চারণকবি মুকুন্দদাস

(রচনা সম্ভার সহ)

ডঃ জয়গুরু গোস্বামী

চারণকবি মুকুন্দদাস

(রচনা সম্ভার সহ)

চারণকবি মুকুন্দদাস

(রচনা সম্ভার সহ)

(জন্মশতবার্ষিক-সংস্করণ)

ডক্টর জয়গুরু গোস্বামী

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রকাশক :

ব্রজকিশোর মণ্ডল

বিশ্ববাণী প্রকাশনী

৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা-৯

পঁয়তাল্লিশ টাকা

উৎসর্গ

মাতৃদেবী ও পিতৃদেবের
শ্রীচরণোদ্দেশে

ভুলি নাই

"ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন বলিদান ?
আজি পরীক্ষা, জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারি হুঁশিয়ার !"

স্বাধীনতার মরণ-পণ সংগ্রামে যাঁহারা হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, জীবন-যুদ্ধে জীবনকে পণ রাখিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়াছেন—সেই সব বীর সৈনিকদের, সংগ্রামী শহীদদের অমর আত্মার স্মৃতির উদ্দেশে স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম। আর প্রণাম জানাই "জনগণ মন-অধিনায়ক ভারত ভাগ্য-বিধাতা"কে। বন্দনা করি—"বিশ্বকবির সোনার বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ, জীবনানন্দের রূপসী বাংলা।"—যাহা আজ সারা বিশ্বে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃত, সুপ্রতিষ্ঠিত ও জাতীয় সঙ্গীতে অভিনন্দিত—

"(ও) আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালবাসি,
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।"

স্বাধীনতার উৎসব—সংগ্রামী মানুষের প্রাণের উৎসব, স্বাধীনতায় গান—মুক্তিকামী মানুষের মুক্তির গান। কারণ—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে
কে পরিবে পায় ?"

বস্তুতঃ মানুষের মধ্যে যেমন বর্ণ-বৈষম্য থাকিতে নাই, স্বাধীনতারও তেমনি কোন জাতিভেদ থাকা উচিত নয়। তাই এপার বাংলা ও ওপার

বাংলার জাগ্রত জনগণের নিকট স্বাধীনতার যে মূল্য, সারা বিশ্বের স্বাধীনতা প্রেমিক জনগণের নিকট তাহার মূল্য একই—

"গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে, সব বাধা ব্যবধান,
যেখানে মিশিছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান-খৃশ্চান।"

তাই, মুক্তি সংগ্রামের অবসান ঘটিলেও স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। এখন সর্বপ্রকার দুর্বলতা, ভ্রান্তি, সংস্কার, জড়তা, নিরক্ষরতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, সংগ্রামই জীবন এবং সংগ্রামই স্বাধীনতা। বিনামূল্যে স্বাধীনতা লাভ করা যায় না, তাহার জন্য মূল্য দিতে হয়। আর এই মূল্য হইতেছে সদাজাগ্রত অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় নিজেকে প্রস্তুত করা এবং চলার পথে মনে রাখা—

"জাগতে হবে উঠতে হবে
লাগতে হবে কাজে;
জগৎ মাঝে কেউ বসে নাই
মোদের কি ঘুম সাজে?"

স্বাধীনতার সৈনিক তাই মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত, উৎসর্গীকৃত ও 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ "আনন্দমঠে"র সন্ন্যাসী। তাঁহার জীবন-সিন্ধু মন্থন করিয়া যে মর্মবীণা বাজিতেছে তাহাই তাঁহার জীবন-সঙ্গীত—

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
ভয় নাই ওরে ভয় নাই;
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।"

ভূমিকা

আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস যাঁহারা রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অন্যান্য বিষয়ের মত এই বিষয়েও পাশ্চাত্ত্য ধারা অনুসরণ করিয়া কেবলমাত্র সরকারী দলিল ও নথিপত্রের উপর নির্ভর করিয়াছেন, তাহার অতিরিক্ত আর কোন তথ্যই তাঁহারা গ্রহণযোগ্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কিন্তু আমাদের দেশের মত অক্ষর-জ্ঞানশূন্য দেশে সর্বাত্মক জাতীয়তাবোধের বিকাশ কেবলমাত্র যে নেতৃবর্গের ভাষণ এবং দেশপ্রেমিকের প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়া সম্ভব হয় নাই, অন্য কোন অলক্ষ্য পথেও সম্ভব হইযাছিল, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পান নাই। অথচ এই কথা সত্য যে, জাতির মধ্যে সর্বাত্মক জাতীয়তাবোধের বিকাশ না হইলে তাহার স্বাধীনতা সংগ্রাম কখনও জয়লাভ করিতে পাবে না। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাও তাহার প্রমাণ।

এই দেশে একদিন যখন স্বদেশী আন্দোলন এবং তারপর সমগ্র ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল, তখন তাহাদের প্রেরণা যে কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া না থাকিয়া দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে প্রচার লাভ করিয়াছিল তাহার প্রকৃত কারণ দূরের কথা, এই বিষয়টিই কেহ যথাযথ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। যদি তাহা করিতে পারিতেন তবে কেবলমাত্র রাজনৈতিক সম্মেলনে আলোচিত প্রস্তাব-পরম্পরার মধ্যে তাঁহাদের এই বিষয়ক আলোচনা সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেন না। প্রকৃত কথা এই যে, এই সকল আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের কোনও সক্রিয় প্রভাব জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। সভামণ্ডপের আনুষ্ঠানিক বিষয় হইতে নিরক্ষর জনসাধারণ কিছুই গ্রহণ করিতে পারে না, তাহাদের গ্রহণ করিবার পথ এবং পদ্ধতি স্বতন্ত্র; দেশের বিদগ্ধসমাজ সেই পথ এবং পদ্ধতির কোন সংবাদ রাখেন না। সুতরাং তাঁহারা দেশাত্মবোধে এ দেশের সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেও প্রকৃত সত্য কথা তাহা নহে। অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে ম্যাট্‌সিনি কিংবা গ্যারিবল্ডি নিজেদের দেশকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই পদ্ধতি আমাদের দেশে চলিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে চলেও নাই।

আমাদের দেশ নিরক্ষরের দেশ। পঁচিশ বৎসর ধরিয়া স্বাধীনতা লাভ করা সত্ত্বেও শতকরা প্রায় আশীভাগ নরনারীই এ দেশে এখনও নিরক্ষর। সুতরাং যে দেশে নিরক্ষর বলিতে কিছু নাই, কিংবা সামান্যই আছে, তাহার জাতীয় চেতনা উদ্বুদ্ধ করিবার যে পদ্ধতি, তাহা নিরক্ষর দেশের উপর প্রযোজ্য হইতে পারে না। আমাদের দেশের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিতসমাজ অর্থাৎ স্বাধীনতা আন্দোলনের সেদিন যাঁহারা পুরোভাগে ছিলেন, তাঁহাদের কেহই এই কথাটি সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। অবশ্য এই বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর কথা স্বতন্ত্র।

সেদিন বাংলাদেশে একজন মাত্র এই কথাটি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, তিনি কেবলমাত্র উপলব্ধি করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, তাঁহার আজীবন কর্ম-সাধনার মধ্য দিয়া তাহা রূপায়িত করিয়া আপামর জনসাধারণকে সেদিন স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার নামে কলিকাতায় কোনও মর্মর মূর্তি স্থাপিত হয় নাই, কোনও পথের নামকরণ হয় নাই, কোন স্মৃতি-মন্দিরও রচিত হয় নাই। তিনি নিতান্ত সাধারণ মানুষের সেবা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যেই বিচরণ করিয়াছেন, তাহাদের হাসি-কান্নায় গানের ভিতর দিয়া স্বাধীনতার বীজ তাহাদের প্রাণে অঙ্কুরিত করিয়া দিয়াছেন, তারপর একদিন তাহাদেরই অশ্রুসজল চোখের সম্মুখ দিয়া শেষ বিদায় লইয়া গিয়াছেন। একদিন তাঁহার সঙ্গেই যাহারা হাসিয়াছিল, কাঁদিয়াছিল, তাহারাই তাঁহার কথা মনের মধ্যে গাঁথিয়া রাখিয়া দিয়াছে। তাঁহার নাম বাংলাদেশের হাটে-ঘাটে-মাঠে সর্বত্র একদিন সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার জ্বলন্ত বাণীর অগ্নিশিখা দেশের একপ্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়া প্রতিটি মানুষের মনে আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল, তিনি চারণ-কবি মুকুন্দদাস।

যাহারা শহরের সভা-সমিতিতে দেশের নেতৃবৃন্দের দেশাত্মবোধক বক্তৃতা শুনিবার সুযোগ পাইত না, তাহারা সহস্রে সহস্রে মুকুন্দদাসের দেশাত্মবোধক গান শুনিত, স্বদেশী যাত্রায় তাঁহার অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হইত; তাঁহার কথা ও তাঁহার গানের মধ্যে তাহারা রসে ও সুরে ডুবিয়া থাকিত, তাহারই ভিতর দিয়া দেশের প্রতি তাহাদের অনুরাগ সৃষ্টি হইত। জীর্ণ-শুষ্ক দেশপ্রেমমূলক কোন গ্রন্থ এই কাজ করিতে পারিত না।

কিন্তু মুকুন্দদাসের কোন পরিচয় আমরা জানিতাম না; যতটুকু জানিতাম তাহা কিংবদন্তীমূলক মাত্র ছিল, ঐতিহাসিক বিচারে তাহার কিছু মূল্য ছিল না। জানিতাম না, বোধহয় জানিবার কোন প্রয়োজনও মনে করিতাম না। কারণ,

বিদগ্ধসমাজের অন্তরাল দিয়া মুকুন্দদাসের যাত্রাপথ স্থাপিত হইয়াছিল, তাই বিদগ্ধসমাজের কোন কৌতূহল তাহার দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে নাই ; অথচ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষুদ্রতম সৈনিকেরও দান স্বীকৃত হউক ইহাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এই বিষয়ে এক বিরাট দান থাকা সত্ত্বেও এতদিন পর্যন্ত তাঁহার জীবন কেবলমাত্র কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়াই চলিয়াছে। পরম সৌভাগ্যের বিষয় আজ এতদিন ব্যবধানে হইলেও এই বিষয়ে একটি বিদগ্ধ মন কৌতূহলী হইয়াছে এবং তাহারই অক্লান্ত চেষ্টায় বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের এই বীর সৈনিকের জীবনের ঐতিহাসিক দিক অনেকখানি উদ্‌ঘাটিত হইতে পারিয়াছে। এই দুরূহ কার্যে যিনি অসামান্য সাফল্য লাভ করিয়াছেন, তিনি আমার স্নেহভাজন ছাত্র শ্রীমান্ জয়গুরু গোস্বামী। তিনি দুরূহ ব্রতেরই ব্রতী। ইতিপূর্বে তিনি বৈষ্ণব-কবি লোচনদাসের বহু পদের সন্ধান লাভ করিয়া তাঁহার নূতন মূল্যায়ন করিয়াছেন। যে লোচনদাস সমাজে এবং সাহিত্যে উপেক্ষিত ছিলেন, তাঁহাকে তিনি নূতন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তারপর আধুনিক কালের আর একজন উপেক্ষিত কবি সম্পর্কেও তিনি তেমনই কৌতূহল প্রকাশ করিয়া তাহাকেও প্রতিষ্ঠা দান করিলেন। সুতরাং বাংলা সাহিত্য এবং বাঙ্গালীর রাজনৈতিক ইতিহাস সন্ধানকারী উভয়েই তাঁহার নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ থাকিবেন।

মুকুন্দদাসের জনপ্রিয়তার একটি প্রধান কারণ এই ছিল যে, আমাদের দেশে প্রচারের যে একটি সনাতন মাধ্যম ছিল, তিনি তাহা অবলম্বন করিয়াই তাঁহার প্রচার-কার্য করিয়াছেন, স্বদেশী মন্ত্র অবিকল এই পদ্ধতিতে আর কেহ এই দেশে প্রচার করেন নাই। আমাদের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত দেশসেবক সমাজের সঙ্গে দেশের নাড়ীর কোন যোগ ছিল না, কিন্তু মুকুন্দদাসের দেশের নাড়ীর সঙ্গে যোগ ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রে যোগ ছিল না। সেইজন্য তাঁহার পদ্ধতি যেমন শক্তিশালী, তেমনই কার্যকরী হইয়াছিল।

আমাদের দেশের নিরক্ষর সমাজে একদিন লোকশিক্ষা প্রচারের প্রধান অবলম্বন ছিল যাত্রা। মুকুন্দদাস তাহাই তাঁহার স্বদেশী মন্ত্র প্রচারের অবলম্বন-রূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। দেশাত্মবোধের চেতনা আমাদের দেশে নূতন, কিন্তু মুকুন্দদাস ইহা প্রচারের যে পদ্ধতিটি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ছিল সম্পূর্ণ দেশীয়। সেইজন্য বিদেশী মন্ত্রও আমাদের নিকট নিতান্ত আপনার বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আমাদের শিক্ষা-যন্ত্র আজ যে এতখানি পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে, তাহার প্রধান কারণ, প্রথম হইতেই শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে আমরা জাতীয়

ভাবনাকে দূর করিয়া দিয়াছি। আমাদের ভাষা, আমাদের ধর্ম, আমাদের কর্ম, আমাদের পরিবার, আমাদের ইতিহাস আমাদের শিক্ষার মধ্যে স্থান পায় নাই, সেইজন্য শিক্ষা আমাদের নিকট প্রথম হইতেই আকর্ষণীয় হইয়া উঠিতে পারে নাই। মুকুন্দদাস প্রথম হইতেই আমাদের জাতীয় জীবনকে ভিত্তি করিয়া লইয়া তাঁহার বাণী আমাদের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাহা নিরক্ষর জনসাধারণেরও প্রাণস্পর্শ করিয়াছে; এমনভাবে তাহা আর কেহই করিতে পারে নাই। মুকুন্দদাসেব গান শুনিয়া মানুষ যে উন্মাদনা অনুভব করিত তাহার কারণ সেই গানের ভাষা, সুর, ভঙ্গি সবই সাধারণ বাঙ্গালীর নিজস্ব। গানের মধ্যে তিনি উচ্চাঙ্গের রাগ-রাগিণী ব্যবহার করিতেন না, কারণ, তিনি জানিতেন অভিজাত সঙ্গীত-বিলাসীর জন্য তিনি সঙ্গীত রচনা করেন নাই, সঙ্গীত তাঁহার বক্তব্যের মাধ্যম মাত্র, তাঁহার বক্তব্যই এখানে মুখ্য। সেইজন্যই তিনি তাঁহাব সঙ্গীতে কথাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন, সুরকে প্রাধান্য দেন নাই।

স্বদেশ বলিতে যে প্রকৃত কি বুঝায়, তাহা মুকুন্দদাস যেমন বুঝিয়াছিলেন, তাহা সেদিন তেমন আর কেহ বুঝিতে পারেন নাই। অনেকের নিকটই তাহা একটি ভাবস্বপ্ন মাত্র ছিল। কিন্তু মুকুন্দদাসের নিকট তাহা প্রত্যক্ষ সত্য ছিল। তিনি জীর্ণচীর-পরিধানা অন্নহীনা স্বাস্থ্যহীনা বাংলার পল্লীনারীর মধ্যে স্বদেশ-জননীর রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাই তাহাদেব দিকে তাকাইয়া তাঁহার অশ্রুসিক্ত সঙ্গীত রচিত হইয়াছে। বাংলার পল্লীর সঙ্গে মুকুন্দদাসের যোগ প্রত্যক্ষ ছিল, সেইজন্য তাহার বেদনা তিনি সমগ্র অন্তর দিয়া অনুভব করিয়া গানের মধ্য দিয়া তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। তারপর যে অন্যায় শক্তি অত্যাচারীর রূপ ধারণ করিয়া পল্লী-জননীর রক্ত শোষণ করিতেছে, তাহার প্রতিও তাহার ক্রোধ দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার সঙ্গীতে তাহাও বলিষ্ঠ ভাষা পাইয়াছে।

এইভাবে যিনি সুষুপ্ত বাঙ্গালীকে সকল দিক হইতে জাগাইয়া তুলিয়া রক্তাক্ত সংগ্রামের সম্মুখীন হইবার শক্তি দিয়াছেন, তাঁহার বিষয় যদি আমরা ভুলিয়া যাইতাম তবে আমাদের এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের আর কোনও উপায় থাকিত না। সুতরাং যিনি বাংলার এই কীর্তিমান্ পুরুষকে বিস্মৃতি হইতে উদ্ধার করিয়া স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহাকে আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানাই।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয়
ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান এবং রবীন্দ্র-অধ্যাপক

গ্রন্থ-পরিচিতি

স্বাধীন বাংলাদেশের পটভূমিকায় বরিশালের চারণ-কবি মুকুন্দদাস একটি স্মরণীয় নাম। অশ্বিনীকুমার, জগদীশচন্দ্র, কালীশচন্দ্রের বরিশাল এক সময় স্বাধীনচিত্ততা এবং অনমনীয় পৌরুষের লীলাভূমি ছিল। ত্যাগ, নিষ্ঠা, সেবা, মানবপ্রেম প্রভৃতি উচ্চ মানবিক বৃত্তিগুলির চরম উৎকর্ষ বরিশাল জিলাকে সর্ববঙ্গীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সেই গৌরব-গাথার নকিব ছিলেন মুকুন্দদাস, আবার উদ্গাতাও ছিলেন তিনিই। তাঁরই গানে গানে পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ সমগ্র বঙ্গভূমির আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছিল। সেই মুকুন্দদাসের জন্মশতবার্ষিকী সমাগতপ্রায়। এমন সময়ে কলোপযোগী একটা বড়ো কাজে হাত দিয়েছেন ডঃ জয়গুরু গোস্বামী। বাংলাদেশের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে মুকুন্দদাস হয়ত একটি প্রবাদমূলক নামে পরিণত হয়েছেন। বরিশালের অধিবাসীরাও হয়ত শহরের উত্তর সীমান্তে প্রায় অবহেলিত একটি ভূমিতে "মুকুন্দদাসের কালীবাড়ী" নামে একটি প্রতিষ্ঠান দেখেন। কিন্তু মুকুন্দদাসের ব্যক্তি-পরিচয়, জাতির জীবনে তাঁর দানের পরিমাণ অনেকের কাছেই অজানা বা আবছা জানা। ডঃ গোস্বামী মুকুন্দদাসের পূর্ণাঙ্গ রূপটি তুলে ধরে একটি মহৎ কর্ম সম্পাদন করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ও অধ্যবসায় প্রশংসনীয়। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য নিয়ে অনেক ইতিহাসগ্রন্থ লেখা হয়েছে, বহু তরুণ গবেষক এই যুগের অনেক অজ্ঞাত ও অপরিজ্ঞাত উপকরণ সংগ্রহ করে গবেষণাগ্রন্থ রচনা করেছেন; কিন্তু মুকুন্দদাসের জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে কোন তথ্যমূলক আলোচনা এ যাবৎ চোখে পড়েনি। যাঁরা পাঁচালি ও যাত্রাগান নিয়ে নিপুণ গবেষণা করেছেন তাঁদের দৃষ্টিতে যে কেন মুকুন্দদাস অলক্ষিত থেকে গেলেন তাই ভাবি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে এবং পাকিস্তান সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা হয়েছে, কিন্তু মুকুন্দদাসের কৃতিত্বের পরিচয় কেউ তুলে ধরেননি। ঐতিহাসিক এই উপেক্ষার পটভূমিতে অধ্যাপক জয়গুরু গোস্বামী যে দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হয়েছেন সে দায়িত্বকে জাতীয় দায়িত্বরূপে গণ্য করা অসমীচীন নয়। স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় চারণ-কবি মুকুন্দদাস তৎকালীন স্বদেশপ্রেমিক যে-কোন জননেতার মতই মূল্যবান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ডঃ গোস্বামী মুকুন্দদাসের

সেই ভূমিকার রূপটিকে যথাযোগ্য তথ্য-প্রমাণাদিযোগে সুবিন্যস্ত করে ফুটিয়ে তুলেছেন।

মুকুন্দদাসের প্রসঙ্গে আর একটি বড প্রতিভার পরিচয়ও প্রাসঙ্গিক। ইনি হলেন বরিশালের সুবিখ্যাত স্বভাব-কবি এবং সুরশিল্পী হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইনি এক উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এঁর একটি ভাই ইংরেজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত অধ্যাপক। রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিভা মূল্যায়ন করতে গিয়ে গৃহিণীপনার অভাব দেখেছিলেন। হেমকবি সম্বন্ধেও অনুরূপ মন্তব্য করা যায়। অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে হেমকবি প্রতিটি রচনায় বাচ্যান্তবে অভিব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতেন। শব্দ প্রয়োগে তাঁব অদ্ভুত দক্ষতা। সর্বোপরি নিখুঁত নির্ভুল সুরজ্ঞান থাকায় শব্দধ্বনি ছন্দোধ্বনির মধ্যে অপূর্ব সামঞ্জস্য সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু আত্মভোলা বেখেয়ালী মানুষটি সাহিত্যেব ইতিহাসে নিজের প্রতিভা-অনুযায়ী কোন স্থায়ী কীর্তি রেখে যেতে পাবেননি। উপযুক্ত পরিবেশ এবং নাগরিক পৃষ্ঠপোষকতার সুযোগ পেলে তৎকালীন কবিকুলে তিনি অগ্রগণ্য হতে পারতেন। সুযোগ-সন্ধানী না হতে পারায় তাঁর প্রতিভার দীপ্তি বিচ্ছুরিত হতে পারেনি। মুকুন্দদাসের কম্বুকণ্ঠে হেমকবির বহু রচনা রসিকসমাজে সমাদৃত হয়েছে এবং বহু রচনা রচয়িতাব পবিচয় হারিয়ে বসে আছে। বহু রচনাব যে ভণিতা-বিভ্রাট ঘটেছে ডঃ গোস্বামীব দৃষ্টি সেদিকেও পড়েছে।

মুকুন্দদাসের নাম বরিশাল জিলার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি-সম্পর্কে অচ্ছেদ্য সূত্রে জড়িত হয়ে আছে। তাঁর জন্মস্থান যে বিক্রমপুব এবং তাঁর প্রকৃত নাম যে যজ্ঞেশ্বব দে—এই তথ্য অনেকেরই অজানা। কী ভাবে তিনি মুদিখানা থেকে যাত্রাব আসরে দিগ্বিজয়ী হয়ে উঠলেন, কী ভাবে সুবেব ইন্দ্রজালে অপূর্ব কাব্যচ্ছটায় মাতিয়ে তুললেন আত্মত্যাগী স্বদেশপ্রাণ তরুণদলকে, কী ভাবে কেন রুষ্ট করে তুললেন তৎকালীন ইংরেজ সরকারকে এবং তেলেব ঘানি টেনে নিষ্ঠুর কারাযন্ত্রণা হাসিমুখে সহ্য করলেন তার বিস্তৃত বিবরণ ডঃ গোস্বামীব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। আজ বরিশাল স্বাধীন বাংলাদেশের একটা গৌববমণ্ডিত অংশ। পশ্চিমবঙ্গও স্বাধীন গণতন্ত্রী ভারতেব ঐশ্বর্যময় ঐতিহ্যের গৌরব নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ। উভয় বঙ্গের কাছেই আজ মুকুন্দদাসের কর্মময় সংগ্রামময় জীবন একটা উল্লেখযোগ্য আদর্শ। ডঃ গোস্বামী সেই আদর্শের সন্ধান দিয়ে আজ বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের কাছে ধন্যবাদেব পাত্র।

অধ্যাপক ডঃ জয়গুরু গোস্বামী তাঁর এক প্রাক্তন শিক্ষাগুরুর কাছে মুকুন্দদাস সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা-গ্রন্থখানির জন্য একটি পরিচায়িকা লেখার দাবী জানালেন। আমি বরিশালের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল আত্মিক যোগে যুক্ত ছিলাম। এখনও বরিশালের সঙ্গে আমার প্রাণের সংযোগ কিছুমাত্র বিচ্ছিন্ন হয়নি। সেখানকার আকাশ বাতাস ও অধিবাসীবৃন্দের সঙ্গে মর্মগত ঐক্য প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি। তাই আমার যোগ্যতার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে আমার কৃতী ছাত্রের প্রীতির আহ্বানে সাড়া দিতে হল। এক-একবার মনে হয়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পুরোধা সংগ্রামীরা যে প্রাণ-প্রাচুর্যে যে প্রচণ্ড বিপ্লব-বহ্নি প্রজ্বলিত করেছিল তার সমিধ সংগ্রহ করেছিলেন যে চারণ-কবি তাঁর মুখবন্ধ লিখে আমি চিরদিনের জন্য ধন্য হলাম। ঐহিক সুখ, নিশ্চিন্ত শান্তজীবন এবং অপরিমেয় উপার্জনের লোভ ত্যাগ করে যিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য দ্বিধাহীন চিত্তে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন তাঁর জীবনীর সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করার দুর্লভ সৌভাগ্য দিয়ে প্রিয় ছাত্রটি আমার চূড়ান্ত গুরুকৃত্য সম্পাদন করলেন।

ডঃ গোস্বামী প্রভূত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে মুকুন্দদাস সম্বন্ধে প্রাপ্তব্য সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেছেন। 'পাথুরে প্রমাণ' ছাড়া যেগুলি প্রবাদ ও জনশ্রুতি-মূলক তথ্য সেগুলিকে তিনি ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার ও বিশ্লেষণ করে গ্রহণ-বর্জন করেছেন। মুকুন্দদাসের জীবন-কাহিনীর মধ্য দিয়ে কবি-প্রতিভার উন্মেষলগ্নটিকে পরিচ্ছন্নভাবে দেখিয়েছেন। বঙ্গ-ভঙ্গ উপলক্ষে স্বদেশী আন্দোলনের তীব্রতায় বরিশালের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন। বাংলাদেশে যাত্রা-আন্দোলনের স্বরূপ এবং সেখানে মুকুন্দদাসের দানের গুণগত এবং পরিমাণগত মূল্য যুক্তি ও তথ্যসহ নিরূপণ করেছেন। উপসংহারে বরিশালের সামাজিক ও পারিবারিক পটভূমিকায় কর্মযোগী মুকুন্দদাসের যে যথার্থ পরিচয় স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে তারও বিশদ পরিচয় এই গ্রন্থখানিকে ঐতিহাসিক মর্যাদা দিয়েছে। গ্রন্থখানির মূল্য ও গৌরব বৃদ্ধি হয়েছে সুসম্পাদিত পরিশিষ্ট রচনায়। মুকুন্দদাসের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনার সুসজ্জিত সংকলন "পরিশিষ্টে" প্রকাশ করা হয়েছে। কবির রচনা বাংলাদেশে ইতস্ততঃ এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছিল। কতক ছিল তাঁর অনুরাগীদের মুখে মুখে। অধ্যাপক গোস্বামী সেগুলি সংগ্রহ করে সাজিয়ে গুছিয়ে, প্রথম চরণের বর্ণানু-ক্রমিক সূচী দিয়ে "পরিশিষ্ট"টিকে মহামূল্যবান করে তুলেছেন। তদুপরি আর একটা বড় কাজ করেছেন "ভণিতা-বিভ্রাট" বিচার। গবেষকের পক্ষে এটা একটা সুকঠিন দুরূহ কর্ম। যে কবি-কর্মের খতিয়ান সাময়িক পত্রে বা মুদ্রিত

গ্রন্থে সহজে পাওয়া যায় তার রচয়িতা পরিচয়ে কোন সমস্যা থাকে না। কিন্তু যাঁর রচনা লোকপ্রিয় সঙ্গীতরূপে গায়কদের মুখে মুখে ঘোরে এবং অতর্কিতে ভণিতামুক্ত হয়ে পড়ে সেই রচনাই রচয়িতা সম্বন্ধে দারুণ সংশয় ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। তার উপর থাকে পাঠান্তর সমস্যা। হেমকবির রচিত বহু পদ এবং তাঁর দেওয়া সুর মুকুন্দদাসের কণ্ঠে বাংলাদেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল। পরে হয়ত পদগুলির সঙ্গে মুকুন্দদাসের নাম ভণিতাবদ্ধ হয়েছে। আবার মুকুন্দদাসকে গুরু বরণ করে যাঁরা যাত্রার আসর খুলেছিলেন তাঁদের যাত্রাগানে হয়ত মুকুন্দদাসের রচিত পদ অন্য কোন গায়কের ভণিতায় প্রচার হয়েছে। এইভাবে "ভণিতা-বিভ্রাট" সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। গবেষণাকার্যে নিপুণ অধ্যাপক গোস্বামী স্থির বুদ্ধি এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে "ভণিতা-বিভ্রাট" নিরসনের একটা অকৃত্রিম চেষ্টা করেছেন। পাঠক সম্প্রদায় সে চেষ্টার সাফল্য নির্ণয় করবেন। মোট কথা, গ্রন্থখানিকে তথ্য-সমৃদ্ধ, বিশ্লেষণাত্মক এবং সর্বাঙ্গসুন্দর করতে ডঃ গোস্বামী কিছুমাত্র ত্রুটি করেননি।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলাদেশের নেতৃবর্গের দানের মূল্য আজ স্বাধীন ভারতের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। স্বাধীনতার ইতিহাস আলোচনায় এই প্রসঙ্গে মুকুন্দদাসের কীর্তিও স্মরণীয়। সম্প্রতি পূর্ববঙ্গ স্বাধীন বাংলাদেশ-রূপে নবজন্ম লাভ করে স্বাধীনতা-সংগ্রামী বাঙ্গালী মনীষীদের কীর্তিকথা নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করবেন এটাই স্বাভাবিক। এপার বাংলা এবং ওপার বাংলার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করবার পরম বাঞ্ছিত প্রয়োজনও তার দ্বারা সাধিত হবে। সেই সম্ভাবিত উদ্যোগে যে উপকরণগুলি প্রয়োজন তার অনেক মাল-মশলা ডঃ গোস্বামীর এই গবেষণামূলক গ্রন্থখানিতে প্রাপ্তব্য বলে মনে করি। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ইতিহাসভিত্তির মূলে শুধু সাম্প্রতিক ঘটনাই নয়, সে-ভিত্তি আরও গভীরে। ডঃ গোস্বামী সেই গভীরতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভবিষ্যৎ গবেষণার পথ এবং জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নিরূপণের পথ সুগম করে দিলেন। তাঁর এই শ্রমলব্ধ গবেষণা জাতীয় প্রয়োজনে সার্থক হয়ে উঠুক এই আশা এবং আশ্বাস নিয়ে আমি গ্রন্থখানিকে সানন্দে অভিনন্দন জানাই।

শ্রীহেরম্ব চক্রবর্তী

অধ্যাপক

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা

গ্রন্থকারের নিবেদন

প্রথম সংস্করণ

ভারতের লব্ধ স্বাধীনতায় বাংলার দান অপরিসীম। এই বাংলাকে ভারতের শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যাঁহারা মরণ-পণ সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে "বাংলা মায়ের দামাল ছেলে চারণ-কবি মুকুন্দদাসের" নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন গীতিকার ও সুরকার, অভিনেতা ও শিল্পী। জীবনকে তিনি শিল্পের মত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই যে কাব্য ও জীবনের একাঙ্গীকরণ, ইহাই ছিল মুকুন্দদাসের জীবন-সাধনা। তাঁহাকে আপনারা অনেকেই জানেন। আর যাঁহারা জানেন না, তাঁহারা এই গ্রন্থখানি পড়িয়া তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিতে পারিবেন আশা করি। তাঁহার কর্মক্ষেত্র ছিল সাধারণ মানুষের ভিতর। তিনি সহজ ও সবল ভাষায় নানা প্রকার গান, বক্তৃতা ও স্বদেশী যাত্রাভিনয়ের মধ্য দিয়া দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত, হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সকলের নিকট প্রেম ও স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি ধনীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন নাই বটে, কিন্তু হৃদয়বত্তায়, আন্তরিকতায় ও আত্মবিশ্বাসে বহু ধনীর চেয়েও "ধনী" ছিলেন। এ-যুগের বহু শেঠজীদের মত তাঁহার লোকবল বা অর্থবল ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাণ-মাতানো গানে হাজার হাজার যুবক "দশ-হাজারীর" দলে যোগ দিত স্বাধীনতার জন্য। মূলতঃ মুকুন্দদাস ছিলেন অগ্নিযুগের অন্যতম ঋত্বিক এবং বিপ্লবী কবি। তাঁহার ছিল এক অদ্ভুত প্রতিভা। "সেইটুকু সম্বল করে তিনি সারাজীবন যা করে গেছেন তাকে মহৎ বললে কম বলা হয়। তা ছিল অনুপম।"

মুকুন্দদাসের নাম-কাল-পরিচয় আজ অতীত ইতিহাসের এক বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায় মাত্র। বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি। তাঁহার অতীতের গৌরবময় অধ্যায়ের কথা সে ভুলিতে বসিয়াছে। মুকুন্দদাসের ভাষায় বলা যায়—"অতীত গিয়াছে অতীতে মিলায়ে সম্মুখে মহাভবিষ্যৎ।" অদূরে কাণ্ডারীর হুঁশিয়ার বাণী ধ্বনিত হইতেছে—"দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার।" সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"বাঙ্গালীর ইতিহাস চাই, নতুবা বাঙ্গালী বাঁচিবে

না"। কিন্তু সেই ইতিহাসও তো আমরা অনুশীলন করি না—"বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া স্বদেশের কুকুর" ধরি না, বরং দেশের ইতিহাস অপেক্ষা বিদেশের ইতিহাসের প্রতিই আগ্রহ যেন বেশী। অথচ আবহমান কাল ধরিয়া যে "Tradition" সমানে চলিয়াছে, বর্তমানেও তাহার কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। অধ্যয়ন, স্মরণ, মনন ও অনুশীলন করিলে এই কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাইবে এবং লুপ্তপ্রায় ইতিহাসের পুনরুদ্ধার সম্ভব হইবে। ভারতের ইতিহাসে স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। এই স্বাধীনতা আন্দোলনে যাঁহারা নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন—চারণ-কবি মুকুন্দদাস তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহাব প্রকৃত নাম কি? তাঁহার জন্মস্থান কোথায়? স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁহার অবদান কোথায়? যাত্রা আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁহার স্থান ও মান কোথায়?—এই সব বিষয় লইয়া আজ পর্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ কোন আলোচনা হয় নাই। অথচ ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য আলোচনার প্রয়োজনীতাও অনস্বীকায। বিশেষ করিয়া মুকুন্দদাসের জন্মশতবার্ষিকী প্রায সমাগত। তাই যখন 'স্বলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ, নবলোকে বাজে জয় ডঙ্ক', তখন 'এল মহা-জনমের লগ্ন'—"চাবণ কবি-মুকুন্দদাস।"

মুকুন্দদাসের জীবনে যাঁহাদেব প্রভাব সবচেয়ে বেশী স্মরণীয, তাঁহাবা হইতেছেন—মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং কবি-বন্ধু হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায। ব্রজমোহন বিদ্যালযে শিক্ষালাভ করিতে আসিয়াই মুকুন্দদাস অশ্বিনীকুমাব দত্তেব সংস্পর্শ লাভ করেন। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারদেশে উপনীত হইতে সক্ষম হন নাই। দুরন্ত উচ্ছৃঙ্খল মুকুন্দ লেখাপড়া অপেক্ষা শ্মশানে শবদাহ ও ঘরে ঘরে হরিনাম সংকীর্তন করিয়া বেড়াইতে অধিক ভালবাসিতেন। কিন্তু ইহা তাঁহার জীবনে অভিশাপ আনে নাই, আশীর্বাদই আনিয়াছিল। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের ভাষায় বলা যায "কলেজে পা দিতে পারিলেই আর মুকুন্দ হইত না। শিষ্ট-ভদ্র গৃহস্থ হইত, বরিশালের লোকেবাও চিনিত না।" আর হেমকবি না থাকিলে মুকুন্দদাসের গান ও যাত্রা এত জনপ্রিয় হইয়া উঠিত না এবং স্বদেশী যাত্রার প্রবর্তক হিসাবে মুকুন্দদাসকে কেহই চিনিত না।

মুকুন্দদাসের গানের সংখ্যা শতাধিক। কিন্তু এই শতাধিক গানের মধ্যে তাঁহার রচিত প্রথম গানটি হইতেছে—"কৃষ্ণনাম বড়ই মধুর/যে লয় সে বড়ই চতুর" ইত্যাদি। ১৩০৮ বঙ্গাব্দের বসন্ত ঋতুতে নিজের বিপণিতে বসিয়া যজ্ঞেশ্বরের জীবনে এই যে গানের জন্ম হইল—উহাই যজ্ঞেশ্বরের রচিত প্রথম

সংগীত। উহাই "মুকুন্দ" নামে প্রচারের সর্বপ্রথম গোপন অভিব্যক্তি। প্রথম রচিত প্রথম দিনের এই সংগীত যে সমারোহে গৃহীত হইয়াছিল, মনে হয় অমর সংগীত রচয়িতা ও গায়ক মুকুন্দের ভবিষ্যৎ বিরাট বিজয়ের উহাই অভিষেকী বিদ্যুৎবাহী আকাশবাণী। দেড় বৎসরের মধ্যে শতাধিক গান রচিত ও গীত হয়। সেই সব গানের একত্র সমাবেশ হইতেছে—"সাধন-সংগীত" এবং "গানের-বই" নামে দুইখানি ক্ষুদ্র পুস্তক। বর্তমানে আর তাহা পাওয়া যায় না, ভবিষ্যতেও পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। আমরা বহুজনের মুখে শুনিয়া, নানা সূত্র অবলম্বন করিয়া বহু পরিশ্রমে মুকুন্দদাসের ১২টি অপ্রকাশিত ও ১১৫টি প্রকাশিত (মোট ১২৭টি) গীত সংগ্রহ করিয়াছি এবং তাহা বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছি। মুকুন্দদাসের গানের সঙ্গে যাঁহারা পরিচয় লাভ করিতে আগ্রহী তাহাদের পক্ষে এই সংকলনটি বিশেষ কাজে লাগিবে বলিয়া মনে করি। মুকুন্দদাসের গানের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, অন্যের পক্ষে তাহা অনুকরণ সম্ভব নয়। মুকুন্দদাস রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রভৃতি কবিগণের মত নিজের রচিত গানগুলিতে নিজেই সুর দিয়াছেন। সুতরাং রবীন্দ্র-সংগীত বা নজরুলগীতির যেমন সুরের পরিবর্তন করা যায় না, তেমনি যায় না মুকুন্দদাসের গানের সুরের পরিবর্তন সাধন। দীর্ঘদিনের সাধনা ও অনুশীলনের ফলে এই বিষয়ে অধিকার জন্মায়। "জীবনে জীবন যোগ করা"ই হইল জীবন-সাধনা ও সুর-সাধনা। তাহা না হইলে "কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।" তাহা ছাড়া "সত্য মূল্য না দিয়ে সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি/ভাল নয় নকল সে সৌখিন মজদুরি।" মুকুন্দদাসের গানেও আছে ইহার প্রমাণ-- "ছল চাতুরী কপটতা মেকি মাল আর চলবে ক'দিন; হাড়ি মুচির চোখ খুলেছে, দেশের কি আর আছে সেদিন?"

"মুকুন্দ"-ভণিতাযুক্ত গীতগুলি মুকুন্দদাসের রচিত গীত বলিয়া সহজেই চেনা যায়। কিন্তু মুকুন্দের রচিত এমন অনেক গীত আছে যাহা "মুকুন্দ"-ভণিতাযুক্ত নহে। মুকুন্দদাস নিজের রচিত গীত ছাড়াও ভাব প্রকাশের সহায়ক অন্যান্যদের রচিত গীতও গাহিতেন। ফলে দেখা যায়, বহু প্রচলিত গীতও "মুকুন্দে"র নামে চলিয়া আসিতেছে, যাহা মুকুন্দদাসের নয়। আমরা মুকুন্দদাসের ভাব-ভাষা, বিষয়-সুর, ছন্দ ও অলঙ্কার মাধুর্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গানের বিচার করিয়া একটা সম্যক ধারণা দিবার চেষ্টা করিয়াছি। আশা করি ইহাতে "ভণিতা-বিভ্রাট" দূর হইবে এবং মুকুন্দদাসের নামের ও গানের একটা যথাযোগ্য মূল্যায়ন হইবে। "কীর্তনীয়া যজ্ঞেশ্বর" এবং "কীর্তনীয়া

মুকুন্দদাসের" মধ্যে একটা কালগত ও ভাবগত তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। "ভণিতা" বিচারে এই ক্রম-বিবর্তনের কথা মনে রাখিতে হইবে। ভবিষ্যতে হয়ত আরও অনেক গীত আবিষ্কৃত হইবে যাহা মুকুন্দদাসের অথবা মুকুন্দদাসের নামে প্রচলিত অন্যান্যদের গীত।

মুকুন্দদাসের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া মুকুন্দের জীবিতাবস্থায় ও তাঁহার মৃত্যুর পরে যে সব চারণ-কবি স্বয়ং দল করিয়া গান গাহিয়াছেন এবং গাহিতেছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দলপতিগণের নাম উল্লেখযোগ্য—কালীকৃষ্ণ নট্ট, যোগেশচন্দ্র দে, শিশু দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ রায়, মনোমোহন নাগ, নবদ্বীপ গোপ প্রভৃতি। মুকুন্দদাসের জীবিতাবস্থায়ই শিক্ষকরূপে তাঁহার প্রেরিত লোকদ্বারা মেদিনীপুরে একটি দল গঠিত হইয়াছিল। অদ্যাবধি যে সব চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গান গাহিয়া মুকুন্দের ভাবধারা বজায় রাখিয়াছেন—চারণ-কবি সুশীল ঘোষ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। এদেশের যাত্রার ট্র্যাডিশান ছয় শত বৎসরেরও বেশী পুরাতন। যেখানে "রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং তনু" শ্রীচৈতন্যদেব নিজে রাধা সাজিয়া অভিনয় করিতেন, সে দেশের মানুষের অন্তরের জিনিস হইল— "যাত্রাভিনয়"। মুকুন্দদাস শক্তিমান পুরুষ ছিলেন। তাই প্রতিটি পালার ভিতর দিয়া দেশাত্মবোধক গান গাহিয়া দৃপ্ত স্বদেশপ্রেমে দেশকে জাগাইতে চাহিয়াছিলেন। তাহারই স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ চারণ-কবির আসনে বরণ করিয়া লয়। পৌরুষের প্রতিমূর্তি এই চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গান গাহিবার মত খুব বেশী শিল্পী আমাদের দেশে আজ আর নাই। শ্রীসবিতাব্রত দত্ত কিংবা শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের মত শিল্পী যাঁহারা আজও উদাত্তকণ্ঠে মুকুন্দদাসের গান গাহিতে পারেন, আমাদের মন অজ্ঞাতসারে যেন তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

মুকুন্দ দাস ছিলেন স্বভাব-কবি। অদ্ভুত ছিল তাঁহার কবিত্বশক্তি ও সৃজনী-[illegible]। আসরে দাঁড়াইয়া স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী গান রচনা করিয়া সুর সহযোগে গাহিবার মত ঐন্দ্রজালিক শক্তি ছিল তাঁহার। তাঁহার গানে মানুষ যেন নতুন জীবন লাভ করিত এবং মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকেই অনুসরণ করিত। দেশকে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন বলিয়াই দেশের মানুষ তাহার গানে এমন পাগলপারা হইয়া পড়িত। তিনি ছিলেন সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি এবং স্বদেশের [illegible] অমর কবি। ঐতিহাসিক আর্ণল্ড টয়েনবি [illegible] "শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা [illegible] বণিক, সৈনিক ও রাজনীতি[illegible] চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী [illegible] কবি [illegible] ঐতিহাসিকের চেয়ে বড়।" উক্তি[illegible] বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।
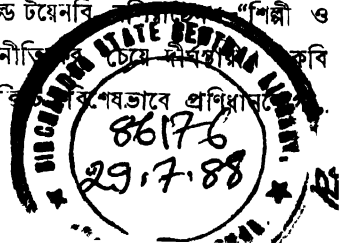
কারণ "কবি" কথাটি বিশেষ অর্থবহ। এই প্রসঙ্গে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তি স্মরণীয় :—"সংস্কৃতে কবি কথার মূলগত অর্থই গায়ক। তাই কাব্য সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি য়ুরোপীয়দের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।" গীতিকার ও সুরকার দিলীপকুমার রায়ের মতে—"ইংরাজি ভাষায় কাব্যের শিখর গানের শিখরের চেয়ে উঁচু। ওদের শ্রেষ্ঠ বাণী মেলে কাব্যে—বিশেষ করে অমিত্রাক্ষরে। কিন্তু ভারতে, আরও বিশেষ করে বাংলাদেশে—কাব্যের শিখর মহিমা-দীপ্ত হয়ে ওঠে গানেই বলব। বাঙালী কবির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি চিরদিনই ফুটে উঠেছে তাঁর গানে। বাংলাদেশের মাটি গানের অশান্ত জোয়ারে আজও উর্বর।" জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, লোচনদাস, বলরাম দাস, শশীশেখর, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রমুখ ভক্ত-কবি, গীতিকার ও সুরকার আমাদের দেহ-মন-প্রাণ জুড়িয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী বাঁচিয়া আছেন। ইঁহাদেরই উত্তর-সাধক **চারণ-কবি মুকুন্দদাস**। প্রকৃতপক্ষে মুকুন্দদাসকেই বাংলার সর্বাঙ্গীণ সার্থক **"চারণ-কবি"** বলিয়া অভিহিত করা হয়।

নিবেদক—

জয়গুরু গোস্বামী

অধ্যাপক, বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ

যাদবপুর ॥ কলিকাতা-৩২

হরিসভা পাড়া

"নিগম-কুটির"

নবদ্বীপ, নদীয়া।

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

"চারণ সম্রাট" মুকুন্দদাসের জন্ম-শতবর্ষে "চারণকবি মুকুন্দদাস" গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃসন্দেহে জনপ্রিয়তার একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ; যাত্রার জয়যাত্রায় নূতন সংস্করণ ; নূতন সংযোজন। আশাকরি প্রথম সংস্করণের ন্যায় এই সংস্করণও মুকুন্দ অনুরাগী পাঠক ও যাত্রামোদীদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন ও সমর্থন লাভ করিবে।

স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রা যে উন্মাদনা ও আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল, এই সংস্করণে তাহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পাদিত হইয়াছে 'স্বদেশী যাত্রা ও মুকুন্দদাস' নামে এক নূতন অধ্যায়ে। তাহা ছাড়া মুকুন্দদাসের জীবনে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাও এই সংস্করণে সংযোজিত হইয়াছে। বিষয়বস্তুকেও পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত করা হইয়াছে। মুকুন্দদাসের গানের যে একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য—ও আবেদন আছে ; ভাব-ভাষা-সুর-ছন্দের যে একটা ঐন্দ্রজালিক শক্তি আছে ; এই সংস্করণে তাহার একটা সামগ্রিক রূপ দেওয়া হইয়াছে। এই বিষয়ে মুকুন্দদাসের পুত্র কালীপদ দাস, মুকুন্দ দাসের দৌহিত্রী পুতুল দত্ত, মুকুন্দ অনুরাগী অগ্রজ-তুল্য মনোজ দত্ত, ত্রিপুরার মুকুন্দ জন্মশতবার্ষিক কমিটির সম্পাদক নিধু হাজরা, মুকুন্দদাসের নিকটতম আত্মীয়—কীর্তন সঙ্গী মনোমোহন নাগ, গীতিকার সুশীল ঘোষ, সবিতাব্রত দত্ত, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও মেদিনীপুর নিবাসী 'কবিভূষণ' শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য।

মূলতঃ "চারণ-কবি মুকুন্দদাস" একটি গবেষণালব্ধ আকরগ্রন্থ। কারণ মুকুন্দদাস সম্বন্ধে তথ্য নির্ভর জীবন কাহিনী ইতিপূর্বে কেহই রচনা করেন নাই। কবি সাহিত্যিক ও গবেষকদের মতে "চারণকবি মুকুন্দদাস"-ই এই বিষয়ে পথিকৃৎ। বাস্তবিক পক্ষে মুকুন্দদাস সম্বন্ধে সচরাচর যাহা জানা যায় ; তাহা অসম্পূর্ণ, সংক্ষিপ্ত ও অতিরঞ্জিত। এই কারণে তাঁহার পুত্র, সহকর্মী, কীর্তন-সঙ্গী, প্রত্যক্ষদর্শী, বন্ধু ও পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের মতামতের উপর নির্ভর করিয়া

এবং ঢাকা-বরিশালের ঐতিহ্যবাহী বহু মুকুন্দ-অনুরাগীদের সঙ্গে মিশিয়া বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করিয়া "চারণ সম্রাট" মুকুন্দদাসের পূর্ণাঙ্গ কর্মময় জীবনালেখ্য রচনায় ব্রতী হইয়াছি। মুকুন্দ-অনুরাগী সরল প্রাণ ভক্তগণ মুকুন্দের রচনা ও জীবনীমূলক ঘটনায় কতকগুলি কিংবদন্তীতে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন। বাংলা সাহিত্যে বৃহত্তম ইতিহাসের লেখক ও তাহাদের মধ্যে কতটা সত্য নিহিত আছে, তাহা বিচার করা অসম্ভব বলিয়াছেন। যে ক্ষেত্রে দেবদূতেরাও অগ্রসর হইতে সঙ্কোচ বোধ করেন, সেইখানে এই মূঢ়মতি গবেষক নিতান্ত সত্য অনুসন্ধিৎসায় প্রণোদিত হইয়া ঐসব কিংবদন্তীর সত্যতা মূল্যায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। এই বিষয়ে যাঁহারা আমাকে আশীর্বাদ করিয়াছেন, প্রেরণায় ও উৎসাহে অভিষিক্ত করিয়াছেন, প্রশংসাধন্যে উজ্জীবিত করিয়াছেন এবং নানাভাবে সাহায্য ও পরামর্শ দিয়াছেন; তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট আমি বিশেষ ভাবে ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থখানির শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যাঁহারা শুভানুধ্যায়ী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ সেন, বাংলা বিভাগের প্রধান ডক্টর অসিত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক ডক্টর আশুতোষ দাস, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর অরবিন্দ বসু, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডক্টর হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বনামখ্যাত অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, 'বরিশাল হিতৈষী' পত্রিকার সম্পাদক দুর্গামোহন সেন এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সব বিশিষ্ট মনীষীবৃন্দ আমার সাধনায় ও ও আরাধনায় প্রীত হইয়া আমাকে যে ভাবে আশীর্বাদ করিয়াছেন, তাহা স্বদেশীযুগের অমর শিল্পী "চারণকবি মুকুন্দদাসের" জন্মলগ্নের জয়টীকা।

গ্রন্থখানির প্রকাশনায় অকুণ্ঠভাবে সাহায্য করিয়াছেন "রবীন্দ্র লাইব্রেরী"-র জনপ্রিয় প্রকাশক রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, বন্ধুবর পরিতোষ চক্রবর্তী এবং "বিশ্ববাণী প্রকাশনীর" স্বত্বাধিকারী ও খ্যাতিসম্পন্ন প্রকাশক ব্রজকিশোর। আর এই দুরূহ কার্য সম্পাদনে ও নূতন তথ্য সংযোজনে নিরলস ভাবে সাহায্য করিয়াছেন গ্রন্থের ভবিষ্যৎ স্বত্বাধিকারিণী ও সহধর্মিণী শ্রীমতী অঞ্জলি গোস্বামী। মুদ্রণকার্যে বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখেন প্রেসের কর্মীবৃন্দ। তাঁহাদের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও চেষ্টা সত্ত্বেও সে-সব ত্রুটি বিচ্যুতি রহিয়া গেল তাহা সাহিত্য

ও মুকুন্দ-অনুরাগী পাঠকেরা ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখিবেন আশাকরি। এই আশা ও বিশ্বাস লইয়া এবং গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করিয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি :—

"একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের মর্ম্মবাণী
এই মোর রহিল প্রণাম
—গ্রন্থকার।

"সত্যাশ্রয়ী নিগমানন্দ"
১০নং নিউ সন্তোষপুর ফার্স্ট লেন,
কলিকাতা—৭৫।

॥ "চারণকবি মুকুন্দদাসে"র উপর বিশিষ্ট মনীষীবৃন্দের অভিমত-সংকলন ॥

Suniti Kumar Chatterji,
National Professor
National Library Campus
Belvedere, Calcutta-27.

Charan-Kavi Mukunda Das

This thesis, running up to 734 pages, has given a comprehensive study of a remarkable patriot of Bengal who wanted to serve the nationalist cause to bring about the freedom of India through music and drama-namely the poet and dramatic artist Mukunda Das of Barisal (1878—1934), Bengali Year 1285—1341. Mukunda Das had combined in himself a fervent patriot whose dream was to instil into the minds of the masses a desire for the freedom of India and the moral as well as economic uplift of the country, and the means which he employed was to rouse them up through his patriotic songs and his dramas of profound social and nationalistic import. He was a master of the drama in the old *yatra* tradition of Bengal. Like the *yatra* players he had his troupe of actors, singers and musicians and would move about the country from town to town and village to village holding performances in the traditional style, without a proper stage and scenes and other accessories. These *yatra* performances are quite a distinctive product of the old dramatic culture of Bengal and India, and they have, because of their alfresco nature, a remarkable appeal to the basic

verities of life and an immense popularity with all classes of people. The *yatra* thus forms a very convenient means for rousing the national spirit as in earlier days it was the most effective hand-maid of religious faith and devotion. Mukunda Das, from the time that he took up this profession became a great force in the country. He himself belonged to a respectable non-Brahmin community, the Kayastha, and born in Dacca district he made his permanent home in Barisal. He did not have much schooling, and he was a man of humble means and was a trader in a small way as a seller of foodstuff and groseries.

But Mukunda Das joined the nationalist movement quite early in life, and he dedicated himself heart and soul to this work, which was quite a dangerous thing to do during the first two decades of the 20th century particularly. At that time the British policy in India, to keep up their hold on India life and on the resources of India made them quite cruel and vindictive, and severe punishments, including physical torture would be meted out to all those who were under the suspicion of the British Government that they wanted the British rule to come to an end in India.

Mukunda Das is now honoured as one of the best workers in the field of this nationalistic uplift through the electrifying power of his music and through the most forceful and appealing language of his songs. Mukunda Das had the soul of a poet and a man of true devotion. But in composing his songs which won the hearts of the people, he got a good collaborator in a dramatist and song writer, namely Hem Chandra Mukherjee. Before taking to the profession of a *yatra* leader Mukunda Das was a *Kirttaniya*, i.e. a singer of Vaishnava lyrics known as

kirttans. The singing of the *kirttan* was consummate and quite a complicated art, and Mukunda Das had a good training in the discipline of this art. His poetic collaborator Hem Chandra Mukherjee was a *kathak* or a narrator of Purana stories in the traditional way in addition. This combination gave to Bengali, already rich in its lyrical wealth of songs and poems of all sorts, a new type of beautiful lyrics of social as well as political significance and importance.

Mukunda Das's career was divided between his travels through many of the districts of Bengal and also in other parts of India leading his troupe and giving *yatra* performances, and in this way he obtained a great celebrity and quite a notional vogue being in demand every where. But because of the patriotic import of his songs, he was held in suspicision by the British Government and had to serve periods of incarceration in prisons, in Barisal and in Delhi. He obtained the universal homage of every great man in Bengal and even outside Bengal, and one of his most ardent friends and suporters was the illustrious Aswini Kumar Dutt of Barisal.

A good biography together with a oollection of his more important musical compositions (the songs were frequently composed by Hem Chandra Mukherjee, his collaborator), and also some of his dramas, has been quite a *desideratum* in the history of Bengali literature of the present age. The absence of a good selection of his songs and of the more important of his plays formed a lacuna in the history of current Bengali literature. Mukunda Das's dramatic repertoire was not very extensive. But those few dramas which he wrote had a telling quality, and they filled the

listeners with enthusiasm which thrilled and inspired them into good thoughts and resolve.

Prof. Goswami has given a good study of Mukunda Das. There is a detailed account of his life. It was of course not very eventful, but in his life there were shadows of great events which ultimately led to the freedom of India events which bronght glory to Bengal and India's fight for freedom. The devotional element was also not wanting in his songs. Those who witnessed his most important dramas like *Samaj* and *Palli Seva* as well as *Brahmacharini* and *karma-kshetra* will be able to testify to the great appeal which Mukunda Das had to the mass mind in Bengal, Both among the intellectual and the cultured elite and the unlettered and unsophisticated working classes. Dr. Goswami has after giving a detailed biography, included as a sort of a pendant to his thesis, which occupies more than half of this work, a collection of Mukunda Das's songs, or rather the songs which he used to sing with his troupe. He has got these songs from the different dramas, as they have been published. Besides, he has also brought in some hitherto unpublished songs as well. He has sought to do his work in a critical spirit and has added a commentary to some of the songs where there has been a difficulty in finding out who the original poet was for a particular song and the circumstances under which these songs were made. There is a section giving an index of the first lines of over 150 songs which have been collected study of Mukunda Das's work. Besides, we have the full text of four of the big dramas which Mukunda Das composed, taking up pages 347—720 of this thesis, and the dramas included are the four mentioned above. There is at the end a brief chrono-

logy of Mukunda Das's life, mentioning the big events in his career, and finally the author has given an extensive bibliography relevant to the study of Mukunda Das, both in Bengali and English.

I believe this is the first systematic monograph, quite comprehensive in its scope, on an important writer-lyrist and dramatist as well as dramatic artist of Bengal in the 19th-20th centuries, who has his importance both in literature and his significance in the social and political life of Bengal. This thesis presents a collection of materials, both published and unpublished, and there is an attempt at critical presentation, besides offering what may be called a *corpus* of Mukunda Das's songs and lyrics and dramas. This thesis is thus an original research as well as a very good presentation of a writer and dramatic artist who holds a very high place in the present-day literature of India-a literature which belongs both to the people and to the sophisticated classes. As such it forms a note worthy contribution to the study of modern Bengali literature.

Sd/—(Suniti Kumar Chatterji)

চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গানের কথা যুদ্ধোত্তরযুগের যুব-সমাজের অনেকেই জানেন না। আমাদের মধ্যেও অনেকেই যাঁরা তাঁর গান শুনেছেন এবং যাত্রা দেখেছেন—তাঁর জীবনীর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পান নাই। মুকুন্দদাসের গানের বহু বৈশিষ্ট্য আছে। এর মাধ্যমে তিনি জনগণের দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন ও বিভিন্ন সামাজিক, অর্থ নৈতিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে মত গঠনের প্রচেষ্টা করেছেন। সহজ সরল ভাষায় লিখিত এই গানগুলি তাঁর আবেগময় কণ্ঠে যাঁদের শুনবার সৌভাগ্য হয়েছিল—আমিও তাঁদের মধ্যে একজন—তাঁরা আজ ডঃ জয়গুরু গোস্বামীকে আন্তরিক ধন্যবাদ না জানিয়ে পারবেন না। ডঃ গোস্বামী বহু পরিশ্রম করে চারণ-কবির জীবনী সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ

করেছেন ও তাঁর গান সংকলন করেছেন। তাঁর এই অমূল্য গ্রন্থ পড়ে আবার নূতন করে চারণ-কবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হোল। গানগুলি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বরের সুমধুর সুর মনের মধ্যে বেজে উঠল। ডঃ গোস্বামী বঙ্গদেশের বিদগ্ধসমাজকে বিশেষভাবে ঋণগ্রস্ত করেছেন।

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ সেন
উপাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ডঃ জয়গুরু গোস্বামীর মৌলিক গবেষণালব্ধ গ্রন্থ 'চারণ কবি মুকুন্দদাস'-এর পাণ্ডুলিপি পড়িয়া বহু অজানা বিষয় জানিতে পারিয়া খুব আনন্দ পাইলাম। স্বদেশীযুগের অমর-কবি, স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম ঋত্বিক, চারণ-সম্রাট মুকুন্দদাসের কীর্তিগাথা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। কিন্তু কাল-প্রবাহে আপামর জনসাধারণের কাছে মুকুন্দদাসের গৌরবময় স্মৃতি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে, তাঁহার প্রাণমাতানো স্বদেশী গান ও যাত্রা লোকমুখে ঘুরিয়া বিস্মৃত-প্রায় হইয়া ক্রমশঃ কিংবদন্তীতে পরিণত হইতেছে। অধ্যাপক ডঃ গোস্বামী ঐকান্তিক উৎসাহে, আগ্রহে ও নিপুণ নিষ্ঠায় গবেষকের ন্যায় বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া সেই বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়ের দ্বার মুক্ত করিয়াছেন। ফলে মুকুন্দদাসের ব্যাপক কর্মবহুল জীবনের একটি তথ্য-সমৃদ্ধ পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ের যে অভাব এতদিন ছিল, ডঃ গোস্বামীর এই অমূল্য গ্রন্থখানি সেই অভাব পূরণ করিল। 'চারণ-কবি মুকুন্দদাস'—বাঙ্গালা ও বাংলাদেশের বহু বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের এক চিত্তাকর্ষক এ্যালবাম্। এপার বাংলা ও ওপার বাংলার স্বাধীনতাকামী এবং মুকুন্দ-প্রিয় দেশবাসীর কাছে জাতির এই গ্রন্থখানি জাতীয় মর্যাদায় স্বীকৃতি লাভ করিবে—এই আশা ও বিশ্বাস লইয়া গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

অরবিন্দ বসু
উপাচার্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ডঃ জয়গুরু গোস্বামী রচিত 'চারণ-কবি মুকুন্দদাস' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পড়েছি। মুকুন্দদাস একটি স্মরণীয় নাম। তিনি একাধারে কবি, সুরকার, গায়ক, অভিনেতা এবং দেশপ্রেমিক ছিলেন। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর প্রবর্তিত যাত্রা

একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে দেশবাসীকে দেশপ্রেমে আত্মদানে দীক্ষা দিয়েছিল। তাঁর সম্বন্ধে একটি পরিপূর্ণ আলোচনার প্রয়োজন ছিল। আমার ধারণা বর্তমান গ্রন্থখানি সেই অভাব যোগ্যতার সহিত পূরণ করবে। এতে শুধু মুকুন্দদাসের ঘটনাবহুল বৈচিত্র্যময় জীবনের পরিচয় নেই, অতিরিক্তভাবে তাঁর রচিত প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত গানগুলি সংযুক্ত হয়েছে। ডঃ গোস্বামী এর জন্য সকল বাঙ্গালীর অভিনন্দন পাবার অধিকারী।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

পুষ্পরাগ
১, বালিগঞ্জ টেরেস,
কলিকাতা-১৯

প্রাক্তন উপাচার্য, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

জীবনের প্রথম প্রভাতে আমি মুকুন্দদাসের গান শুনেছি। স্বদেশীগানের স্বাভাবিক ত!র্শন চল্লিশ বছর আগে বাঙালীর প্রাণকে কিরূপ চঞ্চল করেছিল সে এক অপূর্ব ইতিহাস। এ গান যে একবার শুনেছে সেই স্বদেশপ্রাণতায় দীক্ষিত হয়েছে। সে প্রাণকল্লোল রুদ্ধ করতে ব্রিটিশ রাজশক্তি মুকুন্দদাসের কত গানের আসর ভেঙ্গেছে, আমর, কৈশোরে তার নেপথ্য-সত্যবান সাক্ষী। আজ হঠাৎ অধ্যাপক ডঃ জয়গুরু গোস্বামী সে যুগের স্বদেশিকতার মহাঋত্বিক, মাতৃ-তপস্বী মুকুন্দদাসেব গানের এক সংকলন গ্রন্থে তাঁর প্রশংসনীয় সঙ্গীত সংগ্রহ প্রয়াস ও মুকুন্দদাসের মর্মলোক উদ্‌ঘাটনের শুভ-চৈতন্য দেখিয়ে আমাকে মোহিত করলেন। আমি মুহূর্তে কৈশোরে ফিরে গেলাম। ভয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে মুকুন্দদাসের স্বদেশীগান শোনার শতস্মৃতি আমার মনকে আনন্দে ভরিয়ে দিল। বাংলা দেশের এমন যুবক আমার এককালের মানস-শিষ্য। দেশকে যে ভালবাসে সে যাই হোক, আমার নমস্য। সেই ভাবপ্রবাহ প্লাবন ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বলছি—ডঃ জয়গুরু, তুমি আমার 'জয়গুরু' জেনো।

শ্রীআশুতোষ দাস

অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলার পাঠক ও শ্রোতার স্মৃতিফলক অনেক সময় শূন্য হৃদয়ে অবস্থান করে। একদা যিনি জনসাধারণকে আনন্দে আবেগে ব্যাকুলতায় উদ্দাম করে তুলতেন, পরবর্তীকালে স্মরণ-বেলাভূমিতে তাঁর কোনও চিহ্ন খুঁজে পাওয়া

যায় না। 'গঙ্গা' এদেশের প্রাণপ্রবাহিণী বটে, গঙ্গার সঙ্গে গম্ ধাতুর হয়তো কোনও একটা নিগূঢ় যোগাযোগ আছে। চলধর্মিতা যেন আমাদের চিত্তপ্রকরণকে কোথাও স্থাবর করে রাখে না। ফলে দিশাহীন উদ্দাম যাত্রা আমাদের সত্তাকে বিচ্ছিন্নতার শূন্যতায় অশরীরী করে তোলে। তা নইলে একদা যাঁরা এ জাতির হৃদ্‌পিণ্ডে কবোষ্ণশোণিত প্রবাহের বন্যা সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁরা পরবর্তীকালে আর জীবন্ত হয়ে দেখা দেন না কেন ?

স্বদেশীযুগ থেকে শুরু করে দীর্ঘকাল দেশবাসীর মনে বন্ধন অসহিষ্ণু অগ্নিজ্বালা ছড়িয়ে দিয়ে চারণ-কবি মুকুন্দদাস শিল্পের ক্ষেত্রে একটি বিদ্যুন্ময় উন্মাদনারূপে বিরাজ করছেন। সেকালে যাঁরা তাঁর স্বদেশপ্রেমমূলক যাত্রাগান শুনেছিলেন, তাঁরা হয়তো এখনও সেই সমস্ত দুর্লভ মুহূর্ত স্মরণ করতে পারবেন। ডক্টর শ্রীমান জয়গুরু গোস্বামী প্রভূত পরিশ্রম করে মুকুন্দদাসের বিস্মৃতপ্রায় জীবনকথা ও গানগুলি উদ্ধার করে পাঠক-সমাজে উপস্থাপিত করেছেন। এর জন্য তিনি সমগ্র বাঙালী সমাজের কাছ থেকেই অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করবেন।

ইতিপূর্বেই তিনি গবেষক হিসাবে বাংলা সাহিত্যে একটি স্থায়ী আসন অধিকার করে নিয়েছেন। বক্ষ্যমাণ 'চারণ-কবি মুকুন্দদাস' গ্রন্থটি তাঁর সেই সম্মান অধিকতর বর্ধিত করবে। একটি বিস্মৃতপ্রায় ব্যক্তিত্বকে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে সংস্থাপন করে ডক্টর গোস্বামী বাঙালীকে মলিন পাতিত্য থেকে রক্ষা করলেন, এজন্য তাঁকে আমি স্নেহাশীর্বাদ জানাই।

শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

জয় জগদ্বন্ধু !

চারণ-কবি মুকুন্দদাসের কর্মস্থান বরিশাল জিলায়। আমার জন্মস্থান হইতে বেশী দূরে নয়। ছেলেবেলায় তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি। যাত্রার আসরে যখন সেই পুরুষসিংহ নাচিয়া নাচিয়া গাহিতেন—"সাবধান-সাবধান ! আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড" তখন আমাদের বালকচিত্তে একটা অনির্বচনীয় সম্ভ্রম ও মর্যাদার বোধ জাগ্রত হইত। মনে হইত সমাজের সকল অন্যায়কারীদের শাস্তি দিতে শ্রীভগবানের "ন্যায়ের দণ্ড" নামিয়া আসিতেছে। মা কালীর অনুরাগী ভক্ত অথচ গভীরভাবে দেশপ্রেমিকসামাজিক ও রাজনৈতিক অত্যাচারঅন্যায়েরে-অত

প্রতি তীব্র বিদ্রোহীভাবাপন্ন এরূপ মনীষী দুর্লভ। বাংলার অগ্নিযুগের ঋত্বিকগণের তিনি অন্যতম। তাঁহার জীবন-কাহিনী প্রীতিভাজন ডঃ জয়গুরু গোস্বামী যেভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া দেহে পুলক অনুভব করিলাম। আজিকার দুর্যোগের অন্ধকারে বাংলার যুবকদের কাছে এই গ্রন্থ আলোকবর্তিকাস্বরূপ হউক, এই কামনা করি।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

মহাউদ্ধারণমঠ
৫৯, মানিকতলা মেন রোড,
কলিকাতা-৫৪।

উত্তরজীবনে "চারণ-কবি" নামে পরিচিত মুকুন্দদাস মহাশয়ের সহিত আমার বিশেষ পরিচয় ছিল—বরিশালে। বস্তুতঃ তিনি আমাকে ছোট ভাই-এর মতন দেখিতেন। আজ, তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে পরলোকগমন করিবার পরেও তাহার স্মৃতি আমার মানসপটে অম্লান রহিয়াছে। স্বদেশীযুগে তাঁহার প্রাণোন্মাদকারী সঙ্গীতের রেশ এখনও যেন অনুক্ষণ কানে বাজিতেছে। কিন্তু কালের সঙ্গে সঙ্গে জনসমাজে তাঁহার স্মৃতি স্বভাবতঃই ম্লান হইয়া আসিতেছে। তাই ডঃ জয়গুরু গোস্বামী রচিত মুকুন্দদাসের এই স্মারক জীবনী-গ্রন্থখানিকে আমি অভিনন্দন জানাইতেছি। এই গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

মুকুন্দদাসকে দেখিয়াছি। সে অর্ধশতাব্দী পূবের কথা। রাত্র জাগিয়া মুকুন্দদাসের গান শুনিয়াছি। তাঁহার উদাত্তকণ্ঠে দেশপ্রেমের যে বাণী উদগীত হইয়াছিল তাহা এখনও স্মরণ হইলে মন উদ্বেল হইয়া উঠে। শ্রীমান জয়গুরু গোস্বামী মুকুন্দদাসের জীবনী সংকলন করিয়া ও রচিত সঙ্গীত ও যাত্রাদি পুনঃ প্রকাশ করিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তিনি যে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে এই গ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে সাধুবাদ জানাইতেছি। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এ জাতীয় গ্রন্থ যত প্রকাশিত হয় ততই এদেশের মঙ্গল।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

৪/৩, গোম্‌স্ লেন,
কলিকাতা-১৪

আমি যখন ছোট বেলায় পূর্ববঙ্গের গ্রামে ছিলাম, তখন সেই সুদূর পল্লীতে মুকুন্দদাসের নাম শুনেছিলাম। অর্থাৎ মুকুন্দদাসের যাত্রার প্রভাব সেই দূরবর্তী স্থানে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, গ্রামের নরনারীরা পর্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। যাঁহারা শহরবাসী তাঁরা নানাদিক থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শঙ্খধ্বনি শুনতে পান। ফলে তাঁদের রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা লাভের সুযোগ অনেক বেশী ঘটে থাকে। কিন্তু গ্রামবাসীদের সেই সুযোগ নেই। বিশেষতঃ এই শতকের গোড়ার দিকে দেশব্যাপী শিক্ষার ও সংবাদপত্রের বিস্তার ছিল না। কিন্তু সেদিনের বাংলা দেশের গ্রাম্য-জীবনে জাতীয় ভাবধারা ও সামাজিক চেতনা সঞ্চারের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন চারণ-কবি মুকুন্দদাস। এদিক দিয়ে তাঁর অবদানের কোন তুলনা নেই। মুকুন্দদাসের যাত্রার অবিস্মরণীয় গানগুলি কেবল ঘরে ঘরেই প্রচারিত হয়নি, সমাজ-বিপ্লবের অগ্নিকণাও সেই সঙ্গে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল। সমাজ-বিপ্লব ছাড়া রাজনৈতিক বিপ্লব অগ্রগতি লাভ করতে পারে না। চারণ-কবি মুকুন্দদাস এই সমাজ-বিপ্লবের অগ্রদূত ছিলেন। যে কোন দেশবরেণ্য রাজনৈতিক নেতার চেয়ে এদিক দিয়ে তাঁর দান কম মূল্যবান ছিল না।

দুর্ভাগ্যক্রমে মাঝখানে মুকুন্দদাসকে আমরা প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম। কেবলমাত্র সাম্প্রতিক কালে আমরা তাঁকে আবার স্মরণ করছি। তাঁর কোন পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিতও এতদিন চোখে পড়েনি। সুতরাং ডঃ জয়গুরু গোস্বামী তাঁর জীবন-চরিত রচনা করে দেশের প্রতি একটি গুরুদায়িত্ব পালন করলেন। কেননা, মুকুন্দদাসের জীবন সংগ্রামের সঙ্গে আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। অতএব এই সংগ্রামী কবির জীবন-চরিত রচনা করে ডঃ গোস্বামী আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। মুকুন্দদাস বাংলার জাতীয় কবি এবং চারণ-কবি। তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে আমি নমস্কার জানাই। ইতি—

"শিবির" **বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়**

১৩২, নগেন্দ্রনাথ রোড,

কলিকাতা-২৮

অধ্যাপক ডক্টর জয়গুরু গোস্বামীর গবেষণালব্ধ গ্রন্থ "চারণ-কবি মুকুন্দদাস" পাঠ করিয়া দেহে-মনে-প্রাণে প্রেরণা লাভ করিলাম। স্বদেশী-যুগের অমর কবি

মুকুন্দদাসের উপর তথ্যনির্ভর কোন গ্রন্থ আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। সেই দিক দিয়া ডক্টর গোস্বামীর এই গ্রন্থ পথিকৃৎ হিসাবে জাতীয় মর্যাদায় স্বীকৃতি লাভ করিবে।

মুকুন্দদাস মহামিলনের গান গাহিয়াছিলেন। তাই জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের নিকট মুকুন্দদাসের দেশাত্মবোধক গান যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ডক্টর গোস্বামীর পরিশ্রমলব্ধ "মুকুন্দদাসের গীতাবলী" সংকলনটি আনন্দের উৎস ও জীবনের পাথেয় হিসাবে পরিগণিত হইবে। "মুকুন্দ"-ভণিতাযুক্ত সব গান মুকুন্দের নয়, এমন অনেক গান আছে যাহা বৈষ্ণব দানতাবশতঃ "মুকুন্দ"-ভণিতাযুক্ত না হইয়াও মুকুন্দদাসের। আবার এমন অনেক গান আছে যাহা রচয়িতার পরিচয় হারাইয়া মুকুন্দদাসের পরিচয়ে বাঁচিয়া আছে। ডক্টর গোস্বামী সেদিকেও লক্ষ্য রাখিয়া গানের সংকলন করিয়াছেন এবং "ভণিতা-বিভ্রাটে" গানের বিচার করিয়াছেন। নিপুণ গবেষকের পক্ষে যাহা কিছু করণীয় ডক্টর গোস্বামী তাহা করিয়াছেন। মুকুন্দদাসের জন্মশতবার্ষিকী প্রায় সমাগত। এই উপলক্ষে এপার বাংলা ও ওপার বাংলায় যে উৎসব পালিত হইবে তাহারই প্রস্তুতিপর্বে "চারণ-কবি মুকুন্দদাস" নবযুগের সূচনা করিবে। আমি আন্তরিকভাবে গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

সনাতন আশ্রম
১০৯, বিধান পল্লী
গড়িয়া, ২৪ পরগণা।

শ্রীদুর্গামোহন সেন
সম্পাদক—"বরিশাল হিতৈষী" পত্রিকা।

"চারণকবি মুকুন্দদাস" গ্রন্থের রচয়িতা ডঃ জয়গুরু গোস্বামী তাঁর একনিষ্ঠ সাহিত্যকৃতির জন্য অশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব চারণকবি মুকুন্দদাস ছিলেন স্বদেশ চেতনার উদ্গাতা ত্যাগী বিদগ্ধ পুরুষ। তাঁর সারা জীবনব্যাপী সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যেই যথার্থ চারণকবির জীবন সাধনা বিধৃত হয়ে আছে। সত্যানুরাগী অধ্যাপক ডঃ গোস্বামী নিষ্ঠাবান গবেষকের মত অপরিসীম যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে পিতৃদেব বিরচিত লেখাগুলি যেমন একদিকে সন্নিবেশ করেছেন, অন্যদিকে সত্য-সন্ধানী স্বীয় প্রতিভাদীপ্ত মানসিকতা দিয়ে তার সুযোগ্য সমালোচনা সংযোজিত করে অসামান্য সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

মদীয় পিতৃদেবের সাহিত্য কর্মের ও ত্যাগ মণ্ডপ জীবনের যোগ্য মূল্যদান করে

অধ্যাপক ডঃ গোস্বামী সুধী জনগণ মধ্যে যে কীর্তি স্থাপন করলেন, তার জন্য তিনি চিরদিন বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়ে থাকবেন।

আমি সর্বান্তঃকরণে তাঁর সুকৃতি সমুজ্জ্বল অভ্যুত্থান কামনা করি। চারণকবিকে জানতে হলে গ্রন্থখানি অপরিহার্য। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

"চারণপল্লী"
পোঃ—রায়পুর
জেঃ—২৪ পরগণা।

শ্রীকালীপদ দাস।

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

॥ পরিশিষ্ট ॥

চারণকবি মুকুন্দদাস

(সমগ্র রচনাবলী)

প্রথম অধ্যায়

কবি-পরিচিতি

উনবিংশ শতাব্দী বাঙ্‌লার নবজাগরণের যুগ। এই যুগে যাঁহারা আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতিকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন এবং স্বাধীনতার মন্ত্রে জাগ্রত করিয়াছিলেন—চারণকবি মুকুন্দদাস তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় ১৯০৫ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৩০ সাল—মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে স্বাধীনতার মরণ-পণ সংগ্রাম পর্যন্ত—এই সুদীর্ঘকালব্যাপী মুকুন্দদাস তাঁহার উদাত্ত ও তেজদীপ্ত কণ্ঠের গানে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। ভোরের পাখীর কাকুলিতে যেমন নূতন দিনের সূচনা হয়, তেমনি অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের পথে-প্রান্তরে চারণকবি মুকুন্দদাসের গানে নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছিল। তাঁহার বিপ্লবী-কণ্ঠের গানগুলি ছিল প্রত্যয়ের দৃঢ়তায় দুর্দ্ধর্ষ এবং আত্মিক দীপ্তিতে চিত্তাকর্ষী। গানের মাধ্যমে দেশপ্রেম ছড়ানো আর জন-জাগরণ ছিল তাঁহার স্বপ্ন ও সাধনা, কর্ম ও ব্রত। জীবনের শেষ দিনটি অবধি তিনি এই সাধনাই করিয়া গিয়াছেন। দেশাত্মবোধ প্রচারে তাঁহার কম্বুকণ্ঠের গানের সম্ভাবনা সেদিন উপলব্ধি করিয়াছিলেন—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র। তাই তাঁহারা মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত সহ গানে গানে বঙ্গদেশকে মাতাইয়া তুলিবার আহ্বান সেদিন জানাইয়াছিলেন—বিপ্লবী গায়ক চারণকবি মুকুন্দদাসকে।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন যখন বাঙ্‌লাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া পূর্ববঙ্গকে আলাদা করিতে চাহিলেন তখন তাহার প্রতিবাদে সমগ্র বাঙ্‌লাদেশে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি মনীষিগণের নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া উঠিল। বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ—ইহাই ছিল আন্দোলনের মূলমন্ত্র। এই আন্দোলনে বরিশালের নেতৃত্ব লইয়াছিলেন সব্যসাচী-কর্মযোগী মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত[১]। বরিশাল টাউন হলে স্বদেশী

১। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার ১৮৫৬ সালের ২৫শে জানুয়ারী (বঙ্গাব্দ ১২৬২ সাল, ১৩ই মাঘ) বরিশালের পটুয়াখালিতে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, পটুয়াখালি মহকুমা অশ্বিনীকুমারের পিতা ব্রজমোহন দত্তের সৃষ্টি। অশ্বিনীকুমারের মাতা প্রসন্নময়ী তাঁহার মাতামহ রায়বাহাদুর

প্রচারের বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন—"আমরা যে সব বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছি, তা যদি কেউ যাত্রা আকারে গ্রামে গ্রামে প্রচার করে, তাহলে তা আমাদের এইরূপ সভা বা বক্তৃতার চেয়ে অনেক কার্যকরী হয়।" সেই সভায় মুকুন্দদাস (ওরফে যজ্ঞেশ্বর) উপস্থিত ছিলেন। এই কথা মুকুন্দদাসের "কানের ভিতরদিয়া মরমে প্রবেশ করিল" এবং এমনভাবে তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল যে, সভাশেষে তিনি অশ্বিনীকুমার দত্তের চরণে নিজেকে সমর্পণ করিলেন। অশ্বিনীকুমার বলিলেন—"যজ্ঞা! তোর এই কণ্ঠ আর প্রাণ নিয়ে তুই হবি নূতন যুগের চারণ। যাদের আজো ঘুম ভাঙেনি তুই জাগিয়ে দিবি তাদের[২]।" এই সেই চারণকবি মুকুন্দদাস,—যাঁহার পূর্বনাম ছিল "যজ্ঞেশ্বর" বা "যজ্ঞা"। স্বভাবে ছিল দুর্দান্ত, পেশায় ছিল মুদী, কিন্তু কীর্তনে ও গানে যেমন ছিল আবেগ, তেমনি ছিল উদাত্ত সুমধুর কণ্ঠস্বর। নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে হাজার হাজার শ্রোতার সম্মুখে মুকুন্দদাস যখন রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইতেন তখন তাহাদের দেহে-মনে প্রাণে শিহরণ জাগিত—

"বহুদিন পরে আবার
মরা-গাঙে পেয়ে জোয়ার
জোয়ারে ধরেছি পাড়ি
আর কি পাড়ি ঠেকে রে   মোদের আর কি পাড়ি ঠেকে রে।

নব ভারতের নূতন তরী,
মাকে ক'রেছি কাণ্ডারী
হোক না কেন তুফান ভারী,
আর কি তরী ডোবে রে   মোদের আর কি তরী ডোবে রে।"

চারণের বেশে সমবেত শ্রোতারা দেখিতেন নবীন সন্ন্যাসীকে—মাথায় গৈরিক

রামমোচনের সংসারে প্রতিপালিতা। প্রসন্নময়ীর মাতুলদ্বয় হইতেছেন কলিকাতার তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ ও লালমোহন ঘোষ। এক অভিজাত পরিবারে ভারতের এক যুগ-সন্ধিক্ষণে অশ্বিনীকুমার দত্তের আবির্ভাব। ১৯২৩ সালের ৭ই নভেম্বর কালীপূজার দেওয়ালী উৎসবে তাঁহার জীবন-দীপ নির্বাপিত হইলেও তাঁহার আদর্শ অনির্বাণ দীপশিখারূপে হাজার হাজার গৃহে প্রজ্বলিত হইল।

২। শ্রীহীরালাল দাশগুপ্ত—"জননায়ক অশ্বিনীকুমার", পৃঃ ৪৩

উষ্ণীষ, দেহে গেরুয়া আলখাল্লা, বিশাল-বিস্তৃত বক্ষে জ্বলন্ত বিশ্বাস, আর কণ্ঠে সুমধুর উদাত্ত সংগীত—

"দশ হাজার প্রাণ যদি আমি পেতাম
তবে বিদেশী বণিকের গৌরব রবি
অতল জলে ডুবিয়ে দিতাম।"

উৎসাহে-প্রেরণায়-উন্মাদনায় হাজার হাজার যুবকের দল তখন আগাইয়া আসিত ঐ দশ হাজারীর দলে যোগ দিতে। যখন মুকুন্দদাস গান ধরিতেন—

"ছেড়ে দাও রেশমী চুড়ি, বঙ্গনারী
কভু হাতে আর পরো না।
জাগ গো ও জননী, ও ভগিনী
মোহের ঘুমে আর থেকো না;
কাঁচের মায়াতে ভুলে, শঙ্খ ফেলে
কলঙ্ক আর হাতে পরো না॥
তোমরা যে গৃহলক্ষ্মী, ধর্ম সাক্ষী;
জগৎ ভ'রে আছে জানা;
চটকদার কাঁচের বালা; ফুকের মালা
তোমাদের অঙ্গে শোভে না॥"

তখন অনুতাপে-অনুশোচনায় হাতের রেশমী চুড়ি ভাঙিয়া বা ছুঁড়িয়া ফেলিতেন সমাগতা বঙ্গনারীরা। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল গানের মাধ্যমে দেশবাসীকে ইংরাজদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তোলা এবং বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ—এই সংকল্পে দীক্ষিত করিয়া তোলা। সাধারণতঃ বক্তৃতা বা গানের দ্বারা কোন ভাবধারা যিনি প্রচার করেন তাঁহাকে বলা হয় "চারণ"। আবার স্বরচিত গান অথবা কোন অভিনয়ের দ্বারা যিনি কোন ভাবধারা প্রচার করেন—তিনিই "চারণকবি"। মুকুন্দদাস এই অর্থেই "চারণকবি"।

নজরুলের ভাষায় বলা যায়—

"বাংলা মায়ের দামাল ছেলে চারণ কবি মুকুন্দদাস" শুধু বরিশালের নয়, বাঙ্‌লার প্রতিটি জেলায় মুকুন্দদাসের অপূর্ব সাফল্য দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় অধ্যায়।

১৯০৭ সালের ডিসেম্বরের শেষে মহাসমিতির সুরাট অধিবেশন পণ্ড হইল। নবোত্থিত শক্তিশালী জাতীয় দলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তকে সভাপতি করিয়া তৎক্ষণাৎ কংগ্রেসের একটি অধিবেশন করিবার জন্য জাতীয় দল চেষ্টা করিলেন। প্রস্তাবিত সভাপতি মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের তীব্র বিরোধিতায় তাহা হইতে পারিল না। পরন্তু, অশ্বিনীকুমার দলাতীতরূপে মিলন-প্রচেষ্টায় উভয়দল কর্তৃক সর্ব-ভারতীয় নেতার যোগ্যরূপে প্রশংসিত হইলেন। যশস্বী অশ্বিনীকুমার প্রত্যাবর্তন পথে কিছুদিন বোম্বাইয়ের এক স্বাস্থ্য-নিবাসে অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ সময় বোম্বাইবাসী এক দেশপ্রেমিক, শিক্ষিত যুবক অশ্বিনীকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া কথাপ্রসঙ্গে মুকুন্দদাসের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। উৎসাহী যুবকটি মুকুন্দ সম্বন্ধে শ্রদ্ধা পরিপূরিত উচ্চভাব পোষণ করিতেন এবং বহু আয়াসে মুকুন্দের "সাধন-সংগীতে"র পদ ও অর্থ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। বাঙ্‌লার বাহিরে মুকুন্দের এই গৌরবে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার এত আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, বরিশালে প্রত্যাবর্তনের পর কিছুদিন তিনি যাহাকে কাছে পাইয়াছেন তাহাকেই এই প্রসঙ্গ শুনাইয়াছেন। মুকুন্দের গৌরব যেন তাঁহার নিকট সারা বরিশালের গৌরব। তাই বহু বৎসর পরেও যখন তাঁহার জীবনকথা লিপিবদ্ধ করা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইত, তখনই তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, ঋষি অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ মনীষিগণের নাম উল্লেখ করিয়া নিজ জীবনকথা লিপিবদ্ধের প্রসঙ্গ উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতেন। সেবক কর্মীদের মধ্যে মুকুন্দের কথা উল্লেখ করিয়া অশ্বিনীকুমার বলিতেন, "যৌবনে ভারত-গীতি রচনা ও প্রচার অবলম্বনে দেশের জনসাধারণের কাছে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করিয়াছি; যে পথ অবলম্বন করাইবার চেষ্টায় কংগ্রেস অধিবেশনে পুনঃপুনঃ বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছি, মুকুন্দ আজ সেই জনচেতনার বাণী কেমন সুন্দরভাবে পল্লীর ঘরে ঘরে পৌঁছাইতেছে। শুধু গান আর কথা নয়, ঐ প্রচারের প্রত্যক্ষ ফল সম্বন্ধেও প্রতিনিয়ত পত্রাদি পাইতেছি। লিখিতে হইলে মুকুন্দের মত সেবকের জীবন-কথাই লিখিতে হয় ও লেখার যোগ্য।" এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহার বহুদিনের ঐকান্তিক ইচ্ছা পূরণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

বলা হয় মুকুন্দদাস, মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং মহাত্মা কর্তৃক তিনি "চারণকবি মুকুন্দদাস" নামে আখ্যাত হন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। মুকুন্দদাসের উপর মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রভাবের আধিক্যই এই ধারণার সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহা সত্য, মুকুন্দদাসের সঙ্গে মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের

ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং অশ্বিনীকুমারের বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হইয়াই মুকুন্দদাসের কর্মজীবন আরম্ভ হয়, তথাপি বলা যায় মুকুন্দদাস তো নয়ই, কোনও ব্যক্তিকেই মহাত্মা মন্ত্রশিষ্য করেন নাই ; তিনি কাহারও ধর্মগুরু ছিলেন না, তিনি ছিলেন কর্মগুরু। আর "চারণকবি মুকুন্দদাস" নামও মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের প্রদত্ত নয়, ইহা তাঁহার মন্ত্রগুরু রামদাস স্বামীর প্রদত্ত নাম[৩]। মুকুন্দদাস গুরু রামদাস স্বামীকে প্রায়ই কীর্তন গান শুনাইতেন। রামদাস গানে খুব আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং অতিশয় প্রীত হইয়া একদিন বলেন—"মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদদের মধ্যে যিনি মহাপ্রভুকে কীর্তন শুনাইতেন—তাঁহার নাম ছিল "মুকুন্দ", তাঁহার গানে মহাপ্রভু বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন। আমিও তোমার গান শুনিয়া বড়ই আনন্দ পাইলাম। আজ হইতে তোমার নাম হউক "মুকুন্দদাস" (মুকুন্দের দাস)[৪]। এইভাবে ''মুকুন্দদাস" নামের উৎপত্তি। কিন্তু অশ্বিনীকুমার দত্তের নিকট মুকুন্দদাস চিরকালই স্নেহের ''যজ্ঞা" বা "যজ্ঞেশ্বর" ছিলেন। অশ্বিনীকুমারের সৃষ্টিযজ্ঞে ও কর্মযজ্ঞে মুকুন্দদাস ছিলেন "যজ্ঞেশ্বর"।

অশ্বিনীকুমারের মুখে বহু সময় মুকুন্দের প্রশংসা শুনিয়া মুকুন্দের কোনও কোনও বন্ধু তাঁহাকে "আত্মজীবনী" লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেই বন্ধুদের মধ্যে হীরালাল দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা এবং সুরেশ দাশগুপ্ত মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কীর্তনের আসরে মুকুন্দদাসকে প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন অশ্বিনীকুমারের প্রতিচ্ছবি সহকর্মী ভক্ত এবং দেশপ্রাণ মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা। এইসব বন্ধুদের অনুরোধে ও উৎসাহে মুকুন্দদাস যে সংক্ষিপ্ত ''আত্মপরিচয়"[৫] লিখিয়াছিলেনতাহার প্রথম.পৃষ্ঠার কয়েক ছত্রের পরেই

৩। রামদাস—শ্রীচৈতন্যশাখা।
"রামদাস অভিরাম সখ্য প্রেম রাশি।
ষোড়শাঙ্গের কাষ্ঠ হাতে লৈয়া কৈল বাঁশী॥" (চৈ. চ. আদি ১০/১১৬)

৪। মুকুন্দ দত্ত—শ্রীচৈতন্য শাখা—অম্বষ্ঠ। ব্রজের মধুকণ্ঠ। (গৌ. গ. ১৪০)
"শ্রীমুকুন্দ দত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী।
যাহার কীর্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞি॥" (চৈ. চ. আদি ১০/৪০)

৫। মুকুন্দদাসের স্বহস্তে লিখিত "আত্মপরিচয়" ছাপার হরফে প্রকাশিত হয় নাই। যে-সব আত্মীয়-স্বজন, অন্তরঙ্গ বন্ধুরা তাহা দেখিয়াছেন—বরিশালের সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে একজন। ১৯৪৩ সালে দমদম সেণ্ট্রাল জেলে বন্দী থাকাকালীন তিনি যে-সব ঘটনাবলী লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই মুকুন্দদাসের স্বহস্তে লিখিত "আত্মপরিচয়"-এর কথা জানা যায়। ইহার জন্য সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীহীরালাল দাশগুপ্ত এবং শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত মহাশয়দের নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী।

লিখিত আছে—"আমার জন্মস্থান ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণার বানরি নামক গ্রামে। ঠাকুরদাদা (পিতামহ) নৌকা বাহিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। এই কার্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল বরিশাল শহরের নৌকাঘাট। বরিশাল ঘাটে বিক্রমপুরের মাঝিদেরই সংখ্যাধিক্য ছিল। বরিশালের লোকেরা তখনো এই কার্যে বেশী অগ্রসর হয় নাই এবং প্রয়োজনও ততটা ছিল না। তাই সঙ্ঘবদ্ধ বিক্রমপুরী মাঝিরাই বরিশাল ঘাটে অবস্থান করিত। শুধু নৌকার মাঝি নয়, অর্থাগমের জন্য বিভিন্ন ব্যবসায় ও চাকুরীর ক্ষেত্রেও বিক্রমপুরের অধিবাসীরাই বরিশাল শহরের বিশেষ অংশ জুড়িয়া ছিল। চাকুরীর মধ্যে আদালত, ফৌজদারী ইত্যাদি অফিসের পিয়ন ও চাপরাশীর কার্য বিক্রমপুরবাসীদের প্রায় একচেটিয়া ছিল। বাবা যৌবনে পদার্পণ করিলেন, কিন্তু লেখাপড়া শিখার ধার ধারিলেন না। তিনিও বরিশালে আসিয়া ডেপুটির আর্দালীর চাকুরী লইলেন। বাবার চাকুরী আর্দালীগিরি হইলেও তিনি ভাল পয়সা রোজগার করিতেন। ঠাকুরদাদার মাঝিগিরি অপেক্ষা বাবার চাকুরীর অবস্থা সংসারে সচ্ছলতা আনিল। চাকুরীতে নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থানেরও সুযোগ পাওয়ায় আমার অতি শৈশবেই বাবা গ্রামের বাড়ী হইতে সপরিবারে বরিশালে চলিয়া আসিলেন। জন্মভূমির শৈশবস্মৃতি বিশেষ কিছু মনে হয় না। শৈশবাতিক্রমের সহিত বরিশালভূমিকে চিনিয়াছি, ভালবাসিয়াছি। আমার জন্মস্থান বিক্রমপুর একটা শোনা কথার স্মৃতি ব্যতীত আর কিছু নয়, যে আবেষ্টনকে মানুষ জন্মভূমি নামে ভালবাসে, শ্রদ্ধাভক্তি করে, তাহা আমার কাছে 'বরিশাল'[৬]। বরিশালভূমি আমার আরাধ্য—বরিশালের প্রত্যেক ধূলিকণা আমার প্রিয় শিরোভূষণ। আমার বাবার নাম গুরুদয়াল দে, মায়ের নাম শ্যামাসুন্দরী। আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা। আমার মায়ের নাম শ্যামা।"

৬। বরিশালের প্রাচীন নাম বাখরগঞ্জ। বাখরগঞ্জ জেলার সদর শহর বরিশাল কীর্তনখোলা নদীর তীরে অবস্থিত এবং খুলনা হইতে জলপথে ১০৪ মাইল দূর। মেল স্টীমারে সাড়ে দশ ঘণ্টার পথ। নিসর্গ শোভায় সে অপরূপ। বরিশালের দিকে দিকে নদ-নদী—জোয়ার-ভাঁটায় তারা চিরচঞ্চল আর দক্ষিণে সমুদ্র। নিয়ত গর্জনশীল বঙ্গোপসাগর। বরিশাল হইতে পটুয়াখালি, মাদারীপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি নানাস্থানে স্টীমার যাতায়াত করে। ইহা একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে ব্রজমোহন কলেজ নামে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ অশ্বিনীকুমার দত্ত কর্তৃক স্বীয় পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত। বারশাল অশ্বিনীকুমার দত্তের জন্মভূমি ও কর্মভূমি, চারণকবি মুকুন্দদাসের "যজ্ঞভূমি"। বরিশাল সম্বন্ধে মুকুন্দদাস যেমন বলেন—"বরিশালভূমি আমার আরাধ্য—বরিশালের প্রত্যেক ধূলিকণা আমার প্রিয় শিরোভূষণ।" অশ্বিনীকুমারও তেমনি গভীর অনুরাগে বলেন—

"মরার পরে যেন আবার জন্মগ্রহণ করি এই বরিশালের মাটিতে।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

জন্মকথা

মুকুন্দদাসের স্বহস্তে লিখিত "আত্মপরিচয়" হইতে জানা যায় যে, তিনি বঙ্গজ কায়স্থকুলে পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলায় বিক্রমপুর পরগনার বানরি নামক গ্রামে ১২৮৫ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম গুরুদয়াল দে, মাতা শ্যামাসুন্দরী। বাল্যকালে তাঁহার নাম ছিল—"যজ্ঞেশ্বর"। বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ডাকিতেন—"যজ্ঞা"। কথাবার্তায় নিজেকে নিজে পরিচিত করিবার সময়ও ব্যক্ত হইত—"যজ্ঞা", আমরণ মা'কে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার শেষভাগে লেখা থাকিত "তোমার স্নেহের যজ্ঞা।" কোন বয়স্ক বা পরিচিত ব্যক্তি ক্ষুদ্র যজ্ঞেশ্বরের বিরাট পরিণতি মুকুন্দ নামের ঐশ্বর্যের পাশে "যজ্ঞেশ্বর" নামোল্লেখের সঙ্কোচ ব্যক্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যগ্র আবেগে মুকুন্দ বলিতেন—"আমি আপনাদের কাছে চিরদিন সেই যজ্ঞা, যজ্ঞাই থাকিতে চাই, মুকুন্দ নাম আমার বিদেশের পোষাক।"

বরিশাল শহরের বহু পরিচিত বাড়িতে বর্ষার অবসরে দেখা করা ও বয়স্কদের পদধূলি লওয়া একটা নিয়মিত কাজ ছিল। প্রায়শঃই সেই সব বাড়ির সামনে আসিয়াই বালক-বালিকাদের হাঁকিয়া বলিতেন—"মা'কে বল যজ্ঞা আইছে, পা'র ধূলা নিতে।" বাবা মা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের সহিত স্বয়ং মুকুন্দদাসের নিকটেও এই যজ্ঞেশ্বর বা যজ্ঞা নাম ছিল প্রিয় মাধুর্যমণ্ডিত।

মাতা শ্যামাসুন্দরীর আটাশ বৎসর বয়সে প্রথম সন্তান মুকুন্দ জন্মগ্রহণ করেন। যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সে সময়ের মেয়েরা চৌদ্দ-পনেরো বৎসরে সন্তানের জননী হইতে না পারিলে "বন্ধ্যা" নামে পরিচিত হওয়ার সূচনা হইত। আত্মীয়-স্বজনেরা বন্ধ্যাত্ব মোচনের জন্য ওঝা-কবচের আশ্রয় লইতেন। শ্যামাসুন্দরীর জন্যও সর্ববিধ চেষ্টার ত্রুটি হইল না। সকল রকম ফিকির তাবিজের ব্যর্থতায় আত্মীয়-স্বজনের নিকট শ্যামাসুন্দরী "বন্ধ্যা" বলিয়াই স্থির হইলেন। সকলের এই স্থির সিদ্ধান্তে শ্যামাসুন্দরীর মনোবেদনা ক্রমশঃ তীব্র-হইতে লাগিল। তিনি পুত্রকামনায় ঐকান্তিকতার সহিত নানাবিধ ব্রত-উপবাস, গ্রামান্তরে অবস্থিত প্রত্যক্ষ ফল-দেবতা বিশেষ সমূহের মন্দিরে যাতায়াত ও মানত করিতে লাগিলেন। পুত্রলাভের এই উৎকণ্ঠার আতিশয্য বলিতে যাইয়া নিজেই নিজেকে উপহাস করিতেন এবং সাফল্যের কথা বলিতে

বলিতে বিশ্বাস-ভক্তিতে আপ্লুত হইতেন। ঐ কৃচ্ছ্র তপস্যার দিনে একদা স্বপ্নাবিষ্ট হইয়া শিবচতুর্দশীতে গ্রামান্তরের শিবমন্দির হইতে আশীর্বাদী-নির্মাল্য আনিয়া "বান্ধা" রাখিলেন, অর্থাৎ কতক পুষ্প-বিল্বপত্র আনিয়া একটা বদ্ধপাত্রে সযত্নে রাখিয়া দিলেন। ভোলানাথ শিব নাকি তাঁহার মত পুত্র দিবার আশ্বাস দিয়াছিলেন, বৎসরকালমধ্যে শ্যামাসুন্দরীর আটাশ বৎসর বয়সে কৃচ্ছ্রব্রতের সিদ্ধিরূপে তাঁহার ক্রোড়ে পুত্রসন্তান দেখা দিল।

যথাসময়ে মানত করা পূজাটি শেষ করিয়া ঐ "বান্ধা" নির্মাল্য দ্বারা একটি বৃহৎ কবচ প্রস্তুত হইল, সেই কবচ আমরণ শ্যামাসুন্দরীর গলায় ঝুলানো ছিল। ঐ কবচ প্রথমে তাম্র, পরে রৌপ্য ও শেষে স্বর্ণমণ্ডিত হইয়াছিল। ঐ কবচের আয়তনাধিক্যে শেষ অবধি একটা "ঢোল"-এর আকার ধারণ করিয়াছিল, আবেগাতিশয্যে শ্যামাসুন্দরী আঁচল ভরিয়া নির্মাল্য আনিয়া সম্পূর্ণই "বান্ধা" রাখিয়াছিলেন, বৎসরান্তে শুষ্ক হইয়াও তাহার পরিমাণ ক্ষুদ্র কবচে কুলায় নাই, আর অমন প্রত্যক্ষ নিদর্শনী নির্মাল্যের একবিন্দুও পরিত্যাগ করা যায় কি? ও-যে অপ্রত্যক্ষের প্রত্যক্ষ দানচিহ্ন, ঘনীভূত বিশ্বাস-ভক্তির অফুরন্ত উৎস! শ্যামাসুন্দরী আমরণ বক্ষলগ্ন ঐ রক্ষা-কবচটি ধরিয়া নিজে মাঝে মাঝেই মাথায়-বুকে-চোখে লাগাইয়া চুম্বন করিতেন, পারিবারিক 'ব্যারাম-পীড়ায়' সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা ছিল রোগীর গাত্রে ঐ কবচ বুলানো, ঔষধ-পাঁচন ছিল আনুষঙ্গিক। মাতৃভক্ত মুকুন্দ কোথাও যাত্রা করিলে মায়ের চরণে প্রাণ ঢালিয়া শিরলগ্ন করিয়া কিছুক্ষণ পরে বক্ষে মা'র পা স্পর্শ করিয়া সম্মুখে বসিতেন। মা তাঁহার কবচটি পুত্রের সর্বশরীরে লেপিয়া আশীর্বাদী বাণী শুনাইতেন—"যেখানে যাবি সর্বত্রই জয়-জয়কার।" পুত্র তাহার মধুর, গম্ভীর, চমকিত করিবার সিদ্ধ-কণ্ঠ পঞ্চমে উঠাইয়া ধ্বনি করিতেন—"জয় মা"। দলবলসহ বিদেশ যাত্রাকালে সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হইত—"জয় মা"। "কালী মাইকি জয়"—সেই ধ্বনি, সেই চিত্র ছিল যাত্রামঙ্গল! ধ্রুব জয়োদ্দীপক!

যজ্ঞেশ্বরের জন্মকথা সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত হইলেও "মুকুন্দ"-এর পরিচিতির মূলে ছিল স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকা, মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের প্রভাব এবং হেমকবির নিঃস্বার্থ ত্যাগ। মুকুন্দের জীবন-নাট্যে একদিকে ছিলেন বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কর্মযোগী অশ্বিনীকুমার, অপরদিকে ছিলেন স্বভাবকবি হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়[৭]; আর জীবন-নাট্যের পটভূমিকায় ছিল স্বদেশী আন্দোলন।

৭। হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—মুকুন্দদাসের মূলমন্ত্র বা চাবিকাঠি ছিল গানের মাধ্যমে দেশবাসীকে স্বদেশ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা। এই বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করিয়াছিলেন

এই স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকা না থাকিলে যজ্ঞেশ্বরের পক্ষে "মুকুন্দদাস"-এ পরিণত হওয়া সম্ভব হইত না। মুকুন্দদাস যেন পঙ্কে পদ্মফুল, অশ্বিনীকুমার ঐ ফুল তুলিয়া আনিয়া মায়ের চরণে নিবেদন করিলেন, মন্ত্রোচ্চারণ করিলেন হেমকবি। সোনা ঠাকুরের কালীমন্দিরের বারান্দায় অবহেলিত অবস্থায় চৌদ্দ বৎসরের যজ্ঞেশ্বরকে দেখিয়া অশ্বিনীকুমার বুঝিয়াছিলেন যে, মায়ের মন্দিরের ভিতরে ইহার স্থান—বাহিরে নয়। মানুষ চিনিবার অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁহার ছিল। তাই যজ্ঞেশ্বরকে দেখিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে এই বালকই একদিন বৃহত্তর পরিবেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে।

বস্তুতঃ, মুকুন্দদাসের জীবনোত্থানে স্বদেশী আন্দোলনরূপ মাটিতে অশ্বিনীকুমার যে বীজ পুঁতিয়াছিলেন, হেমকবি মালীর মত তাহা লালন-পালন করিয়া তাহাকে প্রস্ফুটিত ফুলে পরিণত করিয়াছিলেন। তাই 'যজ্ঞেশ্বর' কিভাবে 'মুকুন্দদাস'-এ পরিণত হইল তাহা জানিতে হইলে আমাদের মনে রাখিতে হইবে —স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় মুকুন্দদাসের আবির্ভাব ও প্রয়োজনীয়তা, অশ্বিনীকুমারের সান্নিধ্যলাভ এবং হেমকবির সাহায্য—এই ত্রিশক্তি একত্রে মিলিত হইয়া "যজ্ঞেশ্বর"কে "চারণকবি মুকুন্দদাস"-এ পরিণত করিয়াছিল। "দাস" উপাধি বৈষ্ণব দীনতাসূচক। বরিশালের মুকুটহীন রাজা মহাত্মা অশ্বিনীকুমার সত্যই বলিয়াছিলেন—"যজ্ঞা (মুকুন্দদাসের পূর্ব নাম) তোর মধ্যে রয়েছে বিরাট সম্ভাবনা। তোকে দেশের এই জাতীয় সঙ্কটে নিতে হবে চারণের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা" এই 'ভূমিকা'র ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য স্মরণীয়।

কবির বন্ধু—হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। হেমচন্দ্র ছিলেন সুকণ্ঠ গায়ক। তাঁহার কাব্য-রচনা শক্তিও ছিল অসাধারণ। মনমাতানো ও উন্মাদনাময় গান তিনিই বেশি রচনা করিয়াছেন, মুকুন্দদাস এই সকল গানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের চারিত্রিক দুর্বলতা ও সঙ্গদোষ থাকিলেও অশ্বিনীকুমার তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন—"হেম! তুই যে অদ্ভুত শক্তির লোক! দেশে তোর কাজ আছে। তুই কথকতা করবি—দেশের কথা, রামায়ণ, মহাভারতের কথা, ভগবৎ কথা, সাধু-সন্তদের কথা তুই শোনাবি জনে জনে..." সেইদিন হইতে 'হেমচন্দ্র' হইয়া গেলেন কথকঠাকুর। মানুষের সুপ্ত প্রতিভা আবিষ্কারে অশ্বিনীকুমারের আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। তাই শেষের দিকে অশ্বিনীকুমার হেমকবিকে পাঠাইলেন কলিকাতার হাইকোর্টের জজ আশুতোষ চৌধুরীর কাছে—বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে।

তৃতীয় অধ্যায়

বাল্যে-যৌবনে মুকুন্দদাস

মাতা শ্যামাসুন্দরী শিশুপুত্র যজ্ঞেশ্বরকে বক্ষে লইয়া স্বামী সকাশে কর্মস্থল বরিশালে পৌছাইলেন। এই যে বরিশালে আসিলেন আর বিক্রমপুরে[৮] ফিরিলেন না। কর্মস্থল স্থায়ী বাসস্থানে পরিণত হইল। পিতা গুরুদয়াল দে'র বরিশালস্থ বাসা ছিল জেলা স্কুলের পশ্চিম পাশে। গুরুদয়াল দে চাকুরির সহিত একখানা মুদি দোকান চালাইতেন, ঐ দোকান ছিল "আলেকান্দা" চৌরাস্তার সংযোগ-স্থলের একটু পূর্বদিকে। পাঠশালায় ও স্কুলে যথানিয়মে শিক্ষা চলিতে লাগিল। গুরুদয়াল দে মহাশয় আর্থিক অনটনে শিক্ষা-প্রাপ্তির কোন ব্যাঘাত কোনদিন করেন নাই। বরিশাল শহরে "আলেকান্দা পল্লী" শহরের বড় বড় চাকুরিয়া ও ঐশ্বর্যশালী বিশিষ্ট লোকেদের পাড়া। সেই পাড়ায় বড়দের সমান চালে পুত্রের চলিবার পক্ষে পিতা গুরুদয়াল কোন কার্পণ্য করেন নাই। পুত্র যজ্ঞেশ্বর বহুপ্রকারেই সেই বড়দের সহিত সমানতালে চলিবার যোগ্যতা অর্জন করিলেন, কিন্তু শিক্ষায় "প্রবেশিকা"র দ্বার অতিক্রম করিতে পারিলেন না। এবম্বিধ ছাত্র স্বাভাবিক গতিতে বাসা-সংলগ্ন জেলা স্কুল হইতে বি. এম. স্কুলে ভর্তি হইলেন। বি. এম. স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্তের সর্বতোমুখী প্রতিভাস্ফুরণ কেন্দ্র "ব্রজমোহন বিদ্যালয়" তখন পূর্ণোদ্যমে চলিতেছিল। এখানে ছাত্র যজ্ঞেশ্বর স্বীয় প্রতিভার অনুকূল কিছু কিছু জিনিস পাইলেন এবং সর্বজন পরিচিত হইলেন। কিন্তু যে পারিপার্শ্বিক ও মনোভাব স্কুল পরিবর্তন করাইয়াছে, তাহার বিশেষ কোন অবস্থান্তর না ঘটায় শিক্ষা সমাপ্তি ঐ স্কুলের গণ্ডীতেই হইয়াছিল। তথাপি ব্রজমোহন বিদ্যালয় যজ্ঞেশ্বরের মুকুন্দত্বের আগমনের ইশারা দিয়াছিল। ঐ সময় প্রতি বৎসর পূজার ছুটির

৮। ঢাকা জেলার প্রসিদ্ধস্থান—বিক্রমপুর বারভুঁঞাদের মধ্যে রাজা চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের বাসস্থান। ইঁহারা শাক্ত ছিলেন, পরে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য হন। শ্রীপুরে রাজধানী করেন। পদ্মাবতীর তীরে রাজবাড়ির মঠ—ইঁহাদের কীর্তি। ইঁহাদের মাতৃদেবীর চিতাভস্মের উপরই ঐ মঠ। বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এবং পূর্ববঙ্গের প্রখ্যাত সাঁতারু শ্রীব্রজেন দাস বিক্রমপুরের অধিবাসী ছিলেন। মুন্সীগঞ্জ হইতে তিন মাইল পশ্চিমে বিক্রমপুরের প্রাচীন রাজধানী রামপাল অবস্থিত।

প্রাক্কালে বি. এম. স্কুলের ছাত্রগণ শারদোৎসব বা দুর্গাপূজার দ্বারা শহরবাসীকে নির্মল আনন্দ উপভোগের সহিত নব নব প্রেরণা দান করিতেন। ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দও চিন্তা এবং কার্যে এক নবীনভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িতেন। শারদোৎসবের নব নব রচিত সংগীত, আবৃত্তি, একাঙ্ক অভিনয় প্রভৃতি কখনো গম্ভীর, কখনো উচ্ছ্বসিত, কখনো বা হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সর্বশ্রেণীর দর্শকবৃন্দকে এক অভিনব আদর্শ কেন্দ্রে মুগ্ধবৎ টানিয়া লইত। ছাত্রদের এই অভিনয়ান্তে বিশিষ্ট দর্শকবর্গ অভিনীত বস্তুর আলোচনায় পরিবেশিত রসের আস্বাদনের সহিত ছাত্র ও শ্রোতৃবর্গকে ঐ আদর্শ বস্তুকে জীবনে মূর্ত করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেন। পরদিনের ছুটির প্রভাতে পুষ্প পরিশোভিত বিদ্যালয় 'হল'-এ পুনরায় সমবেত ছাত্র-শিক্ষকগণ ছুটির কর্তব্য ও আনন্দ সম্পর্কে অবহিত হইতেন এবং খেলাধূলার মধ্য দিয়াও পল্লীতে পল্লীতে নব-জীবন সঞ্চারের সেবা কৌশলকে রূপায়িত করিবার চেষ্টা-উদ্দীপনার মধ্যে পরস্পর বিদায় গ্রহণ করিতেন। এইভাবে প্রত্যেকটি ছাত্র-শিক্ষক অশ্বিনীকুমার প্রচারিত সত্য, প্রেম, পবিত্রতার প্রচারকরূপে শত শত গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়া বাঙলার বুকে জাতীয় জীবনের আগমনী প্রচার করিতেছিলেন। ঐ সময়ের চিন্তাধারা, সংগঠনী-শক্তি ও কৌশলের পর্যালোচনা করিলে বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তে এই কথাই মনে হয় যে, প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে অশ্বিনীকুমারের জীবন-সাধনা জাতীয় জীবনের সিদ্ধিলাভের যে পথ, যে কৌশল দেখাইয়া গিয়াছেন অদ্যাবধিও তাহাই পথ, তাহাই রসপূর্ণ কৌশল। শ্রদ্ধা ছাড়া ভক্তি অসম্ভব। এই ভক্তিপথেই অশ্বিনীকুমার রসের সন্ধান পাইয়াছিলেন। মুকুন্দদাস ছিলেন এই রসের ভাণ্ডারের ভাণ্ডারী, রত্নভাণ্ডারের রত্নাকর। তাই মুকুন্দ-জীবনের সহিত ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সম্পর্ক ওত-প্রোতভাবে জড়িত ছিল। ব্রজমোহন বিদ্যালয় যেন মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের কর্মযোগের ও ভক্তিযোগের "আনন্দমঠ"।

বিদ্যালয়ের যে শারদোৎসবের কথা বলিতেছিলাম, তন্মধ্যে ১৮৯৬ সালের শারদোৎসবে স্বর্গীয় পণ্ডিত মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় রচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি সমবেত ছাত্রকণ্ঠে গীত হইয়াছিল।

"চল্‌রে চল্‌রে ও ভাই জীবন আহবে চল্
বাজবে সেথা রণভেরী আসবে প্রাণে বল্।
চল্ চল্ চল্॥

ঘরে থেকে ভাই কাজ কি আছে
লাগুক জীবন দেশের কাজে
মরণ দিয়ে জীবন পাড়ে হউক জনম সফল।
চল্ চল্ চল্॥"

ঐ ছাত্রদলে পুরোভাগে পতাকা হস্তে সঙ্গীতের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র—যজ্ঞেশ্বর। সেই দিনের সেই সঙ্গীত ব্যঞ্জনার মধ্যে ভাবী মুকুন্দের আভাস স্ফুট হইয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

এই ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিক্ষা ভালই হইত, ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক অনেক ঘনিষ্ঠ ছিল। নীতি-শিক্ষাদানে বিশেষ নজর রাখা হইত। দরিদ্র-বান্ধব সমিতি, বান্ধব সম্মিলনী, বাল্যাশ্রম প্রভৃতি অনুষ্ঠান ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। শিক্ষকগণই ছাত্রদের লইয়া এই অনুষ্ঠানসমূহ পরিচালনা করিতেন। দরিদ্র-বান্ধব সমিতির রোগীর শুশ্রূষা, বিপন্নের উদ্ধার প্রভৃতি প্রচেষ্টা বাঙ্‌লায় এই শ্রেণীর সেবাকার্যের অগ্রদূত। ব্রজমোহন বিদ্যালয় সঙ্গীতাবলীর মধ্যে—

"অগ্নিদাহে কেহ সর্বস্ব খোয়ায়
দাঁড়িয়ে না রব পুতুলের প্রায়॥
রোগীর শিয়রে মৃত্যুর শয্যায়,
জাগিব, গাহিব তাঁহারি নাম।"[১]

ইত্যাদি যে প্রেরণা দিয়াছে, তাহার বিস্তৃতি শুধু বরিশালে নয়, ব্রজমোহনের প্রেরণালব্ধ বহু দিগ্বিজয়ী ছাত্র, সেবা স্পৃহা লইয়া বাঙ্‌লা, বাঙ্‌লার বাহিরে, দেশ-দেশান্তরে নীরব কার্য-কেন্দ্র রচনা করিয়াছিলেন। এক সময় ছিল, যখন বাঙ্‌লার বিভিন্ন স্থানের হাইস্কুল প্রধান শিক্ষকের জন্য ব্রজমোহনের ছাত্র চাহিয়া পাঠাইত। বিভিন্ন জেলা হইতে শিক্ষার সহিত নৈতিক জীবন গঠনোদ্দেশ্যে

১। "সত্য, প্রেম, পবিত্রতা"—এই ছিল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের আদর্শ। বিদ্যালয়ের পতাকায়, প্রবেশ পথে, অধ্যয়ন-কক্ষে, বইয়ের পাতায়, মুদ্রিত বিজ্ঞাপনে, সঙ্গীতে, কবিতায় এই মহামন্ত্র লিখিত থাকিত; দুর্গাপূজার পূর্বে 'গিফট্' অনুষ্ঠানে সঙ্গীত আবৃত্তি ও বক্তৃতা হইত। ১৮৯২ সালের উৎসব উপলক্ষ্যে যে গানটি রচিত হইয়াছিল, সেই গানই বিদ্যালয়ের সঙ্গীতরূপে গৃহীত হইয়াছিল। গানটি নিম্নরূপ :—

বহু ছাত্র আসিয়া ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে ভর্তি হইল। দূরবস্থিত অভিভাবকবর্গ বরিশালে পুত্রদের পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। স্কুল-কলেজ তখন অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বে একই গৃহে অবস্থিত ছিল। ব্রজমোহনের ছাত্র, তথা অশ্বিনীবাবুর ছাত্র —এই পরিচয় সকলেই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত।

সত্য, প্রেম, পবিত্রতা

আয় ভাই আয়, মাতি নব বলে
এই মহাব্রত সাধিব সকলে ;
অদম্য উৎসাহে যতন করিলে,
স্বরগ হইবে মরতধাম।

ঘৃণা অভিমানে দিব না বেদনা
পশু পক্ষী কীট তাঁহারি রচনা ;
প্রচারি জীবনে দয়ার মহিমা,
অহিংসা-মন্ত্র জপি অবিরাম।

প্রতি শ্বাসে বাজে ভেরী নিরন্তর,
কান পাতি শুন প্রাণের ভিতর ,
হাতে হাতে ধরি হও অগ্রসর,
দুর্নীতির সহ করিতে সংগ্রাম।

সত্যের নিশান তুলিয়ে গগনে,
পবিত্রতামৃত পূরিয়ে পরাণে,
প্রেম-ডোরে বাঁধি ভাই-বন্ধুগণে,
চল পূর্ণ হবে যত মনস্কাম।

অগ্নিদাহে কেহ সর্বস্ব খোয়ায়,
দাঁড়ায়ে না রব পুতুলের প্রায় ;

রোগীর শিয়রে মৃত্যুর শয্যায়,
জাগিব, গাহিব তাঁহারি নাম।

যত ভাই বোন করে হাহাকার,
শেলসম বাজে প্রাণে সবাকার।
মুছাব তাদের অশ্রু শত ধার,
তাদেরই তরে (ভাই) সঁপিব প্রাণ

এসেছি সংসারে খাটিব শিখিব,
মরি কিংবা বাঁচি পিছু না হটিব,
ছোট বড় কাজ কিছু না বাছিব,
কর্ম-মন্ত্রে দীক্ষা, কিসের মান?

সাহিত্য-সাগরে রতন খুঁজিয়ে
বিশ্ব-শিল্পী পায়ে শিল্পে জ্ঞান নিয়ে,
সঙ্গীতের সুধা চৌদিকে ঢালিয়ে,
মানব-মহত্ত্বে তুলিব তান।

অণু মোরা বটে, তবু ক্ষুদ্র নই,
শত শত ভাই এক প্রাণ হই,
শত শত দাঁড় পড়ে দেখ ওই
ছুটেছে তরণী না মানে উজান

গুরুজন-পদধূলি মাথে লয়ে,
'সত্য-প্রেম-শুদ্ধি' পতাকা উড়ায়ে,
ভাসাহু তরণী ধ্রুবতারা চেয়ে,
ওই দেখা যায় স্বরগ ধাম।

কিন্তু সেদিনের সেই বহুজন-বাঞ্ছিত শিক্ষা পাঠের সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের যজ্ঞেশ্বরের কি হইল? লেখাপড়া শিক্ষায় অগ্রসর হইতে পারিলেন না। শিক্ষক-শিক্ষালয়কে ফাঁকি দেওয়া বন্ধ হইল না, বিশেষ কোন ঘণ্টায় স্কুল হইতে পলায়ন করা, কোন কোন পরীক্ষার দিনে অসুস্থ থাকা, পরীক্ষারপর প্রমোশনের তদ্বির ইত্যাদির সহিত বাবার পয়সা খরচ করাইয়া প্রায় পাঁচ বৎসর আদর্শ শিক্ষাপীঠ ব্রজমোহন বিদ্যালয় সংস্পর্শে অতিবাহিত করিয়া জীবনের এক অধ্যায় অনিচ্ছায় সমাপ্ত করিলেন।

বস্তুতঃ, যজ্ঞেশ্বরের শৈশব-কৈশোর ও যৌবনকাল উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির ছিল। তাই সেদিনের পক্ষে একটি সঙ্গীনধারী কড়া পাহারার সীমান্তের মত দুরতিক্রমণীয় পরীক্ষার বাধা না থাকিলে হয়তো আরও কিছুদিন যজ্ঞেশ্বর ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে অতিবাহিত করিতেন। যজ্ঞেশ্বরের জীবনে এই মূল্যবান সময়টা একটা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ও শক্তিমান ব্যক্তিবর্গের আবহাওয়ায় বিচরণ করিয়া পাণ্ডিত্যের বা সাধুত্বের পথে অগ্রসর হইল না, বরং শহরের দুর্দান্ত চরিত্রের "গুণ্ডা" নামধারী যুবকদের সহিত সম্পর্কান্বিত হইয়াছিল।[১০] তখন বরিশালের ঐ দল স্বকার্যে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিল। দোল-পর্বের দুই দিন উৎকট রসের পরিচয়ের সহিত স্থানে স্থানে দেখা যাইত ছোটখাট দাঙ্গা, রথযাত্রায় রথীভক্তি, কাঁচা পেয়ারা, পচা কলা, নারিকেল প্রভৃতি দূর হইতে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে সজোরে নিক্ষেপ। ঝুলনে গভীর রাত্রি অবধি হল্লা জমাইয়া, নষ্টচন্দ্রার রাত্রে মুহুর্মুহুঃ টিনের চালে ইট ছুঁড়িয়া, যাত্রাগানের সামিয়ানার দড়ি একই সময়ে সকল দিক হইতে কাটিয়া, ঢিল নিক্ষেপে আলো নিভাইয়া তৎকালে একটা স্মরণীয় বিভীষিকা যাহারা বরিশাল শহরে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আমাদের 'যজ্ঞেশ্বর দে' তড়িৎগতিতে এই দলের বিশিষ্ট সদস্যরূপে পরিগণিত হইয়া

১০। সকল সময়েই অল্পাধিক উচ্ছৃঙ্খলদের একটা দল গ্রামে, শহরে, বন্দরে দেখা যায়। এই দলের অস্তিত্ব প্রবাহরূপে বজায় থাকে। কৈশোর হইতে যৌবনের কিয়দংশকাল একের পর এক আসিয়া এই দলের স্থিতি যোগায়। এই দল প্রায়শঃ ভদ্র ও বিদ্যার্থীভবন হইতে সদস্য লাভ করে। এই স্বেচ্ছা-দাসত্বের পথ খুলিয়া দেয় বাড়ির অনাদর ও বিদ্যালয়ের ভর্ৎসিত ছেলের দল। মেধাবী শান্ত-শিষ্ট অথবা হাবা-বোকা ছাত্ররা এই পথে অগ্রসর হয় না। এই উভয়ের মধ্যবর্তী সংখ্যাবহুল একদল ছাত্র থাকে—যাহাদের বুদ্ধি আছে, সুপ্ত প্রতিভার একটা তাড়না আছে, কিন্তু তাহা স্কুল পরীক্ষায় পাসের নম্বরের সাহায্য না করিয়া প্রতিকূলতা করে। দায়িত্বশীল অভিভাবক ও শিক্ষকসহ সমগ্র জাতি পরীক্ষা যন্ত্রের বাটখারায় ওজন করিয়া মান-আদর ও পুরস্কার-বিতরণ করেন। বাকীগুলিকে ঐ যন্ত্র যে অবজ্ঞার ডাস্টবিনে ছুঁড়িয়া ফেলে, সে আঘাতে কেহ জীবনপথে

"বজ্রা গুণ্ডা" নামে অভিহিত হইলেন। ক্রমশঃ এই দলের উৎপাত শান্ত ভদ্র নাগরিকদের উদ্বেগের কারণ হইল। পুলিশ শান্তিরক্ষায় পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ হইতে লাগিল। বিশিষ্টদের পক্ষ হইতে এই উচ্ছৃঙ্খল দলের কথা প্রধান রাজপুরুষ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কর্ণগোচর করান হইল। এইসময় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটরূপে আসিয়াছিলেন স্বনামধন্য সিভিলিয়ান বিটসন্ বেল্[১১]। ইনি আগমনের অল্পদিন মধ্যেই সর্বজনপরিচিত ও জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। জনসেবায়, উৎপীড়িতের রক্ষায়, অত্যাচারী দমনে, আভিজাত্য ভুলিয়া সুদূর পল্লীর দীন কাঙ্গালের সহিত কুটুম্বিতা করিয়া (সেই পর্ণকুটিরে উপস্থিত ও সাহায্য প্রভৃতির দ্বারা) বেল্ সাহেব বরিশালে এক অমর কীর্তি[১২] রাখিয়া গিয়াছেন।

চূর্ণ-বিচূর্ণ, কেহ বা পঙ্গু হইয়া সমাজের বোঝারূপে জীবন অতিবাহিত করে। শিক্ষাযন্ত্রের ঐ নিমম আঘাত সত্ত্বেও কোন কোন জীবন নানা প্রতিকূল পথ অতিক্রম করিয়াও সাফল্যের পথে অগ্রসর হয়, কিন্তু বহুলাংশই আত্মবিকাশের সুযোগলাভে বঞ্চিত হয়। ঐ যন্ত্রের কঠোর নিষ্পেষণে কত শক্তি, কত প্রতিভা অকালে ঝরিয়া শুকাইয়া জাতিকে দুর্বল ও পঙ্গু করিতেছে তাহরে পরিমাপ করিবে কে? আজো সুশিক্ষিত চিন্তাশীল বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিও স্বীয় সন্তানকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কোথায়, কাহার হস্তে অর্পণ করিয়া দিতেছেন তাহা ভাবিবার প্রয়োজন বোধ করেন না। এমনি করিয়াই সমাজের প্রতিটি স্তরে স্তরে প্রতিপদক্ষেপে যে কেমন নির্মমভাবে মানুষ গড়িবার নামে শক্তি, প্রতিভা, মনুষ্যত্বের ভ্রূণ-হত্যা এবং শৌর্য-বীর্যের অপচয় হইতেছে তাহা ভাবিতেও প্রাণে বেদনা জাগে। শুধু বিদ্রোহী কবি নজরুলের ভাষায় বলা যায়ঃ—

"এই ধরণীর ধূলিমাখা তব অসহায় সন্তান
মাগে প্রতিকার উত্তর দাও, আদি পিতা ভগবান॥"

১১। দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ দেহ, হাফ্ প্যাণ্ট পরিহিত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট্ বেল্ সাহেবকে সকলেই বেশ ভয় ও সমীহ করিয়া চলিত। যখন-তখন শহরের রাস্তায়, দূর পল্লীতে, মাঠে-ঘাটে সাইকেল ও কুকুর সঙ্গে তাঁহাকে একাকী ভ্রমণ করিতে দেখা যাইত। তখন রাজপুরুষদের সতক দেহরক্ষীর প্রয়োজনীয়তা না থাকিলেও যতটুকু ছিল বেল্ সাহেব তাহা ভাঙিয়া দিয়াছিলেন। বিনা সংবাদেই যখন-তখন থানা, খাসমহল, কোর্ট অব ওয়ার্ডস প্রভৃতি পরিদর্শন করিতেন। পুলিশ ও বিভিন্ন রাজকর্মচারীর ভিতর তিনি সর্বদা ত্রাসযুক্ত আবির্ভাব বিভীষিকা জাগাইয়াছিলেন প্রত্যেকটি ভ্রমণ পরিদর্শনে তাঁহার একটা কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা থাকিত। এই জবরদস্ত সিভিলিয়ান, যিনি একাধারে, প্রাণবান জনপ্রিয়, অত্যাচার-অনাচার ক্ষিপ্রদমন-কুশলী, নিপীড়িত প্রজা-দরদী, আইনের গণ্ডী অতিক্রমকারী অত্যাচারী শাসক, ভেদনীতি কুশল, বিশ্বস্ত সাম্রাজ্যসেবীরূপে প্রাপ্ত শেষ শিরোপা গভর্ণরের কার্য হইতে যথানিয়মে অবসর পাইয়া মিশনারীরূপে সমাজ সেবা করিয়া জীবনের শেষ সমাপ্তি রেখা টানিয়াছেন।

১২। বেল্ সাহেবের অমর কীর্তির কথা বরিশালবাসীমাত্রই জানেন। উৎসাহী পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এখানে দুই একটি ঘটনার কথা সংক্ষেপে লিখিতেছিঃ—

পূর্বেই বলিয়াছি যে, স্কুলত্যাগী যজ্ঞেশ্বর যে উচ্ছৃঙ্খল দল তথা "গুণ্ডা" দলে মিশিলেন, সে দলের কাহিনী বিশিষ্টদের মারফতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বেল সাহেবের কর্ণগোচর হইল। জবরদস্ত বেল্ সাহেব যদি সেদিন হান্টার হস্তে ঐ দলকে শায়েস্তা করিতেন, তবে কেহই অসন্তুষ্ট হইতেন না। সহজলভ্য এই প্রশংসার পথে বেল সাহেবের অনভ্যাস বা অযোগ্যতাও ছিল না,[১৩] কিন্তু বেল্ সাহেব প্রতিকারের অন্যপথ গ্রহণ করিলেন। বেল চরিত্রের ঔদ্ধত্য, মহাপ্রাণতা, দুর্জয় সাহসিকতা হইতে শেষের পাদরীর কার্য পর্যন্ত পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই একটা স্বতঃপ্রেম প্রেরণা বেলের পশ্চাতে কাজ করিত, কিন্তু সম্মুখের গতিপথ তদনুসারে নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট ছিল না। তাই তাহার জীবনে পরস্পর-বিরোধী ক্রিয়াকলাপের অন্ত ছিল না—একজন তাহাকে মহাপ্রাণ বলিলে একটুও অত্যুক্তি হইবে না, আবার তাহাকে হীন পর্যায়ে নামাইলেও তাহা অস্বীকার করা যাইবে না। বেল সাহেব যদি সাম্রাজ্যসেবী আমলাতন্ত্রের

(ক) একটি পেঁপে হাতে একটি দরিদ্র বালক কাঁদিতে কাঁদিতে চরবাড়ীর অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। বেল সাহেব সাইকেল থামাইয়া বালকের ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন— কোতোয়ালী থানার পুলিশ তাহার অপূর্ব পেঁপেটির দাম চার পয়সা চাওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া ধাক্কা দিয়াছে এবং অপরটি যে দামে বিক্রয় হইবে সময়ান্তরে তাহা আনিবার জন্য বলিয়া দিয়াছে। বেল্ সাহেব পকেট হইতে দশ টাকার একখানা নোট বালকের হাতে দিয়া পেঁপেটি নিজ হাতে লইয়া বালককে বলিলেন, যাও—সেই পুলিশকে গিয়া বল অপরটি দশ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে এবং দাম দশ টাকা দাবি করিয়া বিক্রয়ের টাকা না দেওয়া পর্যন্ত সেখানে থাকিও। বালককে থানায় পাঠাইয়া কিছু সময় রাস্তায় ঘুরিয়া পেঁপে হাতে বেল সাহেব উগ্রমূর্তিতে থানায় প্রবেশ করিয়া সেই পূর্ব পেঁপের পুলিশকে ডাকিয়া বালককে দেখাইয়া দশ টাকা দাম দিতে হুকুম করিলেন। কম্পিত পুলিশ অবিলম্বে দশ টাকা আনিয়া দিল। পুলিশকে সতর্কবাণী শুনাইয়া সাহেব প্রস্থান করিলেন। দুইটি পেঁপের কুড়ি টাকা মূল্যের সংবাদ বিদ্যুৎ গতিতে জেলাময় ছড়াইয়া পড়িল।

(খ) মাহিলাড়ার দরিদ্র বৃদ্ধ গোবিন্দ পুত্রশোকে অর্ধোন্মাদ। পুত্রবধূদ্বয়ের সাহায্যে দাঁড়াইবার স্থান নাই—বেল্ সাহেব শোকার্ত গোবিন্দকে বাপ বলিয়া সম্বোধন করিয়া নিজকুঠিতে আনিয়া আদর-আপ্যায়ন করিয়া পিতৃস্নেহ নিদর্শনরূপ পাগড়ি দিয়া মাথায় বাঁধাইয়া দিলেন। শুধু তাহাই নয়, গোবিন্দের সাংসারিক অবস্থার উন্নতি বিধান করে পুত্রের অভাব কিয়ৎ পরিমাণে মিটাইয়া তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া তুলিলেন।

(গ) বরিশালের সিদ্ধকাঠির জমিদার ও প্রসিদ্ধ নাট্যকার গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর প্লেগে মৃত্যু হইল। রোগ সংক্রামক হইতে পারে তজ্জন্য বেল সাহেবের প্রাণপণ চেষ্টা শুধু দূরে থাকিয়া ক্ষমতা ও অর্থব্যয় করিয়া নহে—প্রত্যহ সেই গ্রামে উপস্থিত হইয়া স্বীয় প্রাণকে বিপন্ন করিয়া যে মহত্ত্বপূর্ণ সেবাপরায়ণ প্রাণের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা অবর্ণনীয় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

১৩। একবার এক ব্রাহ্মণ মহিলার প্রতি কয়েকটি মুসলমানের অত্যাচারের সংবাদে বেল্ সাহেব অত্যাচারী শাসকের রুদ্রমূর্তিতে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের মুসলমানকে পর্যন্ত বাড়ি ছাড়া

শৃঙ্খলে নিজেকে বদ্ধ না করিয়া স্বাধীনভাবে জীবনপথে অগ্রসর হইতেন; তবে শেষ জীবনের পাদরীগিরি জীবন-যৌবনে অঙ্গায়িত হইয়া এমন একস্থানে তাঁহাকে উন্নীত করিতে পারিত যাহা গভর্ণরের সম্মান অপেক্ষা বহুগুণ সম্মানের ছিল।

বরিশাল শহরের উৎপাতস্বরূপ যজ্ঞেশ্বর ও তাঁহার দল আগতপ্রায় হোলী উৎসবে কোন অভিনব কর্মতালিকায় বীভৎস আশ্রয়ে সাফল্য লাভ করিবে তজ্জন্য পরামর্শে ব্যস্ত, পুলিশবাহিনীও শান্তিরক্ষার উপযুক্ত আটঘাট ত্রুটিহীন করিতে ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু অকস্মাৎ বিস্ময়বিমূঢ় শহরবাসী দেখিল আবির ও রং বিমণ্ডিত ম্যাজিস্ট্রেট বিট্সন বেল্ একদল কিশোর যুবক সমভিব্যাহারে সদর রাস্তায় উল্লাসে অগ্রসর হইতেছেন। পদস্থ অভিজাতকুল, সাম্প্রদায়িকতাবাদী প্রভৃতির শিষ্ট সমাজ, আহত চিত্তের অভিব্যক্তিকে চাপিয়া ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—পাগল! কেহ বলিল উদার, মহৎ, কেহ বলিল বদ্‌খেয়ালী আত্মঘাতী মূঢ়!

ভালমন্দ সব আলোচনায় উদাসী বেলের খেয়ালী গতি দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। ঐ উচ্ছৃঙ্খলদের লইয়া নিয়মিত খেলা আরম্ভ হইল। একে তো শ্বেতাঙ্গ, তদুপরি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব খেলার আকর্ষণী শক্তি শহরের সর্বশ্রেণীর যুবকদের আকর্ষণ করিল, "রিক্রিয়েশান ক্লাব" গঠিত হইল। মাঠের খেলোয়াড় বেল্ সাহেব ঐ খেলার অন্তরালে যে যাদুকাঠি ঘুরাইলেন তাহাতে সেদিনের সেই উচ্ছৃঙ্খল দল বিলুপ্ত হইয়া গেল। যাদুকর সাহেব খেলার মাধ্যমে যে শিক্ষা (Play-way in Education) দিলেন তাহাতে উৎসাহী যুবকেরা দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ হইয়া উঠিল এবং যাদুকর সাহেবের প্রচেষ্টায় যোগ্যতানুযায়ী কেহ পুলিশ, কেহ কেরাণী প্রভৃতি পদে নিজেকে

করিয়াছিলেন। কোর্ট অপেক্ষা ঘটনাস্থলেই বিচারের প্রতিই তাঁহার ঝোঁক ছিল বেশী। বহু পদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বেল্ সাহেবের হস্তে দৈহিক লাঞ্ছনায়, অপমানে মৃতবৎ হইয়াছেন। বরিশালের অশিক্ষিতদের ভাষার সহিত কুৎসিত গালাগালিগুলিকেও সাহেব আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং যখন তখন তাহা প্রয়োগ করিতেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পরে সেটেলমেণ্ট অফিসাররূপে তিনি বহু বৎসর বরিশালে কাটাইয়াছেন, সমগ্র জেলার সর্বাবধ পরিচয় যেন তাঁহার নখদর্পণে বিরাজ করিত, ইনি সাম্রাজ্যসেবাতেও কৃতী পুরুষ। বঙ্গভঙ্গের সীমা নির্দেশে বেল্ সাহেবের বিশেষ অংশ ছিল। ক্রমশঃ ইনি রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বার, গভর্ণরের সেক্রেটারী, চীফ কমিশনার, সর্বশেষে আসামের গভর্ণর হইয়াছিলেন। অবসর লইয়া বেল্ সাহেব বরিশালে আসিয়াছিলেন। বরিশাল তাঁহার প্রিয় ছিল, বরিশালের মাটিতে তাঁহার অনেক ভালমন্দ কাজের স্মৃতি রহিয়াছে। বরিশালে তাঁহার অনুরক্ত বন্ধু, অনুগৃহীত আশ্রিত বহু এখনো বাঁচিয়া আছেন।

প্রতিষ্ঠিত করিলেন। যাঁহারা কিছুকাল পূর্বে শহরের উৎপাতস্বরূপ ছিলেন, অনতিকাল মধ্যে তাঁহারাই শিষ্ট-সমাজের ভদ্র গৃহস্থ সংসারী হইয়া গেলেন।

খেলা ও চাকুরিযুক্ত মরশুমে আমাদের যজ্ঞেশ্বর কি করিলেন? ঐ খেলার দলে বিশেষ মিশিতে পারিলেন না, যেন খাপ খাইল না। পিতার তিরস্কার এড়াইতে প্রায়ই পিতাকে শুনাইতেন, শীঘ্রই একটা ভাল চাকুরির বিশেষ সম্ভাবনা, সেই চেষ্টায় সে ব্যস্ত। এই কৈফিয়তের মূলধনে স্কুল পরিত্যাগী যজ্ঞেশ্বরের বাড়ির গঞ্জনা হ্রাস হইল। চাকুরির তেমন আগ্রহ থাকিলে সেদিন যে কোনও রকম একটা চাকুরির অভাব হইত না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, তিনি ছোট হইয়া যে কোন রকমে ঢুকিতে পারিলেই ম্যাজিকের মত চাকুরির শ্রেষ্ঠপদ অধিকার করিয়া লইবেন এবং বহুলোককে আর্থিক সাহায্য করিতে সফল হইবেন। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সহিত উদার মনোবৃত্তির ঊর্ধ্বতম গতির অস্পষ্ট আবেগ, যৌবনের প্রারম্ভে যজ্ঞেশ্বরের ঐ চাকুরির বাসনা-কামনার মধ্যেও ফুটিয়া উঠিত। কাণ্ডারীহীন যজ্ঞেশ্বর স্কুল পরিত্যাগান্তে যে লক্ষশূন্য খরস্রোতে জীবন ভাসাইয়াছিলেন, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বেল্ সাহেবের এক প্রাণের হাওয়া সে গতিবেগকে ফিরাইয়া দিল, কিন্তু ঘাটে বাঁধিতেও পারিল না। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের সত্য, প্রেম, পবিত্রতার সাধনপীঠ "ব্রজমোহন বিদ্যালয়" যে নিবিড় বন্ধনে ছাত্র-শিক্ষককে বাঁধিয়া সমগ্রদেশকে এক অভিনব রূপ দিবার চেষ্টায় ধন্য, সেই শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের অবদান যজ্ঞেশ্বরকে বাঁধিতে পারে নাই। কিন্তু পাগলী মায়ের দুর্দান্ত পাগলছেলে সকলের সকল মঙ্গল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ঘাট-বেঘাটের ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করিয়া যে ক্ষেত্রে গিয়া শিকড় গাড়িলেন, সেই দুর্বার শক্তি-বীজ আহরিত হইয়াছিল অশ্বিনীকুমারের সত্য, প্রেম পবিত্রতার সাধন পীঠ ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সংস্পর্শ হইতে।[১৪]

পিতা গুরুদয়াল দে চাকুরির অবসরে যে মুদি দোকান চালাইতেছিলেন, ছাত্র যজ্ঞেশ্বর তাহাতে একটু বয়স্ক হইয়াই ক্রয়-বিক্রয় ও পাহারার কাজ

১৪। স্বদেশী আন্দোলনকালে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে অশ্বিনীকুমার জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও ব্রজমোহন বিদ্যালয়কে গতানুগতিক পথে রাখিয়াই আন্দোলনের সাহায্যকারী-রূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ের সংস্পর্শে আসিয়াই যজ্ঞেশ্বর অশ্বিনীকুমারের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন এবং তাঁহারই উৎসাহে, প্রেরণায় ও আশীর্বাদে মুকুন্দদাসে পরিণত হন। কথা-প্রসঙ্গে অশ্বিনীকুমার দত্ত সত্যিই বলিয়াছিলেন—"কলেজে পা দিতে পারিলেই আর মুকুন্দ হইত না, শিষ্ট, ভদ্র, গৃহস্থ হইত'; বরিশালের লোকেরাও চিনিত না।"

করিতে লাগিলেন। এই সূত্রে ক্রমশঃ পড়াশুনা নিদ্রা-বিশ্রামের স্থান দোকান ঘরেই স্থায়ী হইল, আহারের জন্য বাসায় যাইতেন মাত্র। এই অবস্থাটা যজ্ঞেশ্বরের নিকট ক্রমশঃ অধিক প্রিয় ও প্রয়োজন ছিল। পিতাও দেখিলেন পুত্রের বিদ্যার্জন ও ব্যবসায় যথাসম্ভব একসাথেই চলিতেছে, কিন্তু অনভিজ্ঞ পিতা বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার এই ব্যবস্থার পথে উদ্দিষ্ট বিদ্যা ও দোকান উভয় পক্ষেই ক্ষতিকর হইতেছে। স্কুলের ছাত্র যজ্ঞেশ্বর কিশোর, চতুর ও বুদ্ধিমান। সর্বশ্রেণীর সমবয়স্কদের আকর্ষণ করিয়া দোকান ঘরে একটি ভালো আড্ডা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। পিতার উপস্থিত কালটা যথাসম্ভব এড়াইয়া আড্ডাটা জমান হইত। তথাপি পিতার চক্ষে যতটা পড়িত তাহাতে তিনি ততটা অসন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না। পাড়ার বড় বড় পদস্থ চাকুরিয়ার ছেলেরাই পুত্রের ইয়ার বন্ধু ও সাহায্যকারী। তিনি যে সব ভদ্রঘরের ছেলেকে "বাবু", "আপনি" বলিতেন, পুত্র তাহাদের নাম ধরিয়া "তুই", "তোর" সম্বোধন করিতেন। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমশঃ দোকানের চাবি, হিসাব কার্যতঃ যজ্ঞেশ্বরের হস্তগত হইল এবং এই অবস্থাতেই যজ্ঞেশ্বরের বিবাহ হয়। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার "দীঘিরপাড়" নামক গ্রামে তিনি বিবাহ করেন। তাঁহার শ্বশুরের নাম রামচরণ দে, শাশুড়ীর নাম সুরধনী দে এবং স্ত্রীর নাম শতদলবাসিনী। তাঁহার বিবাহিত জীবন সুখেরই ছিল।[১৫]

দোকান চলিতে লাগিল। এই দোকানটি হাতে থাকায় কিছু কিছু বাজে খরচে আটকাইত না; যাহা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হইত না বা খুব কষ্টকর ছিল। কিন্তু যজ্ঞেশ্বরের বাজে খরচের অংশটা বনিয়াদী ঘরের পুরাতন কর্মচারীর মত সর্বস্ব গ্রাস করে নাই। দোকানের তেমন উন্নতি হয় নাই, কিন্তু নষ্টও হইল না। কখনো চাকুরি, কখনো অন্যরকম ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতির জন্য

১৫। মুকুন্দদাসের একটি কন্যা হয়, তাহার নাম "সুলভা", ডাক নাম "চিনু"। মুকুন্দদাস যখন তিন বৎসরের জন্য জেলে যান, তখন তাহার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তিনি জেলে থাকাকালীন তাহার স্ত্রী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন এবং কিছুদিন পরে পুত্রটিকে সুস্থ রাখিয়া শতদলবাসিনী পরলোক গমন করেন। মুকুন্দদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমেশচন্দ্র দে'র তখনও বিবাহ হয় নাই এবং তিনিও মুকুন্দদাসের গানের বইয়ের প্রকাশক হিসাবে জেলে আবদ্ধ ছিলেন। মুকুন্দদাস তিন বৎসর জেল ভোগান্তে মুক্তি পাইয়া শুধু ছেলেটিকেই কোলে পাইলেন, স্ত্রীর সাথে আর দেখা হইল না। ছেলেটির নামকরণ করা হয়—কালীপদ দাস। মুকুন্দদাসের কন্যা বর্তমান নাই। পুত্র কালীপদ দাস বর্তমান, ২৪-পরগনা জেলার সোনারপুরের নিকটবর্তী "চারণপল্লী" নামক স্থানে অবস্থান করিতেছেন।

বা কল্পনা লইয়াই ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ অবধি মুকুন্দদাসকে ঐ দোকানদারীই করিতে হইয়াছে। তৎপরেও পিতা, ভ্রাতা, কর্মচারী দ্বারা কিছুদিন ঐ দোকান চলিয়াছিল। দোকানদারীতে মহাজনী হিসাব-পত্র, গ্রাহক ও মহাজনদের সহিত কথাবার্তা, ক্রয়, বিক্রয় প্রভৃতি কার্যে যজ্ঞেশ্বর বিশেষ পটুত্বই লাভ করিয়াছিলেন। অভিজ্ঞতার সহিত মুদির দোকান করিয়া তাহার প্রতি একটা লালসাও জন্মিয়াছিল। দোকান তুলিয়া দেওয়ার ইচ্ছা না থাকিলেও যখন দুই ভাই একত্রে জেলে গেলেন তখনই অনেককালের দোকান বন্ধ হইল। তিন বৎসর কারা ভোগান্তে ঘরে ফিরিয়া অন্ন সংস্থানের জন্য প্রথম অবলম্বন হইল পুনরায় মুদি দোকানদারী। আবার দল করিবার পর সেই মুদি দোকান রাখার ইচ্ছা সত্বেও পরিচালনার ত্রুটিতে সে দোকানও বন্ধ হইল। প্রাচুর্যের দিনে ভ্রাতাকে স্বাধীন স্বতন্ত্র কারবারীরূপে পরিণত করিতে প্রচুর মূলধনে তৃতীয়বার মুদি দোকান খোলা হইল। এবারেও তিন বৎসর পরে দোকান বন্ধ করিয়া ঘর হইতে প্রচুর টাকা দিয়া মহাজনের দেনা শোধ করিতে হইয়াছিল। তথাপি মুদি দোকানের ব্যবসায় সম্বন্ধে বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহার অভিজ্ঞতা রসায়িত আসক্তির পরিচয় দিত।

মুদির খাতা ও পাল্লা-পৈরান হস্তেই যজ্ঞেশ্বরের জীবনের ভবিষ্যৎ সংকল্প রূপ লইয়াছিল। দোকানদারীর নেশা অটুট থাকিয়াও অন্তর্নিহিত প্রতিভা স্ফুরণের বেদনা তাড়নার বেগ সহিয়াছে ঐ মুদি দোকান। ভালমন্দ সকল প্রকারের সহায়ক ছিল—মুদি দোকান। বিরাটের কোলে মুকুন্দ গড়িবার অবসর দিয়াছিল ঐ স্বাধীন স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র মুদি দোকানটি—চাকুরির অকস্মাৎ সংস্পর্শ হয়তো বা সে প্রতিভাকে শোষণ করিয়া লইত। তাই বিখ্যাত মুকুন্দ জীবনের ঐ "মুদি যজ্ঞেশ্বর" স্মৃতি মাধুর্যমণ্ডিত।

মূলতঃ, যজ্ঞেশ্বরের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তি বীজাকারে সুপ্ত ছিল, তাহাই মুদি দোকানের জল-আলো-হাওয়া পরিবেশে, কালক্রমে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া উঠিল। পরবর্তী জীবনে 'মুদি যজ্ঞেশ্বর' যে 'কীর্তনিয়া মুকুন্দদাসে' পরিণত হইয়াছিলেন; তাহার মূলেও আছে এই মুদি দোকানের নিরাপদ আশ্রয় ও স্বাধীনতা। আর ইহাই তাঁহার বাল্যে-যৌবনে লীলাভূমি এবং ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের সাধনভূমি।

চতুর্থ অধ্যায়

কীর্তনিয়া মুকুন্দদাস

বেল্ সাহেবের মঙ্গল প্রচেষ্টায় দলভাঙা যজ্ঞেশ্বর মুদি দোকানেই বিশেষ আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। একক উচ্ছৃঙ্খল পথে বা সঙ্গীতের সমবেত খেলার মাঠে কোথাও যজ্ঞেশ্বর ভিড়িলেন না। চাকুরির সন্ধান আলোচনার গণ্ডীতেই রহিল। আবার উহার কোনটাই পরিত্যাগের স্পষ্ট সংকল্পও ছিল না। কিন্তু ভিতরের একটা শক্তির তাড়না কোন রকমে একটা বিকাশের পথ চায়। দোকানে আসক্তি থাকা সত্ত্বেও যজ্ঞেশ্বরের মন ঐ মুদির গণ্ডীতেই থাকিতে চাহে নাই, আরো কিছু চায় যেন "হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।"[১৬]

এই সময় বরিশালের নায়েব নাজিরের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন স্বর্গীয় বীরেশ্বর গুপ্ত মহাশয়। এই বীরেশ্বরবাবু প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ভক্ত ও গায়ক নবদ্বীপের শ্রীমৎ রামদাস বাবাজীর ভ্রাতা। বীরেশ্বরবাবু দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ দেহ-সম্পন্ন শক্তিমান কীর্তন গায়ক ছিলেন। প্রথমতঃ তাঁহার দল গঠিত হয় তাঁহার অধীনস্থ আদালতের পিয়নদের লইয়া বরিশালে ভূমিস্থ বাকলা চন্দ্র-দ্বীপে, যেখানে শ্রীরূপ ও সনাতনের বাড়ি।[১৭] শ্রীজীব গোস্বামী[১৮]এই ভূমিকেই নয়ন জলে সিক্ত করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভু

১৬। বলাকা—৩৬ সংখ্যক কবিতা।

১৭। শ্রীরূপ ও সনাতন—সম্রাট হোসেন সাহের দরবারে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। প্রথম জীবনে ইসলাম ধর্মের উপর অনুরাগ থাকায় তাঁহাদের মুসলমানী নাম ছিল—"দবীর খাস" ও "সাকর মল্লিক", পরে রামকেলীতে চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর তাঁহাদের উভয়েরই জীবনে পরিবর্তন ঘটিল। শ্রীচৈতন্যদেবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন; তখন তাঁহাদের নাম হয়—রূপ ও সনাতন। রূপ গোস্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—সনাতন। উভয়েই একনিষ্ঠ সাধক, বিখ্যাত পণ্ডিত ও মহাপ্রভুর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। মহাপ্রভুর আদেশে উভয়েই বেশ কিছুকাল বৃন্দাবনে অতিবাহিত করেন। সনাতন গোস্বামী ভক্তি-শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ ও শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা রচনা করেন আর রূপ গোস্বামীর "উদ্ধব দূত", "বিদগ্ধ-মাধব", "ললিত মাধব", "শ্রীরূপ চিন্তামণি" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

১৮। শ্রীজীব—শ্রীচৈতন্যশাখা, প্রসিদ্ধ "ষট্ সন্দর্ভ", "ক্রমসন্দর্ভ", "মাধব-মহোৎসব" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা, চিরকুমার; শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা

অথবা তাঁহার কোন পারিষদ বা শক্তিশালী কোন গৌড়ীয় বৈষ্ণবের আগমন বরিশাল অঞ্চলে হয় নাই। তাই বরিশালভূমি শাক্তপ্রধান। এখানে ছিলেন প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত দেবতা, অভিজাত শ্রেণীর সেবক ও অভিজাত বংশের লোকেরা। গণতান্ত্রিক দেবতাব মধ্যে একমাত্র প্রাচীন শিব ঠাকুরেব অস্তিত্ব, অভিভাবকত্বও ছিল ঐ অভিজাত বংশেরই হস্তে। কিন্তু "চণ্ডালোপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠো হবিভক্তি পরায়ণঃ।" উদাব সদবংশজাত সুপণ্ডিত এক ব্রাহ্মণেব মুখে ব্রাহ্মণ্যেব এই নূতন সংজ্ঞা উদাত্তকণ্ঠে প্রচাবে অভিজাত শ্রেণী ও মুষ্টিমেয় গোঁড়া নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণবা উত্তেজিত ও মাবমুখী হইয়া উঠিলেও সাধাবণ মানুষ আপনাব এক নূতন রূপেব ও নূতন পথেব সন্ধান লাভ কবিয়াছিল।[১৯] "বাধাভাব-দ্যুতি সুবলিতং তনু" শ্রীগৌবাঙ্গ সুন্দব বাধাব মহিমা জানিতে পাবিয়াছিলেন বলিয়াই অধিকাবীভক্তকে তিনি পথেব সন্ধান দিতে পাবিয়াছিলেন। বক্তৃতাব দ্বাবা নয়, প্রচাবেব দ্বাবা নয়, ব্যাখ্যাব দ্বারা নয় তিনি আপন জীবনকে প্রকটিত কবিয়া আপনি আচবি তিনি 'স্বভক্তিশ্রী'-ব 'উন্নতোজ্জ্বলবস' রূপ দেখাইয়াছিলেন। এই ভাবেব ভক্তি "অনর্পিতচবী" ছিল—তাঁহাব পূর্বে

শ্রীবল্লভেব বা অনুপমেব পুত্র। শৈশবে ইনি পিতৃহীন হন। বাল্যকাল হইতেই শ্রীভগবানে অনুবাগী ছিলেন। বৃন্দাবনেব রূপ ও সনাতনেব নিকট থাকিযা ইনি শিক্ষালাভ কবেন। ইনি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি ও দার্শনিক ছিলেন। গৌড়ীয বৈষ্ণব মতেব দার্শনিকতা ইনিই প্রথম দেখাইযাছেন। রূপ ও সনাতনেব পব ইনিই বৃন্দাবনেব গৌড়ীয বৈষ্ণবদেব আচায পদে ব্রতী হন।

১৯। মহাপ্রভুব ব্যক্তিত্বে ছিল কোমল কঠোবেব সমন্বয। আচণ্ডালে প্রেম বিলাইযা তিনি মানুষকে যেমন মিলাইযাছিলেন, তেমনি প্রচণ্ড বিক্রমে বিরুদ্ধশক্তিব পবাভবেব দ্বাবা তাহাদেব মধ্যে শক্তিব সঞ্চাব কবিযা ভযহীন জীবনে তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিতও কবিযাছিলেন। এই প্রসঙ্গে কবিবাজ গোস্বামীব কথা প্রণিধানযোগ্য :—

'আপনা আস্বাদে প্রেম নাম সংকীর্ত্তন ॥
সেই দ্বাবে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চাবে।
নাম-প্রেম মালা গাঁথি পবাইল সংসাবে ॥
এই মত ভক্তভাব কবি অঙ্গীকাব।
আপনি আচবি ভক্তি কবিল প্রচাব ॥" (চৈঃ চঃ)

মহাপ্রভু নাম-সংকীর্ত্তনেব উপবেই অধিক গুরুত্ব আবোপ কবিযাছিলেন। এই নাম মন্ত্রই 'জীবনে জীবন যোগ কবা" হইয়াছিল, জনগণ দেখিল এবং জানিল "যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা কবি নামের সহিতও আছেন আপনি শ্রীহবি।" এইজন্য গৌবচন্দ্রেব প্রথম পবিচয "সংকীর্ত্তন ধর্মেব নিধান"। আজও পশ্চিম বাঙলাব পল্লীতে পল্লীতে গৌব আবাহনে নগব কীর্ত্তনেব আবম্ভ এবং "নগর ভ্রমণ করি গৌর এল ঘবে"তে সমাপ্তি।

ভক্তিধর্মের কোন প্রবর্তকই ভগবদ্ বিষয়িনী রতিকে এমন ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের অতীত পঞ্চমপুরুষার্থরূপে মধুর শৃঙ্গার রসে পরিণত করিতে পারেন নাই, ফলে "তরু হতে যেবা হয় সহিষ্ণু, তৃণ হতে দীনতর"—সেই সব বৈষ্ণবদের ঘরে ঘরে "রাধাকৃষ্ণ". ও "গৌর নিতাই" বিগ্রহ পূজিত হইলেও অভিজাত ও গোঁড়া শ্রেণীর মধ্যে তাহা প্রচলিত হইল না। ক্ষুদ্রশক্তি বৈরাগী ব্যবসাদারেরা বরিশাল জেলার বঞ্চিত হিন্দুদের সুপ্ত মর্মবেদনার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ঐ সব গণতান্ত্রিক ঠাকুবেব (রাধা-কৃষ্ণ ও গৌর-নিতাই) আমদানী লোকচক্ষুর অন্তরালে করিয়াছিল। আর এই জন্যই সুসংস্কৃত বৈষ্ণবধারা প্রচারিত হয় নাই। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও তুলসীর মালা গলায় দেখিলে ভদ্রঘরের ছেলেরা উহা অস্পৃশ্য হিন্দুর নিশানা বলিয়া মনে করিত ও তদনুরূপ ব্যবহার করিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভদ্রঘরে 'হরিলুট' প্রবেশ করিলেও ব্রাহ্মণ ডাকিযা শালগ্রাম সম্মুখে বাতাসা উৎসর্গ করিতে হইত। এহেন বরিশালে বিশিষ্ট ভদ্রঘরে ভদ্র শ্রোতাদের কীর্তনে আকৃষ্ট করিলেন বীরেশ্বর গুপ্ত মহাশয়। অবজ্ঞাত একদল 'প্যাদা' লইয়া তিনি নিতাই-গৌর, রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক কীর্তনকে অভিজাত সম্প্রদায়ের ঘবে পৌঁছাইলেন। ইহার পূর্বে যে কীর্তন হইত না তাহা নহে, কিন্তু বীরেশ্বরবাবুর উদ্দণ্ড নৃত্য সহকারে নগর কীর্তন, মাধুর্য-মাখা গুরুগম্ভীর সুউচ্চ কণ্ঠ, স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত, প্যারীলাল রায়, হরকান্ত সেন, গোরাচাঁদ দাস প্রভৃতির মত শহরের প্রবীণ শ্রোতা—এই সব মিলিয়া যে স্মরণীয় অধ্যায় সূচিত হইয়াছিল, তাহাকে প্রাচীন শাক্তক্ষেত্রের গোঁড়ামি অবসানের সন্ধিক্ষণ বলিতে পারি।

আমাদের যজ্ঞেশ্বরের জীবনে সুর সঙ্গীতেব যে জন্মগত রেশ ছিল যাহার বিকাশ আমরা ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের শারদোৎসবে লক্ষ্য করিয়াছি, শক্তির সেই তাডনা তাঁহাকে শক্তিমান কীর্তন গায়ক বীরেশ্বরবাবুর কীর্তনে আকর্ষণ করিল। সমবেত কণ্ঠের নগর কীর্তনে যোগ দিতে কাহারও পক্ষে কোন বাধা বা অসুবিধা ছিল না। প্রারম্ভে অল্প কয়েকজন খোল করতাল লইয়া রাস্তায় বাহির হইলে, পরিচিতি-অপরিচিত বন্ধুর দলে মিশিয়া যজ্ঞেশ্বরের যোগদানের প্রারম্ভেই শক্তিমান বীরেশ্বর গুপ্ত মহাশয় এই তরুণ যুবককে চিনিয়া আকর্ষণ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই যজ্ঞেশ্বর, বীরেশ্বরবাবুর কীর্তনে প্রধান সহায়করূপে মৃদঙ্গ স্কন্ধে প্রধান গায়কের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বহুজন পরিচিত হইলেন। মস্তকের ঘন কোঁকড়ান চুল স্কন্ধ ঢাকিয়া বাবরি আকারে ঊনবিংশ

বর্ষীয় যুবকের বর্ধিত শ্রী ও সঙ্গীত নৃত্যকালীন ঐ কেশ ও বপুর আলোড়ন একটা মনোহর দর্শনীয় ছিল।

বস্তুতঃ, যে তাড়না যজ্ঞেশ্বরকে বিদ্যালয়ে স্থির থাকিতে দেয় নাই, যাহা পথ খুঁজিতে রাস্তায় দুর্দান্ত দলে ঘুরাইয়াছে, ভিতরের সে অজানা তাড়না আজ আবার একটা পথ পাইল, বীরেশ্বরবাবুর সঙ্গে কীর্তন গাহিবার কৌশল-শিক্ষার সাথে সাথেই যজ্ঞেশ্বর স্বীয় মুদি দোকানকে কেন্দ্র করিয়া পাড়ার মধ্যে একটি ছোট্ট দল গড়িলেন, নিজেই প্রধান গায়ক-বাদকরূপে ছোটখাট নিমন্ত্রণ পাইতে লাগিলেন। কীর্তন গাহিবার নেশা হইল। অল্পদিন মধ্যেই বীরেশ্বরবাবু অকস্মাৎ লোকান্তরিত হইলেন। শহরে তিনি যে একদল গায়ক-বাদক ও শ্রোতা তৈয়ারী করিয়াছিলেন, তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইল। যজ্ঞেশ্বরের পূর্ব-প্রস্তুতি অচিরকাল মধ্যে তাঁহার দলকেই পুষ্ট ও শহরের শ্রেষ্ঠ কীর্তনের দল বলিয়া পরিচিত করিল। এই সব দল নিজেদের পয়সায় মৃদঙ্গ করতালাদি ক্রয় করিয়া লইত। সমস্ত দিনের কাজকর্মের পর ইহারা রাত্রে কীর্তনের নিমন্ত্রণ বাড়িতে সমবেত হইয়া কীর্তন করিত এবং গভীর রাত্রে ক্লান্ত ঘর্মাক্ত কলেবরে কিছু বাতাসা বা অন্য কোন প্রসাদ লইয়া ঘরে ফিরিত। কদাচিৎ খিচুড়ি, মিষ্টান্ন প্রসাদও মিলিত। কীর্তনের জন্য নিমন্ত্রণ পাওয়াই ছিল ইহাদের পুরস্কার বা স্বার্থ। যজ্ঞেশ্বরের কীর্তনের দল ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিল। 'আলেকান্দা' স্থিত এই দলে যোগ দিয়াছিলেন ৺রাজেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী, নলিনীকান্ত সেন প্রভৃতি সমবয়স্ক স্কুল-কলেজের যুবক ছাত্রমণ্ডলী। আলেকান্দা পাড়ার মুদি দোকান-কেন্দ্রে গঠিত এই দল ব্যতীত ক্রমশঃ ছোটখাট অনেক দলের প্রধান গায়করূপে তাঁহাকে দলপতিত্ব করিতে হইত। কীর্তনের শ্রোতা, গায়ক এবং নিমন্ত্রণকারী সকলেই কীর্তনকে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে ধর্মভাব ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান বলিয়া অল্পাধিক মানিয়া লয়। কেহ ভিতরের সুর ও তান লয়ের তাড়নায়, কেহ শুদ্ধ আত্মিক উন্নতির জন্য, কেহ সাধুগিরির পথে স্বার্থসিদ্ধির জন্য, কেহ আত্মপ্রচারকল্পে, কেহ বা কামনা সিদ্ধির কৃতজ্ঞতা প্রচারের পথরূপে আবার কেহ বা দেশসেবার জন্য এই কীর্তনকে ব্যবহার করে, যোগ দেয়, অগ্রসর হয়। ক্রমে অগ্রসরের পথে উদ্দিষ্ট আসল জিনিসের অন্তরায়গুলি একে একে আসিয়া উঁকি মারে, লাভ প্রতিষ্ঠাদির সঙ্গ পাইয়া কেহ সেইখানে থামে, কেহবা অগ্রসর হয়। লক্ষ্যে পৌছায় নাকি "কোটিকে গুটীক"। এ পথে ধনী, দরিদ্র, মূর্খ, বিদ্বান, অত্যাচারী, দুরাচারী, জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে

কাহারো প্রবেশ ও অগ্রসরে কোন বাধা নাই। যাহার যতটুকু চলিতে ইচ্ছা বা সাধ্য চলুক, বাধা দিবার ক্ষমতা কাহারো নাই। এই মাশুলহীন রম্যরাজবর্ত্মের স্রষ্টা বাংলার শ্রীগৌরসুন্দর। প্রায় পাঁচশতবর্ষ পূর্বে সমস্যাসঙ্কুল অবস্থায় পদে পদে বাধা-পূর্ণ পথসমূহ ভাঙিয়া নিড়াইয়া সুকোমল সুখবর, ভীতিহীন বাধাশূন্য ভুবনমঙ্গল পথ রচনা করিয়া গিয়াছেন—প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ।[২০]

আমাদের যজ্ঞেশ্বর দে মহাশয় ঐ 'সুসুখম কর্তুমব্যয়ম" রাজবর্ত্মে প্রবেশ করিয়া ঐ পথের প্রভাবেই চলিতে লাগিলেন। কীর্তনকে লগ্ন জমাট করিতে হইলে শুধু কণ্ঠ ও যন্ত্রেই চলে না—ভাব চাই, ভাবের আনুষঙ্গিক দৃশ্যও প্রয়োজন। ইহার অধিকাংশই প্রধান গায়ক বা দলপতির উপর নির্ভর করে। কীর্তনে ক্রমবর্ধমান যশাধিকারী যজ্ঞেশ্বরের জামা-জুতা দূর হইল; সাদা কাপড় ও সাদা উত্তরীয় খণ্ড অঙ্গের ভূষণ হইল—ভবিষ্যৎ চারণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইল।

এই সময় এবং ইহার কিছু অগ্রপশ্চাতে বাঙ্‌লার কতিপয় শ্রেষ্ঠ কীর্তনের দল ক্রমাগত বরিশালে আসিয়াছে। বরিশাল জেলার লাখুটিয়ার রাসমেলা একদা বাঙ্‌লায় প্রসিদ্ধ ছিল। এই মেলায় প্রতি বৎসর বাঙ্‌লার শ্রেষ্ঠ এবং নূতন গানের দলের বায়না হইত। যাহারা লাখুটিয়ার মেলায় আসিত, তাহাদের এই জেলায় গান গাহিতে হইত। এই সব দলের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের লীলা-গায়ক নীলকণ্ঠ অধিকারী, শ্রীনিবাস অধিকারী, গোবিন্দ কীর্তনিয়া প্রভৃতি আসিয়াছিলেন। যজ্ঞেশ্বর এই সব দলের গান নিবিষ্ট চিত্তে শুনিতেন ও কল্পনায় ঐসব দলের মত ঢপ কীর্তনের দল করিবার চিত্র কল্পনায় আঁকিতেন ও বন্ধুবান্ধবদের তাহা ব্যক্ত করিতেন। শ্রীনিবাস অধিকারী, গোবিন্দ কীর্তনিয়ার মত শুধু দল করা নহে, বৃন্দাদূতীর অংশ অভিনয় করিবেন এবং দল করার

২০। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বাঙালী "ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছে বিশ্বভূপের ছায়া", আর "বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।" এই অপূর্ব রসচেতনার প্রভাবে একদিকে যেমন বাঙ্‌লাদেশে "কানুছাড়া গীত নাই", তেমনি "গৌর গীতিছাড়া কানুগীতি" নাই। রাধাকৃষ্ণের দৈবী মহিমা চৈতন্য প্রেমের ভাবাধিবাসনে প্রিয়ত্বের মর্যাদায় প্রাণরস ঘন হইয়া উঠিয়াছে। এক কথায় বলা চলে, চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব জীবনী ও পদ সাহিত্য "দেবতারে প্রিয় করি : প্রিয়েরে দেবতা" মধ্য দিয়া সার্থকতা লাভ করিয়াছে। অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন—"মহাপ্রভু কৃষ্ণলীলার চমৎকারিত্ব যেরূপভাবে আস্বাদন করিয়াছিলেন, এমন আর কেহ করেন নাই। বস্তুতঃ সেই নিখিল রস-মাধুরী-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নিজ রসমাধুর্য নিজেই আস্বাদন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারই অনুগত হইয়া রসাস্বাদ করিবার যে প্রতিজ্ঞা গায়ক ও ভক্তগণ করেন, তাহা তত্ত্বের দিক দিয়া ও রসের দিক দিয়া সর্বদা যোগ্য বলিয়া মনে হয়। তারপর কৃষ্ণলীলা গান করিতে হইলে চিত্তশুদ্ধি আবশ্যক। শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে স্মরণ করিলে হৃদয় নির্মল হয়।"

পরিণামে তিনি যে বাঙ্‌লার শ্রেষ্ঠ কীর্তনিয়া দলপতিরূপে প্রচুর ধন ঐশ্বর্যের অধিপতি হইবেন এবং মাঝে মাঝেই মহোৎসবে টাকা লুটাইবেন সে পর্যন্ত বলিতেও বাকী রাখিতেন না। আবার ঐ প্রকারের দল গঠনে নিজের যোগ্যতার অভাবটুকু পূরণের জন্য এদিকের সব ছাড়িয়া ছয় মাস কাল চাকর-রূপে উহার একদলে প্রবেশ করিয়া কাজ হাসিল করিয়া আসিবেন তাহাও বলিতেন। সেই বলিবার সময় দল করিতে শুধু ঐ ছয় মাস শিখিয়া আসার জন্য যে বিলম্ব তাহা ছাড়া আর কোন বাধা, বিলম্ব আছে মনে হইত না।

সর্বশেষে যিনি ঢপ্‌[২১] কীর্তনের দল লইয়া বরিশালে আসিয়াছিলেন, তিনি হইলেন পালং[২২]-এর প্রসিদ্ধ গোবিন্দ কীর্তনিয়া। ইনি বাঙ্‌লার বৈষ্ণব পদ-কর্তাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় কৃষ্ণকমল গোস্বামীর[২৩]রচিত 'নিমাই সন্ন্যাস", "রাই উন্মাদিনী", "স্বপ্ন বিলাস", "নৌকা বিলাস" প্রভৃতি পালা গাহিতেন। ওস্তাদী সুর-মাধুর্যে, ভাব-প্রকাশে, যোগ্যতায়, লগ্ন-শক্তিতে গোবিন্দ কীর্তনিয়া পদগায়কদের মধ্যে বাঙ্‌লায় ও বাঙ্‌লার বাহিরেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। গোস্বামী কৃষ্ণকমলের সাধন পথ-প্রদর্শক শক্তিমান মধুর লেখনী নিঃসৃত বাঙ্‌লা পদগুলি যাহা অধুনা মুদ্রিত পুস্তকে দৃষ্ট হইতেছে তাহা পুস্তকাপেক্ষা শতগুণে রসালরূপে অভিব্যক্তি দিয়াছিলেন ভাব-বিহ্বল গায়ক গোবিন্দ

২১। **ঢপ্‌কীর্তন :**—কীর্তনাশ্রয়ী পাঁচালী গানের এক বিশেষ রূপ হইতেছে ঢপ্‌কীর্তন। কীর্তনের মতই এর পালা বিভক্ত এবং কথা ও সুরের সহযোগিতায় গোটা কাহিনীর অনেকটাই নাট্যাকারে উপস্থিত করা হইত। মাঝে মাঝে গায়ক কথকতার মাধ্যমে গানের মর্মবিষয় সম্পর্কে শ্রোতাদের ইঙ্গিত দিত। ঢপ্‌কীর্তনের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ কবি এবং সুরকার ছিলেন 'মধুকান"। যশোহর জেলার উলুশিয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন মধুসূদন কিন্নর ওরফে মধুকান। তাঁহার জীবৎকাল ছিল ১২২০ থেকে ১২৭৫ সাল। মধুকানের রচনা ছিল অনুপ্রাস-বহুল ও ধ্বনি মাধুর্যে পরিপূর্ণ আর সেই সঙ্গে ছিল বাক্‌চাতুর্য।

২২। বরিশাল হইতে আড়িয়লখাঁর পথে মাদারীপুর হইয়া পালং নদী ও নরিয়া খাল দিয়া পদ্মার কূলে অবস্থিত ফরিদপুর জেলার তারপাশা পর্যন্ত দৈনিক স্টিমার যাতায়াত করে। মাদারীপুর হইতে তারপাশার পথে ফরিদপুর জেলার কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থান পড়ে। মাদারীপুর হইতে নয় ঘণ্টার রাস্তা—"**পালং**" একটি ছোটখাটো শহর হইয়া উঠিয়াছে। বাংলায় ভ্রমণ (১ম সং) অমিয় বসু।

২৩। **কৃষ্ণকমল গোস্বামী :**—ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কৃষ্ণযাত্রার প্রাচীন আদর্শের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় যাঁহারা চেষ্টা করেন—কৃষ্ণকমল গোস্বামী তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। অন্যান্যদের মধ্যে গোবিন্দ অধিকারী ও গোবিন্দের শিষ্য নীলকণ্ঠ অধিকারীর নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা যে কৃষ্ণ যাত্রা গাহিতেন, তাহা ঠিক কীর্তন নয়—"কীর্তন-ভাঙ্গা" গান। এইসব গানে কীর্তনের মত 'আখর' নাই। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিণীর সহিত বক্তৃতার অংশেও সুর থাকিত।

কীর্তনিয়া।[২৪] বৃদ্ধ কীর্তনিয়া যখন গানের মাঝখানে রাগিণী ধরিয়া—"ধ্বনি গোবিন্দ বলিতে চাহে উচ্চৈঃস্বরে মুখে নাহি সরে, কেবল গো গো করে"—বিভিন্ন স্বরে ঐ একটি মাত্র পদ দীর্ঘ সময় ধরিয়া বিভিন্ন অর্থ প্রকাশে বিভোর হইতেন, তখন উহা শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে বিভিন্ন ভাবের পুলক শিহরণের নব নব তরঙ্গ তুলিয়া তাহাদিগকে মুগ্ধ করিত। এ সম্বন্ধে গোস্বামী কর্তৃক কীর্তনিয়া গোবিন্দকে স্নেহাশীর্বাদের আখ্যায়িকা ও কৌতুকী ভাষার রসাল কথা তৎকালে বহুজন জ্ঞাত ছিল। দলসহ এই গোবিন্দ কীর্তনিয়া বরিশালে আসিয়াছিলেন খুব সম্ভব ১৮৯৮ খৃঃ কিংবা ১৩০৫ বা ১৩০৬ বঙ্গাব্দে। বরিশাল শহরকে তিনি গানে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, অনেকদিন অবধি পাড়ায় পাড়ায় তাঁহাকে গান গাহিতে হইয়াছে। এই সময় বড় বড় দলের গান শুনিবার খরচ কাহাকেও একক বহন করিতে হইত না। বিবাহ ও শ্রাদ্ধের প্রাচীন রীতি অনুসারে গান শুনিবার নিমন্ত্রণ পত্র যাঁহাদের নিকট যাইত তাঁহাদের প্রায় সকলেই কিছু কিছু দেওয়া অবশ্যই কর্তব্য মনে করিতেন। বর্তমানেও তথাকথিত অনগ্রসর সমাজে রয়ানী, রামায়ণ, কথকতা প্রভৃতিতে ঐ নিয়মের চিহ্ন আছে। আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতা, সুচিহ্নিত সমাজ গঠনের মৌলিক উপাদানকে অজ্ঞাতে ভাঙিয়া প্রতিনিয়ত স্বাতন্ত্র্যের গর্ব ঘোষণা করিতেছে, অথচ সমাজ রক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাও অস্বীকার করিতেছে না। মোহমুগ্ধ ভদ্রসমাজ জানে না যে, তাহারা শ্রাদ্ধে অথবা বিবাহে লৌকিকতা গ্রহণে অসমর্থ জানাইয়া যে দৈন্যজ্ঞাপন করিতেছে, উহা সমাজকে অস্বীকার করিয়া স্বাতন্ত্র্যের দাম্ভিকতাকেই রূঢ় গর্বিত ভাষায় প্রচার করিতেছে। প্রাচীন সমাজ তাহার প্রত্যেকটি চলনভঙ্গীতে স্মরণ করাইত পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা কাহারো

নদীয়া জেলার ভজনঘাটের নিবাসী কৃষ্ণকমল গোস্বামী তৎকালীন রুচিসম্পন্ন দর্শকদের মনোভাব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তাঁহার রচিত "বিচিত্র বিলাস" গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি নিজেই লিখিয়াছেন--"যদিও প্রচলিত অভিনয় অনায়াস সদৃশ কিন্তু তাহা সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিতান্ত বিরক্তিকর, কারণ অনভিজ্ঞ অভিনেতৃবর্গ সামান্য লোকের প্রীতিরহস্য সাধনের উদ্দেশ্যে প্রবন্ধগত প্রকৃতিভাব পরিত্যাগপূর্বক অসাময়িক অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ, নানাপ্রকার কদর্য ও নিতান্ত অবিধেয় বেশ বিন্যাস করিয়া থাকে।" কৃষ্ণকমলের যাত্রায় একদিকে যেমন ভক্তিমূলক গীতি সংলাপের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়, অপরদিকে তেমনি ছন্দ-অলঙ্কারসহ উচ্চাঙ্গের রাগ-রাগিণীর প্রাধান্যও লক্ষণীয়। তাঁহার "স্বপ্নবিলাসে"র গানগুলি এ সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

২৪। গোবিন্দ অধিকারী :—যাত্রায় প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় অন্যতম অধিকারী ছিলেন—গোবিন্দ অধিকারী। সম্ভবতঃ এই জন্যই বলা হইয়াছে—"It is to keep pace with

একার নহে, উহা সমাজের। সমাজমঙ্গলে উহাদের অস্তিত্ব। শিক্ষা-দীক্ষা, বিবাহ, রোগ, শোক, মৃত্যু, আনন্দ সকল কিছুর দায়িত্ব সমাজের। আত্মবিস্মৃত সমাজের মদোন্মত্ত দাম্ভিক বাণীর ধ্বনি-প্রতিধ্বনি আজ শোষণ বজ্রাস্ত্র নিক্ষেপের পথেই কুটুম্বিতার যোগ্যতা নির্ধারণ করিতেছে।

বলিতেছিলাম, গোবিন্দ কীর্তনিয়ার বৃহৎ বিশিষ্ট দলের গান শুনিতে বরিশালের পাড়ায় পাড়ায় কোন ব্যক্তি বিশেষকে আর্থিক ব্যয় বা কায়িক শ্রমে হয়রান হইতে হয় নাই, প্রয়োজন ছিল পাড়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমর্থন ও একজন উৎসাহী যুবক এবং স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের কিছু শ্রম ও চেষ্টা। আনন্দ উপভোগের জন্য অভিভাবকের বাক্স ভাঙিয়া বা পাঠার্থীর জলযোগের পয়সা দ্বারা সেদিন টিকিট কিনিয়া আনন্দ খরিদ করিতে হইত না। নির্বিশেষে জনসাধারণ বিনা পয়সায় নির্মল আনন্দ উপভোগ করিতে পারিত। শহরের সচ্ছল ব্যক্তিগণ স্বেচ্ছায় নিমন্ত্রণ কর্তার হাতে দু-এক টাকা করিয়া দিয়া যাইত, তাহাতেই সকল খরচ কুলান হইয়া যাইত।

যুবক যজ্ঞেশ্বর তথা কীর্তনিয়া যজ্ঞেশ্বর ঐ উৎসাহী যুবকদলে অধিকতররূপে এবার যোগ দিলেন, শহরে যতদিন গান হইল প্রায় সকল আসরেই যজ্ঞেশ্বর উপস্থিত থাকিতেন। নিজেদের পাড়ায়ও একাধিক পালা গীত হইল, তখন যজ্ঞেশ্বর কয়েকজন যুবক লইয়া সংগোপনে বিভিন্নস্থানে বসিয়া ঐ পালা লিখিয়া লইলেন। "রাই উন্মাদিনী" ও "নিমাই সন্ন্যাস" সম্পূর্ণভাবেই লেখা হইয়াছিল। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর পালাগুলি তখন মুদ্রিত হইয়াছিল কিনা জানি না, হইয়া থাকিলেও তাহা যজ্ঞেশ্বরের জানা ছিল না। সঙ্গীসহ সকলের লেখা একত্র করিয়া দুইটি পালা সংগৃহীত হইল; গানের আখড়াই আরম্ভ হইল। যজ্ঞেশ্বর একক দাঁড়াইয়া পালা গাহিতে অভ্যস্ত হইলেন। ক্রমে এই বিনা

these Govinda had to introduce new style." (Hemendra Nath Das Gupta "Indian Stage"

তৎকালীন যাত্রায় যে অশ্লীল কু-রুচিবিশিষ্ট গান গাওয়া হইত, গোবিন্দ অধিকারীর গান সেইরূপ ছিল না। তাঁহার 'মাথুর' পালার বিখ্যাত গান—"ব্রজের কুশল কব কি ওব ভূপতি। দেখলাম তোর বিরহে মূর্চ্ছাগত শ্রীমতী." ইত্যাদি। তখন শ্রোতার ভাবাবেশ এমন বিভোর হইয়া পড়িতেন যে, তাহাদের মানস চক্ষে ভাসিয়া উঠিত "নন্দপু চন্দ্র বিনা, বৃন্দাবন" কিভাবে অন্ধকার হইয়াছে। তাঁহার যাত্রা, বিশেষ করিয়া "নৌকা বিলাস" বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। আসরে গোবিন্দ অধিকারী নিজেই দূতী সাজিতেন। তাঁহার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন তাঁহার শিষ্য—নীলকণ্ঠ অধিকারী এবং কাটোয়ার পীতাম্বর অধিকারী।

পয়সার দলের 'রাই উন্মাদিনী' ও 'নিমাই সন্ন্যাস' গানের জন্য শহরে নিমন্ত্রণ জুটিতে লাগিল; নগ্নপদ, বহির্বাস, শ্বেত উত্তরীয় দ্বারা পৃষ্ঠ ও বক্ষ-আবৃত, বলিষ্ঠ বাহুযুগল অনাবৃত, ঘন কোঁকড়ান চুল প্রায় অর্ধপৃষ্ঠ লম্বিত, গলায় তুলসীর মালায় শোভিত যুবক কীর্তনিয়া যজ্ঞেশ্বর আর এক দফা বহুজন পরিচিত ও প্রিয় হইলেন। সমস্ত দিন ও রাত্রির কিছু সময় অবধি মুদি দোকানদারী, তাহার পর রাত্রি একটা দুইটা অবধি কীর্তন, আহার তাহারও পরে। এইভাবে 'যজ্ঞেশ্বরে'র তথা "কীর্তনিয়া মুকুন্দদাসের" সাধন পর্ব শুরু হইল।

এই সাধনভূমিতে সভ্যতার শাসন-নিয়ম ও সভ্যতার কৃত্রিম শৃঙ্খল না থাকায় গীত রচনায় ও সুর সাধনায় যজ্ঞেশ্বর যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন; স্বাধীনতার মরণ-যজ্ঞে তাহাই ছিল সাধন-সংগীত ও জীবন-সংগীত। মূলতঃ যজ্ঞেশ্বরের বৈষ্ণববেশে কীর্তন গানের আগ্রহই তাঁহাকে "কীর্তনীয়া মুকুন্দদাসে" পরিণত করে। বৈষ্ণব ভাবেরজন্যই যেন বৈষ্ণববেশ, প্রারম্ভে কীর্তন জমাইতে যেন এই বেশেরই প্রয়োজন। কিন্তু যজ্ঞেশ্বরের ইহা কি শুধু লোক ঠকানো বা দেখানো সাজ, না আরও কিছু ছিল; ছিল বলিয়াই প্রমাণিত হয়। বৈষ্ণব ভাবে, বৈষ্ণব পরিবেশে তাহার চপলতা যেন কিছুটা শান্ত, কিছুটা আত্মস্থ। তাঁহার অশান্ত চপলতাকে সঙ্গীতাভিমুখী করিয়া তোলেন অবধূত রামানন্দ। মুকুন্দদাসের জীবনে ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা। আর এই ঘটনাই অর্থাৎ বৈষ্ণবধর্ম প্রবণতাই তাঁহাকে কালী সাধক করিয়া তোলে। এই শাক্ত বৈষ্ণবের মিলনের ফলেই যজ্ঞেশ্বর "মুকুন্দদাসে" পরিণত হন।

পঞ্চম অধ্যায়

সাধনার উন্মেষকাল

"উঠেছে আদেশ
বন্দরের কাল হ'লো শেষ
যাত্রা কর যাত্রা কর যাত্রীদল।"[২৫]

স্বপ্ন ও সাধনা। মানুষ কল্পনাপ্রবণ। সে তাহার অবচেতন মনের ক্রিয়া প্রাবল্যে কত স্বপ্ন দেখে ভবিষ্যতে রূপায়িত করিবার জন্য। যজ্ঞেশ্বরের জীবনে এমনি কত স্বপ্ন ছিল, আর তাহা রূপায়িত করিবার জন্য তাঁহার সাধনার অন্ত ছিল না। যে রুদ্ধ প্রেরণা বিকাশের পথ খুঁজিতে স্থানে স্থানে বাধা পাইয়া আকুলি বিকুলি করিতেছিল তাহা রাস্তায় দুষ্টামির পথে, খেলার মাঠে, চাকরির প্রলোভনে থামে না। কীর্তনের আসরে আসিয়া তাহা যেন শেষ হইয়াছে, শান্ত হইয়াছে। ভাবের ঘরে চুরি করিবার জন্য নয়, ভঙ্গিমায় চোখ ভুলাইবার জন্য নয়, কার্যোদ্ধারের জন্য নয়—মনে-প্রাণে "কীর্তনিয়া" হইবার জন্য সাধনা শুরু হইল। সাধনার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নহে—তাহা দুর্গম ও কষ্টসাধ্য। তথাপি দুর্জয় সাহস, দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষাই যজ্ঞেশ্বরকে "কীতনিয়ায়" পরিণত করিল। কীর্তন গায়ক যুবক যজ্ঞেশ্বরের "বাবুবেশ" কীতনের পরিবেশ পরিবর্তন হইল। কীতনও বেশ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শুধু সুরলয়ের উৎকর্ষেই সময় না কাটাইয়া কীর্তন সম্বন্ধীয়[২৬] তত্ত্বগতের জন্য মুকুন্দদাসের আগ্রহ আসিল।

২৫। বলাকা—৩৭ সংখ্যক কবিতা।

২৬। প্রাচীন কাল হইতে ভগবানের নাম, গুণ লীলা উচ্চৈঃস্বরে গাওয়া হইত। কীর্তনের এই প্রথা ভারতের সর্বত্র প্রচলিত ছিল। কিন্তু বাঙ্গলায় কীর্তন বলিতে বুঝি কয়েকজন মিলিয়া নির্দিষ্ট সুর তাল লয়ে গীত এক স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে শ্রীভগবানের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক গান। শ্রীপাদরূপ গোস্বামী ভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে বলিয়াছেন—শ্রীভগবানের "নামলীলাগুণাদীনাং উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্তনম্"। বলা হয় সত্যযুগে ধ্যানে, ত্রেতায় যজ্ঞে, দ্বাপরে পরিচর্যায় এবং কলিতে হরিকীর্তনে বিষ্ণুর আরাধনা করাই বিধেয়। মহাপ্রভু সংকীর্তনের প্রবর্তক ও প্রচারক বলিয়া তাঁহাকে "সংকীর্তনৈকপিতরৌ" বলা হয় এবং "গৌরচন্দ্রিকা" গানের পর লীলাকীর্তন গানের প্রথা প্রচলিত হয়। কীর্তনে পালা গান গাহিয়া মিলন গাহিতে হয়। লীলাকীর্তন বা রসকীর্তন চৌষট্টি রসের গান বলিয়া বিখ্যাত। কীর্তনের পালা গানে একজন কবির রচিত পদ লইয়াই পালা

তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত[২৭] ও অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রিয়স্থানগুলি কণ্ঠস্থ হইতেছিল। কীর্তনের মধ্যে, আখর[২৮] দিবার সময় সুরে ঐ পয়ার আবৃত্তি ভক্ত মনোরঞ্জনের অধিকতর উপাদান যোগাইতে লাগিল। শুধু কীর্তন, পাঠ লইয়াই আর চলে না; সাধন পন্থা অবগত হইবার জন্যও আগ্রহ হইল, কেন না অগ্রসর হইতে হইবে। নিমন্ত্রণের কীর্তনে নৈশ জাগরণপেক্ষা সাধুসজ্জনের খোঁজে, গভীর নিশীথে শ্মশানক্ষেত্রে কীর্তন আলোচনা অধিকতর মধুরতর বোধ করিতে লাগিলেন। এই সময় প্রায় সমবয়স্ক কালীপ্রসন্ন কর নামক সরকারী চাকুরি ত্যাগী জনৈক যুবক ভক্তের সঙ্গে প্রীতি জন্মিল। উভয় "কানিয়া" ও "যজ্ঞা" সম্বোধনে স্ব স্ব গাঢ় সখ্যের পরিচয় দিতেন। কালীপ্রসন্ন কর গায়ক ছিলেন না। কিন্তু একটি কীতনের বা ভক্তদলের নায়ক ছিলেন। এই দল প্রায়শঃ দীর্ঘ রাত্রিব্যাপী শুধু নাম কীতন করিতেন। যজ্ঞেশ্বর ক্রমশঃ এই দলেই অধিকতর মিশিতে লাগিলেন। ভক্ত

সাজানো হয় না। কয়েকজন বিভিন্ন পদকর্তার একই রসের পদ লইয়া এক একটি পালা গঠিত হইয়াছে এবং বিশেষ অবস্থায় ও বিশেষ নিয়মে এই পালা গানগুলি হয়, যথা—"ঝুলন", "নন্দোৎসব", "দোল", "ফুলদোল" প্রভৃতি তত্তৎ পর্বদিন ভিন্ন গাহিবার উপায় নাই। দিনে রাস, রাত্রিতে গোষ্ঠগান নিষিদ্ধ। উত্তর গোষ্ঠ অপরাহ্নেই গাহিতে হইবে। কুঞ্জভঙ্গ ও খণ্ডিতা সকাল ভিন্ন গাওয়া চলিবে না। মান-কলহান্তরিতা বৈকালের গান নহে। এই সমস্ত রাগ-রাগিণী সংযোজনে যেমন বিষয়বস্তু ও ভাবরসের দিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে, তেমনি সময়েরও বিচার করা হইয়াছে। বাঙলাদেশের বর্তমান কীর্তনিয়ারা (যথা—রথীন ঘোষ, নন্দকিশোর, রুক্মিণীরঞ্জন গোস্বামী, হরিদাস কর, রাধারমন দাস বাবাজী, রথেন পাঠক প্রভৃতি) এইসব নিয়ম মানিয়া অদ্যাবধি কীর্তনের আসর জমাইয়া রাখিয়াছেন।

২৭। শ্রীচৈতন্যজীবন চরিতগুলির মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। কৃষ্ণদাস যখন জীবনের সায়াহ্নে উপস্থিত হন তখন বৃন্দাবনের বৈষ্ণবগণ এই নির্মল, নিরভিমানী ও জ্ঞানী বৃদ্ধকে চৈতন্যের জীবনী লিখিতে অনুরোধ করেন। সাত বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের অন্তলীলা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সবদিক হইতেই এই গ্রন্থখানি বৈষ্ণবদিগের স্পর্শমণি ও বাঙলা সাহিত্যে বিস্ময় হইয়া থাকিবে। এই গ্রন্থখানি কেবলমাত্র জীবনচরিত নহে—ইহার মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের দার্শনিক ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর ষোড়শ শতাব্দীতে দেশের অবস্থা ও তৎকালীন লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষার কাহিনীও বর্ণিত হইয়াছে।

২৮। **আখর**:—"আখর"—হইতেছে কীর্তন গানের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য এবং কীর্তনের আসরে তাহা শুনিয়া বুঝিতে হয়। কীর্তনিয়ারা গান গাহিতে গাহিতে রসমাধুর্যের জন্য পদের মধ্যে "আখর" দিয়া থাকেন, ফলে শ্রোতাগণ পদের রহস্য ও রস—দুই-ই উপলব্ধি করিতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন—"কীর্তনের আখর কথার তান।"

কালীপ্রসন্ন করের গুরু ছিলেন ভগবানদাস নামক জনৈক কাষ্ঠ-বিক্রেতা। কালীপ্রসন্ন করের সহিত তদীয় গুরুর কাষ্ঠের দোকানের পশ্চাতে নিভৃতে উপবিষ্ট সেই বৃদ্ধ গুরুর বৈঠকে যজ্ঞেশ্বর রাত্রিতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। সেখানে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব আলোচনা চলিত। সেখানে সঙ্গীত বা উচ্চকণ্ঠের কথাবার্তাও হইত না। অনুচ্চকণ্ঠের এই আলোচনা ও কথা "কথাকীর্তন" নামে অভিহিত। বৃদ্ধ ভগবানদাস মহাশয়ের লেখাপড়া জানা ছিল না। কিন্তু স্বীয় সাধন পন্থায় শক্তিমান সাধক বলিয়া একদল লোকের বিশ্বাস ছিল। তিনি সহজভাবে কতকগুলি কথা বলিতেন; এখানে তাহার একটি নমুনা দিতেছি —

"ওরে হরি হরি কর, আরো হরি আছে;
এই হরি নিয়া রাইখ্যা দেও সেই হরির পাছে।"

ইহার অর্থ - হরিনাম করো, সংকীর্তন করো, ইহাতেই হইবে না; আরো কিছু করিতে হইবে, তাহা হইল লোকচক্ষুর অন্তরালে ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি কতিপয় গুহ্য সাধনা। যজ্ঞেশ্বরের গ্রহণোন্মুখ উদ্যমশীল চিত্ত সাধনতত্ত্ব জ্ঞাত হইবার জন্য ব্যাকুল হইল। তিনি ভগবানদাসের নিকটেই মন্ত্র গ্রহণ করিবার চিন্তা করিতেছিলেন।

১৩০৭ বঙ্গাব্দ। পূজার ছুটি। সে সময় লোকে এদিকে ওদিকে যাওয়ায় শহর প্রায় জনশূন্য হইত। লোকের ছুটির সাথে সাথে কর্মব্যস্ত বরিশাল শহরেরও যেন ছুটি। লোকবিরল রুদ্ধদ্বার গৃহগুলি শহরের উগ্রমুখরতাকে কয়েকদিনের জন্য যেন অবশিষ্ট স্বল্পলোকের কাছে একটা কান জুড়ানো নিস্তব্ধতা আনিয়া দিত। দোকান-পসারে ক্রয়-বিক্রয় বিশেষ থাকিত না। পাহারার প্রয়োজনেই স্থায়ী দোকানগুলির ঝাঁপ মাঝে মাঝে উত্তোলিত থাকিত। বেলা দ্বিপ্রহর অতীত প্রায়—ক্রেতাশূন্য দোকান, গদীতে রাজেন্দ্র সেন প্রমুখ কয়েকটি সমবয়স্ক যুবক বন্ধু লইয়া, নবানুরাগস্পর্শ রঞ্জিত আমাদের যজ্ঞেশ্বর দে মহাশয় "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" পাঠ ও মাঝে মাঝে গান করিতেছেন এবং আলোচনা চালাইতেছেন। স্নানাহারের তাগিদ, জমাটভাবকে উপসংহারে পৌছাইয়া সকলে উঠিবার আয়োজন করিতেছেন। এমন সময় যৌবনপ্রান্তে উপস্থিত ব্রাহ্মণবেশী জনৈক নাতিদীর্ঘ সুপুরুষ ঐ দোকান ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহার মুখে অনুচ্চস্বরে দ্রুত অবিশ্রাম "হরিবোল"[২৯] শব্দ উচ্চারিত হইতেছে। আবেশভরা সে মূর্তিখানি গৃহমধ্যে দুই তিন পদ মাত্র অগ্রসর হইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া ঐ "হরিবোল" শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। দোকান-গদীতে কয়েকঘণ্টা অবধি যে ভাবের অনুশীলন চলিতেছিল, অকস্মাৎ সেই ভাবানুগ একটি মূর্তির আবির্ভাব দৈব প্রেরণার মত উপলব্ধিকে স্পর্শ করিয়া সকলকে কয়েক মিনিট স্তব্ধ বিমূঢ়ের মত করিয়া রাখিল। তৎপর গদীতে আসন গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করিলেন, কিন্তু অবিশ্রাম দ্রুত অনুচ্চ "হরিবোল" ধ্বনি চলিতে লাগিল। বেলা এক ঘটিকা অতীত হইলে রাজেন্দ্র সেন ও যজ্ঞেশ্বর ব্যতীত আর সকলে চলিয়া গেল। তখন একটু বাধা দিয়া আগন্তুকের পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য প্রভৃতি পরম শ্রদ্ধার সহিত উভয় বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে যাহা জ্ঞাত হইলেন, তাহার মর্ম এই যে, আগন্তুকের নির্দিষ্ট কোন "আখড়া" বা আশ্রম নাই। মুখে অবিরত নামোচ্চারণ সম্বল লইয়া দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। যদি কেহ যাচিয়া আহার বা বিশ্রামের স্থান দেন তবে সাময়িক সেইটুকু গ্রহণ করেন। সঙ্গে একটি পয়সাও নাই। টাকা-পয়সা গ্রহণ করেন না। অবধূত, রামানন্দ, হরিবোলানন্দ গোস্বামী নামে পরিচিত—চৈতন্য শাখা পরিবার ইত্যাদি।

পূজার ছুটি। দোকান সম্মুখস্থ একটা কোঠা বাড়ির মালিক দালানের তালা-চাবি যজ্ঞেশ্বরের হাতে দিয়া একটু নজর রাখিবার ভার দিয়া দেশে গিয়াছেন। সেই কোঠা ও পাশের ঘরের দ্বার মুক্ত হইল। দোকানঘরের চাল-ডাল মিশাইয়া খিচুড়ি পাক হইল। অপরাহ্নে আগন্তুক 'গোঁসাইজীর সেবা হইল, বন্ধুদ্বয়ও প্রসাদ পাইলেন। সন্ধ্যার পর ঐ দালানে যজ্ঞেশ্বরের কতিপয় বন্ধু আগমন

২৯। "হরিবোল" :—হরির বোল বা হরির কথা, অর্থাৎ হরির নাম। নাম ও নামী অভেদ। তাই শ্রীহরির স্মরণ-মনন-পূজন করিলে তিনি বৈকুণ্ঠ হইতে 'ইন্দ্রপ্রস্থসম' এই ধুলার ধরণীতে নামিয়া আসিবেন। তাই কলিযুগে "হরিনাম"ই সার—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"

শ্রীমদ্ভাগবতে নববিধা ভক্তির কথা বলা হইয়াছে, যথা—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন। এই নববিধা ভক্তির মধ্যে কলিযুগে কীর্তনই হইতেছে—'সর্বসাধ্যসার'। তাই "গোরা-পারিষদ সঙ্গে সংকীর্তন রস-রঙ্গে" কীর্তনের বর্ণনায় চৈতন্যভাগবতকার যাহা বলিয়াছেন তাহাতেই "হরিবোল"-এর তাৎপর্য নিহিত আছে—

"হরিবোল হরিবোল হরি বল ভাই
ইহা বই আর কিছু শুনিতে না পাই।"

করিলে রুদ্ধদ্বারে খোল-করতালযোগে প্রায় সমস্ত রাত্রি উদ্দণ্ড নৃত্যসহকারে কীর্তন চলিল—শুধু "হরিবোল" এই একমাত্র পদের অবিশ্রাম ধ্বনি। দিবসে নামমাহাত্ম্য প্রধান বৈষ্ণব গ্রন্থ পাঠ, আস্বাদন, সংক্ষেপ পক্ব খিচুড়ি ভক্ষণ, অনুচ্চস্বরে "হরিবোল" উচ্চারণ, রাত্রে উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্তন। সপ্তাহ অতীত হইতে চলিল ; আগন্তুক গোঁসাইজী অন্যত্র রওনা হওয়ার জন্য ব্যস্ত হইলেন। শ্যামাপূজার গভীর নিশীথে যজ্ঞেশ্বর ও রাজেন্দ্র সেন দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। দীক্ষাদাতা হরিবোল গোঁসাই যজ্ঞেশ্বরের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া শুনাইয়া দিলেন—আজ হইতে তোমার নাম হইল "মুকুন্দদাস"।

দীক্ষা মালা ও নবনাম গ্রহণ এবং আনুষঙ্গিক তত্ত্বের আদান-প্রদানে সে বিনিদ্র দীপালির রাত্রি অবসান হইল। অতি প্রত্যূষে রামানন্দ ঠাকুর আবার সেই নিরুদ্দেশ যাত্রার আয়োজন করিলেন। নব-দীক্ষিত শিষ্য নূতন উত্তরীয় বহির্বাসে গুরুকে সাজাইলেন। পরিত্যক্ত দুই বস্ত্র খণ্ড সহিত কিছু পাথেয় পুঁটলি বাঁধিয়া সঙ্গে দিবার চেষ্টায় শিষ্য ব্যর্থ হইলেন। পশ্চিমাভিমুখী রাস্তা ধরিয়া নিঃসম্বল গুরু তাঁহার সেই অপূর্ব ভঙ্গীর "হরিবোল"উচ্চারণের শ্রেষ্ঠ সম্বল লইয়া নিরুদ্দেশ যাত্রা করিলেন, শিষ্য মুকুন্দ গুরুর পশ্চাতে শহর ছাড়িয়া পল্লীর রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছিলেন। ইতিমধ্যে একাধিকবার ইঙ্গিতে শিষ্যকে প্রত্যাবর্তন করিতে বলিয়াছিলেন ; এইবার দাঁড়াইয়া দেহস্পর্শ করতঃ ফিরিতে বলিলেন। ব্যথিত চিত্তে শিষ্য পদ বন্দনা করিয়া আবার সাক্ষাৎ ও পত্র আদান-প্রদানের একটা ঠিকানার জন্য আবদার করিলেন, গুরুদেব পূর্ববৎ কিছু বলার অক্ষমতা জানাইয়া বিদায় বাণী শুনাইলেন—"যাঁহার ইচ্ছায় দেখা হইয়াছে, প্রয়োজন হইলে তিনিই আবার সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করিবেন, এখন ঘরে যাও।" এই বলিয়া শিষ্যের মস্তকে পুনরায় স্নেহের হস্ত স্পর্শ দিয়া দ্রুতবেগে তেমনি "হরিবোল" বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন। নবানুরাগের বিরহ ব্যথা বুকে লইয়া শিষ্য যতক্ষণ দৃষ্টির আড়াল না হইলেন ততক্ষণ দাঁড়াইয়া তাহার পর ভগ্নহৃদয়ে ধীরে ধীরে দোকানে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

পূজার ছুটি ফুরাইয়াছে। পূর্ববৎ দোকানদারী ও নিশাযোগে বিভিন্ন স্থানে কীর্তন চলিতে লাগিল। এবার যজ্ঞেশ্বরের বন্ধুবর্গ ও ক্রেতাগণ কিছু নূতনত্ব দেখিতে লাগিলেন। দোকানদারী করিতেছেন, রাস্তায় চলিতেছেন, লোকের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলিতেছেন, কিন্তু কথা সমাপ্ত হইলে রামানন্দ গোঁসাইর অনুকরণে তেমনি অনুচ্চকণ্ঠে "হরিবোল" জপ করিতেছেন। রাস্তায় চলিবার কালে ও সন্ধ্যার পরে উত্তরীয় অন্তরালে গলায় ঝুলান একটি মালার

থলিয়ায় তুলসীর মালা ঘুরাইয়া নির্দিষ্ট সংখ্যক জপ চলিতেছে। দোকানে একটি একতারা কানের কাছে লইয়া গুন্‌গুন্ স্বরে ভিতরের-বাহিরের সুর মিলাইবার চেষ্টা হইতেছে। মাঝে মাঝে দোকানঘরে কলার পাতায় মুড়ি, ঘৃত, চিনি মাখিয়া ভোগ লাগান হইত। আর একটি খেয়াল বহুলোকের পক্ষে উপদ্রবের মত মনে হইতেছিল। ছোটবড় সকলের পায়ের ধূলি লওয়ার চেষ্টা। কখনো উপবিষ্ট ব্যক্তির সহিত কথা হইতেছে, তন্মধ্যে স্থূলাগ্র একখানা যষ্টির অগ্রভাগ অন্যমনস্ক উপবিষ্টের পায়ে ঠেকাইয়া সেই যষ্টি স্পর্শ অংশটুকু জিহ্বায় স্পর্শ করাইলেন। পূর্বাপেক্ষা এই মাত্রা চড়ার বৈষ্ণবতা কাহাকেও অধিকতর আকৃষ্ট করিল, কেহ কেহ উপহাসের অধিক সুযোগ পাইল, অনেকে যজ্ঞার মাথা খারাপ হইয়াছে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। যজ্ঞেশ্বর নিজে বিশেষ না বলিলেও বন্ধুবান্ধব মহল ও ভক্তসমাজ দীক্ষা গ্রহণের সংবাদ শুনিল। কিন্তু "মুকুন্দ" নামের সংবাদ কেহই শুনিল না। দুই-একজন শুনিলেও ঐ নামের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ না করিয়া বিস্মৃত হইয়া গেল।

শ্যামাপূজা দীক্ষা গ্রহণান্তে চারিমাস অতীত হইয়া গিয়াছে। ভক্ত কালীপ্রসন্ন করের বাড়িতে ছোট একটি মহোৎসবে সাধুসজ্জন কতক নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, যজ্ঞেশ্বর কীর্তন করিবেন। সন্ধ্যার পরে নিমন্ত্রিত ভক্তগণ ক্রমে সমবেত হইতেছেন; প্রধান গায়ক যজ্ঞেশ্বর আসিয়া পৌঁছিতেছেন না। একজন তাঁহাকে তাড়াতাড়ি আনিবার জন্য গেলেন; অপরেরা গৌরচন্দ্রিকা বা আবাহন সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। যিনি যজ্ঞেশ্বরকে আনিতে গিয়াছিলেন তিনি দোকানে উপস্থিত হইয়া দেখেন, রুদ্ধপ্রায় দোকানঘরে একটি স্তিমিত আলোকের সম্মুখে একতারার বংশদণ্ডটি কানে ঠেকাইয়া ডান হাতে কি লিখিতেছেন। তাগিদদার দর্শনে ব্যস্ততার সহিত কাগজখানা আর একবার দেখিয়া দোকান বন্ধ করিয়া বাহির হইলেন। পথে সেই একতারা কানে ঠেকাইয়া সুর জমান চলিতেছিল। আসরে উপস্থিত মাত্র সমাগত সকলে উল্লাসের সহিত অভ্যর্থনা জানাইতেই প্রতীক্ষারত সাজান আসরে উপবেশন না করিয়াই একতারা হস্তে যজ্ঞেশ্বর গান ধরিলেন—

"কৃষ্ণ নাম বড়ই মধুর
যে লয় সে বড়ই চতুর।
নামের আছে এমনি শক্তি
এই নামাভাষে হয়রে মুক্তি

যে লয় নাম করে ভক্তি
হয়রে তার মায়ামোহ্ দূর
(আমার) এই কৃষ্ণনামের মহিমা
সদা শিব তার আছে নিশানা।
শিব ত্যজিয়ে কৈলাস বাসনা
শ্মশানে নামেতে বিভোর।
এই কৃষ্ণনামের মাধুরী
আমি যাই বলিহারী,
এ মাধুরী জানে কেবল ব্রজনাগরী
যাদের প্রাণে যুগল কিশোর
গোঁসাঞ রামানন্দের বাণী,
শোন মুকুন্দ তোরে বলি
তুই পেয়ে এমন সাধের যোগী
হরে কৃষ্ণ ভজলি নারে মূঢ়।"

দোকানে, পথে যে জমাট সুর, ভাবে যোজিত পদকেতন গুন্‌গুন্‌ স্বরে নিজের ভিতর রুদ্ধ আলোড়নে আঘাত করিতেছিল—স্থানকাল পাত্রানুকূল নয় হওয়ায় তাঁহার বিকাশকে এক অভাবনীয় রূপদান করিয়াছিল। সজ্জিত আসরে প্রবেশমাত্র সেই অবস্থায়ই দাঁড়াইয়া তিনি নিজস্ব মৌলিক সুর ও প্রকাশভঙ্গীর দ্বারা বিদ্যুতের মত সমাগত ভক্ত-হৃদয়ে উত্তাল সম্মোহনে ব্যাকুল করিয়া ফেলিলেন। উল্লিখিত পদ কয়েকটি শেষ করিতে ঐ দণ্ডায়িত অবস্থায় এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল, শ্রোতা ভক্তগণের অনেকের অবস্থাই বেহাল। ভাবাবেগে কেহ মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া অন্তরের তরঙ্গাভিঘাতে হস্ত পদ, মস্তককে বিভিন্নরূপে আন্দোলিত করিয়া সর্বশক্তি প্রয়োগে অস্বাভাবিক ধ্বনি নির্গত করিতেছিল। উহা উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগকে বহির্গমনের একটু পথ দিয়া সামাল দিবার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া পুনরায় বহাইল। এখন আর শ্রোতা নাই, প্রত্যেকেই গায়ক। অভিব্যক্ত ধরনের সামঞ্জস্য নাই, কিন্তু লয় হারায় না—বেহাল কিন্তু বেতাল হয় না। ভাবাতিশয্য গৃহের অভ্যন্তরে সামাল হইতেছে না দেখিয়া মূল গায়ক একতারাটি অপরের হস্তে দিয়া মৃদঙ্গ স্কন্ধে লইয়া চাটি দিলেন—সমগ্র আসরটি দণ্ডায়মান হইল। গায়ক বাদক উভয় গুণেই গুণী। যজ্ঞেশ্বর মৃদঙ্গ স্কন্ধে দু'এক পা করিয়া পশ্চাতে সরিয়া প্রাঙ্গণে নামিলেন—জাদুমন্ত্রে সম্মোহিতের

ন্যায় সমগ্র আসরটি উন্মুক্ত চত্বরে নামিতেই দূরে অবস্থিত মহিলা শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহাদের যোগজ্ঞাপক তুমুল উলুধ্বনি দিতেই আবার ভাবরাজ্যের তুফান তুমুলবেগ ধারণ করিল। পার্শ্বদেশ হইতে কেহ কেহ গায়কগণের মস্তকে পুষ্প নিক্ষেপ করিতেছিলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত, শহর নিস্তব্ধ। রাস্তা হইতে দূরে অবস্থিত ঘন কলাগাছ ও জঙ্গলবেষ্টিত "কায়েত"দের পর্ণকুটির প্রাঙ্গণে কতিপয় শিক্ষা-সভ্যতার প্রতিষ্ঠা বর্জিত লোকের এই মাতলামিসদৃশ নৃত্যগীতের কলরোল, সভ্যসমাজের আড়ালে রাখিবার ব্যবস্থাই ছিল। কিন্তু অকস্মাৎ ঐ দিনের কীর্তন মধ্যে দেখা গেল অন্ধকার কণ্টাকাকীর্ণ জঙ্গল ভেদ করিয়া কতিপয় লোক উপস্থিত হইয়াছেন! তন্মধ্যে ছিলেন ভাববিহ্বল, সেবাব্রতী পণ্ডিত কালী উপাসক বিদ্যাবিনোদ মহাশয়! উন্মুক্ত গাত্রে, নগ্নপদে নৃত্য করিতে করিতে তিনি ঐ কীর্তন চক্রে প্রবেশ করিলেন। আবার উচ্ছ্বাস তুমুল বেগ ধারণ করিল। শহরের সর্বজনমান্য পণ্ডিত ভক্তের ভাববিহ্বল এই যোগদান যেন এই দিনের কীর্তনানন্দকে সকলের প্রাণে বিভিন্ন যোগাযোগে এক মধুরতম গৌরবের ছাপে অঙ্কিত করিয়া রাখিল। রাত্রি দুই ঘটিকার পর কীর্তন থামিল। কয়েকদিনব্যাপী ভক্তগণ মধ্যে এই গানের পদ ও সুর রহিয়া রহিয়া জাগ্রত হইতেছিল। অভিনব ধরনের সহজ সুরে গীত এই গান অনতিকাল মধ্যে আশাতীতরূপে বহুল প্রচারিত হইল। বৈরাগী বৈষ্ণবেরা খমক্, গোপীযন্ত্র সহকারে দ্বারে দ্বারে গান গাহিয়া ভিক্ষা করিত, কিন্তু ইহার রচয়িতা কে, রামানন্দ-মুকুন্দই বা কে তাহা বহুদিন যাবৎ অজ্ঞাতই রহিল। ১৩০৮ বঙ্গাব্দের বসন্ত ঋতুতে মুদি দোকানে বসিয়া এই যে গান রচিত হইল—**"কৃষ্ণনাম বড়ই মধুর, যে লয় সে বড়ই চতুর" ইত্যাদি, উহাই যজ্ঞেশ্বর রচিত প্রথম সঙ্গীত। উহাই মুকুন্দ নাম প্রচারের সর্বপ্রথম গোপনাভিব্যক্তি।** প্রথম রচিত প্রথম দিনের এই সঙ্গীত যে সমারোহে গৃহীত হইয়াছিল, মনে হয় অমর সঙ্গীত রচয়িতা ও গায়ক মুকুন্দের ভবিষ্যৎ বিরাট বিজয়ের উহা অভিষেকী "বিদ্যুৎবাহী আকাশবাণী"।

প্রথম রচিত যে গানটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেছি তাহার কয়েক ছত্র পাঠ করিলে উহার ছেদ, মিল ও ভাবের এমন কোন বিশেষত্ব পাওয়া যাইবে না যাহার উল্লেখ করিয়া একটা গৌরব ঘোষণার সূচনা করিতে পারি। যে নব-রচিত গানটি আসরে গাওয়া হইয়াছিল, রচয়িতা সে আসরের পুরাতন গায়ক, শ্রোতা ও সহগায়কগণ প্রত্যেকেই অল্পাধিক ভাবপ্রবণ এবং

সাধারণ লোকের পর্যায়ভুক্ত। ভাব, ছন্দ বা মিলের বিচার করিয়া রসাস্বাদনের পটুত্ব তাহাদের ছিল না বলিতে পারি, কিন্তু তাহারা স্ব স্ব সাধনাকুল পদ শ্রুত হইলে তাহাকে তড়িৎ গড়িতে যথোচিতরূপে সর্বদেহ ও মনপ্রাণ দিয়া গ্রহণের যোগ্যতা বিশেষভাবেই রাখিত। এতদিন যে গতানুগতিক চলতি কীর্তন গাহিয়া যজ্ঞেশ্বর এই ভক্তদের প্রিয় গায়ক হইয়াছিলেন, সেই শ্রোতা ভক্তদের পরিচিত ভাবকে আজিকার গানে একটা সহজবোধ্য ভাষা, সুরের একটা চমকপ্রদ, অভিনবত্ব ও তৎ গাইত গায়কের সহজাত প্রাণস্পর্শী প্রকাশভঙ্গী মিলিয়া ভক্তদের ঐ আসরকে পূর্বাপেক্ষা শতগুণে বিহ্বল করিতে সক্ষম হইয়াছিল। জটিল-কুটিল ঘোর-প্যাচের বাহিরে প্রত্যক্ষ ও সমসাময়িক শব্দ যোজনায় প্রথম সঙ্গীত রূপায়িত করার সহিত সুর ও প্রকাশভঙ্গীর যে চমকপ্রদ প্রাণস্পর্শী শক্তি ভাবীকালে অভিনয় ও সঙ্গীতে যজ্ঞেশ্বরকে যুগান্তকারী অমর মুকুন্দ করিয়াছে। ঐ ক্ষুদ্র প্রথম রচিত সঙ্গীতেই তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। উক্ত দিনের শ্রোতৃবর্গ বিচারের ধার ধারে নাই, কিন্তু অভিনবরূপে ভাববিহ্বল হইয়াছে। ভিখারী বৈষ্ণব প্রচলিত প্রথায় গাহিবার কালে রামানন্দ-মুকুন্দ শব্দ উচ্চারণকালে মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার করিয়াছে, কিন্তু পরিচয়ের সন্ধান করে নাই।

ঐ দিকে উৎসাহিত রচয়িতার দ্রুত সঙ্গীত রচনা চলিতে লাগিল। দেড বৎসর মধ্যে শতাধিক গান রচিত ও সঙ্গে সঙ্গে গীত হইতেছিল। প্রত্যেকটি গান সেই প্রাচীন রীতি অনুসারে মুকুন্দরামের ভণিতাযুক্ত।[৩০] শহরের সর্বত্র কীর্তন গাহিবার নিমন্ত্রণ সংখ্যা বহুল হইয়া চলিয়াছিল। সময় সময় একই রাত্রিতে দুই তিন স্থানের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইত। "ছ'টা গান," "কৃষ্ণকমল গোস্বামীর পালা" প্রভৃতি ফরমাইস ও আসর বুঝিয়া গায়কের বিবেচনায় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের গান হইত। কীর্তনের সাধারণ আসরে নিজের রচিত গানই ক্রমশঃ বেশী গাহিতেন। পালা গানের ফাঁকে ফাঁকেও স্বরচিত গান জুড়িয়া দিতেন। অভিনেতাবিহীন একক পালা গায়কের পক্ষে মাঝে মাঝে সুরের সঙ্গে কথা বলিয়া বিষয়টা শ্রোতার বোধগম্য করিয়া দিতে হয়। এই

৩০। এই সময় রচয়িতার হস্তে সর্বদাই একটি একতারা থাকিত। দোকানে, বাড়িতে, রাস্তায় গন্তব্যস্থলে সর্বদা সর্বত্র হস্তস্থিত একতারাটি কানের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া সুর বাজিত। স্নান, আহার ও নিদ্রাকাল ছাড়া একতারার বিশ্রাম ছিল না। বলা বাহুল্য, মুকুন্দের রচিত সকল গীতই "মুকুন্দ' ভণিতাযুক্ত নয়। এমন অনেক গীত আছে যাহা ভাবাবেগের প্রাবল্যে অথবা বৈষ্ণব দীনতায় "মুকুন্দ" ভণিতাযুক্ত হয় নাই।

কার্যে যজ্ঞেশ্বরের পটুত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। পালা গায়কদের প্রায় সকলেই নির্দিষ্ট কথাগুলি আবৃত্তি করিয়া যায়। যজ্ঞেশ্বর ক্রমশঃ ঐ কথাগুলির গণ্ডী বাড়াইতে লাগিলেন। কীর্তনের ভাবানুগ সাধনতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা, ধর্মের নামে ভণ্ডামির উপর কটাক্ষ, পয়ার আবৃত্তি ও স্বরচিত সঙ্গীত দ্বারা কথিত বিষয়ের সমর্থন যোগাইতেন। যজ্ঞেশ্বরের বক্তৃতা ও সঙ্গীতের লগ্ন শক্তি যাহা পরবর্তীকালে মুকুন্দরূপে অগণিত নর-নারীকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিত তাহার সূচনা ও শিক্ষানবিশী হইয়াছিল বরিশালের ঘরে ঘরে মানসিক "হরিলুটের" আসরে বসিয়া-গাহিয়া।

১৯০৩ খৃঃ/১৩১০ বঙ্গাব্দের পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়সে "বরিশাল আদর্শ প্রেসে" যজ্ঞেশ্বরের ঐ শতাধিক গান মুদ্রিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। পুস্তকের নাম হইল—"সাধন-সঙ্গীত"। মূল্য নির্ধারিত ছিল—আট আনা। চরণাশ্রিত মুকুন্দ গুরু রামানন্দের নামে ঐ পুস্তকের উৎসর্গপত্রে তাঁহাকে স্বীয় শক্তির উৎস ও জীবনের পরিচালক বলিয়া দৈন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। জনপ্রিয় গায়কের পক্ষে গানের বই "সাধন-সঙ্গীতের"র প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইতে অসুবিধা হয় নাই। তবে ক্রেতা বরিশাল জেলার বাহিরে বিশেষ ছিল না। স্বকণ্ঠের বিজ্ঞাপন ছাড়া "সাধন-সঙ্গীতের" কোন সমালোচনা বা বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে কখনো বাহির হয় নাই। পরবর্তীকালের যশোমণ্ডিত মুকুন্দদাসের ঐ প্রথম রচিত "সাধন-সংঙ্গীতে"র দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণ সংকল্প জাগ্রত হওয়ায় ৺সুরেশ গুপ্ত মহাশয়ের মাধ্যমে জনৈক বন্ধুর নিকট হইতে জীর্ণ একখানি পুস্তক অতিকষ্টে সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাও মুদ্রিত হয় নাই। পরবর্তী "স্বদেশী যাত্রা" পালার মধ্যে "সাধন-সঙ্গীতের" বহু গান স্থান পাইয়াছে এবং সেই সব পালায় "গানের বই" নামে যে সমস্ত পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে "সাধন-সঙ্গীতের" বহু গান মুদ্রিত হইয়াছিল। সেই সময়ের সেই গানের অনুরূপ গান মুকুন্দের পরবর্তী রচিত সঙ্গীতাবলীর মধ্যে পাওয়া যায় না। প্রথমতঃ, মুকুন্দের প্রতিভাস্ফুট হওয়ার পথ লইয়াছিল একটা নূতন সুর, তাহা লইয়া ভাবানুকূল এই নবস্পর্শ নিজেকে ও অপরকে "কৃষ্ণ নাম বড়ই মধুর" এই জ্ঞাত পুরাতন শব্দ যোজনাকেও ফাল্গুনী হিল্লোলে আলোড়িত করিয়াছিল। এই আলোড়নের মুক্ত পথ অব্যাহত রাখিয়াই যজ্ঞেশ্বর "দিগ্বিজয়ী মুকুন্দ" হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। "সাধন-সঙ্গীত"ও প্রাচীন অনুকরণে ঘনাবৃত। সেই আবরণের ফাঁকে ফাঁকে যে বৈশিষ্ট্যটুকু মাঝে মাঝে দেখা গিয়াছে তাহা পিছন ফিরিয়া দেখিবার প্রয়োজন মুছিয়া যাইত যদি মুক্তপথে রচয়িতা দীর্ঘপথ চলিতে

সক্ষম না হইতেন। এই সুযোগে চাহিয়া দেখি ঐ "সাধন-সঙ্গীতের"র প্রথম প্রচেষ্টার ধারা ও বৈশিষ্ট্যটুকু পরবর্তী "আর কি ভয় দেখাও," "এখনো ঘুমায়ে রও" প্রভৃতি রচনায় রূপান্তরে প্রতিফলিত হইয়া নির্বিশেষে জনসাধারণ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। যেখানে প্রথিতনামা সঙ্গীত রচয়িতাদের সঙ্গীতকে পশ্চাতে রাখিয়া "সাধন-সঙ্গীত" রচয়িতা সাহিত্যে তাঁহার নব অবদানে স্থান লাভ করিয়াছিলেন ও জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। সময় ও ভাবের একটা পার্থক্য অথবা ক্রমবিকাশ বা সংস্কৃতি পরিণতি রচিত সঙ্গীতগুলিকে অব্যাহত ধারায় কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে। এখানে আর তাহা আলোচনা করিব না।[৩১] বর্তমানে আলোচ্য মুকুন্দদাসের প্রথম রচিত "সাধন সঙ্গীতের" মধ্যে 'নাম-মাহাত্ম্য', 'গৌর-ভজন,' 'শক্তি-উপাসনা', প্রাচীন বৈষ্ণবপদ কর্তাদের অনুকরণ যুগল প্রেম সম্বন্ধীয় সঙ্গীতসমূহ প্রকাশিত হইয়াছিল। সাধন-সঙ্গীতের "তোরা বল্ সজনী বল্‌না শুনি আমার গৌর কি মোহিনী জানে।" প্রভৃতি গৌর উপাসেনার গানগুলিও প্রিয় সঙ্গীতরূপে জনসাধারণ্যে আদৃত হইয়াছিল। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণব পদকর্তাদের অনুকরণে যে গানগুলি লিখিত হইয়াছিল তাহার অনেকটার পশ্চাৎ হইতে মুকুন্দনাম বাদ দিলে উহা যে আধুনিক কোন রচয়িতার রচনা তাহা বুঝা যায় না।

"অহি হেন গতি, প্রেমকা এ রীতি জটিল কুটিল ভেল,
আঁখি ধারে ধোরে মুকুন্দ অন্তরে হেনেছে দারুণ শেল।"

"পীরিতি"[৩২] শব্দের অবলম্বনে প্রাচীন পদকর্তাদের প্রায় সকলেই নানারূপ

৩১। "পরিশিষ্টে" মুকুন্দদাসের রচিত বিভিন্ন পর্যায়ের গানগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

৩২। "পীরিতি"—বৈষ্ণব পদাবলীর পাঁচটি রস—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই পঞ্চরসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে মধুর রস বা শৃঙ্গার রস। এই রসের নায়ক "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" এবং নায়িকা "মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীরাধা ঠাকুরাণী" যাহা "কান্ত-কান্তা প্রেম" নামে অভিহিত। "শ্রীকৃষ্ণ-রসোবৈসঃ", রসের নাগর তাই "পীরিতি রসের সার"। প্রেমের জন্য যে ব্যক্তি প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে, প্রিয়তমের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে, আপনার স্বাতন্ত্র্য বিস্মৃত হইতে পারে, একমাত্র সেই ব্যক্তিই যথার্থ প্রেম লাভের যোগ্য :—

"পীরিতি না কহে কথা।
পীরিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পীরিতি মিলয়ে তথা॥"

কবিতা ও রসাস্বাদনের রেওয়াজ রহিয়াছে।[৩৩] যে পদাঙ্কানুসরণে এই নবীন পদকর্তা মুকুন্দদাস মহাশয়ও "পীরিতি" শব্দানুপ্রাসে পদ রচনায় ক্ষান্ত রহেন নাই। সাধারণতঃ বহু উচ্চভাব প্রকাশক শব্দই নিম্নতমভাবে ও প্রয়োগে চলিয়া থাকে। বৈষ্ণব কবিতার "প্রেম", "পীরিতি" প্রভৃতি শব্দ ও বাজারে নামিয়া বিকৃত গণ্ডীর মধ্যে অবাধ আসন লাভ করিয়াছে,

---

এই "পীরিতি" শব্দের উদ্ভব সম্বন্ধে একটি অপূর্ব কাহিনী আছে: স্বর্গের "কল্পবৃক্ষে" একটি সুন্দর প্রেমফল হওয়ায় দেবগণ উহা আহরণ করিবার নিমিত্ত শুক পক্ষীকে প্রেরণ করেন। শুক পক্ষী যখন চঞ্চুপুটে ফলটি লইয়া সমুদ্রের উপর দিয়া উড়িয়া আসিতেছিল, তখন চঞ্চুর (ঠোঁটের) দৃঢ় চাপে সুপক্ক ফলটি তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া একখণ্ড সুখ-সাগরে, অপর খণ্ড রস-সাগরে এবং অবশিষ্ট খণ্ড প্রেম-সাগরে পতিত হয়। তখন দেবগণ সমুদ্রত্রয় মন্থন করিলে সুখ-সাগর হইতে 'পী', রস-সাগর হইতে 'রি' এবং প্রেম-সাগর হইতে 'তি'—ফলের এই তিন অংশ হইতে উত্থিত হয় "পীরিতি", চণ্ডীদাস বলেন :—

"বিহি এক চিত্তে ভাবিতে ভাবিতে,
নিরমাণ কৈলা 'পি',
রসের সাগর মন্থন করিতে,
তাতে উপজিল 'রি'।
পুন যে মথিল অমিয় না হলো,
তাতে ভিয়াইল 'তি',
(পিরিতি) এ তিন আঁখর
ভুবনেরি সার
তুলনা দেব যে কি।"

৩৩। প্রাচীন পদকর্তাদের "পীরিতি" শব্দের বহুপদ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে পাঠকদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্যে নিম্নে কয়েকটি পদ দেওয়া হইল :—

(১) "এমন পীরিতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণে বান্ধা আপনা আপনি॥ —চণ্ডীদাস।

(২) "পীরিতি-মূরতি অধিদেবা"। —গোবিন্দদাস।

(৩) "নবরে নবরে নব নবঘন শ্যাম।
তোমার পীরিতি খানি অতি অনুপাম॥
তোমার পীরিতি সুখ-সায়রের মাঝ।
তাহাতে ডুবিল মোর কুল-শীল লাজ॥ —যদুনাথদাস।

(৪) রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥ —জ্ঞানদাস।

পবিত্র ও জীবনপথের মহাশিক্ষাপ্রদ পরকীয়া তত্ত্ব বিকৃত অবস্থায় ধর্মের নামেই ব্যভিচারের আসনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, একাংশ ধর্মেরই ঐ মুখোশটাকে ঘৃণা করে বটে কিন্তু অশ্রদ্ধা পোষণকারী সেই সমাজই তাহাদিগকে ঔদাসীন্যের পথে পোষণ করিতেছে, মুখোশপরিহিত ঐ রসিক দলের পিছনে এমন কতকগুলি দৃঢ় যুক্তি ও অটল বিশ্বাসের উদাহরণযুক্ত উপাদান রহিয়াছে যাহাতে অশ্রদ্ধাকারীদের আরোপিত কলঙ্ককে তাহারা অলঙ্কার বলিয়া গ্রহণ করে। আবার এই তীব্র সমালোচনাকালে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাহার মূলতত্ত্বের ষোল আনাই মিথ্যা বা বিকৃত ভোগের নিছক যোগানদারই মাত্র নহে। এই সাধনার মূল উদ্ভাবকের চিত্তে সেই আশঙ্কা থাকায় এই পথকে ক্ষুরের বাঁকে, চুলের ধরণী বলিয়া অভিহিত করিয়া সতর্ক করা হইয়াছে। কিন্তু সে কথা সাধারণ লোক শুনিল না। ধর্মের নামে প্রতারণার দ্বারা ভোগেচ্ছা পরিপূরণের এই দুর্গমকে সহজপন্থা করিয়া মানুষ দলে দলে প্রবেশ করিল। ভণ্ড গুরুত্ব ব্যবসায়ীরা সরলপ্রাণ অসংখ্য নরনারীকে বচনের রহস্যজাল বিস্তার করিয়া অবাধে সর্বনাশের পথে অগ্রসর করিয়া দিল। ব্যভিচার, ভ্রূণ ইত্যাদির কুৎসিত আচরণের সমাজপঙ্ককারী এই অবস্থা নবানুরাগী বৈষ্ণব যজ্ঞেশ্বরের প্রাণের বেদনা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সেই বেদনার অভিব্যক্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আলোচনার সীমায় ছিল ; বর্তমানে "সাধন-সঙ্গীতে" তাহার সেই প্রতিবাদকে বজ্রনিক্ষেপী ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইল। "পীরিতি" অনুপ্রাস-যুক্ত সঙ্গীতের উপসংহারের লাইনটি—

"পীরিতি পীরিতি সবাই কহে মরম নাইক জানে।
মুকুন্দদাস কহিছে সাধন পীরিতি মায়ের সনে।"

সর্ববিধ অনাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে বেপরোয়া প্রতিবাদের যে নির্ভীক সাহসিকতা বাঙলার বুকে ডঙ্কা বাজাইয়া অভিনব সঙ্গীত তরঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, যজ্ঞেশ্বরের জ্বালাবাহী যে ভাবভৈরী মুকুন্দত্বে অমর হইয়াছে তাহার সেই স্বভাব উদ্যত বজ্রমুষ্টি উত্তোলনের নমুনা ঐ "পীরিতি মায়ের সনে" ছত্রটির ভিতর রহিয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে রসজ্ঞ পণ্ডিত ছত্রটিকে রসজ্ঞানে অনভিজ্ঞ বলিয়া শুদ্ধ সাহিত্যের তালিকা হইতে বর্জন করিবেন, কেননা মধুর রসের উপমা মাতাপুত্রের সম্পর্কে প্রয়োগ নিতান্ত অশ্রাব্যরূপেই শ্রুতিস্পর্শ করে। কিন্তু মুকুন্দের মুকুন্দত্বের বিকাশ যে উগ্র সংস্কারকের পন্থায় তীব্র আঘাত হানায় সাফল্য লাভ করিয়াছিল, সেখানে উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়োজনে ভাষা ও

সাহিত্যের দিকে তাঁহার সজ্ঞান উপেক্ষিত দৃষ্টিই পরিলক্ষিত হইয়াছে। "সাধন-সঙ্গীতে"র বৈষ্ণব মুকুন্দও ছিলেন 'তাথৈ তাথৈ নিত্য বিলাসিনী" উলঙ্গিনী মুক্তকেশী মায়ের মুক্ত সন্তান। সুর-তাল-রস ও ভাষার গণ্ডী তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখে নাই। উদ্দেশ্য ব্যক্ত ও সিদ্ধির পথে মুকুন্দ আপন মনে ঝড়ের গতি লইয়া চলিয়াছেন। তাঁহার সেই আপনভোলা গতিভঙ্গীর পশ্চাতে তাল-ভাষা ছুটিয়া সঙ্গীতও বক্তব্যকে রূপ দিয়াছে। সুপ্রতিষ্ঠিত মুকুন্দদাস স্বীয় দলে ওস্তাদ গায়ক ও বাদক রাখিয়াছেন; কিন্তু তাহাদের ওস্তাদিতে নিজেকে আবদ্ধ করেন নাই। তাহাদের ওস্তাদী, অগণিত লোকসমুদ্রের আসরে মুকুন্দের নিত্য নূতন কথা গান, গর্জন লম্ফ ও নৃত্যের পশ্চাতে চলিয়া সুরের পাহারা দিয়াছে। ওস্তাদ শ্রোতা, সমালোচকগণ আসরে ভাবিবার অবসর পান নাই, পরে অবসরে ধীর আলোচনায় বলিয়াছেন "চমৎকার লগ্নশক্তি কিন্তু তাল কার্য", সাহিত্যিক বলিয়াছেন "শোনায় ভালো কিন্তু রচনা নৈপুণ্যের অভাব", রসজ্ঞ বৈষ্ণব বলিতেন "উদ্দেশ্য মহৎ কিন্তু রসজ্ঞান অপরিপক্ক।" মুকুন্দ হাসিয়া বলিতেন "আমি যা আমি তাই, আমি মানুষ, অত সুক্ষ্মের বালাই আমার নাই" ইত্যাদি। কীর্তনিয়া যজ্ঞেশ্বরেও যাহা মুকুন্দত্বে উজ্জ্বল স্ফুটরূপে বহুজনপরিচিত সেই নির্ভীক স্বতঃস্বচ্ছ স্বেচ্ছাগতি অব্যাহত। দণ্ডায়িত কীর্তনিয়া যজ্ঞেশ্বর শ্রোতার দিক হইতে মুখ না ফিরাইয়া সহসা সহকারী উৎকৃষ্ট মৃদঙ্গ বাদকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পিছনে হাত লইয়া কিছুকাল বাজাইয়া বাদককে নিজের অনুগামী করিয়া লইয়াছেন।

"পীরিতি পীরিতি-সবাই কহয় মরম নাহিক জানে।
শ্রীগুরু সঁপিয়া মুকুন্দ কহিছে পীরিতি মায়ের সনে॥"

সর্বশ্রেণীর শ্রোতার কর্ণে ধাক্কা লাগানো এই পদ গীত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রোতার অন্তর্নিহিত অস্ফুট জিজ্ঞাসার সন্ধানাভিজ্ঞ যজ্ঞেশ্বর পদ ও ভাব বিশ্লেষণে উত্তর যোগাইয়া সুরের সঙ্গে শ্রোতাকে আয়ত্তে আনিতে প্রাচীন পদকর্তাদের পদ পয়ার আবৃত্তির সহিত পবিত্র ভাবের ইতিহাস আলোচনা করিয়া নির্মল গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের কুৎসিত চিত্র চোখের সম্মুখে ধরিয়া দেখাইতেন। মধুর রসতত্ত্বকে তাঁহার নিজস্ব ধারায় কীর্তনের আসরে এইভাবে সমর্থন করিয়া যাইতেন। উহা সর্ববাদিসম্মত হউক বা না হউক সে দিকে "সাধন সঙ্গীত" রচয়িতা ও গায়কের প্রয়োজন ছিল গতানুগতিকের অসাড় খাতে ভাসিবার পথে চিন্তাক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করা। যেখানে তাঁহার জয়ের পথে সহায় হইয়াছে বর্তমানের প্রত্যক্ষ বাস্তব। সেখানে যে কোন বাধাকে তিনি অকুতোভয়ে

সজ্ঞানে অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়াছেন। সেই জীবনের ঐ স্বতঃ গতিবেগ কীর্তনিয়া যজ্ঞেশ্বরে, "সাধন-সঙ্গীতে" প্রথম প্রচারিত বৈষ্ণব মুকুন্দে,—রাজনৈতিক প্রচারকরূপে সমাজ সংস্কারের যে পরিণত মুকুন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা এই ধারায় একটি মাত্র প্রকৃতিগত তাড়নার অভিব্যক্তি মাত্র। সেখানে বেসুরা অসামঞ্জস্যের মধ্যে লগ্ন সুরের সামঞ্জস্য অদ্ভুত ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত। এই গতিপথের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সমালোচনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় মুকুন্দ যেন বলিতেছেন—

"কোন ক্ষ্যাপামীর তালে নাচে পাগল সাগর নীর।
সেই তালে পা ফেলে যাই রইতে নারি স্থির
চলরে সোজা, ফেলরে বোঝা রেখে দে তোর রাস্তা খোঁজা
চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা জেগেছে।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

সিদ্ধির পথে

১৩১০ বঙ্গাব্দে "সাধন-সঙ্গীত" মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবার ও যজ্ঞেশ্বরের "মুকুন্দ" নাম কিছু কিছু প্রচারিত হইল, তখনো "যজ্ঞেশ্বর" নাম চাপা পড়ে নাই। মুদি দোকান ব্যতীত জীবিকার অন্যপথ জোটে নাই, শুধু কল্পনায় 'এটা সেটা' করিবার কথা শোনা যাইত মাত্র। জেলা স্কুলের নিকটস্থ বাসা সরকার প্রয়োজনে দখল (Acquire) করিয়া লইল, বর্তমান "গুরখা" লাইনের নিকটে নূতন বাসা হইল, অল্পদিন পরে তাহাও সরকারের দখলে আসিল। তৃতীয় বাসাও "আলেকান্দায়"ই করা হইল। দোকান ও বাসার পথে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র পাল মহাশয়ের বহির্বাটীর একখানা ঘরে টিনের "এক্সেলসিয়ার ক্লাব" নামে একটি পাঠাগার, তাহার সহিত "সাহিত্য-সভা" গঠিত হইল। পাল ভ্রাতৃবর্গসহিত ষ্টীমার কোম্পানীর মাইনুদ্দীন আহম্মদ[৩৪] নামক জনৈক সাহিত্যসেবী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ওভারসিয়ার শ্রীযুক্ত সীতানাথ ভট্টাচার্য, বাবু নিত্যলাল মুখোপাধ্যায়[৩৫] প্রভৃতি এই সভার সভ্য ছিলেন। এই সভার উদ্বোধন দিবসে দোকানে যাইবার পথে মুকুন্দদাস সাগ্রহে আহূত হইয়া যোগদান করিলেন ও সাহিত্য-সভার জনৈক সদস্যরূপে নির্বাচিত হইলেন। এই সময় মুকুন্দদাস শুধু যদিও কীর্তনিয়া হইতে লোকচক্ষে একটু অধিক সম্মানের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ঐ ক্লাবে মাঝে মাঝে মুকুন্দদাস, তাঁহার স্বরচিত সঙ্গীত গাহিয়া শুনাইতে বাধ্য হইতেন। ক্লাবের সদস্যগণের মধ্যে মুকুন্দ রচিত সঙ্গীত সম্বন্ধে সাহিত্যিক দিক হইতেও নানাপ্রকারের বৈঠকী আলোচনা হইত। সাহিত্যিক ভাবাপন্ন সদস্যদের এই অসঙ্কোচ অনুকূল-প্রতিকূল সমালোচনা মুকুন্দকে উপকৃত করিয়াছিল। ঐ ক্লাবে প্রতি রবিবারে যে নির্দিষ্ট অধিবেশন

৩৪। মাইনুদ্দীন আহম্মদ :—ইঁহার চেষ্টায় বরিশালের বিশিষ্ট মাসিকপত্র "ভারত-সুহৃদ" দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হইয়াছিল।

৩৫। নিত্যলাল মুখোপাধ্যায় :—সাহিত্য-সভায় যোগদানকালে ইনি এম. এ. ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। পরবর্তী সময়ে ইনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য পরিত্যাগ করিয়া যথাক্রমে "ব্রজমোহন কলেজ", "রংপুর কারমাইকেল কলেজ", "বহরমপুর কলেজ"-এর অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। পরে "রিপন কলেজের" ইংরাজীর অধ্যাপক হন। কয়েক বছর হইল ইনি মারা গিয়াছেন।

হইত তাহাতে সদস্যগণের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি দুই সপ্তাহ পূর্বে নির্ধারিত বিষয় সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিতেন। ঐ সভায় মুকুন্দদাস একাধিকবার লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। দোকান ও বাসার পথে যাতায়াতকালে প্রায়ই ঐ ক্লাব গৃহে যাইয়া সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রাদি পাঠ করিতেন অথবা কখনো ঐগুলি বাড়িতে লইয়া আসিতেন। ঐ ক্লাবের সংস্পর্শে পাঠ ও আলোচনা কালে মুদি ও কীর্তনিয়া মুকুন্দের দেশপ্রেম, রাজনীতি, সমাজ ও সাহিত্য-সম্বন্ধীয় সুপ্ত প্রতিভা চেতনার পথ পাইয়াছিল। তৎপূর্বে বৈষ্ণব সাহিত্য ভিন্ন সাময়িক পত্রাদির সহিত বিশেষ পরিচয় ছিল না। পয়ারের[৩৬] মিল ছাড়া গদ্য প্রবন্ধ লিখিবার চিন্তা বা অভিজ্ঞতাও উহার পূর্বে ছিল বলিয়া মনে হয় না। পরবর্তী সময় যাত্রার পালা লেখায় ও দ্রুত প্রবন্ধ লেখায় যে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাহার প্রাথমিক সূচনা ও সাহায্যকারী ঐ "এক্‌সেনসিয়ার ক্লাবের" সংস্পর্শ। "বরিশাল হিতৈষী" পত্রিকার বিশিষ্ট সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন সেন[৩৭] মহাশয় জনসভার হট্টগোলের মধ্যে বসিয়াও

৩৬। পয়ার :—অক্ষয় বৃত্ত বা সর্বসাধারণের পরিচিত পুরাতন ছন্দের নাম পয়ার। পয়ারের এক একটি চরণে চতুর্দশ অক্ষর (SYLLABLE) এবং ইহার মাত্রা সংখ্যাও চতুর্দশ। ইহাতে এক চরণের শেষের ধ্বনি পরবর্তী চরণের শেষের ধ্বনির সহিত মিলিয়া যায়।

যথা— "মহাভারতের কথা/অমৃত সমান।
কাশীরামদাস কহে/ শুন পুণ্যবান॥

পয়ারে দুটি পর্ব থাকে—প্রথম পর্বের মাত্রা সংখ্যা আট, দ্বিতীয় পর্বের ছয়। আবার এক ঝোঁকে প্রথম আটমাত্রা উচ্চারণ করিবার পর সামান্য বিরাম ও শেষের ছয়মাত্রার পর পূর্ণ বিরাম। পয়ারে মিলযুক্ত দুই চরণের মধ্যে ভাবকে পুরিয়া রাখিতে হয়। পয়ারের এই দুই চরণের নিগড় ভাঙ্গিয়া মধুসূদন ছন্দের প্রসার বাড়াইয়া ভাব প্রসারের অবকাশ দিলেন, ইহাই অমিত্রাক্ষর ছন্দ।

৩৭। দুর্গামোহন সেন :—বরিশালের বিশিষ্ট সমাজসেবী, নির্যাতিত রাজনৈতিক নেতা, স্বদেশী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সমর্থন ও প্রচারক। "বরিশাল হিতৈষী" সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক হিসাবে তিনি রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন এবং নির্যাতন বরণ করিয়াছেন। এই বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সাংবাদিককে ছলে বলে কৌশলে বন্দী করাই ছিল ইংরেজ সরকারের সংকল্প। দুষ্টের ছলের অভাব হয় না, তাই সুযোগও আসিল। দুর্গামোহন সেন মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে অন্যের লিখিত একটি প্রবন্ধে রাজদ্রোহিতার গন্ধ আবিষ্কৃত হইল, এবং বিচারে সম্পাদকের ক্ষমা প্রার্থনা অথবা এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড স্থির হইল। দুর্গামোহন সেন মহাশয় প্রবন্ধের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া এক বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিলেন।

দুর্গামোহন সেন মহাশয় স্পষ্টবাদী সাংবাদিক ছিলেন। অন্যায়ের সাথে তিনি কোনদিন আপস করেন নাই। এই জন্য স্বাধীনতা অর্জনের পরে পাকিস্তান সরকার আর এক অজুহাতে তাঁহাকে

পত্রিকার প্রবন্ধ লিখিতে সমর্থ হইতেন। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন—"মুকুন্দের নিকট হইতে প্রবন্ধ পাইতে ওয়ার্ড খেলাপের শেষ থাকে না, কিন্তু একটা সুবিধা আছে।—কোনরকমে অফিসের সামনে ধরিতে পারিলে সেই সময়ই আদায় হইয়া যায়; সেদিন অফিসে বহুলোকের কথাবার্তার মাঝে বসাইয়া কাগজ-কলম দিয়া বলিলাম এখনি লিখিয়া দিতে হইবে। একটুও না থামিয়া একটানে দ্রুত গতিতে প্রবন্ধ লেখা শেষ করিয়া দিল, একটুও কাটা নাই—চমৎকার শক্তি" ইত্যাদি। সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাদিতে এইরূপ বাধ্য হইয়া প্রবন্ধ লিখিয়া দিতে হইত। "একৃসেনসিয়ার ক্লাবের" ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে থাকার সুযোগ মুকুন্দদাস প্রায় দুই বৎসরকাল পাইয়াছিলেন। এই সময়ে ক্লাব সম্বন্ধে তাঁহার আন্তরিকতা, সাপ্তাহিক অধিবেশনে উপস্থিত থাকিবার আকর্ষণ ও কর্তব্যবোধ যথেষ্ট ছিল। বন্ধুবান্ধব মধ্যে অজ্ঞাতনামা লেখকদের ঐ ক্লাবে টানিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং প্রবন্ধ লিখিতে বাধ্য করিয়াছেন। ক্লাবের অস্তিত্ব বজায় থাকা পর্যন্ত দেশ-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত মুকুন্দদাস ঐ ক্লাবের সঙ্গ বিস্মৃত হন নাই। বরিশালে থাকাকালীন অবসরে ঐ ক্লাবে হাজির দিয়া সম্পর্ক বজায় রাখিতেন।

দ্রুত ও উৎকৃষ্ট গদ্য প্রবন্ধ লেখা ছাড়াও মুকুন্দদাস নিজের দলের অভিনয়ের জন্য পালা লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন। বাধ্য হইয়াছেন বলিতেছি এই জন্য যে, অপরের দ্বারা লিখাইবার বা লিখাইতে পারিলে যেন তিনি ত্রাণ পাইতেন। মুকুন্দদাস প্রথমে যে বই লিখিলেন তাঁহার নাম "মাতৃপূজা", দ্বিতীয় "সমাজ", তৃতীয় "কর্ম্মক্ষেত্র", চতুর্থ "পথ", পঞ্চম "পল্লীসেবা"। ইহাছাড়া কবি বন্ধু হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লিখিত "আদর্শ", বিধুভূষণ লিখিত "ব্রহ্মচারিণী"[৩৮] এবং সুরেশ গুপ্ত[৩৯] লিখিত "সাথী" এই সকল বইও তিনি কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া অভিনয় করিয়াছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহার

বহুদিন কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের আজীবন সঙ্গী ও সহকর্মী ছিলেন। বর্তমানে যাদবপুরে বাস করিতেছেন।

৩৮। "বসুমতী-সাহিত্য মন্দির" কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী" নামে যে গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাঁহাতে "সমাজ", "পল্লীসেবা", "ব্রহ্মচারিণী" ও "কর্ম্মক্ষেত্র"—এই চারিটি মুকুন্দদাসের গ্রন্থ বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে।

৩৯। সুরেশ গুপ্ত :—অশ্বিনীকুমার দত্তের একান্ত অনুরাগীদের মধ্যে সুরেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ছিলেন অন্যতম। চারণকবি মুকুন্দদাসেরও তিনি একজন অনুরাগী বন্ধু ও উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। ইনি ছিলেন দেশসেবক, বক্তা, সুলেখক ও রাজনৈতিক কর্মী। তাঁহার নিবাস ছিল বরিশালের

লেখায় ঝোঁক ছিল। তবে গদ্য রচনা অপেক্ষা সঙ্গীত রচনায় তিনি বেশী আনন্দ পাইতেন। এই সাহিত্য-প্রীতি ও সঙ্গীত-প্রীতির মূলেও ছিলেন—মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত।

অশ্বিনীকুমার দত্তের বৈঠকখানা হইতে বিশিষ্ট, শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সন্ধ্যার পরে বিদায় লইলে গুরু-গম্ভীর জ্ঞান ও ধর্মালোচনার বৈঠক রূপান্তরিত হইয়া পাঁচমিশালী এক প্রদর্শনীতে পরিণত হইত। অশ্বিনীকুমার কর্তৃক 'হুক্কানন্দ স্বামী' নামে অভিহিত জনৈক প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ, অশ্বিনীকুমারের দোস্ত বলিয়া গর্বিত পাগলা 'নৈয়া বনৈমদ্দি', 'গাজিয়াল বরদা' প্রভৃতি অল্পাধিক ছিট্‌ওয়ালা ব্যক্তিরা সভা শোভা করিয়া বসিত। উহারা আশেপাশে ঘুরিয়া ঐ সময়ের প্রতীক্ষা করিত। অশ্বিনীকুমারের মৌতাত অবহেলার নহে। ঐ আসরে কবি হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মুকুন্দদাস প্রভৃতির মত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন লোকও থাকিতেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার অতিক্রমে সক্ষম ব্যক্তিগণ এ আসরে কখনো স্থান পাইতেন না বা গ্রহণ করিতেন না। সভায় আলোচ্য বিষয়ের কোন স্থিরতা ছিল না। হাসি, ঠাট্টা, গান, তামাশা, গল্প, আলোচনা, কৌতুক, কীর্তন, তর্ক, অভিনয় প্রভৃতি কোন বিষয়ই বাদ যাইত না। অশ্বিনীকুমার সর্বরসভোক্তারূপে প্রায়ই আসরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া নিষ্ক্রিয় থাকিতেন। কখনো তর্কিত বিষয়ের জন্য তালিকা নির্বাচিত হইয়া সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশে, কখনো বা মৃদু বা উচ্চ হাসি হাসিয়া যোগ রক্ষা করিতেন মাত্র। একদিন সেই আসরে বন্ধুবান্ধবসহ মুকুন্দদাস মহাশয় উপবিষ্ট। ইংরাজী জানা না-জানার ফলাফল সম্বন্ধে অনুকূল-প্রতিকূল তীব্র আলোচনা চলিতেছিল। এই ইংরাজী জানা না-জানা সদস্যদের ইংরাজীর কৌলীন্যে যে গোপন আসক্তি ছিল তাহা ইংরাজী জানা ও ইংরাজী বিদ্যার মোহমুগ্ধদের উপর ক্ষোভযুক্ত আক্রমণে স্ফুট হইতেছিল। সিদ্ধান্তের জন্য অশ্বিনীকুমার জিজ্ঞাসিত হইলেন—"আচ্ছা বলুন, অমুক লোকটা বক্তৃতা দেয় ও লেখে, যদি সে একজন উকিল হইত তবে কি লোক ঐ সকল লেখার অধিকতর মূল্য দিত না?" উত্তরে সেই লোকটির শুধু নামোচ্চারণ করিয়া অশ্বিনীকুমার বলিলেন—"ও যদি

কলসগ্রামে। তিনি ছিলেন আজীবন দারিদ্র্যব্রতধারী কর্মী। জীবিকা অর্জনের জন্য কখনো চাকুরী গ্রহণ করেন নাই। দেশসেবায় তিনি ছিলেন নিঃস্বার্থ কর্মী ও বীর সন্ন্যাসী! অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি অশ্বিনীকুমার দত্তের ও বরিশালের উকিল শরৎচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, তাঁহার বক্তৃতা ও ঐকান্তিক হরিজন সেবার জন্য। প্রবীণ বিপ্লবী মনোরঞ্জন গুপ্ত মহাশয়েরও তিনি সহকর্মী ছিলেন।

বি. এ. পাস করিত তবে হেডমাস্টার হইতে পারিত, কিন্তু অমুক হইত না।" পুনরায় জিজ্ঞাসিত হইলেন—"এই মুকুন্দ যদি ইংরাজীতে আলাপ-আলোচনা করিতে পারিত, একজন গ্রাজুয়েট্ হইত, তবে সম্মান বাড়িয়া যাইত না?" মৃদু হাসির সহিত উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি বলিলেন—"কলেজে পা দিতে পারিলেই আর মুকুন্দ হইত না, শিষ্টভদ্র গৃহস্থ হইত, বরিশালের লোকেরাও চিনিত না।"

বস্তুতঃ যে মুকুন্দদাস একদা পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকারের ত্রাস সঞ্চার করিয়া নির্ভীক হৃদয়ে বাংলাদেশকে আলোড়িত করিতেছিলেন, যিনি একের পর এক 'ইন্‌জাঙ্কশন্' এড়াইয়া অব্যাহত গতিতে রাজপুরুষদের বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছেন, যে দুর্দান্ত মুকুন্দকে শায়েস্তা করিতে রাজদ্রোহের অভিযোগ চাপাইয়া সরকার কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া বাঙলার বাহিরে রাখিয়াছিলেন, পরবর্তী সামাজিক দলপতি মুকুন্দকে যে বেল্ সাহেব আসামের গভর্নররূপে প্রদেশের বাহির করিয়া দিয়া স্বীয় শাসনগণ্ডীকে নিরাপদ করিয়াছিলেন—সেই মুকুন্দ সত্যই "কলেজে পা দিতে পারিলেই আর মুকুন্দ হইত না, শিষ্টভদ্র গৃহস্থ হইত, বরিশালের লোকেরাও চিনিত না।"

পৃথিবীতে আমরা উল্লেখযোগ্য দুই শ্রেণীর মানুষ দেখিতে পাই—এক. যাঁহারা Saviour বা অবতার, দুই. যাঁহারা Liberator বা মুক্তিদাতা। 'মুকুন্দদাস' এই শেষোক্ত শ্রেণীর একজন মানুষ ছিলেন—"He was a brave soldier in the war of liberation of humanity." ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ২৩শে জুন পলাশীর প্রান্তরে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় ও লর্ড ক্লাইভের প্রহসনায় যে স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হইয়াছিল, তাহাকেই আবার পূর্ব গগনে উদিত করিবার জন্য মুকুন্দদাস প্রাণমাতানো গান গাহিয়া চলিয়াছেন গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে এবং ইহাতেই মুকুন্দদাসের সিদ্ধিলাভ—

"ভরসা মায়ের চরণ তরী,
আমরা এবার হবই পার
ভয় গেছে দূরে অভয় পেয়েছি,
মাভৈঃ বাণী শুনেছি মা'র।"

এইখানেই মুকুন্দদাস চারণকবি, জাতীয় কবি। বৈষ্ণব মুকুন্দ, শাক্ত মুকুন্দ হইয়া 'জয় মা' বলিয়া জীবনতরী ভাসাইলেন, তাহা নানা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও নির্ভয়ে চলিয়া শেষ অবধি যে 'সিদ্ধির-ঘাটে' গিয়া পৌছাইল তাহার নাম হইতেছে—'মহাতীর্থ কালীঘাট'।

সপ্তম অধ্যায়

শাক্ত মুকুন্দ

আমরা এ পর্যন্ত মুকুন্দদাসের যে পরিচয় পাইয়াছি তাহাতে তাঁহার বৈষ্ণব রূপটাই ফুটিয়া উঠিয়াছে বেশী। যদিও "সাধন-সঙ্গীতে" রচিত সঙ্গীতাবলীর মধ্যে 'গৌর-ভজন', 'রাধাকৃষ্ণ লীলা' গানের সহিত শাক্ত-উপাসনা সঙ্গীতেরও উল্লেখ করিয়াছি ; তথাপি 'কীর্তন', 'পাঠ', 'আলোচনা', 'বেশভূষা', 'দীক্ষাগ্রহণ' প্রভৃতির মধ্য দিয়া পুরা বৈষ্ণব বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছেন। কিন্তু মুকুন্দ-রচিত সঙ্গীত মধ্যে শ্যামা-সঙ্গীতের স্থান অপ্রচুর তো নহেই, প্রচুর বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। শুধু সঙ্গীত রচনাতেই নহে, সাধন সম্বন্ধেও মুকুন্দ-জীবনে এই শাক্ত-বৈষ্ণবতার মধুর মিলনটিও উপভোগ্য। মুকুন্দ-জীবনের গতিপথ আলোচনা করিতে অন্তবস্থ যে স্রোতোবেগের উল্লেখ করিয়াছি—সে বেগ হিসাবী কৈফিয়ত দিতে জানে না, অথচ বে-হিসাবে দেউলিয়াও সাজে নাই, তজ্জন্য মুকুন্দ-জীবনে মত ও পথের দ্বন্দ্ব বাধাব সৃষ্টি করে নাই। সর্বধর্মে অটুট শ্রদ্ধাভক্তি তাঁহার স্বচ্ছন্দ গতিকে রসাল করিয়া উদ্দেশ্য ও পথকে সহজ এবং অনাবিল করিয়াছে। সেখানে শাক্ত-বৈষ্ণব তো দূরেব কথা, ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের প্রতিও গভীর শ্রদ্ধা দৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহার অভিনীত পালার মধ্যে খৃষ্ট ধর্মযাজকের জীবে প্রেম, দরিদ্র শ্রমিক মুসলমানের ত্যাগমূলক বীরত্বের চিত্র মনোজ্ঞরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। 'ইদুজ্জোহা' প্রভৃতি মুসলমানী পর্বে নিমন্ত্রিত হইয়া মুসলমান জনসভায় তাঁহার বক্তৃতায় ব্যাখ্যা সহিত অনর্গল কোরানের সুরসহযোগে নামাজ, কোরবানীতত্ত্ব প্রভৃতি নিজেকে ও শ্রোতৃবৃন্দকে তৃপ্ত করিত। 'কালী', 'রাধাগোবিন্দ' প্রভৃতি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাতা মুকুন্দ, স্বগৃহাভ্যন্তরে বাগানের মুসলমান মালীর জন্য কোরান পাঠ ও নামাজের স্থান প্রভৃতি করিয়া দেওয়া, মুসলমানদের সহিত অকপট আচার-আচরণ দেখিলে তৎকালে মনে হইয়াছে এ দেশেও কি সাম্প্রদায়িক বিরোধ আছে? আমরা বৈষ্ণব মুকুন্দের শক্তি উপাসনার পরিচয় খুঁজিতেছিলাম। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে দীক্ষাপ্রাপ্ত, কীর্তন মাতোয়ারা মুকুন্দ "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে"র 'সর্বধর্মময় প্রভুস্থানে সর্বধর্ম' অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন বলিতে পারি। শ্রীচৈতন্যের 'বিন্দুবাসিনী' দেবীর মন্দিরে অর্চনা, প্রেম ভাবাদি মুকুন্দের স্বতঃগতিপথে সাহায্য

করিয়াছে। বৃন্দাবনের গোপেশ্বর শিবার্চনা যোগমায়া কাত্যায়নীর বৃন্দারূপকে মুকুন্দের লীলা কীর্তনে গতানুগতিকের অস্পষ্টতাকে স্পষ্ট করিয়া গীত হইত—

"কৃপা কর নর মস্তকমালিকে
ত্বরা দিও তারা সে বনমালীকে।
তুমি ত্রিকালীকে তোমারই কালীকে" ইত্যাদি।[৪০]

ববিশাল শহরের থানা মহল্লা কালীবাড়ি একটি সুপ্রাচীন দেবমন্দির। ঐ কালীবাড়ির বংশানুক্রমিক দ্বিতীয় মালিক স্বর্গীয় সনাতন চক্রবর্তী মহাশয় বরিশালের প্রসিদ্ধ সিদ্ধমহাপুরুষ "সোনাঠাকুব" বলিয়া পরিকীর্তিত। তিনি লেখাপড়া বিশেষ জানিতেন না। প্রাথমিক জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতাব মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হইয়া পৈত্রিক কালীবাড়ি পূজকেব আসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। অচিরকালমধ্যে সে আসন তাঁহাকে শুধু আসনযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাঁহার কৃচ্ছ্রসাধনা জ্ঞানভাণ্ডার সমন্বয়যুক্ত সিদ্ধান্তেব ও তদুপযোগী প্রকাশ-যোগ্যতা জীবন পরিচালন দ্বারা বরিশালের ঐ কালীবাড়িকে একটি পূততীর্থে পরিণত করিয়াছিল। ঐ সাধক ও সাধনকেন্দ্রে ববিশালেব স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ সর্বশ্রেণীর শিবোমণিবর্গ সমবেত হইতেন। ববিশালেব অতিথিবর্গের ঐ কালীবাড়িতে উপস্থিত হওয়া একটা কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সারদানন্দ, পার্লামেন্টের মেম্বার কেয়ার হার্ডি, দেশপূজ্য নেতা স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিরাও সোনাঠাকুরের সাধনপীঠ দর্শন করিতে গিয়াছেন। বরিশালেব অধ্যাত্মগুরু আচার্য জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়, মহাভাগবত কবিরাজ পার্বতীচরণ রায় মহাশয়ও সোনাঠাকুরকে কালীবাড়িতে একত্রিত দেখাব উল্লেখ করিয়া রায় মহাশয়ের জীবনী গ্রন্থের ভূমিকায়[৪১] লিখিয়াছেন—"·· ঘটনাচক্রে থানার মহল্লার কালীমন্দিরে স্বর্গগত সোনাঠাকুরের চরণতলে উপবিষ্ট এই মহাপুরুষকে (৺পার্বতী রায়) একদিন দর্শন করিয়া চিরদিনেব সঞ্চিত সাধ পূর্ণ করিলাম। প্রথম দর্শনেই মনে হইল কোন যোগভ্রষ্ট অমরাত্মা বুঝি মনেব মানুষ খুঁজিতে মায়ের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাদের উভয়েব মৌন মিলন ও স্বল্পাক্ষর আলাপ শুনিয়া মনে হইল বরিশালভূমি সত্যসত্যই

৪০। রচয়িতার নাম অজ্ঞাত।

৪১। গ্রন্থাকার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দাস, এম. এ., এম. এল. এ.

রত্নপ্রসূ।[৪২] যৌবনের প্রারম্ভে শ্রীশ্রীগীতা গ্রন্থে স্থিতপ্রজ্ঞের বর্ণনা পাঠ করিবার সময় ভাবিতাম ভগবান বুঝি একটি কাল্পনিক চিত্র অঙ্কিত করিতেছেন……" ইত্যাদি।

সরকারী দপ্তরের হিসাবে বরিশাল বা বাখরগঞ্জ জেলাকে Granary of Bengal (বাংলার শস্যভাণ্ডার) বলিয়া জমির উৎপাদিকা শক্তির শ্রেষ্ঠত্বের সহিত Murderer District বা 'খুনী জেলা' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। যে মুহূর্তে বরিশালকে বাংলার 'লক্ষ্মীগোলা' বলিয়া লিপিবদ্ধ করিতেছি, ক্রমাগত শ্রুত সংবাদ হইতে সেই অন্নহীন বুভুক্ষা বরিশালের অগণিত নর-নারীর ভিক্ষান্ন হস্তে মনুষ্যত্বহীন পৈশাচিক চিত্র, যাহা মানসপটে প্রত্যক্ষ করিতেছি, আজ এই মুহূর্তে তাহার ক্ষত মর্মে বিদাহীস্পর্শের ন্যায় অসহনীয় বোধ হইলেও সত্য। "Encyclopedia Britanica" সাত সমুদ্র তেরো নদীর পাড়ে বসিয়া বরিশালের বিবিধ শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিলেও বাংলায় রচিত ও প্রচারিত "বিশ্বকোষ" ঐ সরকারী সুরে বাখরগঞ্জকে দুর্ধর্ষ ডাকাতের বাসস্থান বলিয়া ঘোষণা করা সত্ত্বেও একদা বরিশালের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটরূপে অবস্থিত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর, যশোহর জেলা নিবাসী বরিশালের ভূতপূর্ব সরকারী উকিল, দার্শনিক ও সাহিত্যিক মনীষী রায় গণেশচন্দ্র দাশগুপ্ত বাহাদুর, একদা ব্রজমোহন কলেজের প্রধান অধ্যক্ষরূপে অধিষ্ঠিত ও হাইকোর্টের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত উকিল ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রবীণ বৃদ্ধ খৃষ্টান মিশনারী কেরী সাহেব[৪৩] প্রভৃতির লেখা ও বক্তৃতায় বরিশাল সম্পর্কে তাহাদের সুউচ্চ ধারণা,

৪২ রত্নপ্রসূ :—এই ভূমিকা লেখক আচার্য জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বরিশালের গৌরবদৃপ্ত নিজস্ব সম্পত্তি হইলেও তাহার জন্মস্থান খুলনা জেলার বাগেরহাটের বাটরথানী নামক গ্রামে। তিনি ব্রজমোহনের অধ্যাপক ও স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন চিরকুমার ও পরম ভাগবত আচার্য মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের অধ্যাত্ম-জীবনের প্রতিরূপ। ছাত্রগণের জীবন গঠনে এই তপস্বী অধ্যাপকের দান অসামান্য। তাহার অধ্যাপনা ছিল সরল সহজবোধগম্য এবং এক অপূর্ব মাধুর্যে মণ্ডিত।

৪৩। কেরী সাহেব :—বাঙলা গদ্যের উন্মেষ ও গঠনের মূলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। 'বণিকের মানদণ্ড' যখন 'রাজদণ্ডরূপে' দেখা দিল; তখন ইংরাজরা বুঝিয়াছিল যে, এদেশে শাসনযন্ত্র চালাইতে হইলে ইংরাজ তরুণদের এ দেশীয় ভাষা ও রীতিনীতি শিখাইতে হইবে, আর তাহারই ফলস্বরূপ ১৮০০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। শ্রীরামপুরের পাদরীদের কর্তা উইলিয়ম কেরী হইলেন এই কলেজের বাঙলাবিভাগের অধ্যক্ষ। কেরী অধ্যক্ষ হইয়াই দেখিলেন যে, বাংলাভাষায় শিক্ষাদানের উপযোগী গদ্য গ্রন্থের একান্ত অভাব। তখন তিনি দেশীয় পণ্ডিত ও মুন্সিগণের দ্বারা পুস্তক রচনায় মনোনিবেশ

শ্রীঅরবিন্দের[৪৪] 'Nation Builders', 'মর্লি-মিণ্টো ডেস্‌পাচ্‌' (পত্রাবলী), লর্ড রোনাল্ডসে লিখিত 'Heart of Azrzacorto' প্রভৃতিতে পরোক্ষে ববিশালেব শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত লেখাসমূহে ববিশাল গণ্ডীতে অবস্থিত অধিবাসীর গৌরবোপলব্ধির প্রচুর উপাদান সংরক্ষিত হইয়াছে। অধস্তন পুরুষকে সুউচ্চ আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ করিতে শুধু ববিশাল কেন সমগ্র বাংলা তথা ভারতবর্ষকেও উদ্বুদ্ধ করাব আধুনিক ও প্রাচীন ইতিহাস রহিয়াছে। উহাব কার্যকবী শক্তির অনেকখানি নির্ভর করিবে আধুনিক ও ভবিষ্যৎ ববিশাল সন্তানেব উপব। সন্তান মুকুন্দে এই উপলব্ধির প্রাচুর্য ছিল। নব্য ববিশালেও সৃষ্টি ও আদর্শ শুনাইবার একাংশে মুকুন্দ বলিতেন—"পুণ্যে বিশাল এই ববিশালভূমি চাবিটি স্তম্ভের উপর অবস্থিত বহিয়াছে। সে চাবিটি স্তম্ভ অশ্বিনীকুমাব দত্ত, জগদীশ মুখোপাধ্যায়, কালীচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ ও ঠাকুব সনাতন চক্রবর্তী বা সোনা ঠাকুর।" মুকুন্দ-জীবন ইহাদের সম্মিলিত আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল। পবিবর্তন সূচনা হইতে বৈষ্ণব মুকুন্দ যজ্ঞেশ্বররূপে প্রায়শঃ উক্ত সোনাঠাকুবেব কালীমন্দিবে যাতায়াত করিতেন। ঠাকুবেব ও মন্দিবের কিছু সেবা কবাব জন্য মুকুন্দ

করিয়াছিলেন। বাইবেলেব অনুবাদ ছাড়াও কেরী বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ ও বাংলা-ইংরাজী অভিধান বচনা করেন। ইহা ছাড়া ও কথ্য ভাষায় বিচিত্র সংলাপের সংকলন "কথোপকথন" (১৮০১), আব গল্পকাহিনীব সংগ্রহ "ইতিহাস মালা" (১৮১২) বচনা কবেন। কেরী সাহেবের মুন্সী ছিলেন রামরাম বসু এবং উল্লেখযোগ্য সহকাবী ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কাব।

৪৪। অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২—১৯৫০) —শ্রীঅরবিন্দ এই যুগেব বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা, যোগী ও দার্শনিক। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ১৫ই আগষ্ট কলিকাতায় তাহার জন্ম হয়। তাহাব পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ ও মাতামহ রাজনারায়ণ বসু। সাত বৎসর বয়ঃক্রমকালে পিতা পাশ্চাত্য শিক্ষালাভের জন্য অপর দুই ভ্রাতাসহ তাহাকে ইংলণ্ডেব এক ইংরাজ-পরিবারে রাখিয়া আসেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দ গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় প্রথম স্থান অধিকাব কবিয়া সিভিল সার্ভিস পাস করেন। কিন্তু অশ্বারোহণ পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকায় তিনি চাকুবীর জন্য মনোনীত হন নাই। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ট্রাইপস্‌' পাস করার পর ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে দেশে ফিরিয়া তিনি বরোদা কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন এবং অধ্যক্ষ হন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হইলে অরবিন্দ উহাতে যোগদানের উদ্দেশ্যে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বরোদার চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া বাঙলায় আসেন এবং 'বন্দেমাতরম্‌' পত্রিকার কর্ণধার হন। তাঁহার আবির্ভাবে 'মরা গাঙে' যেন বান আসিল। দিকে দিকে "আনন্দমঠের" সন্তানরা পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের ব্রত গ্রহণ করিল। আর ঋষি অরবিন্দ বিবেকানন্দের সাধনা উপলব্ধি করিয়া তপশ্চর্যায় ব্রতী হইলেন ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির সন্ধানে। রবীন্দ্রনাথ এই ভারত-আত্মার মূর্ত প্রতীক ঋষি অরবিন্দ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"অরবিন্দ! রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।"

ফুরসত খুঁজিতেছেন। কীর্তন নিমন্ত্রণহীন অবসরের রাত্রিতে ইচ্ছু একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুসহ ঐ কালীবাড়ির বারান্দায় নিভৃতে বসিয়া থাকিতেন। অমাবস্যার নিশিপূজায় উপস্থিত থাকা ও গভীর নিশীথে প্রসাদ গ্রহণের পর প্রত্যাবর্তন প্রায় বাদ যাইত না। কালীবাড়ি যাতায়াতের প্রধান অন্তরঙ্গ সাথী ছিলেন আলেকান্দার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়, শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীর শিষ্য "স্বামী-শিষ্য সংবাদ" প্রণেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় পোস্ট অফিসের চাকুরী করিতেন, বদলী হইয়া কয়েক বৎসর বরিশালে কাটাইয়াছিলেন, তিনি নিয়মিতরূপে ঐ সোনাঠাকুরের কাছে কালীবাড়িতে যাতায়াত করিতেন। তিনি মাঝে মাঝে ঐ মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া গান গাহিতেন। তিনি সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। ঐ কালীবাড়িতেই মুকুন্দদাস শরৎবাবুর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করেন। শরৎবাবুর কণ্ঠের—

"আর কিছু নাই সংসারের মাঝে
কেবল কালী নাম সার রে।
আমার মন কালী ধন কালী প্রাণ কালী
আমার রে॥
কেহ সংসারে এসেছে বড় সুখে,
পেয়েছে রাজ্যভার রে।
আমার কাঙ্গালের ধন ও রাঙ্গা চরণ
হৃদয়ে পরেছি হার রে॥
এ তনু ধারণে এ তিন ভুবনে
যাতনা নাহিক কার রে।
কিন্তু মায়ের হেরিলে শ্রীমুখ দূরে যায় দুঃখ
এ গুণ শ্যামা মায়ের রে॥
কমলাকান্ত হইয়ে ভ্রান্ত
বেড়াইছে বারেবার রে।
এবার মায়ের অভয় চরণ লয়েছি স্মরণ
অনায়াসে হব পার রে।"

এই গানটি মুকুন্দের অন্যতম প্রিয় সঙ্গীতরূপে পরবর্তীকালে পালাসমূহের প্রায়গুলির মধ্যেই স্থান পাইয়াছিল। কীর্তনিয়া বৈষ্ণব যজ্ঞেশ্বরের ঐ সোনাঠাকুর

ও কালীমন্দিরের আকর্ষণ বিখ্যাত মুকুন্দদাসে আমরণ পরিদৃষ্ট হইয়াছে। দেশ-বিদেশে ভ্রমণান্তে বরিশাল শহরে ষ্টীমার হইতে নামিয়া প্রথমেই ঐ থানার মহল্লার কালীমন্দির ও সোনাঠাকুরের সমাধি মন্দিরে প্রণাম ও প্রণামী দিয়া আশীর্বাদ ও প্রসাদসহ স্বগৃহে পৌছাইতেন। বরিশালে অবস্থানকালে ঐ কালীমন্দিরে সন্ধ্যায় প্রণাম করিতে যাওয়া একটা নিত্যনৈমিত্তিক কাজ ছিল। কালীপুরস্থ বাড়িতে রাধাগোবিন্দের মন্দির ও সংলগ্ন স্বতন্ত্র বাড়িতে একই সময় আনন্দময়ী আশ্রম ও বরিশালের কারিগর দ্বারা থানার মহল্লার কালী-মূর্তির অনুরূপ সিমেন্টের কালীমূর্তি প্রস্তুতের মধ্যে মুকুন্দের অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধাশীল চিন্তার রূপ পরিস্ফুট হইতে চাহিয়াছে। মুকুন্দের অভিনয় ও সঙ্গীতে দেশ-মাতৃকা এই জগদম্বা, মহামায়া কালীরূপে বিকশিত হইয়াছে। রূপ, অরূপ, মূর্ত, অমূর্ত, জড, চেতন,বাস্তব ও আদর্শের মাখামাখিতে ভুবনমনমোহিনী বিশ্বকল্যাণ মায়ামূর্তিতে প্রকটিত হইয়া অগণিত ভক্ত জনগণকে মুগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

এখন বৈষ্ণব মুকুন্দের শাক্ত পরিচয়ের একটি বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ কবিয়া এই অধ্যায় শেষ করিতেছি। বরিশাল জেলার মাতাজী পরিচয়ে এক সন্ন্যাসিনী ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল শ্রীযুক্তা সরোজনী দেবী। বরিশালের 'শঙ্কর মঠ' প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর ইনি সহোদরা। ইনি বরিশাল ও বাঙ্‌লার বিভিন্ন জেলায় অসংখ্য নর-নারীর শ্রদ্ধাকর্ষণ করিয়াছেন। বিভিন্ন স্থানে মাতাজীর বহু শিষ্য-শিষ্যা আছেন। বৈষ্ণব মুকুন্দ এই মাতাজীর নিকট দ্বিতীয়বার দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মাতাজীর সাধনশক্তিতে মুকুন্দের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এই শিষ্যের প্রতিও মাতাজীর পুত্রোপম স্নেহ ছিল। মুকুন্দদাস স্বীয় বাড়ি সংলগ্ন কালীমন্দির, আনন্দময়ী মহিলাশ্রমের বাড়ি, কতক ধানকডারী জমিসহ মাতাজীর নামে রেজেস্টারী দলিল করিয়া তাঁহাকে সর্ব ক্ষমতাসম্পন্না ট্রাষ্টী নিয়োগ করিয়াছিলেন।

শাক্ত পরিচয়ের মুকুন্দ ও বৈষ্ণব মুকুন্দে ভাবেব কোন বিরোধ ছিল না। শ্যাম-শ্যামা, কালী-বনমালী, অসি-বাঁশী, তাঁহার জীবন-সাধনায় বিশৃঙ্খল সৃষ্টি করে নাই। রামানন্দ গোস্বামী এবং মাতাজীর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ দ্বাবা কাহারো প্রতি মুকুন্দের শ্রদ্ধার ন্যূনাধিক্য দৃষ্ট হয় নাই। আনন্দময়ী আশ্রম হইতে প্রকাশিত "অশ্বিনীকুমার" নামক স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্তের জীবনীগ্রন্থে গ্রন্থকারের বিস্মৃতিবশতঃ প্রসঙ্গক্রমে লিখিত মুকুন্দদাস সম্পর্কীয় পরিচয়ে তাঁহাকে একমাত্র রামানন্দের শিষ্য বলিয়া উল্লেখ থাকায় জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর দিয়া-ছিলেন—"পরিচয়টা মিথ্যা নয়তো হে, রামানন্দ কৃপা আমার জীবনের মূলধন।"

অষ্টম অধ্যায়

কংগ্রেস—বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে জাতীয় কংগ্রেস ছিল একক, অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের গৌরবময় অধ্যায়। ১৮৮৫ হইতে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ অবধি—এই প্রতিষ্ঠানই ছিল পরাধীন ভারতবাসীর মুক্তিকামী সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ অবধি জাতীয় আন্দোলনের যে বিরাট অধ্যায়, তাহাকে 'গান্ধীযুগ' নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। রাজনীতিতে গান্ধীজীর নূতন অবদান—'অহিংসা নীতি'। গান্ধীজি গভীরভাবে বিশ্বাস করিতেন যে, পশুশক্তি যতই স্পর্ধিত হউক না কেন, সত্য ও ন্যায়ের পথে নৈতিক শক্তির সাহায্যে উহাকে প্রতিরোধ করিলে উহার পরাজয় ঘটিবেই। ইহারই নাম—'সত্যাগ্রহ'। বাহ্যিক প্রচেষ্টায় বল প্রয়োগের নীতি নহে, মনোবল, নিরস্ত্র সংগ্রাম এবং গণজাগরণই হইতেছে শ্রেষ্ঠ বল। আর এই গণজাগরণের গান গাহিবার জন্য এই দেশের মাটিতে আবির্ভূত হইলেন—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, স্বাধীনতার অগ্রদূত গোবিন্দ দাস, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, সত্য-শিব সুন্দরের পূজারী কবি রবীন্দ্রনাথ, ছন্দের কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, বরিশালের জন্মদাতা অশ্বিনীকুমার, কবি ও কথক হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং চারণকবি মুকুন্দদাস। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে প্রাদেশিক কংগ্রেস অধিবেশন যখন বরিশালে হয়, তখন নবীন সন্ন্যাসীর ন্যায় মুকুন্দদাস মণ্ডপের উচ্চমঞ্চে দাঁড়াইয়া উদাত্তকণ্ঠে গাহিলেন—

> "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
> তবে একলা চলোরে।"

দশ হাজার লোক যেন নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া গান শুনিতেছিল। তখন মাইক ছিল না, কিন্তু বিরাট আসরে কাহারও শুনিতে কোন অসুবিধা হয় নাই। একটু আগে যে আসরে গোলমাল হইতেছিল মুকুন্দের আবির্ভাবের সঙ্গে

সঙ্গেই এবং উদ্দীপনামূলক স্বাধীনতার গানে সবাই যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পড়িল। মুকুন্দ তখন গাহিতেছেন—

"জাগো-গো জাগো জননী
তুই না জাগিলে শ্যামা,
আর কেহ জাগিবে না,
তুই না নাচিলে কারো নাচিবে না ধমনী ॥"

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সন্ত্রাসবাদী উচ্ছ্বাস বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যে স্ববিরোধগুলিকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল, তাহার বাঙ্‌ময় এবং গীতময় আত্মপ্রকাশ যে মানুষগুলিকে বাহন করিয়াছিল, চারণকবি মুকুন্দদাস তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

'বুয়র-যুদ্ধ', 'রুশ-জাপান যুদ্ধ' দেশের সর্বশ্রেণীর অধিকাংশ নর-নারীর স্বাধীনতালাভের আশায় এক ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল। ফলে যুদ্ধ-সংবাদ-সংবলিত সংবাদপত্রগুলি মানুষের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিল। নিভৃত পল্লীবাসী দেশীয় ভাষায় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ডাকযোগে প্রাপ্তির বিলম্বে উৎকণ্ঠিত হইত। গ্রামে তাস-পাশার অলস আড্ডাগুলিও যুদ্ধালোচনায় মুখর হইয়া উঠিল। সংবাদ-সন্ধানী প্রায়াংশের মনোভাব 'বুয়র' ও 'জাপানের' পক্ষাবলম্বন করিতে দেখা যাইত। বহুর কাছে উহার কোন হেতু বা যুক্তি ছিল না—উহা ছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবের একটা প্রকাশ মাত্র। দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার ইহাই ছিল স্বাভাবিক সহানুভূতির কারণ। কিন্তু জাপান সম্বন্ধে তখন কতকটা এশিয়ার নৈকট্য প্রভাব ছিল বলিয়া মনে হয়। এদিকে বাঙ্‌লার 'বীরাষ্টমী ব্রত', মহারাষ্ট্রের 'শিবাজী গণপতি উৎসব' নব প্রেরণার একটা চাষ ভারতীয় চিত্ত-ক্ষেত্রকে নব শস্য বপনের উপযোগী করিয়া তুলিতেছিল। ইহারও প্রায় ২০ বৎসর ১৮৮০, খৃষ্টাব্দের অল্প পরেই বরিশালে অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় সুদৃঢ় ভিত্তিতে জাতীয় জীবন গঠনের একটা চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছিলেন।[৪৫] তদীয় সর্ববিধ প্রচেষ্টা "ভারতগীতি"[৪৬] রচনা,

৪৫। অশ্বিনীকুমার দত্ত জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সকল সময়েই পুরোভাগে থাকিলেও তাহার প্রধান লক্ষ্য ছিল জনসেবা, প্রেম ও সংগঠন। দুঃস্থ, আতুর, অনাথ, নিরাশ্রয়ের নিকট তাঁহার দ্বার ছিল অবারিত। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠান তাহার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত হয়। এই সভার পক্ষ হইতেই বরিশালের দুর্ভিক্ষের জন্য অশ্বিনীকুমার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং দূর-দূরান্ত হইতে সাহায্য পাইয়াছিলেন। কলেরা

গীত ও প্রচারিত হওয়ার মধ্যে একটা রূপ গ্রহণের চেষ্টা করিতেছিল। নিম্নে এই সকল গানের নমুনাস্বরূপ কয়েকটি বিক্ষিপ্ত পদ উদ্ধৃত হইল :

(১) "সোনার এই রাজ্য ছিল, ক্রমে-ক্রমে সকল গেল
এমন যে ভারতবর্ষ গেল ছারখারে।"

(২) "হায়! হায়! কি হইল, এতে দৈত্যদানব এলো
লুঠি নিল যাহা ছিল এ স্বর্ণমন্দিরে পশি।"

(৩) "বিধি কি নিদ্রিত আজ মনে কর বিদেশীগণ
আজিও সে ন্যায়দণ্ড করিছে সবে শাসন।"

অশ্বিনীকুমারের রচিত এই সকল গীতাবলীর মধ্যে বিদেশী বর্জন, স্বদেশী-গ্রহণ, বিদেশী সাজ-সজ্জা ও আহারাদি অনুকরণের প্রতি তীব্র কটাক্ষ, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির আত্মহত্যাকারী নির্বুদ্ধিতা ইত্যাদি সহজভাষায় সর্বজনবোধ্যরূপে প্রচারিত হইতেছিল। তাঁহার "ভক্তিযোগ"[৪৭] ও "কর্মযোগে"[৪৮] যেন শুধু

রোগীকে তিনি নিজের কাঁধে বহন করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করাইয়াছিলেন। পতিতার পুত্রকে তিনি পরম স্নেহে গ্রহণ করিয়া তাহার ভবিষ্যতের পথ উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন। ঋষি রাজনারায়ণ বসু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "কাজ করিতে হইলে বরিশালে থাকিও, আর নাম করিতে হইলে কলিকাতায় আসিও।" তিনি কর্মযোগী ছিলেন তাই কর্মকেই বাছিয়া লইয়াছিলেন, নাম আপনা হইতেই সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। স্বদেশীযুগে বরিশাল "বাঙ্গলার বোম্বাই" বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে সুরাট কংগ্রেস উপলক্ষে যখন তিনি মাদ্রাজে গিয়াছিলেন, তখন রাস্তায় বাহির হইলেও চারিদিক হইতে ধ্বনিত হইত 'অশ্বিনীকুমার দত্ত কি জয়'।

৪৬। ভারত গীতি :—"জনৈক ভারত-ভৃত্য" কর্তৃক রচিত "ভারত গীতি" নামে কয়েকটি জাতীয় সঙ্গীতের একখানা ক্ষুদ্র পুস্তিকা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় একটি ক্ষুদ্র গায়ক সংগ্রহ করিয়া প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় বাজারের রাস্তার মোড়ে একটা কাঠের বাক্সের উপর দাঁড়াইয়া রাস্তার লোক, দোকানদার, খালের ধারে বা নদীর ধারের লোকদের এবং মাঝি-মাল্লাদের উদ্দেশ্য করিয়া গানের সংযোগে রাজনীতি ও অর্থনীতির সরল তথ্য লইয়া বক্তৃতা করিতেন। এই প্রচারকার্য কংগ্রেসের অন্ততঃ একুশ বৎসর আগেকার বৃত্তান্ত। অশ্বিনীকুমারের পূর্বে ভারতের কোথাও এই সকল কথা ঠিক এইভাবে প্রচারিত করিয়া জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতে কেহ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিনা, তাহা জানা যায় না।

৪৭। ভক্তিযোগ :—১৮৮৭-৮৮ খৃষ্টাব্দে অশ্বিনীকুমার দত্ত ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে "ভক্তিযোগে"র উপর যে বক্তৃতা দেন তাহাই পরে গ্রন্থাকারে "ভক্তিযোগ" নামে প্রকাশিত হয়।

৪৮। কর্মযোগ :—১৯১৪ খৃষ্টাব্দে "কর্মযোগ" প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে অশ্বিনীকুমার দত্ত শ্রীমদ্ভাগবদগীতায় ব্যাখ্যাত কর্মতত্ত্ব পূর্ব ও পরবর্তী বহু শাস্ত্রীয় বচন ও যুক্তিদ্বারা সহজ ও সরলভাবে ব্যাখ্যা করেন। "ভক্তিযোগে"র পর "কর্মযোগ" রচিত হইল কেন? ইহার উত্তরে অশ্বিনীকুমার

গ্রন্থ নয়, জাতির নিকট তাহা যেন জীবনবেদ। ইহা ব্যতীত তিনি ধর্ম-বিষয়ক আর কোন বক্তৃতা দেন নাই বা গ্রন্থ লেখেন নাই। কিন্তু কতিপয় "ধর্ম-সঙ্গীত" রচনা করিয়াছিলেন। ঐ সকল সঙ্গীতের নমুনাস্বরূপ কয়েকটি বিক্ষিপ্ত পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

(১) "প্রেম-গিরি কন্দরে যোগী হ'য়ে রহিব
আনন্দ-নির্ঝর-পাশে যোগধ্যানে বসিব।"

(২) "লুকানো মাণিক তুল্‌বি যদি ডুব দে প্রেম-সাগরের জলে
খুঁজলে পরে যেথা-সেথা সে ধন কি ভাই অমনি মিলে ?"

(৩) "তুমি মধু, তুমি মধু, তুমি মধু মধু মধু
মধুর নির্ঝর, মধুর সায়র, আমার পরাণ বধূ।"

প্রেমে অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় যেন জন্মসিদ্ধ ও স্বভাবসিদ্ধ ছিলেন। অন্তরীণে থাকিয়া লক্ষ্ণৌ জেলে বসিয়া তিনি গান লিখিলেন—

"আমি তোর মুখ ফুলানো
ভগবানের ধার ধাবি না ভাই···
স্ফূর্তি আমার প্রাণ।"

এই জাগ্রত মনোভাবের অনুকূলে দেশীয় শিল্পের সৃষ্টি ও প্রসারের চেষ্টা করা হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, বরিশালে শুধু দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য সরবরাহের জন্য 'National Agency' নামে নিছক স্বদেশী দোকান বসিয়াছিল। সেদিনের সেই দেশী জিনিসের মধ্যে সর্ববিধ বিদেশী উপকরণ স্বদেশী হস্তে যোজিত হইয়াও স্বদেশী আসন লাভ করিত। স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র রায়ের "কতকাল পরে বল ভারতরে দুঃখ সাগর সাঁতারি পার হবে" ইত্যাদি সঙ্গীত নিখিলবঙ্গে প্রায় জাতীয় সঙ্গীতের আসনলাভ করিয়াছিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত 'হর হর মহাদেব ব্যোম' এই ধ্বনি অল্লাধিক 'হিপ্। হিপ্! হুররে'র স্থান দখল করিতেছিল। বরিশালের মত বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপে যে চেষ্টা চলিতেছিল, বাঙলার নেতৃবর্গ সেই ভাব ও প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করার জন্য ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে একটি 'স্বদেশী মেলা'র অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ বৎসরেই মাদ্রাজ নগরীতে ১৭ জন মাত্র প্রতিনিধি লইয়া মহাসভার সূচনা হইয়াছিল।

বলিয়াছেন—"ভক্তির পরে কর্ম, ভক্তিহীন কর্মই বন্ধনের হেতু। ভক্তি ব্যতীত যে কর্ম, সেই কর্মেই হলাহল উদ্গীরিত হয়। ভক্তির পর কর্ম না হ'লে সে তো কর্মভোগ যোগ হয় না।"

'স্বদেশী মেলা'র জন্য সেবারে বাঙ্‌লার কোন প্রতিনিধি তথায় যোগদানে সমর্থ হন নাই। পরবর্তী বৎসর বাঙ্‌লার প্রতিনিধিরা বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করিলেন।

৬০ বৎসর পূর্বে ইংরাজী শিক্ষা আমদানির পরিণত অবস্থায় ভারতীয় আবহাওয়ায় একটা বিচ্ছিন্ন অসন্তোষ উঁকি মারিতেছিল। রাজনীতি জ্ঞান-সম্পন্ন শাসক শক্তির দৃষ্টি তাহা এড়াইল না। সেই অসন্তোষের স্বরূপ অবগত হইয়া ও আয়ত্তে রাখিয়া উহা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটা রাজনৈতিক কৌশলপথে প্রবীণ রাজপুরুষ হিউম সাহেবের দূতিয়ালীতে আজিকার বিপ্লবী কংগ্রেস সেই রাজশক্তি দ্বারাই সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রবীণ ভারতীয়েরা বৎসরান্তে মিলন ও সঙ্ঘবদ্ধতার প্রলোভনে এবং রাজকীয় পক্ষ নিরাপদ নির্গমন যন্ত্র (Safety valve) রূপে পাওয়ার জন্যে রাজী হইলেন। শাসক ও শাসিতের যোগাযোগে কংগ্রেস আরম্ভ হইল।

কংগ্রেস জন্মের [৪৯] পূর্ব হইতেই বাঙ্‌লায় যে সাধনা শুরু হইতেছিল তাহার উল্লেখ করিয়াছি। পরবর্তী বিশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্‌লার ক্রমসঞ্চিত শক্তির প্রতি ব্রিটিশ কূট-রাজনীতিজ্ঞদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। বাঙলার সেই শক্তিকে খর্ব করিতে বাঙ্‌লাদেশকে দুইভাগে বিভক্ত করার পরিকল্পনা স্থির হইল। বাঙ্‌লার রাজনৈতিক চেতনা রাজসরকারের কৌশল শুনিবামাত্র উহা উপলব্ধি করিয়া প্রতিবাদ আরম্ভ করিল। বড়লাট লর্ড কার্জন [৫০] দেশ-বিভাগের

৪৯। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সর্বপ্রথম অধিবেশন আহূত হয়। বাঙালী ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টায় যে 'Indian National Conference' স্থাপিত হইয়াছিল তাহা উহার সহিত মিলিত হইয়া যায়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে অদ্যাবধি প্রতি বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশন ভারতের কোন না কোন স্থানে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

৫০। লর্ড কার্জন (১৮৫৯—১৯২৫ খৃঃ) :—ভারতের রাজপ্রতিনিধি হিসাবে ইঁহার নাম বিশেষ খ্যাত। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ইনি 'ভাইসরয়' হইয়া ভারতে আসেন। ইঁহার শাসন সময়ে বহু নূতন আইন বিধিবদ্ধ হয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর তাঁহার স্মরণার্থে কলিকাতার 'Victoria Memorial Hall' নামক সৌধ নির্মাণের জন্য ইনি প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইনি দেশীয় রাজ্যসমূহের রাজবংশীয় যুবকগণকে লইয়া একটি অবৈতনিক সৈনিক সম্প্রদায় গঠিত করেন, ইহা 'Imperial Cadet Corps' নামে অভিহিত। ইঁহারই সময় 'North Western Frontier Province' নামে একটি নূতন প্রদেশ গঠিত হয়। ইনি বাঙ্‌লাদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। এই ব্যবস্থা 'বঙ্গভঙ্গ' নামে আখ্যা লাভ করে। তাহার ফলে স্বদেশী

দৃঢ় সংকল্প লইয়া অগ্রসর হইলেন। কোন প্রতিবাদই আবেদন-নিবেদনের আকারে গৃহীত হওয়ার ভরসা বাঙ্‌লায় তিরোহিত হইতে লাগিল। শুধু যে সরকার বিমুখ তাহা নহে, কংগ্রেসের নিকটও বাঙ্‌লার এই বিষণ্ণ অবস্থাটা প্রাদেশিক বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। রাজপ্রতিনিধি স্বয়ং জনমত অনুকূলে আনিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহরে উপস্থিত হইয়াছেন। জনমত বিশেষ পরিবর্তন হইল না, কিন্তু হিন্দু-মুসলমান-ভেদের বীজ আরোপিত হইল। সমস্ত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ঘোষণা প্রচারিত হইল। ১৬ই অক্টোবর পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ পৃথক হইয়া যাইবে। সর্ব-বাঙ্‌লার নেতৃমণ্ডলীর আহ্বানে ৭ই আগস্ট তারিখে কলিকাতা টাউন হলে অভূতপূর্ব জনসমাবেশে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বিলাতী বয়কট অর্থাৎ বৃটিশের বস্ত্রাদি যাবতীয় জিনিস বর্জনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। বঙ্গভঙ্গ রহিত না হওয়া অবধি এই সংকল্পে অটুট থাকিতে বাঙালী জাতিকে এই যে অনুরোধ, বিদ্যুৎগতিতে তাহার জাতির শ্রুতি স্পর্শ করিল। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ঘোষণা করিলেন 'বঙ্গভঙ্গ' আদেশ বদ করিতেই হইবে। ঋষি অরবিন্দ প্রত্যক্ষ করিলেন ভারতের আত্মারূপে ভবানীকে, লিখিলেন "ভবানী মন্দির"। কবিগুরু লিখিলেন—

"আজি বাঙ্‌লা দেশের হৃদয় হ'তে কখন আপনি,
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হ'লে জননী।"

একই চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছিল—দুইটি ধ্যানীমানসে।

জাতির বিচ্ছিন্ন মনোভাবকে সর্ব-ভারতীয় স্তরে নিয়ন্ত্রিত করিতে কংগ্রেস অধিকারীর স্থান গ্রহণ করিলেন। ক্রমবর্ধমান কংগ্রেসের বিরাট শক্তির উপাদান যোগাইতে বাঙ্‌লার দান অবহেলার তো নহেই, পরন্তু সুপ্রচুর বলিলেও অত্যুক্তি হয় বলিয়া মনে হয় না। কংগ্রেস সৃষ্টির পূর্ব হইতে বাঙ্‌লার নিরালা তপস্যা, কংগ্রেসের সহিত তাহার সবখানি লইয়া যুক্ত হইতে চেষ্টা করিল। বাঙ্‌লার অগ্রগতি বহুসময় কংগ্রেসকে বিব্রত করিয়াছে, নিজেও প্রত্যাখ্যানের আঘাত সহ্য করিয়াছে। সেই প্রত্যাখ্যান বাঙ্‌লার তপস্যাকে হতোদ্যম করে নাই। বাঙ্‌লার তপস্যা বৈভব বঙ্গভঙ্গ অবলম্বনে, সংঘবদ্ধ দৃঢ় সংকল্পের পথে সর্ব-ভারতীয় জাতীয় জীবনকে এক অভিনব জয়যাত্রার অমোঘ সন্ধান প্রদান

আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। তাহাতে সরকার এই ব্যবস্থা রহিত করিতে বাধ্য হন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ইনি পদত্যাগ করেন।

করিল। অরবিন্দ উপলব্ধি করিলেন—যে পরম লগ্নের জন্য তিনি 'রাত্রির তপস্যা' করিয়াছিলেন, অধীর আগ্রহে প্রহর গুনিতেছিলেন, সেই বহু প্রতীক্ষিত লগ্ন সমাগত। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—

"এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে,
'জয় মা' বলে ভাসা তরী।"

সব্যসাচী কর্মযোগী ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের যে মন্ত্র "আনন্দমঠের" মধ্যে মুক্তির প্রতীক্ষায় ছিল, ভারতপথিক বিবেকানন্দের "উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত"-এর মধ্যে যাহা জাগ্রত হইল তাহাই 'প্রাণহীন এদেশেতে, গানহীন যেথা চারিধার" সেখানে এক মুহূর্তে বাঙ্‌লার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে সাড়া জাগাইল। স্বদেশী ও বয়কট উপলক্ষ্য করিয়া অশ্বিনীকুমারও প্রবৃত্ত হইলেন ভারতের মুক্তি সাধনে। তাঁহার "ভক্তিযোগে" দীক্ষিত "কর্মযোগে"র নারায়ণী সেনা সমগ্র বরিশাল জেলার গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে, বন্দরে বন্দরে, হাটে বাজারে স্বাধীনতা ও স্বদেশ-প্রেমের আহ্বান শুনাইলেন—কখনো প্রাণমাতানো বক্তৃতায় এবং কখনো সঙ্গীতে, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ লিখিলেন—"আজ বরিশাল পুণ্যে বিশাল হ'লো লাঠির ঘায়", "আমায় বেত মেরে কি মা ভুলাবে" ইত্যাদি। রজনীকান্ত সেন লিখিলেন—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড
মাথায় তুলে নে রে ভাই।"

বিব্রত ও বিপন্ন সরকার 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি'কে বে-আইনী ঘোষণা করিলেন, ঢাকার 'অনুশীলন সমিতি', মৈমনসিংহের 'সুহৃৎ সমিতি' এবং ফরিদপুরের 'ব্রতী সমিতি'ও নিষিদ্ধ হইল। দুর্গামোহন সেন এবং চারণকবি মুকুন্দদাস—একে একে কারারুদ্ধ হইলেন।[৫১]

বাঙ্‌লার সেই আন্দোলনে অপ্রত্যাশিত ত্যাগ, তিতিক্ষা, নির্ভীক সাহসিকতা, সংকল্পে দৃঢ়তা, প্রত্যয়ে অটুটতা প্রভৃতি বন্যার মত আসিয়া বাঙ্‌লাকে ভাসাইয়া ডুবাইয়া কৃতার্থ করিয়াছিল। বাঙ্‌লার এই বিরাট আন্দোলন পর্বে ক্ষুদ্র বরিশাল সমগ্র ভারতে বিশেষ গৌরবের স্থান অধিকার করিয়াছিল। মাদ্রাজে ডিউটি করিতেন এমন জনৈক বিশিষ্ট নেতা বাঙ্‌লার বরিশাল গড়িয়া তুলিবার সংকল্প ঘোষণা করিয়াছিলেন। জনৈক শ্বেতাঙ্গ

৫১। "অশ্বিনীকুমার" নামক বরিশাল হইতে প্রকাশিত স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্তের জীবনীগ্রন্থে কংগ্রেস, বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী আন্দোলন প্রভৃতির বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

বরিশাল ঘুরিয়া 'English Man' পত্রিকায় লিখিলেন—"বরিশালে বৃটিশ সম্ভ্রম বিলুপ্ত, যেখানে কোন বিদেশীর পক্ষেও কোন বিদেশী জিনিস কিনিতে হইলে নেতার আদেশ ছাড়া এক পয়সার জিনিস কেনার সম্ভাবনা নাই" ইত্যাদি। বরিশাল জেলায় মদের দোকান, বিলাতী বস্ত্র, লবণ—প্রায় শূন্যাবস্থায়। সরকারী বিবরণ দৃষ্টে এক পক্ষের রোষ এবং অপর পক্ষের হর্ষ, সংবাদপত্র ও ভারতীয় জনসাধারণের আলোচ্য বিষয় হইয়াছিল ; শুধু ভারতে নয়, বিলাতী কাগজ ও তত্রত্য অধিবাসীদের দৃষ্টিও আকর্ষণ করিয়াছিল। তৎকালীন ভারত-সচিব লর্ড মর্লি, বড়লাট লর্ড মিণ্টোকে এক গোপন পত্রে বরিশাল সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে 'মর্লি স্মৃতি' পুস্তকে তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই পত্রের মর্ম ছিল—"আমরা উভয়েই এখন ভারতীয় সমস্যার সীমান্তপ্রদেশ ও বরিশাল নিয়াই চিন্তিত" ইত্যাদি। 'পুণ্যে বিশাল বরিশাল'—বরিশালের কোন লেখক বা কবির লেখনী-কল্পনা-প্রসূত নহে, উহা বরিশালের বাহির হইতেই স্বতঃ উত্থিত সেদিনকার বরিশালের স্তুতি। যেদিন সমগ্র বাঙলা আন্দোলন প্রবাহে স্নাত-প্লাবিত হইয়া নবরূপে অভিযান করিল, সেই অভিযানে উহার দর্শক, সমগ্র ভারত ও বৃটিশ শাসকবর্গের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল পুরোভাগে অবস্থিত ঐ বরিশালভূমির উপরে। এই দৃষ্টি আকর্ষণ দৈবাৎ সংঘটিত কোন একটি কার্যের জন্য নহে। উহার পশ্চাতে আজন্ম স্বর্গীয় পবিত্র-মণ্ডিত একজন কুশলী কর্মী, পরম প্রেমিক পুরুষের, পঞ্চবিংশ বর্ষের নীরব তপস্যার শক্তি নিহিত ছিল। সেই শক্তিমান সাধক পুরুষ ছিলেন স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়। তিনি সত্য-প্রেম-পবিত্রতার পতাকাতলে শিক্ষা-সংস্কার, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, সমাজ সমন্বয়ে কাহাকেও উচ্চে, নিম্নে স্থান না দিয়া ভারতীয় জীবনধারাকে এক নূতন সংগঠনী সাজে সজ্জিত করিতে চাহিয়াছিলেন : তাহাই সেদিন ঐ মূর্তিতে প্রকটিত হইয়াছিল। স্থূল দর্শকের চোখে সাময়িক অভিব্যক্তিটুকু চমৎকৃত করে। পশ্চাতের গঠনটা অদৃষ্টরূপেই থাকে। জাতির, বিশ্বের সেবক, সাধকের দৃষ্টিতেও যখন অদৃষ্ট থাকে তখন সুর হারাইয়া সাধনক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। উহাতে ব্যাপক অগ্রগতির পথে বর্তমানে প্রচুর বাধার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু সে সত্য গতিকে বন্ধ করিতে পারে নাই। সে গতি পাষাণ সদৃশ শুষ্ক ভূমির গভীর তলদেশ দিয়া সাগরাভি-মুখী গতিকে অব্যাহত রাখিয়াছে, সে যে অনবরুদ্ধ, অদাহ্য, অশোধ্য! সেদিনের সেই উচ্ছ্বাস-পরিপূরিত বেগ ধরার বুকে শুকাইয়া মিলাইয়া যায় নাই। অন্তঃশালিনী প্রবাহিণীর মত শত শত পায়ের দুর্লঙ্ঘ্য গিরিবন ভেদ করিয়া

জাতীয় জীবনের আপন লক্ষ্যের প্রয়োজন স্বরূপ প্রকটিত করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। এ পরিচয়, এ আত্মাস্বরূপ সম্বিত, রস-সঞ্চারী প্রাণদ। দেউলিয়া নেতৃত্বের পটভূমিতে দাঁড়াইয়া বাঙ্‌লার গৌরব স্মরণ, কাঙালের রাজপুত্র পরিচয়ের মত লজ্জাজনক হইলেও এই লজ্জার হেতু অনুসন্ধান করিতে, সত্যিকার উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করিতে এই স্মরণের প্রয়োজন আছে। কিন্তু শুধু পরিচয়ের মূলধনে রাজপুত্র হইতে গেলে রাজত্ব অপেক্ষা লাঞ্ছনাই লাভ হইবে। তাই আজ আবার সেই পৈত্রিক ধনের অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমাদের দৃষ্টি দূর দূরান্তের জাঁকজমকের মধ্যে নিজত্বকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু সেই শাসক শক্তির কবল-মুক্ত হইতে চেষ্টা করিয়াও আমরা পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ হই, তাহাদের দৃষ্টি আমাদের শক্তিকেন্দ্রকে জনবল, অস্ত্রবলে 'পরিমাপ করে নাই। সে দৃষ্টির একটু পরিচয় আমরা বাঙ্‌লার ভূতপূর্ব গভর্নর লর্ড রোনাল্ড্‌সে লিখিত "হার্ট অব্‌ আর্যাবর্ত" গ্রন্থে পাইতে পারি। ঐ গ্রন্থে তিনি ভারতীয় গণ-জাগরণের একটি ধারার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও আধ্যাত্মিকতার প্রভাব প্রমাণ করিয়াছেন। গ্রন্থকার উহাকে 'Religio-Politics' নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বরিশাল কনফারেন্সে প্রদত্ত শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র (কুমার ?) ঘোষ মহাশয়ের বক্তৃতার উল্লেখ করিয়াছেন। লর্ড রোনাল্ড্‌সের সেই লেখার পরে পঁচিশ বৎসর অতীত হইয়াছে। আজিও জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে ভারতের কোটি কোটি নরনারী যে শক্তিকেন্দ্রে উত্তরোত্তর অধিকতররূপে আপনাকে লীন করিতে চাহে তাহা হইল পাশবিকতা, সংকীর্ণতা লেশহীন প্রেম-সংগ্রাম। কামান-গোলাগুলি নাই—যুদ্ধ আছে। বিশ্ব-কল্যাণ ও স্বদেশ-প্রেমের বিরোধ তিরোহিত হইয়াছে, আদর্শ ও পন্থার পার্থক্য মুছিয়া জাগতিক মুক্তির অভিনব স্বতন্ত্র মূর্তি প্রকট করিয়া ধন্য হইয়াছে। বিস্মিত বিশ্বশক্তি স্বীকার করে, কিন্তু তাহাতে মুক্তির পূর্ণ প্রত্যয় নাই। শক্তিকেন্দ্রের সাধকগণেরও অনেকাংশে উপলব্ধির অভাব পরিস্ফুট। বহির্দৃষ্টির ত্রুটি কাটাইয়া আত্মস্থ হইতে পারিলে এই শক্তি অজেয় দুর্নিবার বিশ্ব-বিজয়ী হইয়া উঠে।

বাঙ্‌লা—সেই বিজয় অভিযানের প্রথম যাত্রী, প্রথম গতিবেগ সৃষ্টির গৌরবাধিকারিণী। সেই অধিকারিণী বাঙ্‌লার, বরিশালের আভিজাত্য, ধন, বিত্ত, শিক্ষা প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রের একটি নগণ্য প্রায় ক্ষুদ্র মানুষ স্বর্গীয় মুকুন্দদাস মহাশয় বাঙ্‌লার বুকে অপূর্ব শিহরণ তুলিয়া নিজেকে ও দেশকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্‌লার সেই বাসন্তী হিল্লোলের আগমনী ঝঞ্ঝায় বাঙ্‌লার মাটিতে, বাঙ্‌লার জলে বৈষ্ণব মুকুন্দ উদ্ভাসিত দেখিলেন মায়ের মহামূর্তিখানিকে। মুকুন্দ

মায়ের সন্তানের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন—ভাইসকল নিদ্রিত। ঘুমন্ত সন্তানের নিদ্রাভঙ্গের ব্যর্থ প্রয়াসে সময় ব্যয় না করিয়া তিনি তাঁহার বুকজোড়া উদাত্তকণ্ঠে ডাকিলেন – মা! মা! মা! সেই ব্যাকুল ডাকের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা আসিল—

"জাগো গো জাগো গো জননী……
তুই না জাগিলে শ্যামা, কেউ তো জাগিবে না মা
তুই না নাচালে কারো নাচিবে না ধমনী
জাগো গো জাগো গো জননী।"

মা সাড়া দিলেন, কিন্তু, যেন নিষ্ক্রিয় ত্রস্ত ব্যাকুলকণ্ঠে মুকুন্দ ডাকিলেন—

"আয় মা তারিণী, করাল বদনী,
ডাকিনী যোগিনী সব নিয়ে আয়।

তুই মা না এলে, তুই না নাচালে দানব
সকলে না দলিলে পায়॥
এই নিশিদিনে এ মহাশ্মশানে
পেলে ও চরণ পূঁজিতাম যতনে
নাম সুধা পানে হইয়া মাতাল
লুটিত মুকুন্দ চরণধূলায়।"

মা জাগ্রত হইলেন। এইবার ভাইয়েব দিকে ফিরিয়া দামামা বাজাইয়া মুকুন্দ আহ্বান করিলেন—

"বুক বেঁধে সকলে, জয় মা মা বলে
দাঁড়া দেখি ভারত সন্তান
দেখুক আঁখি মেলে বিদেশী সকলে
বাসনা দিতে জাগে প্রাণ॥"

জাগ্রত অথচ দ্বিধা সঙ্কোচগ্রস্ত বাঙলাকে সক্রিয় জাগ্রত অংশের দিকে মুকুন্দ স্থির অঙ্গুলী নির্দেশে সহায় শক্তির রূপ দেখাইয়া উন্মাদিয়া স্বরে ডাকিয়া ডাকিয়া শুনাইতে লাগিলেন—

"ভয় কি মরণে?
রাখিতে সন্তানে মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে
তাথৈ তাথৈ থৈ, দ্রিমী দ্রিমী দং দং, ভূত পিশাচ নাচে যোগিনী সঙ্গে।"

আবার একটু শান্ত ধীর স্বরে উচ্ছ্বসিত গতিবেগে ভাসান তরীতে দাঁড়াইয়া যাত্রী ভাইয়ের কাঁধে হস্তার্পণ করতঃ যেন মুকুন্দ লক্ষ্যে পৌছাইবার অব্যর্থ বাণী শুনাইতেছেন—

"মায়ের নাম নিয়ে ভাসান তরী
যেদিন ডুবে যাবে তরী, যেদিন ডুবে যাবে
সেদিন রবি চন্দ্র ধ্রুবতারা, তারাও ডুবে যাবে সেদিন
তারাও ডুবে যাবে ॥

বহুদিন পরে এবার, মরা গাঙে পেয়ে জোয়ার
জোয়ারে ধরেছি পাড়ি, আর কি তরী ডোবে রে
মোদের আর কি তরী ডোবে রে ॥

মায়েই পেয়েছি কাণ্ডারী
হোক্ না কেন তুফান ভারী
মুকুন্দদাসে ভনে, উজানে ভয় করিনে
এবার মায়ের নামের বাদাম টেনে উজান ধরে
যাবো মোরা উজান ধরে যাবো ॥"

প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে হিমাদ্রি গলানো স্রোতে সাগর সঙ্গমে যাত্রী মুকুন্দের সেই ভাসান তরী ডুবিয়া যায় নাই, গতিকে শুদ্ধ করে নাই। উজানে বাদাম খাটাইয়াও সেই তরীর গতি অব্যাহত—

"বন্দেমাতরম্!" "জয় বাংলা!"

নবম অধ্যায়

দলগঠন ও যাত্রাপর্বের ইতিহাস

১৯০৫ খৃষ্টাব্দ। বৎসরের অর্ধেক অতীত হওয়ার পূর্বেই বরিশালের জাগ্রত চিন্তাক্ষেত্রে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। শহরের রাজাবাহাদুরের[৫২] হাবেলীতে মাঝে মাঝে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদসহ জাতীয় ভাবোদ্দীপক বক্তৃতা হইতেছিল। ৭ই আগস্টের পূর্বেই বিদেশীবর্জনের সুর উত্থিত হইল। আগস্টের মধ্যভাগে শহরের রাস্তায়, হাবেলীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে, রাস্তায়, হাটে, মহকুমায় ও গ্রামে গ্রামে সভা, বক্তৃতা এবং সঙ্গীতাদি দ্বারা উত্থিত বাঙলার কিশোর রঞ্জন মূর্তি প্রকটিত হইতে লাগিল। বাঙলার কবি ও গায়ক রসিকচন্দ্র হাটে, বন্দরে, মেলায় অগণ্য নরনারী শ্রোতাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কার ব্যবস্থা—কে ঘটালো এ সংগঠন?" শত শত আসবে সকলের মনের কথা তিনিই অব্যক্ত করিলেন গানে—

"যে আগুন উঠছে জ্ব'লে সে জগদম্বার কৌশলেরে
সে জগদম্বার কৌশলে।"

সর্বত্র অহরহ "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি ভাব প্রকাশের প্রধান স্থান অধিকার করিল। ফলে, ইংরাজ-বিরোধিতা নামক "নূতন ধর্ম" তখন বরিশালে প্রাধান্য লাভ করিল। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য বলিয়াছিলেন—"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্ত পরায়ণঃ।" সন্ত্রাসবাদীদের ঘোষণা ছিল—"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ যদি সঃ ইংরেজদ্বেষী।" মুকুন্দদাস জাতে উঠিয়াছিলেন এই ইংরাজবিদ্বেষ অবলম্বন করিয়া। এই ব্যাপারে কে বা কাহারা তাঁহার দীক্ষাদাতা তাহা

৫২। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগের কথা। এই রাজাবাহাদুর ছিলেন বরিশাল শহরের নামকরা জমিদার, ধনী ও গুণী—এম. এ., বি. এল.। কিন্তু অপাংক্তেয় ছিলেন বরিশাল শহরে। কারণ, তিনি দুশ্চরিত্র ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির ছিলেন। তাঁহাকে আমরণ জুগুপ্সিত জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল বরিশাল শহরে। যে নীতিবোধ ও চরিত্রশুদ্ধির আদর্শের কাছে তিনি মাথা নত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—সে আদর্শ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের তৈরী ব্রাহ্ম-সমাজের। বরিশালের ব্রাহ্ম-সমাজ বেশ শক্তিশালী ছিল। ছিল ধর্মরক্ষিণী সভা আন্দোলন, ছিল রামকৃষ্ণ মিশনীয় তৎপরতা। এক কথায় বরিশাল ছিল বাঙলাদেশের শিক্ষা, চরিত্র ও স্বাধীনতা সংগ্রামের যোগ্যভূমি।

জানা নাই। কিন্তু যে ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই ভূমিকা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা সারা বাঙ্‌লায় দ্বিতীয় ব্যক্তির ছিল না। এইখানেই মুকুন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব। আপন রাজত্বে তিনি ছিলেন—**একক অপ্রতিদ্বন্দ্বী চারণ সম্রাট।**

বস্তুতঃ কীর্তনীয়া বৈষ্ণব মুকুন্দের স্বতন্ত্র স্বরতন্ত্রী স্বকীয় গণ্ডীতে ঝঙ্কৃত হইয়া নবরূপদানে মাতিয়া উঠিল। সভাসমিতির বন্যা হইতে দূরে রহিয়া মুকুন্দদাস সঙ্গোপনে "মাতৃপূজা"[৫৩] রচনা শেষ করিলেন। আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়বিশ্বাসী মুকুন্দ কাহারো সহিত পরামর্শ করিলেন না। রচনা শুনাইয়া সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই। দুর্গম পথ বাহিয়া অনতিকাল মধ্যে অভীষ্ট সিদ্ধির স্থির অটল বিশ্বাস মুকুন্দকে মাতোয়ারা করিয়াছিল। প্রচলিত যাত্রাগানের অনুকরণে "মাতৃপূজা" অভিনয় দ্বারা প্রচারাবলম্বনে সেবার স্বীয় অংশদানে কৃত সংকল্প হইলেন। প্রচলিত যাত্রার দলের সাজ-সরঞ্জাম, গায়ক-বাদক, অভিনেতা, দাদন-বেতন, যাতায়াত, খোরাকী প্রভৃতির শতসহস্র টাকার মূলধন ও নিত্য আয়-ব্যয় সম্পর্কে মুকুন্দদাস অনভিজ্ঞ ছিলেন না। যাত্রার দল করিয়া নিঃস্ব সর্বস্বান্ত হওয়ার দৃষ্টান্তও মুকুন্দের অজ্ঞাত ছিল না। বুদ্ধিমানের পরামর্শ, বিদ্বান পণ্ডিত ধনী ওস্তাদের সাহায্য তাহার অনুকূলে হইবে না সে জ্ঞানেরও অভাব ছিল না। কিন্তু লোকে যতই অবিবেচক বলুক না কেন তাঁহার পক্ষে তো যে কোন রকমে স্বদেশী যাত্রার দল করিতেই হইবে। সাফল্যের স্পষ্ট আশা মুকুন্দের রঙীন মনকে ইন্ধন যোগাইয়া চিন্তাশীলের দুরধিগম্য অর্থে নির্ভয়ে যাত্রার চেষ্টা সোৎসাহে আরম্ভ হইল। সেই চেষ্টা আলোচনা ও জিজ্ঞাসার ঝঞ্ঝাট এড়াইতে অতি সংগোপনে চলিতে লাগিলেন। দল গঠনের লোক সংগ্রহের জন্য প্রথম যাত্রার দলের পেশাদার চাকুরীয়া গায়ক বা বাদকের দ্বারস্থ হইলে তাহাদের মূলধন কে যোগাইবে, কয় মাসের টাকা দাদনস্বরূপ অগ্রিম দিবেন প্রভৃতি প্রশ্ন দ্বারাই মুকুন্দ বুঝিলেন, ইহাদের পাওয়া যাইবে না। এদিকে শ্রাবণ মাসের মধ্যেই যাত্রার দলওয়ালারা উৎকৃষ্ট গায়ক-বাদকদের দাদন দিয়া এগ্রিমেণ্ট দস্তখত শেষ করিল। নিকৃষ্টেরাও বিশিষ্ট যাত্রা দলপতিদের তোষামুদি করিয়া দাদন ভিন্ন কম বেতনে বৎসরের জীবিকার সংস্থান করিতে লাগিল। কিন্তু মুকুন্দের উল্টা তোষামুদিতেও কেহ

৫৩। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ। অশ্বিনীকুমার অন্যতম প্রধান সহকর্মী ভবরঞ্জন মজুমদার "দেশের গান" সংকলনের জন্য দেড় বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন এবং চারণকবি মুকুন্দদাস "মাতৃপূজা" গ্রন্থ প্রকাশের জন্য তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

বিশ্বাস করিয়া রাজী হয় না। অথচ যাত্রার দলের রীতি অনুসারে দুর্গাপূজায় প্রথম গান আরম্ভ করিতে হয়। নূতন পালার মহড়া (রিহার্সেল) ভাদ্রের শেষেই আরম্ভ হয়। এখানেও মুকুন্দের লোক, সাজ, যন্ত্র, অর্থ কিছুই নাই, অথচ পূজায় দল বাহির করিতে হইবে। লোক প্রাপ্তি সম্বন্ধে, বিভিন্নরূপ প্রত্যাখ্যানের পর যাহাদের কোন দলে নিতে চায় না, যাহারা কোনদিন যাত্রার দলে যায় নাই, অথচ একটু গান গাহিবার শখ আছে, এইরূপ লোকের সন্ধান করিয়া কয়েকজন সংগ্রহ করিলেন এবং কাশীপুর গ্রামে "মাতৃপূজা" পালার মহড়া আরম্ভ করিলেন। শহরের বাসা হইতে সন্ধ্যায় আহার করিয়া কাশীপুর গ্রামে যাইয়া রাত্রে মহড়া দিয়া শেষরাত্রে শহরে ফিরিতে হইত। দিনে দলের প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যনির্বাহ করিতেন। মুদি দোকানের ভার পিতা ও ভ্রাতার হাতে দিয়া সেদিক হইতে অবসর লইয়াছিলেন। মাসাধিক কাল নিদ্রা-বিশ্রামের অবসর ছিল না। অতিকষ্টে প্রায় ২০ জন লোক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ অবধি ১৩ জন মাত্র টিকিয়াছিল। এক একটি যাত্রা দলে প্রতি বৎসর পোশাক-পরিচ্ছদ ক্রয় করিতে হাজার টাকা ব্যয় হয় সেক্ষেত্রে মুকুন্দ কিছু পুরাতন কাপড় সংগ্রহ করিয়া গেরুয়া, লাল, কমলা রঙে রাঙাইয়া লইলেন। কীর্তনের হারমোনিয়াম ও মৃদঙ্গ-করতাল নিজের ছিল। বেহালা ও তবলা সংগৃহীত ঐ লোকদের মধ্য হইতে জুটিয়া গেল। পূজার আর কয়েকদিন মাত্র বাকী আছে; কোন বায়না স্থিরতা নাই, কিন্তু যাত্রা সুস্থির। নৌকায় দল লইয়া একদিকে রওনা দিবেন। নৌকাঘাটায় একটি বড় নৌকা ভাড়া করিতে গিয়া দেখিলেন মাস কাবারে ঠিক করিলেও মাসে ৬০ টাকার উপর দিতে হয়। দলের জনৈক নবোৎসাহীর সহিত পরামর্শ করিয়া মাঝিহীন এক ছুটা নৌকা মাসিক কুড়ি টাকায় ভাড়া করিয়া লইলেন। স্বীয় মুদি দোকান হইতে কিছু চাউল-ডাউল সঙ্গে লইয়া অধিবাসের রাত্রে পিতামাতার চরণধূলি লইয়া অতি সংগোপনে নৌকায় আরোহণ করিলেন। স্বয়ং মুকুন্দদাস মাঝি এবং অপর এক উৎসাহী যাত্রী দাঁড়ীর স্থান অধিকার করিলেন। "জয় মা!—"[৫৪] ধ্বনির সহিত নৌকা রওনা হইল। পশ্চিমাভিমুখী হাল ধরিয়া নৌকা চলিতে লাগিল। কিছু বেলায় শহর হইতে এগার মাইল পশ্চিমে

৫৪। জয় মা:—মুকুন্দ তাঁহার স্বকৃত এক স্থূল পঞ্জিকানুসারে কোন কায বা যাত্রার দিন স্থির করিতেন। যথা, ত্র্যহস্পর্শ, মাস-প্রথম গ্রাহ্য করিতেন না। সোম বুধ, শুক্র—এই তিনটি বারের যে কোন বার বাম নাসিকায় শ্বাস বহিবার সময় ছিল তাঁহার পেটেন্ট "মাহেন্দ্রযোগ"। "জয় মা" বলিয়া সেই শুভক্ষণে যাত্রা করিতেন।

"নবগ্রাম" নামক এক পল্লীর হাটখোলার ঘাটে নৌকা লাগাইলেন। রওনা হওয়ার দিন বানরিপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ গুহ-ঠাকুরতা নামক জনৈক পরিচিত সমবয়স্ক বন্ধুকে একখানা পোস্টকার্ড লিখিয়াছিলেন—"পূজার মধ্যে তোমাদের ওখানে দলসহ পৌঁছিয়া একপালা স্বদেশী যাত্রা গাহিতে চাই, আমরা লোক চৌদ্দজন। গাহিবার স্থানাদির একটু বন্দোবস্ত রাখিও—ইত্যাদি।" উত্তরকালে যে মুকুন্দদাসের পূজার তিনদিনের বায়না মাসাধিক কাল আগে হাজার টাকায় স্থির হইয়া থাকিত, প্রারম্ভে সে পূজার বায়নার নমুনা হইল উপযাচক একখানি পোস্টকার্ড লিখিয়া গাহিবাব একটু স্থানভিক্ষা। দলের লক্ষ্য রহিল বানরিপাড়া পৌছানো, পূজার বায়না যেন বানরিপাডায় সুস্থির, অভিব্যক্তিদ্বারা জিজ্ঞাসিত লোকেরা এইরূপই বুঝিয়া লইত। নৌকা 'নবগ্রামের', হাটে পৌছাইলে পল্লীর নীরবতা ভঙ্গকারী দুর্গোৎসবের ঘোষণা দূরাগত ঢাক-ঢোলের ধ্বনির ভিতর দিয়া দলের কানে পৌছাইল। নৌকায় প্রয়োজন ও অপ্রয়োজন মহড়া-সঙ্গীত পথিকের সোৎসুক জিজ্ঞাসা আহ্বান করিতেছিল। অনভ্যস্থ স্বয়ং এমনকি নৌকা চালকদেরও ক্লান্তি আসিয়াছিল। ঐ স্থানেই পাক ও প্রথম মধ্যাহ্ন আহারের পরামর্শ স্থির হইল, পরামর্শ মধ্যে দৈবের সকাম মতলবও অনেকখানি ছিল। ছোট একটি স্বদেশী যাত্রার দলের অকস্মাৎ ঘাটে আগমন-সংবাদ গ্রামের মধ্যে পৌছাইয়া যে আলোচনার সৃষ্টি করিল তৎফলে গ্রামের পক্ষ হইতে লোক আসিল। দলওয়ালারা বলিল, "আগামীকল্য বানরিপাডায় গান হইবে, আজ রাত্রে এখানে একপালা গাহিয়া যাইতে পারি। পারিশ্রমিকস্বরূপ রাত্রের খোরাকী এবং গান শুনিয়া নগদ যাহা দেওয়া শ্রোতারা উচিত মনে করেন তাহা দিলেই চলিবে। টাকার অঙ্ক কোন পক্ষই কিছু বলিল না। তবে না দেওয়ার মত যৎসামান্য কিছু দিবার চেষ্টা দাতারা করিবেন, এই কথার উপরেই সপ্তমীপূজার রাত্রের এই প্রথম দিনের প্রথম বায়না দৈবানুগ্রহের মত উপলব্ধি দ্বারা দলের লোকদের মধ্যে আশা-আনন্দের সঞ্চার করিল। রাত্রে যথাসময়ে সমারোহশূন্য এক আসরে গান আরম্ভ হইল। দ্বিপ্রহর রাত্রান্তে ৺পূজাবাডির ভাল আহার করিয়া নগদ চারি টাকা বিদায় লইয়া সকলে নৌকায় প্রত্যাবর্তন করিল। শ্রোতারা তেমন প্রশংসা বা নিন্দা করে নাই, তবে আসরে দাঁড়াইয়া গাহিতে গিয়া নিজেদের ত্রুটিগুলি দলের লোকে উপলব্ধি করিল। ত্রুটি সংশোধনের আলোচনা ও সামান্য বিশ্রামান্তে মাঝি ও দলপতি মুকুন্দদাস অষ্টমী পূজার প্রত্যূষে বানরিপাড়া অভিমুখে নৌকা চালাইলেন। বানরিপাড়া আসিয়াই

গান হইল। নবগ্রামে প্রথম দিনের গান অপেক্ষা এদিনের গান ও অভিনয় কিছু ভাল হইল। বানরিপাড়া কেন্দ্রে সপ্তাহকাল মধ্যে চারি পালা গান হইল। নবগ্রামের বিদায়ের নিরিখ টানিয়া লইয়া লোকে একবেলা খোরাকী ও চারি টাকা নগদ দিতেছিলেন। এদিকে সঙ্গী লোকদের ও দলের প্রয়োজনীয় কতক জিনিস খরিদ করিয়া আর ২।১ দিন মাত্র চলিবার সংস্থান আছে, নূতন বায়নার কোন সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না। তখন স্থির হইল আর বিলম্ব না করিয়া উত্তর-পূর্ব দিকে নৌকা চালাইয়া দ্রুত গতিতে অপর জেলায় পৌছাইতে হইবে। সঙ্গে তিনদিনের যোগ্য খোরাকীর সংস্থান মাত্র আছে। নৌকা বানরিপাডা ঘাট ত্যাগ করিয়া পুনরায় যাত্রা করিল। নৌকার দাঁড়ি-মাঝির কাজ ক্রমশঃ সকলেই কিছু কিছু গ্রহণ করিল, পথিমধ্যস্থ বিশিষ্ট হাটবাজার গ্রাম পার্শ্বে হেতু-অহেতুতে নৌকা লাগাইয়া লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাক-আহারের সময় দলের কয়েকজন পার্শ্ববর্তী গ্রাম ঘুরিয়া লোকেব সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া দলের সংবাদ প্রচার করে, নবগ্রামের মত কোথাও যদি কোন গ্রাম আহ্বান করে এই মতলব লইয়া। তুইদিন অতীত হইল, কোন আহ্বান নাই। সাফল্য সম্বন্ধে মুকুন্দদাসের দৃঢ় অটুট বিশ্বাস আছে, কিন্তু সঙ্গে ১৩ জন লোক, তাহাদিগকে সাহস দিয়া মানাইয়া রাখিতে হইবে, আহারের সংস্থান করিয়া লইতে হইবে, সঙ্গীত ও অভিনয়কে নূতন রচনা ও স্বরের মহড়া দিয়া অধিকতর চিত্তাকর্ষক করিতে হইবে। আগামীকল্য আহার্য ফুরাইলে তখন কি করিতে হইবে ইত্যাদি নানাভাবে ও কাজে মুকুন্দ বিশ্রামহীন। কখনো নৌকা বাহিয়া যাওয়া, কখনো পাকের আয়োজন, আবার তীরে উঠিয়া লোকের সহিত আলাপ, রচিত পালায় নূতন সঙ্গীত ও পাঠ সংযোজন—সর্বোপরি সেনাপতির মত সঙ্গী লোকদের চিত্তে সাহস ও উৎফুল্লতা বাড়াইবার চেষ্টা এবং আরব্ধ কাজটার মহত্ত্ব শুনাইয়া দুঃখবরণে উদ্বুদ্ধ করা ও সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক সংস্থানের বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা শোনান প্রভৃতি কার্যে নিদ্রার ফুরসতটুকুও ছিল না। বানরিপাড়া হইতে রওয়ানার আজ তৃতীয় দিবস। আজ দিন অতিবাহিত হইলে স্বর্গীয় আহার্য নিঃশেষ হইয়া যাইবে। এই অবস্থায় অতি প্রত্যুষে ইদিলপুরের[৫৫] ঘাটে

৫৫। ইদিলপুর :—বরিশাল-চাঁদপুর-ঢাকা স্টীমার-পথে "বদরটুনি" স্টেশন বাখরগঞ্জ জেলার উত্তর সীমান্তে নয়াভাঙ্গানী ও মেঘনা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। নয়াভাঙ্গানীর অপর পারেই ফরিদপুর জেলা। নয়াভাঙ্গানীর নাম হইতে প্রতীয়মান হয় ইহা পদ্মার নূতন খাত। "বদরটুনি"

নৌকা পৌঁছাইল। জনৈক সঙ্গী লইয়া লোক-সমাগমের আগেই মুকুন্দ তীরে নামিয়া মৎস্য শিকারীদের জাল ঝাড়া পরিত্যক্ত মাছ একবেলা চলার মত অতি সহজেই সংগ্রহ করিয়া নৌকায় ফিরিলেন। আজ দ্বিপ্রহরের মধ্যে বায়নার কোন সন্ধান না পাইলে অপরাহ্নে বৈরাগীরা যেমন গান গাহিয়া চাউল, পয়সা ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া থাকে সেই প্রণালীতে ২।৩ জন করিয়া দুইটি দল দুইদিকে বাহির হইয়া কিছু আহার্য সংগ্রহ করিয়া রাত্রে এ স্থান ত্যাগ করিয়া আরও অগ্রসর হইবেন। পরিত্যক্ত মৎস্য কুড়াইতে কুড়াইতে চিন্তায় এই সন্ধান মিলায় অন্তর মধ্যে অধিকতর উৎসাহ ও নিশ্চিত অবস্থা বোধ করিতে লাগিলেন। একটু বেলা হইতেই লোকের দৃষ্টি নৌকার প্রতি আকৃষ্ট হইল, অনতিকাল মধ্যে স্বদেশী যাত্রার দলের ঘাটে পৌঁছাইবার সংবাদ প্রচারিত হইল। নৌকায় পাকের আয়োজন হইতেছে, তীরে আগন্তুক পথিক ও গ্রামবাসীর সহিত কথাবার্তা চলিতেছে। গ্রামের পরামর্শ, কথা আদান-প্রদান, দর-কষাকষিতে দ্বিপ্রহরের মধ্যেই স্থির হইল রাত্রে গান হইবে। আহার ও নগদ পাঁচ টাকা পাওয়া যাইবে। পূজার ছুটিতে পল্লী ভরপুর। বাঙ্‌লাদেশে ইদিলপুরের সমাজ, প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষা-সংগতিতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ। যাত্রা গান প্রচলিত প্রথানুসারে পার্শ্ববর্তী গ্রামে নিমন্ত্রণ হইল। রাত্রে যথাসময়ে প্রচুর নর-নারীর জমাট আসরে গান আরম্ভ হইল। উদ্বোধন সঙ্গীতসহ গৈরিক পাগড়ী ও আলখাল্লা পরিহিত মুকুন্দের নিপুণ অভিনেতাসুলভ ভঙ্গীতে আসর প্রবেশ ও চমকপ্রদভাবে সঙ্গীতে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গেই হাততালি ও হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল; বিদ্যুতের মত আশাতীত অভগ্ন লগ্নে সঙ্গীত ও অভিনয় চলিতে লাগিল। মুহুর্মুহুঃ করতালি ও হর্ষধ্বনিতে গায়ক-বাদক-অভিনেতাগণ উৎসাহিত হইয়া প্রাণপণে লগ্ন স্থির রাখিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। সাফল্যের জয়জয়কারের মধ্যে সেই রাত্রেই কয়েকপাল্লা গানের বায়না হইল, টাকার অঙ্ক বৃদ্ধি হইল না, কিন্তু খোরাকী

থানার ২।৩ মাইল পশ্চিমে নযাভাঙ্গানী নদীর উপর আবুপুর বা ইদিলপুর গ্রাম। ইদিলপুর পরগণা পুরাতন সরকার বাকলার চারিটি পরগণার অন্যতম। চাঁদ রায়, কেদার রায়ের সময় ইহা বিক্রমপুরের অন্তর্গত ছিল, পরে কেদার রায়ের সেনাপতি রঘুনন্দন চৌধুরী ইহা প্রাপ্ত হন। চৌধুরীরা দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। ভাটগানে শোনা যায় "ইদিলপুরের জমিদার দোহাই মানে বাঘে যায়।" এই পরগণায় সেনবংশীয় রাজা কেশব সেনের এবং বৌদ্ধধর্মাবলম্বী চন্দ্রবংশীয় রাজা শ্রীচন্দ্রদেবের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। শ্রীঅমিয় বসু—বাংলায় ভ্রমণ (১ম খণ্ড) পৃঃ ২৪৪।

একবেলার স্থানে দুইবেলা স্থির হইল। স্ব জেলার পল্লীতে যে কয়েকদিন গান হইয়াছে, তাহার আসর ও জনতা ছিল ক্ষুদ্র, নিজেদেরও প্রস্তুতির অসম্পূর্ণতা এবং শ্রোতাদের চিত্তেও পরিচিত জ্ঞাত মুকুন্দ বিধায় ঐশ্বর্যের যে অভাব ছিল, ইদিলপুরে সর্বপ্রকারের ত্রুটিই প্রায় তিরোহিত হইয়াছিল। মুকুন্দদাস স্বয়ং ইদিলপুরে প্রথম প্রাপ্ত উক্ত অঞ্চলের নর-নারীর যত্ন, স্নেহ, প্রীতি ও আত্মীয়তা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেন। ইদিলপুরে প্রত্যহ গান চলিতে লাগিল। একমাসের মধ্যেই ভাড়াসহ নৌকা বরিশালে ফেরৎ পাঠাইয়া তীরে বাসা করিলেন। ইদিলপুর পরগণায় প্রত্যহ গান হইতেছিল। মহিলারা চাঁদা করিয়াও পাড়ায় পাড়ায়, বাড়ি বাড়ি গান গাওয়াইতেছিলেন। এক "মাতৃপূজা", পালা প্রায়শঃ একই সঙ্গীত। একই শ্রোতা প্রত্যহ উহাতে আনন্দলাভ করে এবং পুনরায় উহা শুনিতে চাহে। সাধারণ যাত্রার দলে অনেক পালা থাকে। একস্থানে কয়েকদিন হইলে প্রত্যহ নূতন পালা গাহিতে হয়। মুকুন্দের সম্বল একটি মাত্র পালা, তবে মাঝে মাঝে সাময়িক ঘটনা সম্পর্কীয় নূতন নূতন সঙ্গীত ও বক্তৃতা যুক্ত হয়। বাজনার সুর চলিতেছে, মুকুন্দ হঠাৎ গানটা একটু থামাইয়া সাময়িক সংবাদ উল্লেখ করিয়া, কিছু সময় বক্তৃতা দিয়া, গীত গানটির পদের সহিত মিলাইয়া আবার সেই গান গাহিতে আরম্ভ করিতেন, তখন শ্রোতৃবৃন্দের কাছে সেই গান বহুগুণ হৃদয়গ্রাহী হইত। উৎপীড়ন, লাঞ্ছনার বর্ণনা শুনাইয়া শ্রোতার প্রাণে সাহস যোগাইতে বিভিন্ন রকমের গান হইত। তন্মধ্যে সহজ সর্বজনবোধ্য হইয়া যাহা আপামর জনসাধারণের মুখে শোনা যাইত ; এইস্থানে তাহার একটু দৃষ্টান্ত দিতেছি—

"ফুলার[৫৬] আর কি দেখাও ভয় ?
দেহ তোমার অধীন বটে মনতো অধীন নয়
হাত বান্ধিবি পা বান্ধিবি
ধরে না হয় জেলে দিবি
মনকে বান্ধিতে পারে তেমন শক্তি নাই।"

৫৬। ফুলার :—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বিদেশী শাসকের নির্মম নিপাতনে মুকুন্দদাস একটুও দমিত না হইয়া তদানীন্তন বাঙলার ছোট লাট স্যার বামফিল্ড ফুলার সাহেবকে উদ্দেশ্য করিয়া বজ্রকণ্ঠে গান গাহিয়াছিলেন "ফুলার—আর কি দেখাও ভয় ?" ফুলার সাহেব পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের অনেকেই ভয় ও প্রলোভন দেখাইয়া দলে টানিয়াছিলেন। এই সকল বিশ্বাসঘাতকদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিবার জন্য এবং ফুলার সাহেবকে হুঁশিয়ার করিয়া দিবার জন্য সেদিনের এই জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল।

গানের শক্তি শুধু শ্রবণবিলাসী শ্রোতার সংখ্যা বৃদ্ধি না করিয়া গীত, অভিনীত ও কথিত বিষয় শ্রোতাকে কার্যে উদ্বুদ্ধ করিত। স্বদেশী আন্দোলনের লক্ষ্যে পৌঁছাইতে, আপামর জনসাধারণ, নর-নারী সকলকে স্বদেশীব্রতে দৃঢ় ব্রতী হইতে মুকুন্দের গান সাহায্য করিয়া সাফল্যের পথে আগাইয়া দিল।[৫৭] বলা বাহুল্য, কীর্তনীয়া মুকুন্দের কীর্তন গান শিক্ষা, সাহস, মাতৃপূজা, সঙ্গীতাভিনয়কে অত্যল্পকাল মধ্যে বিবিধ সম্পদের অধিকারী করিয়াছিল। প্রচারকার্যে ভাষা, সুর প্রভৃতির শক্তি প্রয়োজন; কিন্তু, একটা গ্রামোফোন যন্ত্রে প্রচার চলে না, প্রচারিত বস্তুকে কার্যকরী করিতে প্রচারকরূপী জীবন্ত মানুষের তাজাপ্রাণ-স্পর্শ প্রয়োজন। মুকুন্দের সেই তাজাপ্রাণ-প্রবাহ সঙ্গীতের সুরে ভাষায় মূর্ত করিয়া তুলিত। তিনি যদি শুধু গানের আসরে নিবদ্ধ থাকিয়া স্বীয় কর্তব্য পালন শেষ করিতেন তাহা হইলে ইতিহাস তাঁহাকে তুষের মত ঝাড়িয়া ফেলিয়া স্মৃতিকে নিষ্কৃতিদান করিত। মুকুন্দ-জীবনের উপাদান ও গতিভঙ্গী সেই গতানুগতিক পেশাদারীর অতীতে বা উর্ধ্বে বিচরণ করিত বলিয়াই ভাবী বংশধরেরাও মুকুন্দ স্মৃতির কাছে শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিবে।

যাক্, আমরা ইদিলপুরে বিচরণ করিতেছিলাম। অত্যল্পকাল মধ্যে মুকুন্দ 'ইদিলপুর', 'দাসের জঙ্গল' প্রভৃতি স্থানসহ সমগ্র পরগণার আপনজন

৫৭। বিশিষ্ট সমাজসেবী ও স্বদেশপ্রেমিক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন—ঢাকা মানিকগঞ্জ মহকুমার এক 'সাহা' বড়লোকের বাড়ির বিবাহে কলিকাতার থিয়েটার ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থার মধ্যে জনৈক দেশকর্মীর অনুরোধে উৎসব-কর্তারা মুকুন্দদাসের এক পালা যাত্রাগানের বায়নাও দিলেন। যথানির্দিষ্ট দিনে মুকুন্দবাবু গান গাহিয়া তিন মাইল দূরবর্তী মহকুমা শহর সংলগ্ন স্থানে আহ্বান পাইয়া চলিয়া গেলেন. তথায় গান চলিতে লাগিল। এদিকে বিবাহবাড়িতে কলিকাতার থিয়েটার আরম্ভ হইল, কিন্তু শ্রোতাশূন্য আসর। শহর-পল্লীর চতুর্দিকস্থ লোক থিয়েটার না দেখিয়া মুকুন্দদাসের গান শুনিতে লাগিল। উৎসব-কর্তারা অবস্থা দেখিয়া পুনরায় মুকুন্দদাসকে আনিবার চেষ্টা করিল. কিন্তু, ইতিমধ্যে মুকুন্দবাবু মানিকগঞ্জ টাউনের বায়না লইয়াছেন। থিয়েটারওয়ালারা হিসাব করিয়া আসিয়াছিল যে. বিবাহবাড়ির অভিনয়ের পর তাঁহারা টাউনে আমন্ত্রিত হইবেন. তদনুরূপ কথাও চলিয়াছিল। কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদ, নাচ-নর্তকহীন মুকুন্দের গান-অভিনয় শুনিতে জনসাধারণের উন্মত্ততা মঞ্চস্থিত সুসজ্জিত থিয়েটারকে নিষ্প্রভ ও শ্রোতাশূন্য করিয়া বিদায় দিয়াছিল। উচ্চাদর্শের উপাসক, সুগায়ক সুরেনবাবু মুকুন্দের শক্তি ও প্রাণের প্রতি শ্রদ্ধানুরাগ প্রদর্শনে আপামর জনসাধারণের উপর মুকুন্দদাসের প্রভাবও আকর্ষণী এবং বৎসরের পর বৎসর ঢাকার মুক্তিকামী অনুষ্ঠানকে সাহায্যদানের প্রসঙ্গ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত শুনাইয়াছেন।

হইয়া গেলেন। ঘরে ঘরে মুকুন্দের 'মা', 'বোন' সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আসরে সমবেত ও বাড়িতে বাড়িতে ব্যক্তিগতভাবে মুকুন্দের প্রাণখোলা 'মা', 'বোন'টি ডাক মহিলামহলেও তাঁহাকে অবাধ যাতায়াত ও আলাপ-পরিচয়ের অধিকারী করিয়াছিল। মুকুন্দের মাধুর্যমণ্ডিত ঐশ্বর্য দিনের পর দিন দ্রুত বৃদ্ধির পথে চলিল। ফরিদপুর জেলার দূরবর্তীস্থানে গান গাহিয়া ফিরিবার পথে ইদিলপুরে প্রত্যাবর্তন করিতেন, নিমন্ত্রণ খাইতেন, দাসের জঙ্গলে বাল্যবন্ধু আচার্য মহাশয়ের বাড়ি হইতে এবং ইদিলপুরে প্রথম দিনের গোপনে জাল ঝাড়া পরিত্যক্ত মাছ কুড়াইবার কাহিনী সকলকে শুনাইয়া আমোদ করিতেন। এইভাবে ছয়মাস চলিল, দলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইল। বায়নার টাকাও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এই সময় ১৯০৬ খৃস্টাব্দের ১৪ই এপ্রিলে অনুষ্ঠিত বরিশাল কনফারেন্সে[৫৮] মুকুন্দ সঙ্গীর দলকে ইদিলপুরেই রাখিয়া বিদেশাগত দর্শকের ন্যায় কনফারেন্স দেখিতে গেলেন। কিন্তু কোন অংশ গ্রহণ করিলেন না। যদিও ঐ সময় সংবাদপত্রে মুকুন্দদাসের প্রাণোন্মাদী সঙ্গীতাভিনয়ের সংবাদ কোন কোন স্থান হইতে সংবাদদাতার পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু, যাহারা গান শোনে নাই তাহারা উহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারে নাই। বরিশালবাসীদের মধ্যে বিশেষ পরিচিত ব্যক্তিগণও শুধু মুকুন্দদাস একটা স্বদেশী যাত্রার দল করিয়াছে মাত্র অবগত ছিলেন, তাই কনফারেন্সকালেও মুকুন্দের বরিশাল যাতায়াত তেমন কোন জিজ্ঞাসার সৃষ্টিও করে নাই। স্বয়ং মুকুন্দও বরিশালের নিকট গোপন রহিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। সাধারণতঃ মুকুন্দ প্রভৃতি ঈপ্সিত বিষয়কে খুব জোরের সহিত প্রকাশ করিতে ইতিপূর্বে লক্ষ্য করা

৫৮। বরিশালের প্রাদেশিক কনফারেন্স : ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল বরিশালের হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে বিশ্বাসী ব্যারিস্টার মিঃ আবদুল রসুলের সভাপতিত্বে যে প্রাদেশিক কনফারেন্স হইয়াছিল, মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত ছিলেন উহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। কনফারেন্সে যোগ দিতে আসিয়াছিলেন—সুরেন্দ্রনাথ, অরবিন্দ ঘোষ, ভূপেন্দ্রকুমার বসু, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা, লিয়াকৎ হোসেন, হেদায়েৎ বক্সী, ললিতমোহন ঘোষাল, মুকুন্দদাস প্রমুখ বহু মনীষী, নেতৃবৃন্দ, ছাত্রপ্রতিনিধি, কবি, গায়ক ও হাজার হাজার মাতৃপূজার পূজারীরা। সশস্ত্র পুলিশ আসিয়া কনফারেন্স ভাঙিয়া দিল, নিষিদ্ধ "বন্দেমাতরম্" ধ্বনির উচ্চারণ অপরাধে যুবকদের প্রহার করিল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হইলেন বন্দী এবং লাঠির আঘাতে চিত্তরঞ্জন গুহ আহত হইলেন। এই সম্মেলন সাফল্যে ও জনপ্রিয়তায় বাঙলার তথা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

গিয়াছে। কিন্তু এইবার স্বদেশী যাত্রার দল গঠন ও বরিশাল হইতে যাত্রাকালে যেন একটা প্রকৃতি বিরুদ্ধ গোপন গাম্ভীর্য দেখা গিয়াছে। ইহা হইতে কেহ মনে করিবেন না যে, স্বদেশী যাত্রার দলের সঙ্গে তাহার প্রকৃতিও পরিবর্তিত হইয়াছে। তবে এইবারের আড়ম্বর প্রকাশটা একটু ঘুরান পথ লইয়া বিশেষভাবে প্রকাশের আয়োজন করিতেছিল। ঐ সময় মুকুন্দের শক্তি ও কথায় অত্যধিক বিশ্বাসী জনৈক অন্তরঙ্গ বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি বরিশাল শহরে আসিয়া গান শোনান, তারপর কলিকাতায় যাইয়া গান করুন" ইত্যাদি। প্রত্যুত্তরে মুকুন্দ স্বীয় ভঙ্গীতে গর্জন করিয়া বলিলেন— "একটু সবুর করো, এদিক-ওদিক যামু, একটু ঢিব কইরা বরিশালের ধূলা মাথায় মাখুম, তারপর একদম শিয়ালদা স্টেশনে নাইম্যা কলিকাতাখান ধইরা একটা টান দিয়া ঝাঁকি দিমু, সে ঝাঁকিতে গোটা বাঙ্‌লাদেশ কাঁইপ্যা উঠবো" ইত্যাদি। ইহাই মুকুন্দের স্বরূপাভাষ। নিকটস্থ একদল লোক ছিলেন যাঁহারা সর্ববিধ ঐশ্বর্যহীন মুকুন্দের ভবিষ্যৎ কল্পনার কথাকে মূল্যহীন বাজে বলিয়া তুচ্ছ করিয়াছেন, তাঁহারাই সত্য পরিণতির দিনেও তাঁহাদের অভিব্যক্তি মুকুন্দকে অহঙ্কারী বলিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়শীল মুকুন্দের দ্রুত সাফল্যের সাক্ষী তাঁহাদের কৃপণ চিত্তকে ম্লান করিয়াছে মাত্র, কিন্তু মূক করিতে পারে নাই। মুকুন্দ কণ্ঠস্বরের সহিত যে বৈষ্ণবপ্রাণ অবিশ্রাম ছুটিয়া চলিয়াছে, বাহির হইয়া যে ধ্রুব আত্মপ্রত্যয়ে বিভোর রাখিয়াছে, রসমাধুর্যের সন্ধান মুষ্টিমেয় কৃপণেরা পায় নাই।

তাঁহার উদাত্ত কণ্ঠের গীত—

"কিছু ধুলোর যোগাড় কর
মানুষ হতে চাস যদি ভাই
পায়ে পায়ে লুটে পড
ধুলোর যোগাড় কব।"

প্রভৃতি ধ্বনিতে মিশ্রিত ব্যাকুল কৃতজ্ঞ প্রাণের আত্মপ্রত্যয়ী স্মরণ মঙ্গল, সেই মঙ্গলপূত বিজয়াভিযানের প্রকাশ্য সূচনা হইয়াছিল ইদিলপুরে।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইতেই সঙ্গোপনে মুদি দোকানে বসিয়া "মাতৃপূজা" নামক পালা রচিত হইয়াছিল। এই "মাতৃপূজা" সঙ্গীতাভিনয় সারা বাঙ্‌লাদেশকে মাতোয়ারা করিয়া, তৎকালীন পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বিব্রত করিয়া ক্ষুদ্র একটি দলের পিছনে দীর্ঘদিন

ধাওয়া করিতে বাধ্য করিয়াছিল। সেই দুর্ধর্ষ শক্তিশালী অভিনয়ের বিষয়বস্তু কি আমরা এখন অনুসন্ধান করি। "মাতৃপূজা" পালা-মধ্যস্থ সঙ্গীতাবলীদ্বারা ক্ষুদ্র একখানি গানের বই নোয়াখালীতে ছাপা হইয়াছিল। সেই পুস্তিকার একটি গানের পদ্যাংশ দ্বারা মুকুন্দদাসকে রাজদ্রোহে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হইতে হইয়াছিল। বরিশালে "দেশের-গান" নামে বিভিন্ন রচয়িতার সঙ্গীতাবলী দ্বারা একখানি গানের বইতে মুকুন্দের "মাতৃপূজা" সঙ্গীতাবলীর প্রায়গুলি স্থান পাইয়াছিল। তন্মধ্যে মুকুন্দের রাজদ্রোহকর নির্দিষ্ট গানটি থাকার জন্য উভয়স্থান হইতে প্রকাশিত মুদ্রিত বইগুলি বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়। কাজেই "মাতৃপূজা"র গানগুলির সন্ধানও বর্তমানে পাওয়া যাইবে না। "মাতৃপূজা" পালার হস্ত-লিখিত পাণ্ডুলিপিও পুলিশের হাতে চলিয়া যায়।

মামলার মধ্যে একটি মাত্র গানের পদ্যাংশই রাজদ্রোহকর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। তিন বৎসর কারাভোগান্তে ঐ পাণ্ডুলিপি ফেরত আনিবার কোন চেষ্টা বা প্রয়োজনও বোধ হয় নাই। চেষ্টা করিলে অকস্মাৎ হয়তো "সাধন-সঙ্গীতের" সন্ধান কোন স্থান হইতে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু "মাতৃপূজার" পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। আমরা একটু চেষ্টা করিলে দেখিব ঐ অভিনয় ও সঙ্গীত মধ্যে রচনায় তেমন অপরাধ ছিল না; যতটা অপরাধ ছিল ঐ রচয়িতা মানুষটির। রাজদ্রোহ মামলা আলোচনা কালে আমরা তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব। এখানে আমরা ঐ পালার উদ্ভব ও বিষয়বস্তু প্রকাশের চেষ্টা করিতেছি। জন্মগত শক্তিতে আবার মুকুন্দের গ্রহণোন্মুখ কৈশোর যৌবনে অকস্মাৎ একটি উচ্চাদর্শের সাক্ষাৎ হইয়াছিল বরিশাল শিরোমণি অশ্বিনীকুমার দত্তের ব্রজমোহন বিদ্যালয় সংশ্রবে। সেখানকার সত্য, প্রেম-পবিত্রতার আদর্শানুসরণে অনুষ্ঠিত সেবা, সঙ্গীত, আলোচনা ও উপদেশ মুকুন্দের তরুণ প্রাণে অজ্ঞাতে একটা ছাপ পড়িয়াছিল। ভিতরে মুদ্রিত সেই ছাপের পরিচয় হয়তো নিজেই জানিতেন না। এ-ঘাট ও-ঘাট ঘুরিতে ফিরিতে মুকুন্দ আপন মনে কীর্তনের সাক্ষাৎ পাইয়া বৈষ্ণবতার সহিত ঘনিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিলেন। অনুভূতির আড়ালে বিদ্যালয়ের সত্য-প্রেম-পবিত্রতা কীর্তনের ঘনিষ্ঠতাকে কিছু অভিনব মধুর করিয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের অদূরাগত বন্যার মুখে মুকুন্দের স্বতঃপ্রতিভা ঐ দুয়ের সম্মিলনে নূতনের মত একটা তৃতীয় পথ তাঁহাকে আকৃষ্ট করিল। সেই পথে একটু অগ্রসর হইতেই উপলব্ধি করিলেন, ইহা নূতন নহে,—তরুণ জীবনের স্পর্শ

বিস্মৃতপ্রায় সত্য-প্রেম-পবিত্রতার রঙীন পরিচিত পথ ধরা পড়িতেই অগ্রসর সহজ হইল। সম্মুখে বরিশালের অশ্বিনীকুমার, জগদীশ, কালী সাধক সোনাঠাকুরকে বসাইয়া পালা রচিত হইল। পালায় অভিনয় ও সঙ্গীতের অনুশাসক যাঁহারা তাঁহাদের কথা ও নামোল্লেখ ছিল। আসরে দুইজন অভিনেতা স্বদেশী ও স্বদেশপ্রেমের সমর্থন ও বিরোধিতার তীব্র কথোপকথন চালাইতেছে, অসহিষ্ণু বিরোধী অভিনেতা যুক্তি হারাইয়া নেতৃবৃন্দকে গালাগালি আরম্ভ করিলে সমর্থক অশ্বিনীবাবুর পবিত্র আদর্শ জীবনের দোহাই দিতেই বিরোধী ব্যক্তি অশ্বিনীকুমারকে কঠোর মন্তব্যসহ "গুলিখোর" বলিয়া অভিহিত করিল। সেই মুহূর্তে বাউলবেশী অভিনেতা মুকুন্দ স্বয়ং গাহিতে গাহিতে বিদ্যুৎগতিতে আসরে প্রবেশ করিলেন—

"ঘোর কলিকাল বালাই লয়ে মরি তোর
নইলে ঐ ব্যাটা কি বলতে পারে অশ্বিনীবাবু গুলিখোর?"
ইত্যাদি।

প্রধান অভিনেতা মুকুন্দের বক্তৃতাংশে বহুস্থানে বরিশালের উক্ত মহাপুরুষ চতুষ্টয়ের জীবনকথা ও কার্যের উল্লেখ থাকিত। প্রচলিত যাত্রা ও থিয়েটারের[৫৯] অপরিহার্য নায়ক-নায়িকার নাচ "মাতৃপূজায়" ছিল না। প্রধান অভিনেতা একটি উচ্চাদর্শ লইয়া সমস্ত অঙ্কগুলিতেই নায়করূপে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এই ভ্রমণাবলম্বনে মুক্তিকামী একদল আত্মত্যাগীকে ঐ উচ্চাদর্শে সুগঠিত করিবার চেষ্টা ছিল। উক্ত চেষ্টার কর্মক্ষেত্র ছিল নগর পল্লীর কোণে কোণে লুক্কায়িত কতিপয় হীন দুর্বলতা। ঐ দীনতার চিত্র ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে নেশামত্ত মাতালে, গর্ভধারিণী আজ্ঞাকারী স্ত্রৈণে, কায়িক শ্রমে ঘৃণা পোষণকারী দাম্ভিক শিক্ষিত ভদ্রে, রুগ্ন পীড়িত বিপন্নে সহানুভূতিশূন্য নির্মমে, দেশ-সমাজের সেবা-বিরোধী কর্মবিমুখ তার্কিক ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবাহী দেশদ্রোহীদের চিত্রাবলীতে। আদর্শ সেবী সাধক কর্মীদল সর্ববিধ মুক্ত অন্বেষণে এই সকল হীন মনোবৃত্তির বাঁধ ভাঙিয়া বিরাট মুক্তির পথকে সুগম করিবার প্রয়াসে নিযুক্ত ছিল। প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র কর্মকে

৫৯। যাত্রা অনেকদিন ধরিয়া লোকের প্রীতি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই দীর্ঘ শতাব্দী পর শতাব্দীর যাত্রার রূপ পরিবর্তিত হয় নাই। সকল দেশেই দেখা যায় আদিতে নাট্যের বিকাশ মন্দির প্রাঙ্গণে এবং নাট্যের বিষয় মানবজীবনে দৈবপ্রভাব। পুণ্যের

বিরাটের সহিত রসযুক্ত করিয়া একাধারে মুমুক্ষু ও পতিতকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া উদ্বুদ্ধ করার কাজই ছিল প্রধান অভিনেতা বা নায়কের বিশেষ কাজ। ইহারই পথে-ঘাটে নায়ক বার বার ব্যাকুল করা ডাকে জাতির নিদ্রিতাংশকে সকর্মক জাগরণে আহ্বান করিয়াছেন। বাঙ্‌লার নবজাগরণের সুপ্ত সিংহের খোঁচা খাইয়া "গা" মোড়া দেওয়ার তুলনা করিয়া সতর্ক ও আশ্বাস বাণীর ঘোষণা থাকিত। আলোড়নের স্বদেশী অংশ ছিল "মাতৃপূজার" পবিত্র উপকরণ। বিদেশী বাণিজ্যের শোষণ সংকট মূর্তির দিকে ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া মাতৃপূজার মুকুন্দ গাহিয়াছেন—"দশ হাজার প্রাণ যদি আমি পেতাম", গর্ভাঙ্কে ও উপসংহারে এই মাটির দেশের দৃশ্য-অদৃশ্য প্রাণ শক্তিই যে ব্রহ্মময়ী আদ্যা মহাশক্তির বিকাশরূপে সম্মুখে প্রকটিত, দেশের পূজাই যে মাতৃপূজা, মাতৃপূজার সিদ্ধিই যে সর্ববিধ মুক্তি, মায়ের দুয়ারের বলিদান, রক্তদান যে অ্যাত্মত্যাগ, সেই সুরে পালার গঠনকে সর্বজনরম্য ঊর্ধ্বগামী করার চেষ্টা হইয়াছে। উপসংহারে অসাম্প্রদায়িক আচণ্ডাল তথাকথিত শুচি-অশুচি সকলকে লইয়া সিদ্ধির দুয়ারে পূর্ণ প্রণতি দ্বারা অভিনয় শেষ করা হইয়াছে।

বিভিন্ন কারণেই "মাতৃপূজা" অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা অসম্পূর্ণ থাকিবে। তথাপি সংক্ষেপে যাহা লিপিবদ্ধ হইল উহাদ্বারা অভিনীত পালার একটা আভাস পাওয়া যাইতেছে। এই আভাসে তেমন কোন মৌলিকতা বা অভিনব বৈশিষ্ট্য প্রদান করিবে না। বিষয়বস্তুর* মধ্যে কর্মীর

*জয় ও পাপের ক্ষয়, চিরন্তন ভাল-মন্দের দ্বন্দ্ব প্রায় অধিকাংশ জাতির নাটকে প্রতিভাত। আমাদের দেশে আদিম কাল হইতে নাটকের ও নাট্যশালার উদ্দেশ্য—ধর্মের মহিমা কীর্তন পুরাণের উপাখ্যানের মাধ্যমে। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় ছোটখাট সুখদুঃখ, আনন্দ ও ব্যথা আমাদের নাট্যের বিষয়ীভূত হয় নাই। আমাদের প্রাচীন যাত্রায় খালি পুরাণ কথাই আবালবৃদ্ধবনিতার মানসগোচর করা হইত। ইংরাজীতে যাহাকে বলে "Secular Drama" আমাদের যাত্রায় কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিল না। অবশ্য বিদ্যাসুন্দরকে "Secular Drama" ধরা হইলে এই কথার ব্যতিরেক ঘটে। স্বদেশী আন্দোলনে দেশে যে সাড়া পড়ে সেই সময় অদ্ভুত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নট মুকুন্দদাস যাত্রাকে রাজনৈতিক আন্দোলনের কাজে লাগান। থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পরেই ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকের আরম্ভ। যাত্রার দুর্ভাগ্য বাংলার থিয়েটার আজকালকার যাত্রাকে অত্যন্ত প্রভাবান্বিত করিয়াছে। এই জন্যই আজ ত্রিশ বৎসর যাবৎ যাত্রার দল দাঁড়াইয়াছে "থিয়েট্রীক্যাল যাত্রা পার্টি" তবুও যাত্রাই বাংলার খাঁটি নাট্য, একেবারে বাঙালীর নিজস্ব। আমাদের জাতীয় নাট্য বলিয়া যদি কিছু থাকে সেটি হইতেছে যাত্রা।"

—নাট্যশালা প্রসঙ্গে—শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

উর্ধ্বযোগে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠের"[৬০] ছাপ আছে, অভিনয় প্রণালী অনুসন্ধান করিলে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ক্ষুদ্র নাটিকার ঋণ স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষভাবে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের শারদোৎসবের প্রণালী ও আবৃত্তি অভিনয়ের ধার সুস্পষ্ট, এরূপ অবস্থায় ঐ সমস্ত প্রসিদ্ধ কোন লেখকের নাটক অভিনয় করিলে কি ত্রুটি হইত এবং মুকুন্দ রচিত "মাতৃপূজা"য় অভিনবত্বই বা কি রহিয়াছে, যদ্দ্বারা মুকুন্দের গান ও অভিনয় শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল সম্প্রদায়ের চিত্তাকর্ষণে সফল হইয়াছিল, এখানে তাহার একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। মুকুন্দ, মুকুন্দনাম যত বড়ই হউক তবু একথা ভুলিলে চলিবে না যে, মুকুন্দের রচনাশক্তি সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাইলেও মার্জিত ও ক্রমোন্নত ভাষায় মাপকাঠিতে বিশেষ কোন স্থান পাইবে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার কতকগুলি সঙ্গীত দীর্ঘকাল উচ্চাসনে বিরাজিত থাকার যোগ্যতা সত্ত্বেও "অশ্বিনীবাবু গুলিখোর", "আর কি দেখাও ভয়," "ভাতের যোগাড় কর" ইত্যাদি সঙ্গীতের পদ লইয়া সে দিনের একদল সাহিত্যসেবীকে ব্যঙ্গ করিতে শোনা গিয়াছে। গ্রাম্য জারী, কবি ও পাঁচালীব ছড়া গান হইলে তাহা ভবিষ্যতে কৃপার ভাণ্ডারে সংগ্রহরূপে স্থান পাইতে পারিত কিন্তু মুকুন্দের রচনা সেই স্তর অতিক্রম করিয়া দ্রুত যে স্থান দখল করিয়া লইতেছিল তাহাতে জিনিসটা সাহিত্যিকদেরও আলোচনার বিষয়ীভূত হইতেছিল। সে আলোচনা বাঙলার সাহিত্যিকমণ্ডলীর সর্ব্বৈ স্তরে পৌঁছিয়াছিল[৬১]।

৬০। 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) বঙ্কিমচন্দ্রের অপব উপন্যাসেব মত নয়। কাহিনীতে উপন্যাসেব উপযুক্ত ধারাবাহিকতার অভাব আছে। বইটি যেন কযেকটি চিত্রেব সমষ্টি। উত্তরবঙ্গে সন্ন্যাসী বিদ্রোহেব ঘটনাব উপবে বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনীটি গডিযাছেন বটে, কিন্তু উপন্যাসে যে চিত্রগুলি তিনি আঁকিয়াছেন তাহা সকলই কাল্পনিক। দেশের উন্নতির কাজে যাঁহারা আত্মনিযোগ করিতেন তাঁহাদিগকে নিজের সুখ-দুঃখ উপেক্ষা কবিযা গীতায় উপদিষ্ট নিষ্কাম কর্মযোগ অবলম্বন কবিতে হইবে,—ইহাই আনন্দমঠের মর্মবাণী। বাঙলাদেশের স্বাজাত্যবোধেব উন্মেষে ও লোকহিতৈষণাব প্রচেষ্টায় আনন্দমঠের প্রভাব কম নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত "বন্দেমাতরম" গানটি ইহাতেই সন্নিবেশিত আছে। —ডঃ সুকুমার সেন।

৬১। 'বরিশাল হিতৈষী' পত্রিকার ভূতপূর্ব কাযাধ্যক্ষ ললিতমোহন সেন মহাশয় বিভিন্ন সময় ঢাকা ও রাজশাহী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ রসিকতার সহিত বলিতেন -"দেখো তোমাদেব মুকুন্দকে লইয়া তো আমার বিপদ। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লোক কর্ত্তৃক মুকুন্দের প্রশংসা শুনিয়া খুশী হইয়াছি; কিন্তু একাধিক প্রশংসাকারী তো প্রশ্নের উত্তর আদায় করিতে আমাকে বিব্রত করিয়া ফেলিয়াছে। প্রশ্নকারীর—মুকুন্দ তো পরম ভক্ত এমন লোক আর হয় না—কি বলেন, তাই নয়? ইত্যাদি। প্রশ্নের তো আর মাঝামাঝি জবাব নাই, তবে দূর দেশে এই প্রভাব, জনপ্রিয়তার আমাদের মুকুন্দ বলিয়া অত্যন্ত গৌরব ও আনন্দ অনুভব করিয়াছি।"

সাময়িক সংবাদপত্রের আলোচনা অতিক্রম করিয়া মুকুন্দের সঙ্গীতাভিনয় "প্রবাসী", "মডার্ন রিভিউ" প্রমুখ সুপ্রতিষ্ঠিত মাসিকপত্রেও আলোচিত ও প্রশংসিত হইয়াছে। এইখানেই শেষ নহে। কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিজ বাড়িতে মুকুন্দের দল আহ্বান করিয়া প্রাজ্ঞ সঙ্গীসহ স্বয়ং শ্রোতা হিসাবে মুকুন্দকে সম্মান দিয়াছিলেন। রবীন্দ্র-যুগে যে কোন রচয়িতার পক্ষে এইটুকুই অভিনব বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পথে যথেষ্ট মনে হয়। কাজেই সাহিত্যিক দিক দিয়াও মুকুন্দের রচনাকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না।

স্থানান্তরে আমরা মুকুন্দদাসের অভিনীত পালাসমূহের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব। এখানে "মাতৃপূজার" অভিনয়-বস্তুর স্মরণ আনুষঙ্গিক কয়েকটি কথা লিখিতে হইল। মোট কথা মুকুন্দের মুকুন্দত্ব অভিনবত্ব মৌলিকদান, যাহা ঘরের কোণের ক্ষুদ্র মুকুন্দকে বিরাট মুকুন্দরূপে দেশবাসী পাইয়াছে; যাহার দানের ঋণ ভবিষ্যতে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অপরিহার্যরূপে উজ্জ্বলাসনে বিরাজ করিবে তাহার বিকাশ প্রভাবের অবলম্বন সাহিত্যকলার ভিতর দিয়া "মাতৃপূজা" পালা অভিনয়ের মধ্য দিয়াই দামামা বাজাইয়া জয়যাত্রা করিয়াছিল, ললাটের জয়পত্র ঐ "মাতৃপূজা" অভিনয়ই দৃঢ় সুস্পষ্ট অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছিল।

১৩১৩ বঙ্গাব্দ, ১লা বৈশাখ, সদর রাস্তায় "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি উচ্চারণের অপরাধে পুলিশের লাঠিতে রক্তপাত হইল,[৬২] দেশবরেণ্য নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হইলেন। ২রা বৈশাখ পুলিশ সুপারিণ্টেডেণ্ট (Superintendent) ক্যাম্প সাহেব কনফারেন্স মণ্ডপে আসিয়া বলিলেন, "এই সভা ভঙ্গের পরে বন্দেমাতরম্ উচ্চারণ না করিয়া আপনারা সকলে রাস্তা অতিক্রম করিবেন, আপনারা নেতৃগণ এই প্রতিশ্রুতি দিলে, তবে

৬২। 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারিত হইল। তখনো হাভেলীর ফটক পার হইয়া রাজপথে প্রতিনিধিগণ আসিতে পারেন নাই।·অকস্মাৎ লাঠিবৃষ্টি শুরু হইল পুলিশের। সম্মুখে সারকুলার-বিরোধী সমিতির সভ্যগণ জর্জরিত হইলেন। পিছনের ফটক হইতে নিষ্ক্রমণোদ্যত অধ্যক্ষ রজনীবাবু, ব্রজেন গাঙ্গুলী প্রভৃতি আহত হইলেন। পুলিশ নির্মম ও বেপরোয়াভাবে ডাইনে ও বামে, সম্মুখে ও পশ্চাতে লাঠি চালাইতেছে। কেউ রাস্তায়, কেউ পথিপার্শ্বস্থ নর্দমায় পড়িয়া গেলেন রক্তাক্ত দেহে। যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় গুরুতরভাবে আহত হইলেন। কিন্তু লাঠির পর লাঠির আঘাতে মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতার পুত্র চিত্তরঞ্জন পুকুরের মধ্যে পড়িয়া গিয়াও সংজ্ঞা লুপ্ত না হওয়া অবধি মাতৃমন্ত্রত্যাগ করেন নাই। বৎসরের প্রথম দিন ১লা বৈশাখ সেবকগণ রক্তদীক্ষা গ্রহণ করিলেন বরিশালের রাজপথে। দেশমাতৃকার শঙ্কাহরণ বরাভয় হস্ত সেদিন অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়াছিল শত শত আহত সন্তানদের মাথায়।"

—শ্রীহীরালাল দাশগুপ্ত—"জননায়ক অশ্বিনীকুমার," পৃঃ ৫৬

সভা চলিতে পারে, নচেৎ সভা বন্ধ করুন।" ক্যাম্প সাহেবের স্বৈরাচারী বক্তব্য শুনিয়া চতুর্দিক হইতে এই ধ্বনি উচ্চারিত হইল, "এই প্রতিশ্রুতি দিতে আমরা কেউ প্রস্তুত নই।" তখন ক্যাম্প সাহেব বলিলেন, "তা'হলে পুলিশ জোর করিয়া এই সভা ভাঙিয়া দিবে। অন্যথায় আপনারা সভা বন্ধ করুন।" কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা সভা ভঙ্গের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করিলেও ব্যারিস্টার বি. সি. চ্যাটার্জী ও কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখ বহু নেতৃবৃন্দ বলিলেন,—"গোলাগুলি চালাইয়া ওরা সভা বন্ধ করুক। আমরা সভা ভাঙিয়া দিতে প্রস্তুত নহি।" কিন্তু নেতৃগণের পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শের ফলে সভা বন্ধ করিবার সিদ্ধান্তই গৃহীত হইল। যোগেশ চৌধুরী মহাশয় সাশ্রুনেত্রে বলিলেন—"যাও, সকলে গৃহে যাও। গৃহে গৃহে সভা হোক। চতুর্দিকে আগুন জ্বলুক। সে আগুনে চিরদিনের মত বিলাতী জিনিস দগ্ধ হোক।" বক্ষ ভরা ক্ষোভ, দুঃখ ও অশ্রুজলের সহিত সভা ভঙ্গ হইল; দেশময় যজ্ঞভঙ্গের বেদনা আন্দোলনকে নূতন প্রেরণা দান করিল। মুকুন্দদাস প্রত্যক্ষ দর্শনাভিজ্ঞতা লইয়া দুই-একদিনের মধ্যেই ইদিলপুর পরগনায় অবস্থিত দলের সহিত মিলিত হইলেন। এবার ইদিলপুর পরগনার কেন্দ্র ছাড়িয়া ফরিদপুরের মাদারীপুর[৬৩] শহরে পৌছিলেন। নব নব সঙ্গীত রচিত ও অভিনয়াংশে বিভিন্ন দলে বিভিন্নরূপ যুক্ত হইতে লাগিল। বিহ্বল শ্রোতার দল হইতে সঙ্গীতাভিনয় সম্বন্ধে বিভিন্ন স্থানে অনেক অলৌকিক কথা[৬৪] প্রচারিত হইতে লাগিল। দুই-একটি

৬৩। মাদারীপুর:—খুলনা হইতে প্রতিদিন প্রসিদ্ধকুমার—মধুখালী—বিল পথে ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ হইয়া মাদারীপুর পর্যন্ত স্টীমার যাতায়াত করে। ইহা প্রায় ১৭ ঘণ্টার পথ। মাদারীপুর ফরিদপুর জেলার একটি মহকুমা শহর। বলিতে গেলে এই জেলায় শুধু ফরিদপুর ও মাদারীপুরই শহর পদবাচ্য। একদিকে আড়িয়াল খাঁ ও অন্যদিকে কুমার নদ থাকায় শহরটির দৃশ্য অতীব মনোরম। কথিত আছে শাহ মাদার নামে জনৈক ফকির এই স্থানে বাস করিতেন বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে মাদারীপুর। শাহ মাদারের দরগাহ্ ও সমাধি শহরের পূর্বদিকে অবস্থিত। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক ইঁহাকে শ্রদ্ধা করেন। স্থানীয় বণিকগণ সন্ধ্যাদীপ জ্বালিবার সময়ে ভক্তিভরে তাঁহার নাম লইয়া থাকেন। কবি নবীনচন্দ্র সেন ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মাদারীপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া আগমন করেন। তাঁহার "রঙ্গমতী" কাব্য এই স্থানেই প্রথম প্রকাশিত হয়। —অমিয় বসু "বাংলার ভ্রমণ" (১ম খণ্ড), পৃঃ—২৩৪

৬৪। মুকুন্দদাসের প্রিয় কীর্তন সঙ্গী, নিকটতম আত্মীয় শ্রীমনোমোহন নাগ মহাশয় বর্তমানে যাদবপুরস্থ বিজয়গড়ে বাস করেন। তাঁহার নিকট হইতে একটি অলৌকিক ঘটনার কথা জানিতে পারি। ঘটনাটি নিম্নরূপ:—

মুকুন্দদাস যখন তাঁহার "মাতৃপূজা" অভিনয়ের দ্বারা বিলাতী বর্জন এবং ইংরাজ-বিদ্বেষ প্রচার করিতেছিলেন, তখন তাঁহার উপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হয় এবং তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার

অলৌকিক ঘটনা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় স্থান পাইয়াছিল। ফরিদপুর[৬৫] নগরে পৌছাইতে সেখানকার একচ্ছত্র নেতা বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় শ্রোতার আসনে উপবিষ্ট হইয়া অভিনয় দর্শন করিলেন। উৎফুল্ল অম্বিকাবাবু বরিশালের বন্ধু অশ্বিনীকুমারকে দীর্ঘপত্রে নিম্নলিখিত মর্মে অভিনন্দন জানাইলেন—

"আপনার শিষ্য মুকুন্দদাস আপনার প্রচার্য বিষয়কে অপূর্বভাবে প্রচার করিতেছেন। ফরিদপুরবাসী আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। শিষ্য মুকুন্দ সহিত

জন্য সমস্ত থানায় নোটিশ দেওয়া হয়। মুকুন্দদাস আজ এখানে, কাল সেখানে, পুলিশের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এড়াইয়া গান করিতে লাগিলেন। একদিন সকালবেলা খুলনা জেলার "মানিকহার" নামক গ্রামের কালীবাড়ীতে মুকুন্দদাস গান করিতেছিলেন, বেলা তখন অনুমান ১০টা হইয়াছে বহু পুরুষ ও মহিলা গানের আসরে উপস্থিত আছেন। মহিলাদের বসিবার স্থান হইয়াছে কালীমন্দিরের বারান্দায়। হঠাৎ একজন বাঙালী হিন্দু দারোগা ১০।১২ জন কনষ্টেবল লইয়া সভার ভিতরে দলবল সহ মুকুন্দদাসকে ঘিরিয়া ফেলিল। তখন মহিলাদের ভিতরে একটা বিষম কোলাহলের সৃষ্টি হয়। কারণ, মায়ের খড়্গাধৃত হাতটি বার বার আন্দোলিত হইতেছে দেখা গেল। এই দৃশ্য দেখিয়া একটি মেয়ে ভাবাবেশে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। একে তো মুকুন্দদাসের গ্রেপ্তারের জন্য সকলেই ভীষণ চঞ্চল হইয়া উঠে, তাহার উপর মায়ের হাতে খড়্গ আন্দোলিত হইতেছে দেখিয়া একটা ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি হয়। দারোগাবাবু অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া মুকুন্দদাসকে গ্রেপ্তার করা তো দূরের কথা, তাঁহার কাছে ক্ষমা চাহিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। মুকুন্দদাসও এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই সেই স্থান ত্যাগ করেন।

৬৫। ফরিদপুর :—কলিকাতা হইতে ১৬৬ মাইল দূরে। জেলার সদর শহর ফরিদপুর 'মরাপদ্মা' নামে একটি খালের তীরে অবস্থিত। ইহার পূর্বদিকে 'মাদারতলা' খাল ও পশ্চিমে ফরিদপুরের 'জোলা' নামে আরও দুইটি খাল আছে। শহরের দক্ষিণ দিকে ঢোল সমুদ্র নামে একটি প্রকাণ্ড বিল আছে। বর্ষাকালে এই বিলের জল শহরের প্রান্তদেশ অবধি আসিয়া পৌছয়। 'ফরিদ খাঁ' নামক এক ফকিরের নাম হইতে ফরিদপুরের নামকরণ হইয়াছে বলিয়া কথিত। ফরিদ খাঁর দরগাহ্ কাছারির উত্তরে দৃষ্ট হয়। পূর্বে এই শহরের কমলাপুর পাড়ার উত্তর-পশ্চিমে পদ্মা বহিত এবং তাহার নিকটে বনমধ্যে একটি ডাকাতের দলের আডডা ছিল। ইহার নেতৃত্ব করিত ছবদরা নামে একটি স্ত্রীলোক; এই ডাকাতের দল দমন করিবার জন্য প্রথমে এখানে মহকুমার প্রতিষ্ঠা হয় এবং পরে ইহা জেলার সদরে পরিণত হইয়াছে।

ফরিদপুরে 'রাজেন্দ্র কলেজ' নামে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ আছে। পরলোকগত বিখ্যাত জননায়ক অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় ফরিদপুরের অধিবাসী ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল পুরাতন ফরিদপুর ষ্টেশনটির নাম পরিবর্তন করিয়া তাঁহার নামানুসারে 'অম্বিকাপুর' রাখা হইয়াছে এবং রেললাইনকে বিস্তৃত করিয়া বর্তমান ফরিদপুর ষ্টেশনের সৃষ্টি হইয়াছে। ফরিদপুরে প্রভু জগবন্ধু সুন্দর নামে ভক্ত সাধক বাস করিতেন। তাঁহার সমাধি এখানকার একটি দ্রষ্টব্য বস্তু।

—শ্রীঅমিয় বসু "বাংলায় ভ্রমণ" (১ম খণ্ড), পৃঃ ১১১-১১২

তদীয় গুরু আপনাকে কোন ভাষায় অভিনন্দিত করিব বুঝি না। ফরিদপুরবাসী কৃতজ্ঞ, উপকৃত; আপনার সাধনা সার্থক" ইত্যাদি। কিছুদিন যাবৎ ছদ্মবেশী পুলিশ এই দলের অনুসরণ করিতেছিল, এইবার প্রকাশ্য অভিনয় ও সঙ্গীতাদি লিখিয়া লওয়া আরম্ভ হইল। ফরিদপুরে পুলিশের রিপোর্ট লওয়া ও অনুসরণ প্রভৃতি দ্বারা কর্তৃপক্ষের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি সূচিত হইল। দল চাঁদপুরে আসিল, সেখান হইতে প্রসিদ্ধ নেতা বাবু হরদয়াল নাগ মহাশয়ও অশ্বিনীকুমারকে অম্বিকাবাবুর মতই গুরু সহিত মুকুন্দের অপূর্ব প্রচারকার্যের কথা লিখিলেন। এমনি ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহুলোকের পত্র বরিশালে আসিতেছিল, সংবাদপত্রে অশ্বিনীকুমারের শিষ্য মুকুন্দের জয় জয়কার ঘোষিত হইতে লাগিল। স্বয়ং অশ্বিনীকুমার এই এক নব্যোপম শিষ্য সংবাদে আনন্দ ও গৌরবানুভব করিতেছিলেন। মুকুন্দের দল বিভিন্ন স্থান ঘুরিয়া নোয়াখালী পৌছিল। নোয়াখালী পৌছিয়া "মাতৃপূজা" পালাস্থিত সঙ্গীতগুলির দ্বারা একখানি গানের পাঁচ হাজার পুস্তিকা মুদ্রিত হইল। লোকে চারি আনা মূল্য দিয়া লুটের মত করিয়া গানের বই কিনিতে লাগিল। বর্ষা সমাগমে আর গান চলে না। এদিকে ঢাকার নবাব সাহেবের কুমিল্লা আগমন উপলক্ষ্যে যে অপ্রীতিকর শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব হইল, সে সংবাদ মুকুন্দকে বিচলিত করিল।[৬৬] যাত্রার দলগুলি

৬৬। শ্রীযুক্ত মনোমোহন নাগ মহাশয়ের নিকট হইতে এই "অপ্রীতিকর" ঘটনার কথা জানা যায় এবং এই প্রসঙ্গে মুকুন্দের অলৌকিক ক্ষমতার যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা নিম্নরূপ:—

যখন পূর্ব বাঙলায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি মনীষিগণের নেতৃত্বে আন্দোলন অব্যাহত গতিতে চলিতেছিল; তখন মুকুন্দদাস দলবলসহ কুমিল্লাতে গান করিতে যান। ঢাকা শহরের নবাব বংশের নবাব সলিমুল্লা সাহেব কুমিল্লাতে তাঁহার এক আত্মীয় নাবালক মিঞা নামক এক জমিদারের বাড়ি বেড়াইতে যান। তখন কুমিল্লা রেল ষ্টেশন হইতে নবাব সলিমুল্লা সাহেবকে শোভাযাত্রা সহকারে নাবালক মিঞার বাড়িতে আনা হইতেছিল, তখন রাস্তার ধারে দুঃখীরাম কাপুড়িয়া নামক এক ব্যক্তির কাপড়ের দোকানে দোতলায় তাহার চাকর বারান্দায় ঝাঁট দিতেছিল। তখন তাহার নিকট আর একটি লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করে,—"ভাই, নবাব সলিমুল্লা কোন্ জনরে?"—চাকরটি তখন ঝাঁটা হাতেই "ঐ ছাখ, ঐ যে গাড়ির পিছনের সীটের পূর্বদিকে বসিয়া আছে সে-ই নবাব।" এদিকে গাড়ির ভিতরে যাঁহারা বসিয়াছিলেন তাঁহারা এই দৃশ্য দেখিয়া নাবালক মিঞার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তখন স্বদেশী আন্দোলন লইয়া ইংরাজের প্ররোচনায় ঐ সকল মুসলমানগণ একটু হিন্দু-বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার পর এই চিত্র দেখিয়া নবাব ও নাবালক মিঞা খুব চটিয়া গেলেন। হিন্দুরা নবাবের মত সম্ভ্রান্ত মুসলমান এবং কুমিল্লা মুসলমানদের অতিথিকে ঝাঁটা দেখাইয়াছে—এই সংবাদ প্রচার করিয়া মুসলমানদের একত্রিত করিয়া হুকুম দেওয়া হইল—"দুঃখীরাম কাপুড়িয়ার গদী লুট কর।" সামান্য একটা ঘটনা কি মারাত্মক সাম্প্রদায়িক রূপ লইতে পারে তাহা এই

বর্ষার চারি মাস বন্ধ থাকে। মুকুন্দও দল বন্ধ করিয়া সকলকে বাড়ি পাঠাইয়া একাকী কুমিল্লায় পৌছিলেন। একাকী তথায় পৌছিয়া, বিপন্ন কুমিল্লার যথাসম্ভব সাহায্য করিয়া নিজেকে তৃপ্ত করিলেন। বরিশালে পৌছিয়া সকলের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি অশ্বিনীকুমার প্রমুখ প্রবীণগণ কর্তৃক স্নেহাশিসে অভিনন্দিত হইলেন। এবারে মুকুন্দদাসের পোশাকে কিছু পরিবর্তন সকলেই লক্ষ্য করিল। পূর্বে বৈষ্ণববেশী মুকুন্দের গায়ে একখানা সাদা চাদর মাত্র থাকিত, এখন ময়নামতী ছিটের একটি ঈষৎ জাম্ রঙের পাঞ্জাবি সে স্থান অধিকার করিয়াছে। তৎকালে স্বদেশীর হিড়িকে ঐ ছিট্ কাপড়ের চাহিদা

ঘটনার পরিণতি হইতে বোঝা যায়। দুঃখীরাম কাপুড়িযাব দোকান একেবারে ধ্বংস হইল, সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের সমস্ত দোকানপাট লুট হইতে লাগিল এবং মুসলমানরা প্রচাব কবিতে লাগিল যে, আগামীকাল হিন্দু নাবীদের ঘব হইতে বাহির করা হইবে। মুসলমানদেব এই নোটিশে হিন্দুরা খুবই চিন্তিত ও ব্যতিব্যস্ত হইযা প ড়িল।

এই অবস্থায মুকুন্দদাস কি কবিলেন? মুকুন্দদাস তাঁহাব সম্প্রদাযকে নোযাখালীতে পাঠাইযা দিলেন, কুমিল্লায প্রচার হইল যে, মুকুন্দদাস দলবলসহ নোয়াখালী চলিযা গেলেন। দল নোয়াখালীতে ঠিকই গেল, গেলেন না কেবল মুকুন্দদাস একা। তাহাব পর নোযাখালীতে পচাব হইল মুকুন্দদাস দলসহ আসিয়াছেন। এদিকে কুমিল্লাব হিন্দুবা ভীত ও সন্ত্রস্ত হইযা প্রতিকারের আশায ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবেব নিকট গেলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব জবাব দিলেন,—"তোমবা সুরেন ব্যানার্জীব কাছে যাও, তোমবা বিপিন পালের কাছে যাও, আমাব কাছে এসেছ কেন?" এক কথায় হিন্দুদের তিনি তাড়াইযা দিলেন। হিন্দুবা নিরুপায হইযা শহরের ভিতবে একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দুর প্রাচীর ঘেরা বড বাড়িতে সমস্ত হিন্দু নাবীদেব আনিলেন এবং সমস্ত হিন্দু যুবকব সেই বাড়ি ঘিরিযা পাহাবা দিতে লাগিলেন। সেই দিনই অতি প্রত্যুষে শহবেব মধ্যে "রাণীদীঘি" নামে খুব বড একটা দীঘি আছে, তাহাব ভিতব হইতে প্রথম একটা শব্দ উঠিল তিনবার—মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈ! তাহার পর আবার তিনবাব "বন্দেমাতরম" শব্দ উঠিল। সেই শব্দ এত বড় যে, কোন মানুষের গলায় অতবড শব্দ হওয়া অসম্ভব। কুমিল্লা শহবের সমস্ত লোক এই শব্দ শুনিতে পাইল। শব্দ শুনিযা বহুলোক রাস্তায বাহিব হইয়া পবস্পব পরস্পরকে ঐ শব্দের কথা জিজ্ঞাসা কবিযা সকলেই যে শুনিতে পাইযাছে তাহা জানিল। ফলে শহরে হিন্দুদের মধ্যে একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল।

মুকুন্দদাস যে নোয়াখালিতে না গিয়ে কুমিল্লায় আত্মগোপন করিয়া আছেন তাহা সেখানকাব পুলিশ ইন্স্পেক্টর (Inspactor) জানিতেন। তিনি গোপনে মুকুন্দদাসের সঙ্গে দেখা করিয়া একাদিক্রমে চারিবার গুলি করা যায় এমন ক্ষমতাসম্পন্ন দুইটি পিস্তল তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন,—"মুকুন্দবাবু! আমাদেব হাত-পা শিকল দিয়া বাঁধা। আমাদের কিছু করিবার শক্তি নাই। যদি পারেন আপনি এর সদ্ব্যবহার করুন।" এই বলিয়া পিস্তল দুইটি মুকুন্দদাসের হাতে দিয়া তিনি তাড়াতাড়ি সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। এদিকে সন্ধ্যা নামিয়ে আসিতেছে, আর রাত্রিতেই হিন্দু নারীদের উপর অত্যাচার হইবে; অথচ মুকুন্দদাস

খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। স্বেচ্ছাসেবকরা ঐ ছিটের জামা প্রায়শঃ ব্যবহার করায় ঐ রঙ্-এর শার্ট-পাঞ্জাবিগুলি দেশসেবকের চিহ্নরূপে অনেকটা জনপ্রিয় হইয়াছিল। মুকুন্দদাস স্বয়ং এবং তাঁহার দলস্থ কতিপয় যুবকও ঐরূপ পাঞ্জাবি ব্যবহার করতেন। মুকুন্দদাস যখন বরিশালে পৌছাইলেন, তখন বরিশাল শহরের "কাউনিয়া" পল্লীস্থ ৺বৈকুণ্ঠনাথ দাশ উকিল মহাশয়ের বাড়ির প্রাঙ্গণে স্বদেশ কল্যাণে "বঙ্গমাতা" নামক এক মৃন্ময়ীমূর্তি গঠন করিয়া সেইখানে এক বারোয়ারী উৎসবের জের চলিতেছিল। গান-বাজনা ব্যতীত জনসভার অনুষ্ঠানও উৎসবের অঙ্গ ছিল। তৎকালীন অন্যতম নেতা ও সুবক্তা নিবারণ-

কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। বেশ করিয়া খানিকটা সিদ্ধি খাইলেন। তাহার পর সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি মুসলমানী লুঙ্গি পরিলেন এবং জামার উপর একটা কালো রং-এর ওয়েস্ট কোট গায়ে দিলেন, মাথায় দিলেন কালো রং-এর মুসলমানী টুপী। এক কথায় যাহাকে বলে "ঢাকাইয়া কুট্টী মুসলমান"। মুকুন্দদাসের হাতে "শক্তিশেল" নামক গাছের খুব মোটা এবং শক্ত একখানা লাঠি থাকিত। তিনি দুই পকেটে দুইটি পিস্তল এবং হাতে ঐ "শক্তিশেল" লাঠি লইয়া শহরের মধ্যস্থলে "রাজরাজেশ্বরী" নামে এক কালীমাতার মন্দিরের চত্বরে ঢুকিতেই গেটের দুই পার্শ্বে ঝাড়ের মত যে দুইটি কামিনীফুলের গাছ আছে, তাহার উপর উঠিয়া বসিলেন। রাত্রি যখন ৮টা বাজে তখন তিনি দেখিলেন প্রায় হাজারখানেক মুসলমান "আল্লা হো আকবর" ধ্বনি দিতে দিতে সৈন্যদের মার্চ করার ভঙ্গীতে এক লাইনে ৮।১০ জন করিয়া সারিবদ্ধভাবে আসিতেছে। তিনি গাছের উপর বসিয়া সমস্ত কিছু দেখিতেছেন। এমন করিয়া যখন সমস্ত মুসলমান আগাইয়া গেল তখন তিনি গাছ হইতে নামিলেন এবং লাইনের পিছনে গিয়া মায়ের নাম লইয়া পিছনের সারিতে যে দশজন ছিল, ঐ শক্তিশেলের লাঠি দিয়া "তেরছা" করিয়া তাহাদের মাথায় মারিলেন এক বাড়ি। এক বাড়িতে ৪।৫ জনের মাথা ফাটিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। ইহা দেখিয়া যাহারা ২।৪ জন দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদেরও লাঠির ঘায়ে শেষ করিয়া দিলেন এবং নিজেই "খুন-খুন" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। পিছনের ঐ দৃশ্য দেখিয়া এবং চীৎকার শুনিয়া সামনে যত মুসলমান ছিল তাহারা আর কিছু না দেখিয়া প্রাণের ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পালাইয়া গেল। এই পর্যন্তই আক্রমণ শেষ, আর তাহারা হিন্দু নারীদের উপর আক্রমণ করিতে আসে নাই।

মুকুন্দদাস তখন কি করিলেন? রাত্রি প্রায় তখন ১০টা বাজে, সমস্ত জামা-লুঙ্গিতে রক্তমাখা। সেই অবস্থাতেই তিনি অন্ধকার রাত্রিতে ছুটিতে লাগিলেন নিরাপদে আশ্রয়ের জন্য। কুমিল্লার হইতে ২০ মাইল দূরে "লালমাই" নামে একটা রেল স্টেশন আছে, এই স্টেশনমাস্টার মুকুন্দদাসের একজন বন্ধু। এই ২০ মাইল রাস্তা দৌড়াইয়া রাত্রি প্রায় আড়াইটায় "লালমাই" স্টেশনে আসিয়া বন্ধুকে ঘুম হইতে ডাকিয়া তুলিলেন। বন্ধু তাড়াতাড়ি নিজের জামাকাপড় পরিতে ও কিছু ব্রান্ডি দিলেন। ঐ রক্তমাখা জামাকাপড় আগুন দিয়া জ্বালাইয়া দিলেন। সমস্ত ঘটনা শুনিয়া রাত্রি ৪টাতে নোয়াখালীগামী একটি গাড়ির গার্ডকে বলিয়া মুকুন্দদাসকে প্রথম শ্রেণীর কামরায় তুলিয়া দিলেন। মুকুন্দদাস নিরাপদে নোয়াখালী পৌছাইলেন। পর দিন

চন্দ্র দাশগুপ্ত[৬৭] মহাশয়ের সভাপতিত্বে সে সভা হইতেছিল; সেই সভায় মুকুন্দদাস মহাশয় গান গাহিতে অনুরুদ্ধ হইয়া একক হারমোনিয়ামযোগে গান ধরিলেন। শ্রোতৃবৃন্দ মুহুর্মুহুঃ করতালি ও 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি সহকারে গান ও গায়ককে অভিনন্দিত করিতে লাগিলেন। শ্রোতারা পুনঃ পুনঃ বক্তৃতা অপেক্ষা মুকুন্দের গান শুনিবার জন্য দাবী করিতে থাকায় সভাপতি মহাশয় দাঁড়াইয়া তাঁহার স্বভাবসুলভ তেজস্বী ভাষায় মুকুন্দের সঙ্গীত ও মুকুন্দকে অভিনন্দিত করিয়া বলিলেন,—"লোকমুখে শুনিয়া ও সংবাদপত্র পাঠ করিয়া বরিশালের গৌরবে আনন্দ ও গৌরব বোধ করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহার মূল্য যে সোনা অপেক্ষা সহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ তাহা বুঝি নাই। আজ বুঝিলাম মুকুন্দের এক একটি সঙ্গীতে বহু সভায় বক্তৃতা অপেক্ষা বহুগুণাধিক কার্যকরী শক্তি রহিয়াছে। সভার পক্ষ হইতে আমি মুকুন্দকে অভিনন্দিত করিয়া আশীর্বাদ করি, শ্রীমানের কণ্ঠ উত্তরোত্তর আরও শক্তিশালীরূপে দেশ-বিদেশে প্রচার কার্যে নিযুক্ত রহিয়া মাতৃভূমির সেবায় ধন্য হউক—বরিশালকে গৌরবান্বিত করুক। আজিকার সভায় আর কোন বক্তৃতা হইবে না। আমি শ্রীমান মুকুন্দকে যতক্ষণ সম্ভব সভাকে গান শুনাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি, ইত্যাদি।" মুকুন্দ গানের সহিত সাময়িক ঘটনা ও প্রত্যেক নর-নারীর কর্তব্য সম্বন্ধীয় বক্তৃতার দ্বারা দুইঘণ্টা যাবৎ ক্রমবর্ধিত জনতাকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ রাখিয়া ক্লান্তিজনিত অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তুমুল জয়ধ্বনির মধ্যে সভাশেষ করিলেন। ঐদিন কুমিল্লার ঘটনা উপলক্ষ্যে নবরচিত সঙ্গীতও শুনাইয়াছিলেন, যাহার শেষ লাইনে ছিল—"কুমিল্লার দৈববাণী গাহিয়াছে জয়।"

সকালে এই অভাবনীয় কাণ্ডের জন্য সকলেই অবাক হইলেন এবং একটি দৈব-ঘটনা বলিয়া মনে করিলেন। এই অভূতপূর্ব ঘটনার পর কুমিল্লায় আর মুসলমানের অত্যাচার হয় নাই। অশ্বিনী দত্তের একজন বন্ধু লোক কুমিল্লায় সি. আই. ডি.-র ইন্সপেক্টর ছিলেন। তিনি অশ্বিনীবাবুর কাছে পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"অশ্বিনীবাবু, কুমিল্লার এই অলৌকিক ঘটনা যে কাহার দ্বারা হইয়াছে তাহা আমি সবই জানিতে পারিয়াছি। তবে কাতলা মাছ যখন জাল ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, তখন আর তাহাকে ধরিয়া টানাটানি করিতে ইচ্ছা করি না।"

৬৭। নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত :—মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের অন্যতম সহকর্মী ছিলেন রায়বাহাদুর নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়। ইনি ছিলেন বরিশালের প্রথিতযশা উকিল, রাজনীতিজ্ঞ, বাগ্মী, দার্শনিক, গ্রন্থকার ও ইংরাজী শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। গুরুত্বপূর্ণ প্রায় প্রতিটি বিষয়েই অশ্বিনী দত্ত তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিতেন। যে কোন পরামর্শ সভায় তাঁহার আলোচনা ছিল তথ্য ও তত্ত্ব-সমৃদ্ধ।

এইভাবে প্রথম বর্ষের যাত্রাপর্বের সমাপ্তিতে দ্বিতীয় বর্ষের যাত্রাপর্বের সূচনা হইল। প্রতি পালা চারি টাকায় গাহিতে আরম্ভ করিয়া অষ্টম মাস মধ্যে পালা প্রতি ন্যূন সংখ্যা দশ টাকা পাওয়া যাইতেছিল। প্রথম চারিমাস যাহা পাইয়াছিলেন, তাহাতে দলস্থ সকলের মাহিনা, খোরাকী ও যাতায়াত খরচাদি দিয়া অবশিষ্ট কিছুই থাকে নাই। কিন্তু শেষের চারিমাসে প্রায় তিনশত টাকা উদ্বৃত্ত রহিল। উহা হইতে পিতা-মাতাকে কিছু দিয়া পুনরায় দল লইয়া বাহির হওয়ার জন্য প্রায় দুইশত টাকা রাখিয়া দিলেন। এবার লোকসংগ্রহে বেগ পাইতে হইল না, গতবার যাহাদের খোশামুদি করিয়া পাওয়া যায় নাই, এবার তাহাদের কতিপয় উল্টা খোশামুদি করিয়া দলে আসিল। ৺পূজার বায়না ও তৎপরবর্তী কিছুদিন গাহিবার মত স্থানও প্রায় স্থির হইয়াছিল। দলের লোকের নির্বাচন, যন্ত্রাদি ও সঙ্গীতের উৎকর্ষ চেষ্টায় বর্ষা অতিবাহিত হইল। নূতন লোকদের লইয়া সঙ্গীত ও অভিনয়ের মহড়া দিবার উদ্দেশ্যে একখানা বৃহৎ নৌকায় মহালয়ার পূর্বেই দলবলসহ আট মাসের জন্য নৌকায় উঠিলেন। নৌকা ধীরে ধীরে মাদারীপুর অভিমুখে রওনা হইল। যথানির্দিষ্ট দিনে পূজার বায়না গাওয়া হইল। গান অগণিত নর-নারীর প্রাণে স্বদেশী সাফল্যের উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়া চলিতে লাগিল। তথাপি ভাব সৃষ্টি করিয়া মুকুন্দের সঙ্গীতাভিনয় হাওয়ায় বিলীন হয় নাই, যে স্থানে গান হয় সেই স্থানের পরিবর্তিত ভাব বাস্তব কর্মে ফুটিয়া উঠে।[৬৮] ইতিপূর্বেই সরকারের তীব্র দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার কথা লিখিয়াছি। অভিনয়কালে অমুদ্রিত পালার সঙ্গীতে বক্তৃতাদি লিখিয়া লওয়া চলিতেছিল, মুদ্রিত গানের পুস্তিকাও সরকার সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মনে হয় উহার কিছুতেই তেমন অপরাধজনক কিছু ছিল না। অথচ মুকুন্দের সঙ্গীতে জনসাধারণের মধ্যে যে ভাবের সৃষ্টি হয়, পূর্ব বাঙলার প্রথম লাট ফুলার সরকারের পক্ষে তাহা নিতান্তই অবাঞ্ছিত ছিল। বর্তমানের মত শাসনের

৬৮। বরিশালের মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিভিন্ন জেলা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আসিয়া মুকুন্দের জনপ্রিয়তার স্থায়ী নিদর্শন স্বরূপ বলিতেন,—"গাড়ির গাড়োয়ান মুকুন্দের গান গাহিয়া গাড়ি চালাইতেছে, অপর এক স্থানেও মুকুন্দের ভণিতাযুক্ত গান শুনিয়া একটু বিস্ময়ের সহিত অনুসন্ধানে জানিলাম, মুকুন্দদাস এখানে আসিয়াছিলেন; তদবধি তাঁহার কতকগুলি গান আপামর জনসাধারণের মধ্যে এত প্রচলিত হইয়াছে যে, প্রায়শঃই রাস্তাঘাটেও ঐ গান গীত হইতে শোনা যায়। বিদেশী অপরের মুখে মুকুন্দের গান তাহার নিজ মুখে শোনা গানের চেয়েও অনেক আনন্দ দিয়াছে।"

বহুমুখী অস্ত্র তখনো শাসকের করায়ত্ত ছিল না। মামলায় অসহযোগ ছিল না; উকিল, ব্যারিস্টার, আপীল প্রভৃতির হাত এড়াইয়া সরকার বাঞ্ছিত শাসন চালাইবার পক্ষে খুব সুবিধা ছিল না; যত অসুবিধাই থাকুক রাজত্ব, শাসন ও সম্মান বজায় রাখার প্রচেষ্টায় নীরব থাকা যায় না। মুকুন্দের কণ্ঠকে নীরব করিতে অস্ত্র ঠিক হইল - ইন্‌জাঙ্কশন বা নিষেধাজ্ঞা। সেই নিষেধাজ্ঞাও ব্যাপক ছিল না। বোধ হয় প্রথমতঃ প্রকৃষ্ট এলাকার থানা-কর্তৃপক্ষ অশান্তি সৃষ্টির আশঙ্কা করিয়া সদরে রিপোর্ট করিতেন, তথা হইতে জেলা-কর্তৃপক্ষ ঐ থানা হইতে বহিষ্কারের আদেশ জারী করিতেন। মুকুন্দ আইন অমান্য করিতে চাহেন না; তাঁহার কাজ গান গাহিয়া প্রচার করা। নোটিশ পাওয়া মাত্র তিনি দ্রুত সেই থানার বাহিরে চলিয়া যাইতেন। সেখানে যাওয়া মাত্র আবার গান আরম্ভ হইত—২।৪ দিনের মধ্যে আবার বহিষ্কারের আদেশ জারী হওয়া মাত্র সেস্থান হইতে অন্য থানায় গমন করিতেন।

দ্বিতীয় বর্ষের শেষ অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত মুকুন্দ এই কৌতুককর খেলা খেলিয়াছিলেন। মনে হয় সরকার চাহিয়াছেন এইভাবে মুকুন্দ হয়রান হইয়া ক্ষান্ত হইবেন। কিন্তু দেশব্যাপী মুকুন্দ-প্রিয়-শ্রোতা ও শ্রোতা-প্রিয়-মুকুন্দ যোগাযোগে এক অভিনব রসের সৃষ্টি হইল। শ্রোতৃবৃন্দ পূর্ব হইতেই অপর থানায় বায়না ঠিক করিয়া রাখিত, বহিষ্কার আদেশ প্রাপ্তির পরদিনই হয়তো অন্য থানায় আসিলে গান্ হইত। কোন স্থানে এমনও হইয়াছে যে, একটি নদী বা ক্ষুদ্র খাল থানার এলাকাকে বিভক্ত করিয়াছে। সেখানে খালের এপারে আজ গান গাহিতে গাহিতে ইন্‌জাঙ্কশন জারী হইল, অমনি অনতিকাল মধ্যে খালের অপর পাড়ে গান আরম্ভ হইল। এইভাবে ছত্রিশখানা ইনজাঙ্কশন লইয়া দুঃসাহসিক খেলা খেলিতেই "মাতৃপূজা" অভিনয়ের দ্বিতীয় বর্ষ শেষ হইল।

বস্তুতঃ, দ্বিতীয় বর্ষে ১৯০৬-৭ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দের প্রতিভা, নির্ভীক সাহসিকতা, অপূর্ব প্রচার-কৌশলের উদ্দীপ্ত যশোরাশি সংবাদপত্র মাধ্যমে সর্ব-ভারতে পরিব্যাপ্ত হইল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে বঙ্গে যুবকসহ অশ্বিনীকুমারের "মুকুন্দ-প্রসঙ্গ' আলোচনার কথা প্রারম্ভেই উল্লেখ করিয়াছি। বিভিন্ন প্রদেশের সংবাদপত্রও মুকুন্দকে সম্পাদকীয় মন্তব্যে অভিনন্দিত করিতেছিল।[৬৯] সমগ্র বাঙ্‌লা মুকুন্দকে তাহাদের জেলায় পাঠাইবার জন্য

৬৯। অরবিন্দের নেতৃত্বে "বন্দেমাতরম" পত্রিকা, বারীন ঘোষ ও ভূপেন দত্ত পরিচালিত "যুগান্তর", ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত "সন্ধ্যা", মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা সম্পাদিত "নবশক্তি", অশ্বিনীকুমারের "বরিশাল-হিতৈষী", "বিকাশ", "স্বদেশ বান্ধব সমিতি" প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায়

বরিশালে অশ্বিনীকুমারকে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিতেছিলেন। এদিকে প্রথম বর্ষের প্রথমে মুকুন্দ কয়েকটি পল্লীতে গায়ে পড়িয়া গান গাহিয়াছিলেন। প্রথম বর্ষের সমাপ্তির পর বরিশালে প্রত্যাবর্তনকালে উৎসাহী একদল শ্রোতা দলসহ গান শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, মুকুন্দ এবারের বর্ষা সমাগমে দল ভাঙিবার প্রাক্কালে শহরবাসীকে গান শুনাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন জেলার আগ্রহ ও পুনঃ পুনঃ প্রচারিত সুনামে বরিশাল শহরবাসিগণ গান শুনিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। বরিশাল শহরে উকিলের মোহরারগণ প্রতি বৎসর বাসন্তী পূজা করিয়া কয়েকদিনব্যাপী খুব জাঁকজমকের সহিত উৎসব করিয়া থাকেন। বিশিষ্ট দলসমূহের যাত্রা, কবি, জারী প্রভৃতি ঐ বার্ষিক উৎসবে আমন্ত্রিত হয়। মহুরীবাবুগণ লোকের আগ্রহ ও সময়োপযোগী মনে করিয়া যাতায়াত ও খরচাদি বহন করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া মুকুন্দদাসকে আহ্বান করিলেন। মুকুন্দদাসও সাগ্রহ আহ্বানের সুযোগে স্বীয় ইচ্ছা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থ দলসহ বরিশালে পৌছিলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল, বাঙ্‌লা ১৩১৪ সনের ২রা বৈশাখ প্রসিদ্ধ রাজবাহাদুরের হাবেলীতে পরিচিত নর-নারীর বিরাট সমাবেশের মধ্যে আশৈশব পরিচিত বরিশালের ছোট যজ্ঞা বা মুকুন্দ তদীয় "মাতৃপূজা" সঙ্গীতাভিনয় আরম্ভ করিলেন। অশ্বিনীকুমার প্রমুখ বরিশালের শিরোমণিবর্গ সম্মুখস্থ শ্রোতার আসনে উপবিষ্ট। উদ্বোধনী বন্দনা-সঙ্গীতের পর মুকুন্দ এক নাতিদীর্ঘ প্রাণস্পর্শী বক্তৃতায় বরিশালের ঋণ, বরিশালের বৈশিষ্ট্য, বরিশালের ভাবধারা প্রচারেই তাঁহার আদর, তাঁহার প্রাপ্য সম্মান বরিশালেরই প্রাপ্য, গুরু অশ্বিনীকুমার প্রভৃতির স্নেহ ও আশিস্, গতবর্ষের এমন দিনে অনুষ্ঠিত রাজবাহাদুরের হাবেলীর ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উল্লেখ করিয়া বরিশালবাসীকে প্রণামকরতঃ অভিনয় আরম্ভ করিলেন। বৈদ্যুতিক স্পর্শে রূপান্তরের মতো মুহূর্তে ঐশ্বর্য্যহীন আবাল্য পরিচিত যজ্ঞেশ্বরের মূর্তি কোথায় উড়িয়া গিয়া সরস কাঠিন্যে পরিপূরিত এক প্রধান উপদেষ্টার আবির্ভাব হইল। উহা যাত্রার আসর, কি রাজনৈতিক সভা, না ধর্মসভা, সহস্র নর-নারী প্রায় চারি ঘণ্টা কাল বিস্মৃত হইয়া অধীর আবেগে শুধু প্রতীক্ষা করিল। গান সমাপ্ত করিয়া মুকুন্দ পুনরায় সকলকে প্রণতি জানাইলেন। কিন্তু আসর ভঙ্গ হইল

মুকুন্দদাসকে অভিনন্দিত করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া "প্রবাসী", "মডার্ন রিভিউ" প্রভৃতি পত্রিকার নাম উল্লেখযোগ্য।

না। অশ্বিনীকুমার অগ্রসর হইয়া ভাবাবেগে মুকুন্দকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন—সহস্র সহস্র কণ্ঠের তুমুল জয়ধ্বনির মধ্যে মুকুন্দ অশ্বিনীকুমারের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।[৭০] ভাবে গদ্‌গদ কণ্ঠে অশ্বিনীকুমার সমগ্র বরিশালের আশিস্‌বাণী উচ্চারণ করিলে মুহুর্মুহুঃ "বন্দেমাতরম্" ধ্বনির মধ্যে সে-দিনের আসর ভঙ্গ হইল।

দ্বিতীয় বর্ষের শেষভাগে বরিশালে গান গাহিয়া মুকুন্দদাস পুনরায় দলসহ বাহির হইলেন। পুলিশের বিরূপ দৃষ্টি এড়াইয়া দ্রুতগতিতে অতি অল্প সময় মধ্যে কয়েকটি জেলা পরিভ্রমণান্তে বর্ষা সমাগমে দ্বিতীয় বর্ষের বিজয়াভিযান শেষ করিলেন।

তৃতীয় বর্ষের পূজা সমাগত। শক্তিশালী দল লইয়া আবার বাহির হওয়ার আয়োজন চলিল। পুনঃ পুনঃ পুলিশের নিষেধাজ্ঞা, সর্বত্র পুলিশের অনুসরণে দলস্থ যাঁহাদের মানসিক দুর্বলতা ছিল, তাঁহারা তৃতীয় বর্ষে সরিয়া পড়িলেন।[৭১] বাছাই করা, নির্যাতন বরণে স্বীকৃত লোক লইয়া দল গঠিত হইল। আইন বাঁচাইয়া, নিষেধাজ্ঞা মানিয়া যতদূর সম্ভব দ্রুতগতিতে বিচরণের তালিকা করিয়া যথাসময় মুকুন্দদাসের দল বাহির হইল। নব-গঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকারের উত্তপ্ত নজর এড়াইবার মানসে এবারকার অভিযান পশ্চিমবঙ্গাভিমুখে চালানো স্থির করিয়া পূর্ববঙ্গ এবং আসাম এলাকা ছাড়াইয়া পশ্চিমবঙ্গে দল অগ্রসর হইল। মাসাধিক কাল মধ্যেই বাগেরহাটে[৭২]

৭০। মুকুন্দের বর্ষা-বিশ্রামের দিনগুলির প্রায়ই সন্ধ্যায় অশ্বিনীকুমারের পদপ্রান্তে উপবিষ্ট থাকিয়া কাটিত। ঐ সময় মন খুলিয়া প্রাণের ভাল-মন্দ সকল কথা মুকুন্দ অকপটে ব্যক্ত করিতেন। স্নেহ প্রেমপ্রবণ অশ্বিনীকুমার কখনো আনন্দের, কখনো প্রতিবাদের তিরস্কারে মুকুন্দের হাতের লাঠিখানা টানিয়া লইয়া বা লাথি দিয়া বলিয়া উঠিতেন;—"হারামজাদা," প্রতিধ্বনির মত ত্বরিতগতিতে মুকুন্দ মাথাটা পা'-এর কাছে আগাইয়া আশীর্বাদের মত ঐ অভিব্যক্তিকে গ্রহণ করিতেন। অশ্বিনীকুমারকে লিখিত মুকুন্দের পত্রের "ইতি"-র পরে থাকিত—"আপনার হারামজাদা।" ইহাতেই বোঝা যায়, মুকুন্দদাসের নিকট অশ্বিনীকুমার ছিলেন—"হৃদয় রাজ্যের রাজা।"

৭১। মুকুন্দদাসের সঙ্গে আজীবন সহকর্মী কেহই ছিলেন না। কারণ "মাতৃপূজা" অভিনয়কালীন যাঁহারা সহকর্মী ছিলেন, মুকুন্দদাসের জেলের হুকুম হইবার সময় তাঁহারা সকলে বেতনভুক্ত কর্মচারী পরিচয়ে মুক্তি পান. তখন তাঁহারা যে যাঁহার মনোমত জীবনপথে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে থাকেন। জেল হইতে ফিরিবার পর মুকুন্দদাস যখন আবার সামাজিক যাত্রা আরম্ভ করেন, তখন আগের সম্প্রদায়ের কেহ কেহ আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগদান করেন। তাঁহাদের কয়েকজনের নাম—গঙ্গাচরণ দত্ত, নবীন দাস, যামিনী দাস ইত্যাদি।

৭২। বাগেরহাট :—কলিকাতা হইতে ১২৯ মাইল দূরে অবস্থিত বাগেরহাট। ইহা খুলনা জেলার মহকুমা শহর। বাগেরহাট শহরটি ভৈরব নদের তীরে অবস্থিত। ইহা একটি

এক পিকেটিং উপলক্ষ্যে দলসহ বিশিষ্ট কতিপয় ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইলেন। লোকাভাবে দল চালানো কষ্টকর হওয়ায় মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত দলের অন্যান্য সকলকে ছুটি দিতে বাধ্য হইলেন। কয়েকজনের জেলও হইয়াছিল। ইহারই অল্প কয়েকদিন পূর্বে ঢাকা বিভাগের চারিটি জেলার চারিটি সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হইল। ঐগুলি হইতেছে ঢাকার অনুশীলন, ফরিদপুরের সুহৃদ, ময়মনসিংহের ব্রতী, বরিশালের স্বদেশ বান্ধব সমিতি। স্বদেশ বান্ধবের সভাপতি ছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়। সম্পাদক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সহকারী সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়[৭৩] স্বদেশ বান্ধবের কার্যালয় ও তৎসংলগ্ন একটি ছোট গৃহে বাস করিতেন। স্বদেশ বান্ধব বে-আইনী ঘোষণার প্রাক্কালে এক শেষ রাত্রে শহরের বহু বাড়ি একই সময়ে ঘিরিয়া খানাতল্লাশী আরম্ভ হইল।[৭৪] স্বদেশ বান্ধব কার্যালয় ও ছোট সতীশবাবুর গৃহ জনৈক শ্বেতাঙ্গ পুলিশের নেতৃত্বে খানাতল্লাশী হইয়াছিল। কাষ্ঠ-পাদুকা পরিহিত ব্রহ্মচারী সতীশবাবু সাহেব বা মুসলমান পুলিশের গৃহ-প্রবেশে বাধা

প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র। এখান হইতে প্রচুর পরিমাণে চাউল, সুপারী, নারিকেল ও মাছ রপ্তানী হয়। বাগেরহাটে "প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ" নামে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ আছে। "বাগেরহাট কলেজ" নামে একটি ছোট রেল ষ্টেশনও আছে। এখানে একটি ছোট পুরাতন মসজিদ আছে। উহা নসরৎশাহের আমলে নির্মিত। বঙ্গেশ্বর নসরৎশাহের নামাঙ্কিত কয়েকটি মুদ্রা বাগেরহাট হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাগেরহাটের আশেপাশে খানজাহান আলির আমলের কতকগুলি পুরাকীর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বাগেরহাট হইতে ষাট গম্বুজ মসজিদ পর্যন্ত খানজাহান কর্তৃক নির্মিত একটি রাস্তা এখনও ব্যবহারযোগ্য আছে।

—শ্রীঅমিয় বসু—"বাংলায় ভ্রমণ" (১ম খণ্ড), পৃঃ ২১৮-২১৯

৭৩। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়:—ইঁহার নেতৃত্বে বরিশালে একটি শক্তিশালী বিপ্লবী দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই দল নরেন ঘোষচৌধুরীর কর্মতৎপরতায় ও মনোরঞ্জন গুপ্তের সহযোগিতায় বাংলাদেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। বরিশালের মানুষের কাছে ইনি "ছোট সতীশবাবু" নামে পরিচিত ছিলেন। "শঙ্কর মঠের" প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে ইঁহার পরিবর্তিত নাম হয়—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ স্বামী। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বরিশালে যে প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স হয়, সেখানে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণে অশ্বিনীকুমার বিপ্লবী নেতা প্রজ্ঞানানন্দ সম্পর্কে বলিয়াছিলেন—"বরিশালের প্রদীপ্ত পাবক।"

৭৪। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর তদানীন্তন সরকার উভয়বঙ্গের নয়জন নেতাকে শতাধিক বর্ষ পূর্বে রচিত ৩নং রেগুলেশন (১৮১৮ খৃষ্টাব্দের তিন আইন অনুসারে) দ্বারা বিনা বিচারে নির্বাসিত করিলেন। তন্মধ্যে বরিশালের ছিলেন তিনজন—অশ্বিনীকুমার দত্ত, মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঢাকার শ্রীপুলিনবিহারী দাস, ভূপেন্দ্রনাথ নাগ, কলিকাতার কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু।

দিলেন। তিনজন হিন্দু পুলিশ চর্ম-পাদুকা বাহিরে রাখিয়া গৃহ-প্রবেশের অধিকার পাইলেন। খানাতল্লাশী শেষ হইতে একবেলা হইল। বাগেরহাটে দল ছুটি দিয়া এই সময় মুকুন্দদাস বরিশাল শহরে অবস্থান করিতেছিলেন। মুকুন্দদাস সেখানে পৌছাইয়া তল্লাশী শেষ হইতে না হইতেই করতাল সহযোগে গৌরকীর্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। পুলিশগণ সমারোহে কীর্তন রঙ্গ দেখিয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে উভয় বঙ্গের দমননীতি উগ্রমূর্তি ধারণ করিল। বঙ্গভঙ্গজনিত এই ব্যাপক আন্দোলনের গতি ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রণে সরকারপক্ষ পচলিত আইনের সুবিধা পাইতেছিলেন না। লোকে আইন অমান্য করে না, আদালতে অসহযোগ না করিয়া সরকারী আইনের সুযোগেই সরকারের দমন ইচ্ছাকে ব্যর্থ করিয়া দেয়।

তদানীন্তন পূর্ববঙ্গ সবকাব মুকুন্দদাসকে জব্দ কবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছিলেন। থানায় থানায় পুনঃ পুনঃ নিষেধাজ্ঞার হয়রানিতেও মুকুন্দদাসকে জব্দ করা গেল না—তাঁহার উদাত্ত আহ্বান ও কার্যকরী শক্তি অধিকতররূপে বৃদ্ধির পথেই চলিতেছিল। অভিনয়, গান, বক্তৃতার মধ্যেওআইনে আটকাইবার তেমন কিছু সরকারপক্ষ পাইতেছিলেন না মনে হয়। এদিকে বাগেরহাট হইতে বরিশাল শহরে ফিরিয়া মুকুন্দ পুনরায় দল গঠন কবিলেন। আবার অভিযান। নিশ্চয়ই ক্ষুদ্র একটি লোকের এই দুঃসাহসিক শক্তি সরকারেব মনে বিরূপ ভাবকে অসহনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু মুকুন্দকে রাজোচিত নির্বাসন সম্মান না দিয়া অন্য রকমে জব্দ করাব পথই সরকার খুঁজিতেছিলেন মনে হয়। এইবার মুকুন্দ দল লইয়া নৌকাযোগে ববিশালের পূর্ব অঞ্চল 'উত্তর সাহাবাজপুরে' প্রবেশ করিলেন। গভীর নিশীথে বৃহৎ নৌকায় পাল খাটাইয়া মেঘনার তরঙ্গসঙ্কুল বিশাল বক্ষে মুকুন্দের তরণী অগ্রসর হইতেছে। দলস্বামী মুকুন্দ যে ভীতিপ্রদ ঢেউয়ের তালে সুর মিলাইয়া গান ধরিলেন—
"মায়ের নাম নিয়ে ভাসান তরী, যেদিন ডুবে যাবে রে তরী যেদিন ডুবে যাবে"
ইত্যাদি, তাহা সমবেত কণ্ঠের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি মাঝি ও আরোহীদের

কেবলমাত্র তাহাই নহে, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ব্রজমোহন বিদ্যালয় হইতে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রের বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিলেন। দেবপ্রসাদ ঘোষ এণ্ট্রাস ও এফ.এ.-তে বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম হইয়াও বৃত্তিলাভে বঞ্চিত হইলেন। বানরিপাড়া স্কুলের শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার উচ্চস্থান অধিকার করিয়াও বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন। তথাপি তিনি বি. এম. কলেজেই ভর্তি হইলেন। একদিকে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রদল, অন্যদিকে স্বদেশ বান্ধব সমিতির নেতৃবৃন্দ লইয়া স্থানীয় সরকার বিপন্ন হইয়া পড়িলেন।

সাহস যোগাইয়া দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল। মেঘনাবক্ষে অকস্মাৎ একখানি দ্রুতগামী লঞ্চ দৃষ্ট হইল। মাঝিরা অব্যাহত গতিতে নৌকা চালাইতেছিল। এমন লঞ্চ-ষ্টীমার দেখিতে মাঝিরা অনভ্যস্ত নহে। সহসা একি! ঘাট নাই, থানা-বন্দর কিছুই নাই, লঞ্চের গতি হ্রাস হইল! ক্রমে অতি হ্রস্ব গতি লইয়া লঞ্চখানি নৌকার অনতিদূরে পৌছাইল। লঞ্চ হইতে হাঁকিয়া একজন জিজ্ঞাসা করিল—"নৌকা কাহার?" নৌকা হইতে উত্তর হইল—"মুকুন্দদাসের।" লঞ্চ হইতে গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ আসিল,—"নৌকা থামাও, পুলিশ সাহেবের আদেশ।" লঞ্চ নৌকার গায়ে থামিল, কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ লাফাইয়া নৌকায় উঠিলেন। নৌকা তল্লাশী হইল, বাক্স-পেটরা, নৌকার গহ্বর (পাটাতনের নিম্নভাগ) সকল খুঁজিয়া কাগজ-পত্র, পুস্তক প্রভৃতি একত্রিত হইল—পুলিশ সাহেব অদূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তল্লাশী শেষ হইলে পুলিশ সাহেব ১০৮ ধারামতে দলের সকলের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা পাঠ করিয়া শুনাইয়া সকলকে লঞ্চে উঠাইলেন। নৌকা লঞ্চের সঙ্গে বাঁধিয়া দেওয়া হইল, সশস্ত্র পুলিশ মুকুন্দ-সহিত দলের সকলকে ঘিরিয়া পাহারা দিতে লাগিলেন—লঞ্চ বরিশাল অভিমুখে রওনা হইল। শৃঙ্খলিত বন্দীসহ পরদিন প্রত্যুষে বরিশাল ঘাটে লঞ্চ পৌছাইল। যথাসময়ে আসামিগণকে কোর্টে হাজির করা হইল। গুরু জামিনের আদেশসহ মামলার তারিখ পড়িল। সকলেই জামিনে বাহির হইয়া মামলার দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। উভয় দিক হইতেই মামলার প্রস্তুতি চলিতে লাগিল। সরকার পক্ষ কাগজপত্র ঘাঁটিলেন, বঙ্গভঙ্গ রহিতের পর যিনি যুক্ত বাঙ্‌লা সরকারের আইন-সচিব নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেদিনে বরিশালের সেই উদীয়মান ব্যারিষ্টার ৺নলিনী-ভূষণ গুপ্ত (মিঃ এন. গুপ্ত) মহাশয় মুকুন্দের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হইলেন। মনে হয় প্রমাণপত্রে দৃষ্টে ঐ ১০৮ ধারার মামলা হাইকোর্ট পর্যন্ত টিকানো সম্ভব হইবে না বলিয়া অভিজ্ঞেরা বুঝিতে পারিয়া-ছিলেন। কিন্তু প্রায় দেড় বৎসর পূর্বে নোয়াখালীতে মুদ্রিত "মাতৃপূজা"র গানের বইয়ের ক্ষুদ্র একটি ছত্র[১৫] অভিজ্ঞ ব্যবহারজীবীর চক্ষে এতদিন পরে প্রয়োজনে ধরা পড়িল। বাঞ্ছা পূরণে সরকারের পথ পরিষ্কার হইল।

"মাতৃপূজা" গানের রাজদ্রোহকর ক্ষুদ্র ছত্রটি নিম্নরূপ :—

"বাবু বুঝবে কি আর ম'লে—
ছিল ধান গোলাভরা, শ্বেত ইঁদুরে করল সারা,
চোখের ঐ চশমাজোড়া, দেখনা বাবু খুলে।"

দশম অধ্যায়

রাজদ্রোহে মুকুন্দদাস

১০৮ ধারা মামলার আর তিনদিন মাত্র বাকী। আহারান্তে মুকুন্দ শহরে বাহির হইয়াছেন। বরিশাল শহরের সেদিনকার "জেল রোড" বর্তমানে সদর রোডে 'চাটার্জী ব্রাদার্স-এর ফার্ম -স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বর্তমানে প্রসিদ্ধ কিরণ দরবেশ) মহাশয়ের গৃহে তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিয়া মুকুন্দদাস মহাশয় হাসপাতাল ও জেল-থানায় মধ্যস্থ রাস্তায় উঠিয়াছেন; এমন সময় পুলিশ আসিয়া '১২৪-ক' ধারা অনুসারে মুকুন্দদাসকে পুনরায় গ্রেপ্তার করিল। উভয় হস্ত একত্র করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইল। নির্ভীক মুকুন্দ অনমিত মস্তকে বুক টান করিয়া স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে রাস্তায় দৃষ্ট পথিককে হাসিয়া হাসিয়া শৃঙ্খলিত হস্ত দেখাইতে দেখাইতে পুলিশের সহিত কোর্ট অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনতিকালমধ্যে অদূরশ্রুত 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি ঘোষণা করিল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন মজুমদার মহাশয়ও রাজদ্রোহে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। দর্শক জনতার দুই দল একত্রিত হইয়া জয়ধ্বনি করিয়া মুহূর্তমধ্যে শহরময় এই দুইটি গ্রেপ্তারের বার্তা ছড়াইয়া দিল। ধৃত আসামীদ্বয় জেল-হাজতে প্রেরিত হইলেন। ১০৮ ধারার মামলা আর চালাইবার প্রয়োজনীয়তা রহিল না। এক মুকুন্দদাসকে আটক করিতে পারিলেই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। এই সময় সরকারের দমননীতি লোকের মধ্যে একটা ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। বিশেষতঃ, বরিশালের আইন ব্যবসায়ীদের মধ্যে ইহা যেন অধিকতর ফুটিয়াছিল। রাজদ্রোহের মামলার তারিখে মুকুন্দের পক্ষে দাঁড়াইবার জন্য উকিল পাওয়া গেল না। উকিলহীন আসামী মুকুন্দ কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া সময় প্রার্থনা করিলেন,—বিচারক সময় দিয়া তারিখ ফেলিলেন। শৃঙ্খলাবদ্ধ মুকুন্দ জেল-হাজতে ফিরিবার সময় উকিল লাইব্রেরীর সামনে দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে তীব্রভাষায় উকিলদের ভর্ৎসনা করিয়া গেলেন, মাথা নীচু করিয়া অপ্রতিবাদে সেই ভর্ৎসনা উকিলগণ শুনিলেন। এই সংবাদে জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হইল। ভোলা মহকুমার উকিল-সমাজ বরিশালের সমব্যবসায়ীদের এই ভীরুতায় লজ্জিত হইয়া প্রতিকারের জন্য অগ্রসর হইলেন। পরবর্তী তারিখের পূর্বেই ভোলার প্রসিদ্ধ জননেতা স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র দাশগুপ্ত

ও স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র সেন (পরবর্তী সময়ে স্বামী পূর্ণানন্দ গিরি মহারাজ) মুকুন্দের পক্ষ সমর্থনকল্পে বরিশালে পৌছিলেন। উকিলদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ ও পরামর্শ করিলেন, তাঁহারা লজ্জিত হইলেন। কিন্তু প্রথম দিনের মামলা ভোলার উকিলদ্বয়কেই চালাইতে হইল এবং তাঁহারাই বরিশালের বিশিষ্ট উকিল, স্বর্গীয় যাদবচন্দ্র রায় মহাশয়কে মামলা চালাইবার জন্য স্থির করিয়া গেলেন। শেষ পর্যন্ত যাদববাবুই মামলা চালাইয়াছেন এবং প্রাথমিক ভীতি ভোলার উকিলদ্বয় কাটাইয়া দিলে অনেকেই এই মামলাতে সাহায্য করিতে সাহস পাইলেন ও উহাতে সাহায্য করিয়াছিলেন। পরবর্তী তারিখে মুকুন্দের সহোদর ভ্রাতা রমেশচন্দ্র মামলা তদ্বিরের জন্য কোর্টে ঘুরিতেছিলেন. এমন সময় কোর্ট-প্রাঙ্গণে পুলিশ তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করিল। যথাসময়ে শৃঙ্খলিত ভ্রাতৃদ্বয় জেল-হাজতে নীত হইলেন, অতঃপর একমাত্র বৃদ্ধ পিতাকেই মামলার তদ্বিরে নামিতে হইল।[৭৬] ভ্রাতা রমেশচন্দ্রের অপরাধ নোয়াখালীতে 'মাতৃপূজার' যে ক্ষুদ্র পুস্তিকা মুদ্রিত হইয়াছিল, যাহার একটি লাইনের উপর মামলা, সেই পুস্তিকার প্রকাশকরূপে রমেশচন্দ্রের নাম মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের গ্রেপ্তারের সংবাদ ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। তিনি 'দেশের গান' নামে একখানি স্বদেশী সঙ্গীত সংগ্রহ ছাপাইয়াছিলেন,

৭৬। স্বদেশী আন্দোলনে যখন পুত্রের নাম দেশে-বিদেশে ছড়াইতেছিল, তখন পিতার চাকরির উপর চাপ আসিল। তখনো মুকুন্দের তেমন অর্থাগম আরম্ভ হয় নাই। এমতাবস্থায় অবস্থা বুঝিয়া পিতা চাকুরী পরিত্যাগ করিলেন। চাকুরীহীন পিতাকে সংসার নির্বাহে আর্থিক দৈন্যতা গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তদুপরি পুত্রের জরিমানার টাকা প্রভৃতির জন্য খি ' বেগ পাইতে হইয়াছে। তাহাকে বিভিন্ন স্থানে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইয়াছে। কিন্তু বার্ধক্যে উপনীত পিতামাতা ভীত, দুর্বল ও অনুতপ্ত না হইয়া তাহাদের মর্মবেদনাকে গৌরবানুভূতির মূর্তিতে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আজিকার মত সেদিন গ্রেপ্তার হওয়া, জেলে যাওয়া প্রভৃতির বাহুল্য হয় নাই। তৎকালে ভীতি, বিভীষিকা যথেষ্টই ছিল। সেই দিনে মুকুন্দ-জননী দুই পুত্রের কারাবরণকে যখন রাম ও লক্ষ্মণের বনবাসের সহিত তুলনা করিয়া অশ্রুজলে বুক ভাসাইয়া বিধাতা সম্বোধনে বেদনার প্রতিকারে প্রার্থনা করিলেন, তখন তাহা সাধারণ স্ত্রীজাতিসুলভ আর্ত নহে, ক্ষত্রিয় বীরমাতার অনলমাখা স্নেহাভিব্যক্তি।

বস্তুতঃ, আত্মপ্রত্যয়, দৃঢ়তাব্যঞ্জক বাক্য প্রয়োগে মুকুন্দ-জননীর অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। অনেক সময় কথাপ্রসঙ্গে স্বামীর উল্লেখ করিয়া বলিতেন—"আমি যদি ঐ একজন ব্যতীত আর কাহারো দিকে কোনদিন না চাহিয়া থাকি; তবে যাহা বলিতেছি তাহা হইবেই।" ইহাতেই বোঝা যায়, এমন পিতামাতা না পাইলে মুকুন্দ "জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন" হইয়া কারাগারে কাটাইতে পারিতেন না।

সেই পুস্তকে মুকুন্দের সেই 'রাজদ্রোহকর গানটি'[৭৭] ছাপা হইয়াছিল। ঐ পুস্তকের মুদ্রাকররূপে আদর্শ প্রেসের শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও গ্রেপ্তার হইলেন। রাজদ্রোহের বিচার চলিতে লাগিল।

যথানিয়মে বিচার চলিতে লাগিল। উভয়পক্ষের সওয়াল শেষ হইল। সরকার পক্ষের ব্যারিস্টার মিঃ এল. গুপ্ত তাঁহার সওয়ালে বলিয়াছেন—"মুকুন্দের ভাষা অপেক্ষা তাহার অভিনয়ের ভাব-ভঙ্গী বহুগুণ অধিক রাজদ্রোহকর" (His motion and posture more than sedition of his language)। ঐ একটি গানের জন্য রাজদ্রোহের দুইটি মামলা হইয়াছিল। এক মামলায় আসামী ভবরঞ্জনবাবু ও নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে দেড় বৎসর ও চারিমাস সশ্রম কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইলেন। অপর মামলায় আসামী মুকুন্দদাস ও তদীয় ভ্রাতা যথাক্রমে তিন বৎসর ও ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কারাদণ্ড ব্যতীত মুকুন্দদাসের তিন শত টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও এক বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। কারাদণ্ড চলিতে লাগিল।[৭৮] চৌত্রিশ বৎসর পূর্বের কারাবাসের ভীষণতা আজিকার রাজনৈতিক কারাদণ্ডভোগীদের পক্ষে অনুমান করা কঠিন হইবে। সর্বশ্রেণীর অপরাধীদের সহিত দেশসেবী রাজনৈতিক কয়েদীদের কোন পার্থক্য ছিল না। শ্রম, আহার, শয়ন একই প্রকারে একত্রেই চলিত। অনভ্যস্ত শ্রমের অক্ষমতার শাস্তিতেও পার্থক্য ছিল না। লোহার থালা ও খাদ্যবস্তুর দুর্গন্ধ সহ্য করিয়া নাক চাপিয়া প্রাণ বাঁচাইতে গলাধঃকরণ করার চেষ্টায় অনেককেই ব্যাধিগ্রস্ত জীর্ণাবস্থায় হাসপাতালের আশ্রয় লইতে হইত, সেও কি সহজ ছিল? তাহার

৭৭। এই 'রাজদ্রোহকর' গানটি "পরিশিষ্টে" দেওয়া হইল। এই গানের যে লাইনটি সরকারপক্ষ সুকৌশলে প্রয়োগ করিয়া মুকুন্দদাসকে বরিশালের ফৌজদারী আদালতে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন; তাহা নিম্নরূপ:—

"বাবু বুঝবে কি আর ম'লে!
কাঁধে সাদা ভূত চেপেছে, একদম দফা সারলে॥
... ...
ছিল ধান গোলা ভরা, শ্বেত ইঁদুরে করল সারা"

এই একটি কথা 'শ্বেত ইঁদুরে করল সারা', অর্থাৎ ইংরাজকে 'শ্বেত ইঁদুর' বলিয়া ব্যাখ্যা করায় মুকুন্দদাসের তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছিল। আর দলের সমস্ত লোক বেতনভুক্ত কর্মচারী হিসাবে বেকসুর খালাস পাইয়াছিল।

৭৮। ইংরাজ সরকার মুকুন্দদাসকে কিছুদিন বরিশাল জেলে রাখিয়া পরে দিল্লী জেলে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে মুকুন্দদাসের কারাবাস জীবন বড়ই দুর্বিষহ ছিল। তাঁহাকে জেলে ঘানিতে সরিষা পিষিয়া তৈল বাহির করিবার কাজ দেওয়া হইল। দুর্দান্ত কয়েদীদের

পর রাত্রির বিশ্রাম। সেই শূন্য শয্যার মত কম্বলের উপর মশারীহীন অবস্থায় নিদ্রার আরাধনা, সঙ্গীদের অভ্যস্ত কুৎসিত ভাষায় অশ্রাব্য কাহিনী কর্ণে কি ঢালিত তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। পাঁচ মিনিটের ঘুন্টিতে শত শত লোকের আবরুহীন পায়খানায় উপবেশন, স্নানাদি সম্পর্কেও এমনি অসংখ্য বৈচিত্র্যপূর্ণ অবস্থাতেই কারাপ্রাচীরাভ্যন্তর পরিপূর্ণ ছিল। জনমতে পরিবর্তিত আজিকার কারাকক্ষও রূপান্তরে বহু ক্রুটি লইয়াই চলিতেছে। এখানে উক্ত প্রসঙ্গ আপাততঃ আলোচনা করিব না। তথাপি বলা যায় যে, সর্বশ্রেণীর অপরাধীর জন্যই কারাগার সংশোধনাগার হওয়ার প্রয়োজনীয়তা জাতির মঙ্গলে জরুরী।

বরিশাল কারাগারে সিংহবিক্রমী মৌলবী লিয়াকৎ হোসেনকে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। তিনি শ্রমে অস্বীকার করায় সেলে (cell) আবদ্ধ হইলেন। সেখানে ডাল ভাঙিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে যাঁতা ও ডাল রাখা হইল, ক্রমবর্ধিত শাস্তির মুখে তিনি অটল-অচল। কোনরকমে ... স্বীকৃতি লইবার জন্য জনৈক রক্ষী তোয়াজ করিয়া বলিলেন— "মৌলবী সাহেব, একবার মাত্র যাঁতাটা ঘুরান।" উগ্রমূর্তি মৌলবী তীব্রকণ্ঠে শুনাইয়া দিলেন "জরা ভি ভাঙ্গে গা নেহি" ইত্যাদি। এই অনমনীয় দৃঢ়তার

এই শাস্তি দেওয়া হইত। মুকুন্দদাস ইংরাজ সরকারের নিকট "দুর্দান্ত কয়েদী"-ই ছিলেন। কিছুদিন কলুর বলদের মত তৈল নিষ্কাশনের কাজ করিবার পর 'জেলার' তাহাকে বুক-বাইণ্ডিং বিভাগে কাজ করিবার জন্য বদলী করিলেন। তখন তাঁহার কষ্টের কিছু লাঘব হইল।

দিল্লী জেলে বড় বড় ডাকাত, দস্যু ও দাগী চোরদের আড্ডা ছিল। তাহারা জেলকে ভয় করিত না। অনেকে বলিত, "আরে ভাইয়া, জেলকো কেয়া পরোয়া হ্যায়? সরকার তো হাম লোককে ওয়াস্তে পাক্কা মোকান বানা দিয়া।" জেলে কয়েদীদের যে পরিমাণ রুটি দিত তাহাতে ঐ সকল দস্যুর পেট ভরিত না। মুকুন্দদাস তাঁহার বরাদ্দ রুটি হইতে একটা অংশ এই সকল দস্যুদের দিতেন। বিনিময়ে তাহারা মুকুন্দদাসের শরীর দলিয়া দিত। একজন দস্যুর কথা বলিতে গিয়া মুকুন্দদাস বলিয়াছেন তাহার কাজই ছিল ধনীর ধন লুট করা এবং কাঙালীদের ভিতর বিতরণ করা। ধরা পড়িলে জেল, ছাড়া পাইলে আবার দস্যুতা। এইভাবে দস্যুটি কারাগারকে বাসগৃহ করিয়াছিল। কোন পুলিশ অফিসারের জেল হইলে সে যে পুলিশ ছিল তাহা গোপন রাখিত। কারণ অন্যান্য কয়েদীরা যদি জানিতে পারিত যে এই লোকটা পুলিশ ছিল, তাহা হইলে সমস্ত দস্যু কয়েদীরা "কেয়া শালা, আভি কেয়া হুয়া"—এই রকম গালাগালি করিয়া তাহার মাথার চুল সমস্ত ছিঁড়িয়া ফেলিত। মুকুন্দদাস জেলের বিবরণ যাহা দিয়াছেন তাহাতে জানা যায়—জেলের মধ্যে না হয় এমন কাজ নাই। জুয়া খেলা, নেশা করা ইত্যাদি সকলই চলে। যাহারা জেলের পাহারাদার, তাহাদের ডাকিয়া গোপনে টাকা দিলেই যাহা দরকার তাহা তাহারা বাহির হইতে আনিয়া দিত। এক টাকা দিলে আট আনার জিনিস পাওয়া যাইবে, বাকি আট আনা যে পাহারাদার জিনিস আনিয়া দিবে তাহার।

পাশে আমাদের মুকুন্দদাস আর এক উল্টা পথে উজানে পাল তুলিয়া কারাজীবনকে মাধুর্যময় করিলেন। তিনি সাগ্রহে যে কোন কঠোর শ্রমে স্বীকৃতি জানাইয়া বরিশাল জেলের চৌকা বা পাকশালায় ঢুকিলেন। ত্রিংশ-বর্ষীয় যুবক মুকুন্দ শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে বলিষ্ঠ। অব্যাহত স্ফূর্তিতে গৃহীত কর্তব্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। কার্য সম্পাদন করিতে করিতে ও নিশাযোগে সেই চোর-ডাকাত সঙ্গীদের আসরে আইনের গণ্ডী অতিক্রম না করিয়া তাঁহার গান, বক্তৃতা চালাইতে লাগিলেন। হীন অপরাধে অভ্যস্ত দণ্ডিতেরা নবাগত ছিঁচকে চোর-ডাকাতকে স্ব-স্ব দুঃসাহসিক অপকৌশলের কাহিনী শুনাইয়া উহাদিগকে সাহসী করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মসূচী কারা-প্রাচীরের অন্ধকক্ষে বসিয়াই রচনা করিত। ইহার ফলেই দেখা যায় এক একটি 'গ্যাং' (সঙ্ঘবদ্ধ) বেশে বিভিন্ন জেলার চোর-ডাকাতেরা কেমন কৌশলে একত্রিত হইয়া দুষ্কার্য সম্পন্ন করিয়া বাড়ি ফিরিয়াছে। এই পরামর্শের মূল ঘাট কারাকক্ষ। উন্নত সভ্যতার দাবীদার ব্যবস্থার ফল বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া জেল ও কয়েদীদের সংখ্যা বাড়াইয়া চলিয়াছে, কমাইতে পারে নাই। চল্‌তি ব্যবস্থায় যে একবার কারাগার স্পর্শ করিল, সে আর ঘরে ফিরিল না। কারাকক্ষের আবহাওয়া উক্ত জীবনকে বেপরোয়া সাহসী করিয়া জেলখানাকেই জীবনের মহাতীর্থ করিয়া দিল; যে সংস্কার প্রচেষ্টায় শুরু রবিবাসরীয় ক্ষণিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা যন্ত্রের ন্যায় প্রাণহীন হইয়া চলিয়াছে, উহা শুষ্ক প্রাণহীন স্পর্শ! অভিসন্ধিহীন প্রেমমূলক বিভিন্নমুখী ব্যবস্থা, ব্রতচারী নৃত্যের ধারায় উদ্ভাবনের শুভেচ্ছা, ভাবে ও কর্মে মিলাইয়া দেওয়ার প্রচেষ্টা ফলপ্রদ রস সৃষ্টি করিতে পারে—**কলের দুগ্ধ নহে, মাতৃবক্ষের স্নেহভরা স্তনধারা**। কবে, কতদিনে। যাহা হউক উক্ত প্রসঙ্গ স্থগিত রাখিয়া বলিতে চাই মুকুন্দদাসের কারাজীবন। মুকুন্দের সঙ্গীরা রাত্রে তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিত, মুকুন্দ গান শুনাইতেন, গান শিখাইতেন, মনোজ্ঞ কথা শুনাইতেন। মুকুন্দের সঙ্গীত-ঐশ্বর্য অনেকেরই জানা ছিল, জেলের সকল কয়েদী মুকুন্দের প্রতি আকৃষ্ট হইল।[৭৯] চৌকার কাজ সহকর্মীরা কাড়িয়া লইতে চাহিত, মুকুন্দ সকলের কাজ করিতে চাহিতেন। যে নীরস হুকুমের কর্ম পার্শ্ববর্তীর উপর হিংসা-দ্বেষ জাগ্রত করিয়া দ্বন্দ্ব, বিরোধ, অভিযোগের সৃষ্টি করিয়া নিয়ত বিষোদ্গিরণ করে,

৭৯। প্রবীণ বিপ্লবী, সমাজসেবী ও সাহিত্যিক স্বর্গীয় সুরেশ দাশগুপ্তের কারাবন্ধু শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় কয়েদীদের মধ্যে মুকুন্দের গানের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে একটি

তাহাতেই মুকুন্দের কর্ম কাড়াকাড়ির প্রেমস্পর্শ জেল চৌকার মানুষ আবহাওয়াকে প্রীতি, নির্মল, হাস্যমুখর করিয়া তুলিল। কর্তৃপক্ষ মুকুন্দকে বেশী সময় অবসর দিলেন না। বাঙ্‌লার চিত্তজয়ী মুকুন্দকে বেশী সময় নির্বাসনের পথে দেশান্তরিত না করিয়া দুর্জয় রাজনৈতিক অপরাধীকে চোর-ডাকাতের সমপর্যায়ে রুদ্ধ করিলেন বটে, কিন্তু বাঙ্‌লাদেশে মুকুন্দকে বঙ্গভাষা-ভাষীর সংস্পর্শে রাখাও নিরাপদ মনে না করিয়া নির্বাসিতদের মতই বাঙ্‌লার বাহিরে সুদূর দিল্লীর কারাগারে নির্বাসিত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। মুকুন্দও লোহার শিকলকে ফুলহারের মত দোলাইয়া হাসিমুখে বাঙ্‌লা ছাড়িয়া দিল্লীর কারাগারে গিয়া হাসিলেন—"বাঘেরে না ডরায় নন্দ, সাপেরে না ডরায়—জলেতে না ডোবে নন্দ, আগুনে না পোড়ায়।"

চমৎকার ঘটনার কথা বলেন। ঘটনাটি প্রত্যক্ষদর্শীর এবং তাহা নিম্নরূপ —রাঁচীর পাগলাগারদ এক টাকা দর্শনী দিয়া দেখা যায়। হরেক রকম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পাগল সেখানে চিকিৎসিত হয়। দর্শকের সময় সর্বদায় কৌতুকপূর্ণ আলাপ ও দর্শনে সার্থক হয়। পূজার ছুটিতে অনেক বাঙালী রাঁচীতে বেড়াইতে যান, হাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে ঐ পাগলাগারদ দর্শন যাত্রীদের নিকটে প্রায় অপরিহার্য। বাঙ্‌লার পাগল রোগীরা পূর্বে ঢাকা ও বহরমপুরে চিকিৎসিত হইত। বর্তমানে বাঙ্‌লার পাগল চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রধান স্থান রাঁচীতেই নির্ধারিত হইয়াছে। তজ্জন্য বাঙ্‌লার সংখ্যাবহুল পাগল রাঁচী গারদে পরিদৃষ্ট হয়। পনর বৎসরাধিককাল পূর্বের জনৈক বাঙালী দর্শক রাঁচীর পাগলাগারদে পাগলদের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন,—সহসা জনৈক পাগল জিজ্ঞাসা করিল—"মহাশয়ের বাড়ি কোথায়?" দর্শক বলিলেন—"বরিশাল।" 'বরিশাল' —বলিতেই কয়েকজন পাগল একই সময় সোৎসাহে বলিয়া উঠিল,—"আপনি মুকুন্দদাসকে চিনেন? তার সঙ্গে দেখা হইবে কি?" দর্শক বলিলেন—"হাঁ, চিনি,—দেখা হওয়ার সম্ভাবনা আছে।" সমবেত পাগলেরা বলিয়া উঠিল—"আপনি মুকুন্দবাবুকে অবশ্য এবার আসিতে বলিবেন, আমরা এবার তাঁর তিন পালা গান দেবো। ভুলিবেন না তো?" কৌতুক বিস্ময়ে দর্শক অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, গত বৎসর মুকুন্দবাবু দলসহ যাত্রা করিতে রাঁচীতে আসিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় ঐ সময় রাঁচীতে ছিলেন। তিনি বলেন—"প্রায় এক মাস যাবৎ প্রতিদিন রাঁচীতে গান চলিতেছিল, তবুও বায়না ফুরায় না, শেষে পূর্ব-নির্ধারিত বায়নার তারিখ নিকটবর্তী হইলে রাঁচীর অবশিষ্ট আহ্বান পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হন" ইত্যাদি।

ঐ সময় পাগলাগারদের কর্তৃপক্ষ পাগল-চিকিৎসার অঙ্গরূপে মানসিক আনন্দ দিবার জন্য একশত টাকা ব্যয়ে গারদের মধ্যে মুকুন্দের যাত্রাভিনয়ের বন্দোবস্ত করিলেন। পাগলগণ খুব উল্লাস প্রকাশের সহিত সংযতভাবে গান শুনিতেছিল। গান শেষে সমবেত পাগল রোগিগণ কর্তৃপক্ষের নিকট আবদার করিল, আরও এক পালা গান শুনাইতে হইবে। কর্তৃপক্ষের কর্তব্য নির্ধারণের সহায়তাকল্পে পাগলগণ প্রস্তাব করিল, এই সপ্তাহে তাহারা মাংস খাইবে না। কর্তৃপক্ষ রাজী হইলেন, দ্বিতীয় দিনের গান হইল। সে গানে পাগলগণ এমন আনন্দ পাইয়াছিল যে, বহুদিন পরেও জনৈক বরিশালবাসীর সহিত দেখা হওয়ামাত্র মুকুন্দবাবুকে সাগ্রহে আহ্বান জানাইয়াছিল।

একাদশ অধ্যায়

"দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার"

স্বদেশ ও জাতির মুক্তির জন্য সাধনার পথ বড়ই দুর্গম ও বিপদসংকুল। এই সাধনা যেমন কঠোর, ইহার প্রতিবন্ধকতাও তেমনি প্রতিপদক্ষেপে। স্বদেশ ও জাতির সমস্ত গ্লানি দূর করিয়া তাহাকে নূতন মুক্তি ও আনন্দের আলোকে ভরিয়া তুলিবার সাধনা খুবই কষ্টসাধ্য। উন্মত্ত উদ্দাম সমুদ্রবক্ষে ক্ষুদ্র তরী লইয়া অগ্রসর হইতে গেলে তাহার কাণ্ডারীকে যেমন হুঁশিয়ার হইতে হয়, বিক্ষুব্ধ জাতির জাতীয় জীবনের মুক্তিসাধনার কাণ্ডারীকেও তেমনি হইতে হইবে একনিষ্ঠ, দৃঢ়, আদর্শবান ও সুগভীর আত্মপ্রত্যয়শীল সাধক। মুকুন্দদাসের মধ্যে আমরা এই নির্ভীক ও সাধকোচিত মনোভাবের পরিচয় পাই। দুঃখে-শোকে অবিচলিত, কর্তব্যে দৃঢ়নিষ্ঠ, নিন্দা-আঘাতে আত্মস্থ,[৮০] প্রেমে দীপ্ত, ভাল-

৮০। শ্রদ্ধেয় সুরেশ দাশগুপ্ত মহাশয় কারাবাসকালীন মুকুন্দের যে স্মৃতিচারণ করিয়াছিলেন তাহারই দুইটি অমৃতকণা তুলিয়া দিতেছি। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, মকুন্দদাস সত্যিই নিন্দা ও আঘাতে আত্মস্থ ছিলেন :—

(১) এক আবাল্য বন্ধু মুকুন্দের কাযের তীব্র সমালোচনা করিতেন। সে আলোচনা কোন কোন সময় ঝগড়া-চটাচটিতে শেষ হইয়াছে। পূর্বাহ্নে তিক্ত উত্তেজনার মধ্যে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অপরাধে বন্ধুর ঘরের অদূরে দাঁড়াইয়া মুকুন্দবাবু অনুচ্চস্বরে ডাকিতেছেন,—"বাবু বাড়ি আছেন?"—ইত্যাদি। এই বন্ধুর সহিত পত্রেও ঝগড়া চলিত—আমরণ সে পত্রে লিখন বন্ধ হয় নাই। পত্রের আরম্ভটুকু থাকিত ইংরাজীতে—"My dear Brother", শেষে "ইতি" লেখার পরে ইংরাজীতে "Yours" লিখিয়া বাংলায় লেখা থাকিত—"মোটাবুদ্ধি"।

(২) কতিপয় নিন্দাকারী, মুকুন্দ গুরুগিরি আরম্ভ করিয়াছে, বহু 'মেয়ে লোক' মুকুন্দের শিষ্যা হইতেছে, ইহাতে পতনের ইঙ্গিত করিয়া আনন্দবোধ করিত। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে এই সকল মিথ্যা রটনা লইয়া হাসিঠাট্টাও হইত। তবে এই কথাও ঠিক যে, এই দেশের ভক্তি-শ্রদ্ধা মজ্জাগত যে সংস্কার লইয়া মূর্ত হইতে চাহে সেখানে ঐ মন্ত্র গ্রহণের প্রথা আছে। মুকুন্দ নিজে মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু স্বয়ং কাহাকেও মন্ত্র দিতে নিজেকে নিতান্তই অযোগ্য মনে করিতেন এবং কস্মিন্‌কালে কাহাকেও মন্ত্র দান করেন নাই। তৎসত্ত্বেও কতিপয় ব্যক্তি মুকুন্দের নিকট দীক্ষিত হইতে মৌখিক ও পত্রাদিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। মুকুন্দ সসম্ভ্রমে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া হিতাকাঙ্ক্ষীরূপে জীবন পরিচালনের পরামর্শ দিয়াছেন। ঐ সমস্ত পত্র লেখক-লেখিকাদের মধ্যে শিক্ষিতা বিশিষ্ট মহিলাদের নামও দেখা গিয়াছে।

মন্দে পরিপূর্ণ মানুষ ছিলেন মুকুন্দদাস। "তীরের সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে বেচা-কেনা" করিতে তিনি জানেন না। আরাম ও বিশ্রামের ঘাটের বাঁধন ছিন্ন করিয়া, নূতন সত্যের জগতে পাড়ি জমাইবার সাহসে তাঁহার অন্তর পরিপূর্ণ। আরামের শয্যা ত্যাগ করিয়া "নূতন সমুদ্রতীরে তরী নিয়ে" পাড়ি জমাইবার মত নির্ভীকতা তাঁহার আছে। নূতন সৃষ্টির উপকূলে নিয়ত যাত্রা করিয়া চলার মধ্যেই তাঁহার আনন্দ। প্রথা ও সংস্কারের নিকট দাসখত লিখিয়া দিতে তিনি জানেন না, পুথির বুলি উচ্চারণের ভিতর দিয়া জড়তাকে তিনি ডাকিয়া আনেন না। তিনি—

"আপনায় ভুলে যায় প্রাণ খুলে
নাচে নিখিলের নৃত্যে।"

তিনি আরাম চাহেন না, দুঃখবরণে তাঁহার আনন্দ ও তৃপ্তি। তিনি অমৃত-সন্ধানী, মরণসন্ধানী। 'মৃত্যুর অন্তরে পশি' অমৃত আহরণ তাঁহার কাম্য। প্রাণহীন পুথির বাণীর দ্বারা তিনি তাঁহার জীবনের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করেন না। পুরাতন অর্থহীন বন্ধনকে ভাঙিয়া দেওয়াই তাঁহার কাজ। তিনি "জরাসন্ধের দুর্গ ভেঙে জীবনের জয়ধ্বজা উড়ায়।" তাঁহার মধ্যে আছে সৃজনী শক্তির আবেশ। সেই শক্তি পুরাতনকে নূতন করিয়া থাকে, মৃতকে সঞ্জীবিত করিয়া থাকে, শীতের আঘাতে পাতা ঝরাইয়া বসন্তের পুষ্পরাজি প্রস্ফুটিত করিয়া তোলে।

এদিকে দিন, মাস গণনায় প্রতীক্ষা আরম্ভ হইল। কারাবাসী মুকুন্দের পরিবারে বৃদ্ধ মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, স্ত্রী ও কন্যা রহিয়াছেন। কন্যার বয়স দুই বৎসর। ছয়মাস কারাভোগ করিয়া ভ্রাতা রমেশচন্দ্র গৃহে গেলেন। পিতার সঞ্চিত অর্থ যাহা ছিল, দোকানের মূলধনের সহিত ক্রমে তাহা নিঃশেষ করিতে লাগিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, পুত্রের সংশোধনের জন্য চাকুরিয়া পিতার উপর চাপ আসিল। অবস্থা বুঝিয়া প্রথমতঃ বিদায় লইয়া পরে চাকুরী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পিতা গুরুদয়াল শৈশবের দৈন্য চাকুরী লইয়া কাটাইয়াছিলেন, বার্ধক্যে আবার সেই দৈন্য আসিয়া বৃদ্ধকে ঘিরিতে লাগিল। এদিকে মুকুন্দের কারাগমনের সাত মাস পরে মুকুন্দ-পত্নী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন।[৮১] তখন মুকুন্দ সুদূর দিল্লীর কারাগারে।

৮১। মুকুন্দের এই একটিমাত্র পুত্র সন্তান, নাম—শ্রীকালীপদ দাস। পিতা মুকুন্দের দাস, পুত্র মা-কালীর দাস। শাক্ত ও বৈষ্ণবের অপূর্ব মিলন। পিতার মত পুত্র যশোখ্যাতি লাভ না করিলেও

সেখান হইতে মাঝে মাঝে কুশল সংবাদ পাওয়া যাইত। সংসার ব্যয় নির্বাহ ও জরিমানার টাকা সংগ্রহে ঐ বৃদ্ধ পিতাকে বিভিন্ন জেলায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছে। চরম দৈন্য কাটাইয়া লইবার এই সকল ঝঞ্ঝাট মুকুন্দ-পরিবারে কোনরূপ হতাশার ক্লান্তি আনিতে পারে নাই। তাঁহাদের চিত্তে একটা গৌরবানুভূতির সহিত উজ্জ্বল ভবিষ্যতে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। রাখীবন্ধনের সভায় ঐ বৃদ্ধ তরুণের উৎসাহ লইয়া রাজবাহাদুরের হাবেলীতে সমবেত কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া পুত্রের রচিত সঙ্গীত অসঙ্কোচে গাহিয়াছেন। জনসাধারণও সসম্মান সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বৃদ্ধকে তৃপ্তিদানের চেষ্টা করিয়াছে। অভাব-সাচ্ছল্যে পরিবারবর্গের দিন কাটিতেছে; সুদূর প্রদেশের অবাঙালীপূর্ণ কারাকক্ষেও নিজের উপযোগী স্থান করিয়া লইতে মুকুন্দ সক্ষম হইয়াছেন। নির্দিষ্ট দিনাতীতে আবার পরিবারেব দুঃখ ঘুচাইবাব আশ্বাসও আসিতেছে। তেমনি সাজান গৃহে ফিরিয়া পত্নীক্রোড়ে পুত্র দৃষ্ট হইবে সে চিত্রও মুকুন্দ-চিত্তের হয়তো নিঃসঙ্গতায় পূর্ণতার উপাদান যোগাইয়াছে। কারাবাসের অর্ধাংশ অতীত হইয়াছে—বিধাতার রুদ্র দৃষ্টি আর একবার মুকুন্দ-পরিবারকে স্পর্শ করিয়া গেল। সীমন্তের সিঁদুরকে সগৌরবে মাথায় লইয়া গৃহকোণের যে মৌন প্রাণটি জিজ্ঞাসাহীন উৎকর্ণে স্বামী গৌরব শুনিয়া শুনিয়া ভাষাহীন মিলনের রঙীন প্রতীক্ষায় কাটাইতেছিলেন, পতিপ্রাণা মুকুন্দ-পত্নীর সেই স্থূল দেহটিতে দারুণ বিসূচিকা আসায় আত্মা দেহটি ছাড়িয়া অনন্ত আকাশে মিলাইয়া গেল। শোকাভিভূতে পরিবার শিশু-পুত্র-কন্যা বুকে লইয়া আবার দিন গুনিতে লাগিলেন—মুকুন্দকে এই সংবাদ জানান হইল না।

সংসার, দেশ, সমাজ, ইতিহাস—এই বৈশিষ্ট্যহীন বাসনাকুল বধূ মুকুন্দ পত্নীকে স্মরণ করে নাই, করিবে না—পরন্তু অনায়াসে সেই স্থান অধিকতর সুন্দররূপে পূর্ণ করিয়া দিবার তাগিদ, সংসার, আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবের সমাজে তেমন তীব্র দুঃখানুশোচনা আনে নাই, আনিবে না। কিন্তু সে মূক প্রেমের

পিতার শূন্য আসর জাগাইয়া অদ্যাবধি "চারণপল্লী"তে বাস করিতেছেন। চব্বিশ পরগনা জেলার সোনারপুরের নিকটে রাজপুরস্থ এই "চারণপল্লী"। চারণকবি মুকুন্দদাসের স্মৃতিস্বরূপ শ্রীযুক্ত কালীপদ দাসের উপস্থিতি অদ্যাপিও আমাদের প্রাণে সাড়া জাগায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায় :—

"যাহা কিছু হেরি চক্ষে কিছু তুচ্ছ নয়,
সকলি দুর্লভ বলে আজি মনে হয়॥"

ভাষা যে হৃদয়ে ছাপ লাগাইয়া গিয়াছিল, সেই দাগ বিরাট ঐশ্বর্যের প্লাবনে মুছিতে পারে নাই—মুকুন্দ আমরণ বিপত্নীক রহিলেন।[৮২]

মুকুন্দদাসের পিতা বর্তমান থাকায় জরিমানার টাকা আদায়ের জন্য মাল-ক্রোক চলিল না, কিন্তু গ্রেপ্তারকালে কতিপয় মেডেল পুলিশ হস্তগত করিয়াছিল। জরিমানা আদায়ের জন্য ঐ মেডেলগুলি নিলামে বিক্রয় হইল। ক্রেতার নিকট হইতে টাকা দিয়া মুকুন্দের পিতা সেইগুলি উদ্ধার করিলেন, (পূর্বে যোগাযোগও ছিল)। বাকী টাকা তিন বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বেই যথানিয়মে দাখিল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের (৩রা তারিখ ?) যথানির্দিষ্ট দিনে দিল্লী কারাগার হইতে মুক্ত হইলে মুকুন্দদাস অপরিচিত নগরীর রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। কোথায় যাইবেন, কোথায় থাইবেন কিছুই স্থির নাই। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের[৮৩] বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ ও কালীবাড়িতে প্রণাম করা—এই

৮২। দিল্লীর সুদূর কারাগারে অবস্থানকালে মুকুন্দের পত্নী-বিয়োগ হয়। কারাভোগান্তে পুনরায় ক্রমবর্ধমান ঐশ্বর্যের মধ্যে পুনরায় বিবাহ না করিবার সঙ্কল্পে মাতা কথনও বাধা দেন নাই। বাঙলার সাধারণ জননীকুল পুত্রের বিবাহসম্পন্নে যেইরূপ অধীরতা প্রকাশ করেন, মুকুন্দের মাতা কথনও সেইরূপ করেন নাই, করিলে মাতৃভক্ত মুকুন্দের পক্ষে খুব অসুবিধা হইত। মাতার প্রতি মুকুন্দের অচলা বিশ্বাস ভক্তি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া মুকুন্দ জীবনকে জয়যুক্ত করিয়াছে, মুকুন্দ প্রাণে প্রাণে এই কথা বিশ্বাস করিতেন ও বলিতেন। মুকুন্দের মাতৃভক্তি গাম্ভীর্যের সহিত সেবার উপকরণ যোগাইয়া কর্তব্য নির্বাহের পর্যায়ে ছিল না, তাহা ছিল প্রাণ নিঙড়ানো রসমাধুর্যে পরিপূরিত। মুকুন্দের চাল-চলন, কথাবার্তা, চেহারার মধ্যেও একটু লক্ষ্য করিলেই বোঝা যাইত, সর্বত্রই মাতার উত্তরাধিকার বিরাজমান।

৮৩। মদনমোহন মালব্য, পণ্ডিত.—প্রসিদ্ধ দেশনেতা। ইনি একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এবং প্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক। কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহার এক বিরাট কীর্তি। এলাহাবাদ শহরে ১৮৬১ খৃঃ ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা পণ্ডিত ব্রজনাথ "শ্রীমদ্ভাগবতে"-র একটি সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের পূর্বপুরুষের বাসস্থান মালব দেশ। ১৮৯২ খৃঃ ইনি আইনের পরীক্ষা দিয়া এলাহাবাদ হাইকোর্টের এল. এল. বি. উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ইনি হিন্দুসমাজ নামে একটি সমিতি গঠন করেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় ইনি প্রবেশ করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ইনি লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯১৬ খৃঃ ইনি ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হন রাওলাট্ আইনের ইনি তীব্র প্রতিবাদ করেন। ইনি ১৯১৮ খৃঃ দিল্লী কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯১৩ খৃঃ ইনি মাহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতৃগণের সহিত ইংলণ্ডে গমনপূর্বক গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ইনি একজন শ্রেষ্ঠ নেতা। শুদ্ধি—সংগঠন, অস্পৃশ্যতাবর্জন এবং সর্বশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন তাঁহার জীবনের লক্ষ্য।

ছুইটি মনে স্থির করিয়া প্রথমে কালীবাড়ি পৌছাইয়া প্রণামান্তে মন্দিরের অদূরে কিছুক্ষণ দাঁড়াইতেই এক সন্ন্যাসিনী অগ্রসর হইয়া তীব্র দৃষ্টিতে মুকুন্দকে নিরীক্ষণ করিলেন। মুকুন্দের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেই সেই সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "তুমি কি মুকুন্দদাস ?" মুকুন্দ বিস্ময়ে 'হ্যাঁ' মত বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি বরিশালের সেই ভৈরবী মা ?" সন্ন্যাসিনী বলিলেন—"হ্যাঁ।" কথোপকথনে মুকুন্দ জানিলেন ভৈরবী ছয় মাসের অধিককাল পূর্বে বরিশাল ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। জানিবার মত সংবাদ কি আছে জিজ্ঞাসা করায় ভৈরবী যেন জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন এড়াইয়া অন্য কথা বলিতে চাহিতেছেন। এইটি লক্ষ্য করিয়া মুকুন্দের ভিতরে সংশয়ের উদ্রেক হওয়ায় স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমাদের ঘরের সকলে বাঁচিয়া আছে ?" ভৈরবী একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, শুনিতেই হইবে ? তবে শোনো, তোমার পত্নী-বিয়োগ হইয়াছে,—যমুনায় স্নান করিয়া আইস।" মুকুন্দ এক মিনিট কাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া "জয় মা।" বলিয়া ভৈরবীকে যমুনাব সন্ধান জিজ্ঞাসা করিয়া স্নান করিয়া আসিলেন। একখানা পোস্টকার্ডে মাকে এই সংবাদ শোনার কথা এবং এইজন্য ব্যাকুল হইতে নিষেধ করিয়া চিঠি দিলেন। অতঃপর আহারের ব্যাপদেশে জনৈক প্রসিদ্ধ নেতাব সাক্ষাৎ লাভের আশায় মালব্যজীর বাড়ি উপস্থিত হইয়া একবেলা আহাব পাইলেন, কিন্তু উপলব্ধি করিলেন কারামুক্ত রাজদ্রোহীকে যত শীঘ্র সম্ভব বিদায় দেওয়াই সেই বাড়িব বাঞ্ছনীয়। মুকুন্দ মনে মনে কৌতুক অনুভবকরতঃ আহার্য ত্যাগ না করিয়া ভোজনান্তে স্টেশনে চলিয়া গেলেন এবং পরবর্তী গাড়িতে কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলেন। কলিকাতায় একদিন মাত্র অপেক্ষা করিয়া বরিশালে পৌছিলেন। তিন বৎসব পরে গৃহিণীশূন্য গৃহে মাতা, ভগ্নীর উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন-কোলাহল মুকুন্দকে অভ্যর্থনা করিল। দ্বিতীয় দিনে শহরে দেখাসাক্ষাৎ করিয়া আসিলেন। গৃহে-শহরে বিগত দিনেব সুখ-দুঃখের ইতিহাস শুনিতে লাগিলেন। রাস্তাঘাটে উপদেষ্টাপূর্ণ সমাজ, ঐকান্তিকতার সহিত শান্ত সুস্থ থাকিবার অসংখ্য পরামর্শ দিতে লাগিলেন,— মুকুন্দ অপ্রতিবাদে প্রতিবাদে সকল কথাই শুনিতে লাগিলেন। তৃতীয় দিবসে মাতা দুঃখ প্রকাশ করিয়া সংগোপনে শুনাইলেন—"আগামীকল্য সকালটা কোন রকম চলিবে, বৈকালের কোন সংস্থান নাই। বুড়ার (স্বামী) পর্যটন ও মনোবেদনা দেখিয়া দেখিয়া দুঃখবোধ হইয়াছে, কিন্তু তিন বৎসরের 'ওয়ার্ধায়' তাহার মনটা তাজা রহিয়াছে। আজ যে অবস্থার কথা বলিলাম ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী আশঙ্কাজনক অভাবের

সম্মুখেও পৌঁছিয়াছি, কিন্তু মা-কালী আশ্চর্যরূপে চালাইয়া দিয়াছেন, কাজেই ভয় নাই, তুমি চিন্তিত হইও না, জানাইয়া রাখা কর্তব্য বলিয়াই জানাইলাম।"

"অন্ন চিন্তা চমৎকার"—কথিত আছে মহাকবি কালিদাসকেও নাকি একদা এই সংবাদ শক্তিশালী করিয়াছিল। মুকুন্দ বিচলিত হইবার পাত্র ছিলেন না। মেঘশূন্য আকাশ হইতে বজ্রপাতের মত দিল্লী জেল হইতে বাহির হইবামাত্র পত্নী-বিয়োগ সংবাদে এক মিনিট মাত্র চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই "জয় মা" ধ্বনির সহিত দুর্বলতার পথকে রুদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন। মনস্তাত্বিক অনুসন্ধানে জবাব শুনিলাম—'ভাবনার প্রায় বাহিরের এই সংবাদটা শ্রবণ করা মাত্র দেহের সমস্ত রক্তে যেন একটা ঝলক দিয়া ঐ সংবাদটাকে গ্রহণ ও হজম করিয়া লইল। কারার বাহিরে অবাঙালীপূর্ণ দেশে বাঙ্‌লার দেবীমূর্তির সম্মুখে কয়েক মিনিট মাত্র দাঁড়াইবার সঙ্গেই বাঙ্‌লার এক সন্ন্যাসিনীর মুখ হইতে নির্গত এ-হেন সংবাদ শুনিবার যোগাযোগে অপূর্ব বস কৌশলরূপে আমার জীবনের ইঙ্গিত উপলব্ধি করিলাম, প্রতিকূলতা সকল উড়িয়া গেল—উচ্চৈঃস্বরে "জয় মা" ধ্বনি করিতে সমর্থ হইলাম।"

এখন প্রশ্ন আসিতে পারে, মুকুন্দ কি মায়ামুক্ত নিষ্ঠুর? না, পছন্দমত শিক্ষিতা সুন্দরী নহে বলিয়া প্রীতিহীন? উত্তরে বলিব,—না!—**রসযুক্তা মহামায়ার সন্তানরূপে তাঁহার সকল সম্পর্কে প্রচুর রসজ্ঞান ছিল। দশ-মহাবিদ্যার আদি অন্তের নগ্না ও কমলার সামঞ্জস্যে ত্রুটি মুকুন্দে ছিল না।** কর্তব্যের সম্মুখে অবিচলিত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে সাধারণ আসক্ত সংসারীর প্রতিযোগিতায়ও মুকুন্দ পশ্চাদ্‌পদ হন নাই। একদিন পত্নীকে ধর্মোপদেশ দান করিবার কালে উত্ত্যক্ত চিত্তের অভিব্যক্তি—'হরেকৃষ্ণ' নামের সঙ্গে কি হাস্যজনক শব্দ যোগ করিয়াছিলেন, আগত বন্ধুকে সেই কথা আবৃত্তি করিয়া শুনাইতে উন্মুখ হইলে, প্রস্থানোদ্যতা অবগুণ্ঠিতার অঞ্চল আকর্ষণ করতঃ, একক পাইলেই কোন্ ভাষায় স্বামীকে ভৎর্সনা করিবে, অনুকরণের স্বরে তাহা শুনাইয়া নিষ্কৃতি দিয়াছেন। মুকুন্দের দাম্পত্য প্রেমও নীরস 'কাঠখোট্টা' বা শুধু তাবল্যে নিবদ্ধ ছিল না—সহধর্মিণী করিবার চেষ্টাই ছিল। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলের সহিত সাধারণ আসক্ত সংসারী ব্যক্তির অনুরূপই মুকুন্দের ঐকান্তিক টান ছিল। সেই টানের স্বরূপ ঐ পত্নী-বিয়োগ সংবাদ শ্রবণকালে, শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি কর্তব্যপালনে, শত শত উৎকৃষ্ট সম্ভাবনাপূর্ণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যেও লোকান্তরিতা পত্নীর পবিত্র স্মৃতি বক্ষে লইয়া কঠোর জীবন-যাপনের ভিতর

প্রকটিত হইয়াছিল। ইতিপূর্বে মুকুন্দকে আদর্শ মাতৃভক্ত বলিলে কিঞ্চিৎ মাত্রও অত্যুক্তি হইবে না লিখিত হইয়াছে। তদীয় অভিনয় মধ্যে রোগীর ডিউটিতে সর্বত্র প্রশংসিত প্রসিদ্ধ সেবকের স্বীয় মাতার ঔষধ আনিবার ফুরসতের অভাব ও তৎসমর্থনে ব্যাপক সেবায় নিজের 'ঘরভোলা' মহত্বের আত্মপ্রসাদ অনুভূতির জবাবে মুকুন্দ তীব্র ভাষায় যে বক্তব্য ও সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন—তাহা অনেক দেশসেবক, সমাজসেবক প্রভৃতির নিগূঢ় ক্ষত-স্থানে লবণ ছিটাইয়া দিয়াছে। মুকুন্দ তাঁহার ঐ অভিনীত বস্তুকে স্বীয় জীবনের বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও ব্যাপক সেবার ত্রুটি না খাটাইয়া বাস্তব রূপ দিবার চেষ্টা পুনঃ পুনঃ করিয়াছেন।

তিন বৎসর পরে গৃহে ফিবিয়া মুকুন্দ দেখিলেন—পিতা-মাতার বাঁধাধরা সচল সংসাব তাঁহারই পশ্চাদনুসরণে রাস্তায় দাঁড়াইয়াছে। মুদি দোকানখানি অপরের নিকট বিক্রয় করা হইয়াছে, দৈনন্দিন আহার যোগাইতে বৃদ্ধ পিতার প্রাণান্তকর অবস্থা। হৃত সম্পদ, সংসার পুত্রের প্রতি দোষারোপ করে না, পিতা লোকের সসম্মান সহানুভূতির স্পর্শগৌরবে দৈন্যের চমৎকাবায় হতশ্বাস হন নাই। সংসারের এই মূলধন লইয়া আবার মুকুন্দ নূতন যাত্রা শুরু কবিলেন। মা'ব নিকট তৃতীয় দিবস রাত্রে সংসারের অবস্থা শুনিয়া মুকুন্দ শয়ন করিলেন। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া শহরে বাহির হইয়া প্রথমেই স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমারের প্রিয় ও অনুগত সহকর্মী, তৎকালীন উদীয়মান উকিল শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র গুহ, এম. এ., বি. এল, মহাশয়ের[৮৪] বাড়িতে উপস্থিত হইয়া সংগোপনে তাঁহাকে শুনাইলেন "ঘরে চাউল নাই।" শরৎবাবু আর কোন প্রশ্ন না করিয়া চকিতে দশ টাকার একখানি নোট হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন,—"এখন যাও, রাত্রে বা কাল যে কোন সময় দেখা করিও, কোন চিন্তা নাই।" মুকুন্দ, তদীয় জীবনের সংকট মুহূর্তের কতকগুলি কথা পুনঃ

৮৪। শবৎচন্দ্র গুহ —উকিল শরৎচন্দ্র গুহ অশ্বিনীকুমারেব অনুরাগীদের অন্যতম। তিনি ছিলেন বিদ্বান, বিদ্যোৎসাহী ও অক্লান্ত কর্মী। ছোট-বড সকলকে তিনি সমাদরে সসম্মানে গ্রহণ করিতেন। নিঃস্বার্থ পরোপকার ছিল তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। সরল ও উদারচিত্ত শরৎচন্দ্র বহু বৎসর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ও চেয়ারম্যানরূপে বরিশালে অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। ১৯৪৬-'৪৭ খৃষ্টাব্দের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তিনি অশেষ ত্যাগ স্বীকার করিয়া অসীম সাহসিকতার সঙ্গে শতশত বিপন্ন নরনারীকে রক্ষা করিয়াছেন। জনপ্রিয়তায় বরিশালে অশ্বিনীকুমারের পরে শরৎচন্দ্রের সমকক্ষ কেহ ছিল না।

—শ্রীহীরালাল দাশগুপ্ত—"জননায়ক অশ্বিনীকুমার", পৃঃ ৯০।

পুনঃ কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেন,—তন্মধ্যে শরৎবাবুর এই ক্ষুদ্র দশ টাকা দিবার ও পাইবার কাহিনী ঘনিষ্ঠ বন্ধুবর্গ বারংবার শুনিয়াছেন।

শরৎবাবু প্রদত্ত টাকা লইয়া মুকুন্দ বরিশাল চকবাজারের মহাজন পট্টিতে গেলেন। পুরাতন পাইকার, কীর্তনিয়া, স্বদেশী আন্দোলনে প্রসিদ্ধ, তিন বৎসর কারাভোগের পর প্রত্যাগত সেই পুরাতন পরিচিত বন্ধুকে স্ব স্ব গৃহে পাইয়া সকলেই আনন্দ ও গৌরববোধ করিতে লাগিলেন। একে একে সকলের গৃহেই দেখা করিলেন ও বিশিষ্ট কয়েকজন মহাজনকে পুনরায় দোকান খুলিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মহাজনগণ সাগ্রহে সর্বপ্রকারের সাহায্যের আশ্বাস দিলেন। সঙ্গীয় টাকা দ্বারা কতক চাউল সহিত অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনিয়া বাড়ি পাঠাইয়া দ্বিপ্রহরে গৃহে পৌছিলেন। মুকুন্দ মনে মনে স্থির করিয়া লইলেন অগৌণে মুদি দোকান অবলম্বনে সংসার চালাইবার ব্যবস্থা করিয়া আবার বিঘ্নসংকুল পথে ঝাঁপ দিবেন। মুদি দোকান করিবার প্রস্তাব পিতা ও ভ্রাতা সাগ্রহে সমর্থন করিলেন। মহাজনগণ ধারে মাল দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন কিন্তু পূর্ব দোকান হস্তান্তরিত, নূতন স্থানে নূতন ঘরে দোকান খুলিতে হইবে। তাহা ছাড়া আসবাবপত্রাদি বাবদ কতক নগদ টাকা তো দরকার। শরৎবাবু ও অশ্বিনীবাবুতে পরামর্শ হইল, বন্ধু-বান্ধবরা বিভিন্নরূপে সাহায্যের আশ্বাস দিলেন। অনতিকালমধ্যে স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রদত্ত নগদ একশত টাকা লইয়া তাঁহারই বাড়ির সন্নিকটে কালীবাড়ি রোডে মুদি দোকান খোলা হইল। পিতা ও ভ্রাতার সহিত মুকুন্দ আবার দাঁড়ি-পাল্লা ও মহাজনী খাতা লইয়া পাকা মুদির আসনে উপবিষ্ট হইলেন। দোকানে ক্রেতা ও বন্ধুব[illegible] ভিড়, দূরবর্তী স্থানের শহর অধিবাসীদেরও অনেকে মুকুন্দর দোকান হইতে জিনিস কিনিয়া সাহায্য করে। মুকুন্দ জিনিস মাপিয়া দেন, খাতা লেখেন, বন্ধু-বান্ধব ও বিশিষ্ট সমাগতদের সহিত উচ্চাঙ্গের রাজনীতি ও ধর্মালোচনা করেন, আবার মুদি দোকানের লাভালাভের ছোটখাট কথারও জবাব দিয়া থাকেন। মহাজন পট্টিতে জিনিস খরিদের জন্য যান, আবার সঙ্গীত, কীর্তন ও আলোচনার নিমন্ত্রণও রক্ষা করেন। দোকান দ্রুত শ্রীবৃদ্ধির পথে চলিল। দৈ[illegible] ৫০।৬০ টাকা নগদ বিক্রয় চলিতে লাগিল। মুকুন্দের সংসার-দৈন্য দূর হইল। দুইমাস পরে দোকানকে সর্বপ্রকারে 'চল্‌তি' করিয়া একজন দক্ষ সাহায্যকারী কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া মুকুন্দ একটু অবসর লইলেন।

কারাগার হইতে ফিরিয়া তিনদিন বিশ্রামের সুযোগ হয় নাই। দুইমাস কাল অক্লান্ত শ্রম করিয়া মুদি দোকান অবলম্বনে বাবা-মাকে দৈনন্দিন দৈন্য

হইতে অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্যের ভিতরে পৌছাইয়া দিয়া মুকুন্দদাস পথের সন্ধানে কলিকাতা রওনা হইয়া গেলেন। আজ আবার কোন্ পথ অবলম্বনে উদ্দিষ্ট ব্যাপক মঙ্গল প্রচেষ্টার সাহায্য করিবেন তাহা অনুসন্ধান করিতেছিলেন। কলিকাতায় যাত্রা, থিয়েটার দেখিলেন, কয়েকজন প্রসিদ্ধ অভিনেতার সহিতও আলাপ-পরিচয় করিলেন। সর্বত্রই সাদর অভ্যর্থনা লাভ করিলেন। রাজরোষে বিপন্ন অবস্থার জন্য সকলেই সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছিলেন। কোন কোন প্রীতিসম্পন্ন ব্যক্তির চেষ্টায় এক থিয়েটার কর্তৃপক্ষ দেড়শত টাকা মাহিনা দিয়া তাঁহাদের দলে রাখিতে চাহিলেন। ব্যবসাদার দল প্রথমতঃ মুকুন্দের নামের সুযোগ লইবার সহিত যদি কার্যেও সুফল দেখিতে পান, তবে এই পথে আর্থিক ক্রমোন্নতির প্রলোভনও শুনাইয়াছিলেন। মুকুন্দ কয়েকদিন থিয়েটার দেখিলেন ও অনেকগুলি মুদ্রিত নাটকের পুস্তক পাঠ করিলেন। চাকরির পথে প্রলোভনীয় প্রস্তাবের উত্তরে মুকুন্দ পরে জবাব দিবেন বলিয়া বরিশাল প্রত্যাগমন করিলেন। জেলখানায় বসিয়াই মুকুন্দ ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার রূপ মনে মনে আঁকিয়া লইয়াছিলেন। কলিকাতা যাতায়াত, থিয়েটার দেখা, নির্ঝঞ্ঝাটে চাকরি করিয়া অর্থোপার্জনের জন্য নাট্যশালার প্রস্তাব প্রভৃতিতে মুকুন্দের ইচ্ছার কোন পরিবর্তন ঘটিল না। পরন্তু আপন পথে দৃঢ় হইয়াই ফিরিলেন, তাহারই আয়োজনে কলিকাতায় গিয়াছিলেন। পুনরায় যাত্রার দল করিবার দৃঢ় সংকল্প বরিশাল ফিরিয়াই ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু পুনরায় দল বাহির করিবার মূলধন নাই। চিন্তিত মুকুন্দকে শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়[৮৫] মহাশয়ের সহধর্মিণী ডাকিয়া লইয়া স্বীয় গাত্রালংকার দিয়া বলিলেন—"ইহা বন্ধক দিয়া টাকা আনো ও দল বাহির করো।" মুকুন্দের পুনঃ পুনঃ স্মরণের কতিপয় ঘটনামধ্যে ঐ প্রাণের নির্মল সাহায্যকে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্মরণরূপে কৃতজ্ঞতার সহিত ব্যক্ত করিতেন। মূলধন সংগ্রহ হওয়ায় মুকুন্দ স্থির করিলেন পুলিশের হাত এড়াইয়া প্রচারকার্য চালাইতে হইবে। পুনরায় "মাতৃপূজা" গাহিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া লাভ নাই। কলিকাতায় নাটক দেখা ও নাটক পাঠের মধ্য দিয়া "মাতৃপূজা"র পরিবর্তে কি প্রকারের পালা রচিত হইলে এবারের অগ্রসরে সুবিধা হইবে, তাহাই স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। বরিশাল আসিয়া "সমাজ"

৮৫। ললিতবাবু ছিলেন স্টীমার কোম্পানীর জনৈক বিশিষ্ট কর্মচারী। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের স্টীমার ধর্মঘটে তিনি চাকরি ত্যাগ করিয়া দুঃখ বরণ করেন। কৃতজ্ঞ মুকুন্দ আমরণ সস্ত্রীক ললিতবাবুর কতিপয় বার্ষিক দেবার্চনা অনুষ্ঠানে নিয়মিত মনিঅর্ডার কুপনে স্নেহাশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া আত্মতৃপ্ত হইয়াছেন।

নামক একটি পালা রচনা আরম্ভ করিলেন, কিছুদিনের মধ্যেই পালা র:না শেষ করিয়া দল গঠনের চেষ্টা আরম্ভ করিলেন।

১৩১৭ বঙ্গাব্দের শারদীয়া পূজার পূর্বে বিগত লাঞ্ছনা ঝাড়িয়া ফেলিয়া পুনরায় মুকুন্দদাস দল লইয়া বাহির হইলেন। সর্বত্র পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের পত্রদ্বারা পুনরায় "সমাজ" নামে একখানি সামাজিক দুর্নীতির চিত্র-সংবলিত পালা অভিনয়েব জন্য দল লইয়া বাহির হইতেছে, ইহা জানাইলেন। বহু স্থান হইতেই সাগ্রহ নিমন্ত্রণ আসিল। প্রথম বর্ষের মত কোথায় গাহিতে হইবে, কি খাওয়া হইবে সে চিন্তা এবার ছিল না। কিন্তু কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি কোন্ পথে পরিচালিত হইবে তাহাব উপবই সকল নিভব করিবে। সে যাহাই হউক, বিপদ-সম্পদ যাহাই আসুক, মুকুন্দকে পথ চলিতে হইবে। পূর্বের মত আবার তাড়া করুক, জেলে ভরিয়া বাখুক' বাহাদুরি লাভেব জন্য সেই ইচ্ছা নাই, কিন্তু যদি আসে তবে হাসিমুখেই গ্রহণ কবিতে হইবে। "মাতৃপূজা" পালায় বাজনী‍ি প্রাধান্য ছিল। "সমাজ" অভিনয়ে সমাজ সংস্কারের প্রাবল্যই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পণপ্রথা, বহুবিবাহ, কৌলীন্য, অস্পৃশ্যতা, ধনী জমিদারের শাসন-শোষণের মজ্জাগত কুপ্রথার তীব্র প্রতিবাদ, অর্থ:নৈতিক উন্নতির পথে স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যবহাব সহিত দেশেব আত্মশুদ্ধির পথ দেখান হইয়াছে। উপসংহাবে এই স্বচেষ্টায় শুদ্ধি সাফল্যের অগ্রগমন ব্যতীত বাজনীতি, ধর্মনীতি বা যে কোন নীতির গালভরা উচ্চারণ নিরর্থক ফাঁকা আওয়াজ মাত্র এই কথা বলিবার চেষ্টা হইয়াছে। "মাতৃপূজা" ও "সমাজের" অভিব্যক্তি মধ্যে ধ্বনি, সুর চিত্রাদি রূপান্তরে একই কথা ও ভাব প্রচারিত হইয়াছে। কি "মাতৃপূজায়" বাজনীতি ও স্বদেশীয় উগ্র ভাবটা একটু আড়ালে পড়িয়াছিল মাত্র। "সমাজ" অভিনয় চলিতে লাগিল। সামাজিক ও আধ্যাত্মিক হইলেও পুলিশের দৃষ্টি শিথিল হইল না। অনুসবণ, রিপোর্ট লওয়া, আসরে সজ্জিত পুলিশ মোতায়েন প্রভৃতি দ্বারা একদিকে আহ্বান সমর্থ সমাজে একটু ভীতি, সঙ্কোচ আসিলেও জনসাধারণেব ঔৎসুক্য বৃদ্ধি করিয়া চলিতে লাগিল। প্রাথমিক চারি টাকা স্থলে পালা প্রতি পঁচিশ টাকায় এবারের গান আরম্ভ হইল। একদলের ভীতি সত্ত্বেও দল বসিয়া থাকে না, অবিশ্রাম গান চলিতে লাগিল। আর্থিক দৈন্যও আর রহিল না।

দ্বাদশ অধ্যায়

যাত্রা আন্দোলনের ইতিহাস ও মুকুন্দদাস

যুগ-যুগান্ত ধরিয়া মানুষ নূতন কিছু সৃষ্টির আশায় সচেষ্ট। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শিক্ষা, সভ্যতা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও মানবিক চিন্তাধারার পরিবর্তন বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই পরিবর্তনের উত্তাল ঢেউ লাগে সাহিত্য-শিল্পকলায়। মাঝে মাঝে এমন একটা পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হয় যাহা একটা যুগকে চিরতরে চিহ্নিত করিয়া রাখে। তবে এই পরিবর্তন হঠাৎ আসে না। ইহা নানা বিবর্তনের মাধ্যমে শম্বুকগতিতে অগ্রসর হয়। যেমন, কোনও একটা জিনিসের বহুল ব্যবহার তাহার আকর্ষণকে স্তিমিত করে, তখন তাহার ভিতর মনমুগ্ধকর তথা মানব হৃদয়হরণকারী শক্তি লুপ্ত হয়। তখন নবাবিষ্কারের চিন্তায় মানবহৃদয় সদাচঞ্চল হইয়া উঠে। পুরাতনকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া নবসৃষ্টি সম্ভবপর নহে। পুরাতনকে মন্থন করিয়াই নবজাতকের আত্মপ্রকাশ সম্ভবপর হইয়া উঠে। বহু-আকাঙ্ক্ষিত মুক্তির আস্বাদনে নবজাতক হংসবলাকার ন্যায় মুক্ত আকাশে বিচরণ করিতে চাহে। তেমনি এক নবজাতকের ভ্রূণ প্রোথিত হয় ষোড়শ শতাব্দীতে। এই ভ্রূণ ঊনবিংশ শতাব্দীর 'নূতন যাত্রা'র। কিন্তু অতি প্রাচীনকাল হইতেই শব্দগত অর্থে 'যাত্রা' শব্দটি আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল।

অভিনয় অর্থে 'যাত্রা' শব্দটির উৎপত্তি লইয়া মত-পার্থক্য দৃষ্ট হয়। যদিও সংস্কৃত অভিধানে উৎসব অর্থে যাত্রা শব্দটি গৃহীত হইয়াছে, তথাপি শব্দটি যদি মূলতঃ ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দ হইয়া থাকে, তাহা হইলে 'যা' ধাতু হইতে ইহা উৎপন্ন বলিয়া গমন অর্থেই ইহা সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হইত। গমন উপলক্ষ্যে উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া কালক্রমে উৎসব অর্থে যাত্রা শব্দটি সংস্কৃতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইভাবে দেব যাত্রা শব্দের অর্থ দেবতা সম্পর্কিত কোন উৎসবের অনুষ্ঠান। মন্মথমোহন বসুর মতে, "বাস্তবিক প্রায় সকল প্রাচীন উৎসবেরই আদি ভিত্তি সৌরোৎসব। সূর্যের যাত্রা উপলক্ষ্য করিয়া এই সকল উৎসব হইত এবং ইহাদের প্রধান অঙ্গ নাট্যাভিনয় ছিল বলিয়া নাট্যাভিনয়ের নাম 'যাত্রা' হইয়াছে।"[৮৬] ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, "সূর্যের নব নব

৮৬। মন্মথমোহন বসু প্রণীত "বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ" (পৃঃ ৪১)

যাত্রা উপলক্ষে এই সকল উৎসবের (রথযাত্রা, চড়কযাত্রা প্রভৃতি) অনুষ্ঠান ইহত বলিয়া কালক্রমে দেবতা-বিষয়ক যে কোন উৎসবকেই যাত্রা বলিত।"[৮৭]

যাহাই হউক, যাত্রাগান বলিতে দেবতার উৎসব উপলক্ষে শোভাযাত্রা বা উৎসবকে বুঝাইত। অতএব ইহার বিষয়বস্তু ছিল দেবদেবীর কাহিনী। আদি যাত্রার উপজীব্য বিষয় ছিল রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ভাগবত প্রভৃতির বিচিত্র কাহিনী। তৎকালে যাত্রার নির্দিষ্ট বাঁধা পালা ছিল না বলিয়া পাত্র-পাত্রীগণ নিজেরাই আসরে নামিয়া কথোপকথন, শ্লোকাদি পাঠ ও গান রচনা করিয়া লইতেন। সময় সময় গান নির্দিষ্ট থাকিলেও কথোপকথন অভিনেতাগণ তৈয়ারী করিয়া লইতেন। "ময়নামতী-গোপীচাঁদে"র কাহিনীতে এইরূপ পালার নিদর্শন সুস্পষ্ট।

যাত্রাগানের প্রধান ও প্রথম উৎস মঙ্গলকাব্য। চণ্ডীযাত্রা, ভাসান যাত্রা ইত্যাদি ইহাদের মধ্যে অন্যতম। তৎপরে পর্যায়ক্রমে রাসযাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা এবং বিদ্যাসুন্দর যাত্রার বিকাশলাভ ঘটে। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে পারি যে, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকাল হইতেই যাত্রার সবিশেষ প্রসার পরিলক্ষিত হয়। মধ্যযুগীয় বাঙালীর নবনাট্য সৃষ্টির অভিনব রূপ—যাত্রা। ডাঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের মতে—"জয়দেবের গীতগোবিন্দম্-এ (খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দী) বাঙ্গালার যাত্রাগানের আদিম রূপটি বিধৃত আছে বলিয়া মনে হয়।"[৮৮] এতদ্ভিন্ন বড়ু চণ্ডীদাসকৃত "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"ও নাটগীত শ্রেণীর রচনা। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে এই নাটগীতকেই 'যাত্রা' বলিয়া অভিহিত করা হইত।

ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গভূমিতে যে যাত্রার ভ্রূণ প্রোথিত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহা অঙ্কুরিত হয় এবং উনবিংশ শতাব্দীতে উহা শাখা, প্রশাখা, পত্র, ফুল, ফল লইয়া বিচিত্রভাবে নবকলেবরে এক শক্তিশালী মহামহীরুহে পরিণত হয়। ষোড়শ শতাব্দী তথা চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগে নাটকের লক্ষণ সুস্পষ্ট হইতে থাকে। মহাপ্রভু স্বয়ং কৃষ্ণলীলার মূর্ত অভিনয় বিগ্রহ ছিলেন। "রাধাভাবে" ভাবিত গৌরচন্দ্রের ভাবস্পন্দনের বিভিন্ন অভিব্যক্তি ভক্তগণ প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইতেন। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভু নবদ্বীপে চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে যে কৃষ্ণলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন তা'তে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় অদ্বৈত

৮৭। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' ১ম খণ্ড, কলিকাতা ১৯৬০, পৃঃ ৬৫।

৮৮। "যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্প্রদায়," কলিকাতা (১৩৭৪), পৃঃ ৪।

আচার্য, শ্রীরাধা এবং রুক্মিণীর ভূমিকায় মহাপ্রভু স্বয়ং, বড়াই এবং নারদের ভূমিকায় যথাক্রমে নিত্যানন্দ ও শ্রীবাস অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৮৯] কিন্তু এই অভিনয়কে 'যাত্রা' না বলিয়া "অঙ্কের বিধানে নৃত্য" আখ্যা দিয়া সংস্কৃত নাটকের অঙ্কবিভ্রানেরই অনুসরণ করা হইয়াছিল।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম বাঙালীর জাতীয় জীবনে প্রবল ভাববন্যার সৃষ্টি করিল এবং ঐ ভাবোচ্ছ্বাস তিনখানি সংস্কৃত নাটক রচনায় সহায়ক হইল। ঐগুলি হইতেছে রূপ গোস্বামীকৃত "বিদগ্ধমাধব" (১৫৩২ খৃঃ) ও "ললিত মাধব" (১৫৩৭ খৃঃ) এবং কবি কর্ণপূরকৃত 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়" নাটক (.৫৭২ খৃঃ)।

কৃষ্ণলীলা কাহিনী অবলম্বন করিয়া পববর্তীকালে কিছু কিছু মধ্যযুগীয় নাটকের ভাব এবং আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করিয়া প্রাচীনতম যাত্রা "কৃষ্ণযাত্রা" জন্মগ্রহণ করিল। নানাভাবে ইহাতে বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াস দেখা গিয়াছিল বলিয়া এই 'যাত্রা' জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই বৈচিত্র্য সৃষ্টির অপর একটি প্রচেষ্টা হইয়াছিল 'কালীয়দমন' কাহিনীর নাট্যরূপ। ইহা ভক্তিভাব এবং গীতিপ্রধান হইয়া উঠিয়াছিল। কৃষ্ণযাত্রার পাশাপাশি "মিশ্র প্রকৃতি" লইয়া অন্যান্য যাত্রার উদ্ভব হইয়াছিল। কৃষ্ণযাত্রার দল মানভঞ্জন, কলঙ্কভঞ্জন, নৌকাবিলাস ও নিমাই-সন্ন্যাস পালাও অভিনয় করিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে যাত্রার উপর পাচালীর প্রভাব প্রতিফলিত হয়। ইহার আঙ্গিকের রূপান্তর ঘটিতে থাকে। ইহার পব চতুর্দিক উন্মুক্ত আসরে বাঁধা পালা গানের অভিনয় আরম্ভ হয়। এইরূপে বাঁধা পালা রচনায় গোবিন্দ অধিকারী, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকমল গোস্বামী সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের সময়ে মুসলমান আমলের অবসান এবং ইংরাজ আমলের পত্তনে সাহিত্যে ধর্মীয় বিষয়ের গুরুত্ব কমিয়া যায়। দেশে বিকৃত রুচির মধ্য দিয়া পুরাতন ধর্মীয় সমাজব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ে। এমতাবস্থায় শিশুরাম 'কালীয়দমন যাত্রা' রচনা করিয়া যাত্রার গৌরববৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হন। ইহার পর শিশুরামের শিষ্য পরমানন্দ অধিকারী সর্বপ্রথম যাত্রায় গানের সহিত গদ্য-সংলাপ সংযোজন করিয়া বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন। পরমানন্দের সময়েই প্রেমচাঁদ যাত্রাগানে বৈষ্ণব পদাবলী হইতে পদ চয়ন এবং সহজ

৮৯। অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ—শ্রীচৈতন্য ভাগবত, মধ্য খণ্ড ১৮শ অধ্যায়ে।

ভাষায় পরিবর্তন করিয়া ব্যবহার করেন। হাওড়াস্থিত সালকিয়া নিবাসী বদন অধিকারী 'দান', 'মান' এবং 'মাথুর' পালা ; লোচন অধিকারী 'অক্রূর-সংবাদ' এবং 'নিমাই-সন্ন্যাস' পালা রচনা করিয়া প্রশংসিত হন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালীর রুচি বিকৃতি ঘটে। তজ্জন্য কলিকাতাতে 'নূতন যাত্রা' নামক একপ্রকার যাত্রার উদ্ভব হয়। গোপাল উড়ে [৯০] প্রবর্তিত 'বিদ্যাসুন্দর যাত্রা' ইহাদের মধ্যে অন্যতম। দেব কাহিনী বর্জন করিয়া মানবীয় কাহিনীই ইহাতে প্রবর্তন করা হইয়াছিল। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদেশীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত বঙ্গদেশের মানুষের রুচি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে থিয়েটার ও অভিনয়যোগে নাটক আরম্ভ হয়। এই 'যাত্রা'র নূতন নামকরণ হয় 'গীতাভিনয়'। উন্মুক্ত স্থানে গীত-প্রধান যাত্রার অভিনয় বেশ জমজমাট হইয়া উঠে। এইরূপে যাত্রার পালা রচনা এবং যাত্রার দল পরিচালনা করিয়া খ্যাতিলাভের অধিকারী হন ব্রজমোহন রায় ও মতিলাল রায় এবং পরিশেষে "স্বদেশী যাত্রা" দলের প্রবর্তক— চারণ-সম্রাট মুকুন্দদাস।

স্বদেশী আন্দোলনের সাত বৎসর পূর্বেই মুকুন্দদাস বৈষ্ণব কীর্তনিয়ারূপে বরিশাল গণ্ডীতে সর্বজন পরিচিত হইয়াছিলেন। আসরে দাঁড়াইয়া নূতন বেশে, নূতন ভঙ্গীতে এক নূতন ধরনের "স্বদেশী-যাত্রা"র মাধ্যমে তৎকালীন ভাবধারা প্রচার করিয়াছেন। সেদিন যাহা বয়স ও ক্ষুদ্র পরিচিত মানুষ হিসাবে স্থানে স্থানে ঔদ্ধত্য বা অনধিকারচর্চা বলিয়া যাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁহারা বক্তৃতায়, সংলাপ ও গীত রচনায় এবং অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়া স্বদেশী যুগের অমর কবি হিসাবে, অভিনেতা হিসাবে স্বীকার করিয়া লইয়া নিজেদের উদারতা দেখাইয়াছেন। এইখানেই মুকুন্দদাসের সাফল্য। অধঃপতিত, আত্মবিস্মৃত এক ঘুমন্ত জাতিকে জাগাইতে তিনি এক নূতন পথ ধরিলেন। যে পথ অপরিচিত ছিল সেই পথেই তিনি মায়ের নাম লইয়া দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করিয়া

৯০। গোপাল ছিলেন বর্তমান 'Spence Hotel' (Wellesley Place) বাড়ীটির তদানীন্তন মালিক বীর নৃসিংহের ভৃত্য। তিনি লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে যে বিদ্যাসুন্দর যাত্রার অনুষ্ঠান করেন সেই যাত্রার পালা রচনা করেন ভৈরবচন্দ্র হালদার। গোপাল মনিবের কাছে থেকে সেটি লাভ করেন। —বিশ্বকোষ। পঞ্চদশ ভাগ, কলিকাতা (১৩১১) ৭০৭ পৃঃ।

তুলিতে এক স্বদেশী যাত্রার দল গড়িয়া তুলিলেন। আহ্বান জানাইলেন বজ্রকণ্ঠে, —

"বান এসেছে মরা গাঙ্গে খুলতে হবে নাও
তোমরা এখনো ঘুমাও? তোমরা এখনো ঘুমাও?"

আবার, "এসেছে ভারতের নব জাগরণ,
পেয়েছে ভারত নূতন প্রাণ।
মাতৃ মন্ত্রে লয়েছে দীক্ষা জগতে শিক্ষা করিবে দান॥"

এইভাবে সঙ্গীতে, কাব্য-গাঁথায় গ্রামে গ্রামে তিনি স্বদেশী মন্ত্রের বীজ বপন করিতে লাগিলেন। ঘুমন্ত জাতি হঠাৎ জাগিয়া উঠিল, পাষাণী অহল্যা প্রাণ ফিরিয়া পাইল এবং কংসের কারাগারে কৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটিল। দিগ্বিজয়ী সম্রাটের মত মুকুন্দদাস গ্রামের পব গ্রাম, শহরেব পর শহর এমনভাবে গানের মাধ্যমে মাতাইয়া তুলিলেন যে, "মুকুন্দদাসের যাত্রা'র নাম শুনিলে জনসমুদ্রে পরিণত হইত। কি তাঁহার আকর্ষণী শক্তি, কি তাঁহার প্রাণমাতানো সঙ্গীত, কি তাঁহার অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্য ও প্রাণবেগ এবং প্রাণবন্ত আবেদন। গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীবেশ তাঁহার সকল আসরে। গানের সঙ্গে বক্তৃতা, বক্তৃতার সঙ্গে গান—এইভাবে কতক্ষণ বলিবার পর আবার পূর্বকথায় ফিরিয়া আসিয়া অভিনয়, প্রতিভাধর মুকুন্দদাসের যাত্রা আন্দোলনের ইতিহাসে ইহা এক নূতন টেক্‌নিক্। কোথাও অমিল নাই, অভিনয়ে রসহানি নাই; ঘণ্টাব পর ঘণ্টা অভিনয় চলিতেছে আর শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের মত স্তব্ধ হইয়া বিস্ফারিতনেত্রে অভিনয় দর্শন করিতেছে। দেশের মানুষ মুক্তি ও আনন্দের এক নূতন স্বাদ পাইল তাঁহার গানে আর তাঁহার যাত্রার মধ্যে। সাধারণের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল এবং দিকে দিকে প্রচারিত হইল মুকুন্দদাসের খ্যাতি।

জেল হইতে ফিরিয়া মুকুন্দদাস কি করিবেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। মনে পুনরায় গানের স্পৃহা জাগায় তিনি 'ভারতের শেক্‌স্‌পীয়ার' গিরিশচন্দ্র ঘোষের "বলিদান"[৯১] নামক সামাজিক নাটকের অনুকরণে "সমাজ" নামে

৯১। বলিদান:—গিরিশচন্দ্রের সামাজিক দৃশ্যকাব্য-বিভাগের চতুর্থ নাটক—"বলিদান," ইহা একটি সামাজিক সমস্যামূলক (Problematic) নাটক। ১৯০৫ খৃঃ ৮ই এপ্রিল তারিখে বিড্‌ন স্ট্রীটস্থ মিনার্ভা থিয়েটারে "বলিদান" প্রথম অভিনীত হয়। অতিরিক্ত পণপ্রথার জন্য মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজে কন্যার বিবাহ দেওয়া কিরূপ দায়স্বরূপ, নাটকখানি তাহারইএক বিচিত্রআলেখ্য।

একটি পালা রচনা করিলেন—যাহার বিষয়বস্তু ছিল বাঙ্‌লার কৌলিন্য-প্রথার মর্মান্তিক দৃশ্য এবং পণপ্রথার কুফল। এই বইতে 'ভাইরে মানুষ নাই রে দেশে' এবং 'দেশের উল্টে গেছে হাল'—ইত্যাদি গান সন্নিবেশিত আছে। ইহার পর কবিবন্ধু হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "দাদাঠাকুর" নামে একখানি বই লিখিয়া অভিনয় উদ্দেশ্যে মুকুন্দদাসকে দেন, যাহার ভিতরে হেমকবির "সাবধান! সাবধান! আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড; রুদ্রদৃপ্ত মূর্তিমান"—ইত্যাদি গান রহিয়াছে। মুকুন্দদাস বইটির কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া নিজের লেখা কিছু গান তাহাতে যুক্ত করিয়া "দাদাঠাকুর" নামের পরিবর্তে "আদর্শ" নাম দিয়া সমাজে প্রচার করিয়া বইখানিকে জনপ্রিয় করিয়া তোলেন। তাঁহার কবিবন্ধু বিধুভূষণ বসু তাঁহার রচিত "দীনবন্ধু" নামক বইখানি মুকুন্দদাসকে অভিনয় করিতে দেন এবং পরে অর্থের বিনিময়ে মুকুন্দদাসকে বই-এর স্বত্ব বিক্রয় করিয়া দেন। মুকুন্দদাস বিধুবাবুর অনুমতি লইয়া নিজের নামে "ব্রহ্মচারিণী" নাম দিয়া গ্রন্থখানি জনপ্রিয় করিয়া তোলেন। বিবাহিতের আদর্শ জীবন গঠনকল্পে একদল ব্রহ্মচারিণীব প্রয়োজনীয়তা মুকুন্দ উপলব্ধি করিতেন। এই মনোভাব তদীয় কথাবার্তা, অভিনীত পালা ও মহিলা আশ্রম পরিকল্পনায সর্বজন বিদিত ছিল। "ব্রহ্মচারিণী" মুকুন্দদাসের সেই উপলব্ধিজাত ফল।

তাহার পর মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইল। মুকুন্দদাস এই সময় বই লিখিলেন "কর্মক্ষেত্র", "পথ" এবং "পল্লীসেবা"। কবিবন্ধু সুরেশচন্দ্র গুপ্ত এই সময় বই লিখিলেন "সাথী"। এইভাবে গ্রন্থ ও গান রচনায়, অভিনয়ে ও প্রচারে মুকুন্দদাস বাঙ্‌লা মায়ের সেবা করিতে লাগি. ন। তখন "বণিকের মানদণ্ড বাজদণ্ডরূপে" খুবই প্রকট, সকলেই যেন ভীত ও সন্ত্রস্ত, দেশাত্মবোধক গান ও অভিনয়ে আগ্রহ থাকিলেও প্রকাশের ক্ষমতা নাই। মুকুন্দদাস পুরুষসিংহের মত আগাইয়া আসিলেন এবং বলিলেন—

"ছেড়ে দাও রেশমী চুড়ী বঙ্গনারী
কভু হাতে আর পরো না।

জাগ গো ও জননী ও ভগিনী,
মোহের ঘুমে আর থেকো না।"

নাটকের নায়ক করুণাময় যথাসর্বস্ব বিক্রয় করিয়া দুইটি কন্যাকে পাত্রস্থ করিবার পর তৃতীয় কন্যার বেলায় চুক্তি ভঙ্গেব দাযে (Br. ch of contract) আত্মবলি দিযা বিয়োগান্ত পরিণতিতে

সেদিন এই গান প্রকাশ্যে গাহিয়া বেড়ানো চরম দুঃসাহসেরই কাজ ছিল। যাত্রার মাধ্যমে এই যে সঙ্গীত ও নাটকীয় ভঙ্গীতে অভিনয়—ইহাই মুকুন্দদাসের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল এবং স্বদেশী যাত্রার ইহাই ছিল আবেদন। একদিকে যেমন ছিল ইংরাজ-বিদ্বেষ ও স্বরাজসাধনার কথা, অপরদিকে তেমনি হিন্দু-মুসলমানের মিলিতকণ্ঠের কথা, তাঁতীর কথা এবং নব্যবাবুদের প্রতি বিদ্বেষ ও কটাক্ষের কথা। সহজ, সরল ভাষায় গান আর বক্তৃতা পাশ্চাত্যপ্রভাবে প্রভাবিত আধুনিক অভিনয়যুগে তাহা ভাবাই যায় না। এইখানেই মুকুন্দদাসের আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা এবং এইক্ষেত্রেই মুকুন্দদাস চারণকবি ও অভিনেতা। অভিনয়কালে আসর অনুযায়ী সংলাপকে দীর্ঘ করিয়া ঠিক অবস্থানুযায়ী স্বদেশমন্ত্র জাগাইবার রসমধুর বক্তৃতা দিয়া পুনরায় ঠিক সেই প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসিয়া জনতাকে মুগ্ধ করিয়া যাত্রার সংলাপে আসা—ইহাই ছিল মুকুন্দদাসের যাত্রাভিনয়ের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য। তাঁহার যাত্রার আসর আধুনিক চটকদার আসর ছিল না—তাহা ছিল শব সাধনার আসর, স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষা লাভের পঞ্চমুণ্ডের আসর, কৃষ্ণ-কালী মন্ত্রে দীক্ষিত আসর, ইংরাজের বিদ্বেষপ্রসূত ও আশীর্বাদপুষ্ট আসর। এই আসর হইতে উত্থিত হইয়াছে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের আহ্বান—

> "ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে
> মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে
>
> লইয়ে কৃপাণ হও আগুয়ান
> নিতে হয় মুকুন্দেরে নিওবে সঙ্গে।"

আবার চাষী-বন্দনায় গাহিছেন-

> "ধন্য দেশের চাষা
> তাঁর চরণ ধূলি পড়লে মাথায়
> প্রাণ হয়ে যায় খাসা।"

কিভাবে নিষ্কৃতি পাইলেন, তাহা নাট্যকার দক্ষহস্তে ও নিপুণ তুলিকায় দর্শক ও পাঠকসমাজকে দেখাইয়াছেন।

এই চাষীদের উন্নতি হইলেই দেশের উন্নতি হইবে, স্বরাজ আসিবে—ইহাই ছিল মুকুন্দদাসের জীবন-বাণী। তাই তিনি বলেন—

"স্বরাজ সেদিন মিলবে যেদিন
চাষার লাগিয়া কাঁদিবে প্রাণ।
তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়ে,
সপ্তমে তোরা তুলিবি তান॥"

তাঁতীদেব সম্বন্ধে বলেন—

"চালারে তাঁত সাজরে তাঁতী
দেখে নিও বিদেশী তাঁতী।"

সাম্যবাদের গানে মুখব মুকুন্দদাসের যাত্রা ও গান—

"কোটি কোটি মিলিত কণ্ঠে
তখনি উঠিবে গান,
যে গানে আবার হইবে মিলিত
হিন্দু মুসলমান॥"

জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ও ছুতমার্গগামী সমাজেব প্রতি বিদ্রোহী কবির হুঁশিয়ার বাণী—

"জাতের নামে বজ্জাতি সব
জাত জালিয়াৎ খেল্‌ছে জুয়া
ছুঁলেই তোর জাত যাবে?
জাত ছেলের হাতের নয় ত মোয়া॥"

মুকুন্দদাস বিশ্বাস করিতেন 'সবার উপব মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই।' ব্রাহ্মণ-শূদ্র, বৃহৎ-ক্ষুদ্র ইহা মানুষের কৃত্রিম পবিচয়। মানুষের একমাত্র পরিচয় —সে মানুষ। এই মনুষ্যত্ব তখনই জাগ্রত হয় যখন থাকে পিতা-মাতার প্রতি ভক্তি, ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধা, গুরুজনদের প্রতি আনুগত্য আর সত্য-প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা। কিন্তু—

"ঘোর কলিকাল যা দেখি সব উল্টা তোর।
নইলে মা করবেন দাসীপনা,
গিন্নী উঠছেন মাথার উপর॥"

আবার—

"বাবুদের পায়ে নমস্কার
দেখলেম ভাই ঘোর কলিতে এ জগতে
ভাল মন্দের নাই বিচার।
... ...
কলিতে বউ হয়েছে রং-এর বিবি স্বামী মানে না—
শাশুড়ী হ'ন ময়না মাগী স্বামী খানসামা।
তারা ভাশুর শ্বশুর কেয়ার করে না
বাপকে বলে মাই ডিয়ার।"

এই কলিহত জীবের উদ্ধারের জন্য "রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং তনু" প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং জাতিধর্ম-নির্বিশেষে আচণ্ডালে কোল দিয়া নিজে ধন্য হইয়া অপরকে ধন্য করিয়াছিলেন। ফলে জনগণ দেখিল—

"যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি,
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি।" (চৈ. চ.)

মুকুন্দদাস তাঁহার রচিত "সমাজ" পালায় তাই বলিয়াছেন—"শ্রীচৈতন্যদেব যেমন আচণ্ডালে কোল দিয়ে তাঁর প্রেমের বন্যায় জগৎ প্লাবিত করেছিলেন, তোমরা যতদিন সেই শ্রীচৈতন্যের অনুপ্রাণিত হয়ে আচণ্ডালে কোল দিতে না পারবে, ততদিন পর্যন্ত তোমাদের, তোমাদের ভারতের কল্যাণ নেই।"

এই নিদ্রিত ভারতকে জাগ্রত করিবার জন্য, স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করিবার জন্য জাতিকে দেহে-মনে-প্রাণে সুস্থ, সবল ও প্রকৃতিস্থ করিয়া তুলিতে হইবে। আর ইহার জন্যই চাই শক্তিরূপিণী মায়ের আরাধন—

"মা মা বলে ডাক্ দেখি ভাই,
ডাক্ দেখি ভাই সবে রে।
মা মা বলে কাঁদলে ছেলে,
মা কি পারে রইতে রে॥
জাগিবে জননী কুলকুণ্ডলিনী,
জাগিবে শক্তি জাগিবে রে।
খুলে যাবে প্রাণ দিতে পারবি প্রাণ,
স্বদেশ কল্যাণ তরে রে॥"

কবির এই ব্যাকুল 'মাতৃ-বন্দনা'তে আজিও প্রাণে জাগে শিহরণ, দেহে জাগে পুলক এবং কানে বাজে দেশমাতৃকার সাধনার বাণী—

"হাসিতে খেলিতে আসিনি এ জগতে,
করিতে হবে মোদের মায়েরই সাধনা।"

"কর্মযোগে" জাতি তখন সংগ্রামী হইয়া উঠে ; কারণ—

"করমেরই যুগ এসেছে, সবাই কাজে লেগে গেছে,
মোরাই শুধু রব কি শয়ান।"

আবেগে, ধিক্কারে, আদরে, মৈত্রীতে মাতৃ-বন্দনার উন্মাদনায় চারণকবি মুকুন্দদাস যে মহান ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, জাতি আজ সেই ব্রতের ব্রতধারী ও সার্থক উত্তরাধিকারী। এপাব বাঙ্‌লা, ওপার বাঙ্‌লার মিলিত শক্তিতে ; ভারত ও বাঙ্‌লাদেশের মৈত্রীতে, সৃষ্টিযজ্ঞের ও কর্মযজ্ঞের যে আহ্বান আসিয়াছে তাহাতে ঘুমন্ত মানুষের ঘুম ভাঙিয়াছে ; পাষাণী অহল্যা বন্দীদশা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। মুকুন্দদাস সেই ঘুম ভাঙানি গানের চারণকবি।

বস্তুতঃ, মুকুন্দদাস বহু সঙ্গীতের বচয়িতা, নাটক লিখিতেও তিনি দক্ষ। অভিনয় ও লগ্ন শক্তিতে তিনি ছিলেন বাঙ্‌লার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট। কিন্তু ইহার যে কোনটা লইয়াই ভবিষ্যৎকালে তাঁহাকে ধরিয়া রাখা বা স্মরণ করাব প্রয়োজনীয়তা ততটা মনে করিত না, যদি যুগের বুকে স্রষ্টারূপে তিনি একটা অনন্যসাধারণ কিছু না করিয়া যাইতেন। সেই অনন্যসাধারণত্ব যে পথে ফুটিয়া মুকুন্দ-জীবনকে অতুলনীয় করিয়া গিয়াছে সেটি হং চ্ছে প্রচলিত যাত্রাদলের আয়োজনকে সহজ পথে টানিয়া আনিয়া সঙ্গীত ও সুরের মধ্যে নূতন সৃষ্টি ঝংকার।[৯২] ব্যবসায়ী অথচ দেশের শ্রেষ্ঠ প্রয়োজনীয় প্রচারকার্যকে অপূর্ব কৌশলে মিলাইয়া,—নিজের জীবনকে সাক্ষীরূপে দাঁড় করাইয়া, নির্ভীক খেলোয়াড়ের মত চুলের ধরণী ধরিয়া ক্ষুরের সাঁকো পার হইয়া একটানা জীবন শেষ করিয়া গিয়াছেন। মুকুন্দ তাহার সমগ্র মন-প্রাণ দিয়া উদ্দিষ্ট বিষয়কে

৯২। "এক শ্রেণীর বনস্পতি আছে, যারা ঝড়েব ..ঙ্গিত পেলে আশ্চয অধীর হয়ে ওঠে। মানুষের মধ্যেও এমন এক শ্রেণীব পুরুষ আছে, যারা এক একটা প্রেরণায় আশ্চর্যভাবে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। চেতনার সেই রূপটা তাদের নিজস্ব। মুকুন্দদাস ছিলেন এই ধরনের বিরাট ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুরুষ এবং সেই ব্যক্তিত্ব আশ্চর্য উত্তেজনায় প্রখর হয়ে উঠত রঙ্গমঞ্চে জাতীয়তামূলক অভিনয়ের প্রেরণায়।" 'গানের আসর'—শার্ঙ্গদেব। ১৩৬৬ সাল, ৫ই আষাঢ়, 'দেশ', সংখ্যা-৩৪।

চিত্ত-বিমোহন রূপ দান করিয়া মানুষের ভাবকে কর্মে নিয়ন্ত্রিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। লেখক, কবি, নাট্যকার ইহার যে কোনটার শ্রেষ্ঠত্বের বা মৌলিকত্বের দাবী মুকুন্দ করেন নাই। তিনি চাহিতেন উদ্দিষ্ট বিষয়কে শ্রোতার প্রাণস্পর্শী করিতে। সেজন্য প্রয়োজনে তিনি যে কোন লেখকের লেখা, গান, বক্তৃতা পালায় যোগ করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। মুকুন্দ বলিতেন—"আমার সম্বল বৃন্দাবনের বৈরাগীর মাধুকরী। মধুকররূপে যেখানে যে ফুলে মধু দেখিব তাহা সংগ্রহ করিব। আমার শ্রোতা, দেশের জনসাধারণকে যে ওষুধ খাওয়াইতে চাই, তাহা যে অনুপানে গ্রহণ করাইবার সুবিধা দেখিব তাহাই গ্রহণ করিব" ইত্যাদি। "সমাজ" পালা 'ভারতের শেক্‌স্‌পীয়ার' নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের[৯৩] "বলিদান" পালার ছায়া অবলম্বনে লিখিত। অপর পালাগুলি সেরূপ নহে। স্বীয় কল্পিত ভবিষ্যৎকে আঁকিয়া লইয়াছেন। পালাগুলির রূপ ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়াছে। সঙ্গীত ও কথ্য বিষয়ে নব নব সংযোজনায় প্রারম্ভ হইতে বৎসরান্তে পালা নবরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। কোন গ্রামে বা শহরে উপস্থিত হইয়া সেখানকার সমস্যা সমাধানযোগ্য অভিনয় ও সঙ্গীতে সে অঞ্চলে পালা অন্য রূপ ধারণ করিয়াছে। পরবর্তী সময়ে যে পালা কতক মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে মোটামুটি যে কাঠামো আছে বিভিন্ন সময় তাহার উপর সেই পালাতেই অনুরূপ গীত হইয়াছে। স্থান এবং শ্রোতার দিকে মুকুন্দের নজর ছিল সুতীক্ষ্ণ। সঙ্গীত অভিনয়ের লিখিত বা মুদ্রিত পথ আসর বুঝিয়া ওলট-পালট করার বিরাট শক্তি ছিল তাঁহার ভিতরে। খেলার মত সহজ সরল অপর যে তিনজনের লেখা তিনটি পালা মুকুন্দ অভিনয় করিয়াছেন, সেই লেখকদের সহিত চুক্তি ছিল, প্রয়োজনবোধে সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্ধনের অধিকার অভিনেতার হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে। মুকুন্দ আপন খেয়ালে সেই পালার

৯৩। গিরিশচন্দ্র ঘোষ.—বাঙ্‌লাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও অভিনেতা—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তিনি ছিলেন বাঙ্‌লা নাটকের দ্বিতীয় যুগের (১৮৪৪-১৯১১) নাট্যকার। তাঁহার প্রতিভা তিন দিক হইতে বাঙ্‌লা নাট্যসাহিত্য, বাঙ্‌লা-রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয় রীতিকে পরিপুষ্ট করিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের যুগই নাট্যসাহিত্যের স্বর্ণযুগ। সর্বমোট তিনি পঁচাত্তরটি সমাপ্ত ও চারিটি অসমাপ্ত নাটক-প্রহসনের রচয়িতা। বিষয়গত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া ইহাদের চারবিভাগে ভাগ করা যায় —পৌরাণিক বা ভক্তিমূলক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক এবং প্রহসন। সামাজিক ও পারিবারিক নাটকের মধ্যে "প্রফুল্ল" (১৮৯৯ খৃঃ) জনপ্রিয়তায় অনন্যতুল্য, তাহা ছাড়া "মায়াবসান" (১৮৯৮), "বলিদান" (১৯০৫) প্রধান। গিরিশ-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব ভক্তিপ্রধান পৌরাণিক নাটক রচনায় ও "গৈরিশ ছন্দের" প্রবর্তনে। তাঁহার নাটকগুলি মুখ্যতঃ মঞ্চধর্মী। এক কথায়, গিরিশচন্দ্র প্রথমে নট এবং পরে নাট্যকার।

মুণ্ডপাত করিয়াছেন বলিয়াও কোন লেখক মন্তব্য করিয়াছেন, কিন্তু উপায় নাই, পূর্বাহ্ণেই চুক্তিবদ্ধ লেখকদের নিকটেও তাঁহার ভাবের ফরমাইস্ থাকিত। তিনি অভিনয়যোগ্য প্রতি পালায় পালা-লেখককে দুইশত টাকা পারিশ্রমিক দিয়াছেন। বিভিন্ন রূপ পালার সংখ্যা বাড়াইবার ইচ্ছা এবং তজ্জন্য ন্যূনকল্পে দুইশত টাকার পারিশ্রমিক দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াও নিজের মনের মত গ্রহণযোগ্য লেখা পান নাই। যাহা পাইয়াছেন তাহাও তাঁহার মধুকর বৃত্তির দ্বারা সাজাইয়া আসরে বাহির করিতে হইয়াছে। অনেকে অভিনয় ও সঙ্গীত রচনা করিয়া পাঠাইয়া জানাইয়াছেন, 'টাকা চাই না, অভিনীত ও গীত হইলেই কৃতার্থ মনে করিব।' কিন্তু মুকুন্দ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অথচ তিনি রামপ্রসাদী, কাঙাল হরিনাথ, কৃষ্ণকান্ত শিরোমণি, গোবিন্দদাস, হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রিয়ংবদা দেবী, রবীন্দ্রনাথ, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ প্রবীণ লোকের রচিত সঙ্গীত তো পালায় যুক্ত করিয়াছেনই, এতদ্ব্যতীত বহু অজ্ঞাত, অখ্যাত লোকের গান পালায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যেখানে যেটুকু সুন্দর পাইয়াছেন তাহাই অসঙ্কোচে গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছেন। স্বলিখিত পালার মৌলিকত্ব রক্ষার জেদে নিজে রচনার অপেক্ষা করেন নাই। যাহা পান নাই তাহা বাধ্য হইয়া রচনা করিয়াছেন। আবার পরবর্তী সময়ে কোন উৎকৃষ্ট গান পাইলে নিজের রচিত গান বাদ দিয়া সেই কুড়াইয়া পাওয়া গানের দ্বারা স্থান পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। মুদ্রিত পালা ও গানের বইগুলির প্রত্যেকটি গানের নিম্নে রচয়িতার নাম মুদ্রিত হইয়াছে। কতক গানের রচয়িতার সন্ধান পান নাই। সেইগুলির নীচে রচয়িতা "অজ্ঞাত" বলিয়া মুদ্রিত রহিয়াছে। হঠাৎ একদিন এক পল্লীতে গোপীযন্ত্র বাজাইয়া এক বৈরাগী গাহিতেছিলেন—

"দেখলাম ভাই জাতিকুল বিচারে[১৪]
যতক্ষণ রাস্তার 'পরে, ততক্ষণ জাত বিচারে
খেয়াঘাটে গেলে পরে এক নৌকায় সবে চড়ে॥
খেয়ার মাশুল ঘাটমাঝিতে সমান আদায় করে
মাঝির সাথে যা'র সুহৃদ পীরিত সুহৃদে দু'একজন করে ছাড়ে॥

১৪। উল্লিখিত "জাতিকুল বিচারে" গানটি কারাগারের একাধিক সাধারণ কয়েদীর মুখে শুনা গিয়াছে, বর্তমানেও শুনা যায়। আট বৎসর কারাদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদীর নিকট হইতে সম্পূর্ণ গানটি লিখিয়াছিলেন ৺সুরেশ দাশগুপ্ত মহাশয়। আমরা তাঁহার নিকট ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

এ ভারতের কর্তা যিনি, নামটি তার মহারাণী
দুই পক্ষের সাক্ষী জানি, সমান বিচার করে।
ন্যায় অন্যায় দেখেন তিনি আইন অনুসারে
কিবা হিন্দু, কিবা মুসলমান এক গারদে ভরে॥
আর এক বিচার বাংলা দেশে লোক আচারে,
নমঃ কামায় না শ্রুতির নাপিতে, মুসলমান কামাইতে পারে॥
রেলগাড়ী আর স্টীমার তাতে জাতি যায় না রে
মুসলমান ভাইতে শুধু হুঁকার জলটি মারে।
দেখলাম ভাই শ্রীক্ষেত্রেতে, সবে খায় একত্রেতে,
মুসলমান জাতি মাত্র যেতে নারে॥"

মুকুন্দ এই গান শুনিবামাত্র গানটি লিখিয়াছিলেন, রচয়িতার নাম সংগ্রহ করিতে পারিলেন না, ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের কোন অজ্ঞাতনামা গ্রাম্য রচয়িতার এই পুরাতন গানটির মধ্যে মুকুন্দ একটি প্রাণস্পর্শী দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া স্বীয় এবং কবিত্বপূর্ণ অপরের সঙ্গীত বাদ দিয়া এই সঙ্গীতটিকেই প্রাধান্য দিয়া পালার অস্পৃশ্যতা বর্জনাংশে যোগ করিয়া দিলেন। মুকুন্দ বলিতেন—"ঐ পদের মধ্যে লেখকের সাধন সম্পদ আছে, যাহা সুভদ্র ভাষার কবিত্বপূর্ণ গানে নাই।" মুকুন্দদাসের গোঁড়ামির ভিতরে ঐ সাধনস্পর্শী সংস্কারের গানটি দীর্ঘকাল যথাযথরূপেই গীত হইয়াছে। অনেকদিন পরে আলোচনাকারীদের মর্যাদা রক্ষার জন্য একটি লাইনের পরিবর্তন করিয়া গীত হইত—"এ ভারতের কর্ত্রী যিনি, নাম ছিল তার মহারাণী"। যে গানটি ছিল লোকশ্রুতির অন্তরালে, পল্লীর অজ্ঞাত কোণে, যাহা ক্রমে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছিল, সেই গান মুকুন্দ-কণ্ঠে গীত হইয়া সারা বাঙলায় অদ্যাবধিও গীত হয়। হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঐ সঙ্গীতের পদ উপমাস্বরূপে কথ্য বিষয়ের সমর্থনে বর্তমানেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে অপরের রচিত এমনি কতিপয় গান সাধারণের মধ্যে "মুকুন্দের গান" বলিয়া ধারণা আছে। অপরের গান যেমন মুকুন্দ-কণ্ঠে গীত বলিয়া "মুকুন্দের গান" বলিয়া পরিচিত, তেমনি আবার মুকুন্দস্থলে অন্য নাম বসাইয়া গীত হইতে শুনিয়াছি। একদা দীর্ঘ কেশ, সিন্দূর ফোঁটা দেওয়া রক্তবর্ণ বস্ত্রখণ্ড পরিহিত জনৈক ব্যক্তি গোপীযন্ত্র হস্তে শ্যামাসঙ্গীত গাহিয়া ভক্তের আদর সম্মানলাভ করিতেছিল, তাহার গানের ভণিতায় 'নীলরতন বলে' যুক্ত

দেখা যাইত। ঐ গায়কটির ভদ্রনাম ছিল নীলরতন, হঠাৎ তাহার জমান পসারে আঘাত দিলেন জনৈক সাধন সঙ্গীতের সহিত পরিচিত ব্যক্তি, তিনি যখন প্রচার করিয়া দিলেন যে, মুকুন্দ-রচিত সঙ্গীতগুলির মুকুন্দ ভণিতাস্থলে "নীলরতন' বসাইয়া এই লোকটি ভক্ত কবি সাজিয়াছেন। তখন অচিরে স্থান পরিত্যাগ ব্যতীত আর তাহার গত্যন্তর রহিল না। মুকুন্দ-কণ্ঠে গীত সঙ্গীতে একটা প্রাণসঞ্চারী শক্তি ছিল। সে ধাক্কা অনুকরণকারী গায়ককেও সঞ্জীবিত ও শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছে। অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির গানের উল্লেখ করিলাম। এইবার সসঙ্কোচে বা সগর্বে আর একটি শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির গানের উল্লেখ করিব। স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় নিৰ্বাসনকালে লক্ষ্ণৌ কারাগারে[৯৫] বসিয়া উনষাটটি গান লিখিয়াছিলেন—তাহার অনেকগুলি পেন্সিলে লিখিত ছিল এবং তারিখ দেওয়া ছিল। অশ্বিনীকুমার একবার বলিয়াছিলেন ঐ গানগুলির সঙ্গে চৌদ্দ মাসের একটি ভাবের ইতিহাস আছে। কেউ যদি ঐগুলির প্রত্যেকটির সঙ্গে দুই এক ছত্রে তৎকালীন ভাবটি উল্লেখ করিয়া 'নির্বাসন গীতি' বলিয়া ছাপায় তাহা হইলে মন্দ হয় না, কিন্তু ছাপা হয় নাই। মুকুন্দ উহার অনেকগুলি গান পালার সৌষ্ঠব ও শক্তিবৃদ্ধির জন্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'নির্বাসন গীতি'র শেষ সঙ্গীতটি 'তুমি মধু মধুর

৯৫। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে "স্বদেশ বান্ধব সমিতি" নিষিদ্ধ হইয়াছিল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে অশ্বিনীকুমার ও সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নির্বাসিত হইলেন। "স্বদেশ বান্ধব সমিতি" নিষিদ্ধ হইবার পরে যে ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অশ্বিনীকুমার তাহার সভাপতি ছিলেন। লক্ষ্ণৌ কারাগারে নির্বাসন তাহাকে দমাইতে পারিল না, সেখানেও তিনি কারাগারের অধিবাসী ও কর্মচারীদের হৃদয়ে রাজা হইয়া বসিয়া রহিলেন। লক্ষ্ণৌ কারাগারে ১৭ই মার্চ ১৯০৯ খৃঃ, অশ্বিনীকুমার লিখিলেন,—

"মিষ্টি মধুর খাবার তোমার একলা খাবার নয়
আশেপাশে সবাইকে তা বেঁটে দিতে হয়;
* * *
প্রহ্লাদ তাই বল্লে দেখ একা মুক্তি নেবো নাকো
কাঙাল ভুকো তাদের ডাকো, নেবে মিলি এক সময়।"

১৯১০ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী লক্ষ্ণৌ কারাগার হইতে অশ্বিনীকুমার মুক্তিলাভ করিলেন। কারাগার যেন অশ্বিনীকুমারের সাধনার পীঠস্থান। তাই কারাগৃহে দুঃসহ নির্জনতা তিনি অনুভব করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—"Sorrow and Solitude কিছুই তো অনুভব করিনি।"

নির্ঝর, মধুর সায়র, আমার পরাণ বধূ'[৯৬] ইত্যাদি। অধুনা এই সঙ্গীতটি গ্রামোফোন রেকর্ডে ব্রহ্মসঙ্গীতে স্থানলাভ করিয়াছে। সুধী ভক্ত-সমাজে এই গানটি উচ্চাঙ্গের রচনা ও ভাবসমৃদ্ধ বলিয়া সমাদর লাভ করিতেছে। এই গানটিও সেই "যখন কারাগারে এনে মারলে এরা তালা। তখনি বুঝলাম হলো মজা হদ্দ মজার আলা," "পূরব জনমে যেন, কার গো সুখের ময়না ছিনু," "এই লক্ষ্ণৌ-এ সেবার নবাব ছিল যে এবার লাট্ হয়েছে সে, সেই পুরানো টানে এসে আবার জুটেছে।" "বিনোদিয়া ঐ কি বাজাস বাঁশী তোর, মরমের লো গো পশি প্রাণ হলো ভোব," "শিশু ডাকে বাবাজান, আমার আনন্দে নাচে

৯৬। লক্ষ্ণৌ কাবাকক্ষে বচিত অশ্বিনীকুমাবেব বহু সঙ্গীতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত হইতেছে—"তুমি মধু" তুমি মধু" গানটি। উৎসাহী পাঠকদেব ক্ষুধা নিবৃত্তিব সম্পূর্ণ গানটি নীচে দেওয়া হইল —

"তুমি মধু, তুমি মধু, তুমি মধু মধু মধু।
মধুর নির্ঝর, মধুর সায়র, আমাব পরাণ বধূ।
মধুর মুরতী, মধুর কীরিতি, মধুব মধুর ভাষ,
মধুর চলনি, মধুর দোলনি, মধুর মধুব হাস,
মধুর চাহনি, মধুর সাজনি, মধুব রূপেব লেখা,
মধুর মধুর মধুর মধুব মাহেন্দ্রক্ষণের দেখা,
ও মধুর রূপের মধুর কাহিনী, মধুর কণ্ঠে গায়,
শুনিতে শুনিতে গলিতে গলিতে প্রাণ মধু হয়ে যায়।
তখন অনলে অনিলে জলে, মধু প্রবাহিণী চলে,
মেদিনী হয় মধুময়,
তখন প্রকৃতি মোহিনী সাজে, হৃদয়ে মৃদঙ্গ বাজে,
মধুর মধুর ধ্বনি হয়,
তখন যেরূপ ভাতে যেখানে, যে কথা পশে গো কানে,
স্তুতি নিন্দা সকলি মধুর,
তখন বজ্ররব কুহু ধ্বনি, গুরু সোম রাহু শনি
মধু রসে সকলি ভরপুর।"

মধুকে যিনি আস্বাদন করেছিলেন, এ সঙ্গীত তাঁহার অন্তরের সুধারসে সিক্ত।

—'জননায়ক অশ্বিনীকুমার', পৃঃ ৭৪-৭৫

প্রাণ।”—প্রভৃতি রচনার মতই অজ্ঞাত থাকিত যদি ঐ “মধু মধু” সঙ্গীত মুকুন্দ কণ্ঠের স্পর্শ না পাইত। ঐ পদে প্রথম কীর্তনের সুর যুক্ত করিলেন মুকুন্দদাস মহাশয়। তিনি দু' একটি উপজ যোগ করিলেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র পাল প্রভৃতিকে লইয়া অশ্বিনীকুমারের সম্মুখে গানের মহড়া চলিল। অশ্বিনীকুমার চক্ষু বুজিয়া উপজ যোগাইলেন—“মধু বাতাঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধব” প্রভৃতি। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে মুকুন্দ-কণ্ঠের “মধু মধু” গান বাঙ্‌লার সুধী বিদ্বৎমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিবার পরেই ঐ গানের প্রচারও ব্রহ্মসঙ্গীতে স্থান লাভ করে। অদ্যাবধিও অশ্বিনীকুমারের অনুগৃহীত সেবক গায়ক যোগেশচন্দ্র পালের কণ্ঠে ঐ “মধু মধু” গান শুনিলে, রেকর্ডে গৃহীত গানকে তুলনায় উপহাসের মতই মনে হইবে।

দীর্ঘ পরাধীনতার নিষ্পেষণে জাতির প্রত্যেক স্তরে যে দুরারোগ্য জটিলতা বিরাট মুখ ব্যাদান করিয়া সৎ চেষ্টাসমূহকে খেলার মত গ্রাস করিয়া দিনের পর দিন নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন করিতেছে—মুকুন্দ সেই ব্যাধি নিরসনের অব্যর্থ পথ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, এখনও সেই পথে শক্তি নিয়োজিত করিতে দেশ অগ্রসর হইতেছে না। একখানি বাঁধান বৃহৎ কালীমূর্তি, একখানা যুগলমূর্তির পট মুকুন্দের প্রত্যেকটি গানের আসরে উপস্থিত করা হইত। পদ ও কণ্ঠের মিলিত প্রভাবে যে “মধু মধু” ব্রহ্মসঙ্গীতে স্থান পাইয়াছে উহা প্রায়শঃই ঐ যুগলমূর্তির সম্মুখে গীত হইত। কালীমূর্তির সম্মুখেই “বলিদান” অবলম্বনে কাঙাল হরিনাথের “বলি দাও বলে সবে, বলি কি তাই জানে না⋯ ⋯/দেহের রক্তদানে শক্তি পূজা করে যে সব বলবান,/তারা শাক্ত নাম ধরে লোক করে তাদের কীর্তিগান,/রাখিতে মায়ের মান, করে যারা প্রাণদান, করে তাঁরা বলিদান, ছেড়ে বিষয় কামনা বাসনা” ইত্যাদি। অশ্বিনীকুমারের নির্বাসন গীতির “শুনি মাভৈঃ মাভৈঃ, শুনি মাভৈঃ মাভৈঃ—অভয় তো হয়ে গেছে ভয় আর কি ?⋯⋯বিপদ পাহাড়ের মত, আসুক না আসবে কত, ঐ পদে হবে যত, হবো জগজ্জয়ী, শুনি মাভৈঃ মাভৈঃ⋯” ইত্যাদি সঙ্গীতে ঐ পটস্থিত কালীমূর্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া গাওয়া হইত। আবার ঐ প্রসঙ্গে ইস্‌লাম ধর্মের কোরবানির কথা আখ্যায়িকাসহ মূল আরবী ও তাহার বঙ্গানুবাদ শুনাইয়া জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে শ্রোতৃবৃন্দকে ত্যাগমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিতেন। অনর্গল কোরান হাদিসের সুরা-আয়াৎ, অজু-নামাজের বঙ্গানুবাদ সর্বসম্প্রদায়ের লোক মুগ্ধচিত্তে শুনিতেন। মুকুন্দ চিন্তাকার্য সঙ্গীতাভিনয় যে যে ভাব প্রবাহের পথে ছুটিয়া চলিত সেই জিনিস মুকুন্দকে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অবিশ্রাম আগাইয়া লইয়া

চলিয়াছে। এই বহনকারী মুকুন্দও তাই হিন্দু-মুসলমান সকলের অবিসংবাদিত প্রিয়জন ছিলেন। মুকুন্দের পল্লীভবনস্থ প্রতিবেশী মুসলমানগণ তাঁহাকে আপনজন মনে করিত। সাম্প্রদায়িক খ্যাতিসম্পন্ন প্রবীণ মুসলমান নেতা বরিশালের পরলোকগত খান বাহাদুর হেমায়তুদ্দিন আহাম্মদ সাহেব সভাস্তে মুকুন্দদাসকে আলিঙ্গন করিয়া জনসাধারণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কলেজ বোর্ডিং-এর মুসলমান যুবকগণ আপনজনবোধে মুকুন্দদাসের বাড়িতে যাতায়াত করিত। "ইদুজ্জোহা" পর্বে বিরাট মুসলমান সম্মিলনীতে সাদরে নিমন্ত্রিত হইয়া মুকুন্দদাস বক্তৃতা দিয়াছেন। বার বার হর্ষধ্বনি ও করতালি দ্বারা মুকুন্দদাস সংবর্ধিত হইয়াছেন। রাধাগোবিন্দ ও কালীমন্দির প্রতিষ্ঠাতা মুকুন্দ মুসলমান সমাজকর্তৃক "কাফের" বলিয়া অভিহিত হন নাই। দমদম জেলের কয়েদী ঢাকা মানিকগঞ্জ সাব-ডিভিসনের অধিবাসী এন্তাজ আলী বলেন, "আমার বাবা ভাল মুছলিম ছিলেন। গান-বাজনার কথা শুনিলে বাবা কানে হাত দিয়া তোবা তোবা বলিতেন, কিন্তু তিনি অনেক দূর স্থান পর্যন্ত যাইয়া মুকুন্দের সহিত আলাপ করিতেন। লোকের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিতেন, মুকুন্দদাসের গান না শুনিলে শুনাই হয় না।।"

ধার্মিক দেশপ্রেমিক গানের অগ্রগমন রোধ করিয়া যে জটিল সমস্যা ভীষণ মূর্তিতে দাঁড়াইয়া আছে, মুকুন্দ-জীবন সেই সমস্যা সমাধানের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু অনুগামী পান নাই। সাধনা, আচরণ, ত্যাগ এই সকল দূরে থাকুক, তাঁহার প্রচারের পন্থাও দেশপ্রেমিকগণ গ্রহণ করেন নাই। প্রচার-কার্যে দিনের পর দিন অধিকতর কর্মী, অর্থ, শক্তি ব্যয়িত হইতেছে, কিন্তু উহা মুকুন্দের পথ নয়। অদ্যাপিও মুকুন্দের দলস্থ কতিপয় লোক বাঙ্‌লার বিভিন্ন স্থানে মুকুন্দের সেই গান গাহিয়া থাকে, সেই পালা অভিনয় করিয়া পয়সাও উপার্জন করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে গায়ক ও অভিনেতা হিসাবে মুকুন্দকে অনেকটা প্রশংসনীয়রূপে অনুকরণ করিতেও কেহ কেহ সমর্থ হইয়াছে, কিন্তু যে সচেতন কৌশল, সমসাময়িক ঘটনাকে বাঁধা পালার পরিবর্ধন পরিবর্তনে প্রাণস্পর্শী করিত সে কৌশল, সে জাগ্রত প্রাণের অভাব ঘটিয়াছে। সেই পুরাতন পালাগুলি গাহিয়াই আধুনিক দলওয়ালারা কোনরকমে তাহাদের ব্যবসা বজায় রাখে। প্রচারকার্যের পক্ষে মুকুন্দের অতুলনীয় দান নেতৃবর্গ কর্তৃক অবিসংবাদিতরূপে স্বীকৃত হইলেও তেমন কোন শক্তিমান শিক্ষিত দেশপ্রেমিক এ পথে অগ্রসর হন নাই বা পশ্চাতে থাকিয়াও উৎসাহ, সাহায্যদ্বারা পরিচালনা করিতেছেন না। স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার বলিয়াছেন—"কলেজে পা" দিলেই

আর মুকুন্দ হইত না।" যে দৃষ্টি লইয়া অশ্বিনীকুমার এই মন্তব্য করিয়াছিলেন মুকুন্দের প্রবর্তিত পথে শিক্ষিত শক্তিমানের অগ্রসর না হওয়ার ইহাই হয়তো একটা দিক হইতে পারে।

মুকুন্দদাসের সেই পুরাতন পালাগুলি লইয়া অদ্যাবধি কতিপয় লোক দল করিয়া জীবিকার্জন করিতেছে। মুকুন্দের দলের জনৈক সাহা গায়ক অদ্যাবধি একলা গোপীযন্ত্র[৯৭] লইয়া একক গান গাহিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতেছেন। মুকুন্দের জীবিতাবস্থায় ও তাঁহার মৃত্যুর পরে যে সকল লোক মুকুন্দের শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং দল করিয়া গাহিয়াছেন ও গাহিতেছেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দলপতিগণের নাম উল্লেখযোগ্য—কালীকৃষ্ণ নট, মাখন সন্নামত, যোগেশচন্দ্র দে, শিশু দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ রায়, মনমোহন দাস, নবদ্বীপ গোপ প্রভৃতি। মুকুন্দদাসের জীবিতাবস্থায়ই শিক্ষকরূপে তাঁহার প্রেরিত লোক দ্বারা মেদিনীপুরে একটি দল গঠিত হইয়াছিল। কংগ্রেসকর্মী ক্ষিতীশচন্দ্র গুহ-ঠাকুরতা মহাশয় কংগ্রেসের আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্য লইয়া কতিপয় দেশসেবকের সহিত পরামর্শ করিয়া উহার একটি দলের সঙ্গে কিছুদিন ঘুরিয়াছেন, কিন্তু তিনি নিজে গায়ক নহেন, শুধু বক্তা, তদ্ভিন্ন ইচ্ছানুযায়ী দল চালাইতে প্রাথমিক গঠন খরচেরও তাঁহার অভাব ছিল। একটু পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি মুকুন্দের সৃষ্ট এমন একটি প্রচারের পথ দেশের নেতৃবর্গ গ্রহণ করেন নাই। তাহার একটা বিশেষ অংশের যেহেতু দিয়াছি তাহাতে ব্যবসাদার যাত্রাওয়ালা হওয়াটার মধ্যে একটা আভিজাত্য গর্বে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা। মুকুন্দ যাত্রাওয়ালা, স্বদেশী যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি বিশেষণে পরিচিত হইয়াছেন। গায়ক-বাদকের মতই লোকে স্বর্ণ-রৌপ্য পদক দ্বারা মুকুন্দকে পুরস্কৃত করিয়াছে। পদক সংখ্যা ছিল সাত শতাধিক। তন্মধ্যে

৯৭। গোপীযন্ত্র।—গোপীযন্ত্র একশ্রেণীর একতারা বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। সগ্রন্থি সার্ধহস্ত পরিমিত সরু বংশদণ্ডের প্রান্তে আনন্দলহরীর খোলের মত একটি অলাবু নির্মিত খোল সংলগ্ন করিয়া তাহাতে আনন্দলহরীর রীতিতে একটি লৌহ-তার সংলগ্ন থাকে। তারটির মধ্যভাগে অবস্থিত ও একটি প্রান্ত অখণ্ডিত প্রান্তে কীলক-বদ্ধ ও অপরটি খোলে আবদ্ধ থাকে। তারের অপর প্রান্ত উক্ত বংশদণ্ডের অবিকৃত ভাগে প্রোথিত একটি কীলকে সংবদ্ধ থাকে। যন্ত্রটির মধ্যভাগে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী বাদ দিয়া অন্যসব অঙ্গুলির সাহায্যে ধরিয়া তর্জনী দ্বারা তারে আঘাত করিয়া বাজান হয়। অঙ্গুলির প্রসারণ ও আকুঞ্চনে ইহার স্বরের উচ্চ-নিম্নতা প্রকাশ পায়। এই যন্ত্রটি বিশেষতঃ বীরভূমের বাউল ও ভিক্ষুকেরাই ব্যবহার করিয়া থাকে।

—"ভারতকোষ" (৩য় খণ্ড), পৃঃ ১৮৯।

স্বর্ণপদকগুলির ওজন ছিল প্রায় এক সের। পদক ব্যতীত স্বর্ণ-রৌপ্য, পত্র, পকেট, সেফ্‌টিপিন্‌, অঙ্গুরীয়, বাহুবন্ধ, বাঁধানো লাঠি প্রভৃতি বহু জিনিস প্রতি বৎসরই উপহার পাইয়াছেন। মুকুন্দ এইগুলিকে সঙ্গে লইয়া চলিয়াছেন এবং প্রায় আসরেই বিভিন্ন অঙ্গে ঐ জিনিসগুলি ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া ধারণ করিয়াছেন। সাধারণ গায়ক-বাদকের অনুরূপে এই পদকসজ্জায় মুকুন্দ লজ্জাবোধ করেন নাই, পরন্তু প্রয়োজন বা গৌরব বোধই করিয়াছেন। কিন্তু যাত্রাওয়ালা দেশ-বিদেশে আর একটি জিনিস পাইয়াছেন সেটি উপাধি ও অভিনন্দন। খুব সম্ভব প্রথমতঃ আসাম প্রদেশের এক বিদ্যুৎমণ্ডলী মুকুন্দকে "চারণ-সম্রাট"[৯৮]—এই উপাধি দান করেন। বিভিন্ন স্থানেব নেতৃবর্গ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসাযুক্ত পত্রাদি বরিশালে স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্তের নামে পৌছিত তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তদ্ব্যতীত বহু স্থানের বিশিষ্ট জনসভা মুদ্রিত ও হস্তলিখিত অভিনন্দন পত্রমধ্যে তাঁহার যে সমস্ত বিশেষণ ও প্রশংসার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা বহু বিশিষ্ট নেতার পক্ষেও লোভনীয়। মুকুন্দের এই অভিনন্দনপ্রাপ্তির পশ্চাতে কোন দল বা অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টা ছিল না। উহা ছিল জনসাধারণের প্রাণেব স্বতঃ উচ্ছ্বাসপ্রসূত। পরবর্তী সময়েব বহু অভিনন্দনের শিরোনামাতেই নামের পূবে ঐ "চারণ-সম্রাট" বিশেষণ দেখা যাইত। সংবাদপত্রের বিবরণীতেও "চারণ-সম্রাট মুকুন্দ" বলিয়া লিখিত হইত। একাধিক অভিনন্দনে ' সন্তান" উপাধিও দৃষ্ট হইয়াছে।

পদক, অভিনন্দন প্রভৃতি পুরস্কারেব উল্লেখ করিয়াছি। এখন একটি বিশেষ স্মরণীয় পুরস্কারের উল্লেখ কবিতেছি, যে পুরস্কারের কথা স্বয়ং মুকুন্দ

৯৮। মুকুন্দদাস যখন তাহাব যাত্রা সম্প্রদায়সহ কলিকাতায ৭, কাশী ঘোষ লেনে (বিডন স্ট্রীট্) অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময একদিন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইস্‌লাম মুকুন্দদাসেব বাড়িতে আসিয়া নিজেব রচিত কযেকখানা গান নিজে হাবমোনিযাম বাজাইয়া মুকুন্দদাসকে গাহিয়া শুনাইলেন। যথা—"এই শিকল পবা ছল, মোদের এই শিকল পরা ছল", "ঘোর ঘোব ঘোররে আমার সাধের চরকা ঘোর," "কাবাব ঐ লৌহ কপাট ভেঙ্গে ফেল কববে লোপাট,' "বল ভাই মাভৈ মাভৈ নবযুগ ঐ এল ঐ" ইত্যাদি। শুধু তাহাই নহে। নিজের বচিত দুইখানা বই—"অগ্নিবীণা" ও "বিষের বাঁশী" মুকুন্দদাসকে উপহাবদেন এবং তিনি তখন বলেন,—"যাঁরা গান বা বক্তৃতা দ্বারা দেশের জাগরণ আনতে চেষ্টা কবেন তাঁরা সকলেই 'চারণ'। আপনি, আমি, আমরা সবাই চারণ, তবে আপনি আমাদের 'সম্রাট' অর্থাৎ 'চারণ-সম্রাট'।" যে দুইখানা বই তিনি মুকুন্দদাসকে উপহার দেন তাহার উপরে তিনি লিখিয়া দেন—"চারণ-সম্রাট মুকুন্দদাসকে উপহার।" মুকুন্দদাসের নিকটতম আত্মীয় ও সহকর্মী শ্রীযুক্ত মনোমোহন নাগ মহাশয এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন।

কোন কোন আসরে দাঁড়াইয়া বলিয়াছেন এবং বহুবার বন্ধুবান্ধবদের নিকটে রসাল বিবৃতি দ্বারা আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন।

মুকুন্দ কারাদণ্ড ভোগান্তে "সমাজ" পালা গাহিতে শুরু করিয়াছেন। স্ব-জিলার বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ জমিদারের বাড়িতে বায়না হইয়া গিয়াছে। জমিদারটির পোশাক-পরিচ্ছদে, চাল-চলনে আধুনিকতা প্রবেশ করে নাই। প্রাচীন বিধিব্যবস্থায়, কৌলীন্যের মর্যাদা রক্ষায়, আচার-আচরণে তাঁহার নৈষ্ঠিকভাবে কখনও কোন গলদ ছিল না। এহেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ জমিদারের বাড়ি মুকুন্দের গান। জমিদার বহুসহস্রজন পরিবেষ্টিত হইয়া স্বয়ং শ্রোতা। গান খুব জমিয়াছে। শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ, আত্মবিহ্বল মুকুন্দ কৌলীন্যের ব্যভিচার, পণপ্রথা প্রভৃতিব বিরুদ্ধে বক্তৃতা ও গান চালাইতেছেন; এই অবস্থায় কিয়ৎকাল মধ্যে জমিদার আসর হইতে উঠিয়া গেলেন। গান সমাপ্ত হইলে জমিদারবাবু মুকুন্দকে ডাকিলেন এবং উপস্থিত হইবামাত্র দ্রুত পঁচিশটি টাকা দিয়া উত্তেজিতভাবে বলিলেন,—' শুনিয়াছিলাম তুমি নাকি ভাল ছেলে, কিন্তু তুমি আমার বাড়িতে আসিয়াছ গালাগালি দিতে? তোমাকে কিছু বলিলাম না, আর কেহ হইলে টাকা নয়, পঁচিশটি জুতার বাড়ি দিয়া বিদায় করিতাম।" মুকুন্দও তৎক্ষণাৎ টাকা পকেটে লইয়া পদধূলি লইতে লইতে বলিলেন,—"মহারাজ! আপনার জুতার বাড়িও যে আমার আশীর্বাদ!" এই কথা বলিয়াই সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। জমিদার আর কোন কথা বলিবার সুযোগ পাইলেন না। মুকুন্দ বাহির রাস্তার সকলকে এই পুরস্কার সংবাদ খুব উৎসাহের সহিত শুনাইতে লাগিলেন। নিকটবর্তী গ্রামে কয়েকদিন যে গান হইয়াছে সকল আসরেই মুকুন্দ এই "পুরস্কার-বার্তা" অসঙ্কোচে প্রচার করিয়াছেন।

ইতিপূর্বে "মাতৃপূজা" অভিনয়কালে কলিকাতায় গান গাওয়া সম্বন্ধে মুকুন্দের সেই দাম্ভিকোপম বাক্য—"শিয়ালদা নাইমা কইলকাতাখানেরে একটা টান দিয়া ঝাঁকি দিমু, সমস্ত বাঙ্‌লাদেশটা কাইপা উঠবো" ইত্যাদি। বারো বৎসর যাবৎ উহা বাক্যেই পর্যবসিত ছিল। খুব সম্ভবতঃ ১৩২৩ বঙ্গাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কন্যার বিবাহ। দেশবন্ধু অশ্বিনীকুমারের নিকট বরিশালের মুকুন্দকে ঐ বিবাহোৎসবে গানগাহিবার জন্য চাহিয়া পাঠাইলেন।[৯৯]

৯৯। যখন বাঙ্‌লাদেশে অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে বিপ্লবী দল গড়িয়া উঠে, মুকুন্দদাস তখন সেই দলের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। আর যখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বিপ্লবীদের মামলা পরিচালনা করিয়া অরবিন্দ এবং বারীন ঘোষ প্রমুখকে মুক্ত করেন, সেই সময় হইতেই চিত্তরঞ্জন দাশ মুকুন্দদাসকে চিনিতেন ও জানিতেন।

মুকুন্দ তখন বর্ষাকালীন বিশ্রামের জন্য দল ছুটি দিয়া বরিশালে আছেন। অশ্বিনীকুমারের আদেশে মুকুন্দ বিভিন্ন দলেব এক একজন করিয়া আনিয়া একত্র করিলেন, হাজাব টাকা বায়না স্থিব হইল, মুকুন্দ দলসহ কলিকাতায় পৌঁছাইলেন। মুকুন্দেব তথাকথিত দাম্ভিকোক্তির বারো বৎসব পরে বিধিব বিধানে কলিকাতা মহানগরীব একটি আসব তিনি প্রথম দিনেই পাইলেন, যেখানে সর্ববিষয়ে বাংলাব শিবোমণিবর্গ শ্রোতার আসনে উপবিষ্ট। প্রথম দিনেই পূর্বশ্রুত সুনামেব অনুমানকে প্রত্যক্ষেব উপলব্ধিতে শতগুণ শ্রেষ্ঠত্ব দিতে গায়ক সমর্থ হইলেন। বিদ্বৎ ও বিদুষী-সমাজ বিমুগ্ধচিত্তে এই সঙ্গীতাভিনয়কে অভূতপূর্ব বলিয়া মন্তব্য কবিলেন। বায়নাকৃত বিবাহোৎসবেব গান সমাপন হইলে শ্রোতৃবৃন্দ জনসাধারণকে এই গান শুনাইবাব জন্য 'ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট'[১০০] হলে গানেব ব্যবস্থা কবিলেন। হলে তিল ধাবণেব

১০০। "CALCUTTA UNIVERSITY INSTITUTE'

১৮৯১ খৃষ্টাব্দেব ৩১শে আগস্ট হিন্দু স্কুলের পূর্ব দিকেব দুইখানি ঘব লইয়া "Society for the Higher Training of Youngmen' নামে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিমূলক এক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয। এই প্রতিষ্ঠানেব কায প্রথমে তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা,

(১) Mr. H Lee-এর অধীনে "Athletic Exercise .

(২) বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জিব অধীনে Literary Culture

এবং (৩) Revd. Protap Chandra Majumdar-এব অধীনে 'Purity of Character

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দেব ১৫ই আগস্ট বহু বাদ-প্রতিবাদের মধ্য দিযা এই প্রতিষ্ঠানের নামকবণ কব হয "Calcutta University Institute হিন্দু স্কুলেব কোণ পরিত্যাগ করিযা "ইনস্টিটিউট ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে উহাব নবনির্মিত গৃহে প্রবেশ কবে। তখন বাঙলাব লাট ছিলেন "লর্ড কারমাইকেল"। তিনি এই নবগৃহেব দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

বহু প্রথিতযশা মনীষী এই 'ইনস্টিটিউট'-এব বিভিন্ন পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। নিম্নলিখিত তালিকাতে ইহাব প্রথম সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, গ্রন্থাগারিক এবং সহ-সম্পাদক, তৎসহ প্রথম ভাবতীয সভ্যের ঐ সকল পদলাভ এবং খৃষ্টাব্দ যথাক্রমে বর্ণিত হইল।

PRESIDENTS

Mr H. H. Risley. 1891-92

Sir Asutosh Mookerjee. 1917-1923.

(First Indian President)

VICE-PRESIDENTS

Raja Benoy Kumar Deb
Khan Bahadur Maulavi.
Abdul Jabbar. } 1896.

(All are Indians).

স্থান রহিল না। দেশবন্ধুর বাড়িতে যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারাও উপস্থিত হইলেন। এই দিনের গান এবং অভিনয় আরও উৎকৃষ্ট হইল। দেশবন্ধু প্রদত্ত একটি মূল্যবান স্বর্ণপদক ঐ আসরে মুকুন্দকে পরাইয়া দেওয়া হইল। মুকুন্দ উন্মত্তের মত বেপরোয়া আক্রমণে সমাজের বিভিন্ন ত্রুটি স্থানে আঘাত করিতেছিলেন। পরিপূর্ণ মহিলা আসনের দিকে মুখ করিয়া 'মা-ভগিনী' সম্বোধনে মুকুন্দ বিদেশী আদর্শে অনুরঞ্জিত আধুনিক শিক্ষিতা মহিলাদের চাল-চলন, পোশাক-পরিচ্ছদের উপর তীব্র কটাক্ষ করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সিন্দুরহীন ললাট, সেফ টিপিনে আঁটা শাড়ী পরিহিতাদের রকমারী বেশের বর্ণনায় ব্যঙ্গকৌতুক মিশ্রিত ছিল। পরিশেষে মুকুন্দের ঈপ্সিত সিন্দুর পরিহিতা বাঙালী মা সাজিবার জন্য সন্তানের আবেদন জানাইয়াছিলেন।—

"মায়ের জাতি উঠলে ন'ড়ে
ছেলে মিল্‌বে ঘরে ঘরে।"

SECTIONAL PRESIDENTS

Rev. H. Whitehead.
Rai. Bankim Chandra Chatterjee Bahadur. } 1893.
(Indian)
Rev. Protap Chandra Majumdar.
(Indian)

SECRETARIES

Mr. Protap Chandra Majumdar. 1891-1892.
(First Indian Secretary)
Mr. C. R. Wilson. 1893-1896.

TREASURERS

Maharaj Kumar Benoy Kumar Deb. 1893-1895.
(Indian)
Rev. A. Tomary. 1896-1902.
Sir Rajendra Nath Mookherjee. 1909-1916.
(First Indian Treasurer. Calcutta University Institute.)

LIBRARIANS

Rev. A. B. Warm, 1898-1901.
Sri Narendra Kumar Basu. 1907-1915.
(First Indian Librarian)

DY. SECRETARIES

Babu Baroda Prasad Ghose. 1893-1896.
Mr. J. N. Das Gupta. 1897-1899.
(All Dy. Secretaries were Indians)

মুকুন্দের হিতাকাঙ্ক্ষী কতিপয় বন্ধু কলিকাতার মহিলা সমাজের সম্মুখে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপপূর্ণ বক্তৃতায় একটু যেন শঙ্কিত হইতেছিলেন। কিন্তু বন্ধুদের সেই আশঙ্কা অনতিকাল মধ্যে দূরীভূত হইয়াছিল। সঙ্গীতশেষে সমবেত মহিলাগণ মুকুন্দকে তাঁহাদের কাছে আহ্বান করিলেন। তাঁহাদের মুখপাত্রীরূপে সুপরিচিতা মহিলা কবি শ্রীযুক্তা প্রিয়ংবদা দেবী ধন্যবাদ জানাইয়া বলিলেন :—"গাল তো ভাই অনেক দিলে, আমাদের কিছু দিতে হয়, নাও তোমার চক্ষুশূল এই সোনার সেফ্‌টিপিনটি, গানের বদলে তোমাকেই দিলাম।" মুকুন্দ মস্তক অবনত করিয়া সেফ্‌টিপিনটি মস্তকে ধারণ করিলেন।

কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাড়িতে বাড়িতে গান হইতে লাগিল। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাস্টিস এ চৌধুরী প্রভৃতির বাড়িতে গান হইল। স্বয়ং দেশবন্ধু স্থির করিয়া দিলেন পালা প্রতি এক শত টাকা করিয়া পারিশ্রমিক দিতে হইবে। ইতিপূর্বে অন্যত্র পঞ্চাশ টাকা করিয়া পালা গাহিতেন। যাবতীয় সংবাদপত্রে প্রশংসার সহিত আলোচনা হইল। দুই সপ্তাহ অতীত হইতেই কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের আহ্বান আসিল, তিনি মৌখিক শুনাইয়া দিলেন,—"এখন তোমার চলিয়া যাওয়া ভাল।" দেশবন্ধু প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা করিয়া মুকুন্দ বরিশালে প্রত্যাবর্তন করিলেন। বরিশাল ষ্টীমারঘাটে কতিপয় বন্ধু পুষ্পমাল্য দ্বারা মুকুন্দকে সংবর্ধনা জানাইলেন এবং চরণ বন্দনাকালে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত মুকুন্দকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া 'সাবাস্, সাবাস্" বলিয়া সজোরে পৃষ্ঠদেশ চাপড়াইয়া মুকুন্দের আকাঙ্ক্ষিত সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করিলেন। উহার কয়েকমাস পরে অশ্বিনীকুমার পীড়িত অবস্থায় ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয়ের বাড়িতে অবস্থানকালে তাঁহাকে জাস্টিস এ. চৌধুরী মহাশয় দেখিতে আসিয়া মুকুন্দের কথা উল্লেখ করিয়া উচ্ছ্বাসের সহিত অশ্বিনীকুমারকে বলিলেন—"একটি অতুলনীয় রত্ন পাঠাইয়াছিলেন, এতদিন লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন কেন?" ইত্যাদি।

অধুনা "Calcutta University Institute" এক বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। একে একে "Silver Jubilee", "Golden Jubilee", "Diamond Jubilee" পালিত হওয়ার পর ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে "Platinum Jubilee" উদ্‌যাপিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানটিতে বহুমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। শরীরচর্চা হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্টি-কলা-ধর্মাদি বিষয়ক আধ্যাত্মিক ও আত্মিক শিক্ষা পর্যন্ত প্রায় সর্বপ্রকারের শিক্ষাচর্চার ব্যবস্থা এইখানে আছে। যে সদস্যগণ লইয়া এই "ইন্‌স্টিটিউটটির" ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র শ্রীমন্মথমোহন বসু মহাশয় অদ্যাবধি জীবিত আছেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বরিশালের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের পটভূমিকায় মুকুন্দদাস

বাখরগঞ্জ জেলার সদর শহর "বরিশাল" কীর্তনখোলা নদীর তীরে অবস্থিত। মোগল যুগে এই বাখরগঞ্জ জেলা সরকার বাকলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তৎপূর্বে এই অঞ্চলে নাম ছিল চন্দ্রদ্বীপ। এখনও এখানকার পরগনার নাম বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ। প্রবাদ আছে যে, ইতিহাস-বিশ্রুত রাজা দনুজমর্দনদেবের গুরু তপস্বী চন্দ্রশেখর চক্রবর্তীর নামানুসারে রাজ্যের নাম হয় চন্দ্রদ্বীপ। কথিত আছে, একদিন রাত্রিকালে নৌকায় নিদ্রাকালীন চন্দ্রশেখরের প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় যে, নৌকার নিকটস্থ জলমধ্যস্থিত বিগ্রহ তিনি যেন উঠাইবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার কথামত দনুজমর্দনদেব জলে ডুব দিয়া কালো পাথরের দুইটি মূর্তি প্রাপ্ত হন। অদ্যাবধিও মাধবপাশায় এই দুইটি মূর্তি, কাত্যায়নী ও মদনগোপাল পূজিত হইতেছেন।

বরিশালের অধিকাংশ লোকই শাক্ত সম্প্রদায়ের, শক্তি উপাসক এবং অধিকাংশ লোকই মাংসভোজী। উপাস্য দেবীর মধ্যে "মনসা"-র স্থানই সকলের উপরে। কারণ, গ্রামে গরীব এবং মধ্যবিত্ত প্রায় সকলের বাড়িতেই "মনসাদেবী" ঘটে-পটে বা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা আছেন। যদিও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মীয় লোকের সংখ্যাই যথেষ্ট, কিন্তু তাঁহারাও এই মনসাদেবীর পূজা করিয়া থাকেন।

রাজা দনুজমর্দনদেবের পরে "চন্দ্রদ্বীপ" পরগনার রাজা হইলেন তাঁহার পুত্র কন্দর্পনারায়ণ।[১০১] ইঁহারা ছিলেন বঙ্গজকায়স্থ এবং কায়স্থ সমাজের

১০১। কন্দর্পনারায়ণ—রাজা কন্দর্পনারায়ণ বারভুঁইয়াদিগের অন্যতম ছিলেন এবং মাধবপাশায় (বরিশাল শহর হইতে ৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে মাধবপাশা একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গ্রাম) ১৪।১৫ বৎসর সগৌরবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কন্দর্পনারায়ণ বীর ও সাহসী ছিলেন। দেশরক্ষার্থে মগ ও ফিরিঙ্গীদের সহিত বহুবার যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইঁহার রাজত্বকালে ভ্রমণকারী র‍্যাল্‌ফ্‌ ফিচ্‌, ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে বাক্‌লায় আগমন করেন। ফিচের বিবরণী হইতে কন্দর্পনারায়ণের বীরত্বের কথা জানা যায়। তিনি প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক ছিলেন এবং প্রতাপের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার নাবালক পুত্র রামচন্দ্র রাজা হন। —"বাংলায় ভ্রমণ"—অমিয় বসু, পৃঃ ২৪১।

সমাজপতি। ইঁহারা বিশেষভাবে বঙ্গজকায়স্থদের কুলীন সমাজে প্রতিষ্ঠা করেন। ঘোষ, বসু, গুহ এবং মিত্র—এই চারি বংশের মধ্যে "মিত্র" বংশ ভিন্ন অপর তিন বংশকে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। "মিত্র" বংশের কোন বিশেষ প্রভাব বঙ্গজকায়স্থ সমাজে নাই, রাঢ় দেশেই মিত্র বংশের প্রাধান্য।

রাজা দনুজমর্দন পৃথক পৃথকভাবে এক একজন কুলীনের এক একটি গ্রাম নির্ধারিত করিয়া স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যথা—"গাভা" নামক গ্রামে স্থাপিত করিলেন ঘোষ বংশ, তাঁহাদের পরিচয় হইল "গাভার ঘোষ" এবং তাঁহাদের "ঘোষ" পদবীর সঙ্গে আর একটি বিশেষণ যুক্ত হইল "দস্তিদার"। পূর্ণ পরিচয়—"গাভার ঘোষ দস্তিদার", ঘোষ বংশীয় কুলীনদের ভিতরে ইঁহারা শ্রেষ্ঠ স্থানাধিকারী।

"নথুল্লাবাজ" নামক গ্রামবাসীদের পরিচয় হইল—বসুরায় এবং বিশেষ সম্মানিত বিশেষণ "মীরবহর"। পূর্ণ পরিচয়—"নথুল্লাবাজের বসুরায় মীরবহর"। ইঁহারা বসু বংশীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ইঁহারা সকল কুলীনের শ্রেষ্ঠ বলিয়াই দাবী করেন।

আর "বানরিপাড়া" নামক গ্রামে "গুহ" বংশীয় কুলীনদের প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই "গুহ" পদবীর পরে বিশেষ সম্মান হিসাবে "ঠাকুরতা" আখ্যাটি যুক্ত হয়। পূর্ণ পরিচয়—"বানরিপাড়ার গুহ-ঠাকুরতা"। গুহবংশীয় কুলীনদের ভিতরে ইঁহারা শ্রেষ্ঠ স্থানাধিকারী।

এই সকল কুলীন সম্প্রদায়ের মধ্যে জাত্যভিমান বড় প্রবল। সাধারণতঃ মৌলিক কায়স্থ, যথা—দে, দাস, নন্দী ইত্যাদি কায়স্থদের ইঁহারা "ছোট শুদ্দুর" অর্থাৎ "ছোট শূদ্র" এই আখ্যা দিয়া থাকিতেন। এই সকল কায়স্থ সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে কোন ভোজসভায় এই সকল কুলীনরা এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া আহার করেন না, তাহাতে তাঁহাদের মর্যাদার হানি হয়। অথচ অর্থের বিনিময়ে এই সকল কুলীনরা যে কোন শ্রেণীতে কন্যাদান করিতে দ্বিধা বোধ করেন না।

মুকুন্দদাস যখন বাঙ্‌লাদেশে বেশ সম্মানিত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার আর্থিক উন্নতি হইতে লাগিল তখন তিনি তাঁহার বরিশালের ভাড়াটিয়া বাসা বাড়ি ছাড়িয়া দিয়া শহরের পশ্চিম প্রান্তে মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার ঠিক পরেই "কাশীপুর" নামক গ্রামে একটা বড় জায়গা কিনিয়া বাড়ি করিলেন। সেই গ্রামে যাঁহারা কায়স্থ সম্প্রদায় আছেন, তাঁহাদের মধ্যে

"গাভার ঘোষ দস্তিদার" বংশীয় কিছু কায়স্থও আছেন। মুকুন্দদাস কাশীপুর গ্রামে বাড়ি করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে সেখানকার সামাজিকদের সঙ্গে এক সমাজভুক্ত হইয়া বাস করিতে হইবে; তাহা না হইলে মুকুন্দদাসের বাড়িতে কোন কার্য উপলক্ষে পাড়ার কোন সামাজিক সংযোগ থাকিবে না এবং বাড়ির মহিলারাও কেহ আসিবেন না। এই কারণে মুকুন্দদাস গ্রামের সমাজপতিদের নিকটে তাঁহাকে "সমাজভুক্ত" করিয়া লইবার আবেদন জানাইলেন। কিন্তু সমাজে মিশিতে হইলে সমাজের সকলকে একটা "ভোজ" দিতে হইবে এবং সমাজপতিদের কিছু কিছু সেলামী দিয়া সম্মান করিতে হইবে। মুকুন্দদাস সমাজপতিদের একটা ভোজ দিতে আপত্তি করিলেন না, কিন্তু "সেলামী" দিয়া তাঁহাদের সম্মান করিয়া সাদরে বাড়িতে আনিয়া আদর-আপ্যায়নের মারফত সমাজে উঠিতে হইবে—এই প্রস্তাব তিনি অগ্রাহ্য করিলেন। ফলে মুকুন্দদাসের আর কাশীপুর কায়স্থ সমাজে স্থান হইল না, তিনি চিরকাল সেই সমাজের বাহিরেই রহিয়া গেলেন। অথচ মুকুন্দদাসকে "সমাজভুক্ত" করিয়া লইলে সমাজপতিদের গৌরব বৃদ্ধিই পাইত। কারণ মুকুন্দদাসের তখন দেশজোড়া নাম এবং আর্থিক অবস্থায় সমাজপতিদের পর্যায়ভুক্ত। মুকুন্দদাস তখন সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং কল্যাণমূলক কাজে মুক্তহস্তে দান করিতেছেন। এইরূপ একজনকে সমাজের মধ্যে রাখিলে সমাজ ও সমাজপতিদেরই মঙ্গল। কিন্তু যাহা হইলে সৃষ্টির কার্য আরও সুন্দর হইত তাহা ছুতমার্গগামী সমাজব্যবস্থায় হইল না। নজরুলের ভাষায় বলা যায়:—

"বন্ধু, তোমার বুক ভরা লোভ, দু'চোখে স্বার্থ ঠুলি,
নতুবা দেখিতে, তোমারে সেবিতে, দেবতা হ'য়েছে কুলি।"

মুকুন্দদাস এই "জাতের নামে বজ্জাতি" সহ্য করেন নাই। তিনি দেখিয়াছেন সকলেই "জাত জালিয়া খেল্‌ছে জুয়া।" তাই "সেলামী" দিয়া জাতে উঠিতে চাহেন নাই। তিনি বিশ্বাস করিতেন—"ছুঁলে পরেই জাত যাবে, জাত ছেলের হাতে নয় তো মোয়া।" বর্তমানে সেই জাতও নাই, জাতের গৌরবও নাই, "শুধু আছে জাত শেয়ালের হুক্কাহুয়া।"

মুকুন্দদাসের একটি মাত্র পুত্র, নাম—কালীপদ দাস (জীবিত), সুদর্শন। নওল্লাবাজ "বসুরায় মীরবহর" বংশীয় ক্ষিতীশচন্দ্র বসুরায়ের স্ত্রী গাভার "ঘোষ দস্তিদার" বংশের কন্যা। কাশীপুর গ্রামে তাঁহার ভাইরা বাড়ি করিয়া বাস

করিতেছিলেন। ক্ষিতীশ বসুরায় মহাশয়ের স্ত্রী প্রায়ই তাঁহার ভাইদের বাড়ি কাশীপুরে বেড়াইতে আসিতেন। মুকুন্দদাসের বাড়ি ছিল ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সদর রাস্তার উপরে, কাজেই মুকুন্দদাসের বাড়ির দরজা দিয়াই তাঁহাকে যাতায়াত করিতে হইত। অনেক সময় মুকুন্দদাসের বাড়িতে বসিয়া মেয়েদের সঙ্গে গল্পগুজব করা, চা খাওয়া ইত্যাদি বাড়ির অবস্থা দেখা এবং মুকুন্দদাসের পুত্রকে দেখা—সকলই তিনি করিয়াছেন এবং পুত্রটিকে দেখিয়াও তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন। কালীপদ দাস তখন ম্যাট্রিক্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, পূর্ণ যৌবন এবং ১৮।১৯ বৎসর বয়স। ক্ষিতীশ বসুরায়ের একটি মাত্র কন্যা, নাম—সুষমারাণী "বসুরায় মীরবহর"। তিনি তাঁহার কন্যার সহিত কালীপদ দাসের বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলেন। মুকুন্দদাসের কুলীনদের [১০২] উপরে (সমাজে স্থান না দিবার জন্য) কোনরকমের শ্রদ্ধা ছিল না। কিন্তু বাড়ির সকলের এবং তাঁহার মায়ের আদেশ পালনের জন্য তিনি এই বিবাহে সম্মত হইলেন।

ক্ষিতীশচন্দ্র বসুরায় সাব-রেজিস্ট্রার ছিলেন। তিনি দুইটি পুত্র, একটি কন্যা এবং স্ত্রীকে রাখিয়া অল্প বয়সেই মৃত্যু বরণ করেন। তজ্জন্য তাঁহার স্ত্রীর আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। অনেক সময় ভাইদের নিকট হইতে সাহায্যও লইতেন। বিবাহের কথাবার্তা ঠিক করিয়া তিনি কাশীপুরে ভাইদের নিকট গিয়া সমস্ত কিছু জানাইলেন এবং বিবাহে ভাইদের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্যও চাহিলেন। মুকুন্দের পুত্রের সহিত তাঁহাদের ভাগ্নীর বিবাহের কথা শুনিয়া তাঁহারা 'তেলে-বেগুনে' জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহারা বলিলেন—"বল কি? মুকুন্দদাসের ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিবাহ? এ হতেই পারে না। মুকুন্দদাস ছোট শুদ্দুর, তার ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিবাহ আমরা সমর্থন করতে পারি না।" উত্তরে মেয়ের মা বলিলেন—"মুকুন্দদাস নিম্নশ্রেণীর কায়েত হইলেও কায়েত তো বটে! আমি যখন সঙ্কল্প করেছি, তখন আমি মেয়েকে ঐ পাত্রেই বিবাহ দেবো।" ভাইরা রাগতস্বরে বলিলেন—"আমাদের অপমান করে তুমি যদি মুকুন্দদাসের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দাও তা'হলে আর্থিক সাহায্য তো দূরের কথা, আমরা তোমার মেয়ের বিবাহেও উপস্থিত

১০২। কুলীন:—সমাজের উচ্চবংশীয়দের কুলীন বলে। ধনে-মানে-জ্ঞানে যাঁহারা বড়, তাঁহারাই কুলীন। এই কুলীন শব্দের গৌরবময় অর্থ হইল—কু (কুভাব) লীন হইয়াছে যাঁহার, তিনিই কুলীন। আর সংকীর্ণ অর্থ হইল—"মূলে যার ভুল সেই করে কুল কুল।"

থাকবো না।" মেয়ের মা দীপ্তকণ্ঠে ভাইদের বলিলেন,—"তোমরা কোন প্রকার সাহায্য বা বিবাহে যোগ না দিলেও আমি এ সম্বন্ধ করবোই।"

ভাইদের নিকট হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া মেয়ের মা মুকুন্দদাসকে জানাইলেন, "আমরা যদি আমাদের সমকক্ষ ঘর ছাড়া নীচু ঘরে মেয়ের বিবাহ দিই; তা' হলে দেড় হাজার দু'হাজার টাকা কন্যার পণ হিসাবে গ্রহণ করি। আমি আপনার নিকট পণ বাবদ কিছুই চাই না, তবে বিবাহের খরচ বহন করিবার মত আর্থিক সঙ্গতি আমার নাই; তাই বিবাহের খরচের জন্য আমি আপনার নিকট কিছু আর্থিক সাহায্য চাই।" শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত হইল যে, মুকুন্দদাস বিবাহের খরচের জন্য মেয়ের মাকে নগদ পাঁচশত এক টাকা দিবেন। মেয়ের মা ইহাতেই রাজী হইলেন। মুকুন্দদাস মেয়ের মাকে অভয় দিয়া বলিলেন—"আপনি বাড়ি যান, এই শ্রাবণ মাসেই বিবাহ হইবে। আমি শীঘ্রই মেয়েকে পাকা দেখা এবং বিবাহের দিন, লগ্ন, চুক্তিপত্র লেখাপড়া কবিবাব জন্য লোক পাঠাইয়া দিব।"

মুকুন্দদাসের প্রিয় শিষ্য ও 'ভায়রা ভাই' শ্রীমনোমোহন নাগ[১০৩] মহাশয় আসিয়াছিলেন মুকুন্দদাসকে প্রণাম জানাইতে, তিনি নাগ মহাশয়কে বলিলেন, "তোমার এখন আর বাড়ি ফিরিয়া যাওয়া হইবে না। কালীপদ-র বিবাহ এই শ্রাবণেই হইবে। তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া রমেশকে (রমেশ মুকুন্দদাসেব ছোট ভাই) সঙ্গে লইয়া মেয়েকে পাকা দেখা এবং বিবাহের দিন, লগ্ন, চুক্তিপত্র লেখাপড়া করিয়া আসিবে।" রমেশদাস যদিও মনোমোহন নাগ অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, তথাপি মুকুন্দদাস নাগ মহাশয়েব উপরেই লেখাপড়া প্রভৃতি সকল কাজের দায়িত্ব ছাড়িয়া দিলেন।

মুকুন্দদাসের নির্দেশানুযায়ী সকল কিছুই হইল, অর্থাৎ পাত্রী দেখা, লেখাপড়া কবা ইত্যাদি। ইহার ২।৪ দিন পরেই অধিবাসের সমস্ত সামগ্রী রমেশ ও নাগ মহাশয় উভয়েই কন্যা ও কন্যাযাত্রীদের প্রচলিত প্রথানুযায়ী বাড়ি হইতে লইয়া আসিবার জন্য রওনা হইলেন।

১০৩। মনোমোহন নাগ —মুকুন্দদাসের একজন প্রিয় শিষ্য, নিকটতম আত্মীয় ও কীর্তনসঙ্গী—মনোমোহন নাগ। বর্তমানে যাদবপুরস্থ 'বিজয়গড়ে' ^ য়িভাবে বাস করিতেছেন। মুকুন্দদাসের সঙ্গে সাত বৎসর এবং স্বতন্ত্র কুড়ি বৎসর কাল যাত্রা গান করিয়া বর্তমানে স্বরনালী বিপর্যস্ত হওয়ায় অবসর জীবনে স্মৃতি রোমন্থন করিতেছেন। "চারণকবি মুকুন্দদাস" বচনাকালে তিনি আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। আমি তাঁহার নিকট ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

মুকুন্দদাস বেশ ভালভাবেই অধিবাসের সামগ্রী দিয়াছিলেন। যথা—একখানা বেশ বড় খাগড়াই কাঁসার বগী থালা, বড় একটি খাগড়াই বাটি, একখানা ভাল খদ্দরের শাড়ী, একখানা "মোহর", একশত ফজলি আম, আধ মণ দই, আধ মণ রসগোল্লা, কুড়িটা ইলিশ মাছ, পঞ্চাশ গোছ পান ইত্যাদি। মনোমোহন নাগ মহাশয় বলেন যে, তাঁহাদের সঙ্গে কন্যাপক্ষরাও বেশ ভদ্র ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহাদের টাকা দিয়া সম্মান জানানো ইত্যাদি সকলই করিয়াছেন। শুনা যায়, নথুল্লাবাজ গ্রাম হইতে অনেক বড় লোকের বাড়ি কন্যা সম্প্রদান হইয়াছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত এত বড় অধিবাস কেহই দেয় নাই। বরিশাল নদীবহুল দেশ। সর্বত্রই নদী আর খাল, খাল আর নদী। তাই নৌকায় যাতায়াত করিতে হয়। নথুল্লাবাজ গ্রাম হইতে মুকুন্দদাসের বাড়ি কাশীপুর আসিতে নৌকাতে প্রায় ৫।৬ ঘণ্টার রাস্তা। যাহাই হউক, কন্যা এবং কন্যাযাত্রীদের দুইখানা বড় নৌকা করিয়া বরিশালে আনা হইল।

মুকুন্দদাসের বাড়ি যে খালের ধারে অবস্থিত সেই খাল পার হইয়া মুকুন্দদাসের বাড়ি যাইতে একশত গজ দূর মাত্র, অর্থাৎ এক মিনিটের রাস্তা। কিন্তু কন্যাযাত্রীরা ঐটুকু রাস্তা হাঁটিয়া যাইতে রাজী হইলেন না। তাঁহারা বলিলেন, "আমরা কোন মৌলিক কায়েতের বাড়িতে হেঁটে যাই না। আমাদেরপ্রত্যেককে পাল্কী করে তুলে নিতে হবে।" মুকুন্দদাস জানাইলেন, "মাত্র এক মিনিটের পথ। তাহা ছাড়া পাল্কীর ব্যবহার এখন আর নাই। কাজেই আমি কি করিয়া আপনাদের জন্য পাল্কীর ব্যবস্থা করিব?" কন্যাযাত্রী, পুরোহিত, ঠাকুর, চাকর ইত্যাদি সমেত মোট পঁচিশজন লোক হইবে। তজ্জন্য পাল্কীর বিনিময়ে অগত্যা ঐ এক মিনিটের পথের জন্য ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা করা হইল। তাহার পর কন্যাযাত্রীদের জলখাবার, বাসস্থান এবং রাত্রিকার আহারের 'সিধা' (চাল-ডাল-তেল-নুন ইত্যাদি) দিয়া শুভক্ষণে শুভলগ্নে বিবাহকার্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

পরদিন বাসি-বিবাহ, প্রথা অনুসারে কন্যাযাত্রীদের বাসি-বিবাহসভায় উপস্থিত থাকা এবং 'সরকারী' ভোজে মিলিত হইয়া আহার্য গ্রহণ করিবার নিয়ম আছে। সেইমতো কন্যাযাত্রীদের নিমন্ত্রণ করা হইল। কিন্তু কন্যাকর্তা বলিলেন, "আমরা আপনাদের ভোজসভায় আহার্য গ্রহণ করবো না, আমাদের সে প্রথা নাই। আমাদের আহারের জন্য 'সিধা' দিতে হবে।" যে ষোলজন কন্যাযাত্রী আসিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে সিধা দেওয়ার প্রস্তাব আসিল। তাহা নিম্নরূপে :—প্রতি সামাজিককে বত্রিশ কাঠি করিয়া চাউল (বত্রিশ কাঠি অর্থে বর্তমান হিসাবে ২৪।২৫ কিলোগ্রামের

সমান) সেই পরিমাণে ডাল, তরকারী, মাছ ইত্যাদি। প্রত্যুত্তরে মুকুন্দদাস বলিলেন "বত্রিশ কাঠি চাউলের ভাত তো একজন মানুষ খাইতে পারে না। অযথা আমাকে হয়রান করিয়া কি হইবে ? তাহার চেয়ে আপনারা আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া সরকারীপাকে খাইবার অনুমতি দিন। আমরা পোলাও, মাংস ইত্যাদি নানাবিধ খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছি, ইহা আপনাদের মর্যাদা অনুযায়ী উপযুক্ত হইবে। তারপর আহারান্তে বিদায়কালে সাধ্যমত আপনাদের সম্মান রক্ষা করিব।"

অগত্যা কন্যাযাত্রীরা মুকুন্দদাসের প্রস্তাবেই রাজী হইলেন। মধ্যাহ্নে চর্ব্যচোষ্য, লেহ্য, পেয় করিয়া তাঁহারা আহার করিলেন, বৈকালে কন্যাযাত্রীরা বিদায়কালে গুণগত ও সমাজগত যোগ্যতা অনুযায়ী প্রণামী গ্রহণ করিলেন। এই প্রণামীর হার আট টাকা হইতে চৌষট্টি টাকা পর্যন্ত ছিল। কন্যাকর্তাকে চৌষট্টি টাকা দেওয়া হইয়াছিল। যে সমাজে "সেলামী" দিয়া মুকুন্দদাসকে জাতে উঠিতে হইত, সেই সমাজে পুত্রের বিবাহ দিয়া আজ মুকুন্দদাস যেন জাতে উঠিলেন।

বঙ্গজকায়স্থ সমাজের ভাবধারা প্রায় এইরূপ। তবে কুলীন ব্যতীত মৌলিক কায়স্থদের মধ্যে "কড়াপুর" নামক গ্রাম নিবাসী নাগবংশীয়রা কুলীন না হইলেও বঙ্গজকায়স্থ সমাজে বিশেষ সম্মানের অধিকারী, অধুনা বিজয়গড় নিবাসী মুকুন্দ-অনুরাগী ও বরিশালের প্রবীণ বিপ্লবী শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রলাল নাগ মহাশয় [১০৪] এই কড়াপুরের নাগবংশীয়দের অন্যতম। এই "নাগবংশ" যশোহরের মহারাজ প্রতাপাদিত্যের [১০৫] আত্মীয়। চন্দ্রদ্বীপের রাজা

১০৪। ভূপেন্দ্রলাল নাগ।—শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রলাল নাগ এম. এ. (ট্রিপল), ডিপ্-লিব্। বরিশাল—চন্দ্রদ্বীপের রাজা মহারাজ কন্দর্পনারায়ণের দ্বারা স্থাপিত "দেহেরগতি" গ্রামে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কড়াপুরের নাগ বংশীয়দের একজন। ছাত্রজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল বি. এম. স্কুলে এবং কলেজে। এইখানেই মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের সংস্পর্শে আসেন এবং মহাত্মার নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিয়া কারাবরণ করেন। তিনি বরিশালের স্বনামধন্য ক্রীড়াবিদ্ এবং চারণকবি মুকুন্দদাসের সহিত স্বদেশী আন্দোলনের দোসর, যাদবপুর বিজয়গড় উপনিবেশের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। বিজয়গড় স্কুল, কলেজ, প্রসূতি সদন, বাজার প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের স্রষ্টাকর্তা। বিজয়গড় কলেজের পরিচালক সমিতির একজন প্রাক্তন সদস্য এবং ঐ কলেজেরই গ্রন্থাগারিক। "চারণকবি মুকুন্দদাস" রচনায় ইঁহার উৎসাহ ও সাহায্য প্রশংসনীয়। আমি তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

১০৫। প্রতাপাদিত্য :—স্বনামখ্যাত প্রতাপাদিত্য রাজা বিক্রমাদিত্যের পুত্র। তাঁহার জন্ম-তারিখ ও স্থান লইয়া মতভেদ আছে। অনেকের অনুমান ১৫৬০।৬১ খৃষ্টাব্দে গৌড় নগরে তাঁহার

দনুজমর্দনদেবও মহারাজ প্রতাপাদিত্যের আত্মীয়। সেই সূত্রে নাগবংশের এক সন্তানকে আনিয়া চন্দ্রদ্বীপের রাজা তাঁহার বাড়ি "মাধবপাশা"[১০৬] গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রাম "কড়াপুর" নামক গ্রামে স্থাপিত করেন।

নাগবংশের একটি বধূ আত্মীয়তা সূত্রে রাজা দনুজমর্দনদেবের বাড়িতে বেড়াইতে আসেন। তাঁহার একটি শিশুপুত্র ছিল। একদিন রাজা দনুজমর্দনদেব তাঁহার সভাসদদের লইয়া দরবার কক্ষে বসিয়া দরবার করিতেছিলেন। তখন চেয়ার-টেবিলের প্রচলন ছিল না। ফরাস বিছানা তাকিয়া ইত্যাদি লইয়াই দরবারে উপস্থিত সকল সদস্যদের চন্দন কপালে দিয়া আপ্যায়িত করা হইত। সেইদিন সভার সকলকে চন্দন পরিবেশন করিয়া সেই চন্দনের বাটিটি সভার মাঝখানে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। হঠাৎ দেখা গেল একটি শিশু হামাগুড়ি দিয়া দরবার কক্ষে ঢুকিয়া খেলা হিসাবে ঐ চন্দনের বাটিটি ধরিয়াছে। রাজা এই দৃশ্য দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আরে এ ছেলে কার?" তখন একজন জানাইলেন, "ছেলেটি কড়াপুরের নাগদের"। রাজা ছিলেন কায়স্থ সমাজের সমাজপতি। তাঁহার ব্যবস্থা মতন কায়স্থ সমাজ পরিচালিত হয়। রাজা বলিলেন, "এই শিশু যখন দরবারে এসে চন্দনের বাটিটা ধরেছে তখন আজ থেকে আমি এই শিশুকে চন্দনের

জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই প্রতাপ বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, প্রতাপের কোষ্ঠী গণিয়া জ্যোতিষীরা বলিয়াছিলেন যে, তিনি পিতৃদ্রোহী হইবেন। এইজন্য বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে বিশেষ ভাল চক্ষে দেখিতেন না এবং সর্বদাই দূরে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেন। যুবক প্রতাপকে তিনি আগ্রায় বাদশাহী দরবারে পাঠাইয়া দিলেন। প্রতাপাদিত্য বাদশাহ আকবরের সুনজরে পড়িয়া যশোহরে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় পিতা ও পিতৃব্য বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যশোহর রাজ্যের সনদ নিজ নামে করিয়া লইয়া আসিলেন। এইরূপে কোষ্ঠীর ফল ফলিল বলিয়া কথিত। ভারতচন্দ্রের অমর কবিতায় যশোহর নগর ও যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের নাম বাঙালীর নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

"যশোর নগর ধাম প্রতাপ-আদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
বরপুত্র ভবানীর খ্যাত হইল পৃথিবীর
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥"

—বাংলায় ভ্রমণ (১ম খণ্ড), পৃঃ ১২৩-১২৪।

১০৬। মাধবপাশা :—বরিশাল শহর হইতে ৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে মাধবপাশা একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গ্রাম। বরিশাল হইতে মাধবপাশা পর্যন্ত একটি রাস্তা আছে।

বাটির অধিকার দিলাম। যে কোন সভাতে যখন চন্দন পরিবেশিত হইবে তখন সেই সভাতে যদি কড়াপুরের নাগ উপস্থিত থাকে তাহা হইলে ঐ চন্দনের বাটি কড়াপুরের নাগই পাইবে। অন্য কোন কুলীনের তাহার উপর কোন দাবীই চলিবে না।"

পূর্বে নিয়ম ছিল বিবাহসভাতে একদিকে বরপক্ষ, অন্যদিকে কন্যাপক্ষ বসিতেন। বাটায় করিয়া দুই পক্ষকেই পান পরিবেশন করা হইত এবং বাটিতে করিয়া চন্দন পরিবেশন করা হইত। বিবাহান্তে ঐ পানের বাটা এবং চন্দনের বাটি যিনি কৌলীন্যের শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেন, শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান হিসাবে তিনিই পাইতেন; কিন্তু রাজার ঐ ঘোষণার পরে চন্দনের বাটির অধিকার আর কাহারও রহিল না। যিনি যত বড় কুলীনই হউন না কেন, কড়াপুরের নাগ সভায় উপস্থিত থাকিলে চন্দনের বাটির অধিকার তাহারই। চন্দ্রদ্বীপের[১০৭] রাজার দেওয়া সম্মানের জোরে কড়াপুরের নাগবংশ বঙ্গজকায়স্থ সমাজে একটা বিশেষ সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন।

বরিশালের এই সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের পটভূমিকায় মুকুন্দদাসের যাত্রা ও গানের ফলশ্রুতি বিচার করিতে হইবে। মুকুন্দদাসকে যিনি গান সরবরাহ করিয়াছিলেন, যিনি যাত্রার পালা রচনা করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার নাম—কবি হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ভাওয়ালের কবি গোবিন্দদাসের[১০৮] সঙ্গে তাঁহার তুলনা হইতে পারে। বুঝি বা গোবিন্দদাস অপেক্ষাও বিয়োগান্ত মহিমায়

১০৭। চন্দ্রদ্বীপ-রাজবংশের বংশধরেরা এখনও বর্তমান আছেন, 'মাধবপাশা' গ্রামে রাজাদেরই বাড়িতে তাহারা বাস করেন। কিন্তু রাজবাড়ির কোন চিহ্ন বর্তমান নাই এবং যাঁহারা রাজবংশীয় বলিয়া পরিচিত, তাহাদের আর্থিক অবস্থাও ভাল নহে। 'মাধবপাশা' চন্দ্রদ্বীপ রাজগণের শেষ রাজধানী। এই গ্রামে অনেক ভগ্নাবশেষ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দৃষ্ট হয়। "দুর্গাসাগর" নামক একটি সুবৃহৎ প্রাচীন দীঘি বর্তমান আছে, উহা রাজা জয়নারায়ণের মাতা 'দুর্গাবতী'র নামে নামকরণ করা হইয়াছে। দীঘির উত্তর ও পশ্চিম পাড়ের উপর দিয়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা গিয়াছে। দীঘির চার পাড়ের সীমানা মোট দুই মাইল।

১০৮। গোবিন্দদাস :—পূর্ববঙ্গের ভাওয়ালের অন্তর্গত জয়দেবপুরে গোবিন্দদাস (১৮৫৫-১৯১৮ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে ভাওয়ালের রাজপরিবারেই প্রতিপালিত হন, পরে সেখানেই চাকরি গ্রহণ করেন। কিন্তু রাজাদের অত্যাচারে এবং ম্যানেজারের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে তিনি ভাওয়াল হইতে বিতাড়িত হন। তিনি উচ্চতর ইংরাজী অথবা সংস্কৃত শিক্ষা পান নাই। সেইজন্য তাঁহার কবিতা কিঞ্চিৎ অমার্জিত হইলেও তীব্র আবেগ এবং গভীর আন্তরিকতায় পূর্ণ। অপরিসীম দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁহার সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয়। তাই তাঁহার কবিতা যেন বিয়োগান্ত জীবননাট্যের কাব্যরূপ।

ভাস্বর তিনি। এমন নেশা ছিল না, যাহাতে তিনি আসক্ত না ছিলেন। এমন রাগ-রাগিণী ছিল না, যাহাকে তিনি তাঁহার কণ্ঠের শাসনে না রাখিয়াছিলেন। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মত সহজ ছিল তাঁহার গান রচনা এবং কথকতা। বর্তমানে কথকতা শিল্প যাহা লোকসংস্কৃতির বিশিষ্ট অঙ্গস্বরূপ তাহা লুপ্তপ্রায়। এই লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতিব শিল্পকে বাঁচাইবার জন্য যাহারা সাধনা ও গবেষণা করিতেছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যক্ষ, রবীন্দ্র অধ্যাপক ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শ্রদ্ধেয় ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অদ্যাপিও বরিশালের ঐতিহ্যবাহী মানুষের কানে বাজে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের বাড়িতে ও জগদীশবাবুর আশ্রমে হেমকবির কথকতা।

প্রাচীন চারণগণ নিজেরাই ছিলেন রচিয়তা, উহা সামন্ত-যুগের কাহিনী। ইংরাজ আমলের চারণ মুকুন্দদাস তাঁহাব কবিত্বশক্তিব প্রেরণালাভ করিয়াছিলেন হেমকবির নিঃস্বার্থ সাহচর্যের নিকটে। দুই শক্তি একই হইয়া গিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, হেমকবি না থাকিলে মুকুন্দদাস হইত না, আবার কেহ কেহ বলেন, মুকুন্দদাস না থাকিলে হেমকবিকে কেহই চিনিত না,—পূর্ণতা এই দুইটিকে লইয়াই। তুলসীপাতা ছোট হইলেইও যেমন মাহাত্ম্যে ছোট-বড হয় না, তেমনি ছিলেন—হেমকবি আর মুকুন্দদাস। মুকুন্দদাস তাঁহার যাত্রা পালাগানের মঞ্চে যে মূর্তি, যে ব্যক্তিত্ব, যে গায়কত্ব লইয়া দেখা দিয়াছিলেন, তাহার অসাধারণত্ব তর্কাতীত। সেই মঞ্চের নেপথ্যে হেমকবি উপস্থিত থাকিয়া এই জবানবন্দী করিয়া গিয়াছেন যে, "আমা অপেক্ষা গায়ক অভিনেতা ন্যূন নয়।"

হেমকবির প্রতিভা ধনী ছিল, কিন্তু তাহাতে "সুগৃহিণী" ভাব ছিল না। মুকুন্দদাস এই "সুগৃহিণী"র কার্য করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পরশমণির স্পর্শে হেমকবি সঞ্জীবিত হইয়াছিলেন। কলিকাতার ঠাকুরবাডিতে কিছুদিনের জন্য তাঁহার অধিষ্ঠানও হইয়াছিল। তাহার পর "আতিথ্যের উপহার" লাভ করিয়াছিলেন "বীরবল" ছদ্মনামধারী প্রমথ চৌধুরীর বাড়িতে। কিন্তু হেমকবিকে অ-হেমকবিরূপে পরিণত করিবার চেষ্টা সফল হয় নাই। তাঁহার নেশা তাঁহাকে বরিশালের স্বগণমধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত নৈষ্ঠিক নীতিবাদী হইলেও হেমকবির কবিত্বকে তিনি

বিনাশ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। হেমকবির কবিতা ও গীতরচনার ধারাল ইস্পাতখণ্ডকে তিনি মুকুন্দদাসের গান গাহিয়া অভিনয় করা ও আসর মাতাইবার ক্ষমতার সঙ্গে যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা যেন কুঠারের ফলার সঙ্গে "আছাড়ি" লাগাইয়া দেওয়া।

মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত নিজে লেখনীচর্চা করিতেন। "ভক্তিযোগ" ও "কর্মযোগ" তাহার প্রমাণ। কিন্তু পুঁথি-আকারে মুদ্রিত নহে, এমন প্রমাণ ইতস্তত ছড়াইয়াছিল। অধুনা সেইগুলি প্রায় বিস্মৃতির অতল তলে নিমজ্জিত হইয়াছে। অশ্বিনীকুমার দত্ত গীতিকার হইতে পারিতেন। "তুমি মধু, তুমি মধু, আমারি পরাণ বঁধু"—এই গানটি তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বরিশালের বি. এম. কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীসুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী মহাশয় বলেন—"প্রতিযোগিতার কথা শুনিয়াছি, অশ্বিনীকুমার দত্তের এবং হেমকবির মধ্যে—কে কত অল্প সময়ে কবিতা লিখিতে বা গান বাঁধিতে পারেন। ফলাফলে দেখা যাইত—হেমকবির নিকটে অশ্বিনী দত্তের মহানুভব পরাজয়।" এই প্রসঙ্গে সুধাংশুবাবু একটি দিনের ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলেন—"সেদিন হেমকবির লেখনীতে বেদান্ত আসিয়া ভর করিয়াছিল। ফলে তখন একটি আধ্যাত্মিকতত্ত্বপূর্ণ গানের সৃষ্টি হইল, যাহা আজও হেমকবিকে বাঁচাইয়া রাখিবে।" গানটি নিম্নরূপ :—

"কেবা কার করে আরাধন
যেন, আপনি পাতিয়া কান
শোনো আপনার গান
আপনা আপনি আলাপন।
কারে ডাকো বারে বারে, কে দিবে সাড়া
আপনারে নাহি চেনো, আপনি-হারা
মুঠোর ভিতরে রাখি
মোহপাশে মুদি আঁখি
আঁধারে নিভায়ে বাতি, খোঁজা হারাধন।
কেবা তুমি, কেবা আঁখি
সব আমি হই,
আমাতেই আমি তুমি, ভিন্ কেহ নই
হয় শুধু তুমি থাকো

নয় শুধু আমায় রাখো
উভয়ের হ'তে নাহি পারে একাসন।"

এই রচনার নিকটে অশ্বিনীকুমারের রচনাকে হার স্বীকার করিতে হইয়াছিল। "দত্ত কারো ভৃত্য নহে," কিন্তু, হেমকবির নিকটে অশ্বিনীকুমার যেন বলিতে চাহেন, "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে।" উভয়ের সম্পর্কটা দৃষ্টি-উন্মোচক। লোকনেতা, সারা বাঙলাদেশের শ্রেষ্ঠ পুরুষদের অন্যতম বনাম অখ্যাত অজ্ঞাত মদ্যপ এক স্বভাবকবি। জয় হইতেছে শেষোক্তের। অশ্বিনীকুমার কি ছিলেন তাহা ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। বুঝিতে পারা যায়, কারণ, "I he written word is mo e powei ful than volumes of spoken w ord, and reformist action"

Emerson বলিয়াছেন, "Man is only half himself ; the other half is his expression." হেমকবি সেই 'other half'-কে উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ জানিয়া 'the man that is half himself' তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন। মুকুন্দদাসের 'other half' এই হেমকবি। হেমকবিকে বাদ দিলে মুকুন্দদাস অর্ধেক হইয়া থাকিতে পারেন না—'a man taken by half is never taken right'. খ্যাতি জিনিসটা বারবনিতার ন্যায়। উহার ভালবাসায় যে বিশ্বাস করে, সে ডুবিয়া যায়। জীবনানন্দ দাশের কথা মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,—

"আমার কীর্তিরে আমি করি না বিশ্বাস।"

জীবনানন্দ বলিতে পারিতেন,—

"কীর্তির নারীর দেহ শূকরের মাংস ও যে খায়।"

জীবনানন্দকে এখন কীর্তি ধাওয়া করিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু জীবনানন্দ বাপের বেটা। কীর্তির বহুবল্লভা তাঁহাকে বাঁচিয়া থাকিতে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

"কীর্তি" হেমকবির নাগাল পায় নাই। তাঁহাকে না পাইয়া এখন ধরিয়াছে মুকুন্দদাসকে ; রচিত হইল "চারণকবি মুকুন্দদাস" নামে ছায়াছবি। আর যখন ছায়াছবি ও মঞ্চে মুকুন্দদাসের জীবনী দেখান আরম্ভ হইল, তখনই তাঁহাকে "**চারণকবি**" আখ্যা দেওয়া হইল।

হেমকবি ও মুকুন্দদাস কেহই উচ্চ সংস্কৃতিবান্ নহেন ; শিক্ষিতও নহেন স্কুল-কলেজের বিদ্যায় উভয়েই বঞ্চিত। মুকুন্দদাসের উদ্ভব নিম্নকুলে ; হেমকবির ব্রাহ্মণকুলে হইলেও কর্ম ছিল নিম্নকুলে। তদানীন্তন নৈতিকতার মাপকাঠি

দিয়া মাপলে উভয়েরই লজ্জা নিবারণ কঠিন হইয়া পড়ে। তথাপি উভয়ে মিলিয়া বাঙালীকে মাতাইয়া রাখিয়াছিলেন—দেবদেবীর ভক্তিতে নহে, এক নূতনতর কর্মবোধে নহে,—দেশাত্মবোধে সম্মানবোধে—ইংরাজ বিরোধিতায়। একপ্রকারের নূতনতর আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনাকে তাঁহারা তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, যাহার কর্ম সক্ষম চরিত্রের পরিচ্ছন্নতররূপে অশ্বিনীকুমার প্রমুখ লোকনেতার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বৈষ্ণবদের মতে 'হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডাল দ্বিজশ্রেষ্ঠ' হইতে পারিত। রক্ষণশীল সমাজে নিহিত স্ববিরোধ সেই যুগে ঐভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। যবন হরিদাস দ্বিজশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন, যজ্ঞেশ্বর হইয়াছিলেন—মুকুন্দদাস।

চারণকবি মুকুন্দদাস বাঙলার এক অভূতপূর্ব ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনতালাভের দৃঢ় পদক্ষেপের এক জলন্ত স্বাক্ষর। অতীতে পরাজিত রাজা-মহারাজা কিংবা রাজস্থানের চির স্বাধীনতাকামী রাণাদের উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিত—এই সকল প্রকৃতির কোলে লালিত স্বভাবকবি চারণ দল। তাঁহাদের অপূর্বসুন্দর উৎসাহব্যঞ্জক 'গাথা" পরাজিতদের বুকে নূতন উৎসাহ আর নবশক্তির প্রেরণা দিত। চারণকবি মুকুন্দদাস—সেই পরম পূত বৃত্তিতে আমাদের সুপ্ত আত্মাকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন, ভাঙিয়া দিয়াছিলেন পরাধীনতার মোহনিদ্রা। এক অতি নিষ্ঠাবান সৈনিকের মত প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করিবার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন—শুধু জ্বালাময়ী প্রেরণাময়ী গানে, যাত্রায়, কথায় ও অভিব্যক্তিতে। সে কি কণ্ঠ, সে কি তেজোদীপ্ত বয়ান, সে কি দৃঢ়পদক্ষেপের পদচারণ! রক্তাম্বর-পরিহিত, উষ্ণীষশোভিত, সুঠাম দেহের অধিকারী "মুকুন্দদাস" আসরে আসিয়াই গান ধরিতেন—

"পণ করে সব লাগরে কাজে,
খাটবো মোরা দিন কি রাত।
(এই) বাংলা যখন পরের হাতে,
কিসের মান আর কিসের জাত॥"

সমস্ত প্রাণ এক অশ্রুতপূর্ব উদাত্ত আহ্বানে যেন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিত, সারাটি আসরে কয়েক সহস্র দর্শকের চেতনা যেন ক্ষণতরে শুব্ধ হইয়া যাইত। প্রবেশ, প্রস্থান, আবার প্রবেশ—মধ্যবর্তী সময়ে দর্শকবৃন্দ যেন নিশ্বাস বন্ধ করিয়া থাকিত পুনরায় মুকুন্দদাসের আগমনের প্রতীক্ষায়। নির্দিষ্ট লগ্নে লগ্নশক্তির অধিকারী মুকুন্দদাস আসরে আসামাত্রই যেন দর্শকবৃন্দ নিশ্বাস ছাড়িয়া

বাঁচিল। তাহারা দেখিল কাহিনীকার, সুরস্রষ্টা নির্দেশক স্বয়ং শিল্পী, মুকুন্দদাসকে এবং শুনিল প্রাণমাতান আহ্বান—

"করমেরই যুগ এসেছে, সবাই কাজে লেগে গেছে,
মোরাই শুধু রব কি শয়ান।
চিরদিন রব নীচে, চল্‌ব সবার পিছে পিছে
সহিব শত অপমান॥
জেগেছে জগতে সবে, বসে নাই কেউ নীরবে,
একই সুরে ধরিয়াছে গান।
নিজেরে ভেবো না হীন, ধনী, মানী, দুঃখী, দীন—
রাজা প্রজা সকলি সমান॥"

কয়েক সহস্র শ্রোতার কণ্ঠ নীরব। সারাটি আসর যেন এক ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে মন্ত্রমুগ্ধ। কেহই যেন নিশ্বাস ফেলিতেছে না, সকলেই যেন এক স্বর্গীয় আবেশে বিভোর। একই আসরে, একই পালা, দিনের পর দিন হইতেছে—তবুও দর্শকদের উৎসাহ ও আগ্রহ বিন্দুমাত্র কমে নাই। ইহা এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। এক অনাস্বাদিত যাত্রার আসর। আজ যাঁহাদের পূরবীর ছন্দে জীবনের শেষ রাগিণীর বীণা বাজিতেছে তাঁহারা যেন সেই সকল 'আসরের ছবি' চক্ষু মুদিয়া দেখিতে পান আর স্মৃতি রোমন্থনে যেন আনন্দ অনুভব করেন। তাঁহার যাত্রা ও গানের আবেদন ছিল সার্বজনীন।

গানের বায়নায় মুকুন্দবাবু বৎসরে দশ সহস্রাধিক টাকা পাইয়াছেন। দু'এক বৎসর বর্ষাকালীন আহ্বান সমেত বায়না পনের হাজারেও পৌছিয়াছে। দলের খরচ বাদে বার্ষিক সাত-আট হাজার টাকা তাঁহার আয় হইত। এই হিসাবে তাঁহার যাত্রাগানের জীবনে তিনি দেড় লক্ষাধিক টাকা আয় করিয়াছেন। কিন্তু মৃত্যুকালে কিছু দেনা রাখিয়া গিয়াছেন, অনেকটা তাহারই ফলে, সাধ করিয়া বরিশালে শহর উপকণ্ঠে 'কাশীপুর' গ্রামে তিনি যে বাড়ি ও জমি করিয়াছিলেন তাহা ভবিষ্যৎ বংশধরের ভোগে লাগে নাই। একজন সাধারণ গৃহস্থের এত টাকা আয় সত্ত্বেও দেনা হইল কেন? যাহার ফলে বাড়িটুকুও রহিল না? স্বতঃই এই প্রশ্ন মনে জাগে। সেই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে পারি—মুকুন্দের মৃত্যুকালীন দেনার পরিমাণটা ছিল তাঁহার 'চল্‌তি' দেনা, প্রায় প্রতি বৎসরই তাঁহাকে "হ্যাণ্ড নোটে" টাকা কর্জ করিয়া দল বাহির করিতে হইত। অথচ তাঁহার স্বীয় সংসারের খরচ ঐশ্বর্যপূর্ণ দিনগুলিতেও বৎসরে দেড় হাজার টাকার উর্ধ্বে উঠে নাই। ইহাও আত্মীয়-স্বজন বহুপোষ্য-

পরিবৃত বৃহৎ সংসারের জন্য। চাল-চলনের মধ্যে পাঞ্জাবীদের মত পাগড়ী ও জ্যাকেট পরিহিত সাজসজ্জাটা লইয়া যখন বাহির হইতেন, তখন একটা বৈশিষ্ট্য রাস্তার লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। সেই পোশাকও তাঁহাকে বিশেষ কিনিতে হয় নাই। বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত উপহার দ্বারাই কেবলমাত্র নিজের নহে, অপরকেও বিলাইতে পারিতেন। বরিশাল শহরে অবস্থানকালে মাঝে মাঝে ঐ পোশাক পরিধান করিয়া কালীবাড়ি, আখড়া ও অশ্বিনীকুমারকে প্রণাম এবং কতিপয় নির্দিষ্ট বন্ধু-বান্ধবের বাড়ি ও রাস্তা ঘুরিয়া আসিতেন। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঐ সর্বজন দৃষ্টি-আকর্ষক পোশাক পরিধানের অপর বেলাতেই দেখা যাইত নগ্নপদ মুকুন্দদাস একখানা সাদা ধুতির একপ্রান্ত বহির্বাসের মত কটিদেশে জড়াইয়া, অপরাংশ স্কন্ধের উপর ফেলিয়া, স্থূল দেহের কতকাংশ আবৃত করিয়া শহরে ঘুরিতেছেন ; হাতে একখানা মোটা লাঠি ও একটা ছাতা। বিপত্নীক হইয়া পুনরায় দার-পরিগ্রহ করেন নাই। পুত্র ও ভ্রাতাকে আহার্য সম্বন্ধে স্বাবলম্বী করিবার জন্য কতক জমি খ'রিদ ও তৃতীয়বার এক মুদি দোকান করিয়া দিয়াছিলেন। মুকুন্দদাস ব্যাঙ্কে টাকা রাখা ও লাইফ ইন্সিওরেন্স করিবার বিরোধী ছিলেন। দল লইয়া বাহির হইবার সময় পাঁচশত টাকার একটি সংরক্ষিত তহবিল লইয়া যাত্রা করিতেন। ফিরিবার সময় তিন হইতে পাঁচ হাজার টাকা লইয়া ফিরিতেন, উহার মধ্যে একখানিও নোট কাগজ থাকিত না ; সকলগুলিই রৌপ্যমুদ্রা। কোনস্থানে নোটগ্রহণে বাধ্য হইলে উহা ভাঙাইয়া ধাতুমুদ্রা সংগ্রহের জন্য উদ্বিগ্ন হইতেন, ভাঙাইতে না পারিলে প্রথম খরচেই ঐ নোট ব্যয় করিয়া 'সোয়াস্তি' লাভ করিতেন। রূপার টাকার ঐ ভার বহন করিবার অদ্ভুত মনোবৃত্তি বর্তমান ভারত-রক্ষা আইনের আমলে আসিত, ভাগ্যে তখন এই আইন প্রকট হয় নাই। তথাপি পারিপার্শ্বিক বন্ধু-বান্ধবের কৌতুকী নিষ্ঠুর বাক্য শুনিতে হ'ত। অবশ্য স্বামী পুরুষোত্তমানন্দজী মুকুন্দের এই মনোবৃত্তির মধ্য হইতে দার্শনিক ব্যাখ্যায় আসল মুকুন্দের মুকুন্দত্ব বাহির করিয়াছেন বটে ; কিন্তু ধাতুমুদ্রা পীতি যাহা পুরাকালের মত মৃত্তিকায় প্রোথিত হইবে না বা সিন্দুকেও বেশী সময় থাকিবার অবসর পাইবে না, সেইক্ষেত্রে সাধারণ বুদ্ধির সহিত ইহা বেমানান ও হাস্যোদ্দীপক। বহুজনজ্ঞাত কতকগুলি দান তাঁহার ছিল, সেইগুলির প্রায় অংশই সংগৃহীত, স্বকীয় অর্জিত তহবিলের নহে। কোথাও উপস্থিত হইয়া যখন দেখিলেন তত্রস্থ কোন প্রাচীন মন্দির, দেবস্থান বিদ্যালয় বা সাধারণের হিতানুষ্ঠান অর্থাভাবে অস্তিত্ব হারাইতেছে, তখন সেইস্থানের

জমান আসরে তিনি আবেদন করিতেন, "আপনাদের বায়নার গান শেষ হইল, আগামীকল্য আমি এখানে গান করিব; শুনিবার জন্য আপনাদের নিমন্ত্রণ করিতেছি। গানের পরে আপনাদের কাছে কিছু ভিক্ষা চাহিব, স্থানীয় ধ্বংসপ্রায় 'অমুক' প্রতিষ্ঠানের জন্য আপনাদের প্রত্যেকের পকেটে যেন কিছু থাকে"—ইত্যাদি। যথাসময়ে গানের মধ্যে ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বলিয়া বক্তৃতা করিতেন। সময়ান্তরে একাধিক অবসরে নগদ টাকা ও অলঙ্কার আদায় করিতেন, শ্রোতাদের মতানুসারে কমিটি গঠন করিয়া সংগৃহীত অর্থের সঙ্গে প্রয়োজনবোধে নিজেও কতক দিয়া সেই বিরাট আসরের মধ্যেই তুমুল হর্ষধ্বনির সঙ্গে ঐ কমিটির হস্তে অর্থ প্রদান করিতেন। ইহার মধ্যে অর্থসংগ্রহের তিক্ততা তো ছিলই না, পরন্তু জনসাধারণের পক্ষে অপরাপর দিনের মত সঙ্গীতাভিনয় ব্যতীত একটা নূতন রকমের রসাল উল্লাস ও তৃপ্তি উপভোগের সুযোগ ঘটিত। পরবর্তী সময়ে বহু শহর-বন্দরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান মুকুন্দদাসের দল বায়না করিয়া টিকিট বিক্রয়ের দ্বারা লাভবান হইতেন। ক্রমশ এই টিকিট করা গানে বায়নার বাহুল্য হইতেছিল। একাধিক স্থানে এই টিকিট করা বায়না-গান গাহিবার সময় বেষ্টনীর বাহিরে বিরাট জনতা বিভ্রাট সৃষ্টির চেষ্টা কালে মুকুন্দদাস স্বয়ং অদ্ভুত কৌশলে আয়োজনকারীদের রক্ষা কবিতেন। ভিতরের শ্রোতারা বাহিরের উত্তেজিত জনতার হল্লায় অস্থির হইয়া পয়সা ফেরত চাহিয়া অনুষ্ঠান-কর্তাদের বিব্রত করিয়া তুলিতেন। মুকুন্দদাস তখন স্বয়ং বহির্দ্বারে উত্তেজিত জনতার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র হল্লা স্তব্ধ হইয়া যাইত; মুকুন্দের জিজ্ঞাসায় জনতা বিনা টিকিটে গান শুনিবার আকাঙ্ক্ষা জানাইলে মুকুন্দ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় তাঁহার গান শুনিবার জন্য জনতার ব্যাকুলতায় তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্বক বায়নার চুক্তিবদ্ধতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতেন,—"আপনারা যদি দয়া করিয়া শান্তভাবে আজ চলিয়া গিয়া আমার চুক্তিরক্ষার সুযোগ দেন তবে আগামীকল্য আমি আপনাদের গান শুনাইব, টিকিট বিক্রয় বন্ধ থাকিবে।" জনতা হর্ষধ্বনির সহিত সম্মতি জানাইলে মুকুন্দ হাত জোড় করিয়া পুনরায় আবেদন করিতেন,—"আপনারা জানেন এই গান আমার এবং সঙ্গীয় ত্রিশজন লোকের পরিবার-পরিজনের আহার যোগায়, তাই যার যা সামর্থ্য আমাদের আহার খরচের জন্য যেন স্বেচ্ছায় কিছু কিছু দান করেন—" ইত্যাদি। কিছুক্ষণ পূর্বে যাহারা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া হল্লা করিতেছিল সেই বিরাট জনতা বিজয়গর্বে হর্ষধ্বনি করিয়া প্রস্থান করিলে মণ্ডপের গান নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইত। পরদিন

যথাসময় পূর্ব-ঘোষণা অনুযায়ী মুক্তদ্বার গৃহে বিরাট জনসমাবেশে গান হইল। গান শেষে পূর্বদিনের আবেদন স্মরণ করাইবামাত্র যাহা পাওয়া গেল তাহা সাধারণ বায়না অপেক্ষা অনেক বেশী। সংগৃহীত অর্থ হইতে দল খরচের টাকামাত্র রাখিয়া ঐ সভামধ্যে মুকুন্দদাস বাকী অংশ স্থানীয় সদানুষ্ঠানকে দিয়া আসিয়াছেন। কোন কোন স্থানে বায়নার আসরেই সেইস্থানের জনমতের সমর্থন পাইলে কন্যাদায়গ্রস্ত বা অন্য কোন প্রকারের বিপন্ন পরিবারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। বিভিন্ন কার্যে অর্থের জন্য আসরে আবেদনকালে সঙ্গে কিছু না থাকায় অনেক লোক পরে মুকুন্দের অবস্থান স্থানে সাহায্য দিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেকটি পালায় গীত গানগুলি পালার নামে পৃথক পৃথক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় মুদ্রিত হইয়া চার আনা মূল্যে বিক্রয় হইত। 'সেবা'[১০৯] ও 'কর্মক্ষেত্র' পালা দুইটি পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। প্রত্যেক বৎসরেই প্রায় দেড় সহস্র টাকার ঐ গান ও পালার পুস্তিকা বিক্রয় হইত। উহার শতকরা অধিকাংশই লভ্যাংশ। গানের সঙ্গে সঙ্গেই লোকে উহা সাগ্রহে খরিদ করিত। এই তহবিলটি পৃথক থাকিত। এই তহবিল খুচরা সিকি, আধুলির আধিক্যে ঘট ও থলিতে বোঝাই হইত। নোট তো অস্পৃশ্য; কাগজ ও মুদ্রণ ব্যয় বাদে দেবার্চনা ও দানের জন্য এই তহবিলের মুনাফা সংরক্ষিত ছিল। দানের সীমা মুখে বলিয়া দিতেন এবং কল্পনায় বিভিন্ন রকমে এই বিভক্ত তহবিলের সংখ্যাবৃদ্ধি ও ক্রমশ বিপুল করিবার কল্পনায় তাঁহার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু বৎসরান্তে দল বাহির করিবার সময় উহা হইত হ্যাণ্ড নোটে কর্জের সামিল। আয় প্রসঙ্গে এই স্থানে আরেকটি সংবাদ দিয়া ব্যয় ও কর্জের নমুনা উল্লেখ করিব। সম্ভবত উনিশ শত পাঁচ খৃষ্টাব্দ হইতে বঙ্গীয় সরকার জেলায় জেলায় কৃষিশিল্প প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিবার দিকে বিশেষ ঝোঁক দিয়াছিলেন। প্রদর্শনীকে বহুজনের চিত্তাকর্ষক করিতে মণ্ডপে নানাবিধ ক্রিয়াকৌতুক ব্যবস্থার রীতি আছে। তদনুযায়ী সরকারী প্রেরণায় অনুষ্ঠিত এই সমস্ত প্রদর্শনীতেও থিয়েটার, ম্যাজিক প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকিত। যতদূর মনে হয়, অসহযোগ মতবাদের প্রভাবে সরকারী এই কৃষিশিল্পের উন্নতিকর চেষ্টাকেও দেশের বিশিষ্ট একদল লোক ভাল দৃষ্টিতে দেখিতেন না। ঐ দৃষ্টির প্রভাব জনসাধারণের মধ্যে যে ভাব বিস্তার করিত, তাহাকে ঘুরাইয়া সংখ্যাবহুল

১০৯। 'সেবা' পালাটি বর্তমানে পুস্তিকাকারে দেখা যায় না। 'কর্মক্ষেত্র' পালাটি ও আরও তিনটি পালা (যথা—'সমাজ', 'পল্লীসেবা' ও 'ব্রহ্মচারিণী') একত্রে বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশ করিয়াছেন।

দর্শক আকর্ষণের জন্ম স্বদেশীভাবাপন্ন বক্তৃতা উদ্বোধনে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আহ্বান প্রভৃতির চেষ্টা অনুষ্ঠান-কর্তাদের করিতে হইত। এই চিন্তার ফলেই বলিতে পারি, যে মুকুন্দদাসকে একদা বিভিন্ন স্থান হইতে সরকার তাড়া করিয়াছেন, পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি যে মুকুন্দের সামাজিক অভিনয়কেও পাহারা দিয়াছে; এই কৃষিশিল্প প্রদর্শনীকে জনপ্রিয় করিতে সেই মুকুন্দ জাতে উঠিলেন এবং সরকার অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে মুকুন্দের বায়না হইতে লাগিল। মুকুন্দ যাত্রাওয়ালা, তাঁহার পেশা ও নেশা এই যাত্রাগান। তিনি অসহযোগী ছিলেন না। আহ্বান পাইলে যাওয়া ও না-যাওয়ার মাপকাঠি ছিল টাকার সংখ্যা। এই সকল সরকারী প্রদর্শনীতে টাকার সংখ্যা ভালই ছিল। শেষের কয়েক বৎসর মুকুন্দ কতিপয় প্রদর্শনীতে গান গাহিয়াছেন। সেই গান, সেই পালা, সেই মুকুন্দ-ভাবের ব্যত্যয় নাই। কিন্তু অসহযোগের তীব্র আন্দোলনের পরে সরকারের যে চিন্তাপ্রণালী প্রদর্শনীব পথে সাফল্যলাভ করিতে চাহিয়াছে সে পথের দুর্গমতা দূর করিতে মুকুন্দকে ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। মুকুন্দও ভ্রূক্ষেপহীন স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যকে আপন মনে পথ অতিক্রম করিতে দিয়াছেন,—নিজেকে বা পথকে দিশাহারা করেন নাই।

মুকুন্দের আয়, আহ্বান, দান, সম্মান, সুনাম, সচ্ছলতা, অনটন প্রভৃতি প্রাথমিক কৃচ্ছ্রতা ও লাঞ্ছনার পরে আমরণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধির পথেই চলিয়াছে। সচ্ছলতার পরিচয় পাইয়াছি, এইবার আমরা কর্জ অনটনের বিশেষ কাবণ অনুসন্ধান করিব।

মুদি-দোকানের 'তেল-নুন' মাপিবার সহিত তাঁহার আশা-আকাঙ্ক্ষা, জল্পনা-কল্পনা আমরা টের পাইয়াছি। ঐরূপ আকাশ-কুসুম বোধ হয় বিভিন্ন-রূপে প্রত্যেকেই যতটা সাধ্য রচনা করিয়া মনের খোরাক জোগাইয়া থাকে। কেহ বলেন, কেহ গোপন করেন, কেহ হয়ত আকাশ-কুসুমাংশের বাস্তব স্পর্শানুভব করেন, কেহ হয়ত রচনা বিহ্বল 'পুনাই' তেলির মত শিরে হস্তার্পণ করতঃ মূলধন খোয়ান ভাঙা কলসীর দিকে তাকাইয়া বাস্তবের তরঙ্গাঘাতে হতাশ হইয়া যান, আবার রূপান্তরে সেই ভাবরাজ্যের কানন চাষ আরম্ভ করেন—নিরস্ত থাকেন না। মুকুন্দের জীবনেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ক্ষুদ্র মুদি দোকান 'লাখী' গদিতে সমুন্নত হওয়া, ক্ষুদ্র চাকুরিয়ারূপে প্রবেশের ছিদ্রপথে শ্রেষ্ঠ পদলাভ, চাকর হইয়া ঢপের দলে ঢুকিয়া শ্রেষ্ঠতম ঢপ কীর্তনিয়া হওয়া, সাধুভক্তরূপে বিচরণ করা প্রভৃতি ভাবের তৎকালীন ধ্রুব বিশ্বাস ও আনুষঙ্গিক চেষ্টা আমরা নিখিল বঙ্গের অজ্ঞাত অধ্যায়ে যজ্ঞেশ্বরের জীবনে

দেখিয়াছি। তাহার পর স্বদেশী বন্যায় ঝঞ্ঝার মত বাঙ্‌লার শহর-পল্লীর পথে-ঘাটে কুটিরে-প্রাসাদে অবাধ গতিশীল মুকুন্দ-মূর্তির মাতোয়ারা প্রকটভাবে অনুভব করিয়াছি। আমরা খুঁজিতেছি তাহার কর্মঠ বিশাল বপুর অন্তরালের ছবিখানি। যে জমা-খরচের খাতা নামাইয়া এই অনুসন্ধানের কাজ আরম্ভ করিয়াছি, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই হিসাবের শোচনীয় দেউলিয়া অবস্থাও বলিয়া ফেলিয়াছি। যদি অঙ্গুলি-নির্দেশে দেখাইতে পারিতাম মুকুন্দের অর্জিত অর্থে গড়া ঐ একটা অটুট সৌধ বা তদনুরূপ ঐশ্বর্য যাহা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ না থাকিলেও স্থাবররূপে লুক্কায়িত অস্তিত্বের নিশানা বহন করিয়া চলিবে, তবেই না বলিবার সার্থকতা ছিল। তথাপি এই দেউলিয়া বিলুপ্তির নিরর্থক রন্ধ্র খুঁজিয়া কোন দুর্লভ মাণিক্যের সন্ধান করিতেছি, যাহা সাত রাজার নিগূঢ় ধনরূপে ঐ অন্ধ রন্ধ্রে মিশিয়া রহিয়াছে।

ব্যয়ের হিসাব যোগ্যতা না থাকিলে উপার্জনটা ব্যাধির মত অপরাধের বংশ বৃদ্ধি করিয়া ধ্বংসের পথটাকেই সুগম করিয়া দেয়। বেহিসাবী মুকুন্দের সাংসারিক চল্‌তি ঐশ্বর্য নিশ্চিহ্ন প্রায়। অর্জিত স্থাবব-অস্থাবর সম্পত্তি সে জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই ডুব দিয়াছে বলিতে পারি, কিন্তু তাহার জীবনের সীমা পর্যন্ত তাহা নিজের ও অপরের নিকটে অজ্ঞাতই ছিল। মুকুন্দের আয় ও আয় সম্বন্ধের ধারণা তাঁহার দৃষ্টিতে সুদূরে অস্পষ্ট ছিল বলিয়াই মনে হয়। আর দশজনের মত তিনিও অনটন দায়িত্ব জীবনের অস্থিরতা, আবৃত্তি করিয়া ব্যয়সঙ্কোচে বাক্যের দৃঢ়তা এবং আগামী বর্ষে দেনাশূন্য হইয়া সঞ্চয়ে মনোনিবেশে দৃঢ় সঙ্কল্প ঘোষণা করতঃ তহবিল নিঃশেষ করিয়া হ্যাণ্ড নোটে দস্তখত করিতেন।

দাতা মুকুন্দের প্রকাশ্যদানের পরিচয় দিয়াছি, উহার পরিমাণ খুব অল্প নহে, সঠিক জানা না থাকায় সংখ্যা উল্লেখ করিতে সঙ্কোচবোধ করিতেছি। ঐ দানের সঙ্গে অর্জিত নিজ তহবিলের সম্পর্ক ছিল না তাহাও বলিয়াছি। এখন ঐ স্বোপার্জিত টাকার একটি আনুমানিক হিসাব দিতেছি যাহার সঠিক সংখ্যা দিতে না পারিলেও প্রায় কাছাকাছি হইবে। পৈতৃক বাসা ছিল অস্থায়ী মেয়াদি জমির উপর, তাহাও দুইবার 'একোয়ার' হওয়ার পর পিতার তৃতীয় বাসায় থাকিয়া পিতার মৃত্যুর পর বরিশালের শহরোপকণ্ঠে 'কাশীপুর' পল্লীতে জমি খরিদ করিয়া বহু রঙীন পরিকল্পনার সহিত বাড়ি, ঘর, পুকুর জমি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ত্রিশ হাজার টাকা, বহু আত্মীয়-স্বজন আশ্রিত-সহ সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য ত্রিশ হাজার, শ্রাদ্ধ, বিবাহ প্রভৃতিতে দশ

হাজার খরচ হইয়াছে। রাধা-গোবিন্দ ও আনন্দময়ী কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা, আনন্দময়ী আশ্রম, বাড়ি, পুকুর, জমি ও তদানুষঙ্গিক পূজা-উৎসবাদিতে প্রায় চল্লিশ হাজার ব্যয় করিয়াছেন। বাকী পঞ্চাশ হাজারের হিসাব দেখিতে পাই বিভিন্ন মঙ্গলকর কার্যের মাধ্যমে। ধর্ম, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এককালীন ও মাসিক সাহায্যে, সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী, কন্যাদায়গ্রস্ত, বিপন্ন গৃহস্থ, দুঃস্থ বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতিকে সাহায্য করিতে তাঁহার জীবনে নীরবে পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ইহার কোনটাই সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠায় স্থান পায় নাই। যাহা পাইয়াছে সেইগুলি সর্বজনজ্ঞাত অপরের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থের হাত-বদল মাত্র। মুকুন্দ প্রতিভার প্রভাব ও কৌশলের সাহায্যে অনায়াসে এইগুলি সম্পন্ন করিয়া চলিযাছিল। ইহাতে আয়ের ব্যাঘাত হয় নাই। প্রায়শই নিজ তহবিল ঐ সমস্ত প্রকাশ্য দানের টানে টান পড়ে নাই। সাধারণত না পড়াই রীতি। ইতিহাসে অক্ষয় অমর বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তিও 'হাত-বদলী' দানেই নেতৃত্ব চালাইয়া কীর্তিমান হইয়াছেন ও হইতেছেন। মুকুন্দদাস তো একজন সাধারণ সর্ব ঐশ্বর্যশূন্য যাত্রাগান ব্যবসায়ী, নেতা, দাতা কোনটাই নহেন। অতএব গায়ের রক্ত জল করা অর্থ নিজের ও পরিবার-পরিজনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যয় করাই স্বাভাবিক, তিনি করিয়াছেনও তাহাই। "গায়ের রক্ত জল করা" শব্দোল্লেখের সঙ্গে একটি ঘটনা জানা যায়, তাহা এইখানে বলিতেছি।

মহানগরী কলিকাতার বিদ্যা-ঐশ্বর্যে উদ্দীপ্ত পরিবারগুলির সহিত মুকুন্দের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পর একবার কলিকাতায় গান চলিতেছে। সেই সময় গঙ্গাস্নানের একটি বিশিষ্ট যোগ। মাতা-পুত্রের মিলিত ইচ্ছায় মুকুন্দ-জননী কলিকাতায় আসিয়া শুভযোগে গঙ্গাস্নান সমাপন করিলেন। মাতা দিগ্বিজয়ী সন্তানের সঙ্গীতাভিনয় এবং কণ্ঠের সঙ্গীত বাড়িতে আখড়া (রিহার্সেল) দিবার সময় শুনিয়াছেন, কিন্তু বিরাট আসরে পুত্র কেমন করিয়া কি মূর্তিতে অগণিত শ্রোতাকে মুগ্ধ করিয়া আসে তাহা দেখেন নাই। এইবার সেই সুযোগ উপস্থিত হইলে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের আসরে মহিলা আসেন কতিপয় বিশিষ্টা মহিলার নিকটে মাতাকে বসাইয়া দিয়া পুত্র আসরে প্রবেশ করিলেন। মহিলাদের সাগ্রহ আবেষ্টন মধ্যে মাতা সগৌরবে পুত্রের মত্ত সঙ্গীতাভিনয় নিবিষ্ট চিত্তে দেখিতে লাগিলেন। চারিঘণ্টাব্যাপী পুনঃ পুনঃ পুত্রের আগমন-নির্গমনে তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে পার্শ্ববর্তী মহিলাবৃন্দ মুকুন্দ-জননীকে অভিনন্দিত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু, মুকুন্দ-মাতা ক্রমে মৌন গাম্ভীর্যাধিক্যে

সকলকে নিরাশ করিলেন। অভিনয়ের প্রায় শেষে জিজ্ঞাসিতা হইয়া মুকুন্দ-মাতা বলিলেন,—"দিদি! আপনারা সুখী হইতেছেন, কিন্তু, আমার প্রাণ অস্থির হইতেছে, আমার না দেখাই ভাল ছিল,—আহা। শরীর এমন বাটা বাটা করিয়া, বার বার ঘামে ভিজাইয়া, গায়ের রক্ত জল করিয়া পয়সা রোজগার করে। আমার সহ্য হয় না।" মায়ের মুখোচ্চারিত এই স্নেহঘন বাণী মহিলাদের প্রাণস্পর্শ করিল। অনতিকাল পরেই ঘর্মসিক্ত পরিচ্ছদে অভিনয়ক্লান্ত পুত্র মাতৃ-সন্নিধানে আগমন করিতেই মহিলাগণ মায়ের এই স্নেহমথিত বাণী শুনাইবামাত্র মুকুন্দ মাতৃ-চরণে মস্তক লুটাইয়া, পায়ের নিকটে বসিয়া ক্রোড়ে মস্তক রাখিলেন। মা নীরবে পুত্রের গাত্র-মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন; মহিলাগণ এই দৃশ্য কেবল নীরবে দেখিলেন। মনে পড়িতেছে যেন প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে নদীয়ার নিমাই সন্ন্যাস লইয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে উপস্থিত। শচীমাতা নদীয়া হইতে ছুটিয়া সেখানে পৌছাইয়া প্রথমেই "কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিহ্বল", তাহার পর যখন প্রেমোন্মত্ত পুত্র কীর্তনের মধ্যে বিহ্বলাবস্থায় ভক্ত পরিবেষ্টিত নৃত্যের মধ্যে—

"ক্ষণে ক্ষণে পড়ে প্রভু আছাড় খাইয়া।
দেখি শচীমাতা কহে রোদন করিয়া॥
চূর্ণ হইল হেন বাসো নিমাই কলেবর।
হা হা করি বিষ্ণুপাশে মাগে এই বর॥
বাল্যকাল হইতে তোমার যে কৈলুঁ সেবন।
তাব এই ফল মোরে দেহ নারাণে॥
যে কালে নিমাই পড়ে ধবণী উপরে।
ব্যথা যেন নাহি লাগে নিমাই শরীরে॥" —চৈ. চ।

মাতৃস্নেহের এই পূত শাশ্বত ধারা অব্যাহত। এই কাহিনী স্মরণ-মননে দেহ-প্রাণে অমৃত সিঞ্চন করে, পুনঃ পুনঃ বলিলেও বলিবার ইচ্ছা ক্লান্ত হয় না। তথাপি আমাদের সেই মাতৃক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া থাকিলে চলিবে না। বুক হইতেই বুকের সম্বল লইয়া নিয়মের শুষ্ক পথেই আগাইয়া চলিতে হইবে। আমরা মুকুন্দের "গায়ের রক্ত জল করা" উপার্জিত অর্থের খরচ মিলাইয়া নিষ্কৃতি দিব। মাস-কাবারে দলের লোকদের বেতন সকলকে একদিনেই হিসাব করিয়া দেওয়া হইত। ঐ দিন আরও কতগুলি 'মানি-অর্ডার' প্রতি মাসেই করা হইত। ঐগুলিও দেনাশোধের মত পাঠাইয়া মুকুন্দ হাল্কা হইতেন। ঐ 'মানি-অর্ডার' প্রাপকদের মধ্যে দেশ, সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য,

শিল্প-বাণিজ্য সেবায় নিয়োজিত কতক ব্যক্তি ও অনুষ্ঠান, আত্মীয়, বন্ধু, পাঠার্থী, পরীক্ষার্থী, দুঃস্থ, বিপন্ন হরেক রকমের লোক থাকিত। উহার কোনটা সাময়িক, কোনটা মাসিক। বৎসরের পর বৎসর সেই মাসিক ব্যবস্থা চলিত। ইহা ছাড়া স্তূপীকৃত চিঠির জবাব দিতে হইত। ঐ সমস্ত চিঠিও বিভিন্ন রকমের ছিল—ব্যক্তিগত ব্যাপার, রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি। এমনকি অহেতুকী জিজ্ঞাসা, উপদেশ, পরামর্শ, প্রার্থনা, দাবী প্রভৃতি বহু রকমের পত্র থাকিত। ঐ চিঠিগুলির একাংশ হইতেই 'মানি-অর্ডার', 'টেলিগ্রাফ মানি-অর্ডার'-এর উদ্ভব হইত। দিনের পর দিন আয়ের ও বিভিন্ন দেশের পরিচয়ের বৃদ্ধির সঙ্গে ইহার সংখ্যাও বৃদ্ধি হইতেছিল। এখানে একটা কথা বলি, অবাধ্য, অপ্রীতিকর অবস্থা লইয়া লোক যেমন নিজ পরিবারস্থদের অফুরন্ত দাবী আমবণ মিটাইয়া চলাই কর্তব্য বা ধর্ম মনে করে, মুকুন্দের এই 'মানি-অর্ডার'গুলিও তদ্রূপ পারিবারিক ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অনুষ্ঠানে ব্যবসা, মতবাদে সামঞ্জস্য ছিল না, সাক্ষাৎ ও পত্রালাপে তিক্ত-বিরক্ত বেদনা পরিস্ফুট ভাব দৃষ্ট হইত, কিন্তু 'মানি-অর্ডারের' সংখ্যা তাহাতে খর্ব হয় নাই। পারিবারিক খরচের মত সহজভাবে এইগুলি কাহাকেও বলিবার মতও তাঁহার মনে হয় নাই। সংবাদপত্রের প্রশংসায় তাঁহার অরুচি ছিল বা "তৃণাদপি" ভাবে নিজেকে লুকাইয়া রাখার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। সাক্ষ্য দিব না, শুধু এই কথাই বলিব যে, ঐ জাঁকজমকওয়ালা বিরাট বপুর ভিতরের প্রাণটার ব্যাপকতা লোকচক্ষুর অন্তরালে মুকুন্দ-দেহের বিশালত্ব অপেক্ষা দূর-দূরান্তে অন্তরের তাডনায় বিস্তৃত হইয়াই চলিয়াছে।

মাথা ও বুকের সামঞ্জস্য রক্ষাই স্বাস্থ্য। মাথা আগাইয়া দেহ পতনের, আর আগাইয়া দেওয়া বুক, মস্তকহীনতার লক্ষণ ঘোষণা করে। মানুষ ঐ দিকে তাকাইয়া নিন্দা-প্রশংসার সূত্র গ্রহণ করে। মুকুন্দের অনন্যসাধারণত্ব, অগণিত জনসাধারণের হস্তে ঐ নিন্দা-প্রশংসার সূত্র দিয়াছিল। মুকুন্দের কবিত্ব, উদ্ভাবনী ও সৃজনী শক্তিতে যুগবক্ষ যে দুর্লভ নব অবদান লাভ করিয়াছে, তাঁহার সেই প্রতিভা পশ্চাতের যে তাডনায় যজ্ঞেশ্বরকে মুকুন্দ করিয়া ভগ্ন, বদ্ধ, দীন কুটীর হইতে নিখিল বাঙলার শহর-পল্লীর ঘাটে ঘাটে অবিশ্রাম চক্রের মত ঘুরাইয়া অকালে স্তব্ধ বিশ্রামে কোল দিয়াছে, সেই তাড়না, সেই প্রতিভা, সেই শক্তির উৎস ঐ বুকখানা। ঐ বুক তাঁহাকে শুধু প্রশংসিত না করিয়া নিন্দিতও করিয়াছে, অকালে দেহের পতন ঘটিয়াছে। ঐ 'মানি-অর্ডারের' নীরব গোপন তাড়াগুলি যাহাকে দান বলিয়া অভিহিত করা যায় মুকুন্দ যদি তাহাকে

দান ভাবিতে পারিতেন, তাহা হইলে ঐ অর্থ লক্ষাধিক টাকা বুদ্ধিপূর্বক ব্যবস্থায় ঐ দানেই তাহাকে চিরকাল অমর করিয়া রাখিতে সক্ষম হইত। কিন্তু মুকুন্দের প্রাণ উহাকে পারিবারিক সেবায় অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিল। সেখানে উদ্বেলতা ছিল না, সংবাদপত্র এই সন্ধান পায় নাই, উহা ছিল মুকুন্দ-জীবনের সহজ সরল প্রাণের স্বতঃগতি। ঐ গতি স্বদেশী আন্দোলনের সৃষ্টি নহে— দাঁড়ি-পাল্লা হস্তে মুদি যজ্ঞেশ্বরের কল্পনায় ঐ প্রাণচিত্তের আভাস পাইয়াছিল। পরবর্তীকালে ব্যাপকক্ষেত্রে তাহাই ব্যাপকতররূপে স্বদেশী আন্দোলনে বিলাইবার সুযোগ পাইয়াছিল মাত্র।

উল্লিখিত বিবরণ প্রশংসার জন্যই লিখিত, আর প্রশংসা ছাড়া নিন্দারই বা কি?—কিন্তু কিছু আছে। এই অর্থব্যয় মুকুন্দের প্রশংসার সহিত নিন্দাও কম হয় নাই। দেশের অসংখ্য দরিদ্রতার চিত্র আমাদের চারিদিক ঘিরিয়া আছে। অন্নে-বস্ত্রে, শিক্ষায়-দীক্ষায়, বিধি-ব্যবস্থায় সর্বক্ষেত্রে নিত্য এই জাতিকে দহন কবিতেছে। সর্ববিধ দৈন্যের বিশেষণেব মূল হেতু মাত্র একটা, সেটা আত্মসম্মান জ্ঞানের অভাব, এই জ্ঞান বা চেতনাই ব্যক্তিকে, জাতিকে, সমাজকে উঠায়-নামায়। রাজাব কুমারকে রাস্তাব ভিখাবী কবে, কাঙাল পুত্রকে রাজাসনে তুলিয়া দেয়। এই উঠা-নামার অদৃশ্য কৌশল যন্ত্রটি অন্তরের গোপন কক্ষে বিরাজিত। ঐ সম্মান জ্ঞান। তজ্জন্য প্রাণ দিয়াও ঐ মানকে বাঁচাইয়া রাখাই ছিল শ্রেষ্ঠ নীতি-বাক্য।

কিন্তু অধুনা বুভুক্ষ নগ্ন কঙ্কালের বাঁচন অভিমানী আর্ত হুঙ্কাব পরিবেষ্টিত আকাশ-বাতাসকে পূতি গন্ধাপ্লুত গলিত শবের শেষ উপহারে নিস্তব্ধ করিবার চঞ্চল স্রোত উৎকট বেগে প্রবাহিত। এই দুই কূল ভাঙা বীভৎস স্রোতমুখে দাঁড়াইয়া কিসের নীতিকথা! আজ যে বাঁচিতে হইবে। সু-খাদ্য কু-খাদ্যের কাছাকাছি, ক্লেদ মলিন ছিন্ন বা পরিপাটি লজ্জাবরণ কিনা, সেই বিচারের অবসর কোথায়? ডাস্টবিন, লঙ্গরখানা, ধার্মিকদের 'দরিদ্রনারায়ণ' ডাক-হাঁকা, 'হাট সম্মানী—ঢোলামন্ত্রণ' অভিনব স্বাধীনতাকামীদের দাবী নির্গলিত আহ্বান,— উহার যেখানে যেটুকুর সন্ধান পাই ছুটিয়া ছুটাইয়া এই বেড়া আগুনের কবল হইতে বাঁচাইয়া রাখিব এই দগ্ধাবশিষ্ট প্রাণকে, লজ্জাকে। বাঁচন চেষ্টার এই উন্মাদ মরশুমে, বাঁচিবার, বাঁচাইবার, বাঁচাইয়া বাঁচিবার উলঙ্গ-ফিকির আজ সকলকে ঘর হইতে টানিয়া রাস্তায় বাহির করিয়াছে। বাঁচিবার আশায় রাজধানীর অত্যুজ্জ্বল সৌধালোকে পতঙ্গের মত পল্লীর নিরীহ শিশু-বৃদ্ধ নর-নারী ছুটিয়া চলিয়াছে, সেবাক্ষেত্র, লঙ্গরখানার পথে-দুয়ারে, বুকের উপর মরা-পায়ে

দলিয়াও ছুটিয়া চলিয়াছে—বেহুঁশ বিরামহীন। মজুতদার, ব্যবসায়ী, ধনী, মহাজন, ধার্মিক, রাজনৈতিক, সমাজপন্থী সকলের বাঁচাইয়া বাঁচিবার ফিকির সমন্বয়ে দিকে দিকে সেবাধর্মের, মহাপ্রাণতারবান ডাকাইয়া আকাশভেদী বিজয় বিষাণ বাজিতেছে। দুঃখ-দুর্দিনের মধ্যেও এই মহাপ্রাণতায় শান্তি আনন্দ উপভোগই স্বাভাবিক। ঐ রাজপথে মুমূর্ষু, কঙ্কাল, মুখে এক ফোঁটা জল পাইয়া কৃতজ্ঞতার চাহনি চাহিয়া চক্ষু বুজিল—দাতা কৃতার্থে উৎসাহিত, সমাজে প্রশংসিত। ঐ সুরে সুর মিলাইয়া প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতায় উল্লসিত হইতে পারিলেই লেখনীর সহিত প্রাণটা সরস বোধ হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্য! বাস্তবের দূরে, রুদ্ধ প্রাচীরের বদ্ধ লেখনী প্রতিকূলে গর্জনে বাঁচাইবার ঐ শুভ্র সুন্দর চিরপ্রশংসিত অনাবিল পথে মসী ছিটাইতে চাহে। বলিতে চাহে, ওগো হিতৈষী, রক্ষক, ধার্মিক, ডাক্তারের দল—'ইন্‌জেকশন্‌টা একটু থামাও, আরামে মরিতে দাও।' বাঁচাইবার ক্ষমতা তো ঐ লক্ষ লক্ষ শবের শৃগাল-কুকুর ভক্ষিত গলিত দেহখণ্ডই সাক্ষ্য দিতেছে, আর কেন? তোমাদের পুণ্য পুরস্কার তো যথেষ্ট মিলিয়াছে। ধরার ধূলিতে বৈকুণ্ঠের নারায়ণ ক্রমবর্ধমান মূর্তি ধরিয়া তোমাদের সেবার প্রশংসার সহিত সর্ব সন্ধিকে বাঙ্‌লার রাস্তাঘাট, পল্লী-নগর পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। কৃচ্ছ্র তপস্যার ভীতি নাই—সাধ্য নারায়ণ আজ উঠিতে-বসিতে সহজসিদ্ধ হইয়া হাটে-মাঠে তোমারই পায়ে পায়ে ছুটিয়া মরিতেছে।

বাস্তবের একটা দমকা হাওয়ার স্পর্শে অনেক দূরে আসিয়াছি। উচ্ছ্বাসের এই অসংখ্য রথের দৃশ্য সত্ত্বেও অসহায়ত্বের দাবীতে করুণা ভিক্ষা করিয়া প্রত্যাবর্তনের পথে আবার বলি—

মেঘগর্জনশ্রুত মৎস্য বিশেষের আশা উল্লাসে কানে হাঁটিয়া—ডাঙায় বাঁচিবার অন্ধ প্রয়াসের শিকারীসুলভ মনোবৃত্তির সুযোগে অজ্ঞাতে আচ্ছন্ন করিয়াছে, না প্রতিকারপ্রয়াসীদের তাহা ভাবিবার সময় হয় নাই? সমস্ত শিক্ষা-সভ্যতার নিদর্শনরূপে পরিস্ফুট ঐ ক্রমবর্ধমান থানা, রেজিস্টারী অফিস, কারাগার কি প্রমাণ করিতেছে না যে, চুরি, ডাকাতি, মিথ্যা জুয়াচুরি দিনের পর দিন কমাইবার নামে বাড়াইয়াই চলিয়াছে? তেমনি বা ততোধিক দ্রুত গতিতে আমাদের নারায়ণ পূজার লোভে বাঙ্‌লার ঐ গণগোষ্ঠী নারায়ণ শিলা 'শালেগ্রাম' হইয়া যাইতেছে নাকি? মান-অপমানের শয়ন-উপবেশন সমান করিয়া কৃপাসিন্ধুর দল এই জাতিকে লঙ্গরখানার মহোৎসবে ভিক্ষুকের ছাপ শিরে আঁকিয়া ভবিষ্যৎ বংশকে উত্থান-রহিত করিতেছে নাকি? গার্হস্থ্য জীবনে গৃহে অন্ন না থাকা অপেক্ষা বড় অপমান আর নাই। তণ্ডুলহীন উপবাসী

গৃহস্থঘরের শিশুর মুখ হইতেও উপবাসের কথা উচ্চারিত হইত না। সেই বাঙ্‌লার অনশন-কলঙ্ক জগতের কানে পৌঁছাইল—ধর্ম, সমাজ, শাসন সর্বক্ষেত্রের মহাকৌশলে ভিক্ষাপাত্র হস্তে শোষকের প্রাঙ্গণ হইতে কুড়ান উচ্ছিষ্ট ছড়াইয়া খেলিতে খেলিতে নগ্ন বেহুঁশ অবস্থায় জাতিকে ঘরের বাহির করিয়াছে, শুধু ঘরের বাহিরে নয়, পল্লী-শহর-রাজধানী হইতেও শত সহস্র মাইল দূরে অজ্ঞাত বনবাসে প্রেরণ করা হইয়াছে। অঙ্কের হিসাবে সভ্যতা বাঁচাইতে, ঐশ্বর্যের দুয়ার হইতে নোংরা কঙ্কাল আবর্জনা—সভ্য ভদ্রের সোনালী শক্তিমান ঝাড়ুতে ঝাঁটাইয়া পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জোর চেষ্টা চলিতেছে। দীর্ঘ পুঞ্জীভূত দারিদ্র্যের উপহাসের মত ঝাড়ুদারকুলকে ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেসামাল করিতেছে। পয়োমুখী নীতি বাণী গাহিয়া গাহিয়া নীতিপথকে পায়ে দলিয়া মান ঘুরাইয়া প্রাণ রাখিতে চাওয়াই রক্ষা হইয়াছে কি? ধুকধুক করিয়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন যাহা অবশিষ্ট আছে তাহাও এই পথে রক্ষা হইবে কি? ক্ষুব্ধ অবরুদ্ধ চিত্ত সর্বশক্তি নিঃশেষে চীৎকার করিয়া বলিতে চাহে—না, হইতে পারে না।

মাতৃ-ক্রোড়ে রাত্রিশেষে বাঙ্‌লার শিশু, জীবন-সম্বল শ্লোক কণ্ঠস্থ করিত—

"বরমসি ধারা, তরুতলে বাস
বরমপি ভিক্ষা বরমুপবাস
বরমপি ঘোর নরকে পতনং
নচ ধন গর্বিত বান্ধব শরণম্।"

বাঁচিতে হইলে এই নিদ্রিত মহামন্ত্রকে আবার জাগাইতে হইবে। সসম্মানে মরিয়া বাঁচিবার 'Die to live' অমৃতমন্ত্রে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াই বাঁচাইতে হইবে। জগতের গলগ্রহ ভিক্ষাপাত্রপাণি ভিক্ষুক বংশের অবমানিত অস্তিত্ব থাকিতে পারে না—ধ্রুব মৃত্যুর পথে অসহনীয় জ্বালাকে আর কিঞ্চিৎ দীর্ঘ করিয়া লাভ কি? সসম্মানে মরিয়া বাঁচিতে দাও! ইহাই অন্তরাত্মার শ্রুত আকাশবাণী।

সূক্ষ্ম রাজনীতির তোয়াক্কাহীন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যাত্রাওয়ালা মুকুন্দের কণ্ঠ-লেখনী এই জাতীয় মর্যাদা জাগাইয়া তুলিবার সুরকে ধ্বনিত করিবার চেষ্টাতেই নিখিল বঙ্গে ছুটিয়া বেড়াইত,[১১০] ভাষা ও সুরের এই বহির্বিভাগ বিচারে ইহাকে

১১০। তাঁহার "কর্মক্ষেত্র" পালা মোটা ভাষায়—"আপনারে ভাই আপনে হাঁটি, কেন ঠ্যাং থাকিতে ধরবি লাঠি" প্রভৃতি এই সকল পদের ধাক্কায় দেশবাসীকে আত্মসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করিবার আপ্রাণ প্রয়াস মূর্ত হইয়া উঠিত। কারণ, মুকুন্দদাসের গানের মধ্যে ছিল সাধারণ মানুষের প্রাণের কথা, আর 'জীবনে জীবন যোগ' করিবার কথা।

কৌশলী ব্যবসা বুদ্ধির পর্যায়ে ফেলিলে প্রতিবাদের খুব শক্ত যুক্তি মিলিবে না। প্রকাণ্ড আসরে সংগৃহীত দানগুলিও সেই শ্রেণীতে পড়িতে পারে। কিন্তু ঐ যে অর্ধ লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ের উল্লেখ করিয়াছি যাহা নাম-গন্ধহীন, রক্তসম্পর্কহীন ব্যক্তি, পরিবার, অনুষ্ঠানের পশ্চাতে গোপনে ব্যয় হইয়াছে, তাহাকে আমরা আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সেই বোধ উদ্বুদ্ধ করিবার সহজ প্রচেষ্টার পর্যায় দৃঢ়তার সহিত রক্ষা করিতে চাহি। কিন্তু, দুর্গতির মূল ব্যাধি জর্জরিত উলঙ্গ ভিক্ষাবৃত্তি, মুকুন্দের গোপন দৌর্বল্যের সন্ধান পাইয়া দাবীর অসংখ্য মূর্তি লইয়া তাঁহাকে বিব্রত করিয়াছে। চতুর সবল সক্ষমের দল সম্যক লুটিয়া লইবার বাসনায় প্রতিহত হইয়া নিন্দা-অপবাদ রটাইবার অবিরাম চেষ্টায় কার্পণ্য করে নাই। আংশিকপ্রাপ্ত আশানুরূপপ্রাপ্তি বা বিলম্বের জন্য শুধু ভর্ৎসনা নহে—শাসাইয়া পত্রও লিখিয়াছে। চিহ্নিত গণ্ডী পরিবারের বাহিরে গড়া মুকুন্দের বৃহৎ সংসারের উল্লেখে ঐ পরিবারের অসম দাবীতেও গঞ্জনা সহ্য করিতে কম হয় নাই। এই অজস্র বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও মুকুন্দের মর্যাদা-উদ্বোধক সেবাকে তিক্ততায় রুদ্ধ, ব্যাহত করিতে পারে নাই। ভগ্নস্বাস্থ্যে বিশ্রামের প্রয়োজন; স্বীয় চিকিৎসা ও আহার্য চলিতে 'ঠেকা' ছিল না, কিন্তু ক্রমবর্ধমান বৃহৎ সংসারের ভাবনা, জাতির আত্মসম্মান, উদ্বোধক আরব্ধ কার্য সকলের চিন্তা বিশ্রাম করিতে দেয় নাই। পুনঃ পুনঃ রোগাক্রান্ত দেহ লইয়াও দেশ-দেশান্তরে ঘুরিতে হইয়াছে। এই সম্বন্ধে বন্ধু-বান্ধব কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া যুক্তিসঙ্গত কৈফিয়ত দিতে পারিতেন না। শীঘ্রই বিশ্রাম করিবার 'ওয়াদা' করিতেন। অবশেষে দল লইয়া ভ্রমণ করিতে করিতেই শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত অবিরাম সেই পুনঃপ্রচেষ্টার মধ্যেই অকালে শেষ বিশ্রামই তাঁহাকে বিশ্রাম দিয়াছে—প্রার্থীর দল শান্ত হইয়াছে। তজ্জন্য বলিয়াছি, তাঁহার ক্রমবর্ধমান নীরব প্রচেষ্টাই অকালে তাঁহার দেহের পতন ঘটাইয়া ক্ষান্ত হইয়াছে। কিন্তু ঋজু কঠিন ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ভঙ্গীতে ও উদাত্ত আহ্বানে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইতেছে। অতএব সেই সকল কথা বলিবার প্রয়োজনীয়তা চিরকাল আছে এবং আজিকার 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'-তে তাহার প্রয়োজন বোধহয় সর্বাপেক্ষা অধিক।

চতুর্দশ অধ্যায়

কর্মযোগী মুকুন্দদাস

মুকুন্দের আকাশজোড়া বুকের আশা, মুদীর গণ্ডী ভাঙিয়া কল্পনার পুষ্পরথে নিখিলবঙ্গে যে অভিযান করিয়াছিল তাহার প্রকাশ্য ও গোপন মূর্তির একটা মোটামুটি পরিচয় লইয়াছি। উহার ব্যর্থতা ও সার্থকতা, অজ্ঞতা-বিজ্ঞতা প্রভৃতি মিলিয়া একটা আমরণ জীয়ন-কাঠির অবিরাম প্রাণস্পর্শ দিয়াছে, যে প্রাণ দেহান্তেও মরে নাই। অদ্যাপিও বাঙ্‌লার এমন সমস্ত অনুষ্ঠান ও কর্মী আছে যাহাদেব জীবনপ্রবাহে মুকুন্দের ঋণ সরাইয়া লইলে তাহাদের অস্তিত্বের চিহ্ন বহুকাল পূর্বেই শুষ্ক ও স্মরণের বাহিরে যাইত। অঙ্গুলি-নির্দেশে সেইগুলি উল্লেখ কবিযা যাইতে পারিলে শোভন হইত, কিন্তু তাহার সম্যক সাহস ও সুযোগেব বর্তমানে অভাব থাকিলেও কালপ্রবাহে একদিন তাহা প্রকাশ পাইবে।

ইতিপূর্বে আমরা উপার্জিত নিজস্ব অর্থকে তিনভাগে ব্যয়ের উল্লেখ করিয়াছি। সেই ব্যয়ের মধ্যে কতিপয় ব্যয়ের একটু বিশদ বিবরণ দিব। তজ্জন্য কিছু কিছু পুনরুল্লেখ হইলেও জীবনধাবা ও চিন্তা-প্রণালীর সহিত অধিকতর পরিচিত হইবার সুযোগ পাইব।

কারা-প্রত্যাগত মৃতদার মুকুন্দ বিপত্নীক জীবন যাপনেব সঙ্কল্প লইয়াও সংসাব সম্বন্ধে উদাসীন হইলেন না। আসক্তি ও ঔদাসীন্যের মাঝখানে দাঁড়াইয়া মাতা-পুত্রের সংসাব গড়িয়া দেওয়ার সেবাকে জীবনের অন্যতম কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। দল ছুটি দিয়া মুকুন্দ জ্যৈষ্ঠের শেষে বাড়ি ফিরিতেন এবং দুর্গোৎসবেব সপ্তাহকাল পূর্বে পুনরায় রওনা হইতেন। কোন বৎসরই চারি মাসের উর্ধ্বে তাঁহার বাড়ি থাকা হইত না। ঐ সময় মধ্যেও কোন কোন বৎসর বিশেষ বায়না হইত, সেই বৎসর আড়াই কি তিন মাসের বেশী বাড়ি থাকিতে পারিতেন না। কাশীপুরের নূতন বাড়ি প্রকাণ্ড। সেই বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে পুষ্করিণীর কোণে একখানি ঘর তুলিয়াছিলেন নিজের থাকিবার জন্য। মাঝে ছিল বৃহৎ পুষ্করিণী। কয়েক হাত দূরেই বরিশাল হইতে পল্লীগ্রামী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের বড় রাস্তা। পূর্বদিকস্থ পুষ্করিণী, প্রান্তরে রাধা-গোবিন্দ মন্দির। পশ্চিমে-উত্তরে মাঠ, দক্ষিণে রাস্তার অপরদিকে

মাঠ ও কালী-মন্দির। বাড়ির চতুর্দিকে দৃষ্টির মধ্যে কোন লোকালয় ছিল না। নিজ বাসগৃহে হইতে চীৎকার করিয়া ডাকিলেই কেবলমাত্র সেই শব্দ বাড়ির মধ্যে পৌছিত। অতিথি অভ্যাগত না থাকিলেও ঐ গৃহে একজন মুসলমান মালী ব্যতীত আর নৈশ সঙ্গী থাকিত না। বর্ষাবিহীন রজনীর গভীর নিশি, ঘরের বাহিরে একখানি কাষ্ঠাসনে অথবা পুকুরের ঘাটলায় একাকী কাটাইতেন। বৎসরের আট মাস আহার নিদ্রায় সর্বদা বহুলোক পরিবেষ্টিত অবস্থার পর কাশীপুরের নৈশ নির্জনতা তাঁহাকে আরাম দিত। অশীতিপর বৃদ্ধা জননী পুত্রের নিষেধ সত্ত্বেও কর্দমাক্ত পথ অতিক্রম কবিয়া নির্জনোপবিষ্ট পুত্রের ঘন কেশদাম মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া গাত্র সংলগ্ন হইয়া বসিয়া থাকিতেন। মাঝে মাঝে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া মাতাকে ঘরে পাঠাইবার তাগিদ ব্যপদেশে তাঁহাকে বাহুদ্বারা অধিকতর দেহ সংলগ্ন করিয়া মুকুন্দ আবার নীরব হইতেন। মাতা-পুত্রের বিচ্ছিন্ন হইবার ইচ্ছা-অনিচ্ছার এই কুসুম সংঘাতের মধ্যে রজনীকে অতিক্রম না করিয়া ক্ষান্ত হইত না। উন্মাদমুখর জীবনবাহী প্রৌঢ়ের এই শান্ত শিশুত্বে মাধুরী দর্শনোপভোগের একমাত্র অধিকারী স্তব্ধ নিশীথেব অসীম নীলাকাশোজ্জ্বল তারকামণ্ডলী, ধূলির জগৎ নহে।

'বাড়ি' নামক মুকুন্দের এই বিশ্রাম ও শক্তি সঞ্চয়ী কেন্দ্রটিকে মাতা ও পুত্রের তত্ত্বাবধানে এমন একটি আশ্রম গড়িয়া দিবার কথা ছিল—যেখানে 'মাছভরা পুকুর', 'গোলাভরা ধান', দুগ্ধবতী গাভী, প্রচুর তরি-তরকারিতে পরিপূর্ণ থাকিবে। শহরের পশ্চিমস্থ শেষ সীমার নির্জন মাঠ জঙ্গলবেষ্টিত বাড়িটির চতুর্দিকস্থ জমিগুলি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ক্রমশ খরিদ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানেও জমি খরিদ করিয়াছিলেন। বাড়ি, পুকুর, পাকাঘাট, মন্দির, ইট কাটা, জমি খরিদ, সংসার ব্যয় প্রভৃতির যাবতীয় খরচ ভ্রাতার হাতে সম্পন্ন হইত। কতিপয় বৎসর পরে মুকুন্দ টের পাইলেন যে, তাঁহার অজ্ঞাতে 'হ্যাণ্ড-নোট', 'মর্টগেজ' প্রভৃতিতে ভ্রাতা বহু দেনা করিয়াছেন। বিস্মিত ব্যথিত মুকুন্দ দেনা পরিশোধ করিয়া ভ্রাতাকে স্বাবলম্বী করিয়া দেওয়ার জন্য বরিশালে নূতন বাজারে প্রচুর মূলধনে তৃতীয়বার মুদি দোকান করিয়াছিলেন। দুই বৎসরের মধ্যে পুনরায় মহাজনের বিস্তর দেনা পরিশোধ করিয়া দোকান বন্ধ করিয়া দিতে হইল। অবস্থা উপলব্ধি করিয়া ভ্রাতার নিকট হইতে একখানা দলিলে সম্পত্তির উপর কোন দাবী-দাওয়া নাই—এই মর্মে মুক্তিপত্র রেজিস্ট্রি করিয়া লইলেন। সমস্ত সম্পত্তি রাধা-গোবিন্দের দেবোত্তর রূপে উৎসর্গ করতঃ পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের সেবায়েত রূপে ভোগের অধিকারী স্থির করিয়া উইল

করিয়াছিলেন। বিভিন্ন দিক রক্ষা করিয়া এই ব্যবস্থা যে বুদ্ধি ও মহাপ্রাণতাপূর্ণই ছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ ছিল না। কিন্তু, অকাল মৃত্যু সকল ব্যবস্থাই পণ্ড করিয়া দিয়াছে। মৃত্যুকালে দেনার পরিমাণ ছিল তিন সহস্র। দেনা অপেক্ষা দৃশ্যমান অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণও অনেক বেশী ছিল। ওয়ারিশগণ ধারে কর্জশোধের ইচ্ছা করিলেন, মহাজনগণ আয়-চেষ্টাশূন্য খাতকের উইল ব্যবস্থা স্বীকারে আতঙ্কিত হইলেন; মামলা চলিতে লাগিল। মামলা ক্লান্ত ওয়ারিশগণ উইল নাকচ করিবার সাহায্য করিয়া দেনা শোধের পথ মুক্ত করিয়া লইলেন। সেই মুক্তপথে ক্রমশ মুকুন্দের পবিকল্পনার বাড়ি-ঘরের সূচী নিঃশেষ হইল, বলিতে পারি।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা—আশ্রমবাড়ি ও কালী-মন্দির। বাড়ির অনতিদূরের এইস্থান নির্দিষ্ট কবিয়া কারুকার্যমণ্ডিত মন্দির, সিমেণ্ট দ্বারা প্রস্তুত কালী বিগ্রহ পুকুব-ঘাটলা গৃহাদি নির্মিত করিয়া বার্ষিক পঞ্চাশ মণ ধানের জমির সহিত মাতাজীকে সর্বময় কর্তৃত্ব প্রদান কবিয়া এক রেজিষ্ট্রি দলিল করিয়াছিলেন। মন্দির ও আশ্রম প্রতিষ্ঠা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। মাতাজী উপলব্ধি কবিলেন, স্থানটা মহিলা আশ্রমের উপযোগী হয় নাই। ঐ স্থানে মহিলাদের লইয়া থাকিতে হইলে দৃঢ় প্রাচীর বেষ্টিত এবং অপর কতকগুলি বন্দোবস্তের প্রযোজন। কিছুকাল পবে মাতাজী অন্যত্র গেলেন। মুকুন্দ ঐ স্থানকে মাতাজীব আদেশানুযায়ী আশ্রমোপযোগী প্রস্তুতের ভার গ্রহণ করিলেন। সুস্থ ও স্থান প্রস্তুতাদি সম্পন্ন হইলে মাতাজী পুনরায় আসিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ভোগ ও পূজার জন্য ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইল। ইতিমধ্যে মুকুন্দেব মৃত্যু তাঁহাব সকল পবিকল্পনায় যবনিকাপাত করিল।

কালী মন্দির, বিগ্রহ, আশ্রমবাড়ি এখনও আছে, স্মৃতির ম্লান ছাঁ' লইয়া হয়ত আবো বহুদিন থাকিবে। এখনও শহব হইতে লোক মুকুন্দের কালীবাড়িতে প্রণাম করিতে আসে, পূজা করে, শিবরাত্র, মাঘী সপ্তমীতে ভিড করে, কিন্তু মুকুন্দের আকাঙ্ক্ষা, দেহপ্রাণের প্রবল প্রচেষ্টা, প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়, নিজের সমস্ত ভবিষ্যৎ চেষ্টার কল্পনা, মহিলা আশ্রম অবলম্বনে যে রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন সেই কথা স্মরণ করিতে মুকুন্দের অন্তরঙ্গজ্ঞাত বন্ধু—পরিচিতদের চিত্ত বরং বেদনায় ক্ষোভে ভরিয়া উঠে।

বাঙ্‌লার বিভিন্ন স্থানের গঠনমূলক অনুষ্ঠানের পশ্চাতে রহিয়া যে বেনামী অর্থ যোগান, মুকুন্দের ক্রমবর্ধিত অর্জিত অর্থের সঞ্চয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, সেই গঠনমূলক কার্যের একটি দৃঢ় কেন্দ্র ঐ মন্দির ও আশ্রম অবলম্বনে সুগঠিত

করিয়া স্বগৃহ পরিবারের সহিত বিরাট দুঃস্থ সমাজকে সেবার আদর্শ আশ্রয়ে পরিণত করিবেন এবং সেবাতেই জীবনের সমাপ্তি ঘটাইবেন, এই ছিল তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। ঐ কেন্দ্রটি হইবে অস্পৃশ্যতাবর্জন, সাম্প্রদায়িক মিলন, ভিক্ষা নিরোধী—মানদ কুটীর-শিল্পের আদর্শ কারখানা, বিশেষভাবে মহিলাদের সসম্মান স্বাবলম্বী আশ্রয়।

বাঁচিয়া থাকা সম্বন্ধে মুকুন্দের ধরন ছিল কিছু দীর্ঘ। পিতৃমাতৃ মহলের আয়ুষ্কাল তুলনায় ছাঁটিয়া কাটিয়া আরও বিশ বৎসর বাঁচিবেন এবং দশ বৎসর কাল অন্তত কর্মযোগ্য দেহের সুযোগ পাওয়া যাইবে। পঞ্চান্ন বৎসর অতিক্রম করিবার পরেও যখন আহারে, শ্রমে, যৌবন অক্ষুন্ন উপলব্ধি করিতেন তখন সেই অনুমানে ভ্রান্তিও অনুভব করিতেন না। কিন্তু দেহের স্থূলতা, দন্ত পতনাদি দৃষ্টে মাঝে মাঝে অকস্মাতের আশঙ্কাও করিতেন—উইলাদির ব্যবস্থায় উৎকণ্ঠার মধ্যে সেই চিন্তাও ছিল।

ঢপ, টপ্পা, কথকতা, পাঁচালী প্রভৃতি[১১১] ভাঙিয়া সুরে, ভাবে, দৃশ্যে যাত্রার

১১১। **ঢপ**—ইতিপূর্বে "ঢপ"-এর কথা বলা হইয়াছে। কীর্তনাশ্রয়ী পাঁচালী গানের এক বিশেষ রূপ হইতেছে—ঢপ কীর্তন। উন্নতমানের রস পরিবেশনের জন্য যশোহরের মধুসূদন কান এই ঢপ কীর্তনের প্রচলন করেন। তিনি 'অক্রূর সংবাদ', 'কলঙ্ক ভঞ্জন', 'মাথুর', 'প্রভাস' প্রভৃতি পালা গান রচনা করেন। তাহার গানে কৃষ্ণকমল গোস্বামীর ন্যায় ভাবের প্রাধান্য এবং অনুপ্রাস ও যমকের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়।

টপ্পা—"টপ্পা" হিন্দী শব্দ—অর্থ সংক্ষিপ্ত। এই গান আকারে ছোট এবং বিশেষ সুরে গাওয়া হয়। গানের ভাষায় বলা যায়—ধ্রুপদ এবং খেয়াল হইতে সংক্ষিপ্ততর যে গান, তাহাই টপ্পা। অনেকের ধারণা আদি রস বিষয়ক গানই টপ্পা, কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ক্যাপ্টেন উইলার্ড বলিয়াছেন—"টপ্পা রীতির গান পাঞ্জাবের উষ্ট্রচালকদের জাতীয় সংগীত ছিল। প্রসিদ্ধ গায়ক শোরী মিঞা এই গান নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া উন্নত করেন।" রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু বাঙলাদেশে এই গানের প্রচলন করেন। হিন্দী টপ্পা গানকে তিনিই বাঙলা ছাঁচে রূপায়িত করেন। টপ্পা গানের মূলকথা যে দেহলোলুপ আদিরস সৃষ্টি, নিধুবাবুর গানও তাহা হইতে মুক্ত নহে। তবে তাঁহার রচনায় সক্ষম হাতের ছাপ রহিয়াছে। তাঁহার গানগুলি একদিন শৌখীন বাঙালী মহলে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল।

কথকতা—"কথকতা" বাঙলার প্রাচীন লোক-সংস্কৃতি। ইহা একপ্রকার নাট-গীত এবং ইহাতে কীর্তন ও গীতাভিনয়ের কিছুটা রূপ দেখা যায়। শ্রীধর কথকের জীবনকথায় পাই—"কথকতা-শিক্ষার কালে তিনি কখনও বালকের হাতে সন্দেশ দিয়া তাহা কাড়িয়া লইতেন, আর দুটি বিশাল চক্ষুর অন্তর্দৃষ্টিতে বালকের তখনকার সেই ভাব তুলিয়া লইতেন। আবার কখন-বা বৃদ্ধের দন্তহীন মুখের কথার ভাব গ্রহণের জন্যে কোন বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলিয়া নির্নিমেষে তাঁহার

যে অভিনব রূপ মুকুন্দ দিয়াছিলেন তাহার শ্রোতা-প্রিয় আকর্ষণী শক্তি, পোশাক পরিচ্ছদের ব্যয়-হ্রাসের লাভ প্রভৃতিতে প্রচলিত যাত্রাওয়ালাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় তাহারা কতকটা সংস্কারের পথে চলিতে আরম্ভ করিল। প্রাচীন যাত্রার দলে উচ্চাঙ্গ কাওয়ালাতী বা কাওয়ালী গান ও নায়ক ছিল দলের ভালমন্দের মাপকাঠি। সেই সকল কঠিন সুর তালের সমজদার শ্রোতাও তৎকালে আসর পূর্ণ করিয়া বসিত। অর্থ শতাব্দী পূর্বে শ্রোতাদের রুচি পরিবর্তনসহ ওস্তাদ সংখ্যাও হ্রাস হইতেছিল। প্রাচীন প্রথাকে আঁকড়াইয়া ব্যবসাদার দলগুলি জুরি নামক চোগা চাপকান পরিহিত একদল বয়স্ক গায়ককে মাঝে মাঝে দাঁড় করাইয়া যে সময় ব্যয় করিত তাহা ক্রমশ শ্রোতৃবৃন্দের তিক্ততা প্রকাশক মন্তব্য হৈ-চৈ ধ্বনিতেও থামিত না। সমবেত শ্রোতাদের পুনঃ পুনঃ অপ্রিয় মন্তব্যের মুখে অপরিসীম ধৈর্য-তিতিক্ষার কঠোর পরীক্ষা দিয়াও

রসনার গতি-প্রকৃতি ... পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করিতেন"—অমরেন্দ্রনাথ রায়, 'গিরিশ নাট্য-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য', কলিকাতা (১৯৩৮)। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত সোনামুখী নিবাসী গদাধর শিরোমণি ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথক। ভোলানাথ চক্রবর্তী কথকতার সৃষ্টি এইভাবে নির্দেশ করিয়াছেন—"শিরোমণি মহাশয় একস্থলে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। তিনি উত্তম ব্যাখ্যাতা ছিলেন। অন্যান্যস্থানে তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিতে বিস্তর লোক উপস্থিত হইত। কিন্তু ঐ স্থানে অধিক শ্রোতা আসিতেছে না দেখিয়া, শিরোমণি মহাশয় তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শুনিলেন নিকটে একস্থানে রামায়ণ গান হইতেছে, সেইখানেই লোক যাইতেছে। শিরোমণি বলিলেন, "আচ্ছা, সকলকে বলিবে, কল্য হইতে আমার নিকট ভাগবত গান শুনিতে পাইবে। পরদিন বৈকালে তিনি নূতন রীতির কথকতা আরম্ভ করিলেন। চারিদিক হইতে লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল, তাঁহার স্বরসংযোগ, বাক্যবিন্যাস, ব্যাখ্যা ও সঙ্গীত পদাবলী শুনিয়া লোকে বিস্মিত ও মোহিত হইল। ইহাই কথকতার প্রথম সৃষ্টি।' (১৮৭৫-এ প্রকাশিত "সেই একদিন আর এই একদিন"—গ্রন্থ)

পাঁচালী—অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে কবি, টপ্পা, আখড়াই ইত্যাদির মত "পাঁচালী" নামে এক ধরনের গান বাঙলাদেশে প্রচলিত ছিল। পাঁচালীর উদ্ভব সম্পর্কে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন—"পাঁচালীর উৎপত্তি স্থান পাঞ্চালী বা কনৌজ।" ডঃ সুশীলকুমার দে-র মতে 'পদচালনা' হইতে আসিয়াছে 'পা-চালি' এবং তাহা হইতে রূপান্তরিত হইয়া আসিয়াছে "পাঁচালী"। তিনি আরও বলিয়াছেন 'নাচাড়ী' হইতে আসিয়াছে 'পাঁচালী'। এই বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন। যাহাই হউক, পাঁচালী এক প্রকারের নাচ, গান ও আবৃত্তি। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্য ছিল গীতপ্রধান। রামায়ণ, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি কাব্যগুলি নৃত্য ও বাদ্য সহযোগে দলবদ্ধভাবে গীত হইত। অতি প্রাচীনকালে পঞ্চালিকা (পাঞ্চালিকা) বা পুতুলনাচের সঙ্গে এই ধরনের কাব্য গাওয়া হইত বলিয়া ইহার নাম দেওয়া হয় "পাঁচালী"। "পাঁচালী গানের উদ্ভব কীর্তন হইতে এবং কীর্তনের ঢঙে এই গান গীত হয়।" দাশরথি রায় বা দাশু রায় ছিলেন পাঁচালী রচয়িতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

একজনের পর একজন রাগিণী ধরিয়া অপরকে উপবেশনের সহিত সভামধ্যে শুক হুক্কায় তামুক সেবনের বিশ্রাম দিত। দাড়ি-গোঁফ কামান সীতাদেবীও কখন এই অবসরে তবলচীর কিছু সাহায্য করতঃ রাগিণী থামিবার সঙ্গে সঙ্গে অপরের হস্তস্থিত হুক্কায় সজোরে টান দিয়া মুখের ধূম সম্যক নিঃশেষিত হইতে না হইতে 'হা! রামচন্দ্র!' বলিয়া দণ্ডায়মান হইয়া রাগিণী কান্না কাঁদিতে আরম্ভ করিতেন। যাত্রার দলগুলির রাগিণী উপদ্রুত উনবিংশ শতাব্দীর বিদায়-কালীন একটি যাত্রাগানের সভায় বরিশালের সর্বজন পরিচিত ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বিট্সন বেল, যাঁহার পরিচয় আমরা প্রারম্ভেই পাইয়াছি, উপস্থিত ছিলেন। তৎকালে স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষগণ সম্ভ্রান্ত পরিচিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাড়িতে যাতায়াত করিতেন, সামাজিক নিমন্ত্রণ ও নিমন্ত্রণ রক্ষা উভয়পক্ষেই কর্তব্য বলিয়া বোধ হইত। বেল সাহেবের চরিত্র ছিল অভিনব ও স্বতন্ত্র। তিনি গানের আসরে দ্বিতীয়বার জুবীর উত্থান দর্শনে বলিয়াছিলেন—"বাহু মোক্তার লোগ্‌কো বৈঠ্‌কহো"। ইহারই কয়েক বৎসর পরে মুকুন্দের জুরী রাগিণীহীন একক গাহিবার প্রভাব যাত্রার দলওয়ালাদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বরিশালের 'নাগ দত্ত', 'সিংহ রায়', 'রুদ্র ও নট্ট' কোম্পানী প্রভৃতি যাত্রার দলগুলি এক এক সময় এক একটি বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দলরূপে বিভিন্ন জিলায় গান গাহিয়া কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই সমস্ত দলের দলপতি ও বিশিষ্ট অভিনেতাগণ মুকুন্দের বাড়িতে বিশ্রামকালে আলোচনার জন্য সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। ঐ সময় যাত্রার দলগুলির বিবিধ সংস্কারের আলোচনা চলিত। থিয়েটারের অনুকরণ হইতে যাত্রার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা, পালাগুলির দেশহিতকর রূপদান, সাজ-সজ্জা, খরচ, অভিনয়ের সময় অন্তত অর্ধেক করা প্রভৃতি ছিল মুকুন্দের পরামর্শ। ইহার পক্ষে-বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ খুঁটিনাটি আলোচনা বহুবার দীর্ঘকাল ব্যাপী হইয়াছে। মুকুন্দের যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিয়াও প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির আশঙ্কায় ব্যবসাক্ষেত্রে বিশেষ বাধার কারণ মনে হইত। তজ্জন্য দলপতি ও শক্তিমান চালকদের একটা কন্‌ফারেন্সের মত করিবার পরামর্শও একবার হইয়াছিল। সেই কনফারেন্স হয় নাই, কিন্তু মুকুন্দের আদর্শ ও পরামর্শ যাত্রার দলগুলি জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে কতকটা গ্রহণ করিয়াছে। এইখানেই মুকুন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব।

স্বয়ং মুকুন্দ নিজে যেভাবে দল চালাইতেছিলেন অনতিকালমধ্যে তাহারও রূপ পরিবর্তনের ইচ্ছা উদ্ভূত হইবার প্রথম কারণ আদর্শানুগ মনের মত লোকের

অভাব। শুদ্ধ চরিত্র সাধুভক্ত একত্র করিলে তো দল চলে না। প্রত্যেকটি লোক গান, বাদ্য, স্বর, তাল, অভিনয় প্রভৃতির যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া দুষ্কর। মুকুন্দ ভাবিয়াছিলেন নিয়মের কঠোরতার মধ্য দিয়া গান বাজনার ওস্তাদ অপরিহার্য লোকদের সংশোধন করিয়া লইবেন। কিন্তু পরিলক্ষিত হইল যে, স্বীয় জীবন ব্রতের ও প্রচার্য বিষয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বস্তু, হিন্দুর অস্পৃশ্যতা-বর্জনের অঙ্গটিও দলের তথাকথিত জনগণের একাংশ দুঃখজনকভাবে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে।

যাত্রার দলের বহুলাংশ লোকই তথাকথিত অস্পৃশ্য নিম্নশ্রেণীর মধ্য হইতে সংগ্রহ করিতে হয়, মুকুন্দের দলেও শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর কিছু আধিক্য থাকিলেও ঐ সংখ্যাও লঘু ছিল না। তদুপরি কয়েকটি অর্ধ-হিন্দু, অর্ধ-মুসলমান "নাকারসী" জাতীয় বালক যুবক ছিল। এই জাতিটির অবস্থা বেশ উপভোগ্য। হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় জাতির গোঁড়ামির মাঝখানে ইহারা এক রসাল উপায় অবলম্বনে স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া উভয় সমাজের মনোবৃত্তির ইতিহাস বহন করিয়া চলিতেছে। "চাকর" উপাধিধারী ডুলিবাহক, বস্ত্র বয়নকারী "জোলা" বা কারিগর, মৎস্যজীবী, "নাইয়া" প্রভৃতি কতিপয় জাতি হিন্দুর অবজ্ঞার বোঝা ক্রমশ কমাইয়া পূর্ণ মুসলমানত্বের সন্ধান পাইয়াছে, কিন্তু নাকারসী জাতি এখনও পারে নাই। উহাদের জীবিকাবৃত্তি প্রধানত বাজনাদারী, দ্বিতীয় 'ধোনকর' বা 'তুলা ধুননী'। মনে হয় নট, সঙ্গার, ভুঞ্ঞুমান্নীর মতই ইহারাও হিন্দুসমাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ সেবার কর্তব্য নির্বাহ করিয়াছে ও করিতেছে। যুগে যুগে অসংখ্য বল্লালীর কোন বল্লালী বোধ হয় একদিন তাহার অমোঘ অনুশাসনে ঐ জাতির কর্ণে শুনাইয়া দিয়াছিল,—জাতিচ্যুত কোন ব্রাহ্মণের পক্ষেও ধোপা, ভুঞ্ঞুমানী-কাপানীর মত যদিও হওয়ার অধিকারও তথাপি তাহাদের বংশাবলী নাকারসী জাতি কস্মিনকালেও পাইবে না। অসংখ্য অফুরন্ত বল্লালের মত কোন এক সময়ের একটি বাক্যদণ্ড, তাম্রশাসন, শিলা-লিপির ঐতিহাসিকতা অপেক্ষা জাতীয় প্রবহমান রক্তে বংশানুক্রমে দৃঢ়, অফুরন্ত রূপ দিয়া গ্রহণ করিয়াছে। বরিশাল জিলার শাতলা বিলের জনৈক কৃষকের নাম "নাসাই চেদরা।" জিজ্ঞাসা করা হইল, "চেদরা কি?" উত্তরে নাসাই সগর্বে বলিল,—"আজ্ঞে ওটা আমাদের বল্লাল সেনের দেওয়া উপাধি, কত্তা"! লিখিত ইতিহাস না থাকিলেও পূর্বপুরুষের সেই উপাধি প্রাপ্তির গল্পটি নাসাই তাহার পিতা-পিতামহের নিকট হইতে সঠিক জানিয়া রাখিয়াছে। গল্পটি এইরূপ—

একদা বল্লাল সেন জমি দেখিতে মাঠে আসিয়াছেন; একখানা জমির

নোংরা অবস্থা দেখিয়া তিনি সেই জমির চাষী, নাসাইর পূর্বপুরুষকে জমির অবস্থানুরূপে নাম উচ্চারণে বলিয়াছিলেন, 'আজ হইতে তোর নাম চেদরা।' স্বয়ং বল্লালের বাক্য শিরে ধরিয়া চেদরার বংশধরেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী উহাকে নামের ভূষণরূপে বহন করিয়া বিংশ শতাব্দীতে পৌছিয়াছে। যদিও এই শতাব্দীতে বহু মিস্ত্রি-মিত্র, মৃধা-মজুমদার, বারৈ-বসু হইয়াছে। ইহা ব্যতীত রায়, সরকার, সিংহ, মিশ্র প্রভৃতি নূতন উপাধি বরণ করিয়া একদল সংখ্যালঘু তথাকথিত ভদ্রলোকের ভ্রূকুঞ্চন হইতে মুহূর্তের জন্য আত্মরক্ষার পথ করিয়াছে। ম্যাট্রিক পাসের পর দিশা হওয়ায় অর্থ ব্যয়ে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া পদবী বদলাইবার একটা হিড়িক কিছুদিন চলিয়াছে। মণ্ডল, মাদবর, শীল, শিকদার, হালদার প্রভৃতি পদবীগুলি তো চেদরার মত কুৎসিত অর্থবাচক নয় কিন্তু, যে মনোবৃত্তি ঐ শব্দগুলিকে হীনার্থক করিয়াছে, তাহাদের অঙ্কেই মাথা লুকাইয়া আত্মগোপন প্রচেষ্টার মধ্যেও যে ভীরু দুর্বলতা রহিয়াছে, সমাজহিতকামীদের প্রত্যেক অংশের এবং সমবেত সমাজের পক্ষেও ইহা বিশেষ বিবেচনা করিবার প্রয়োজন মনে হয়। যে অবজ্ঞার চাহনি দেশজোড়া হিন্দুসমাজকে শত বিচ্ছিন্ন দুর্বলতম জাতিতে পরিণত কবিয়াছে, তাহার প্রভাব ইতিহাস বিস্মৃত হিন্দুস্থানের বিকারগ্রস্ত এই দেহের ডান-বাঁ হাতের স্বাতন্ত্র্য সম্পন্ন মুসলমানকেও উদার মুসলমানী বিভ্রান্ত করিতে সক্ষম হইয়াছে। সেই সংকীর্ণতা মুষ্টিমেয় 'নাকারসী' জাতিকে মধ্যপথে রাখিয়াছে, ডোমদিগকে বুকে তুলিতে দেয় নাই। বর্তমান হিন্দুসমাজ তাহার নাসিকা সজোরে রুদ্ধ করিয়া প্রিয়ের মৃতদেহকে শ্মশান সঙ্গমে বিদায়কালীন চীৎকারের মত "আমার-আমার' ধ্বনি করিয়া নিজেকে হাল্কা করিতেছেন, কিন্তু নিষ্ফলতায় অজ্ঞ বলিতে পারি না। মানুষ একটা অবলম্বন খুঁজিয়া পাইতে চাহে, সেই অনুসন্ধানে ধর্মের বা পরমেশ্বরের অদৃশ্য আশ্রয়ে শান্ত হয়। হিসাব-বেহিসাব ধর্মানুগ যে কোন সমাজের বিধি-ব্যবস্থা মানিয়া লয়। এই মানিয়া লইবার মাপকাঠি বিবাহ ও মৃত্যুতে পরিলক্ষিত হয়। নাকারসী জাতি হিন্দুদের উৎসবে, দেবার্চনায় সাহায্য করিয়া জীবিকার্জন করে, পুরোহিত হইয়াও বাড়িতে ধন ও শিল্পাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী-সরস্বতী পূজা করে। কিন্তু নমঃ, সাহা, পাটনী, কাপালীকুল শ্রোত্রীয়দের অস্পৃশ্য বর্ণ বিপ্রদ্বারা যে যজন-যাজনের অধিকারটুকু ভোগ করে নাকারসীরা তাহা হইতেও বঞ্চিত। একদা হিন্দুসমাজে দরদী উদারমনা ব্রাহ্মণ দ্বারাই বর্ণ বিপ্রের মূল গঠন হইয়াছিল, কিন্তু দাম্ভিক বল্লালী হিন্দু-শাসন সে উদারতাকে অস্বীকার করিয়া হীন-আখ্যা দান

করিয়াছে। সেই উদারতার স্মৃতিকে পদদলিত করিয়া তথাকথিত অস্পৃশ্য ব্রাহ্মণের বংশ অ্যাখ্যা দিয়াছে। পূর্বপুরুষের মহিমাময় লুপ্তপ্রায় গৌরবময় আদর্শের উপলব্ধিতে কৌশলী ডাকাতের মত হিন্দু ব্যবস্থা তীব্র ক্লোরোফরম্ প্রয়োগে অচেতন করিয়া ঐ গৌরবপূত বংশকে হেয় করিয়া রাখিয়াছে। তথাপি ঐ ত্যাগী পুরুষদের বংশধরেরাই সমাজের অজ্ঞাতে হিন্দুর অস্তিত্বকে পূর্ণ ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতেছে। এই আত্মত্যাগী ব্রাহ্মণবংশের নিকট ঋণ স্বীকারেব মনোবৃত্তি অদ্যাবধি গভীর অন্ধকারে বিরাজ করিতেছে। মুষ্টিমেয়, বর্ণবিপ্র ও বর্ণ নরসুন্দরকে হিন্দুসমাজ এই বিস্মৃত কৃতজ্ঞতাতে জাগাইয়া তুলিয়া লইতে পারিলে ম্যাজিকের মত অসংখ্য জটিলতা হিন্দুসমাজের বুক হইতে তিরোহিত হইয়া যাইত। যাঁহারা অনাগত রাজশক্তির প্রতীক্ষায় এই সমস্যাগুলিকে মুলতুবী রাখিবেন, যাঁহারা প্রচলিত শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নত ধারায় তুলিয়া সেই চাপে হিন্দুসমাজকে চাঙ্গা করিবেন ভাবিতেছেন, তাঁহারা সকলেই আংশিক সত্যের উপাসনায় আংশিক লাভ করিবেন। এই প্রতীক্ষার অবসরে ক্ষুদ্র, অজ্ঞাত জাতিকে আম্বেদকারের অনুগামী করিবার অবসর মাত্র দিবেন। নাকারসী জাতি বল্লালীর ফলে হিন্দু বন্ধনের জটিল অধ্যায় কাটাইয়া দূরে সরিয়াও পশ্চাতে চাহিয়া দেখিতেছে। উপায়ন্তরবিহীন নাকারসী-সমাজ বর্তমানে মৃত্যুব পর 'জানজো' ও বিবাহের "সরা" শ্রবণে ঠিকা মৌলবীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। একই নাকাবসী গৃহে ইসমাইল, যোগেশ, মনিরদ্দী, মলিয়া, মথুরা প্রভৃতি নাম বিরাজ করিয়া উভয় সমাজের দুর্বলতার সাক্ষ্য দিতেছে।

মুকুন্দের যাত্রার দলে এই 'নাকারসী' শ্রেণীর কয়েকটি গায়ক বাদক ছিল। মুকুন্দ ইহাদের বিশেষ আদর-যত্ন করিতেন। ইহাদের খোঁজ-খবর লইয়া বন্ধুদের সহিত এই নাকারসী জাতির অবস্থা আলোচনা করিতেন। মুকুন্দ ছিলেন হিন্দুর অস্পৃশ্যতা বিরোধী, ধর্মে ছিলেন সমন্বয়বাদী - প্রাচুর্য বিষয় নিজ জীবনে, ঘরে বাহিরে অসঙ্কোচ পালনকারী। বাড়ির মুসলমান মালীকে গৃহ মধ্যে কোবান পাঠের সুযোগ দিয়া, মালী ও নাকারসী বাহিত অন্নভোজন করিয়া, হিন্দু দেবদেবী পূজনে মুকুন্দ তদীয় জীবন-প্রণালীর সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছেন। বাড়ির পুকরের ঘাটলায় মুসলমান পথিক 'নামাজ' পড়িতেন, উহা দর্শনে মুকুন্দের গভীর আনন্দ হইত। নামাজান্তে তাহাদের বিশ্রাম ও তামাক খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিতেন। বহির্বাটীর নিজ বাসগৃহের সন্নিকটে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা সংলগ্ন করিয়া সিমেণ্ট করা একখানি

নামাজ ঘর তুলিবার ইচ্ছা ছিল। পরিকল্পনা শ্রবণকারীদের মধ্যে কেহ কেহ বাড়িতে এই কার্যের বিষময় পরিণাম অকাট্য যুক্তি ও দৃষ্টান্তের সহিত শুনাইয়াছেন। উত্তরে মুকুন্দ বলিতেন, "অটুট অধিকার দিবার জন্যই তো ইহা বলিতে চাই।" মুকুন্দ যাহা করিতে চাহিয়াছেন, কালের কুটিলচক্র তাহাতে হিন্দুর দিক হইতে বাতুলতা বলিবার সুযোগ হইয়াছে। একটু পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই, এই দেশের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের একে অপরের ধর্ম সম্বন্ধে শুধু সহিষ্ণু নয়, গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ক্ষেমানন্দ[১১২] রচিত মনসামঙ্গল নামক প্রাচীন পুঁথিতে দেখা যায় লক্ষীন্দরের বাসরগৃহকে নির্বিঘ্ন করিবার হিন্দুয়ানী ব্যবস্থার সহিত একখানি কোরান রাখা হইয়াছিল। বহু মুসলমান কবির হিন্দুধর্ম সম্বন্ধীয় শ্রদ্ধাপূর্ণ গাঁথা লইয়া বাংলা ভাষা ও হিন্দু জাতি গৌরবান্বিত। মুকুন্দের বাসভূমি বরিশালের 'জারি গায়ক' আলাম আকুবরের সঙ্গীতাবলী অদ্যাপিও হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের পূর্ণাঙ্গ উৎসবে অপরিহার্য। অর্ধ-শতাব্দীর পূর্বে মনসা, শীতলা, কালী পূজায় মুসলমানদের যোগদান, মানত করা, পাঁঠা ও পুজোপকরণ প্রদান, দুর্গোৎসবে নববস্ত্র পরিধান লক্ষ্মী পূজায় গৃহে আলপনা ও পূজায়োজন, মক্কা যাত্রার দিন দেখাইতে ঠাকুরবাড়ি গমন প্রভৃতি যেন চক্ষুর উপর জীবন্ত ভাসিতেছে। অদ্যাপিও বোধ হয় 'নলচিরা' গ্রামে মুসলমান জমিদারের খরচে দুর্গোৎসব সম্পন্ন হয়। মুসলমান সমাজের সর্ব বিষয়ে প্রবীণ সায়েস্থাবাদের জমিদার বাড়ির কর্মচারীবর্গের ধর্মে কর্মে অকপট স্বাধীনতা ও গুণের সম্মান দান বিস্মৃত হইবার নহে। যে অদৃশ্য মোহনকাঠির স্পর্শে হিন্দু-মুসলমানের সম্মুখে ধীর পরিবর্তিত চিত্রপট উদ্ভাসিত হইয়াছে, সেই পট পশ্চাতের ইতিহাসকে ঢাকিয়া বিভেদের জয়ঢাক বাজাইয়া কর্ণ বধির করিতেছে। অভিনয় সাঙ্গের পরেও কানাকানি মুক্ত করিতে সময় লাগিবে, ধর্মের নামে মানুষে মানুষে এই যে সৃষ্ট ভেদ চালাইবার অমানুষিক অবস্থা

১১২। ক্ষেমানন্দ—মনসামঙ্গলের কবি ক্ষেমানন্দের প্রচলিত নাম—কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। কবির আসল নাম—ক্ষেমানন্দ। কেতকাদাস (মনসার দাস) তাঁহার উপাধি। মনসার ভাসান গান পূর্ববঙ্গেই অধিক সমাদার লাভ করিয়াছে। তজ্জন্য মনসামঙ্গলের অধিকাংশ কবি পূর্ববঙ্গের লোক। পশ্চিমবঙ্গে মনসার ভাসান গান লিখিয়া যাঁহারা খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেতকাদাস—ক্ষেমানন্দ শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার কাব্য সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রচিত। কবির নিবাস বর্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামে। তিনি জাতিতে কায়স্থ। তাঁহার কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য আন্তরিকতা, বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গী, রীতিনীতি ও ভৌগোলিক সংস্থানসমূহের বিশদ বর্ণনা। তাঁহার কাব্যটির ভাষা বেশী "মাজা ঘষা"।

চলিতেছে সেই ক্ষেত্রে মুকুন্দের নামাজগৃহে পরিকল্পনা বাতুলতা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিলে আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। মুকুন্দ "শুদ্ধি" বিশ্বাসী ছিলেন না, সেই বিশ্বাস থাকিলে মুকুন্দের শক্তি ও প্রভাব নাকারসী সমাজে প্রয়োগ দ্বারা পরিবর্তন ঘটাইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু মধ্যপথে দণ্ডায়মান নাকারসীদের তিনি ধর্মের নামে কোন দিকে না টানিয়া আপন গতিতে চলিতে দেওয়াই কর্তব্যবোধ করিয়াছিলেন। শক্তিসম্পন্ন হিন্দুর এবংবিধ ঔদাসীন্য মুকুন্দকে নবসৃষ্ট হিন্দুসভার নিকট অপ্রশংসিত রাখিয়াছে। মুকুন্দের নাকারসী প্রীতি দলমধ্যে আর একটি ভাগের বৃদ্ধি করিল। তথাকথিত অস্পৃশ্যদের ব্রাহ্মণাদির স্পৃষ্ট পংক্তিতে স্থান প্রাপ্তির দাবীদার সত্ত্বেও নাকারসীর গাত্রস্পর্শ ব্রাহ্মণ্য চিন্তার বিরোধী ছিল। এই ত্র্যহ বা চতুস্পর্শ মুকুন্দকে ক্ষুব্ধ ব্যথিত করিত। এই ভাবাপন্ন লোক লইয়া দল চালানজনিত অস্বস্তি ও অপমানবোধ যেন তাঁহার সহ্যের মাত্রা অতিক্রম করিয়া যাইতেছিল। অনতিকালমধ্যে দলের মূর্তি পরিবর্তনের যে পরিকল্পনা চলিতেছিল তন্মধ্যে এই কারণটিও ছিল অন্যতম প্রধান। যাত্রা, জারি, কবি, ঢপ প্রভৃতির দলগুলি চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত শ্রোতার মাঝখানে অবস্থান করিয়া সঙ্গীতাভিনয় সম্পন্ন করেন। বাজনাদার ও একদল গায়ক সর্বদাই আসরে উপবিষ্ট থাকেন। অভিনেতাদের আগমন প্রস্থান থাকিলেও গানের সময় কতিপয়কে ঐ স্থানেই উপবিষ্ট থাকিতে হয়। ঐ জনবেষ্টিত আসরে উপবিষ্ট অবস্থায় ধূমপানের রীতি প্রচলিত। অভিনেতার ধূমপানের হাস্যোদ্দীপক দৃশ্য ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। মুকুন্দের দল প্রথমাবধি কঠোরানুশাসনে এই প্রথা রুদ্ধ করিয়াছিলেন। এইরূপ আরও কতকগুলি অনুশাসনে দলের লোকদের উপর ছিল ও যথাসম্ভব পালিত হইত, কিন্তু অস্পৃশ্যতা বর্জনের অনুশাসনে ব্যর্থ হইয়াছে। যাত্রার দলরূপী উৎকৃষ্ট প্রচারযন্ত্রকে শুদ্ধ, সহজ, অনাড়ম্বর, অনায়াসলভ্য করিবার প্রচেষ্টার সঙ্গে নিজের দলকে ঢপ, কথকতা, যাত্রা সমাবেশে চারিজন মাত্র লোকের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে আনিয়া সর্ব বিষয়ে একটি ঘনীভূত আদর্শ দল গড়িবার উদ্যোগ চলিতেছিল। ঐ ভাবানুরূপ পালা সৃষ্টি সবভারতে প্রচারকার্য চালাইতে প্রত্যেকটি পালার হিন্দী অনুবাদ করাইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। দিল্লী জেলে অবস্থানকালে হিন্দি ও উর্দুতে অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন। কিন্তু লিখিতে পারিতেন না। পালার হিন্দী অনুবাদকার্যে একজন যোগ্য সাহায্যকারীর অনুসন্ধান এবং আলোচনাও করিতেছিলেন। তাঁহার হিসাবে

সংসার চালাইবার মত জমিজমা খরিদ শেষ হইয়াছে, কয়েকটি আত্মীয়ের বাড়ি-ঘর করিয়া দিয়াছেন এবং মাতার শ্রাদ্ধের জন্য কতক টাকা গচ্ছিত রাখিয়া অবশিষ্ট জীবন আশ্রম, মন্দির ও আশ্রমাবলম্বনে পরিকল্পিত গঠনমূলক কার্যে সর্বতোভাবে স্বীয় শক্তিকে নিয়োজিত রাখিয়া তিনি জীবনের কর্তব্য শেষ করিবার উদ্যোগে করিতেছিলেন। বৃহৎ দল পরিচালনের ঝঞ্ঝাট লঘু হইলে বিশ্রামাদির অবসর দ্বারা জীবন পরিসর সুদীর্ঘ হইবার আশাও করিতেন। চারিজনের দ্বারা নবগঠিত দলে ব্যবসাদারীর চিহ্ন মুছিয়া সুপ্রাচীন ভাগবত পুরাণাদি পাঠকের মত স্বেচ্ছাদানের উপব চলিবেন এই আকাঙ্ক্ষা ছিল। বায়না স্থির করিতে, দর কষাকষির অবস্থাটা মুকুন্দকে অস্বস্তি দিতেছিল, কিন্তু দ্রুত প্রয়োজনবৃদ্ধির চাপ, তাঁহাকে সম্ভাব্যস্থানের টাকা আর কয়েকদিন মাত্র কুড়াইয়া আনার প্রবোধ যোগাইয়া ঐ দরাদরির প্রথাকে বজায় রাখিতেছিল।

মুকুন্দের উপার্জিত অর্থে বিভিন্ন স্থানের বহু সংখ্যক বিবাহ ও শ্রাদ্ধ-শান্তি সম্পন্ন হইয়াছে। স্বীয় গণ্ডী অঙ্কিত সংসারে চারিটি বিবাহ তাঁহার অর্থব্যয়ে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যেকটি বিবাহে প্রচুর অর্থ খরচ হইয়াছে, কিন্তু স্বীয় ইচ্ছাকে বাধ্য হইয়া নির্যাতিত হইতে দিয়াছেন। সম্বন্ধাদি স্থির হইবার পরে তিনি জ্ঞাত হইয়াছেন এবং অনুকূল যুক্তি চেষ্টার কৌশলী আয়োজনে তাঁহার সম্মতি আদায় করা হইয়াছে। বংশগত কৌলিন্যের আর্থিক মাপকারী গুণহীন বংশ সৃষ্টির সুযোগের সহিত যে দণ্ডের পূজা আদায় আজও চলিতেছে —তৎপ্রতি মুকুন্দের বিতৃষ্ণা সর্বজন পরিচিত। কিন্তু পুত্রের বিবাহ কায়স্থ-সমাজের শ্রেষ্ঠ কুলীন কন্যার সহিতই হইয়াছে। মৃতদার মুকুন্দ, এক পত্নীত্বের মর্যাদা, মৃতা পত্নীর প্রতি অটুট শ্রদ্ধা প্রীতির নিদর্শনরূপে ধর্মবোধে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন কিন্তু বিবাহের প্রতি তাঁহার যে কোন অশ্রদ্ধা ছিল না, তাহা বিভিন্ন স্থানের কন্যাদায়গ্রস্তের সাহায্যে পরিস্ফুট রহিয়াছে। বিবাহিতের আদর্শ জীবন গঠনকল্পে একদল ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীর প্রয়োজনীয়তা মুকুন্দ উপলব্ধি করিতেন। এই মনোভাব তদীয় কথাবার্তা, অভিনীত পালা ও মহিলা আশ্রম পরিকল্পনায় সর্বজনবিদিত ছিল। স্বীয় কন্যা এই আদর্শের কথা শুনিয়া পিতৃসন্নিধানে তদুপযোগী শিক্ষা প্রাপ্তির ইচ্ছা জানাইয়াছেন। আনন্দে উৎসাহে নিজ কন্যাকে শিক্ষিত করিবার জন্য শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবীর নিকট কিছুকাল রাখিবার পর বরিশালের শিরোভূষণ আচার্য জগদীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যও গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্তী সময়ে ব্যর্থ মনোরথ পিতার অসহযোগী ভাবের মধ্যে নিয়মরক্ষার জন্য সমারোহশূন্য

নীরবতার ভিতর কন্যার বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল। ভ্রাতা ও পুত্রের বিবাহে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া উৎসব নির্বাহ করিয়াছিলেন। ভ্রাতা নববধূর সহিত বাড়িতে আগমনকালে বরিশাল স্টীমারঘাটে নিজে উপস্থিত হইয়া চিরাচরিত প্রথা ভাঙিয়া শোভাযাত্রা সহকারে পায়ে হাঁটিয়া নবদম্পতিকে গৃহে আনিয়াছিলেন। ভ্রাতা ও ভ্রাতৃ-বধূকে স্টেশনে সর্বপ্রথম আশীর্বাদ করিলেন বরিশালের মাটিদ্বারা তিলক করিয়া দিয়া। বরিশালের মাটির এই গৌরবে শিক্ষাদাতা, অতুলনীয় লোকশিক্ষক অশ্বিনীকুমার স্বয়ং। নির্বাসন যাত্রায় শ্বেতাঙ্গ পুলিসের প্রহরায় গাড়ি হইতে লঞ্চে উঠিবার প্রাক্কালে অগণিত জনতার উদ্বেল দৃষ্টির মুখে নদীকূল হইতে মৃত্তিকা তুলিয়া ললাটে তিলকধারণ করতঃ জনতার দিকে ফিরিয়া যুক্তকরে বিদায় লইয়া লঞ্চে আরোহণ করিয়া চৌদ্দমাসকাল অদৃশ্য ছিলেন। মুকুন্দ-জীবনে সেই শিক্ষা আমরণ প্রতিপালিত হইয়াছে।

গৃহে এক জ্যেঠাইমা (জ্যাঠিমা) ছিলেন নিঃসন্তান বিধবা। 'জ্যাঠিমার' ধ্যান-জ্ঞান ছিল মুকুন্দের সংসার মঙ্গল। মুকুন্দও তাঁহাকে মায়ের মতই সম্মান দিতেন। ঐশ্বর্যের প্রথমারম্ভে কারাপ্রত্যাগমনের তিন বছর পরে আলেকান্দার বাসায় পিতার মৃত্যু হইলে সেই শ্রাদ্ধে দুই সহস্রাধিক টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। মাতৃসমতুল্যা জ্যেঠাইমা'র শ্রাদ্ধে ব্যয় হইয়াছিল পাঁচ সহস্রাধিক টাকা। এই শ্রাদ্ধের একটা বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে উল্লেখ করি।

তখনও হরিজন আন্দোলন আরম্ভ হয় নাই, যে আরম্ভের পাঁচ বৎসর পূর্বে মুকুন্দ জনৈক বন্ধুসহ শহরে নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইয়া সমগ্র শহরের মুচি, মেথর, ডোমদের ঘরে ঘরে উপস্থিত হইয়া যুক্তকরে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। ডোম-মেথরদের নিকটে এবম্বিধ নিমন্ত্রণ এক অভিনব ব্যাপার। দূর-দূরান্তে নিমন্ত্রণের নাম শুনিলে যাহারা দ্বিপ্রহর হইতে রাত্র পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া, উচ্ছিষ্ট মিশ্রিত অবশিষ্টাংশ হইতে কখনও প্রচুর, কখনও উপকরণহীন কিছু অন্ন সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাবর্তন করে, দ্বিপ্রহরকাল পর্যন্ত লোলুপ অপেক্ষমাণ ঐ বেচারীদের প্রতি মুহুর্মুহুঃ 'দূর-দূর' ভৎর্সনাই এই উভয়পক্ষ ন্যায্য দেনা-পাওনা বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। সেই ডোম, মেথরদের বাড়ি-বাড়ি উপস্থিত হইয়া নিমন্ত্রণ ও শেষ পর্যন্ত উচ্ছিষ্টটাও নিতে না দেওয়া, ঐ সম্প্রদায়সমূহ মধ্যে এক অভিনব আত্মসম্মান বোধ জাগ্রতের সূচনা করিয়াছিল। আচার্য জগদীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রাদ্ধ-বাসরের এই মধুর আয়োজনে আনন্দে বিহ্বল হইয়া বলিয়াছিলেন,—"মুকুন্দ। এ বুদ্ধি পাইলে

কোথায়?" মুকুন্দ অদূরে দণ্ডায়িত ঐশ্বর্যহীন এক বন্ধুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,—"এই আমার বুদ্ধি।" জনতার ভিড়ের মধ্যে সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ জনৈক মহাপুরুষের আশীর্বাদী গৌরবকে অসঙ্কোচে অপরের ঘাড়ে চাপাইয়া দিবার উদার মনোবৃত্তি সেদিন মুকুন্দকে উপস্থিত সকলের নিকট অধিকতর মহৎ করিয়াছিল।

মাতার মৃত্যুতে ন্যূনকল্পে দশ সহস্র টাকা ব্যয়ের একটা পরিকল্পনা ছিল, সেই পরিকল্পনায় প্রচলিত শ্রাদ্ধ পদ্ধতির নিয়ম রক্ষা করিয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের নবরূপদানের প্রবল অভিলাষ ছিল। মহাকাল সেই রঙীন পরিকল্পনাকে মূর্তি দেওয়ার অবসর দেন নাই।

গণ্ডীর বাহিরে বিবাহ এবং শ্রাদ্ধে মুকুন্দের মুক্তহস্তে গোপন ও প্রকাশ্যদানের উল্লেখ করিব, উহা ভিতরের না বাহিরের তাহা বলিতে পারিব না। গুরু অশ্বিনীকুমারের শ্মশান-শয্যায় মুকুন্দ উপস্থিত ছিলেন—যথাসময়ে আত্মীয়-স্বজনগণ শ্রাদ্ধ দান ভোজনাদি সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিলেন। রক্ত-সম্পর্কহীন শিষ্য বা পুত্র মুকুন্দ গঠনমূলক কার্যের জন্য বরিশালের স্বরাজ সেবক সঙ্ঘের হস্তে এক সহস্র টাকা দান করিয়া তদীয় কর্তব্য নিষ্পন্ন করিয়া লোকের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত অশ্বিনীকুমারের একখানি মর্মরমূর্তি বরিশাল টাউন হলের (পরিবর্তিত নাম অশ্বিনীকুমার হল) সম্মুখে স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ঐ কার্যের জন্য তিনি কতক টাকা আরও দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, কিন্তু মুকুন্দের মৃত্যুর পর তাহার আঁর কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় নাই। মুকুন্দদাস বরিশালের কাশীপুরে প্রচুর ব্যয়ে কালী মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখন সেই ইষ্টের কাছেই প্রার্থনা—

"কবে যে ভারতে আসিবে সেদিন
ভেবে তা মুকুন্দ দিন দিন ক্ষীণ
আজ কাল বলে কেটে গেলে দিন
দিন পেলে লীন হতেম চরণেতে।"

"লীন" হইবার সেই দিনটি মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সেই যেন উপস্থিত হইল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

"যেতে নাহি দিব"

মানুষ মরণশীল। জন্মিলে মরিতে হবে, "অমর কে কোথা কবে?" তথাপি মানুষের চিরকালের কামনা—"I will not let thee go"—"যেতে নাহি দিব"। অক্ষুণ্ণ প্রেমের গর্বে ভীমকান্ত মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়াও মানুষ তাহার প্রিয়জনকে চিরকালের জন্য বাঁধিয়া রাখিতে চায়। "এ গতির বিরাম নাই, শেষ নাই।" পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে আমরা সকলেই অভিনেতা-অভিনেত্রী। যাহার যখন অভিনয় শেষ হইয়া যাইবে, তাহাকে তখন সমস্ত আবেদন নিবেদনকে উপেক্ষা কবিয়া, প্রিয়জনের স্মৃতিবিজড়িত চিব-পরিচিত সংসারকে পশ্চাতে ফেলিয়া "একলা চল বে" বলিয়া অগ্রসব হইতে হইবে মহাপ্রস্থানের পথে। পশ্চাতেব পৃথিবী ব্যথায়-বেদনায়, শোকে-দুঃখে মুহ্যমান হইয়া পড়ে, আর বুকফাটা ক্রন্দনে ও আর্তনাদে আকাশ-বাতাসকে মথিত করিয়া তোলে এবং বলে—"যেতে নাহি দিব।" তবু "যেতে দিতে হয়", "তবু চলে যায়।" থাকে শুধু স্মৃতি—হয সে কাঁদায়, আর না হয "কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল" হইয়া বাঁচিয়া থাকে। সভ্যতার শাসননিয়ম, সভ্যতাব কৃত্রিম শৃঙ্খল যতই আঁট হয়, হৃদয়ে হৃদয়ে স্বাধীন মিলন, প্রকৃতিব অনন্ত ক্ষেত্রের মধ্যে ক্ষণকালেব জন্য রুদ্ধ হৃদয়ের ছুটি ততই প্রয়োজন হইয়া পড়ে। আর তখনই "অসমাপ্ত পরিচয় ও অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি" বাখিয়া আমাদের অবসর গ্রহণ কবিতে হয়। এমনি কবিয়াই চলিয়াছে—

"নূতন করিয়া বসা আর ভাঙা পুরানো হাটের মেলা,
দিবসরাত্রি নূতন যাত্রী, নিত্য নাটের খেলা।"[১১৩]

১৩৪০ বঙ্গাব্দ। পূজায় বায়না জেলান্তরে ও কালীপূজার বায়না স্বজেলায় "নলচিড়ায়" স্থির হইয়াছে। দুই বৎসর যাবৎ মুকুন্দদাসের শরীর মাঝে মাঝেই অসুস্থ হইতেছিল। আর অসুস্থতার জন্য মাঝে মাঝে দল বন্ধ রাখিয়া চিকিৎসা ও বিশ্রাম করিতে হইয়াছে। এবারের বর্ষাকালীন বিশ্রামও তেমন সুখকর হয় নাই—একাধিকবার জরাক্রান্ত হইয়াছেন। নিজেকে

১১৩। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত —"হাট" কবিতাটি ১৩১৭-১৩২৯ বঙ্গাব্দে লিখিত "মরীচিকা" কাব্যগ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত হয়।

সর্বতোভাবে বাদ দিলে দল চলে না। তাই শারীরিক দৌর্বল্য উপলব্ধি করিয়া নিজের অভিনয় ও সঙ্গীতের কতকাংশে সহকারীরূপে একজনকে দাঁড়াইবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন। চিকিৎসক ও বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হইতে ঔষধ ও সতর্কতার রক্ষাকবচ লইয়া যথাসময়ে জেলান্তরের পূজা-গান শেষ করিয়া অন্যত্র দুই-এক পালা গাহিতেই জ্বরাক্রান্ত হইয়া বরিশালে প্রত্যাবর্তন করিলেন। বরিশালে সুস্থ হইয়া "নলচিড়ায়" কালীপূজার বায়না গাহিবার বন্দোবস্তে দল ছুটি দিলেন। কিন্তু জ্বর নিরাময় হইতেছিল না, তথাপি দলসহ পূর্বদিনে নৌকায় রওনা হইলেন এবং আসরে একবার কোনরকমে দেখা দিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। দলের লোকেরা পূর্ব বন্দোবস্তানুযায়ী কোনরকমে পালা শেষ করিয়া দলপতিকে লইয়া বরিশালে প্রত্যাবর্তন করিলেন। জ্বর আরোগ্য হইল, কিন্তু দুর্বলতা দূর হয় না, পূর্ণ বিশ্রামের দরকার। সেই বিশ্রামের সম্য অন্তরায় দলের ত্রিশজন লোকের পারিবারিক অন্ন-সংস্থানের দায়িত্ব। কিছু সুস্থ হইয়া অনতিকালমধ্যেই দল লইয়া বাহির হইলেন। দল চলিতে লাগিল—জ্বরাক্রান্ত না হইলেও শরীরের দুর্বলতা যথেষ্টই ছিল। বৈষয়িককার্যে একবার তিনদিনের জন্য দল রাখিয়া একক বরিশালে ফিরিলেন। কার্যান্তে রওনা হইবার দিন পুকুরে স্নান করিতে করিতে জনৈক বন্ধুকে বলিলেন—"এভাবে আর বেশী দিন চলিবে না।" —এই বলিয়া বিভিন্ন স্থানের দৈহিক জীর্ণতা দেখাইয়া বলিলেন,—"এত কাজ করো, ছেলেটাকে একটু বুঝাইয়া দলে পাঠাইতে পারো কিনা দেখিও, বলিও আর কিন্তু সময় নাই" ইত্যাদি। কথাগুলির মধ্যে একটা করুণ আবেদন ছিল—যেন মৃত্যুর নিঃশব্দ পদসঞ্চারের ধ্বনি তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন। কটিদেশ পর্যন্ত জলমগ্ন অবস্থায় একজনকে একটি তুলসী পাতা আনিতে বলিলেন,—তুলসী পাতা হাতে লইয়া "আচ্ছা, যাও" বলিয়া বন্ধুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। অস্ফুট অজ্ঞাত এক আশঙ্কাযুক্ত হৃদয়ভার লইয়া বন্ধুকে নমস্কার জানাইয়া ধীরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই সময়টা ফাল্গুনের প্রথম। বরিশালে ও তত্রস্থ বন্ধু-বান্ধবের নিকট এই শেষ বিদায়—শেষ যাত্রা! শেষ বাণী!

"মুকুন্দ বলিছে কেন কাঙাল সেজেছ
তোমরাই পারো নাকি
পরিতে বীরের সাজ।

দেখাতে পারো নাকি,
বোঝাতে পারো নাকি,
এ জগতে ভারতবাসীর
কতটুকু অধিকার।”

১৩১০-১৩৪১ বঙ্গাব্দে—যাত্রারম্ভের ত্রিংশ বর্ষ। দল মাঝে মাঝে ছুটি দিতে বাধ্য হওয়ায় আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল চলিতেছিল। দলের গায়ক-বাদকদের বৎসরে আটমাস কাজ ও মাহিনা দেওয়ার রীতি—কম হইলে গরীব বেচারীদের খুবই অসুবিধা হয়—নিজেরও অভ্যস্ত দান-ধ্যানে সঙ্কোচের অসুবিধা বোধ হইতেছে। তাই স্থির করিলেন দল ছুটির নির্ধারিত দিনগুলির কতকাংশ কলিকাতায় ব্যয় করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ কবিয়া বরিশালে প্রত্যাবর্তন কবিবেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যও ত্বরান্বিত হইল। ১৩৪১ সালের বৈশাখ মাসে যাত্রাভিনয়ের আহ্বানে তিনি কলিকাতায় আসেন এবং কলিকাতাস্থ—১৯, গোপাল নিয়োগী লেনে একটি বাড়ি ভাড়া করিয়া দলসহ বিভিন্ন স্থানে গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন, পয়সাও আসিতে লাগিল। ১৩৪১ সালে ৩রা জ্যৈষ্ঠ বেলেঘাটায় এক বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া রাত্রি প্রায় ১২টায় গৃহে ফিরিলেন। সেবক কালীচরণ নট্ট যথানিয়মে শয্যাদি ঠিক করিয়া বিছানার পার্শ্বে বসিয়া গা টিপিয়া দিতেছিলেন। তাহাকে লক্ষ্য কবিয়া মুকুন্দদাস বলিলেন,—“আমার শরীরটা খুব খারাপ লাগছে, আমি ঘুমোবার চেষ্টা করি, আমি না ওঠা পর্যন্ত আমাকে ডাকিস না।” এই বলিয়া তিনি তাঁহার একছড়া চন্দনের জপের মালা ছিল, তাহা লইয়া নামজপ করিতে লাগিলেন। এই দিকে পদসেবা করিতে করিতে কালীচরণেব ঘুম আসিতেছে দেখিয়া মুকুন্দদাস তাহাকে শুইতে বলিয়া নিজে পাশ ফিরিয়া শুইলেন—কালীচরণ মশারি ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।

১৩৪১ সালের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ জাতির ইতিহাসে, বিশেষ করিয়া যাত্রা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিন ভারতবিখ্যাত চারণ-সম্রাট মুকুন্দদাস বাঙলার প্রতি ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বাণী পৌঁছাইয়া দিয়া দেশবাসীর নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, বেলা হইয়াছে, মুকুন্দদাস শয্যা ত্যাগ করিতেছেন না। এইদিকে ঐ দিন সন্ধ্যায় হাওড়ায় এক গানের বায়না ছিল। তাই জিনিসপত্র লইয়া যাইবার জন্য এবং ভাড়া ঠিক করিবার জন্য একটি লরীর ড্রাইভার সকাল হইতেই আসিয়া বসিয়া আছেন। বিলম্বটা একটু অস্বাভাবিক মনে হওয়ায়

এবং ড্রাইভার পুনঃ পুনঃ তাগাদা দেওয়ায় নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কালীচরণ বাধ্য হইয়া মুকুন্দদাসকে ডাকিতে আসিলেন। অতি সন্তর্পণে মশারি তুলিয়া পায়ে হাত দিতেই অভিজ্ঞ কালীচরণ চীৎকার করিয়া উঠিল,—"আপনারা শীঘ্রই আসুন, কর্তা বুঝি নাই।" সকলেই ছুটিয়া আসিয়া দেখিল—সেই বীরবপু চাঞ্চল্যের কোন চিহ্ন শয্যায় বা দেহে না লইয়া নিশ্চিন্তে নিদ্রামগ্ন। এই চিরনিদ্রা কত শান্ত! জপের মালাটি হাতেই রহিয়াছে, যেন বলিতেছেন, "জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো" এবং "প্রাণ যেন যায় সখি নামেরই সনে।" শিয়রে টাঙানো কালীমূর্তিব সামনে আত্মনিবেদনের ভাবটি কত সুন্দর :—

"বড দয়া তব শুনি কাঙালেতে
নিবেদন করে রাখি চরণেতে
চরণ-যুগল দেখিতে যেন
মুকুন্দের খেলা হয় মা ভঙ্গ।"

বিদ্যুৎ চমকের মত এই সংবাদ সারা কলিকাতায় ছডাইয়া পডিল। ডাক্তার আসিল, আত্মীয়-স্বজন আসিল, অনুরাগী বন্ধু-বান্ধব সকলেই আসিল এবং সকলেই দেখিল মুকুন্দদাস যেন "বিশ্বরাজের চরণতলে লভিল নির্বাণ।"

মুকুন্দদাসের পুত্র কালীপদ দাস তখন বরিশালে। টেলিগ্রাম মাবফত পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তিনি কলিকাতায় আসিলেন এবং মহাসমারোহে কেওড়াতলা শ্মশানে পিতার শেষকৃত্য সম্পন্ন করিলেন। তাহাব পর দলবলসহ জিনিসপত্র লইয়া কালীপদ দাস বরিশালে চলিয়া গেলেন। মুকুন্দদাসেব নিজের যাত্রাদলের এইখানে সমাপ্তি ঘটিলেও তাঁহার গানের সমাপ্তি ঘটিল না। কান পাতিয়া শুনিলে আজিও শোনা যায় মুকুন্দদাসের সেই উদাত্ত আহ্বান—

"জাগতে হবে, উঠতে হবে, লাগতে হবে কাজে।
জগৎ মাঝে কেউ বসে নাই, মোদের কি ঘুম সাজে॥"
তাই—"বান এসেছে মরা গাঙে খুলতে হবে নাও
তোমরা এখনও ঘুমাও।"

জাতি জাগিল এবং দেখিল পুরুষসিংহ মুকুন্দদাস এপারের নৌকা খুলিয়া দিয়া ওপারের পথে পাড়ি দিলেন। দেশবাসী যেন দেখিল এক মহান আত্মা জ্যোতির্ময় মূর্তিতে পঞ্চভূতে মিলিয়া গেল। কিন্তু তাঁহার দেশাত্মবোধ গান ও স্বদেশীযাত্রা "কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল" হইয়া রহিল।

বহু বৎসর পূর্বে মুকুন্দদাস সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের যে ছবি গানের মাধ্যমে রূপ দিয়াছিলেন হাজার পরিবর্তনের মধ্যেও তাহার মূল রূপটির যেন কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। আজিও—

"মানুষ নাই রে দেশে।
আছে যাহা কেবল ফাঁকি কেবল মেকি
যে যার মজে আপন রসে॥
মুখে বলি মিষ্টি কথা তার অন্তর ভরা বিষে,
তারা কথার বেলায় বৃহস্পতি
তাদের চেনার যো নাই বেশে,
তারা স্বার্থ ছাড়া কাজ করে না,
অর্থ ছাড়া কথা কয় না,
বলতে গেলে এসব কথা
পাগল বলে যায় রে হেসে॥
ছেলের বাবা বসে আছে পাঁচ হাজারের আশে,
আর মেয়ের বাবার ভাঙ্গা কপাল চোখের জলে বুক ভাসে,
ভাই রে, মানুষ নাই রে দেশে।"

আধুনিক যন্ত্র সমস্যার যুগে "পণ-প্রথা"র সমস্যা যেন দুষ্ট ক্ষতের মত সমাজের বুকে আজিও বাঁচিয়া আছে। আইন করিয়াও[১১৪] এই অভিশাপ হইতে জাতি মুক্ত হয় নাই। আজিও মিথ্যার বেসাতি হইতেছে এবং ভঙ্গী দিয়াই চোখ ভুলান হইতেছে। দেশের একটা বহু চিত্র-বিচিত্র অ্যালবাম্ মুকুন্দ যেন স্বদেশী যাত্রা ও গানের মাধ্যমে দেশবাসীকে উপহার দিয়াছিলেন। যখনই সেই অ্যালবাম্ খুলি, তখনই দেখি—"সেই Tradition সমানে চলিয়াছে, তাহার কোথাও পরিবর্তন ঘটে নাই।"

পরিশেষে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়—
"জীবনে যত পূজা হল না সারা
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা॥"[১১৫]

১১৪। আইন করিয়া "পণ-প্রথা" বে-আইনী করা হইয়াছে—১৯৫৫ সাল হইতে। তথাপি এই "পণ-প্রথা" লুপ্ত হয় নাই।

১১৫। রবীন্দ্রনাথের "গীতাঞ্জলি" "অসমাপ্ত", গীত সংখ্যা :—১৪৭, পৃঃ ১৬৭।

মুকুন্দ নাম, মুকুন্দ নামযুক্ত সঙ্গীত, মুকুন্দের রচনা, ধাক্কা দেওয়া সুরভঙ্গী, পণ্ডিত-নিরক্ষর সকলের সহজবোধ্য ভাষা, নিদ্রিত বাঙ্‌লাকে ধাক্কা দিয়া যে সুরতরঙ্গ সমগ্র ভারতে চাঞ্চল্য আনিয়াছিল, মৃত্যু যাঁহার সুরকে স্তব্ধ করিতে সক্ষম হয় নাই, আজো কারাকক্ষের 'ফাণ্টু' ("ফালতু"?) ভাইদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন চেষ্টায় মুকুন্দের যে পরিচয় ভাসিয়া উঠে, তাহাতে "মুকুন্দ" নামের অমরত্বই বিঘোষিত হয়—"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ।" মানুষের চিত্তে, ভবিষ্যতের ইতিহাসে "মুকুন্দ" নামটিই তাঁহার অমর অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করিবে। যাত্রাগানের সুর, ভাব ও সাজ-সজ্জায় নূতনত্ব সৃষ্টি করিয়া সমগ্র বাঙ্‌লায় পরিভ্রমণ করতঃ যে অপরিসীম শক্তির খেলা মুকুন্দদাস দেখাইয়াছিলেন—বাঙ্‌লায় স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে তাহা অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

মূলতঃ, মুকুন্দদাস কণ্ঠ ও অভিনয়, বক্তৃতা ও গানে প্রাণ দিয়াছেন। সে প্রাণ-সঞ্চারী প্রতিভা তাঁহার পারিপার্শ্বিক সর্ববিধ যোগ্যতাকে গ্রহণ করিয়াছে। সেই প্রাণদশক্তি তাঁহাকে স্বীয় রচনার মোহে না বাঁধিয়া মধুকর বৃত্তিতে অব্যাহত রাখিয়া অজ্ঞাতে লেখক, কবি ও অভিনেতা সাজাইয়া গিয়াছে। মুকুন্দদাস চাহিয়াছিলেন "সবার পিছে সবার নীচে সব হারাদের মাঝে" যাহারা আছে, সেই সব নিঃস্ব, পরাধীন, নিদ্রিত জাতভাইদের শ্রান্ত শুষ্ক মুখে হাসি ফুটাইতে এবং ভগ্ন বুকে আশা আকাজ্ক্ষা জাগ্রত করিতে। সেই চেষ্টার উপকরণ খুঁজিতে তাঁহার অপরাপর সকল ঐশ্বর্য তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া সার্থক হইয়াছে। এই চাওয়া ও পাওয়ার পথে তাঁহার বহু সাধনায় লব্ধ নব সুরভঙ্গী, সহজ ভাষা, তরঙ্গিণীর মতো বিশাল জনপদকে প্লাবিত করিয়া নবীনযুগের নবীন আদর্শ স্থাপন করিয়াছে—ইহাই মুকুন্দের নব অবদান, এইখানেই মুকুন্দদাস নবযুগের নবীন স্রষ্টা—চারণ-সম্রাট। দেশবরেণ্য নেতা চিত্তরঞ্জন হইয়াছিলেন 'দেশবন্ধু', গান্ধীজী হইয়াছিলেন 'জাতির জনক', সুভাষচন্দ্র হইয়াছিলেন 'নেতাজী', রবীন্দ্রনাথ হইয়াছিলেন 'বিশ্বকবি', সত্যেন্দ্রনাথ হইয়াছিলেন 'ছন্দ-ভারতী', আর মুকুন্দদাস হইয়াছিলেন—'চারণ সম্রাট !'

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

স্বদেশীযাত্রা ও মুকুন্দদাস

ভারতবর্ষ তথা বাঙ্‌লাদেশে বরাবরই যাত্রা-নাটকের চর্চা হইয়াছে এবং বর্তমানেও হইতেছে। এই সম্বন্ধে 'সংবাদ প্রভাকর'[১১৬] (.৮৬০) লিখিয়াছেন—"নাটকাভিনয় প্রদর্শনের সুবিমল প্রথা পুরাকালে এই রাজ্য মধ্যে প্রকৃষ্টরূপে প্রচলিত ছিল, ইহা ঐতিহাসিক বিবরণ দ্বারা এবং বহুবিধ কবিবর গুণাকরের বিবচিত নাটক দ্বারাই বিশিষ্টরূপে প্রকাশ আছে। অতএব এতদ্দেশীয় বিদ্যামোদী ব্যক্তিগণ সম্প্রতি নাটকাভিনয় প্রদর্শন বিষয়ে যে উৎসাহ প্রকাশ কবিতেছেন, ইহাকে কোন মতে নূতন বলা যাইতে পাবে না এবং তাঁহারা ইংরাজদিগের দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়াছেন, আমরা একথাও বলিতে পারি না।" প্রভাকরের মতে ঐতিহাসিক সততায়, প্রমাণিত হইয়াছে যে নাট্যচর্চাব প্রচলন 'পুবাকাল' হইতেই এবং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে ভাবতবর্ষই নাট্যচর্চার পীঠস্থান।

স্বাধীনতা লাভের পঁচিশ বছর পরে সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রের মত যাত্রা-গানেবও বহু বিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। আঙ্গিক এবং বিষয়ের দিক হইতে নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে। নাট্য-আন্দোলনে বাঙ্‌লাদেশ কোনদিনই নীরব ভূমিকা গ্রহণ কবেন নাই, তাহার ভূমিকা ছিল সবব ও সক্রিয়—যদিও বর্তমান কালের মত হয়তো তেমন সোচ্চাব ছিল না, কিন্তু আন্তরিকতায় ভাব ঘটে নাই কোনদিন। সাম্প্রতিককালের পত্র-পত্রিকা আর পথ জুড়িয়া মিছিলে মিছিলে গণনাট্য আন্দোলন আগাইয়া চলিয়াছে, 'জাতীয় নাট্যশালা'র জন্য

১১৬। সংবাদ-প্রভাকব—কবি ঈশ্বব গুপ্তের সম্পাদনায় 'সংবাদ-প্রভাকর' ১৮৩১ খৃঃ প্রকাশিত হয়। ইহাব মাসিক, সাপ্তাহিক ও দ্বিসাপ্তাহিক সংস্কবণও অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল। পরে ঈশ্বর গুপ্ত ইহাব দৈনিক সংস্কবণ ১৮৩৯ খৃঃ, ১৪ই জুন প্রকাশ করেন। ভাবতীয় ভাষায় ইহাই প্রথম দৈনিকপত্র। ঈশ্বর গুপ্ত যদিও কোন কোন দিক দিয়া ঈষৎ প্রাচীনপন্থী ছিলেন, তথাপি তাঁহার পত্রিকায় নানা প্রগতিশীল আলোচনা স্থান পা'ই'ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ অধিকারী, মনোমোহন বসু—পরবর্তীকালের ছোট-বড সাহিত্যিকগণ প্রায় সকলেই প্রথম যৌবনে গুপ্ত-কবির শিষ্যত্ব স্বীকাব করিয়াছিলেন এবং সংবাদ প্রভাকরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

সভা-সমিতিতে বক্তৃতা মঞ্চ 'মুখর হইয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে। তবুও বলা যায় যে, শতবর্ষ পূর্বের সমস্যা যেন আজও ঠিক তেমনিভাবেই রহিয়া গিয়াছে; বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। নাটকের চিন্তা, ভাবনা আর উপস্থাপনা লইয়া নাট্যকার, পরিচালক এবং সর্বোপরি দর্শকশ্রেণীর যেন ঘুম নাই, শান্তি নাই—তাহারা যেন আরও কিছু চায়; ভাবটা যেন এইরূপ—'এহ বাহ্য, আগে কহ আর'। ফলে নূতন আঙ্গিকে, নূতন রূপরেখায়, নূতন সমস্ত কিছুতেই চমক সৃষ্টি করাই আধুনিক-কালের যাত্রা-নাটকের বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু সার্থক যাত্রা বা নাটক সৃষ্টি করিতে হইলে চাই ঐকান্তিকতা, সংবেদনশীল মন, সর্বব্যাপী সহানুভূতি ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি। চমকের মধ্যে বাহাদুরি আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা যখন 'সস্তা'তেই বাজী মাৎ করে, তখন আর যাহাই হোক, আর্ট হইয়া উঠে না। ১৯৬৯ সালেব ১৮ই এপ্রিল 'যুগান্তর' লিখিয়াছেন—"সৎ মনোভাবাপন্ন ও গভীর উপলব্ধির শিল্পীদের স্বার্থে একটি সংস্কৃতি কেন্দ্র গড়িয়া তোলার জন্য বাংলা নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি গঠিত হয়েছে। এদের উদ্দেশ্য এমন একটি নাট্যমঞ্চ স্থাপন করা যার লক্ষ্য ব্যবসায়িক নয়। নাট্যশিল্পীর সাধনার ক্ষেত্র ছাড়াও এখানে ক্রমশঃ চিত্রকলা, সঙ্গীতকলা ইত্যাদি নানান শিল্পকলা বিকাশ ও প্রদর্শনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হবে।" কিন্তু ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, "থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পরেই ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকের আরম্ভ। যাত্রার দুর্ভাগ্য বাঙলার থিয়েটার আজকালকার যাত্রাকে অত্যন্ত প্রভাবান্বিত করিয়াছে। এই জন্যই আজ ত্রিশ বৎসর থেকে যাত্রার দল হইয়া দাঁড়াইয়াছে 'থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টি', তবুও যাত্রাই বাঙ্‌লার খাঁটী নাট্য, একেবারে বাঙালীর নিজস্ব। আমাদের জাতীয় নাট্য বলিয়া যদি কিছু থাকে সেটি হইতেছে যাত্রা" ('নাট্যশালা প্রসঙ্গে' —শিশির ভাদুড়ী)। তাই, সেই সুদূর অতীতের 'মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতা'[১১৭]

১১৭। মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতা:—পৃথিবীর ইতিহাসে সভ্যতার প্রথম বিকাশ হয—আফ্রিকার মিশরদেশে, এশিয়ার মেসোপোটেমিয়ায, চীনদেশে এবং ভারতে সিন্ধুনদের উপত্যকায। এই সিন্ধুনদের সভ্যতাকেই 'মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতা' বলে। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অংশে সিন্ধু-প্রদেশের অন্তর্গত লারকানা জেলায় 'মোহেন-জো-দ ড়ো' এবং পাঞ্জাবের অন্তর্গত মণ্টগোমারি জেলায় 'হরপ্পা' অবস্থিত। ১৯২২ খৃঃ প্রাগৈতিহাসিক যুগের নানাবিধ নিদর্শন এই দুই স্থানে আবিষ্কৃত হইবার পর ভারতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সংযোজন হইয়াছে। খ্যাতনামা প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিন্ধু প্রদেশের (বর্তমান পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত) মোহেন-জো-দড়ো খনন করিয়া এক অভূতপূর্ব নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। দয়ারাম

হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 'লেনিন' পর্যন্ত যাত্রায় স্থান পাইয়াছেন। অনুকরণপ্রিয়তা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। তাই চিরন্তন সহজাত প্রবৃত্তি হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে যাত্রা।

অথচ আমাদের দেশে যাত্রা-গান এক সময় ধর্মীয় আবহাওয়াতেই জন্মলাভ করে। এই যাত্রা ভক্তি ভাব, রং, সং আর গান দিয়া মানুষকে মোহিত করিয়া রাখিত। এই প্রসঙ্গে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—"যাত্রা অনেকদিন ধরিয়া লোকের প্রীতি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই দীর্ঘ শতাব্দীর পর শতাব্দীর রূপ পরিবর্তিত হয় নাই। সকল দেশেই দেখা যায় আদিতে নাট্যের বিকাশ মন্দির-প্রাঙ্গণে এবং নাট্যের বিষয় মানবজীবনে দৈবপ্রভাব। পুণ্যের জয় ও পাপের ক্ষয়, চিরন্তন ভাল-মন্দের দ্বন্দ্ব প্রায় অধিকাংশ জাতির নাটকে প্রতিভাত। আমাদের দেশে আদিমকাল হইতে নাটকেব ও নাট্যশালার উদ্দেশ্য—ধর্মের মহিমা কীর্ত্তন পুরাণের উপাখ্যানেব মাধ্যমে। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় ছোটখাট সুখ-দুঃখ, আনন্দ ও ব্যথা আমাদেব নাট্যের বিষয়ীভূত হয় নাই। আমাদের প্রাচীন যাত্রায় খালি পুরাণ কথাই আবালবৃদ্ধবনিতার মানসগোচর, করা হইত। ইংরাজীতে যাহাকে বলে 'SECULAR DRAMA' আমাদের যাত্রায় কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত ছিল না। অবশ্য বিদ্যাসুন্দরকে 'SECULAR DRAMA' ধরা হইলে এ কথার ব্যতিরেক ঘটে।" কারণ দেবকাহিনী বর্জন করিয়া মানব কাহিনীই ইহাতে প্রবর্তন করা হইয়াছিল। শুধু 'বিদ্যাসুন্দর'[১১৮]

সাহানীর উদ্যোগে খননকার্য্যের ফলে হরপ্পাতে সুপ্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। পরে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্যার জন মার্শালের অধীনে ব্যাপকভাবে খননকার্য্যের ফলে মোহেন-জো-দড়ো নামক স্থানে একটি বৃহৎ-সুন্দর-মনোরম নগরীর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। ইহাতে অনুমিত হয় যে, খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্বে সিন্ধু-উপত্যকায় এক সুসভ্য জাতি বাস করিত। এই জাতির সভ্যতাকে মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতা বলে।

১১৮। বিদ্যাসুন্দর যাত্রা—বর্তমানে সরকারী ও বে-সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় যাত্রার জয়-যাত্রা, যাত্রার সমারোহ। কিন্তু দেশের যাত্রা উৎসবে শতাধিক বছর আগে যে অবাঙালী আসর মাতাইয়াছিলেন, তিনি হইতেছেন উড়িষ্যার অধিবাসী গোপাল উড়ে। তাঁহার অকালমৃত্যুতে দল ভাঙিয়া যায় এবং সেই আঙ্গিকে অভিনয়ও বন্ধ হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিদ্যাসুন্দর যাত্রা ৬ ভাগে ৪০৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় শতাধিক বছর আগে ১২৮৩-৮৪ বঙ্গাব্দে। প্রকাশক—যদুনাথ দত্ত, চিৎপুর, কলিকাতা। এই যাত্রা-নাটকে হীরা মালিনীর একটি গান তখন লোকের মুখে মুখে ঘুরিত—

যাত্রা নয়, এই সময় 'নল-দময়ন্তী যাত্রা', 'নন্দবিদায় যাত্রা' প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের 'নূতন যাত্রা'র প্রচলনের কথাও জানা যায়। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদেশীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত এই দেশের মানুষের রুচির পরিবর্তন ঘটে। ফলে থিয়েটার ও অভিনয়যোগে নাটক আরম্ভ হয়। এই যাত্রার নূতন নামকরণ হয়—"গীতাভিনয়।" উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজী কায়দায় নাটক রচনা করিবার পূর্বে বহু নাট্যকার গীতাভিনয়ের পালা লিখিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন হরিশ্চন্দ্র মিত্র, মনোমোহন বসু প্রভৃতি। এই সমস্ত যাত্রা বা গীতাভিনয়ে ছিল গানের সীমাহীন প্রাচুর্য। তাই এখনো ইহাকে আমরা নাটক না বলিয়া বলি—যাত্রাগান। গীতপ্রধান যাত্রার এই অভিনয়কে মুখর করিয়া তোলেন যাত্রা পরিচালক ব্রজমোহন রায় ও মতিলাল রায় এবং পরে স্বদেশী যুগে স্বদেশী যাত্রাদলের প্রবর্তক ও প্রচারক—চারণকবি মুকুন্দদাস।

দেশে যখন স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার আসিয়াছে, তখনও যাত্রায় পৌরাণিক এবং আধা-ঐতিহাসিক কাহিনীর জাঁকজমক সৃষ্টি করিয়া আসর জমজমাট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই দিক হইতে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম —চারণকবি মুকুন্দদাস। "পৌরাণিক যাত্রাগুলি অনুসরণ করিলেও বুঝা যায় যে বাঙ্‌লা নাটক যখন যে ভাব ও রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, যাত্রাও তাহাই অনুসরণ করিয়াছে। কারণ দেখা যায় যে, বাঙ্‌লা নাট্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটক রচনার যুগের অবসান হইয়া যখন ঐতিহাসিক ও দেশাত্মবোধক নাটক রচনার সূত্রপাত হয়, সেই যুগেই যাত্রা রচনার ক্ষেত্রেও এক শ্রেণীর নূতন যাত্রার আবির্ভাব হয়—তাহা স্বদেশীযাত্রা নামে পরিচিত" ('বাঙ্‌লা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য। এই স্বদেশী যাত্রার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক, অভিনেতা ও পরিচালক হইতেছেন চারণকবি মুকুন্দদাস। তাঁহার স্বদেশীযাত্রা ও গান স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তিনি শুধু স্বদেশী যুগের অমর কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন অভিনেতা, নাট্যকার সুগায়ক ও সুবক্তা। আসর বুঝিয়া গান

"মাসি বল কারে বিদেশী।
ঠেকিলে দায় অনেকে বলে 'মাসি পিসি।
তুমি কার কে তোমার, মাসি বল বার বার
এ কেমন ব্যবহার তাই তোমায় জিজ্ঞাসি।
স্নেহভরে দেখে তোরে, বাসা দিনু নিজ ঘরে।
তার প্রতিফল দিলি মোরে, সিঁদ কেটে সারা নিশি

করিতে বা বক্তৃতা দিতে তাঁহার সমকক্ষ সে যুগে বড় একটা কেহই ছিলেন না। ডঃ অজিতকুমার ঘোষ সত্যই বলিয়াছেন "একমাত্র মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রাই শহরবাসী শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোকদেরও মাতিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল।"

সাধারণত সাহিত্যিক, রাজনীতিক, নাট্যকার ও গীতিকার বলিতে আমরা যাহা বুঝি, মুকুন্দদাসকে সেইরূপ বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না। তিনি ছিলেন স্বদেশী যুগের বিপ্লবী চারণ এবং আধুনিক যুগের কর্মযোগী। তাঁহার যাত্রা-গান তাঁহাকে যত বড করিয়াছিল, তিনি ছিলেন তাহার চেয়েও বড়। তাঁহার উদার হৃদয়, বিরাট ব্যক্তিত্ব, অসীম সাহস, দুর্জয় সঙ্কল্প, দরাজ গলা, সুরেলা কণ্ঠ এবং সাংগঠনিক প্রতিভা 'জগৎসভায়' একটি স্থায়ী আসন দিয়াছিল। উচ্চাকাঙ্ক্ষাই মহত্ত্বের ভিত্তিভূমি। তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তাঁহাকে মহত্ত্বের আসনে উন্নীত করিয়াছিল। কিন্তু যে জীবন এই শিল্প রচনা করিয়াছিল, তাহা উহার কীর্তি অপেক্ষা বড। সেইজন্য উহা কীর্তির বন্ধনে, শিল্পের বন্ধনে বাঁধা পডিল না। শিল্প অপেক্ষা জীবন বড। তাই, 'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ' —এই কথা বুঝিবার ও বলিবার সময় আসিয়াছে; বিশেষ করিয়া মুকুন্দ জন্ম-শতবর্ষে ইহা যত উচ্চারিত ও প্রচারিত হয়, ততই দেশের মঙ্গল। স্বাধীনতা পাওয়াই বড কথা নয়, স্বাধীনতা রক্ষা করাই বড কথা। মুকুন্দদাসের গান—এই স্বাধীনতার রক্ষাকবচ—

> "আমাদের জন্মভূমি, দেবতার লীলাভূমি,
> দেবগণ আসুক নেমে পূর্ণ হউক কামনা ॥
> সার্থক হবে তবে এ জনম সবাকার।
> ছেলের গৌরবে হবে গরবিনী মা আমার ॥
> জগৎ লুটিবে পায় ঘুচে যাবে যত দায়,
> মিটে যাবে মুকুন্দের চিরদিনের বাসনা ॥"

ঋজু-কঠিন-তীক্ষ্ণ-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ও নাটকীয় ভঙ্গিতে মুকুন্দদাস যাহা বলিয়াছেন, তাহার মূল কথাই হইতেছে—জগৎ ও জীবনের উন্নতির কথা, দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক স্বাধীনতার কথা, দেহের ও মনের ব্যাপ্তি এবং প্রসারতার কথা। এই কথা বলিবার প্রয়োজন চিরকাল আছে এবং আজকের দিনে তার প্রয়োজন বোধ হয় সবচেয়ে বেশী। 'প্রাণহীন এদেশেতে, গানহীন যেথা চারিধার'—সেখানে 'প্রাণের' ও 'গানের' সঞ্চার করিয়াছিলেন মুকুন্দদাস। এইখানেই মুকুন্দদাস অমর এবং সে-যুগের ও এ-যুগের যাত্রা-আন্দোলনের ইতিহাসে একক অপ্রতিদ্বন্দ্বী 'চারণ-সম্রাট'।

চারণকবি মুকুন্দদাস স্বদেশী আন্দোলনের সাত বৎসর পূর্বেই বৈষ্ণবীয় পরিবেশে 'বৈষ্ণব কীর্তনিয়া' রূপে বরিশালে পরিচিতি লাভ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ তখনও বরিশালকে স্পর্শ করে নাই। গান্ধীজীর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের ভাবশিষ্য মুকুন্দদাস—নূতন বেশে, নূতন ভঙ্গিতে এক নূতন ধরনের স্বদেশী যাত্রার প্রচলন করেন। শহরের জীবনে যেখানে নিরবচ্ছিন্ন ক্ষতির খতিয়ান, যেখানে সিনেমা, থিয়েটার ও সংবাদপত্রের প্রভাবে এবং শিক্ষিত লোকের কৃষি-সম্পন্ন পরিবেশে যাত্রা একেবারেই অপাঙ্‌ক্তেয়; মুকুন্দদাসের যাত্রা সেখানে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, আবালবৃদ্ধ-বনিতাকে একদিকে যেমন উত্তেজিত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছিল; অপরদিকে তেমনি জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলকে আনন্দ ও শিক্ষা দিয়াছিল। তাই মুকুন্দ-দাসের স্বদেশী যাত্রা লোকশিক্ষা ও সংস্কৃতির অঙ্গ ছিল। সেদিন যাঁহারা মুকুন্দ-দাসকে বয়স ও ক্ষুদ্র পরিচিত মানুষ হিসাবে গুরুত্ব দেন নাই, ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁহারাই তাঁহার যাত্রার আসরে প্রথম সারিতে বসিয়া গান শুনিয়াছেন—

"ছল চাতুরী কপটতা মেকী মাল আর চলবে ক'দিন ?
হাড়ি মুচির চোখ খুলেছে, দেশের কি আব আছে সেদিন।

*　　　*　　　*

নেতারাই দেশ জাগাত, সবাই তাঁদের বলত চারণ।
এখন আপনা বেঁচে সালসীপাড়ায়, যোগান তাঁরা ভোটের দাদন।
তোঁদের পতন এতই গভীর, ভাবলেও তা করে স্থবির।
দেশ হাসালি রূপ দেখালি প্রতিভারে করলি মলিন॥
দেশের কাছে পড়লি ধরা আর দাঁড়াবার উপায় নাই,
আমরা তাই বাউল চারণ মুক্তিমন্ত্র ছড়িয়ে বেড়াই।
গাড়ো সাঁওতাল বাগ্দি মেথর নেতা বয়েছে ওদের ভিতর।
মাতৃমন্ত্রের সাধক তারা, তারাই ভারত করবে স্বাধীন॥"

—মুকুন্দদাস ছিলেন এই 'বাউল চারণ' এবং স্বাধীনতাই ছিল তাঁহার জীবনের স্বপ্ন ও সাধনা। মানুষের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিবার পক্ষে মুকুন্দদাসের গানগুলি ছিল মৃতসঞ্জীবনী সুধা এবং আত্মশুদ্ধির পক্ষে ছিল শান্তিবারি। এইখানেই মুকুন্দদাসের যাত্রাগানের অন্তর্নিহিত শক্তি ও বৈশিষ্ট্য এবং সিদ্ধি-লাভের গোড়ার কথা।

বরিশাল শুধু 'পুণ্যে বিশাল' নয়, কর্মে'ও সম্পদেও বিশাল। এই

বরিশালের[১১৯] মাটিতেই কর্মযোগী মুকুন্দদাসের সিদ্ধিলাভ। জন্ম—ঢাকা জিলার বিক্রমপুরে, কর্ম বরিশালের সৃষ্টি-যজ্ঞে। স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় তাঁহার আবির্ভাব, পরিচয় ও সার্থকতা। স্বদেশী আন্দোলন—স্বাধীনতা অর্জনে এবং অর্থনৈতিক আন্দোলন স্বাধীনতা রূপায়ণে। এই দুই আন্দোলনের নির্ভীক সৈনিক ছিলেন—সব্যসাচী মুকুন্দদাস স্বাধীনতার মরণযজ্ঞে তিনি যে গুরুতর ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, অন্যের পক্ষে তাহা গ্রহণ করা দুঃসাধ্য ছিল। বরিশালের মুকুটহীন রাজা মহাত্মা অশ্বিনীকুমার তাই বলিয়াছিলেন—"যজ্ঞা (মুকুন্দদাসের পূর্ব নাম) তোর মধ্যে রয়েছে বিরাট সম্ভাবনা। তোকে দেশের এই জাতীয় সঙ্কটে নিতে হবে চারণের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা।" এই স্মরণীয় ভূমিকা পালন করিতে গিয়া বরণীয় চারণের সুপ্ত আত্মা যে ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার মূল্যায়ন করিতে গিয়া শিল্পী ও সাহিত্যিক শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়:—"আমাদের পরিশীলিত সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ মুকুন্দদাসকে কিভাবে বিচার করেন বলতে পারি না, নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি কিঞ্চিৎ স্থান অধিকার করে আছেন কিনা তাও আমার জানা নেই, কিন্তু মুকুন্দদাস যে নাট্যজগতে একটা নতুন দিক উদ্ভাবিত করে গেছেন, একটা অভাবনীয় রীতি স্থাপন করে গেছেন, সেটা বোধ হয় কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। রঙ্গমঞ্চের পাদপীঠকে তিনি সমস্ত কৃত্রিমতা থেকে অব্যাহতি প্রদান করেছিলেন এবং দর্শক ও অভিনেতাদের মধ্যে একটা ঘরোয়া সংযোগ স্থাপন করেছিলেন—যা হয়তো এখনকার খুব 'সফিস্টিকেটেড' স্টেজেও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। যে যুগে তিনি অভিনয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সে যুগে কেবলমাত্র সামাজিক বিষয়বস্তুকে অবলম্বন ক'রে জনগণের কয়েকটি প্রতীককে মাত্র নিয়ে, এমন বৈপ্লবিকভাবে যাত্রার মাধ্যমে নাট্য প্রচেষ্টা আর কারুর সাধ্যায়ত্ত হয়নি, এমনকি পরিকল্পনাতেও আসেনি,—কারণ পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কিম্বা সামাজিক স্থূল প্রহসন ভিন্ন যাত্রাভিনয়ের কথা তখন কেউ ভাবতে পারতেন না। প্রতিষ্ঠা বা আত্মপ্রচারের

১১৯। 'যেতে শাল, আসতে শাল; তার নাম বরিশাল। বরিশালের কথা উঠিলেই এই প্রবাদ বাক্যটি শোনা যায়। ইহা অনেক সময় নিন্দার্থক বা 'গাল' অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আসল অর্থ হইতেছে নদ-নদী-খাল বেষ্টিত বরিশালের পথ-ঘাট দুর্গম ও কষ্টসাধ্য। তাই 'যেতেও কষ্ট, আসতেও কষ্ট।' আমরা যাহা এক মাইল, দুই মাইল বলি, বরিশালের লোকেরা তাহাকেই 'এক শাল' 'দুই শাল' বলে। মূলতঃ পথের দূরত্ব এবং দুর্গমতা বোঝাইতেই এই প্রবাদ বাক্যটি ব্যবহৃত হয়। তাহা ছাড়া স্বাধীনতা আন্দোলনে বরিশালবাসীর বীরত্বব্যঞ্জক ভূমিকারও ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনা ইহাতে পাওয়া যায়।

দিকে একান্ত উদাসীন ছিলেন বলেই বোধ হয় কেবলমাত্র স্বদেশী যাত্রার প্রযোজক রূপেই পরিচিত রয়ে গেলেন ;—তাঁর জীবন বা জীবনব্যাপী প্রচেষ্টা সম্বন্ধে খুব কম লোকই বর্তমানে জ্ঞাত আছেন বা আগ্রহ পোষণ করেন। আমাদের দেশে বিভিন্ন চিন্তায়, বিভিন্ন ব্যক্তি তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। আমরা তাঁদের উপলব্ধি করতে পারি ; কিন্তু মুকুন্দদাস ছিলেন বিচিত্র প্রকৃতির ব্যক্তি। তাঁর কর্মধারা এমন স্বতন্ত্র যে তাঁর প্রতিভার পরিসর সম্বন্ধে পরিমাপ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তিনি গান করেছেন, কিন্তু কেবলমাত্র গায়ক বলে তাঁর পরিচয় দিলে সেটা যথার্থ হবে না, তিনি নাট্যকার এবং নাট্য প্রযোজক—কিন্তু তাও তো তাঁর সম্যক পরিচয় না ;—উগ্র জাতীয়তাবাদের সঙ্গে উদার মানবতার প্রেরণা তাঁকে এমন একটা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব প্রদান করেছে, যা তাঁর জীবনের বহু "প্রোফাইল"-এর মধ্য থেকে খুঁজে নিতে হয়। হয়তো লিটন স্ট্রাচির মত একজন জীবন পর্যবেক্ষক এই চরিত্রকে বিশ্লেষণ করে ভাস্বর করে তুলতে পারতেন।"[১২০]

মূলতঃ 'স্বদেশীযাত্রা'—যাত্রা আন্দোলনের ইতিহাসে যেমন অভিনব, তেমনি স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে এক কার্যকরী অধ্যায়। এই অধ্যায়ে মুকুন্দদাস আবিষ্কারক, প্রবর্তক, প্রচারক, অভিনেতা ও প্রবক্তা। তাঁহার রচনা, সংযোজনা, আসর অনুযায়ী সংলাপ ও বক্তৃতার প্রবর্তনা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-শ্লেষ-রসিকতা-উপদেশ সমন্বিত নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টির কার্যকারিতা একমাত্র স্বদেশী যাত্রাতেই সম্ভব ; অন্যের পক্ষে এসব অন্য থিয়েটারী পরিবেশে অসম্ভব যাত্রা আন্দোলনের ইতিহাসে এই কথাই প্রমাণ করে। দেশে যখন গান্ধীবাদ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ এদেশের গঠনমূলক কাজের সূচনা হইয়াছে, তখন দেশকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিবার জন্য এবং পরাধীন ও আত্মবিস্মৃত জাতিকে জাগাইবার জন্য মুকুন্দদাস এক অভিনব পথের পথিক হইলেন। যে পথ ছিল অজানা ও অপরিচিত, সেই পথেই তিনি মায়ের নামে জীবন-তরী ভাসাইলেন, জাগাইয়া তুলিলেন ঘুম ভাঙানির গানে ঘুমন্ত মানুষকে—

> "এসেছে ভারতের নবজাগরণ—
> পেয়েছে ভারত নূতন প্রাণ।
> মাতৃমন্ত্রে লয়েছে দীক্ষা, জগতে শিক্ষা করিবে দান।"

১২০। 'জাতীয় জাগরণের প্রগাতা মুকুন্দদাস—'রাজ্যেশ্বর মিত্র (দেশ—১৪ই জানুয়ারী, ১৯৭৮, পৃঃ ৪৬)।

—মুকুন্দদাস ছিলেন এই 'নবজাগরণে'র চারণ কবি, মাতৃমন্ত্রের সাধক কবি; লোকশিক্ষার স্বভাবকবি। পৃথিবীতে যাঁহারা ধ্যানে-কর্মে-চিন্তায় 'নবজাগরণে'র গান গাহিয়াছিলেন, মুকুন্দদাস তাঁহাদেরই একজন; আধুনিক লোকনাট্যের বা গণ-নাট্যের অগ্রদূত; স্বাধীনতার পূজারী ও কর্মের দিশারী।

সাধারণত, আমাদের দেশে সমকালীন ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া 'গান বাঁধা' চারণকবিরা চিরকাল করিয়া আসিয়াছেন। আধুনিক কালেও সেই 'Tradition' সমানে চলিয়াছে, কোথাও তার পরিবর্তন ঘটে নাই। কবি ঈশ্বর গুপ্ত[১২১] অষ্টাদশ শতাব্দী ব্যাপী অর্থাৎ এক যুগ ধরিয়া নিরলসভাবে এই মহান কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। নবজাগরণের কবি শ্রীমধুসূদন অবশ্য এই যুগের স্বরগ্রামটিকে ক্লাসিক রীতিতে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে হেমচন্দ্র আবার সমকালীন ঘটনাকে গুপ্তকবির ধারায় রূপ দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মধুসূদনের সে প্রতিভা ধুলামুঠিকে সোনামুঠিতে পরিণত করিতে পারিত; তাহা হেমচন্দ্রের ও নবীনচন্দ্রের ছিল না। তাই সমকালীন ঘটনাকে গুপ্তকবির ধারায় প্রবাহিত করিয়া দেওয়ার মধ্যে আছে একটা প্রতিভাগত সীমা ও কালগত মানসিক প্রবণতা। পরবর্তীকালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐন্দ্রজালিক প্রতিভার স্পর্শে এই ধারাবাহিক ঐতিহ্যের যুগান্তকারী রূপ দেখি,

১২১। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত:—(১২১৩—১২৬৫ বঙ্গাব্দ) প্রসিদ্ধ বাঙালী কবি। কাঁচরা-পাড়ার হরিনারায়ণ গুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র। বাল্যকালে লেখাপড়ায় তাঁহার মন ছিল না। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল। তাঁহার পিতা দ্বিতীয়বার বিবাহ করায় তিনি কলিকাতায় মাতুলালয়ে চলিয়া যান, সেখানেও তাঁহার তাদৃশ লেখাপড়া হয় না। ১৫ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। পত্নী দুর্গামণি সুশ্রী ও বুদ্ধিমতী না থাকায় তাঁহার বিবাহিত জীবন সুখের হয় নাই। তিনি ঠাকুরবাড়ির যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহায়তায় ১২৩৭ বঙ্গাব্দে সাপ্তাহিক "সংবাদ প্রভাকর" বাহির করেন। ১২৩৯ বঙ্গাব্দে সংবাদ পত্রটি উঠিয়া যায়। পরে তিনি ১২৪৫ বঙ্গাব্দে কানাইলাল ঠাকুরের সহায়তায় "সংবাদ প্রভাকর"-কে দৈনিক আকারে বাহির করেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহের আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। তিনি ১২৫৩ বঙ্গাব্দে "পাষণ্ডপীড়ন" পত্রিকা বাহির করেন। এই সময় গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য) "রসরাজ" নামে এক পত্র প্রকাশ করিয়া তাহার সহিত কবিতাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। পরে দুইখানি কাগজই উঠিয়া যায়। তিনি ১২৫৪ সালে "সাধুরঞ্জন" নামে এক-খানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ও প্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের গুরু। তিনি একজন খাঁটি ও শক্তিশালী বাঙালী কবি ছিলেন। "প্রবোধ প্রভাকর", "হিত প্রভাকর", "বোধেন্দুবিকাশ" প্রভৃতি তাঁহার রচিত গ্রন্থ।

ছন্দের জাদুকর সত্যেন্দ্রনাথে[১২২] দেখি তাহারই বিস্ময়কর বৈচিত্র্য, বিদ্রোহী কবি নজরুলের দেখি 'একহাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য্য' এবং চারণকবি মুকুন্দদাসের যাত্রা-গানে দেখিব গণদেবতার জয়গান—

"বাম এসেছে মরা গাঙ্গে খুলতে হবে নাও
তোমরা এখনো ঘুমাও ?"

বাঙ্‌লা তথা অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে চারণকবি মুকুন্দদাসের এই গান ছিল—জাগরণের গান, শৃঙ্খলমোচনের গান। অনুরূপ গান গাহিয়াছিলেন মহারাষ্ট্রের চারণদ্বয়—'সন্ত্রযুকদোজি' ও 'পাখেবাপুরাও'। তাঁহারাও বঞ্চিত-লাঞ্ছিত-নির্যাতিত জনগণকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করিয়াছিলেন। মুকুন্দদাসও অভিনয় করিতেন, গান গাহিতেন, নাটক রচনা করিতেন এবং সুরও দিতেন নিজে। তাঁহার সুরের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল—বাংলা গ্রামীণ ঢঙ্, যাহা আজও প্রচলিত আছে। তাহার দরাজ গলা, উদাত্ত আহ্বান ও সুরেলা কণ্ঠ শ্রোতাদের মুগ্ধ করিয়া রাখিত। রাগ-সঙ্গীতের আঙ্গিক তাঁহার কাছে গৌণ ছিল, মুখ্য ছিল গানটি শ্রোতাদের হৃদয়ঙ্গম করিয়া তোলা। এইজন্য তিনি গানের সুবেব সঙ্গে অভিনয় ধারাকে এই অভিনব পদ্ধতিতে যোগ করিয়া

১২২। কবি সতেন্দ্রনাথ দত্ত —রবীন্দ্র-সমকালীন কবিদেব মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের স্থানই বিশিষ্ট। তিনি ছিলেন বাস্তববাদী কবি। ব্রিটিশ শাসনেব তীব্রতর শোষণের পর্যাযে দেশের দুঃখ-দারিদ্র্য চরম সীমায পৌছিযাছিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবোধ আন্দোলনও দেখা দিযাছিল। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিল দেশের মাটিব নিগূঢ় বন্ধন। সেইজন্য তিনি দেশেব দাবি-দাওয়াব আন্দোলনে কেবলমাত্র সহানুভূতি প্রকাশ করেন নাই, দেশেব গভীব বেদনাকে তিনি তীব্র-ভাবে ভাষারূপ দিলেন। তিনি তাঁহার ছন্দ সবস্বতাকে মানবের বাস্তব ইতিহাসেব সর্বাঙ্গীণ প্রগতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বন্দনা করিয়াছেন। তিনি প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যেব চাবণ।

জন্ম ১৮৮২, ১২ই ফেব্রুয়ারি, মৃত্যু ১৯২২ ২৫শে জুন। নিবাস—চুপী, বর্ধমান, পবে দর্জিপাড়া, কলিকাতা। পিতা রজনীনাথ দত্ত এবং মাতা মহামাযা দেবী। পিতামহ জ্ঞানতপস্বী অক্ষয়কুমার দত্ত। তাই কলেজে বি. এ. পর্যন্ত পড়িলেও সাহিত্য-প্রীতি ও দেশ-প্রীতি ছিল অপরিসীম। ১৮ বৎসব বযসে প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সবিতা' (১৯০০) প্রকাশিত হয়। 'জন্মদুখী, (অনূদিত উপন্যাস), 'চীনের ধুপ' (নিবন্ধ), 'রঙ্গমল্লী' (কবিতায় ও গদ্যে অনূদিত নাটকাবলী) ও 'ধুপের ধোঁয়ায়' নাটিকা ছাড়া তাঁহার রচিত বাকি পনেরোখানি গ্রন্থই কাব্য। সমসাময়িক ঘটনা ও মানুষের উপর তিনি অনেক কবিতা লিখিয়াছেন; বহু কবিতা এখনও সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠাতেই আছে। তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষ্যে কবিগুরু যে অনিন্দ্যসুন্দর কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন; তাহার মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের কবিমানস ও কাব্য-প্রকৃতির স্বরূপ সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এমন এক বাস্তবভিত্তিক কার্যকারিতা সৃষ্টি করিয়াছিলেন ; যাহা সুরের মাধ্যমে, আলাপের ভঙ্গিতে বিশেষ বিশেষ আকুতিকে ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম ছিল। কাজী নজরুলের[১২৩] 'কারার ঐ লৌহকপাট' গানটির সুরে মুকুন্দদাস প্রভাবিত। ধুঁয়ার ছলনায় যেমন কান্নার কথা পদাবলী সাহিত্যে পাওয়া যায়, মুকুন্দদাসও তেমনি যাত্রাগানের নাম করিয়া অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা দিতেন। "কথক ঠাকুরেরা যেমন বর্ণনা প্রসঙ্গে সুবিখ্যাত রাগ সঙ্গীতগুলি শুধু একটা সুরের কাঠামোয় অভিনয়েব ভঙ্গিতে গেয়ে যান, মুকুন্দদাসের ধরণটাও অনেকটা সেই রকম ছিল। অথচ একান্ত সরল ধারায় গেয়েও তিনি সুরে, বসে, ভাবে আসরকে আপ্লুত কবে দিতেন।" সত্যই গানের পব বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে গান, তাহারই মধ্যে আবার পূর্বকথায় ফিবিয়া আসিয়া অভিনয়—যাত্রা-আন্দোলনের ইতিহাসে, মুকুন্দদাসের ইহা এক অভিনব টেকনিক। "সেইটুকু সম্বল করে তিনি সারা জীবন যা করে গেছেন তাকে মহৎ বললে কম বলা হয় ; তা ছিল অনুপম।"

মূলতঃ মুকুন্দদাস ছিলেন অগ্নিযুগের অন্যতম ঋত্বিক এবং এক অদ্ভুত প্রতিভাসম্পন্ন বিপ্লবী কবি। তিনি ছিলেন 'মাটিব কাছাকাছি' এবং 'জীবনে জীবন যোগ করা'ই ছিল তাঁহার স্বপ্ন ও সাধনা। 'সবার পিছে সবার নীচে সব-হাবাদের মাঝে' যাহাবা আছে, তাহাদেব সঙ্গেই তাঁহার নাডীব যোগ। তাই তাঁহাদেব যাত্রা-গান ছিল 'বিচিত্র', ভাষা-সুব-ছন্দ ছিল সহজ, সরল ও সাবলীল এবং গতি ছিল 'সর্বত্রগামী'। 'যা-কিছু স্ববশে তাই তো স্বদেশ'—

১২৩। কাজী নজরুল ইসলাম —প্রসিদ্ধ বাঙালা কবি—সাম্যবাদের কবি—সর্বহারার কবি। প্রথম যৌবনে "বিদ্রোহ" কবিতা লিখিয়া তিনি "বিদ্রোহী কবি" নামে পরিচিত হন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে, ২৪শে মে বর্ধমানেব চুরুলিয়া গ্রামে তাহাব জন্ম। ১৯৬১ খৃঃ তিনি সৈনিক হন। সৈনিকরূপে তাহাকে 'নওশেরা' 'করাচী', 'মেসোপোটেমিয়া প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ কবিতে হয় ক্রমে ক্রমে তিনি হাবিলদাব হন এবং প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধেব শেষে ১৯২১ খৃঃ দেশে ফিবিয়া আসেন। যুদ্ধ যাত্রার পরিবেশে কাব্য স্ফূর্তিলাভ করে এবং তাঁহাব অদম্য প্রাণশক্তির বলে কাব্যধারা বন্যার আকাব ধাবণ করে। ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে বসিযাই তিনি মহাকাব্য বচনা করেন। 'মোসলেম ভাবত' পত্রিকায় সেইগুলির প্রকাশে সাহিত্যক্ষেত্রে সাডা পডিয়া যায় এবং অত্যল্পকাল মধ্যে তিনি যশস্বী হইয়া উঠেন। তাঁহার সম্পাদিত 'নবযুগ', 'ধূমকেতু', '[illegible]' প্রভৃতি পত্রিকা রাজরোষে পডিয়া অকালে বন্ধ হইযা যায়। তাঁহার রচনা, প্রধানতঃ কবিতা অফুরন্তভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে এবং পবপর পুস্তকাকারে বাহির হয়। সংগীত রচয়িতা হিসাবে তিনি প্রভূত খ্যাতিলাভ করেন। ১৯৬০ খৃঃ তিনি ভারত সবকার কর্তৃক "পদ্মভূষণ" উপাধিতে ভূষিত হন। কবির দুই পুত্র—কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধ। শেষোক্তজন কিছুদিন পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন। আর ১৯৭৬ খৃঃ ২৯শে আগস্ট ঢাকায কবি পরলোকগমন করেন।

ইহাই ছিল তাঁহার স্বদেশী যাত্রা-গানের মূল বৈশিষ্ট্য। "তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল গানের প্রথমাংশ ধরাটুকুতে। এমনভাবে তিনি গানের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তেন বা গানের শুরুতে কথাগুলি উচ্চারণ করতেন যে, সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকবৃন্দ একান্ত-ভাবে অভিভূত হয়ে পড়তেন।" তাই জীবন-সিন্ধু মন্থন করিয়া যে রস উঠিয়াছে, তাহারই ঘনীভূত নির্যাস—মুকুন্দদাসের যাত্রা-গান। স্বপ্নময় জীবনের চেয়ে জীবনময় স্বপ্ন শ্রেয়ঃ। মুকুন্দদাস সারা জীবন এই বাস্তবভিত্তিক জীবনের জয়গান গাহিয়াছেন। জীবনে যখন জাগিয়াছে সত্যপ্রীতি ও মনুষ্যপ্রীতি—সাহিত্যে তখনই পড়িয়াছে তাহার প্রতিবিম্ব। এই দিক হইতে দেখিতে গেলে মুকুন্দদাসের যাত্রা-গানে আমরা 'সঙ্গ পাই সবাকাব, লাভ করি আনন্দের ভোগ'।

মুকুন্দদাসের যাত্রা-গান মানবতা জয়গানে মুখব। তিনি প্রেম ও স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিয়া সমাজের সর্বশ্রেণীর চবিত্রকে পালাগানে রূপায়িত করিয়া-ছিলেন। 'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যাঁরা জীবনের জয়গান'—মুকুন্দদাস তাঁহাদেরই চারণকবি। ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় ও লর্ড ক্লাইভের প্রহসনায় স্বাধীনতার যে সূর্য অস্তমিত হইয়াছিল, তাহাই আবার 'উদিবে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বাব'—এই প্রতিজ্ঞায় ও স্থিব বিশ্বাসে যাঁহারা মরণপণ সংগ্রাম করিয়াছিলেন,—মুকুন্দদাস, এই স্বদেশী যুগেব স্বদেশী কবি। পরাধীন জাতির বঞ্চিত বুকেব পুঞ্জীভূত বেদনার রূপকার ছিলেন—চারণকবি মুকুন্দদাস। দেশে যখন বিদেশী দ্রব্য বর্জন এবং স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ—এই আন্দোলন চলিতেছে, বাংলার চারণ তখন তাহাকে জাতীয় আন্দোলনে রূপ দিলেন—স্বদেশী যাত্রা ও গানের মাধ্যমে। তিনি ছিলেন মানব-প্রেমিক এবং মানবধর্মের প্রচারক। তাঁহার সব কাজের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল—জাতিকে দেহে-মনে-প্রাণে সবল, সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ করিয়া তোলা। তাই তিনি বুঝিয়াছিলেন—শুধু নীরস বক্তৃতায় নয়, পরাধীন জাতিকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে হইলে এবং জাতি গঠনে 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'—এই ভাবধারা প্রচার করিতে হইলে চাই স্বদেশী যাত্রা ও গান। মুকুন্দদাসের এই মাসিক প্রবণতার কথা স্মরণ রাখিয়াই নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয় বলিয়াছিলেন—"স্বদেশী-আন্দোলনে দেশে যে সাড়া পড়ে সেই সময় অদ্ভুত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, নট-মুকুন্দদাস যাত্রাকে রাজনৈতিক কাজে লাগান।" তাঁহার 'মাতৃপূজা', 'পথ', 'সাথী', 'সমাজ', 'পল্লীসেবা', 'ব্রহ্মচারিণী', 'কর্মক্ষেত্র' প্রভৃতি নাটকগুলি সেই উদ্দেশ্যেই লিখিত হওয়ায়

অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই সব নাটকে তিনি দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া বলিতেন—'তোরা সবাই কোদাল ধর, দেশ থেকে তাড়াতে হবে ম্যালেরিয়া জর', 'মায়ের নাম নিয়ে ভাসানো তরী যেদিন ডুবে যাবে, সেদিন চন্দ্রসূর্য ধ্রুবতারা তারাও ডুবে যাবে', 'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াৎ খেলছে জুয়া' (পল্লীসেবা) ; 'বান এসেছে মরা গাঙে ঠেলতে হবে নাও, তোমরা এখনো ঘুমাও', 'জ্বাল জ্বাল কামনা অনল' (ব্রহ্মচারিণী), 'ছেড়ে দাও রেশমি চুড়ি বঙ্গনারী', 'স্বরাজ সেদিন মিলিবে যেদিন চাষার লাগিয়া কাঁদিবে প্রাণ', 'জাগগো জাগগো জননী' (কর্মক্ষেত্র) প্রভৃতি গানের মাধ্যমে অধঃপতিত ও আত্মসুখ লালায়িত বাঙালী জাতিকে স্বাবলম্বী হওয়ার প্রেরণা দিতেন। মুকুন্দদাস তাই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ—এই যুগসন্ধিক্ষণের স্বদেশী যুগের অমর কবি, যুগন্ধর কবি।

বাংলাব চারণ—বাংলার লোক-সাহিত্য ও লোক-সংস্কৃতির সার্থক প্রচারক। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ[১২৪] সত্যই বলিয়াছিলেন—"বাঙ্গালীর প্রাণসত্য ও বাঙলার জল মাটিব সঙ্গে মিশিয়া বাঙ্গালী হিন্দু ছিল বাঙ্গালী, মুসলমানও ছিল বাঙ্গালী।" ইহা লোকসাহিত্যেবও সাক্ষ্য। বাংলার চারণ এই ঐতিহ্যের পূজারী, মুকুন্দদাস তাহাবই যোগ্য উত্তবাধিকারী। বন্দীর বন্দনা-

১২৪। দেশবন্ধু চিত্তবঞ্জন দাশ —পবাধীন ভাবতে জাতিব পুবোধায দাঁড়াইযা যিনি তাহাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পবিচালিত কবিযাছিলেন, তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। জন্ম—১৮৭০ সালেব ৫ই নভেম্বর, মৃত্যু—১৯২৫ সালেব ১৬ই জুন। পিতা ভুবনমোহন দাশ, মাতা নিস্তাবিণী দেবী। প্রাথমিক শিক্ষাব পর চিত্তবঞ্জন ভবানীপুরেব লণ্ডন মিশনারি স্কুলে ভর্তি হইলেন। ১৮৮৬ সালে এণ্ট্রান্স পাস। ১৮৯০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয হইতে স্নাতক হইযা তিনি বিলাত যান। কিন্তু বাজনৈতিক মতবাদেব জন্য আই সি. এস. পবীক্ষা দিবাব অনুমতি না পাইযা তিনি ১৮৯৪ সালে ব্যাবিস্টাবি পাস করিযা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে আইনেব ব্যবসায শুরু করিলেন। তাহাব ব্যারিস্টাবিতে মুরাবি-পুকুবের বোমাব মামলায় শ্রীঅববিন্দ নির্দোষ প্রমাণিত হইযা মুক্তিলাভ কবিলেন। কিন্তু দেশেব ডাকে চিত্তরঞ্জন ঝাঁপাইযা পড়িলেন—গান্ধীজী প্রবর্তিত অহিংসা আন্দোলনে। চিত্তরঞ্জন হইলেন জনগণের মনের অধিনায়ক—সকলের প্রিয "দেশবন্ধু"। তাহাব কাব্যগ্রন্থ —'মালঞ্চ', 'মালা', 'অন্তর্যামী', 'কিশোব-কিশোরী' ও 'সাগর-সংগীত'। দেশকে ভালবাসিযা এই মহাত্যাগী মহানায়ক সমস্তই দান কবিযাছিলেন, অবশিষ্ট ছিল তাঁহার প্রাণ এই প্রাণও তিনি দেশবাসীকে দান করিয়াছিলেন—

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ।
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান॥"

গান, রাজপণ্ডিতের মঙ্গলাচারণ, সভাকবির স্তুতিচারণ—"চারণ"-এর পর্যায়ে পড়ে না। "চারণ" বলিতে আমরা বুঝি—আনন্দলোকের যাত্রী, মৃত্যুঞ্জয়ী পথিক এবং ঐশ্বরিক শক্তিতে শক্তিমান। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—'প্রতিভা, পাগলামি মাত্র'। চারণের ক্ষেত্রে এই 'পাগলামি' পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু পাগলের পাগলামি এবং প্রতিভাধরের পাগলামি এক নয়। 'ভবের পাগল' বলিতে আমরা যাহা বুঝি, চারণের ভূমিকা তাহার চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, 'চারণ' লোককথার ঐতিহ্যবাহী শিল্পী। 'বিচিত্র প্রবন্ধে' রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—সমাজে দুই শ্রেণীর মানুষ বাস করে। একদল কাজের কথার মানুষ—কাজের কথা ছাড়া বাজে কথা বলে না, ইহারা 'পনেরো আনার' দলে। আর বাজে কথার মানুষ—'এক আনা দলে।' এই শ্রেণীতে আছেন —প্রতিভাধর কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, দাতা, ভক্ত, গায়ক, নাট্যকার প্রভৃতি। 'চারণ'—এই শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত। ইহারা মুক্ত পুরুষ, খামখেয়ালি ও বে-হিসেবী মানুষ—এই জগতের মানুষ হইয়াও অন্য জগতের মানুষ। আপন খেয়ালে, স্বভাব মাধুর্যে ও উদাত্ত কণ্ঠে ইঁহারা যে গান গাহিয়া বেড়ান তারা সব সময় কাজের মানুষের কাজে না আসিলেও মনের মানুষের কাজে লাগে। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাই চারণকবি মুকুন্দদাসকে শ্রদ্ধা জানাইতে গিয়া বলিয়াছিলেন—'যাঁরা গান বা বক্তৃতার দ্বারা দেশের জাগরণ আনতে চেষ্টা করেন, তাঁরা সকলেই 'চারণ'। আপনি, আমি, আমরা সব্বাই 'চারণ', তবে আপনি আমাদের 'সম্রাট' অর্থাৎ 'চারণ-সম্রাট'।"

সত্যই মুকুন্দদাস ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চারণকবি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ গায়ে না মাখিয়া প্রথম জীবনেই হরিনামের ঝুলি হাতে লইয়া যে 'যজ্ঞা' বাংলার শক্তি ও সাধনাকে জাগ্রত করিয়াছিলেন, তাহারই গুরু প্রদত্ত নাম—"চারণকবি মুকুন্দদাস।" সিনেমা, থিয়েটার ও যাত্রাভিনয়ে যখন মুকুন্দদাসের জীবনী অভিনীত হইতে লাগিল, তখনই চারণকবি মুকুন্দদাসের নাম সর্বাধিক পরিচিতি লাভ করে। স্বদেশী যুগে এই নাম সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় শোভা পাইত এবং লোকের মুখে মুখে এই নাম তখন এমনভাবে প্রচারিত হইত যে, সাধারণ লোকে—"সাবধান! সাবধান! আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড রুদ্রদীপ্ত মূর্তিমান,—এই গানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে 'মুক্তিদাতা' বা 'Liberator' বলিয়া মনে করিত। 'যাত্রায় তাঁর ভূমিকাটা ছিল একটু বিশেষ ধরনের। তিনি সাধারণত বাউল ব্রহ্মচারী বা ঐ ধরনের

একটা ভূমিকা বেছে নিতেন। দৃশ্যাদিতে তাঁর প্রবেশ ছিল নাটকীয় এবং সম্পূর্ণ যাত্রার ঐতিহ্যসম্মত। অনেক সময় তাই বিবেকের প্রবেশকে মনে করিয়া দিত। কিন্তু যেটা আশ্চর্য সেটা ছিল এই যে, পার্ট বলতে গিয়ে তার নির্দিষ্ট অংশের অতিরিক্ত অনেক কিছু তিনি বলে যেতেন, প্রয়োজনবোধে অনেক সময় অনেক সাময়িক প্রসঙ্গের উল্লেখ করতেন তাঁর অভিনয়ের পরিবেশে বা সমর্থনে। যখন দরকার মনে করতেন তখন পার্টের মাঝখানেই আমাদের ছেলেদের উদ্দেশ করে বলতেন—'ছেলেরা তোমরা এই জায়গাটা ভাল করে দেখে নাও, নিজেরা এখন থেকে স্বাবলম্বী হতে শেখো, দেশের কাজে মন দাও, মনকে কর্মমুখী করে তোলো'—ইত্যাদি। এমনি অনেক কথা সব শ্রেণীর দর্শকদেরই সম্বোধন করে বলতেন।···এক সময় তিনি পুরো একটা বক্তৃতা দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ পরে মঞ্চে নিজের ভূমিকায় ফিরে আসতেন। শ্রোতারা কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা আগ্রহের সঙ্গে শুনতেন, সেই মুহূর্তে নাটকটাও তাঁদের কাছে গৌণ হয়ে যেত। সামগ্রিকভাবে কিন্তু তাঁর যাত্রা অত্যন্ত মনোগ্রাহী হত এত সব বক্তৃতা সত্ত্বেও, তার কারণ সেগুলির মধ্যে গল্পাংশ এবং সাসপেন্স যথেষ্ট থাকত।" মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রা বলিতে আমবা ইহাই বুঝি।

স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, 'সবাব পিছে সবার নীচে সব হাবাদের মাঝে' যাহারা আছে, তাহাদের নিকট স্বাধীনতার বাণী পৌছাইযা দিতে মুকুন্দদাসের সমকক্ষ আর কেহ ছিলেন না। তিনি শুধু বরিশালের 'চারণ' নন বাংলার চারণ। বাংলার বাউল বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার কার্যকবী রূপ হইতেছে—বাংলার চারণকবি মুকুন্দদাস। শুধু তাহাই নহে, ভৌগোলিক বৃত্ত অতিক্রম করিয়া সারা ভারতের মুক্তিযজ্ঞের আন্দোলনে তাঁহার যাত্রা-গান 'নব ভারতের নব জাগরণ' আনিয়াছিল। ফলে সর্বভারতীয় নেতাদের নিকট হইতে আরম্ভ করিয়া পথের পথিক, কৃষক ও কুলির নিকট হইতে তিনি যে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন ও সম্মান পাইয়াছিলেন তাহা অনেকের ভাগ্যেই ঘটে না। তাঁহার তেজোগর্ভ বাক্যাবলী, শব্দ সম্পদ, প্রাণস্পর্শী সহজ সংগীত, তাঁহার 'সাধন সঙ্গীতে'র বিষয়। এখানে 'মাধুকরী' বৃত্তি থাকিলেও হীনমন্যতা নাই, আছে 'পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে'— এই ঐকান্তিক অভিপ্রায়। 'জ্ঞানের দীনতা, মনের দীনতা' সৃষ্টি করে নাই, সৃষ্টি করিয়াছে নব জীবনের নব প্রভাত। তিনি কার্যকরী স্বাদেশিকতা দেশময় বহন করিয়া এক একটি আসরে হাজার হাজার শ্রোতৃবর্গকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতেন—যাহা সর্বভারতীয় নেতাদের বক্তৃতায় সম্ভব হইত

না। এইখানেই চারণকবি মুকুন্দদাসের যাত্রা-গানের বৈশিষ্ট্য। দেহের সঙ্গে, প্রাণের সঙ্গে, মনের সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে, ভাষায় সঙ্গে, ধর্মের সঙ্গে, কর্মের সঙ্গে একাত্মতা সৃষ্টি করিয়া তিনি যাত্রা-গানের সুর, ভাব ও সাজ-সজ্জায় নূতনত্ব আনিয়া সমগ্র বাংলা পরিভ্রমণ করতঃ সে অপরিসীম শক্তির খেলা দেখাইয়াছিলেন—স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে তাহা অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

মুকুন্দদাসের সঙ্গে মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন যখন বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করিতে উদ্যত হন, তখন ঐতিহাসিক বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হয়। "তাহার ফলে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের লক্ষ্য আমূল পরিবর্তিত হইয়া যায়। একদিন সমাজ সংস্কার ও ভক্তিভাবের প্রচার ইহার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সেই সময় দেশাত্মবোধ প্রচার করিতে গিয়া বাংলাদেশের অতীত ইতিহাস হইতে বীর চরিত্রের অনুসন্ধান করিয়া স্বাধীনতা রক্ষায় তাহাদের ত্যাগ, দুঃখ ও আত্মবিসর্জনের কথা নানাভাবে বর্ণনা করা হইতে লাগিল। এমন কি, যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ কেবলমাত্র পৌরাণিক নাটক রচনার মধ্যে তাঁহার জীবনের প্রায় সমগ্র অংশই নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন, তিনিও তাঁহার চিরাচরিত পথ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার জীবনের সায়াহ্নে নূতন বিষয় লইয়া নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এতদ্ব্যতীত দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলিও সমসাময়িক বাংলার সমাজের মধ্যে নূতন উত্তেজনার সৃষ্টি করিল। বাংলার যাত্রাগুলি স্বভাবতঃই ইহার প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারিল না।" (বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য।) ইহারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ দেখা দিল—স্বদেশী যাত্রা। এই যাত্রার পরিকল্পনা ও রূপায়ণে যাঁহার কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশী, তিনি হইতেছেন বরিশালের তথা ভারতের অন্যতম বিপ্লবী মুকুন্দদাস। স্বদেশী আন্দোলনের বলিষ্ঠতম প্রকাশ হইতেছে—স্বদেশীযাত্রা। নূতন ঢঙে, নূতন বেশে, নূতন ভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের আসরে আসিল—মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রা। তাই যাত্রা আন্দোলনের ইতিহাসে মুকুন্দদাসের প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

স্বাধীনতা আন্দোলনে 'বরিশালে'র অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। কারণ বরিশালের স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন—মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত। এই উপলক্ষ্যে বরিশালের টাউন হলে স্বদেশী আন্দোলন বিষয়ক বহু সভা হইত। এইরূপ একটি বিশেষ সভায় অশ্বিনীকুমার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—"আমরা বক্তৃতায় যে সব কথা বলিতেছি, তাহা যদি কেহ গানের

ভিতর দিয়া প্রচার করেন, তাহা হইলে আমাদের এই বক্তৃতার চেয়ে তাহা অনেক বেশী কার্য্যকরী হইবে।" এই সভায় মুকুন্দদাস উপস্থিত ছিলেন। সভাশেষে মুকুন্দদাস বাড়ি ফিরিবার পথে দুইটি মোমবাতি, একটি পেন্সিল এবং এক দিস্তা ফুলস্কেপ কাগজ কিনিয়া আনিলেন। সেই রাত্রিতেই মায়ের নাম স্মরণ করিয়া তিনি যে বই লিখিলেন তাহা "মাতৃপূজা" নামে খ্যাত। চারণকবি মুকুন্দদাসের আত্মপ্রকাশের ইহাই শুভলগ্ন। মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত চারণকবি এই গ্রন্থে জাতীয় উদ্দীপনামূলক দেশাত্মবোধক যে সব গান লিখিয়াছিলেন তাহাতে ঘুমন্ত মানুষের ঘুম ভাঙিয়া যায়। এবং পরাধীন জাতি স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষালাভ করেন। তাঁহার সংগীতের এই নবীন ভাবধারায় দেশে অসীম আলোড়ন সৃষ্টি করে। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের শোষণের ইঙ্গিত চারণকবির উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

"বাবু বুঝবে কি আর ম'লে—
ছিল ধান গোলাভরা, শ্বেত ইঁদুরে করল সারা।
চোখের ঐ চশমা জোড়া, দেখনা বাবু খুলে॥"

শ্রীযুক্ত ববদাকান্ত বাবু মহাশয় "Reflections on the War of India Independence"-গ্রন্থে মুকুন্দদাস প্রসঙ্গে এই গানটি সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী পরিবেশন করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে একবার যাত্রাভিনয় করিবার সময় মুকুন্দদাস মনের আবেগে এই গানটি গাইতে গাইতে প্রায় ২০০ বি শষ্ট শ্রোতাসহ স্বয়ং মূর্ছিত হইয়া পড়েন। হলে সেইদিন তিল ধারণের জায়গা ছিল না। এই অভূতপূর্ব ঘটনায় অভিনয় বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু ইহা একটি স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনারূপে বহুদিন যাবৎ মানুষের মনে থাকে। আজও প্রত্যক্ষদর্শীর মধ্যে যাঁহারা বাঁচিয়া আছেন, তাঁহারা ঐ ঘটনার বর্ণনা দিবার সময় নিজেকে হারাইয়া ফেলেন। মুকুন্দদাসের যাত্রা-গানে ইহাই অন্তর্নিহিত শক্তির মূলীভূত আকর্ষণ। বলা বাহুল্য, এই গানটি গাহিবার ও লিখিবার অপরাধে মুকুন্দদাসের তিন বৎসর জেল হইয়াছিল।

১৯০৫—১৯০৬ সলে। বঙ্গভঙ্গ, রাখীবন্ধন ইত্যাদি আন্দোলনে বাঙালীর জাতীয় জীবনে নূতন উদ্দীপনা সঞ্চার করে। বিপ্লবী চারণকবি তাঁহার সঙ্গীতে বিপ্লবের নব-প্রেরণা ঘোষিত করেন—

"আমি দশ হাজার প্রাণ যদি পেতাম,
তবে ফিরিঙ্গী বণিকের গৌরব রবি —
অতল জলে ডুবিয়ে দিতাম।"

তখনকার দিনে এই গান প্রকাশ্যে গাহিয়া বেড়ানো দুঃসাহসের কাজ ছিল। মুকুন্দদাস এই দুঃসাহসিক অভিযানের একক যাত্রী ছিলেন। ফলে বৃটিশ আমলাতন্ত্রের শ্যেনদৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয় এবং অচিরেই তিনি রাজদ্রোহ অপরাধে গ্রেপ্তার হন। বৃটিশ সরকার মুকুন্দদাসকে যতখানি ভয় করিতেন, তাহার চেয়েও বেশী ভয় করিতেন যাত্রা-গানকে। কারণ—"His motion and posture more than sedition of his language." মুকুন্দদাসের যাত্রা-গান প্রসঙ্গে ইহাই মূল কথা। বিচারে মুকুন্দদাসের আড়াই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। সরকার এই ভীষণ প্রকৃতির মানুষটিকে বাংলায় রাখিতে সাহসী না হইয়া সকলের অগোচরে দিল্লীর সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু দেহও বাঁধিলেও 'মন তো বাঁধা সহজ নয়।' তাই কারাগারে থাকিয়াও মুকুন্দদাস গাহিলেন—

"আমি গান গাহিতাম গাইতে দিলে গান,
সে গানে মাতিয়ে দিতাম প্রাণ।"

ক্ষিপ্ত হইয়া বিদেশী শাসক তেলের ঘানিতে জুড়িয়া দিলেন তাঁহাকে। ১৯০৮—১৯০৯ সালে জেল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া তিনি দেখিলেন—মাতৃহীনা মেয়ে 'সুলভা' এবং পুত্র 'কালিদাস'। সবাই ভাবিল ইহাদের মুখ চাহিয়া দুরন্ত মুকুন্দদাস হয়ত শান্ত হইয়া ঘরসংসারে মন দিবেন। কিন্তু চারণের সুপ্ত আত্মা মুহূর্তের মধ্যে দুর্বলতা কাটাইয়া গাহিয়া উঠিল—

"মায়ের নাম নিয়ে ভাসানো তরী
যেদিন ডুবে যাবে রে,
সেদিন রবি চন্দ্র ধ্রুবতারা
তারাও ডুবে যাবে রে।"

পাল তোলা তরীর মতোই ছুটিয়া চলিল মুকুন্দদাসের জীবন-তরী। "মাতৃপূজা" বৃটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হওয়ায় মুকুন্দদাস ইহার পর লিখিলেন—"সমাজ", "কর্মক্ষেত্র", "পথ", "পল্লীসেবা"। ইহা কবিবন্ধু হেমচন্দ্র লিখিত "আদর্শ", বিধুভূষণ লিখিত "ব্রহ্মচারিণী" এবং সুরেশ গুপ্ত লিখিত "সাথী" বইগুলির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া অভিনয় করেন। মুকুন্দদাসের সব কয়টি পালাগান অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করে। 'কর্মক্ষেত্র" ও "পথ"—পালা দুইটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেই আদেশ প্রত্যাহৃত হয়। এইভাবে মুকুন্দদাসের লিখিত, পরিবর্তিত ও

সংশোধিত পালাগানগুলির মধ্যে যে চারখানি আজও বাঁচিয়া আছে—অর্থাৎ "সমাজ", "পল্লীসেবা", "ব্রহ্মচারিণী" ও "কর্মক্ষেত্র"—তাহা আলোচ্য গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে।

মুকুন্দদাস ছিলেন পুরুষসিংহ। তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্পের মধ্যে আত্মত্যাগী উৎসাহ ও বীরত্ব দেখা দিয়াছে। তিনি 'ছল চাতুরী, কপটতার' ধার ধারিতেন না এবং 'হুজুগে'র প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি পা থাকিতে লাঠিতে হাঁটিতেন না, চোখ থাকিতে চশমা পরিতেন না—তিনি ছিলেন স্বাবলম্বী ও স্বাধীনচেতা পুরুষ। তিনি তাঁহার প্রতিটি যাত্রাভিনয়ে দেশকে, জাতিকে গড়িবার পরিকল্পনা করিয়াছেন, "কর্মক্ষেত্র" রচনা করিয়াছেন এবং দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন। সমাজের প্রায় প্রতিটি বিসদৃশ দিক তিনি 'পর্যবেক্ষণ' করিয়াছেন এবং কিভাবে তাহা সংস্কার সাধন করা যায় সেই বিষয়ে যথেষ্ট কার্যকরী চিন্তার পরিচয় রাখিয়াছেন। স্বদেশী ও স্বজাতির জীবনের দুঃখ ও কলঙ্ক মুছিয়া দিবাব জন্য তিনি দেহ-মন-প্রাণ, এক কথায় জীবন সর্বস্ব পণ করিয়াছেন এবং ব্যক্তিগত জীবনেব সমস্ত সুখ-দুঃখের অনুভূতি বিসর্জন দিয়াছেন। মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত মুকুন্দদাস সারাজীবন 'তোমার নামেই জন্মি যেন, তোমাব নামেই মবি'—এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, জাতি আজ সেই ব্রতের সার্থক উত্তরসূরী, জন্মগত বর্ষে তাঁহারই উদ্দেশে এই শ্রদ্ধাঞ্জলি। অনেক দেরিতে হইলেও এপার বাংলা ও ওপার বাংলা আজ মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ। যে ঘুম ভাঙানির গান তিনি গাহিয়াছিলেন, তাহা আবালবৃদ্ধ-বনিতার 'চোখ খুলিয়া দিয়াছে'। এইখানেই মুকুন্দদাসের সাধনার ব্যবহারিক সার্থকতা। সঙ্গীত-শিল্পী-সাহিত্যিক শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন—"বহু রাজনৈতিক নেতার বক্তৃতা শুনেছি—তাঁদের একটা কথাও মনে নেই, কেননা সে সব বক্তৃতায় তরল উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটে উঠত এবং তা বাষ্পের আকারেই মিলিয়ে যেত, কিন্তু মুকুন্দদাসকে আজও ভুলতে পারিনি—কেননা যে লোক আত্মসমালোচনার প্রেরণা দেয়, তাকে ভোলা যায় না। তাঁর গানকেও ভুলতে পারিনি, কেননা সঞ্জীবনী মন্ত্র তাঁর কণ্ঠে ছিল এবং তা নিয়ে তিনি প্রাণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতেন।"

সত্যই জাতির 'প্রাণশক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ' করিবার জন্য মুকুন্দদাসের যাত্রা-গান যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন কবিয়াছিল, তাহা স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। মুকুন্দদাসেব যাত্রার ভাষা ছিল অত্যন্ত সহজ ও সরল। তাঁহার গানগুলি ছিল দেশপ্রেমিকের কণ্ঠহার, পতিত

মানুষের মুক্তির বাণী এবং পরাধীন জাতির অভয়মন্ত্র। দেশকে স্বদেশ হিসাবে ভালবাসিবার মন্ত্র মুকুন্দদাস যেভাবে দিয়াছিলেন, তাহা শুধু অভাবনীয় নয়, অভূতপূর্ব। তাঁহার আবির্ভাবেই স্বদেশী যাত্রা এবং তাঁহার অন্তর্ধানেই এই যাত্রার শেষ। তাই 'স্বদেশী যাত্রা' বলিতে আমরা মুকুন্দদাসের যুগ বুঝি। তাঁহার স্বদেশী যাত্রা-গান—জাগরণের গান, মরচে পড়া অন্তরকে শাণিত তরবারির ঔজ্জ্বল্যে পরিণত করার গান। মুকুন্দদাসের গান তাই সুর-তাল-লয়-মানে জমাট বাঁধা কয়েকটি কথার ফুলঝুরিই নয়—হৃদয়কে সাহসে-উৎসাহে আর মুক্তির আলোয় আলোময় করিয়া তুলিবার উজ্জীবন মন্ত্র। বিশ্বকবির গানে আমরা পাই রূপ সায়বে ডুব দিয়া অরূপ রতনের সন্ধান, আর চারণকবির গানে পাই—মহামুক্তির মন্ত্রোচ্চারণ, শৃঙ্খল উন্মোচনের অমোঘ শক্তি। মুকুন্দদাসের যাত্রা-গান তাই প্রতিটি দেশবাসীর কাছে এক বিশিষ্ট সম্পদ, মূককে মুখর করার দৈববাণী। এইখানেই মুকুন্দদাসের যাত্রা-গানের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা।

দেশ আজ মুক্ত, ভারত আজ স্বাধীন। কিন্তু ভারতের মুক্তি যুদ্ধে হারাইয়া যাওয়া বীর সেনাদলের কথা স্মরণ করিলে যাঁহাদের কথা সর্বপ্রথম মনে পড়িবে —মুকুন্দদাস তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। রাজপুতনার পর্বত-সঙ্কুল অবণ্যে স্বাধীনতাকামী রাজন্যবর্গকে তখনকার চারণকবিরা উজ্জীবিত করিয়া তুলিত তাঁহাদের রচিত অনবদ্য দেশপ্রেমের সঙ্গীত সুধায়। তাই অনাহারে সামান্য ঘাসের রুটি আহার করিয়া অযুত দৈহিক ক্লেশ সহ্য করিয়া তাহারা আবার প্রস্তুত হইতেন স্বাধীনতা সমরে। মুকুন্দদাসও দুর্বল, পরাধীন, পতিত জাতিকে সঞ্জীবন মন্ত্রে জাগাইয়া তোলার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাঁহার অভিনয়ে, তাঁহার গানের অপূর্ব প্রাণরসে, দৃঢ় ও বলিষ্ঠ কণ্ঠের ঔদার্যে। শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন—বর্বর শ্বেত শাসকের কবল হইতে জননীর শৃঙ্খলমোচন। এই আন্তরিকতা, এই অফুরন্ত উৎসাহ, প্রাণবন্ততাই ছিল—মুকুন্দদাসের যাত্রা-গানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

মুকুন্দদাসের যাত্রা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে, খোলা আকাশের নীচে—হাটে-মাঠে ও বারোয়ারীতলায় যেমন অভিনীত হইত, তেমনি প্রেক্ষাগৃহে ও রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবার পক্ষে কোন অসুবিধা ছিল না। ইহার রচয়িতা, সুরকার, গীতিকার, শিল্পীগোষ্ঠী ও দর্শক প্রায়শই 'লোকায়ত স্তরের মানুষ' ছিল। তাই আটপৌরে সহজ-সরল-প্রাঞ্জল ভাষার আবেদন দেশের ঘরে ঘরে নারী-পুরুষ-পণ্ডিত-নিরক্ষর নির্বিশেষে সকলের মধ্যে সাড়া জাগিয়াছিল। রামপ্রসাদের

গানগুলি যেমন ছিল মায়ের উদ্দেশে নিবেদিত "প্রসাদী সঙ্গীত", মুকুন্দদাসের যাত্রা-গানগুলিও তেমনি ছিল—শ্যাম-শ্যামা মন্ত্রে দীক্ষিত ও নিবেদিত "সাধন সঙ্গীত।" রামপ্রসাদের ভাষা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"যে তুলা পেঁজে, যে কুট্‌না কাটে, সেও বোঝে, সেও আস্বাদ করতে পারে।" মুকুন্দদাসের ভাষা প্রসঙ্গে এই কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে। শরতের শিউলি ঝরা ফুলের মত তাঁহার ভাষা আপনি আসে, আপনি ফুটে আর আপন সৌরভে দশদিক আমোদিত করিয়া দেয়। তাই দেশের সর্বস্তরের মানুষের মনকেই উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিত তাঁহাব যাত্রার সংলাপ ও গান। অভিনয়কালে আসর অনুযায়ী সংলাপকে বা বক্তৃতাকে দীর্ঘ বা হ্রস্ব করিয়া স্বদেশ মন্ত্রে সকলকে উজ্জীবিত করিয়া আবার পূর্বের প্রসঙ্গানুযায়ী সংলাপে ফিরিয়া আসাই ছিল মুকুন্দদাসের যাত্রাভিনয়ের মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

মুকুন্দদাসের যাত্রা—স্বদেশী যাত্রা হওয়ায় তাহা ছিল উদ্দেশ্যমূলক, উদ্দীপনা-মূলক ও ভাবোদ্দীপক। তাই তাঁহার দৃপ্ত কণ্ঠে আমরা পাইয়াছি হারাইয়া যাওয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষার পুনঃপ্রাপ্তি, বাহুতে পাইয়াছি দশভুজার বরাভয়ের আশিসধারা। গানের প্রতিটি কলি যেন নির্ঝরিণীর সাবলীল ধারা। সহসা কখনও কখনও উপলখণ্ডের প্রতি ধাক্কা লাগিয়া সায়নের দিকে প্রবহমান হইতেছে। তাঁহার গানে যে ওজগুণ নাই এমন কথা আমরা বলিতে পারি না। যে কবির জীবন ঘাত-প্রতিঘাতময়তার মধ্যে অগ্রসর হইয়াছে, সেক্ষেত্রে ইহার চেয়ে সূক্ষ্ম মনস্তাত্বিক অথবা রচনা-শৈলীজাত রহস্যময়তা (Mystery) আশা করিতে পারি না। তাঁহার স্বরচিত গানগুলি প্রায়ই মিশ্ররাগ ও রাগিণীতে গীত হইয়াছে। ইহাও ছাড়াও আছে খাটি সিং: মালকৌশ, আরানা ইত্যাদি। তালের মধ্যেও আছে—দাদ্‌রা, মালসী, একতাল, চৌতাল ঝাপ, ঘৃতাঙ্গি (দশমাত্রা) ও তেওড়া অত্যধিক। রাগ রাগিণীর সূক্ষ্ম বিচারে হয়তো তাঁহার সঙ্গীত অনেকখানি ম্লান হইয়া উঠিবে ঠিকই ; কিন্তু ম্লান ম্রিয়মাণ মূক মুখে ভাষা যোগানোর ব্রতে সে সঙ্গীত ছিল অমূল্য ও অনন্যা।—

'জাগিবে জননী কুলকুণ্ডলিনী,
জাগিবে শক্তি জাগিবে রে।
খুলে যাবে প্রাণ দিতে পারবি প্রাণ,
স্বদেশ কল্যাণ তরে রে।"

সাবলীল স্বচ্ছন্দ গতি মুকুন্দদাসের ছন্দ বৈশিষ্ট্য। গানের পঙ্‌ক্তিগুলির মধ্যে অন্তমিল প্রায়ই দেখা যায়। মিত্রাক্ষর (ক-খ-ক-খ) ছন্দের ব্যবহারও যথেষ্ট।

দেশের সর্বস্তরের মানুষের মনকেই উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতে এই ছন্দ মন্ত্রশক্তির মত কাজ করিত। তাই মুকুন্দদাসের সঙ্গীতে এই ছন্দের ব্যবহার খুব বেশী। এক কথায় মুকুন্দদাসের সঙ্গীতে ছিল মুক্তিকামী দেশবাসীকে জাগাইয়া তুলিবার মহামন্ত্র, জীয়ন কাঠির অভিপ্রেত স্পর্শ। মুকুন্দদাস বাংলার জাতীয় কবি ও চারণকবি।

সত্যই 'মুকুন্দদাস'—স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় নাম। তাঁহার স্বদেশী যাত্রা-গানের স্বাভাবিক আকর্ষণ চল্লিশ বছর আগে বাঙালীর প্রাণকে কিরূপ চঞ্চল করিয়াছিল তাহা এক স্মরণীয় ইতিহাস। এই যাত্রা-গান শুনিবার সৌভাগ্য যাঁহার হইয়াছে, তিনিই স্বদেশপ্রাণতায় দীক্ষিত হইয়াছেন। তিনি কোন ধর্ম প্রচার করেন নাই, সর্বধর্ম সমন্বয়ে মূলীভূত যে শক্তি তাহাই তিনি গাহিয়াছেন—

"আমরা সকলে এক মায়ের ছেলে,
এই মহামন্ত্র ভুলবো না।"

মুকুন্দদাস এই মহামিলনের চারণকবি ছিলেন। মা কালীর অনুরাগী ভক্ত অথচ গভীরভাবে দেশপ্রেমিক ও সামাজিক—রাজনৈতিক অন্যায়-অত্যাচারের প্রতি তীব্র বিদ্রোহী ভাবাপন্ন এইরূপ মনীষী দুর্লভ। যাঁহারা শহরবাসী তাঁহারা নানা দিক হইতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শঙ্খধ্বনি শুনিতে পান। ফলে তাঁহাদেব রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা লাভেব সুযোগ অনেক বেশী। কিন্তু গ্রাম-বাসীদের সেই সুযোগ নাই। বিশেষতঃ এই শতকের গোড়ার দিকে দেশব্যাপী শিক্ষার ও সংবাদপত্রের বিস্তার তেমন ছিল না। কিন্তু সেদিনের বাংলাদেশের গ্রাম্য জীবনে জাতীয় ভাবধারা ও সামাজিক চেতনা সঞ্চারের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন—চারণকবি মুকুন্দদাস। এই দিক দিয়া তাঁহার অবদানের কোন তুলনা নাই। মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রা লোক-শিক্ষা প্রচারের এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

মূলতঃ স্বদেশী যাত্রার ইতিহাস—চারণকবি মুকুন্দদাসের ইতিহাস। মুকুন্দদাসের জীবন-সংগ্রামের সঙ্গে আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। নাটকের আঙ্গিক বিচারে প্রধান হইল চরিত্র। মুকুন্দদাসের যাত্রায় একটি চরিত্রই প্রধান হইয়া উঠে এবং সেই চরিত্রে তিনি নিজেই অভিনয় করিতেন (যথা—'সমাজ'-এর ভাবুক সত্য, 'পল্লীসেবা'তে পল্লী সমিতির চালক সন্ন্যাসী, 'ব্রহ্মচারিণী'-তে ব্রহ্মচারী প্রেমানন্দ ও 'কর্মক্ষেত্র'-এ কর্মী-গৃহস্থ বাউল)। বলা বাহুল্য, এই চরিত্রগুলি আদর্শ ও প্রাণরসে ভরপুর।

অন্যান্য চরিত্রগুলি তাঁহাকে ছায়ার মত অনুসরণ করিয়াছে। উদ্দিষ্ট চরিত্রগুলির যে পরিবর্তন হইয়াছে তাহা কিন্তু শুধু বাহ্যিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে নয়, বরং অন্তরের তাগিদেই তাহা সম্ভব হইয়াছে! সৎচিন্তা, সৎ-বুদ্ধি, সৎকর্মের প্রেরণা তাহাদের মধ্যে জাগ্রত হইয়াছে। 'এই দিক হইতে বলা যায় চারণকবি একাধারে যেন দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং তনু' শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর কলিহত জীবের উদ্ধারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কবি 'সমাজ'-পালায় তাই বলিয়াছেন—"তোমরা যতদিন সেই শ্রীচৈতন্যের আদেশে অনুপ্রাণিত হয়ে আচণ্ডালে কোল দিতে না পারবে, ততদিন পর্য্যন্ত তোমাদের ভারতেব কল্যাণ নেই।" মুকুন্দদাসের যাত্রায় এই সনাতন ভাবধারা ও ঐতিহ্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

আধুনিক যাত্রায় বক্তৃতার অবসর নাই বলিলেই চলে—সংলাপের প্রাধান্যই সেখানে বেশী। কিন্তু মুকুন্দাসের যাত্রায় সংলাপের চেয়ে বক্তৃতা আর গান—আজকের অভিনয় শৈলীতে ইহা ভাবা যায় না। মুকুন্দদাস তাঁহাব শ্রোতাদের উদ্বুদ্ধ করিব৷র জন্য মাঝে মাঝে দীর্ঘ বক্তৃতাব অবতারণা করিতেন। এই শ্রেণীর বক্তৃতা সাধারণত নাটকের স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করে। কিন্তু মুকুন্দদাসের ক্ষেত্রে এই কথা বলা চলে না। অভিনেতার ব্যক্তিত্ব ও বাচন-ভঙ্গি—এমনই আকর্ষণীয় হইত যে, শ্রোতৃমণ্ডলী কখনও তাঁহাব বক্তৃতাকে বাহুল্য বলিয়া মনে করে নাই বা অধৈর্য হইয়া উঠে নাই, তাহারা মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহা শ্রবণ করিত। বাংলা নাটক প্রথম হইতেই দুইটি উদ্দেশ্য পালন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে—প্রথমটি সমাজ সংস্কার, দ্বিতীয়টি দেশাত্ম-বোধের জাগরণ। মুকুন্দদাসের বক্তৃতা-গান-অভিনয়ে—এই দুই উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইয়াছে। তাই 'বক্তৃতা' মুকুন্দদাসের গীতাভিনয়ে একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। যাত্রা বা নাটকে সংলাপের কাজ দুইটি চরিত্রগুলিকে পরিস্ফুট করিয়া লইতে সাহায্য করা। মুকুন্দদাসের যাত্রায় সংলাপ বা বক্তৃতা দীর্ঘ হইলেও তাহা নাট্যগতির পরিপন্থী হয় নাই। শ্রোতার মন জয় করিতে তিনি যে কোন কবি বা লেখকের গান কিংবা বক্তৃতা তাঁহার পালায় অন্তর্ভুক্ত করিতেন, এই জন্য কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। মুকুন্দদাস নিজেই বলিয়াছেন—"আমার সম্বল বৃন্দাবনের বৈরাগীর মাধুকরী। মধুকর রূপে যেখানে যে ফুলে মধু দেখিব তাহা সংগ্রহ করিব। আমার শ্রোতা, দেশের জনসাধারণকে যে ঔষধ খাওয়াইতে চাই, তাহা যে অনুপাতে গ্রহণ করাইবার সুবিধা দেখিব তাহাই গ্রহণ করিব।"

মুকুন্দদাস তাৎক্ষণিক মূল্যের দিকে তাকাইয়া তাঁহার যাত্রা রচনা করিয়া-

ছিলেন। তাই তাঁহার নাটকের বিষয়বস্তুর আবেদন বর্তমানে আর তেমন সাড়া জাগায় না। বিদেশী শাসন আর 'রেশমী চুড়ি'-র যুগ আজ আর নাই। তাহা ছাড়া তাঁহার গান—বক্তৃতা—অভিনয়ের মাধ্যমে যাত্রা কৌশল বর্তমান কালে অনেকটা অচল। কবি তাঁহার একক অভিনয় ও সঙ্গীতের প্রাণ প্রাচুর্যে সবাইকে মাতাইয়া রাখিতেন, কিন্তু এ-কালে তাঁহার দোসর কোথায়? তথাপি বলা যায় যে, ঋজু-কঠিন-তীক্ষ্ণ ভঙ্গিতে তিনি যাহা বলিয়াছেন; তাহার মূল কথাই ছিল—মন ও জাতির উন্নতির কথা। সেই কথা বলিবার প্রয়োজন বোধ হয় সবচেয়ে বেশী। আধুনিক থিয়েট্রিক্যাল যাত্রায় সঙ্গীতের ব্যবহার বহুলাংশে কমিয়া গিয়াছে—কিছু সঙ্গীত নৃত্য-সহযোগে, আবার কিছু সঙ্গীত পাশ্চাত্য ঢঙে রং-এ পরিবেশন করা হয়। "স্বদেশী যাত্রা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা হইতে ভক্তির ভাব দূব হইয়া গেল, এমনকি এতদিন পর্যন্ত যে রামায়ণেব দলে একজন মাত্র গায়েন ৩।৪ জন দোহাবেব সহায়তায় রামায়ণের এক একটি অংশ দিনের পর দিন পরিবেশন করিয়া যাইত, তাহার সেই দল ভাঙ্গিয়া রাম-যাত্রার দল গঠিত হইল" (বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য)। এইরূপে চণ্ডীমঙ্গলের দল ভাঙিয়া 'চণ্ডীযাত্রা', মনসা মঙ্গলের দল ভাঙিয়া 'ভাসান যাত্রা'র সৃষ্টি হইল। কিন্তু মুকুন্দাসের স্বদেশী যাত্রা ভাঙিয়া আর কিছু হইল না, তাহা খাঁটি স্বদেশী যাত্রাই রহিয়া গেল। আধুনিক কালের যাত্রা নাটকগুলি অধিকাংশই অল্পবিস্তর রূপকধর্মী। যাত্রা বা নাটকেব মূল উপজীব্যকে সরাসরি উপস্থাপনা দর্শক এখন আর পছন্দ করেন না—ইঙ্গিতবহ ব্যঞ্জনাই এখন মুখ্য। রূপের আড়ালে অরূপকে খুঁজিতেই দর্শক ভালবাসে। কিন্তু চারণকবির শ্রোতাদের মানসিকতা এমন ছিল না, তাই স্বদেশী যাত্রা বলিতে এখনও আমরা মুকুন্দদাসের কথাই বলি। মুকুন্দদাস স্বদেশী যাত্রার স্রষ্টা ও রূপকার, প্রবর্তক ও প্রচারক।

বস্তুতঃ, "স্বদেশী যাত্রা ও মুকুন্দদাস"—যাত্রা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি বিশেষ অধ্যায়। গণ-জাগরণের মহান দায়িত্ব যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, মুকুন্দদাস তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। "একদিন যাত্রার আসর কেবলমাত্র রাধাকৃষ্ণ, ভীমার্জুনই অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু নূতন যুগে প্রবেশ করিয়া ঐতিহাসিক চরিত্রও ইহার লক্ষ্য হইয়া উঠিল। এই ঐতিহাসিক চরিত্রের সূত্র ধরিয়াই ক্রমে ইহাতে সামাজিক চরিত্রের আবির্ভাবের সূচনা দেখা দিল। তখন আর কেবল পৌরাণিক চরিত্র নহে, এমন কি ঐতিহাসিক চরিত্রও নহে, আমাদের চারিদিককার সমাজের নর-নারীও ইহার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিল। স্বদেশী

যুগের যাত্রায় প্রধানত ঐতিহাসিক চরিত্রই স্থান লাভ করিলেও স্বদেশী আন্দোলন ক্রমে স্থিতি লাভ করিয়া যখন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত হইল, তখন ইহাতে সাধারণ মানুষের নানা সমস্যার কথাও নানাভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল। একদিন এই শ্রেণীর যাত্রায় মহাপুরুষের জীবন কথা কীর্তিত হইয়াছে, কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষের জীবনও ইহার বিষয়ীভূত হইল। এই যুগে একজন শ্রেষ্ঠ যাত্রা রচয়িতার জন্ম হয়, তাহার নাম মুকুন্দদাস" (বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য)। তবে কি মুকুন্দদাস একটি বিশেষ যুগের চারণকবি? তাহার কণ্ঠ সত্যই কি চিরতরে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে? শেষ হইয়া গিয়াছে স্বদেশী যাত্রা-গানের রেশ? না—তাহা তো নয়, শেষের পরেও যে অশেষ আছে। সাধারণতঃ উদ্দেশ্যমূলক গল্প কাহিনীর ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা তৎকালীন যুগেই সীমাবদ্ধ থাকে, যুগের বেড়া অতিক্রম করিবার দিকে তেমন নজর থাকে না। কিন্তু চারণকবির যাত্রা-গান যুগের প্রয়োজনে লিখিত হইলেও দেশকালের সীমার কোন ফাঁক দিয়া তাহা যুগোত্তীর্ণতা লাভ করিয়াছে।

আমাদের জাতি আজও মুকুন্দদাস উত্থাপিত দোষ-ত্রুটি মুক্ত নয়। জাতি-ভেদ, অস্পৃশ্যতা, বিদেশীদের অনুকরণপ্রিয়তা, পণপ্রথা ইত্যাদি প্রগতির পথে যাহা কিছু বাধা স্বরূপ তাহা আজও আমাদের মধ্যে বর্তমান, আজও বাঙালী আলস্যে ভরা এবং অতীতের সুখ স্বপ্নে ও স্মৃতিতে বিভোর। ফলে নবলব্ধ স্বাধীনতা প্রাপ্ত অথচ আত্মবিস্মৃত বাঙালীকে জাগরণের গান কে শুনাইবে? স্বাধীনতা পাওয়ার চেয়ে রক্ষার মূল্য বেশী। বিনামূল্যে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না, তাহার জন্য মূল্য দিতে হয়। অর্থদান, রক্তদান, শ্রমদান ও প্রাণদানের মাধ্যমে এই মূল্য নিরূপিত হয়। স্বাধীনতার সংগ্রাম কোন দিন স্তব্ধ থাকে না। তাই মৃত্যুঞ্জয়ী মুকুন্দদাসের মরণজয়ী গানের সমাদর কোনদিন কমিবে না, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের যোগসূত্ররূপে ইহা চিরকাল 'কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল' হইয়া থাকিবে। দেশ আজ স্বাধীন বটে, কিন্তু কবির কথা—

"হাসিতে খেলিতে আসিনি এ জগতে
করিতে হবে মোদের মায়েরই সাধনা।"

—আজও সমানই সত্য। আজও দেশে পণ-প্রথা, 'জাতের নামে বজ্জাতি' ও 'ছলচাতুরী কপটতা' সমানই চলিতেছে, কিন্তু মুকুন্দদাসের গানে যে 'হাঁড়ি মুচির চোখ খুলেছে', সেইদিকে নজর দিবার সময় আসিয়াছে। সভ্যতার শাসন-নিয়ম, সভ্যতার কৃত্রিম শৃঙ্খল যতই আঁট হয়, হৃদয়ে-হৃদয়ে স্বাধীন মিলন,

প্রকৃতির অনন্ত ক্ষেত্রের মধ্যে কিছুকালের জন্য রুদ্ধ হৃদয়ের ছুটি ততই প্রয়োজন হইয়া পড়ে, মুকুন্দদাসের যাত্রা সেই মহামিলনের শান্তিনিকেতন, মুকুন্দদাসের গান—বদ্ধ হৃদয়ের দ্বার খোলার গান, শ্রান্ত-ক্লান্ত-রিক্ত মানুষের মুক্তির গান। তাই মানুষের চিত্তে, ভবিষ্যতের ইতিহাসে ' মুকুন্দ" নামটি বিধাতার আশীর্বাদে অমৃতের টীকা পড়িয়া বাঁচিয়া থাকিবে। কারণ "মুকুন্দদাস তাঁর অভিনয়ে একজন উপদেষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতেন। সেটা তাঁর নির্দিষ্ট পাঠ হলেও সেটা ছিল নামমাত্র। সেই ভূমিকাটুকু অবলম্বন করে নানা প্রসঙ্গে তিনি মর্মস্পর্শী বক্তৃতা এবং গান করে যেতেন। বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রোতাকে আহ্বান করে তিনি তাদের নানা ত্রুটির কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন, উন্নতির জন্য আবেদন করতেন, তাঁদের জাতীয়তাবোধ এবং সমাজচেতনা উদ্দীপ্ত করতে চেষ্টা করতেন। তারপরে আবার ফিরে আসতেন তাঁর ভূমিকায়। তাঁর অভিনয়গুলিতে প্রত্যেকটি চরিত্র ছিল সমাজের এক-একটি বিশেষরূপের প্রতীক। আমাদের সমাজের প্রায় প্রতিটি 'ভিলেন'কেই তিনি তাঁর অভিনয়ে নিপুণভাবে রূপায়িত করেছেন। এই নৈপুণ্য এবং যথাযথ চরিত্র বিশ্লেষণের জন্য শ্রোতাদের উপর তাঁর প্রভাব যে কী বিরাট ছিল, তা না প্রত্যক্ষ করলে ধারণা করা যায় না।" এই অসাধারণ ও অভূতপূর্ব প্রতিভার জন্য মুকুন্দদাস স্বদেশী যুগের কবি হইয়াও সর্বকালের সর্বযুগের চারণদের প্রতিনিধি 'চারণ-সম্রাট', নব-ভারতের নবীন কাণ্ডারী নব-ভাবের, নব-পথের দিশারী, নবযুগের নবীন স্রষ্টা, এক দেশবরেণ্য কবি।

॥ মুকুন্দদাসের অপ্রকাশিত গীতাবলী সংগ্রহ ॥

॥ মুকুন্দদাস-রচিত প্রথম অপ্রকাশিত সঙ্গীত ॥

(১)

"কৃষ্ণনাম বড়ই মধুর
যে লয় সে বড়ই চতুর।
নামের আছে এমনি শক্তি
এই নামাভাষে হয় রে মুক্তি
যে লয় নাম করে ভক্তি
হয় রে তার মায়ামোহ দূর।
(আমার) এই কৃষ্ণনামের মহিমা
সদাশিব তার আছে নিশানা।
শিব ত্যজিয়ে কৈলাস বাসনা
শ্মশানে নামেতে বিভোর।
এই কৃষ্ণনামের মাধুরী
আমি যাই বলিহারী,
এ মাধুরী জানে কেবল ব্রজনাগরী
যাদের প্রাণে যুগল কিশোর
গোঁসাঞ রামানন্দের বাণী,
শোন মুকুন্দ তোরে বলি
তুই পেয়ে এমন সাধের যোগী
হরেকৃষ্ণ ভজলি নারে মূঢ়।"

১৩০৮ বঙ্গাব্দের বসন্ত ঋতুতে নিজের মুদি দোকানে বসিয়া যজ্ঞেশ্বর তথা মুকুন্দদাসের রচিত এই প্রথম সঙ্গীতই তাঁহার ভবিষ্যৎ নাম প্রচারের সর্বপ্রথম গোপনাভিব্যক্তি। মনে হয়, অমর সঙ্গীত-রচয়িতা ও গায়ক—চারণ-কবি মুকুন্দদাসের ভবিষ্যৎ বিরাট বিজয়ের উহাই অভিষেকী বিদ্যুৎবাহী আকাশবাণী।

মুকুন্দদাসের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সাধনলব্ধ প্রচেষ্টায় এবং প্রবীণ বিপ্লবী শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত মহাশয়ের সৌজন্যে আমরা এই উল্লেখযোগ্য গীতটি সংগ্রহ করিয়াছি। ইহার জন্য আমরা উভয়ের নিকট ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

চারণ-কবি মুকুন্দদাসের

(অপ্রকাশিত গীতাবলী)

(২)

শ্যামা মা তোর পাগলা ছেলে,
আমায় দয়া কর মা শ্যামা ॥
সাধ করে মা এলাম হাটে
মনের মত দেখবো খেটে,
পারি কিনা হৃদয়পটে
আঁকতে শ্যামারূপে মা ॥
পড়িলে সংকটে—
ছেলে কাঁদে মার নিকটে,
তাই এ মুকুন্দ রটে
আমায় এবার তবাও মা ॥

গীত সংখ্যা—২০২, পৃষ্ঠা ১৭০

(৩)

তোরা পাশ করে হো'স মরা।
থাকে না শৌর্য-বীর্য, শুধু মুখের বোলেই
জিনিস ধরা ॥
পড়ে ভাই এ. বি. সি. ডি., সাহেব হবার সাধটি যদি
তবে কেন ড্যাম ব্লাডি শুনেও তাদের ছাড়া,
তারা কি ছাড়ে রে তোরে বল্লে এমন ধারা,
তাতেই বলি শিখলি ভাল
কেবল তা'দের পোষাক পরা।

গীত সংখ্যা—৭, পৃষ্ঠা ১৬

(৪)

হরি বল রে মন আমার
হলে হবে লাঠির ঘায়ে ভারত উদ্ধার
পাঠাইলে ফল হবে না
দরখাস্ত আঁটি আঁটি
ধর লাঠি, দে মাটি
কিসের কান্নাকাটি ॥

গীত সংখ্যা—৬, পৃষ্ঠা ১৩

(৫)

আয় রে সকলে ভাই ভাই মিলে
মায়ের নামে আজ মেতে যাই,
ঘরের ছেলে ঘরে আয় রে তোরা ফিরে
সবে মিলে মায়ের জয় গাই ॥
আত্মপর ভাব ভুলে যাবে সবে
কাঁপা রে জগৎ সচ্চিদানন্দ রবে,
ছাড় রে হুঙ্কার খেলুক রে বিজলী
চলে যাক আঁধার আলোক পাই ॥
যাঁদের ডাকে একদিন জগৎ দিল সাড়া,
মোদের পূর্বপুরুষই তো তাঁরা,
উঠে পড়ে লাগ নূতন দিতে হবে,
এ জগতে এখন নূতনই চাই ॥
ভয় আছে কি রে যদিও ছোট হই,
মায়ের নামের ডঙ্কায় হয়ে যাব জয়ী,
সমগ্র জগৎ হবে গলাগলি—
কহিছে মুকুন্দ দেখিবে তাই ॥

গীত সংখ্যা—২০৪, পৃষ্ঠা ১০৪

(৬)

নগর চেয়ে কানন ভাল
নাইকো সেথা কোলাহল।

ভক্তি ভরে মধুর স্বরে—

মন রে একবার হরি বল।

প্রতিধ্বনি গম্ভীর স্বরে

বলবে হরি দূরে ঘুরে

বনের পাখী বলবে হরি

তুলবে প্রেমে কুসুম দল॥

গীত সংখ্যা—১১৫, পৃষ্ঠা ২২৭

(৭)

আমার বাঁধন ছাড়া প্রাণ।

হাসি যখন হাসান তিনি,

কাঁদি তিনি যখন কাঁদান॥

যখন তাঁর শুনি বাঁশী

পাগল হয়ে ছুটে আসি।

দর্শনে তাঁর হই উদাসী

ধরতে গেলে দৌড়ে পালান॥

চাঁদিনী হয় স্থির গগনে

কতই সুধা ছড়ান বনে

আমি তখন আপন মনে

সাজাই বাসরখান॥

যদি থাকে কর্মে লেখা

একদিন তাঁর পাবোই দেখা

বক্ষে ধরে প্রিয়তমে

অধর সুধা করবো লো পান॥

গীত সংখ্যা—১১৬, পৃষ্ঠা ২২৯

(৮)

সাধে কি বলি গো পাষাণী (শ্যামা তোরে)

ছেলে কাঁদে 'মা' 'মা' বলে, দেখিস না আঁখি মেলে

তোর স্নেহের বালাই লয়ে মরে যায় জননী॥

ক্ষুধা দাবানলে জ্বলে, কত ভাই মরে গেল,
তাদের হাহাকার যখন আকাশেই মিশে গেল,
তবে কি গুণে তোরে বলি গো দয়াময়ী
পতিত পাবনী শ্যামা অধমতারিণী ॥
দেখে তোর ব্যবহার বুক ভেঙ্গে গেছে গো মা
অবিচার অত্যাচার আর প্রাণে সহে না মা,
যেন হেন মনে লয় অকালে করিবি লয়
ভারতবাসী সমুদায় নরমুণ্ডমালিনী ॥
মুকুন্দ কি বলবে আর বলবার নাই কিছু মা গো,
সুখে থাক সুখময়ী যা ইচ্ছা কর মা গো,
মনে রেখো ইচ্ছাময়ী জানি না চরণ-বই
পারের ভেলা করেছি তোর ও চরণ দু'খানি ॥

গীত সংখ্যা—৯৫, পৃষ্ঠা ১৮৯

(৯)

সোনার ঘরে জ্বালিয়ে আগুন
ভাবছিস বেটী থাকবি সুখে।
মরণকে আজ করলি বরণ
জীবন ভরে কাঁদবি দুখে ॥
ভাঙ্গা সহজ গড়া কঠিন
গড়লেই মোদের আসবে সুদিন,
নিভিয়ে দে লো ঘরের আগুন
জ্বালিস নে আর ফুঁকে ফুঁকে ॥
যাদের লাগি তুই পাগল পারা
সেই ছেলেটা তোর লক্ষ্মীছাড়া,
মেয়েটা ঘোর বিলাসিনী
একদিন কালি দিবেই মুখে ॥

গীত সংখ্যা—১১৭, পৃষ্ঠা ২৩১

(১০)

হা হা হা, হি হি হি, দুনিয়াটাই গোল,
এই দুনিয়াটাই গোল ॥

যার আছে তার গোল, যার নাই তার গোল
টাকাটাই গোল ॥
ঠাকুরের বিশ্ব যাঁতায় কেউ থাকে না
সব পিষে যায়,
আছে যার কপাল ভাল
সে লেগে যায় মুষলের গায়,
বাঁচবে কেবল সে, আর সকলের ভাঙবে মাথার খোল্ ॥
সবই তাঁর বদ্ধকারার চিড়িয়াখানার পাখী,
কে জানে লো কখন কারে নিবেন তিনি ডাকি।
কারো বাজবে বিয়ের ঢোল,
যমপুরীতে (কারো) বাজবে বিয়ের ঢোল ॥

গীত সংখ্যা—১১৯, পৃষ্ঠা ২৩৫

(১১)

বন্দে জননী তব রাতুল চরণ
ত্রিশ কোটী দীন সন্তানগণে।
ভীত চকিত আজি দ্বন্দ্ব সংগ্রামে
বর্ষি করুণা কণা, কল্যাণময়ী তুমি
কল্যাণ কর আজি কৃপা বিতরণে ॥
দেখাই জগতে মোরা কার বলে বলীয়ান
কার ইঙ্গিতে চলে কোটী কোটী সন্তান
কার নাম গানে, কার রূপ ধ্যানে
নৃত্য করে ত্রিশ কোটী নরনারী।
মাভৈঃ শুনিলে যবে অভয় হইয়ে সবে
একই পতাকাতলে আবার মিলিত হবে,
ভুলে যাবে দলাদলি, হইবে গলাগলি
শান্তি হবে পুনঃ প্রীতি চন্দনে ॥
তবেই হবে মোদের দুঃখ নিশার অবসান
সন্তান পাইবে পুনঃ মায়েরি সন্ধান।
মা, মা বলিয়া উঠিবে গর্জিয়া
গাহিবে কোটী কণ্ঠে জয় মা তোমারি।

এ মহাযাত্রাকালে জয়টীকা দে গো ভালে
ব্যোম, ব্যোম হর বলি নাচি আজ রুদ্র তালে,
তবে বিশ্ববিজয়ী সেনা, বিশ্বজয় না করি ফিরিবে না,
মা তোর এ ভারত-নন্দনে ॥

গীত সংখ্যা—১৭৪, পৃষ্ঠা ১০৬

(১২)

কুলকুণ্ডলিনী তুমি কে.
এখনো মা ঘুমে যে ॥
তুমি ঘটে ঘটে আছো গো মা চৈতন্যরূপে,
তুমি মম ঘটে অচৈতন্য হলে কিরূপে ?
তুমি নাকি জগতেরই মা—
আমি কি এ জগৎ ছাড়া
ওগো কুসন্তানে যে মায়ের আদর
"মা" বলি তাকে ॥
দেখাও দাস মুকুন্দে, যুগল রাধা-গোবিন্দে,
তোমার দয়াময়ী নামের ডঙ্কা বাজুক ত্রিলোকে ॥

গীত সংখ্যা—৯১, ১৮১

॥ মুকুন্দদাসের প্রকাশিত গীতাবলী সংগ্রহ ॥

(১)

ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে,
মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে ॥
তাথৈ তাথৈ থৈ দ্রিমী দ্রিমী দং দং,
ভূত পিশাচ নাচে যোগিনী সঙ্গে।
দানব দলনী হয়ে উন্মাদিনী,
আর কি দানব থাকিবে বঙ্গে ॥
সাজ রে সন্তান হিন্দু মুসলমান,
থাকে থাকিবে প্রাণ না হয় যাইবে প্রাণ।
লইয়ে কৃপাণ হও রে আগুয়ান,
নিতে হয় মুকুন্দে-রে নিও রে সঙ্গে ॥ *

শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৬, পৃষ্ঠা—৪

(২)

ভারতের ভগ্ন প্রাণগুলি লগ্ন করে দে মা,
মগ্ন হউক তব চিন্ময়ী রূপ ধ্যানে।
গণ্ডী ভেঙ্গে ফেলে মুক্ত গগন তলে,
দাঁড়াক মিলনপ্রার্থী চূর্ণ করি অভিমানে ॥

* ১৩১৩ বঙ্গাব্দে স্বদেশী আন্দোলনে মরা গাঙে বান ডাকিল। বৈষ্ণব মুকুন্দের হৃদয়-তন্ত্রী মাতৃমন্ত্রে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল—দেশকে জড় না ভাবিয়া বাংলার আরাধ্যা চৈতন্যময়ীকে কালী-দুর্গা মূর্তিতে অঙ্কিত করিয়া তাঁহারই উদ্দেশ্যে জাতিকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা লাভের জন্য আহ্বান জানাইলেন। ফলে মরণভীত বাঙালী মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়া উঠিল এবং "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন" হইয়া "ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল জীবনের জয়গান।"

তোমারই সৃজিত বিশ্ব তোমারই তো সৃষ্ট ফুল,
তোমার বিরুদ্ধে আজ বিদ্রোহ ঘোষণা।
ভুল ভেঙ্গে দেও মাগো আনন্দে নৃত্য করি,
ছুটুক পরাণ গঙ্গা মুক্তি সাগর পানে ॥
তরুণ ভারতে আজ হতেছে যে অভিনয়,
কে জানে কোথায় হবে এ নাটকের অঙ্ক শেষ।
যবনিকার অন্তরালে জানি না কোন চিত্র আঁকা,
ধ্বংসের ভৈরব গর্জন মুহুর্মুহুঃ শুনি কানে ॥

১। শ্রীকালীপদ দাস —"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—১, পৃষ্ঠা—১

২। শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস—' দেশভক্ত ৺মুকুন্দচন্দ্র দাসের গান", গীত—৩, পৃষ্ঠা—২

(৩)

কার কম্বু নিনাদে জানি অমৃত বরষিল,
কোটী কোটী নরনারী মৃতদেহে পেল প্রাণ।
তাই শত শতাব্দী পরে মায়ের করুণাহ্বানে,
জননীর মুখ চাহি, পাগল হিন্দু মুসলমান ॥
ললাটে বিজয় টীকা দীপ্ত নয়নগুলি,
আগ্নেয়গিরি যেন উগাবে অনল রাশি।
পদ ভরে থর হরি কাঁপিছে বসুন্ধরা,
চমকিত অরিকুল, দেখে নব অভিযান ॥
ব্যর্থ হবে না হতে পারে না এ আয়োজন,
নারায়ণী সেনা পাবে যখনি যা প্রয়োজন।
নির্ভয়ে এগিয়ে চল পাবি বে বিজয় লক্ষ্মী,
ভারতের কর্ম রথের সারথী শ্রীভগবান্ ॥

শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৫, পৃষ্ঠা—৩-৪

(৪)

মায়ের নাম নিয়ে ভাসান তরী—[১]
যেদিন ডুবে যাবে রে, যেদিন ডুবে যাবে রে।
সেদিন রবি চন্দ্র ধ্রুবতারা,
তারাও ডুবে যাবে রে, তারাও ডুবে যাবে রে॥
নবভাবের নবীন তরী যাকেই করেছি কাণ্ডারী।
হউক না কেন তুফান ভারী,
আর কি তরী ডুবে রে, আর কি তরী ডুবে রে॥
বহুদিন পরে আবার মরা গাঙে পেয়ে জোয়ার,
জোয়ারে ধরেছি পাড়ি—
আর কি তরী ঠেকে রে, আর কি তরী ঠেকে রে॥
মুকুন্দ দাসে ভণে উজানেও ভয় করিনে,
মায়ের নামের বাদাম টেনে,
উজান ধরে যাব রে, উজান ধরে যাব রে॥ *

১। শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—২ পৃষ্ঠা—১-২

২। বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী", —'পল্লীসেবা' পৃষ্ঠা—২৬

(৫)

ভাই রে মানুষ নাই এ দেশে—
এ দেশের সকল মেকি সকল ফাঁকি,
যে যার মৌজে আপন রসে॥

* মুকুন্দের বিদ্রোহী মনোভাবে ইংরেজ সরকার শঙ্কিত হইয়া পড়েন। তাঁহাকে রাজদ্রোহের অপরাধে তিন বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। জেলে থাকাকালীন তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী সুভাষিণী দেবী পরলোক গমন করেন। নিদারুণ শোকে মুকুন্দদাস মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। কিন্তু জেল হইতে বাহির হইয়াই তিনি শিশুপুত্র কালীপদ দাস এবং কন্যা সুলভাকে সঙ্গে লইয়া আবার অভিনয়ে মন দিলেন। ভাঙ্গা দল জোড়া লাগাইয়া তিনি "মায়ের নাম নিয়ে" তরী ভাসাইলেন।

পাঠান্তর :—(১) "সাধে কি বলি—
মায়ের নাম নিয়ে ভাসান তরী"।—বসুমতী।

দেখছি কত মস্ত সবাই আপন নিয়ে ব্যস্ত,
মুখখানা বড় মিষ্ট অন্তর ভরা বিষে।
কথার বেলা বৃহস্পতি, কাজে কেউ না ঘেঁষে—
বলতে গেলে এসব কথা, উঠে পাগল বলে সবে হেসে ॥
স্বার্থ ছাড়া কথা কয় না, অর্থ ছাড়া কাজ করে না,
দেখতে শুনতে রকমটি বেশ, চিনবার যো নাই বেশে।
ছেলের বাপ বসে আছে পাঁচ হাজারের আশে,
মেয়ের বাপের ভাঙ্গা কপাল চোখের জলে ভাসে ॥
যে দেশ সকল দেশের সেরা, সে দেশের এমনি ধারা,
দেখে শুনে ইচ্ছা হয় চলে যাই বিদেশে।
তবু কেবল বসে আছি ক্ষেপা মাগীর আশে,
এ মুকুন্দের ভরসা আছে দিবে বেটী সমাজ পিষে ॥[১]

১। শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীতা—৪, পৃষ্ঠা—৩

২। শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত—"চাবণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—১০, পৃষ্ঠা—৫-৬

৩। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীমদন গোপাল গুপ্ত কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত—"মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৯, পৃষ্ঠা—৬

৪। শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস—"দেশভক্ত ৺মুকুন্দচন্দ্র দাসের গান", গীত—৯, পৃষ্ঠা—১১

(৬)

ভবসা মায়ের চরণ তরণী,
আমরা এবার হবই পার।

পাঠান্তর :—

(১) "নিশ্চয় আসবেন তিনি, সমাজে দণ্ড দিতে দেশে—
ভাই রে মানুষ নাই রে দেশে ॥" চট্টো. গুপ্ত ও চন্দ্র।

কালীপদ দাসের গীতে "মুকুন্দের" নাম আছে, কিন্তু চট্টোপাধ্যায়, গুপ্ত ও চন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত গীতে ভণিতায় মুকুন্দের নাম নাই।

ভয় গেছে দূরে অভয় পেয়েছি,

মাভৈঃ বাণী শুনেছি মা'র।

বীর প্রসবিনী জননী মোদের,

বীরের জাতি আমরা বীর।

বিলাসে ব্যসনে ধরেছিল জরা,

নত হয়েছিল উন্নত শির,

জানি না কাহার চরণ পরশে,

উজলি উঠিল পূরবাকাশ,

মোহ মদিরার নেশা গেল ছুটে,

তামসী নিশার হইল নাশ।

জাগিল স্মৃতিতে পূরব গরিমা—

কালিমা মুছাতে হবেই হবে,

দাঁড়া রে সকলে জয় মা বলিয়া—

তোদেব বিজয় হবেই হবে।

১। শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৭, পৃষ্ঠা—৫

২। বসুমতী সাহিত্য মন্দিব— 'মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী", 'কর্মক্ষেত্র', পৃষ্ঠা—৩৯-৪০

(৭)

আমি যাঁরে চাই তাঁরে কোথা পাই,

খুঁজি ঠাঁই ঠাঁই, ঠিকানা না পাই।

শুনি সর্ব ঘটে, ঘটে মঠে পটে,

রয় সে নিকটে দেখা নাহি পাই॥

থাকে কমল কাননে, রবি শশী কোণে,

মক্কা বৃন্দাবনে, যমুনা পুলিনে।

যেখানে যখন মজে তাঁর মন,

হয় সে মগন বাঁশরী বাজাই॥

মাঝে মাঝে থাকি আঁখি মুদে বসি,

দেখি কালোশশী চুপে চুপে আ'সি—

হৃদি কুঞ্জবনে, মারে উঁকি ঝুঁকি,
মুকুন্দ ধরি বলি গেলে, যায় রে পলাই ॥[১]

১। শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৮, পৃষ্ঠা—৫-৬

২। বসুমতী সাহিত্য মন্দির—"মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী" 'সমাজ', পৃষ্ঠা—৫-৬

(৮)

জাত গেছে সে জাতির—
যার প্রাণ দেখে না বিচার করে,
দেখে কেবল বাহির ॥
ধর্ম্ম যাদের লুকিয়েছে ভাতের হাঁড়ির মাঝে,
সাধুতা যার কপটতা, ভক্ত কেবল সাজে।
অর্থে মাপে মনুষ্যত্ব, কর্ম কেবল নাম জাহির ॥
মুখবাজিতে বেজায় বড, ভক্তি চোখের জলে ,
কাজের বেলায় দে পগার পা'র, থলিতে হাত প'লে
বন্ধু কেবল পাবার বেলায়, দেবার বেলা নাই খাতির ॥

শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী ', গীত—৯, পৃষ্ঠা—৬

(৯)

স্বরাজ সেদিন মিলিবে যেদিন,
চাষার লাগিয়া কাঁদিবে প্রাণ।
তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়ে,
সপ্তমে তোরা তুলিবি তান ॥
দেবতার আশীস বর্ষিবে সেদিন,
অজস্র ধারায় মাথার উপর,

পাঠান্তর :—

(১) 'মুকুন্দ ধরি বলে গেলে, যায় গো পালাই'—বসুমতী।

আসিবে নামিয়া নূতন শকতি,
নব বলে সবে হবি বলীয়ান—
শক্তিতে হব শক্তিমান ॥
কোটী কোটী মিলিত কণ্ঠে,
তখনি উঠিবে গান,
যে গানে আবার হইবে মিলিত,
হিন্দু মুসলমান।
মা মা বলিয়া উঠিবে ফুকারি,
ভারতের নরনারী—
হোমানল জ্বালি বসিবে যজ্ঞে,
পূর্ণাহুতি করিবে দান ;
সাধনার সিদ্ধি স্বরাজ তোদের,
তখনি হইবে মূর্তিমান ॥

১। শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—১০, পৃষ্ঠা—৭
২। শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—১৭, পৃষ্ঠা—৯-১৩
৩। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীমদনগোপাল গুপ্ত কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত—"মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—১৫, পৃষ্ঠা—৯০
৪। বসুমতী সাহিত্য মন্দির—"মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী", 'কর্মক্ষেত্র', পৃষ্ঠা—৫০

(১০)

ঘোর কলিকাল মা দেখি সব উল্টা তোর।
নইলে মা করবেন দাসীপনা,
গিন্নি উঠছেন মাথার উপর ॥
হয়েছে দুনিয়ার কি দোষ,
সবে খোঁজে পরের দোষ।
দেখে আমার পাচ্ছে হাসি,
বাবুদের কি জ্ঞানের জোর ॥

সদা অসতের আদর,

সৎ-এর যে হচ্ছে অনাদর।

বেদ কোরাণ,ফক্কিকারী—

বাবুরা নভেল পড়ে প্রেমে ভোর॥

যে জনে সদা খাচ্ছে মদ,

বেশ্যা যার পরম সম্পদ,

সে নয় দোষী তার উচ্চ পদ—

যে না খায় সে মদখোর॥

দেখে-শুনে ভবের ভাব—

মুকুন্দের পূরিল অভাব।

এক ভাবির কাছে ভাব শিখিয়ে,

ভাঙ্‌লো আমার ঘুমের ঘোর॥

১। শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—১১, পৃষ্ঠা—৮

২। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীমদগোপাল গুপ্ত কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত—"মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—২৭, পৃষ্ঠা—১৫

৩। শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—২৭, পৃষ্ঠা—১৫-১৬

৪। বসুমতী সাহিত্য মন্দির—"মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী", 'ব্রহ্মচারিণী', পৃষ্ঠা—২৩

(১১)

আবার যখন গান ধরেছি, গাব গো সেই গান।

বুকটা যাতে ফুলে উঠে, শিরায় যাতে অগ্নি ছোটে—[১]

তন্দ্রা যাতে যায় গো ছুটে, মাতায় যাতে প্রাণ॥[২]

অগ্নিগিরির গর্ভ মাঝে সাগর গর্জনে,

সিংহনাদে ঝড়ের বুকে মেঘের তর্জনে—

পাঠান্তর :—(১) 'শিরায় যাহে অগ্নি ছোটে', (২) 'তন্দ্রা যাহে যায় গো ছুটে, মাতায় যাহে প্রাণ'।

এদের ভিতর ওতঃপ্রোত রয়েছে সে সুরের স্রোত,
আজকে সে যে বাহির হবে, প্রলয় অভিযান ॥
খধূপ সম উর্ধ্বে উঠে আকাশ লুটে নেবে,
চন্দ্র সূর্য অবাক হয়ে থাকবে চেয়ে সবে।
পাখা মেলি পাখীর মতন বিদারিয়া উর্ধ্ব গগন—
বিশ্বরাজের চরণতলে লভিব নির্বাণ ॥
গান গেয়েছি অনেক বটে, তাকে কি কয় গান!
আকাশ পৃথ্বী হ'ল না তায় টলটলায়মান—
ভূমিকম্প জলোচ্ছ্বাস উঠল না তায় ঘূর্ণিবাতাস,[৩]
কোটী প্রাণের সমুদ্রে আজ[৪] ডাকলো নাকো বান ॥

১। শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত ১২, পৃষ্ঠা—৯

২। বসুমতী সাহিত্য মন্দির—"মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী", 'ব্রহ্মচারিণী', পৃষ্ঠা—১৩-১৪

(১২)

হাসিতে খেলিতে আসিনি এ জগতে।
করিতে হবে মোঁদের মায়েরই সাধনা।
দেখাতে হবে আজি জগৎবাসী সবে,
এখনো ভারতের যায়নি রে চেতনা ॥
গভীর ওঁঙ্কারে হুঙ্কারী দে রে ডাক—
শিহরি উঠুক বিশ্ব, মেদিনীটা ফেটে যাক!
আমাদের জন্মভূমি, দেবতার লীলাভূমি,
দেবগণ আসুক নেমে পূর্ণ হউক কামনা ॥
সার্থক হবে তবে এ জনম সবাকার।
ছেলের গৌরবে হয়ে গরবিনী মা আমার ॥

পাঠান্তর :—(৩) 'উঠলো না যায় ঘূর্ণিবাতাস', (৪) 'লক্ষ প্রাণের সমুদ্রে যায়।'—বসুমতী।

জগৎ লুটিবে পায় ঘুচে যাবে যত দায়,
মিটে যাবে মুকুন্দের চিরদিনের বাসনা ॥

১। শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—১৩, পৃষ্ঠা ৯-১০
২। শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—২৪, পৃষ্ঠা—১৪
৩। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীমদনগোপাল গুপ্ত কর্ত্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত—"মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—২৪, পৃষ্ঠা—১৪
৪। শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস—"দেশভক্ত ৺মুকুন্দচন্দ্র দাসের গান", গীত—২, পৃষ্ঠা—২

(১৩)

ভাই রে, ধন্য দেশের চাষা।
এদের চরণ ধূলি পড়লে মাথায় প্রাণ হয়ে যায় খাসা ॥
এরা কপটতার ধার ধারে না, সত্য ছাড়া মিথ্যা কয় না,
প্রাণের কথা গুছিয়ে বলার নাইকো এদের ভাষা ॥
প্রাণ ভরা আনন্দ এদের, বুকটা স্নেহের বাসা,
চিনলে এসব সোনার মানুষ, মিটতো দেশের সব পিয়াসা।
এদের নাই জুতো, নাই তেমন কাপড়,
ছেঁড়া লেংটি ছেঁড়া চাদর,
তাতেই তুষ্ট এমনি মিষ্ট, প্রেম সাগর ভাসা ॥
এসব দেবতা ছুঁলে, জাত যায় মোদের
মোরা এমনি বুদ্ধিনাশা,
যাদের রক্তে জগৎ তুষ্ট, তাদের দেখলে কুঞ্চিত করি নাসা ॥
এরা কর্ম্মনিষ্ঠ বীর বটে, ছোট বললে খুবই চটে,
কারো দুঃখ দেখলে শিউরে ওঠে, এদের এমনি ভালবাসা ॥
অন্ধ তোরা চিনলি না রে এই দেশের এই চাষা,

যারা প্রাণ দিয়েও দেশকে বাঁচায়,

একই স্বর্গ যাদের আশা ॥

১। শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—১৪, পৃষ্ঠা—১০-১১

২। শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—১২, পৃষ্ঠা—১২-১৩

৪। বসুমতী সাহিত্য মন্দির—"মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী", 'কর্মক্ষেত্র', পৃষ্ঠা—২৬

(১৪)

মা আমার বিশ্বরাণী, আমি তাঁর আদরের ছেলে[১]

কত রতন মাণিক হীরে সোনা, সবই মায়ের পদতলে[২] ॥

মা সবেই দেছেন কোঠাবাড়ী, আমার গাছতলাতে বাড়ী।

এ ঘর ভাঙ্গবে নাকো টুট্‌বে নাকো,

ক্ষয় হবে না কোন কালে ॥

মায়ের খাস তালুকে বসত করি, জমিদারের কি ধার ধারি?

১। শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—১৫, পৃষ্ঠা—১১

২। শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী," গীত—১৮, পৃষ্ঠা—১০-১১

৩। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীমদনগোপাল গুপ্ত কর্ত্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত—"মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—১৭, পৃষ্ঠা—১০

৪। বসুমতী সাহিত্য মন্দির—"ব্রহ্মচারিণী", পৃষ্ঠা—৮-৯

৫। শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস—"দেশভক্ত ৺মুকুন্দচন্দ্র দাসের গান", গীত—১২, পৃষ্ঠা—১৪

পাঠান্তর :—(১) "আমি মায়ের আদরের ছেলে।"

(২) "যত রতন মাণিক হীরা সোনা, সব দিয়েছি মায়ের পদতলে।"

এর বিক্রী নাইকো নিলাম নাইকো,[৩]

বিশ্ব ডুবুক না প্রলয়ের জলে[৪] ॥

শ্রীগুরুর কৃপা পেয়েছি,[৫] খাটী সোনা হয়ে গেছি।

তাই মুকুন্দ আনন্দে নাচে, জয় তারা জয় তারা বলে ॥ *

(১৫)

পণ করে সব লাগ রে কাজে,

খাটবো মোরা দিন কি রাত।

(এই) বাংলা যখন পরের হাতে,

কিসের মান আর কিসের জাত ॥

মাড়োয়ারী দিল্লীওয়ালা

উড়ে পার্শী ভাটীয়ারা,

তারা মোটর হাঁকে, চৌতালায় থাকে,

আমাদের নাই পেটে ভাত ॥

যেদিকে চাই বাংলা দেশের,

(আজ) সকল দিকই করছে গ্রাস,

তোরাই শুধু কেবাণীর দল,

এক বোড়েব চালেই হলি মাত ॥

১। শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী," গীত—১৬ পৃষ্ঠা—১২

২। শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত—
"চারণ-কবি মুকুন্দদাসেব গীতাবলী," গীত—২, পৃষ্ঠা—১-২

৩। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীমদনগোপাল গুপ্ত কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত—
"মুকুন্দদাসের গীতাবলী," গীত—২, পৃষ্ঠা—২-৩

৪। শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস—"দেশভক্ত ৺মুকুন্দচন্দ্র দাসের গান", পৃষ্ঠা—১

৫। বসুমতী সাহিত্য মন্দির—"মুকুন্দদাসেব গ্রন্থাবলী,' 'কর্মক্ষেত্র,' পৃষ্ঠা—১০

পাঠান্তর :—(৩) "এ জমি বিক্রী নাইকো নিলাম নাইকো।"

(৪) "জমি ডুবেবে না বর্ষার জলে।"

(৫) "আমি গুরুর কৃপা পেয়েছি।"

—চট্টোপাধ্যায়, গুপ্ত ও চন্দ্র।

* এই গানটি সঙ্গীত-গুণাকব শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় HMV-এব প্রযোজনায় রেকর্ড করেন Record No.—N83227.

এমন করে পরের হাতে[১]
বিকিয়ে দিলি সোনার দেশ।
ধিক্ বাঙ্গালী নীরব রইলি,
থাকতে কোটী কোটী হাত ॥[২]

(১৬)

আয় মা তারিণী করাল বদনী,
ডাকিনী যোগিনী সব নিয়ে আয়।
শ্মশান বাসিনী, শ্মশান রঙ্গিণী,
(আজ) ভারত শ্মশানে নাচবি গো আয় ॥
শ্মশানের শোভা মুনি মনলোভা,
হবে কি সে শোভা বেরোবে কি আভা,
তুই মা না এলে, তুই না নাচিলে—
দুর্নীতি সব না দলিলে পায় ॥
ডাকিনী যোগিনী লইয়ে সঙ্গে,
নাচ গো রঙ্গিণী নানা রঙ্গে ভঙ্গে,
ঘোর অমানিশা হাস অট্টহাসি,
এমন শ্মশান পাবিনে ধরায় ॥
এই নিশি দিনে, এ মহাশ্মশানে,
পেলে ও চরণ পূজিতেম যতনে—
হইয়ে মাতাল নাম-সুধা পানে,
লুটিত মুকুন্দ চরণ-ধূলায় ॥

১। শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী" গীত—১৭.
পৃষ্ঠা—১৩

২। বসুমতী সাহিত্য মন্দির—"মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী", 'পল্লীসেবা.'
পৃষ্ঠা—৫

পাঠান্তর :—(১) "বাংলা যখন পরের হাতে
কিসের মান আর কিসের জাত ॥
আজ আমরা উপোস করে দিন কাটাচ্ছি
থাকতে মোদের ক্ষেতে ভাত।"
—চট্টো ও গুপ্ত।

(২) "থাকতে চৌদ্দ কোটী হাত"।—বসুমতী।

(১৭)

জাগ রে ভাই সবে স্মরিয়ে কেশবে,
জয় জয় রবে কাঁপা রে মেদিনী ॥
দুঃখ নিশা মোদের হল অবসান,
উদিত পুরবে সুখ দিনমণি ॥
এ নব উষাতে জাগিয়ে নিলে প্রাণ,
ঘুমাবে না কভু আর ভারত সন্তান।
দেখিলে মায়ের দশা কেঁদে উঠিবে প্রাণ
করম সিন্ধুনীরে ভাসা রে তরণী ॥
জাগিল বুয়োর জাতি নবীন আলোকে ;
জাগিল ক্ষুদ্র জাপান বিপুল পুলকে,
ভারত জাগিলে এ নব আলোকে—
পলকে জিনিতে পারে রে ধরণী ॥
মুকুন্দ দাসে কয় আর কারে করি ভয়,
অভয়দায়িনী কুমিল্লায় দিয়েছেন অভয়।
ত্রিশ কোটী কণ্ঠে বল মাই কী জয়—
বাজাও বিজয় ডঙ্কা কাঁপুক রে ধরণী ॥

শ্রীকালীপদ দাস—'চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী," গীত—১৮, পৃষ্ঠা—১৪

(১৮)

করমেরই যুগ এসেছে[১], সবাই কাজে লেগে গেছে,
মোরাই শুধু রব কি শয়ান।
চিরদিন রব নীচে[২], চলব সবার পিছে পিছে,
সহিব শত অপমান ॥
জেগেছে জগতে সবে, বসে নাই কেউ নীরবে,
একই সুরে ধরিয়াছে গান।
নিজে রে ভেবো না হীন, ধনী মানী দুঃখী দীন—
রাজা প্রজা[৩] সকলি সমান ॥

পাঠান্তর :—(১) 'করমের যুগ এসেছে'। (২) 'রহিব সবার নীচে'। (৩) '(এ যুগে) রাজা প্রজা'। (৪) 'এক সুরে ধরিয়াছে তান।' (৫) 'দলে দলে হও গো আগুয়ান।' —চট্টো, গুপ্ত ও চন্দ্র।

সে সুরে সুর মিলাইয়ে[৪], করম পতাকা লয়ে,

দলে দলে হও রে আগুয়ান।[৫]

দ্বেষ হিংসা পায় দলে, আয় ছুটে আয় চলে—

চল্লিশ কোটী হিন্দু মুসলমান॥

মরণ সাগর পার, যেতে হবে সবাকার,

দিন গেল বেলা অবসান।

তরী বুঝি ছেড়ে যায়, উঠে পড় খেয়া নায়—

ভয় নাই মাঝি ভগবান॥

১। শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী," গীত—১৯, পৃষ্ঠা—১৫

২। শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী," গীত—২২, পৃষ্ঠা—১২-১৩

৩। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীমদনগোপাল গুপ্ত কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত—"মুকুন্দদাসের গীতাবলী," গীত—২৩, পৃষ্ঠা—১৩-১৪

৪। শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস—"দেশভক্ত ৺মুকুন্দচন্দ্র দাসের গান", পৃষ্ঠা—১৫

৫। বসুমতী সাহিত্য মন্দির—"মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী", 'কর্মক্ষেত্র,' পৃষ্ঠা—৩০-৩১

(১৯)

সকল কাজের মিলবে সময়,

আগে দুটি ভাতের যোগাড় কর্,

তোরা পেটের যোগাড় কর্॥

মানের গোড়ায় ছাই ঢেলে আজ,

কষে লাঙ্গল ধর্॥

ডেকে নে তাঁতী জোলা,

ছাড়িয়ে নেংটি তিলক ঝোলা,

খুলে দে তাঁতের মেলা, প্রতি ঘর ঘর॥

কামার কুমার চামার মুচি,

তারাই কাজের তারাই শুচি,

ধর্ জড়িয়ে গলা তাদের, ভুলে আপন পর॥

এত সব যাদের ঘরে,

তারাও মরে উপোস করে—

তোদের কথা ভাবলে আসে কম্প দিয়ে জ্বর[১] ॥

১। শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী," গীত—২০, পৃষ্ঠা—১৫-১৬

২। শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী," গীত—৬, পৃষ্ঠা—৩-৪

৩। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীমদনগোপাল গুপ্ত কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত—"মুকুন্দদাসের গীতাবলী," গীত—৭, পৃষ্ঠা—৫

৪। শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস—"দেশভক্ত ৺মুকুন্দচন্দ্র দাসের গান," গীত—৭, পৃষ্ঠা—৬

৫। বসুমতী সাহিত্য মন্দির—"মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী", 'কর্মক্ষেত্র,' পৃঃ-২১

(২০)

এখনো খোলেনি আঁখি যার।[১]

আমি কি দিয়ে বুঝাব তারে,[২]

কোন্ কর্ম সাধিবারে,

জনম লভিনু কোলে 'ভারত মাতার' ॥[৩]

যদি কারো ভাগ্য গুণে, একটুখানি খোলে আঁখি[৪]

তখনি আমরা তারে চশ্‌মা দিয়ে ঢেকে রাখি।

আসমানেতে বেঁধে ঘর, ভাবি মোরা কতই বড়।

পরে মোরা পেটের দায়ে ধরা দেখি অন্ধকার ॥

বি, এ, এম. এ, পাশ করে নকরি যদি নাহি মিলে,

ভাবনা কেন কিসের ভয় মিশে যাও না চাষার দলে।

খেটে পড়ে খামার কর, শক্ত করে লাঙ্গল ধর—

পাঠান্তর :—(১) চট্টোপাধ্যায়, গুপ্ত ও চন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত গীতে দেখা যায়—"এত সব যাদের ঘরে ···· কম্প দিয়ে জ্বর।"—এই লাইনগুলি নাই। সেখানে গীত শেষ হইতেছে—

"জড়িয়ে ধর্ গলা তাদের ভুল আপন পর,

তোরা পেটের জোগাড় কর্ ॥"

দেখতে পাবি দু'দিন পরে ঘুচে গেছে হাহাকার ॥
মুকুন্দ বলিছে কেন কাঙ্গাল সেজেছ আজ,[৫]
তোমরাই পার নাকি পরিতে বীরের সাজ।
দেখাতে পার নাকি বোঝাতে পার নাকি,
এ জগতে ভারতবাসীর কতটুকু অধিকার ॥[৬]*

১। শ্রীকালীপদ দাস—"চাবণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী," গীত—২১, পৃষ্ঠা—১৬-১৭

২। শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী," গীত—১৪, পৃষ্ঠা—৮

৩। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীমদনগোপাল গুপ্ত কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত—"মুকুন্দদাসের গীতাবলী," গীত—১৬, পৃষ্ঠা—৯-১০

(২১)

কোন্ ফাগুনের হাওয়া এ যে,
কোন্ সাগরের ঢেউ।
তা বুঝলে না তো কেউ ॥
কোন্ করমীর তূর্যনাদে কাঁপছে ধরাখান,
কালের ভেরী বাজছে কেন ?
ভারতবাসীর পরাণ গঙ্গায় ডাকল আবাব বান।
ভাবলে নাকো কেউ ॥
তাই তো বলি এই শ্মশানে অমানিশার রাতে,
বসে যা রে সাধকের দল মায়েব সাধনাতে।
সিদ্ধি তোদের হবেই হবে—
ভয় করিস্‌নে কেউ ॥

শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ কবি মুকুন্দদাসেব গীতাবলী," গীত—.৩, পৃষ্ঠা—১৮-১৯

পাঠান্তর:—(১) 'হায় রে এখনও ফোটেনি আঁখি যার',—(২) 'কেমনে বোঝাব তারে,' (৩) 'জনম গেল বুঝিবারে,' (৪) 'যদি কোন ভাগ্যক্রমে একটু ফোটে আঁখি', (৬) 'ভারত মাঝে ভারতবাসীর কতটুকু অধিকার'।

এই গানটি সঙ্গীত-গুণাকর শ্রীসন্তোষর মুখোপাধ্যায় HMV-এর প্রযোজনায় রেকর্ড করেন। Record No.—N83227.

(২২)

আর কারে করি ভয়, মায়ের পেয়েছি অভয়,
জয় মা বলে হও রে আগুয়ান।
জয় শঙ্খ নিনাদে মেদিনী কাঁপিয়ে দে—
ফুলিয়া উঠুক মরা প্রাণ॥
আত্মপর যাও রে ভুলি, কর সবে কোলাকুলি,
ওরে ভাই হিন্দু মুসলমান।
বাজা রে দামামা কাড়া, জগতে পড়ুক সাড়া,
মরেনি ভারত সন্তান॥
তোরা কেন ভাবিস্ এত, বড কে তোদের মত,
তোদের মত কেবা বলীয়ান।
তোদের পূর্ব পুরুষগণে, একদিন এই ত্রিভুবনে,
উড়িয়েছিল বিজয় নিশান॥
তাদেরই সন্তান তোরা, জগতে নাই তোদের জোড়া,
তাই মা আমার তোদের পূজা চান।
মায়ের পূজার কর আয়োজন রক্তজবা বিল্ব চন্দন,
দাস মুকুন্দ দিবে বলিদান॥

শ্রীকালীপদ দাস —"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী," গীত—২৪,
পৃষ্ঠা—১৯

(২৩)

আয় রে বাঙ্গালী আয় সেজে আয়,
আয় লেগে যাই দেশের কাজে।
দেখাই জগতে ভেতো বাঙ্গালী,
দাঁড়াইতে জানে বীর সমাজে॥
বহুদিন পরে ডাক এসেছে আজ,
ওরে বাঙ্গালী সাজ তোরা সাজ।
এখনো নীরবে নাই কিরে লাজ![১]
ধিক্ রে তোদের ক্ষাত্র তেজে॥

কোটী কণ্ঠে আজ জয় মা বলিয়া,

দ্বেষ হিংসা আদি চরণে দলিয়া ;

দাঁড়া রে বাঙ্গালী আপনা ভুলিয়া,

সাজাই বাংলা নূতন সাজে ॥

মাভৈঃ ওঠ্ রে ও বাঙ্গালী বীর,

কতকাল রবি নত করি শির—

শুনেছি রে জয় বাঙ্গালী জাতির,

আনহত শব্দ ভেরীর মাঝে ॥

১ শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—২৫, পৃষ্ঠা—২০

২। শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত— "চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৪, পৃষ্ঠা—২-৩

৩। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীমদনগোপাল গুপ্ত কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৬, পৃষ্ঠা—৪-৫

৪। শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস—"দেশভক্ত ৺মুকুন্দচন্দ্র দাসের গান", গীত– ৮, পৃষ্ঠা—৭

৫। বসুমতী সাহিত্য মন্দির—"মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী", 'পল্লীসেবা', পৃষ্ঠা—৩৫

পাঠান্তর :—(১) শ্রীকালীপদ দাসের সংগৃহীত গীতে এবং বসুমতী প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে যেভাবে গীতটি দেখা যায়, চট্টোপাধ্যায়, গুপ্ত ও চন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত গীতে সেইভাবে গীতটি দেখা যায় না। যথা :—"আয় রে বাঙ্গালী······ সাজ তোরা সাজ"। এই পর্যন্ত ঠিক আছে। তারপর পাঠান্তর লক্ষণীয় :—

"এখনো নীরব, নাহি কি রে লাজ,

ডুবালি রে ভরা মরণ-সাগরে ॥

বীর কখনও কি নত করে শির,

ধার ধারে কি সে হা হতোস্মির,

পারে কি দেখিতে বীর জননীর

উলঙ্গ-মূরতি যুগ-যুগান্তর ধরে ॥

লুকাল কোথায় বদনের হাসি

পুঞ্জীভূত কেন ভালে চিন্তারাশি,

মায়ের ছেলে তোরা হাস অট্টহাসি,

রবি শশী তারা খসে পড়ুক রে ॥"

(২৪)

অতীত গিয়াছে অতীতে মিলায়ে,[১]
সম্মুখে মহা ভবিষ্যৎ।
আলোকে পুলকে জ্ঞানে পুণ্যে,
দৃপ্ত যেন সে ত্রিদিববৎ॥
শাসন যাহার অস্ত্রে নহে,
প্রেমই কেবল মাত্র।
গড়িয়া উঠিবে নূতন তন্ত্র[২] যাহার শাসন আত্মদান,
দেখাইবে মহা মুক্তিপথ॥
ত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, লভিয়া নূতন প্রাণ,[৩]
সমান সূত্রে হইবে মিলিত, হিন্দু মুসলমান।[৪]
কামনা হবে মূর্তিমতী আশা হবে ফলবতী,[৫]
গিয়াছে সেদিন আসিছে সুদিন,
কর সবে তারে দণ্ডবৎ॥

১। শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—২৬, পৃষ্ঠা—২০-২১

২। বসুমতী সাহিত্য মন্দির—"মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী", 'ব্রহ্মচারিণী', পৃষ্ঠা—৩১

(২৫)

বাবু বুঝবে কি আর ম'লে।
কাঁধে সাদা ভূত চেপেছে, একদম দফা সারলে॥

পাঠান্তর :—(১) 'অতীত যাইবে অতীতে মিলায়ে'।
(২) 'আসিয়াছেন হেন নব নয়পতি'।
(৩) 'চিন্তা হবে বর্ণময়ী, কল্পনা লভি প্রাণ'।
(৪) 'সমান সূত্রে হইবে মিলিত, কর্মভক্তি জ্ঞান'।
(৫) "জীবন সাধনা হবে সুমহতী,
পূরিবে পূরিবে সে মনোরথ;
রবে না এ দিন, আসিবে সুদিন,
কর কর তাঁরে দণ্ডবৎ॥"—বসুমতী।

খেতে ভাত সোনার থালে,
নাউ সেটিস্‌ফাইড্‌ ষ্টীলের থালে,
তোদের মত মূর্খ কি আর, দ্বিতীয়টি মেলে।
পমেটম্‌ লাইক করিলি, দেশী আতর ফেলে—
সাধে কি তোদের দেয় রে গালি,
ব্রুট্‌, ননসেন্স ফুলিশ বলে ॥
ছিল ধান গোলা ভরা, শ্বেত ইঁদুরে করল সারা,
চোখের ঐ চশমা জোড়া, দেখ্‌ না তোরা খুলে।
কুল নিয়েছে, মান নিয়েছে, ধন নিতেছে কলে,
ডু ইউ নো, বাঙ্গালী বাবু—
ইওর হেড্‌ ফিরিঙ্গীর বুটের তলে ॥
মুকুন্দের কথা ধর, এখনো সামনে চল,
সাহেবি চালটি ছাড়, যদি সুখ চাও কপালে।
বন্দে মাতরম্‌ বাজাও ডঙ্কা. জাগুক ভাই সকলে,
দেখে মুকুন্দ ডুবে যাক আজ,
প্রেমময়ীর প্রেম সলিলে।

শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—২৭
পৃষ্ঠা—২১-২২

(২৬)

জাগতে হবে উঠতে হবে লাগতে হবে কাজে।
জগৎ মাঝে কেউ বসে নেই, মোদের কি ঘুম সাজে ॥
যেতে হবে সাগরের পার, ছাড়তে হবে জাতের বিচার,
শুনতে হবে জগৎ বীণা, কোন্‌ সুরেতে বাজে ॥
পরের খেয়ে পরের লয়ে, চলবে না দিন গেছে বয়ে—
(মোরা) পা থাকিতে নিছি লাঠি, হাসে লোক সমাজে ॥

* শ্রীবরদাকান্ত বসু মহাশয় তাঁহার "Reflections on the war of Indian Independence" গ্রন্থে মুকুন্দদাস প্রসঙ্গে এই গানটি সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী পরিবেশন করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে একবার যাত্রাভিনয় করিবার সময় মুকুন্দদাস মনের আবেগে এই গানটি গাহিলে প্রায় ২০০ শ্রোতা সহ স্বয়ং মূর্ছিত হইয়া পড়েন। অভিনয় সেদিনের মত বন্ধ হইলেও এই স্মরণীয় ঘটনার কথা বহুদিন যাবৎ মানুষের মনে থাকে। বলাবাহুল্য এই গানটি গাহিবার ও লিখিবার অপরাধে মুকুন্দদাসের তিন বৎসর জেল হইয়াছিল।

যাদের মা উপবাসী, তাদের মুখে রঙ্গ হাসি!
দেখে মুকুন্দ মরে যায় আজ ঘৃণা অভিমান লাজে॥

১। শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—২৮, পৃষ্ঠা—২২

২। শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—২৫, পৃষ্ঠা—১৪-১৫

৩। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীমদনগোপাল গুপ্ত কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত—"মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—২৬, পৃষ্ঠা—১৪-১৫

৪। বসুমতী সাহিত্য মন্দির—"মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী", 'ব্রহ্মচারিণী", পৃষ্ঠা—২৯

(২৭)

বান এসেছে মরা গাঙে[১] খুলতে হবে নাও।
তোমরা এখনও ঘুমাও!
কত যুগ গেছে কেটে দেখেছ কত স্বপন
এবার বদর বলে ধর বৈঠা জীবন-মরণ পণ।
দমকা হাওয়ার কাল গিয়েছে—
ফাগুন বইছে পাল খাটাও॥
অবহেলে থাকলে বসে কাঁদতে হবে সারা জীবন,
যুগ-যুগান্তের তপস্যাতে, মিলছে এমন লগন।
পারের মাঝি হাল ধরেছে—
মিছে পরের মুখ তাকাও॥

১। শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—২৯, পৃষ্ঠা—২৩

২। শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—১৬, পৃষ্ঠা—৯

৩। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীমদনগোপাল গুপ্ত কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত—"মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৯, পৃষ্ঠা—১১

৪। শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস—"দেশভক্ত ৺মুকুন্দচন্দ্র দাসের গান", গীত—১৪, পৃষ্ঠা—১৬

পাঠান্তর:—(১) 'বান ডেকেছে মরা গাঙে'—চট্টো।

মাকে ডাক্ দেখি—
ডাক্ তোরা আজ সবে বদন ভরে,
দেখি কান খেয়ে বেটী, ক'দিন থাকতে পারে ॥
ভক্তি মন্ত্র দিয়ে যদি, ডাক আজ নিরবধি,
ঠিক দাঁড়াবে ক্ষেপী মাগী অসি লয়ে করে ॥
ক্ষেপী যদি উঠে দাঁড়ায়—
দেখে পাপ ভয়েই পালায় ;
এ মুকুন্দ বগল বাজায়—
বম্ বম বম্ হরে হরে ॥

১। শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৩০, পৃষ্ঠা—২৩

২। বসুমতী সাহিত্য মন্দির—"মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী", 'ব্রহ্মচারিণী", পৃষ্ঠা—১৫

(২৯)

জাগ গো জাগ জননী

তুই না জাগিলে শ্যামা, কেউ জাগিবে না গো মা,
তুই না নাচালে কারো, নাচিবে না ধমনী ॥
ডেকে ডেকে হনু সারা কেউ সাড়া দিলে না মা,
খুঁজে দেখলাম কত প্রাণ, কারো প্রাণ কাঁদে না মা।
তুই না জাগালে প্রাণ, কাঁদিবে কি কারো প্রাণ—
না জাগিলে সবার প্রাণ, পোহাবে কি রজনী ॥
নাম ধর দয়াময়ী, দয়া কি মা আছে তোর,
দয়া থাকলে মরে কি আজ কোটী কোটী ছেলে তোর
মরি তাতে ক্ষতি নাই, বাসনা মা দেখে যাই,
ভারতের ভাগ্যাকাশে উঠেছে দিনমণি ॥
নিবেদিলাম তব পায়, ঠেল না পায় তারিণী ;
ছেলের কথা চিরকাল রাখে জানি জননী।

মুকুন্দের কথা রাখ, করুণা নয়নে দেখ,

অকূলে পড়েছি মোরা, তার দীন তারিণী ॥

১। শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৩১, পৃষ্ঠা—২৪

২। বসুমতী সাহিত্য মন্দির—"মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী", 'পল্লীসেবা'—পৃষ্ঠা—৪৬, 'কর্মক্ষেত্র'—পৃষ্ঠা ১৮-১৯

(৩০)

স্বরাজ স্বরাজ করিস তোরা ?

স্বরাজ কি রে গাছের ফল ?

অবহেলে তায় পেড়ে খাবি তোরা,

পর পদলেহি ভীরুর দল ॥

ধনীর দুয়ারে ধন্না দিয়ে স্বরাজ তোরা ভিক্ষা চাস,

কপট বৈরাগ্যের মুখোস পরিয়া,

ভাইয়ের কাছে ভাই করিস্ ছল –

কি করে স্বরাজ মিলিবে বল্ ॥

পারিস্ যদি রে হতে বীরাচারী,

সোমরস আবার করিতে পান ;

রক্তগঙ্গার পুণ্য সলিলে, পূজিতে মায়ের মূরতি খান।

রুধিরাসক্তা পানেতে মত্তা,

মা আজ ছেলের রক্ত চান—

দিতে হবে তাই মনে রাখিস্ ভাই,

স্বরাজ পথের যাত্রী দল ;

মরণ দিয়েই বরণ করিতে,

হইবে তোদের মুক্তি ফল ॥

শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৩২, পৃষ্ঠা—২৪-২৫

(৩১)

বন্দে মাতরম্ বলে নাচ রে সকলে,

কৃপাণ লইয়া হাতে।

দেখুক বিদেশী হাসুক অট্টহাসি,

কাঁপুক মেদিনী ভীম পদাঘাতে ॥

বাজাও দামামা কাড়া ঘণ্টা ঢোল,
শঙ্খ করতাল জয়ডঙ্কা খোল ;
নাচুক ধমনি শুনিয়ে সে রোল,
হউক নূতন খেলা শুরু এ ভারতে ॥
এখনো কি তোদের আছে ঘুমঘোর,
গেছে কুল মান, মোছ্ আঁখি লোর।
হও আগুয়ান ভয় কি রে তোর—
বিজয় পতাকা তুলে নিয়ে হাতে॥
কবে যে ভারতে আসিবে সেদিন,
ভেবে তা মুকুন্দ দিন দিন ক্ষীণ।
আজ কাল বলে কেটে গেল দিন,
দিন পেলে লীন হতেম চরণেতে ॥ *

শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৩৪,
পৃষ্ঠা ২৬-২৭

(৩২)

বিরাট তুমি মহান্ তুমি,
প্রণমি তোমায় আনন্দময়।
অমৃত তুমি শাশ্বত তুমি,
চিদ্ঘন হউক তোমারই জয় ॥
রবি শশী তোমার আদেশে চলে,
সপ্ত সিন্ধু ধোয়ায় পা।
আপনি পবন চামর দোলায়—
বিভূতি তোমার জগন্ময় ॥

* ১৯০৫-১৯০৬ সাল। বঙ্গভঙ্গ লইয়া তখন স্বদেশী আন্দোলনের বান ডাকিয়াছে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করিবার জন্য বুকের সমস্ত সাহস লইয়া গর্জিয়া উঠিলেন মুকুন্দদাস—"বন্দেমাতরম্ বলে নাচ রে সকলে কৃপাণ লইয়া হাতে," ইত্যাদি। মুকুন্দের সেই মূর্তি দেখিলেন—মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত। তিনি মুকুন্দকে বলিলেন—"স্বদেশী যাত্রার দল তোমাকে করতেই হবে।" দল গড়তে মুকুন্দ ওস্তাদ। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বন্ধু-বান্ধবদের লইয়া "স্বদেশী যাত্রার" দল গঠন করিলেন এবং মহাত্মার নির্দেশিত পথেই জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিলেন।

কোটী কোটী সৌরলোক,
জানে না তোমার কোথায় ধাম ;
কি নামে ডাকিলে সাড়া দিবে তুমি,
অনন্ত তোমার অনন্ত নাম।
শিখিয়ে দাও না নামটি দয়াল,
জীবন সন্ধ্যায় তোমারে চাই ;
নাম-সুধা পানে আমারে আমি,
তোমার মাঝে হারিয়ে যাই।
করুণা পরশে আবার আমার,
নয়নে যদি গো সাগর বয় ;
অনন্ত বাসনা ধুয়ে মুছে গিয়ে,
জগৎ হইবে ব্রহ্মময় ॥

শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী," গীত—৩৬,
পৃষ্ঠা—২৮-২৯

(৩৩)

মায়ের নামের ডঙ্কা দিয়ে চল্ রে শঙ্কা যাবে দূরে—
শুনিস্‌নে কালের ভেরী, উঠছে বেজে আজব সুরে ॥
রেখে দে রে পুঁটলী বাঁধা, আর তোদের কাগজে কাঁদা।
ধরে দে মা-নামের সারি দীপক রাগে ভারত জুড়ে ॥
মা জগদম্বার কৌশলে, যখন আগুন উঠছে জ্বলে,
দিয়ে দে আজ পূর্ণাহুতি, খেয়ে নিক মা উদর পূরে ॥
মরণ সাগর করলে মথন, তবেই নাকি মিলবে রতন ;
তাই তো এত ডাকাডাকি করছি তোদের ঘুরে ঘুরে ॥
ক্ষেপেছে ক্ষেপা মাগী, ভয় কি মরবি বাঁচবার লাগি ;
দেখুক আজ বিশ্বাসী ভারতবাসী নয় রে কুঁড়ে ॥

১। শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৩৭,
পৃষ্ঠা—২৯-৩০

২। বসুমতী সাহিত্য মন্দির—"মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী," 'পল্লীসেবা'—
পৃষ্ঠা—৪

অগ্নিময়ী মায়ের ছেলে আগুন নিয়েই খেলবে তারা।
মরেনি বীর সেনাদল আবার আগুন জ্বালবে তারা ॥
অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা তাদের জ্বালবে না রে হোমানল,
তাদের ত্যাগ বৈরাগ্যের পূর্ণাহুতি বজ্রানলের কালানল।
স্বর্গ নরক করি মানে, চায় না তারা মোক্ষপানে;
বীরাচারী নেংটা মায়ের বীর পূজার এমনি ধারা ॥
বেসুরেই বাজবে তাদের রণোন্মাদের যন্ত্রগুলি,
গগন ছেয়ে উঠবে তাদের, নৃত্য পায়ের মুক্ত ধূলি।
অত্যাচারীর কণ্ঠ রুধির, পানীয় তাদের বড়ই তৃপ্তির;
ক্লীবত্ব যায়নি যাদের বলবে তাদের পাগল পারা ॥
মায়ের বুকে পাষাণ চাপা দেখেও যারা খেতাব চান,
তারাই তো দেশের দুশমন্, তারাই দেশের শয়তান।
যদি দেশের মুক্তি চাও, ওদের দূরে সরিয়ে দেও—
লাল ফাগুয়ায় খেল্ রে হোলি, ছুটুক লালে লাল ফোয়ারা ॥

শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী" গীত—৩৮,
পৃষ্ঠা—৩০

(৩৫)

মূর্ত করিয়া লুপ্ত গরীমা,
আবার বিশ্বে আনিল যে,
ভক্তি অর্ঘ্য দেও রে সকলে,
তাহার চরণ পঙ্কজে।
সুপ্ত শক্তি উঠিবে জাগিয়া,
গুপ্ত শত শতাব্দীর
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
হুঙ্কারে যদি বাঙ্গালী বীর।
ভৈরব নাদে বিজয় কম্বু,
উঠিলে বাজিয়া নাচিবে প্রাণ,
সপ্ত কোটী গঙ্গা সাগরে,
ডাকিবে আবার প্রলয় বান।

প্লাবিত করি নিখিল বিশ্ব,
ধৌত করিয়া মলিনতা—
দেবরাজ্য গড়িয়া উঠিলে,
মিলিবে, মোদের স্বাধীনতা।

শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৩৯

পৃষ্ঠা—৩১

(৩৬)

তোদের নাম জগৎ জোড়া বীরের জাতি তোরা,
বীরের মত একটু চল্ রে।
বুক উঁচু করে হা-হা হি-হি করে,
প্রাণ ভরে তোরা হাস্ রে॥
লুকালো কোথায় বদনের হাসি,
পুঞ্জীভূত কেন ভালে চিন্তারাশি।
বীরের জাতি তোরা হাস্ অট্টহাসি,
রবি শশী তারা খসে পড়ুক রে॥
বীর কি কখনো নত করে শির,
ধার ধারে কি সে হা হতোস্মির।
পারে কি দেখিতে বীর জননীর,
উলঙ্গ মূরতি যুগান্ত ধরে॥
কাঁপিত মেদিনী যাদের পদ ভরে,
বিজয় পতাকা উড়িত অম্বরে।
স্মৃতি লুপ্ত হয়ে তাদের বংশধরে,
বেঁচে থাকার চেয়ে মরণই ভাল রে॥
ভেবে পাই না তোরা বাঁচা কিংবা মরা,
পুরুষ কি প্রকৃতি কোন্ ধাতে গড়া!
আঁখি অন্ধ ফিরে ধরিয়াছে জরা,
ডুবালি রে ভরা মরণ সাগরে॥

শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৪০,

পৃষ্ঠা—৩১-৩২

(৩৭)

এমন দিন কি আসবে মোদের,
আমরা আবার মানুষ হব।
ভুলে যাব দলাদলি,
প্রাণে প্রাণ মিলিয়ে দিব॥
মেয়েলি ঢং দিব ছেড়ে,
ফ্যাসন্ দিব ঝাঁটিয়ে দূরে।
গোঁফ রেখে চুল সমান কেটে,
বীরের মত কাজ করিব॥
ছোট বড় যাব ভুলে,
প্রাণের কপাট দিব খুলে।
"বাবু"* এই দু'টি আখর,
নামের পেছন থেকে উঠিয়ে দিব॥
ঘুচে যাবে তমঃ রাশি,
মায়ের মুখে দেখব হাসি।
আমরা আবার সকল ভুলে,
মায়ের লাগি পাগল হব॥

শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৪১,
পৃষ্ঠা—৩২-৩৩

(৩৮)

কি আনন্দধ্বনি উঠল বঙ্গভূমে।
বঙ্গভূমে বঙ্গভূমে বঙ্গভূমে ভারতভূমে।[১]
জেগেছে আজ ভারতবাসী আর কি মানা শোনে,
লেগেছে আপন কাজে যার যা নিচ্ছে মনে।
মায়ের কৃপায় পেলেম ফিরে চরকা হেন ধনে—
তাই রেখেছি আমি অতি সযতনে আমার চরকা-ধনে—

* বাবু:—হিন্দু ভদ্রলোকের নামের সহিত যোজ্য উপাধি ('রামবাবু'), কেরাণী ('আপিসের বড়বাবু')। ভদ্রপরিবারের কর্তা বা অন্য পুরুষ ('বাবু বাড়ি নেই, ছোটবাবু')। মধ্যবিত্ত মনিবের বা ইতর কর্তৃক ভদ্রকে সম্বোধন। শৌখিন, বিলাসী ('লোকটি অত্যন্ত—ফুলবাবু) বাবুগিরি বি[বাবুয়ানা,—আনি] বিলাসিতা, বড়মানুষী চাল।—চলন্তিকা, পৃঃ ৩৯৪।

চরকা আমার মাতা-পিতা, চরকা বন্ধু সখা ;
চরকায় ভাত কাপড় পরি জোড়ায় জোড়ায় শাঁখা।
মুকুন্দ দাসে বলে ভাল সুযোগ পেলে,
তোমরা সবে ধর চরকা হবে সুখ কপালে।

১। শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৪২, পৃষ্ঠা—৩৫-৩৪

২। বসুমতী সাহিত্য মন্দির—"মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী", 'কর্মক্ষেত্র'—পৃষ্ঠা—১৬

(৩৯)

এ ভবে পাগল চেনা বিষম দায়।
পাগলের তত্ত্ব ভবে ক'জন পায়॥
ছিল পাগল গৌরাঙ্গ নিতাই আর সাঙ্গপাঙ্গ,
বলে গেল সাধনার কি মধুর প্রসঙ্গ।
আজ নেড়া-নেড়ী সে প্রসঙ্গ উল্টা করে উল্টা ধায়॥

পাঠান্তর :—

(১) কি আনন্দধ্বনি·········ভারতভূমে
আনন্দে আনন্দধামে. হচ্ছে বেচাকিনি
দেশী ধুতি, দেশী চিনি, এইমাত্র শুনি,
 বিদেশী আর কি কিনি॥
জেগেছে ভারতবাসী····· জোড়ায় শাঁখা।
 চরকা প্রাণের সখা॥
হাতের কঙ্কণ, নাকের বেসর,
 পরি ঢাকাই শাড়ী,
সুতো কেটে পরেছি এবার,
 হাতীর দাঁতের চুড়ি ;
চরকা আর কি ছাড়ি,
মুকুন্দদাস বলে, ভাল সুযোগ পেলে,
দিদিরা সব ধর চরকা
 মাতরম বলে,
হবে সুখ কপালে॥

তার একটা শ্মশান শয্যায়,

বক্ষে রেখে ক্ষেপীর পায় ;

জ্ঞানদাতা জ্ঞান দিচ্ছে জীব মাত্র সবায়।

বুঝলে না দীন ভারতবাসী শক্তি মহাশক্তির পায় ॥

১। শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৪৩, পৃষ্ঠা—৩৪

২। বসুমতী সাহিত্য মন্দির—"মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী," 'কর্মক্ষেত্র'—পৃষ্ঠা—১৩-১৪

(৪০)

এডিটার খোঁজ রাখে ক'জনার ?

চল্লিশ কোটী মায়ের ছেলে নাম ছাপে সে দু'চার জনার ॥

নামটি যার টাইটেল যুক্ত, লেখনীটি সেথায় মুক্ত,

তা বৈ লিখার উপযুক্ত আছে কি রে আর।

রামা আজ দিল্লী যাবেন শ্যামা যাবেন কাছাড—

স্টারে নাচবে কুসুমকুমারী আ মরি খবরের বাহার।

এ দেশের এডিটার যত, বুঝলে তাদের দায়িত্ব কত,

লেখায় তারা ঢালতো আগুন আসন পেতো নেতার।

দেশের সেবক উঠতো মেতে জয় দিয়ে বিধাতার—

তারা ফেলতো ছিঁড়ে বাঁধন ছাদন মুক্ত তারা হত আবার ॥

১। শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৪৪, পৃষ্ঠা—৩৪-৩৫

২। বসুমতী সাহিত্য মন্দির—"মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী" 'কর্মক্ষেত্র'—পৃষ্ঠা - ৪

(৪১)

মানস নয়নে করি উন্মীলন,[১]

চেয়ে দেখ শিরে খাড়া ন্যায়ের দণ্ড।

বিদ্যুৎ চমকে ঐ ঝলসে তীব্রানল,

অশনি গরজে কাল রুদ্র প্রচণ্ড ॥

পাঠান্তর :—(১) "মানুষ নয়ন করি উন্মীলন"—চট্টো, গুপ্ত ও চন্দ্র।

এখনো কেটে দে রে মোহ ঘোর তন্দ্রা,

এখনো জেগে ওঠ্‌ ছেড়ে কালনিদ্রা।

পাইয়ে গোটাকত রজত মুদ্রা,

ভেব না করগত বিশ্ব অখণ্ড ॥

বিষয়-বৈভব দম্ভ ধন জন,

দলিত চূর্ণিত পলকে বিলীন

কূট তর্ক হল সেথা অকারণ,

সত্য দীপে জলে অখিল ব্রহ্মাণ্ড ॥

ঐশ্বর্য সম্পদ পেয়েছ যাঁহারি দান,

দলিছ চরণে আজ তাঁহারি সন্তান।

রুদ্র ক্রোধে তাঁর জ্বলিলে নয়ান—

কটাক্ষে ভস্ম যথা আনলে তৃণখণ্ড ॥

১। শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৪৫, পৃষ্ঠা—৩৫-৩৬

২। বসুমতী সাহিত্য মন্দির—"মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী", 'ব্রহ্মচারিণী'—পৃষ্ঠা—১২

৩। সুরেশচন্দ্র দাস "দেশভক্ত ৺মুকুকুচন্দ্র দাসের গান", গীত—১০, পৃষ্ঠা—১২-১৩

৪। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীমদনগোপাল গুপ্ত কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত—"মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত - ২১, পৃষ্ঠা—১২

৫। শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—২১, পৃষ্ঠা—১২

(৪২)

বল শ্যামাঙ্গিনী যোগিনী সঙ্গিনী

উলঙ্গিনী একি রঙ্গ!

মত্ত মাতঙ্গিনী কলুষনাশিনী—

বিভীষিকা কোন করে ভুজঙ্গ।

উগ্রচণ্ডা মূর্তি ভীমা ভয়ঙ্করা,

লম্ফে ঝম্ফে দম্ভে কম্পে বসুন্ধরা।

শুনি অট্টহাসি যোগিনীর পারা,
ত্রাসিত ভেল মন মাতঙ্গ ॥
ক্ষেপেছে রঙ্গিণী মেতেছে রঙ্গে,
ভূত পিশাচ যোগিনী সঙ্গে,
দনুজ নাশিছে সমর রঙ্গে,
ক্ষেপা বক্ষে ক্ষেপী হয়ে উলঙ্গ ॥
তব লীলা শ্যামা কে পারে বর্ণিতে,
যারে দেও বর্ণিতে সে পারে বর্ণিতে,
জ্বলিতেছে হিয়া যে পাপ বহ্নিতে,
ত্বরিতে তাপিতে কব মা সাঙ্গ ॥
বড দয়া তব শুনি কাঙ্গালেতে,
নিবেদন করে রাখি চরণেতে,
চরণ যুগল দেখিতে দেখিতে,
মুকুন্দের খেলা হয় মা ভঙ্গ ॥

শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৪৬,
পৃষ্ঠা—৩৬-৩৭

(৫৩)

তরুণ অরুণ কিরণে প্রকৃতি,
সেজেছে নূতন করিয়া,
প্রভাতে গাহিছে পঞ্চম রাগে,
জাগরণ গীতি পাপিয়া।
পুলকে বিশ্ব উঠিল শিহরি,
খুলে গেল সব কুটীর দ্বার—
জাগাল জননী সন্তানগণে,
লইতে আপন করম ভার।
বন্দি মায়ের-চরণ দু'খানি,
আশিস্ সাগরে করিয়া স্নান,
বাহিরিলা সব মত্ত কেশরী,
ধরিয়া মায়ের বিজয় গান।

পেয়েছে এরা মায়ের অভয়,
গিয়েছে এদের মরণ ভয়,
এরাই পরিবে বিজয় তিলক,
এবাই করিবে বিশ্ব জয় ॥*

শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৪৭,
পৃষ্ঠা—৩৭

(৪৪)

সময় ফিরিয়া কেব৷ পায় ?
কেবলি শুনিনু কানে না চাহিনু তাঁর পানে,
শুধু উপেক্ষিনু তাঁরে হেলায় হেলায় ॥
এখনো যা আছে কিছু ধবিলে তাঁহাবে এঁটে,
যে ক'টা দিন আছে বাকী আনন্দেই যেত কেটে,
কিন্তু এমন অন্ধ মোবা, এমনই কপাল পোড়া,
বিধিলিপি কপাল জোড়া কথায় কথায় ॥
মোরা যেমন ফুটবলে কিক্ দিয়ে ধরা জিনি,
বিধি-রে ভেবেছ বুঝি তেমনি একটি হাবা তিনি।
বিশ্বপতি কর্মময় হাবা ছেলেব বাবা নয়—
কর্ম ভালবাসেন তিনি, কর্মীই তাঁর কৃপা পায় ॥
কর্মক্ষেত্রে এসে যাবা কর্মই কবে না সাথী,
ক্ষণস্থায়ী যেন ভাই তাদেবই জীবন-বাতি
এ মহা কর্মেব যুগে, শান্তি নাই কর্মত্যাগে,
মুকুন্দ কবিছে কর্ম, শান্তিবাবি পিপাসায় ॥

শ্রীকালীপদ দাস—"চাবণ কবি মুকুন্দদাসেব গীতাবলী", গীত—৪৮,
পৃষ্ঠা—৩৮

* ১৯০৬ সাল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষে সাবা দেশের নেতারা উপস্থিত হইয়াছেন বরিশাল সম্মেলনে। মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের প্রথম হইতেই দৃষ্টি ছিল মুকুন্দদাসের উপর। তাই এই বিরাট সভার উদ্বোধন-সঙ্গীতের ভার পড়িল মুকুন্দদাসের উপর। মুকুন্দদাস গাহিলেন—"তরুণ অরুণ কিরণে প্রকৃতি" ইত্যাদি। সেই সভায় পুলিশের লাঠি-চার্জ ও নিষ্ঠুর পীড়ন হয়। চিত্তরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা সেদিন জলে পড়িয়াও জ্ঞান না হাবানো পর্যন্ত 'বন্দেমাতরম্ ধ্বনি' করিয়াছিলেন।

(৪৫)

মায়ের জাতি জাগিয়ে তোল্ ।
মায়ের জাতি গ'ড়ে তোল্ ।
সকল কাজের ঐ তো গড়া,
আজ ভেঙ্গে দে রে তাদের গোল ॥
মেয়েদের এই সব হাইস্কুলে,
মা হবে না কোনকালে ।
তাই তোরা ভাই সবার আগে,
মায়ের মন্দির গ'ড়ে তোল্ ॥
গার্গী, লীলা খনার দেশে,
কাপড় হল গাউন শেষে ।
এসব দেখে শুনে অন্ধের মত,
খাঁটী দুধে ঢালছিস্ ঘোল ॥
মায়ের জাতি উঠলে গ'ড়ে,
ছেলে মিলবে ঘরে ঘরে ।
বাজবে আবার বিজয় ভেরী,
জয় ডঙ্কা সানাই ঢোল ॥

শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৪[illegible],
পৃষ্ঠা—৩৮-৩৯

(৪৬)

জ্বাল্ জ্বাল্ জ্বাল্ কামনা অনল,
পড়বি যেদিন পুড়বি সেদিন এমনি মজার কল ॥
বুকের মাঝে কেটে চিতা কাঠ করে দে হাড়,
সকল শিরার রক্ত দিয়ে আহুতি কর সার ।
আগুন যখন জ্বলবে গগন ছেয়ে উঠবে ;
নিভাতে পারবি না দিয়ে সাত সাগরের জল ।
আপন ঘরে আগুন জেলে বসে দেখছিস্ তোরা,
ফড়িং ভাবে আগুন মিষ্টি এমনি কপল পোড়া ।
যখন পাখা দুটি পুড়বে অবশ হয়ে পড়বে,
প্রাণ-জ্বলনি ছটফটানি কে জুড়াবে বল ॥

১। শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৫১, পৃষ্ঠা—৪০

২। বসুমতী সাহিত্য মন্দির—"মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী", 'ব্রহ্মচারিণী', পৃষ্ঠা—১১-১২

(৪৭)

ছাত্র-মন তরী গড়িয়া মাকে স্মরিয়া;
চল চড়িয়া হে।
আমাদের বাহাদুরী কাঠের তরী,
আজ ভীষণ তরঙ্গে তরণীয়া
হবে সিন্ধুর সহ আইনের যুদ্ধ,
চল জ্ঞান বৃদ্ধ সেনাপতি নিয়া।
ভাগ্যে কমলা ছিল এ ভারতে,
শ্বেত-সিন্ধু নিল হরিয়া।
ধৈর্য নরপতি ন্যায্য সেনাপতি,
চল সবে সুরপতির অনুমতি নিয়া
বিপক্ষ বাতাসে তরঙ্গ পুলিশ,
উঠিল মাতঙ্গে চড়িয়া,
একাগ্র শক্তিতে দেশী শিল্পসিংহ,
দেখনা উঠিছে গর্জিয়া।
দেখে হবি ভয়ে পলাইবে অরি,
সেনা ভঙ্গ দিবে সিংহ নেহারিয়া॥
দক্ষ মাঝি পাছে হালে বসে আছে,
অনুকূল বায়ু হেরিয়া।
বন্দেমাতরম্ বাদাম ছেড়োনো,
বিপক্ষ সম্মুখে হেরিয়া।
পর দেশী বস্ত্র বড ভাল অস্ত্র,
সবে লবণ চিনি যাও পাসরিয়া॥
দেশী আন্দোলনে মন্দর গড়িয়া,
সিন্ধু মাঝে দেহ ছাড়িয়া।
অনন্ত শক্তিকে একত্র করিয়া,
মন্থন রজ্জু ধর টানিয়া।

মন্থনের চোটে যদি সুধা উঠে,

তখন কমলা উঠিবে শিহরিয়া ॥

শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত -৫৩,

পৃষ্ঠা - ৪১-৪২

(৪৮)

তরুণ যখন উঠেছে ক্ষেপিয়া,

পথ রোধি তাঁর দাঁড়াবে কে ?

মায়ের আশিস্ মাথায় লভিয়া,

আপন পথে চলিবে সে।

বম্ বম্ বম্ হর হর বলে,

দীপক রাগে সে ধরিছে সুর—

ব্রহ্ম তালের রুদ্র ঠমকে,

পথের কাঁটা সে করিবে দূর।

ঘোর অমানিশা ভয়াল শ্মশানে,

সাধন ক্ষেত্র রচিছে তাঁর।

মহাকালকে চরণে দলিয়া,

সাধন করিছে সেই কালিকা'র ॥

শব হয়ে শিব চরণে পড়িয়া,

শিবত্ব আবার লভিবে সে—

মরণ সিন্ধু চরণে মথিয়া,

কোহিনূর আবার লভিবে সে।

শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—১৪,

পৃষ্ঠা—৪২-৪৩

(৪৯)

মায়ের নামের বাদাম উড়িয়ে দে রে,

উজান বাইতে বাদাম চাই।

বাংলা দরিয়ার মাঝে,

বড় জোরের কাটাল পড়েছে ভাই ॥

এমন ভাঙ্গন লাগছে গাঙ্গে,

এপার ওপার ভাঙ্গে।

তার উপরে কাল-বোশেখীর,

ঘন ঘটা দেখতে পাই ॥

হুঁশিয়ার থাকিস্ দম্‌কা হাওয়ায়,

তোদের পালের দড়ি ছিঁড়ে না যায়।

লক্ষ্য রাখিস্ মায়ের চরণ,

ভয় কি পারের ভাবনা নাই ॥

এই ঝড় বাদলে নৌকা ছাড়ি,

জমিয়ে দিতে পারলে পাড়ি।

এই বাঙ্গালীর জয়ের সারি,

গাইবে জগৎ শুনবি তাই ॥

১। শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৫৫, পৃষ্ঠা—৪৩-৪৪

২। বসুমতী সাহিত্য মন্দির—"মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী", 'পল্লীসেবা', পৃষ্ঠা—৩৩

(৫০)

রাম রহিম না জুদা কর ভাই

মনটা খাঁটী রাখ জী।

দেশের কথা ভাব ভাই রে,

দেশ আমাদের মাতাজী ॥

হিন্দু মুসলমান এক মায়ের ছেলে,

তফাৎ কেন কর জী;

দু' ভাইয়েতে দু' ঘর বেঁধে,

করি একই দেশে বসতি ॥

টাকায় ছিল আট মণ চাউল ভাই,

এখন বিকায় পোয়া পশারি।

এর পরেতে হতে হবে,

গাছের তলায় বসতি ॥

১। শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৫৬, পৃষ্ঠা—৪৫

২। বসুমতী সাহিত্য মন্দির—"মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী", 'কর্মক্ষেত্র', পৃষ্ঠা—২৬

(৫১)

আয় না রে ভাই আপনি হাটি।
কেন পা থাকিতে নিবি লাঠি॥
দেশী জিনিষ থাকতে কেন,
বিদেশীতে মন মজাও ভাই;
মোটা ভাত মোটা কাপড়ে,
চলে না কি মোটামুটি॥
বীটের চিনি কলের ময়দা,
কাজ কি রে আর খেয়ে তারে।
আখের গুড়[১] আর যাঁতার আটা,
খাব খানা পরিপাটী॥
ছেড়ে দেও মা কাঁচের চুড়ী,[২]
শাঁখার কি আর অভাব দেশে।
মুকুন্দের কথা ধর,
ভাই বোন সব হয়ে খাঁটী॥

১। শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৫৮
পৃষ্ঠা—৪৫-৫৬

২। বসুমতী সাহিত্য মন্দিব—"মুকুন্দদাসেব গ্রন্থাবলী", 'কর্মক্ষেত্র',
পৃষ্ঠা—৪৫

(৫২)

ছেড়ে দেও কাঁচের চুড়ী বঙ্গনারী,
কভু হাতে আর প'রো না।
জাগ গো ও জননী ও ভগিনী,
মোহের ঘুমে আর থেকো না॥
কাঁচের মায়াতে ভুলে শঙ্খ ফেলে,
কলঙ্ক হাতে প'রো না।

পাঠান্তর:—(১) 'আঁখীগুড়', (২) 'ছেড়ে দেও বিদেশী কাপড়,
বাঁচুক মোদের দেশী তাঁতি,
তামা কাঁসা থাকতে দেশে,
কিনিস্ কেন লোহার বাটি।'—বসুমতী।

তোমরা যে, গৃহলক্ষ্মী ধর্ম্মসাক্ষী,

জগৎ ভ'রে আছে জানা।

চটকদার কাঁচের বালা ফুলের মালা,

তোমাদের অঙ্গে শোভে না॥

বলিতে লজ্জা করে প্রাণ বিদরে,

কোটী টাকার কম হবে না।

পুঁতি কাঁচ ঝুঁটো মুক্তায় এই বাংলায়,

নেয় বিদেশী কেউ জানে না॥

ঐ শোন্ বঙ্গমাতা শুধান কথা,

জাগ আমার যত কন্যা।

তোরা সব করিলে পণ মায়ের এ ধন,

বিদেশে উড়ে যাবে না॥

আমি অভাগিনী কাঙ্গালিনী,

দু'বেলা অন্ন জোটে না।

কি ছিলেম, কি হইলেম, কোথায় এলেম,

মা যে তোরা চিনলি না॥

১। শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৫৯, পৃষ্ঠা – ৪৬-৪৭

২। বসুমতী সাহিত্য মন্দির—"মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী", 'কর্মক্ষেত্র', পৃষ্ঠা—৪৬

(৫৩)

আমি গান কবিতাম গাইতে দিলে গান।

সে গানে মাতিয়ে দিতাম প্রাণ॥

গলাটা বেশ করে সেধে,

সুরটা নিতাম পঞ্চমে বেঁধে।

তানে প্রাণ উঠত রে মেতে,

সবার দিল-দরিয়ায় বইত রে উজান॥

দিতাম একটা এমন অট্টহাস,

জগৎটার কেটে যেত পাশ।

ঝড়ের মত বইত রে বাতাস,
উড়িয়ে নিত কালো মেঘখান ॥
সুখ-রবি কিরণ ছড়াত,
সব ঘুমের মানুষ চমকে উঠত ;
এ মুকুন্দ একাই পারত,
জগৎ ধরে দিতে একটা টান ॥*

শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৬০,
পৃষ্ঠা—৪৬-৪৮

(৫৪)

তুমি যদি আবার বাজাতে মোহন বাঁশরী,
যমুনা বুঝি বা বহিত উজান।
আবার তুলিত কুঞ্জ বিপিনে,
বুঝি বা বিহগী মধুর তান ॥
উঠিত ফুলিয়া ভারত রক্ত,
নাচিত গরবে জননী ভক্ত।
বাহু প্রসারণে হইত শক্ত,
লইত আপন করম ভার।
ঢালিত প্রকৃতি প্রেম প্রবাহে,
শান্তি সরস অজেয় তান ॥
হইত মায়ের করুণা পাত্র,
লভিত আপন করম ক্ষেত্র।
ধরিত বাহুতে শকতি সূত্র,
সন্তান দিত অনায়াসে আপন প্রাণ।
উঠিত আবার নিন্দুক মুখে,
জয় সুখাবহ সুযশ গান ॥

* ১৯০৮-১৯০৯ সাল। ইংরেজ সরকার রাজদ্রোহের অপরাধে মুকুন্দদাসকে গ্রেপ্তার করিয়া সুদূর "দিল্লী সেণ্ট্রাল জেলে" তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। মুকুন্দদাস ঐ কারাগারের মধ্যে থাকিয়া গান ধরিলেন—
"আমি গান গাহিতাম গাইতে দিলে গান,
সে গানে মাতিয়ে দিতাম প্রাণ ॥"

সুনীল গগনে সুধা বরষিত,
সে বিধু তারকা গরবে হাসিত।
বিজয় পতাকা মলয়ে খেলিত,
শিহরি উঠিত শোণিত ধার।
খেলিত চপলা কুলিশ বরষি,
রাখিতে ভারত গরব মান॥

শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৬১,
পৃষ্ঠা—৪৮-৪৯

(৫৫)

ডাকবো কি শুনবে কে রে,
আছে কি কারো কান?
পাব কি এমন ছেলে,
যার দেশের লাগি কাঁদে প্রাণ॥
দেশ বিদেশে ঘুরে ঘুরে,
কত ভাবের গাইনু গান—
সে গান শুনলে না কেউ,
বুঝলে না কেউ,
কোন্ সুরেতে ধরছি তান॥
আমরাই নাকি বিশ্বমাঝে,
বিশ্বপতির শ্রেষ্ঠ দান।
আজ উপোস করে দিন কাটাচ্ছি,
থাকতে মোদের ক্ষেতে ধান॥
ভাব-সাগরে বইছে হাওয়া,
কাল-সাগরে ডাকছে বান।
এখনো হাল ছেড়ে দে ঢেউ কাটিয়ে,
পার হয়ে যাক্ তরীখান॥

শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৬২,
পৃষ্ঠা ৪৯—৫০

মা মা বলে ডাক্ দেখি ভাই,
ডাক্ দেখি ভাই সবে রে।
মা মা বলে কাঁদলে ছেলে,
মা কি পারে রইতে রে ॥
জাগিবে জননী কুলকুণ্ডলিনী,
জাগিবে শক্তি জাগিবে রে,
খুলে যাবে প্রাণ দিতে পারবি প্রাণ,
স্বদেশ কল্যাণ তরে রে ॥
মায়ের শ্রীচরণ তরী ভরসা করি,
ভাসাও দেহ তরী রে।
মা হবে কাণ্ডারী সুখে যাবে তরী,[১]
ভয় কি অকূল পাথারে ॥
দেখ্ ভারতবাসী ঐ এলোকেশী,
মায়ের হাতে অসি কেঁপেছে রে।
এ মুকুন্দ কয় আর কারে ভয়,[২]
জয় জয় ডঙ্কা বাজা রে ॥

১। শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—২৪, পৃষ্ঠা ৫১—৫২

২। শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত—"চারণকবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—১, পৃষ্ঠা—১

৩। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীমদনগোপাল গুপ্ত—"মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৩, পৃষ্ঠা—৩

৪। শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস—"দেশভক্ত ৺মুকুন্দচন্দ্র দাসের গান", গীত—৬, পৃষ্ঠা—৫

৫। বসুমতী সাহিত্য মন্দির—"মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী," 'কর্মক্ষেত্র', পৃষ্ঠা—৩

পাঠান্তর :—

(১) "তবে মা হবেন কাণ্ডারী সুখে দেবে পাড়ি"
—গুপ্ত, চট্টো ও চন্দ্র।

(২) "দাস মুকুন্দ কয় আর কারে ভয়"—গুপ্ত, চট্টো ও চন্দ্র।

(৫৭)

অমল আনন্দে নাচ বীর ছন্দে,

বল রে কালী মাইকি জয়।

ছেলের ডাকে পাগলিনী জাগিবে রে কুণ্ডলিনী,

কি ভয়—কি ভয়—কি ভয়॥

হর হর বম্ বম্ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ,

আনহাতে আন রে প্রলয়।

কোটী কণ্ঠ-যন্ত্রে ভারতের মহামন্ত্রে,

বিঘোষিত কর জগন্ময়॥

লুপ্ত গরীমা ভবে মূর্ত করিতে হবে,

অমৃতস্য পুত্র সমুদয়।

রোমাঞ্চ উঠুক বিশ্বে, মিলে যাক্ গুরু শিষ্যে,

আসুক সত্য হউক সমন্বয়॥

শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৬৫,

পৃষ্ঠা—৫২

(৫৮)

ছল চাতুরী কপটতা মেকী মাল আর চলবে ক'দিন?

হাড়ি মুচির চোখ খুলেছে, দেশের কি আর আছে সেদিন॥

খেতাবধারী হোমরা চোমরা, নেতা বলেই মানতে হবে,

মনুষ্যত্ব থাক কি না থাক, তাঁর হুকুমেই চলবে সবে।

সত্যকে পায় দলবি তোরা আসন চাইবি বিশ্ব জোড়া;

হবে না তা নবীন যুগে হোস না তোরা যতই প্রবীণ॥

সংবাদপত্রে উচ্চস্তম্ভে নাম ছাপিয়ে টেক্কা নিবি,

মুস্কিল আসান করতে হলে কংগ্রেসের দোহাই দিবি।

ভণ্ডামী আর করবি কত হলি না কেউ কাজে রত।

মনে রাখিস্ স্বদেশ ব্রত, কর্মী হবে কর্মেতে লীন॥

নেতারাই দেশ জাগাত সবাই তাঁদের বলত চারণ।

এখন আপনা বেঁচে মালসী পাড়ায়, যোগান তাঁরা

ভোটের দাদন।

তোদের পতন এতই গভীর ভাবলেও তা করে স্থবির।

দেশ হাসালি রূপ দেখালি প্রতিভা রে করলি মলিন॥

দেশের কাছে পড়লি ধরা আর দাঁড়াবার উপায় নাই,
আমরা ভাই বাউল চারণ মুক্তিমন্ত্র ছড়িয়ে বেড়াই।
গাড়ো সাঁওতাল বাগ্দি মেথর রয়েছে ওদের ভিতর।
মাতৃমন্ত্রের সাধক তারা, তারাই ভারত করবে স্বাধীন ॥
পল্লী মায়েব শ্মশান বুকে বসে যাবে আবার ধ্যানে
কুণ্ডলিনী জাগবে সেদিন তোদেরি অজপার টানে।
ভারতের ভাগ্য-রবি ধরবে সেদিন নূতন ছবি,
জগতের অমানিশায় পূর্ণচন্দ্র উঠবে সেদিন ॥

১। শ্রীকালীপদ দাস— "চাবণ-কবি মুকুন্দদাসেব গীতাবলী", গীত—৬৬, পৃষ্ঠা— ৫৩-৫৪

২। শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী," গীত—৯, পৃষ্ঠা—৫

৩। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীমদনগোপাল গুপ্ত কর্তৃক সংকলিত—"মুকুন্দদাসেব গীতাবলী," গীত—১২, পৃষ্ঠা—৭-৮

(৫৯)

বাবুদের* পায়ে নমস্কাব

দেখলেম ভাই ঘোর কলিতে এ জগতে
ভাল মন্দের নাই বিচার ॥
যার মা উপোসী ভগ্নি দাসী বাবুর বাড়ীতে
সেই ছেলে হয় টিকপ্দার বেশ্যা বাড়ীতে।
বাবু বিদ্যার নামে নব ডঙ্কা—
গুড্নাইট, গুড্মর্নিং সার ॥

* বাবুদের পায়ে নমস্কার—'বণিকের মানদণ্ড' যখন 'রাজদণ্ড'-রূপে দেখা দিল তখন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও অনুপ্রাণিত একশ্রেণী নব্য বাঙালী যুবকদের "বাবু" নামে অভিহিত করা হইত। ইহারা বাংলা বলিত না, যে বলিত তাহাকে অসভ্য ও বর্বর বলিত। নিজেরা সর্বদাই "হেটো ইংরেজী, মেঠো ইংরেজী, চোরা ইংরেজী, ছেঁড়া ইংরেজীতে" কথা বলিত এবং নিজেকে আর দশজনের নিকট হইতে পৃথক রাখিত। বঙ্কিমচন্দ্র ইহাদের জাতির কলঙ্কস্বরূপ ('কুলাঙ্গার') কলিযুগের এক অদ্ভুত জীব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। স্বদেশীদের নিকট ইহারা ঘৃণিত ও নিন্দিত, বিদেশীদের নিকট অনুগৃহীত ও অবহেলিত। তথাপি "বাবু" সম্বোধনে ইহারা আনন্দিত ও গর্বিত।

কলিতে বউ হয়েছে রং-এর বিবি[1] স্বামী মানে না—
শাশুড়ী হ'ন ময়না মাগী স্বামী খানসামা।
তারা ভাশুর শ্বশুর কেয়ার করে না
বাপকে বলে "মাই-ডিয়ার॥"
ছোট খাটো চুল ছাঁটা আর সিং তোলা টেরী
যুবক বন্ধুর চোখে চশ্‌মা এই দুঃখে মরি!
বাবুরা স্ফূর্তি করে বেড়ান ঘুরে[2]
যেন ময়লা টানা গাড়ীর ষাঁড়॥

১। শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৬৭, পৃষ্ঠা—৫৪

২। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীমদনগোপাল গুপ্ত কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত—"মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—২৮, পৃষ্ঠা—১৫-১৬

৩। শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত সংকলিত—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—২৬, পৃষ্ঠা—১৫

৪। শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস—"দেশভক্ত ৺মুকুন্দচন্দ্র দাসের গান", পৃষ্ঠা—১৩-১৪

(৬০)

এসেছে ভারতে নব জাগরণ,
পেয়েছে ভারত নূতন প্রাণ
মাতৃমন্ত্রে লয়েছে দীক্ষা
জগতে শিক্ষা করিবে দান॥
স্তম্ভিত করি বিশ্বমানবে
শিষ্য করিতে জগতখান—
কহিছে সে আজ পুণ্য বারতা
শোন রে সকলে পাতিয়া কান।
বিরাট ব্যোম্-ছত্র তলে
রবি শশী ঐ তাঁরই আঁখি জলে—

পাঠান্তর :—

(১) "বাবুর বৌ হয়েছে রঙ্গের বিবি"

(২) "বাবু পথে বেড়ান ঘুরি।"

—চট্টো, গুপ্ত ও চন্দ্র।

ইঙ্গিতে তাঁর ত্রিভুবন টলে

এ মরজগতে তিনি গরীয়ান্।

অমৃত তিনি শাশ্বত তিনি

তাঁরেই অর্ঘ্য কর হে দান।

১। শ্রীকালীপদ দাস—'চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী'', গীত—৬৮, পৃষ্ঠা—৫৫

২। শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত— "চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—২০, পৃষ্ঠা—১১-১২

৩। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীমদনগোপাল গুপ্ত কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত— "মুকুন্দদাসের গীতাবলী," গীত—৮, পৃষ্ঠা—১০-১১

৪। বসুমতী সাহিত্য মন্দিব—'মুকুন্দদাসেব গ্রন্থাবলী'', 'পল্লীসেবা', পৃষ্ঠা—৪১

(৬১)

আমরা বিচাব কবে চলবো না।

মান অভিমান রাখবো না

ধনী কি দীন বাছবো না॥

আমরা মোদের ভাই চিনেছি

এখনো কি নেটিভ আছি—

ইউনিটি সার করেছি

কারেও কেউ ছাডবো না॥

হিন্দু পার্শী জৈন সাঁই

মুচী ডোম মেথর কসাই—

আমরা সকলেই এক মায়েব ছেলে

এই মহামন্ত্র ভুলবো না॥

পাগল সেজেই বলতে সোজা

তাই মুকুন্দের পাগল সাজা।

ছাড়তে হবে জাতের বিচার

নইলে ভারত উঠবে না॥

শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৬৯, পৃষ্ঠা—৫৫-৫৬

(৬২)

পতিত পাবনী অধম তারিণী

দীন দয়াময়ী শ্যামা রে।

এ ঘোর অকূলে পার হবি হেলে

পরাণ খুলিয়ে ডাক রে॥

মধুর কণ্ঠে যদি ডাক নিরবধি,

ভেসে ভেসে আঁখি জলে রে।

হউক না পাষাণ মায়ের পরাণ,

সে পাষাণ যাইবে গলে রে॥

ছেলে কাঁদে যার সে মা কি রে আর

ঘুমাতে কখনো পারে রে।

কুণ্ডলিনী জাগিবে মনের আঁধার ঘুচিবে

মরা প্রাণ নেচে উঠিবে রে॥

বিপদ সাগরে ভয় রবে না রে,

অনায়াসে যাবি পারে রে।

মুকুন্দেব জননী পতিত পাবনী

তবাতে পতিত জনে রে॥

১। শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৭০, পৃষ্ঠা—৫৬-৫৭

২। বসুমতী সাহিত্য মন্দির – "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী", 'সমাজ', পৃষ্ঠা—৩১

(৬৩)

হবে নামতে ধূলার তলে—

পথে ঘাটে রৌদ্র মাঠে সবাই যেথায় চলে॥

অহঙ্কারে উচ্চাসনে বসে বসে আপন মনে,

ভাবছিস্ বুঝি তোদের মতো নাইকো ত্রিভুবনে।

এতে নিজেদেরে যে ছোট করে তুলছ প্রতক্ষিণে—

যিনি বাজার রাজা তিনি বেড়ান,

ছোট বড সবার দলে॥

তাঁরেই শুধু মানী জানি,

সবারে যে করবে মানী,

এ নহে মান এ বেইমানী,

ফেরা মানের খোঁজে।

সবার চেয়ে কাঙ্গাল সেজে,

সে কি গো তা বুঝে।

মানের গোড়ায় না দিলে ছাই—

মান কি মিলে কথার ছলে ॥

শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৭ , পৃষ্ঠা—৫৭-৫৮

(৬৪)

আপন চেনা কঠিন ভেবে।

আপন চিনবে যেদিন বিশ্ব সেদিন

আপন হয়ে যাবে ॥

চিনলে আপন জনা, লোহা যেত হয়ে সোনা,

পেতে তাঁর স্নেহের কণা ভেসে যেতে কবে—

তিল তিল করি বিলিয়ে দিতে লুটে নিত সবে।

ঐ স্বরগে আজ বাজতো ভেরী—

দেবতা সব আসতো নেবে ॥

পাগলের কথা ধর, এখনো সরে পড়,

দিন রবে না ঠিক জেনো ভাই এদিন চলে যাবে,

কালের স্রোতে সবাইকে ভাই ভেসে যেতে হবে।

এ মুকুন্দের ঝাঁকে ঢেলা—

বুঝবে সেদিন আসবে যাবে ॥

শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—২, পৃষ্ঠা—৫৮

(৬৫)

আমি দশ হাজার প্রাণ যদি পেতাম।

তবে ফিরিঙ্গী* বণিকের গৌরব-রবি —

অতল জলে ডুবিয়ে দিতাম ॥

---

* ফিরিঙ্গী: (পো. Francez)। (মূঃ ফরাসী পোতুগীজ, হঃ ইওরোপীয় জাতি) ইওরোপীয় ও ভারতীয় হইতে উৎপন্ন বর্ণসংকর জাতি, ইওবোপীয়।

"ফিরিঙ্গি" শব্দের অর্থের চমৎকার ইতিহাস আছে। শব্দটির উৎপত্তি যেখান হইতেই হউক না কেন, বাঙলায় ইহা আদিতে 'পর্তুগীজ জলদস্যু'-গণকে বুঝাইত। তারপর ভারতীয় নারীব গর্ভে তাহাদের উৎপাদিত সন্তান এবং এখন 'ইওরোপীয়'-গণকে বোঝায়। স্থানে স্থানে 'ইওরোপীয়' অর্থেও এই শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়—"জঙ্‌লা কাঙ্‌লা ফিরিঙ্গি সব বাংলা হ'তে হ'ল দূর" ('সিরাজদ্দৌলা'—গিরিশচন্দ্র ঘোষ) পাশি "ফিরিঙ্গি" শব্দে ইওরোপ বোঝায়। বোম্বাই-এ গোয়ার দেশী খৃষ্টানদিগকে "ফিরিঙ্গি" বলে।

শোন সব ভাই স্বদেশী,

হিন্দু মোছলেম্ ভারতবাসী।

পারি কিনা ধরতে অসি,

জগতকে তা দেখাইতাম ॥

কথা শুনে প্রাণ যদি মজে,

সেজে আয় বীর সাজে।

দাস মুকুন্দ আছে সেজে,

দাঁড়ি পেলে তরী ভাসাইতাম ॥

শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত —৭৩,

পৃষ্ঠা—৫৮-৫৯

(৮৬)

ফুলার* আর কি দেখাও ভয়?

দেহ তোমার অধীনে বটে!

মন তো তোমার নয়।

হাত বাঁধিবে পা বাঁধিবে,

ধরে না হয় জেলেই দিবে—

মন কি ফিরাতে পারবে,

সে তো পূর্ণ স্বাধীন রয় ॥

বন্দে মাতরম্ মন্ত্র কানে,

বর্ম এঁটে দেহে মনে।

রোধিতে কি পারবে রণে —

তুমি কত শক্তিময় ॥

শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত —৭৪,

পৃষ্ঠা—৫৯

* ফুলার. পূর্ববঙ্গ-আসামের ছোটলাট স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি বিদেশী বস্ত্র প্রচলনের চেষ্টা করেন। তিনি বস্ত্রব্যবসায়ীদের ভীতিপ্রদর্শন করেন এবং প্রশাসনিক নাগপাশে তাহাদের বাঁধিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহার সে চেষ্টা ও অভিযান ব্যর্থ হয়। মুকুন্দদাস এই দাম্ভিক ও স্বেচ্ছাচারী ছোটলাটকে উদ্দেশ্য করিয়া বজ্রকণ্ঠে সেদিন এই গান গাহিয়াছিলেন। কালের অমোঘ নিয়মে আজ সেই কণ্ঠ স্তব্ধ হইলেও মুক্তিকামী জনসাধারণের নিকট আজও তাহা জীবনবেদ।

(৬৭)

জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী,
ডাকে আজ ভকতি ভজনবিহীন জনা।
অধম তারিণী তুই শ্যামা মা ॥
তুই না জাগালে কেউ জাগিবে না,
কাল ঘুম মোদের কারো ভাঙ্গিবে না,
এ ঘোর রজনী আর পোহাবে না,
সবই হয়েছে শব মা।
সে শব 'পরি এসে দাঁড়া ত্রিনয়না—
ভ্রামরী ভবানী ভৈরবী ভীষণা।
নাচ্ মা চল্লিশ কোটী শব 'পরি নাচ্,
তাথৈ-তাথৈ-থৈ ধিন-ধিন-ধিনা ॥
বাতুল চরণ পরশ পাইয়া,
চল্লিশ কোটী মরা উঠিবে বাঁচিয়া।
দেখিলে মায়ের শ্রী উঠিবে শিহরি,
কাঁদিয়া উঠিবে প্রাণ।
তখন কোটী কণ্ঠ মিলে একবার হুঙ্কারিলে,
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
সিদ্ধি হবে মা ভারতের চির আকাঙ্ক্ষিত,
স্বরাজ সাধনা ॥

শ্রীকালীপদ দাস—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৭৫,
পৃষ্ঠা—৬০

(৬৮)

(ভাই রে) মাটিই খাঁটি ভবে।
মাটির দেহ পরিপাটি, মাটিতে লয় হবে ॥
দু'দিনের জন্য আসা, দু'দিনের ভালবাসা,
দু'দিনেই ভাঙ্গে বাসা স্থায়ী হয় কে কবে।
কাল সাগরে উঠছে তুফান আর কতদিন রবে-
ভুলে যা রে দলাদলি গলাগলি হয়ে সবে ॥

সকলে এক মায়ের ছেলে আছি এক মায়ের কোলে
ভাব একটু গোলক ধাঁধার ধাঁধা ঘুচে যাবে।
ধনী দীন রাজা প্রজা মাটির কোলেই শোবে,
নেংটা আসা নেংটা যাওয়া, ভবের খেলা সাঙ্গ হবে ॥

শ্রীকালীপদ দাস "চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৫২,
পৃষ্ঠা—৪১

(৬৯)

মায়ের ডাকে সব জেগেছে,
যে যার কাজে লেগে গেছে,
তোমরাই মায়ের জাতি বসে থাকবে কী নীরবে ?
শক্তি স্বরূপিণী যাঁরা
এ দুর্দিনে কেন তাঁরা
ভোগে বিলাসে মজে মৃতপ্রায় পড়ে রবে ॥
জাগাও সকলে আজি নিদ্রিতা শকতি,
তোমাদেরি হাতে মাগো, ভারতের মুকতি,
শিখাও সন্তানগণে মাতৃ-ভকতি,
করম-মন্ত্রে দীক্ষিত করে সবে ॥
বীর সাজে সাজিয়ে দে সন্তানগণে,
অবহেলে যেন তারা জয়ী হয় রণে,
অর্ঘ্য দিতে মাতৃ-চরণে
সমবেত হোক সবে বম্ বম্ হর রবে

১। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত শ্রীমদনগোপাল ও গুপ্ত কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত—
"মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৪, পৃষ্ঠা—৩-৪
২। শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত—
"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৭, পৃষ্ঠা—৪
৩। বসুমতী সাহিত্য মন্দির "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী",
'পল্লীসেবা', পৃষ্ঠা—১৩

(৭০)

তোরা সবে কোদাল ধর।
দেশ থেকে তাড়াতে হবে ম্যালেরিয়া জ্বর ॥

মাথা গুঁজে ভাবলে বসে হবে না দেশের কল্যাণ,
কোমর বেঁধে হতে হবে সবায় আগুয়ান,
ভয় কি রে ভাই একজন আছেন মাথার উপর ॥
ঝড়ের মতন আয় রে মেতে সাগর করে প্রাণ,
দ্বেষ-হিংসা দল রে পায়ে মান অপমান,
দেখবি যদি মায়ের হাসি প্রেমের সরোবর ॥

১। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীমদনগোপাল গুপ্ত কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত—
"মুকুন্দদাসের গীতাবলী', গীত - ৮, পৃষ্ঠা - ৫-৬

২। শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত—
'চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৮, পৃষ্ঠা—৪-৫

৩। বসুমতী সাহিত্য মন্দির— 'মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী", 'পল্লীসেবা',
পৃষ্ঠা — ৮

(৭১)

পুঁটলি বেঁধে ঘরের কোণে, আর কি বসে থাকা যায়,
দেবতা আজ ঘরের দ্বারে, অর্ঘ্য দিতে হবে পায় ॥
হিসাব রেখে সিকেয় তুলি, লুটিয়ে নে মা'র চরণ ধূলি,
সাধনার ধন চরকাগুলি, মাথায় তুলে দেখ তায় ॥
চালা রে তাঁত সাজ রে তাঁতি, দেখে নিক বিদেশী তাঁতি,
বুঝিয়ে তাদের দিতে হবে আমরা সবাই দুনিয়ায় ॥
রাখিস্ রে রাখিস্ মনে, হিন্দু-মুসলমান ভাই দুজনে,
এক হয়ে আজ নামতে হবে, লাগতে হবে মা'র সেবায় ॥
দেশের ধান যায় বিদেশে, রাখতে হবে তারে দেশে,
করতে হবে ধর্ম গোলা প্রতি পল্লী প্রতি গাঁয়ে ॥

১। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীমদনগোপাল গুপ্ত কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত
"মুকুন্দদাসের গীতাবলী," গীত—১১, পৃষ্ঠা—৭

২। শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত—"চারণ-কবি
মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—১১, পৃষ্ঠা—৬

৩। বসুমতী সাহিত্য মন্দির—' মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী", পৃষ্ঠা —২০-২১

(৭২)

কেতাবধারী হোম্‌রা চোম্‌রাই

নেতা বলে মানতে হবে।

মনুষ্যত্ব থাক্ বা না থাক্

তার হুকুমেই চলতে হবে ॥

সত্যকে পায় দলবি তোর

আসন চাইবি বিশ্বজোড়া,

হবে না তা নবীন যুগে

হোস্ না তোরা যতই প্রবীণ ॥

পল্লীমায়ের শ্মশান বুকে

নেতারা সব বসছে ধ্যানে,

কুল-কুণ্ডলিনী জাগবে যেদিন

তাদেরই অজপার টানে ॥

ভারতে ভাগ্য-রবি ধরবে সেদিন

নূতন ছবি,

জগতের অমানিশায় পূর্ণচন্দ্র

উঠবে সেদিন ॥

১। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীমদনগোপাল গুপ্ত কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত - "মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—১৩, পৃষ্ঠা—৮

২। শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত— ৩ পৃষ্ঠা—৭-৮

(৭৩)

আমি গাইব কি আর শুনবে কে রে,

আছে কি আর কারো কান ?

আমি দেশ-বিদেশে ঘুরে ঘুরে কত ভাবের গাইনু গান ,

এ গান শুনলে না কেউ বুঝলে না কেউ

কোন্ সুরেতে ধরছি তান ॥

আমরাই নাকি বিশ্বমাঝে বিশ্বপতির শ্রে· দান,

আমরাই আজ উপোস করে

দিন কাটাচ্ছি থাকতে মোদের ক্ষেতের ধান ॥

পাব কি আর এমন ছেলে দেশেব লাগি কাঁদে প্রাণ,
ভব-সাগরে বইছে হাওয়া কাল সাগরে ডাকছে বান,
তোরা এখন হাল ছেড়ে দে পাব হয়ে যাক্‌ তবীখান ॥[১]

১। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীমদনগোপাল গুপ্ত কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত—
"মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—৫, পৃষ্ঠা—৪

২। শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত—"চারণ-কবি
মুকুন্দদাসেব গীতাবলী", গীত—৫, পৃষ্ঠা—৩

৩। শ্রীসুবেশচন্দ্র দাস—"দেশভক্ত ৺মুকুন্দচন্দ্রদাসেব গান,"
গীত -৫, পৃষ্ঠা—৫

(৭৪)

দেশেব লক্ষ্মী গেছে ছেড়ে।
মেযেমানুষটি পূজাব দেবী,
স্বামী থাকেন করযোড়ে,
দেশের লক্ষ্মী গেছে ছেড়ে ॥
দুশ্চবিত্রা নাবী যাবা,
পাড়ায় পাড়ায ঘোবে তারা,
কেবল তাদেব ঝগড়া করা, কাহারে না ডরে,
দেশেব লক্ষ্মী গেছে ছেড়ে ॥
স্বামীটা যাব আছে নরম,
তাব মোটে নাই লজ্জা সবম,
কেবল ত'ব চক্ষু গবম, স্বামী থাকেন ডবে,
দেশেব লক্ষ্মী গেছে ছেড়ে ॥
বাগেব জ্বালায ঘরে ঢোকে,
থালা বাসন ধরে আছাড মারে,
তাই মুকুন্দদাস ভেবে বলে, এসব আছে ঘরে ঘরে,
দেশের লক্ষ্মী গেছে ছেড়ে ॥

১। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীমদনগোপাল গুপ্ত কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত—
"মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—১৪, পৃষ্ঠা—৯

২। শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত—"চারণ-কবি
মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—১৫, পৃষ্ঠা—৮-৯

পাঠান্তর :—(১) 'পার হয়ে যাক্‌ (ভারতবাসীর) তরীখান" —চন্দ্র

(৭৫)

আমি এক ধর্ম-অনুরাগী।

বাপ আমার গুষ্টি পোষেন, আমি হলেম সবত্যাগী

আমি লেখাপড়ায় অষ্টরম্ভা, কথা বলি লম্বা লম্বা,

বাপকে ডাকি "ওল্ডফুল" বলে মা বেটি অভাগী,

ঘরের গিন্নীর ঝাঁটা খেয়ে আমি হয়েছি বিরাগী॥

তাই কাবু হয়ে গেছি গলে তাইতে দেশের সেবায় লাগি॥

শুনলে হরি নামাবলী অমনি আমি কেঁদে ফেলি,

কীর্তনে লাফাই আমি সারারাত্রি জাগি॥

লোকে বলে আঃ কি ভক্ত, আঃ কি অনুরাগী,

আমি কিন্তু যা করি তাই, সবই আমার নামের লাগি॥

শুনলেন তো আমার পরিচয়,

এদেশে আমার মত প্রায় সমুদয়,

তাই মুকুন্দ কেঁদে কেঁদে কয়,[১]

সারা বাংলা খুঁজে পেল না সে তাহার দুঃখের একটা ভাগী॥

১। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীমদনগোপাল গুপ্ত কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত—"মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—১০, পৃষ্ঠা—৬-৭

২। শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—১২, পৃষ্ঠা—৬-৭

৩। শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস—"দেশভক্ত ৺মুকুন্দচন্দ্রদাসের গান", গীত—৪, পৃষ্ঠা—৩-৪

(৭৬)

মোরা ঢুকেছি যে রঙ্‌মহলে আর যাব না রান্নাঘরে।

তাই রান্নাবান্না ছেড়ে দিয়েছি, এখন রাঁধুনী-বামুনে করে॥

এতকাল যে ঘুমিয়েছিলাম ঘোমটা টেনে চিরকাল,

শাশুড়ী ননদীর কাছে নিত্য নূতন খেতাম গাল,

এখন ঘোমটা ফেলে সভার মাঝে যাচ্ছি কত ফ্যাশান ধরে॥

পাঠান্তর :—(১) "তাই দাস মুকুন্দ কেঁদে কেঁদে কয়"—চট্টো

শাশুড়ী ননদী যদি পথের কাঁটা হয়,
তাই স্যাণ্ডেল জুতো পায়ে দিয়েছি আর করি কি ভয়,
মোরা বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ যাচ্ছি মোটরগাড়ী চড়ে।
লজ্জা-ঘৃণায় দুটি আঁখি চশমা দিয়ে দিয়েছি ঢেকে,
তাই কপালে টিপ খোঁপাতে ক্লিপ
বেড়াই এসেন্স আতর মেখে,
মোরা হাতেতে রিষ্টওয়াচ্‌ বেঁধেছি
শাঁখা চুড়ি বদল করে॥
পার্টি আর তাস খেলাতে লোকে যদি মন্দ বলে
শুনবো নাকো, কান ঢেকেছি পাতা কেটে মাথার চুলে,
নইলে নভেল পড়ে দিন কাটাব
এস্‌রাজ হারমোনিয়াম ধরে॥

১। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীমদনগোপাল গুপ্ত কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত—"মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—১৯, পৃষ্ঠা—১৬

২। শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী", গীত—২৮, পৃষ্ঠা—১৬

(৭৭)

আপন নিয়ে থাকলে পরে
আপন কভু তো চিনবে না।
আপন-হারা বেহুঁস বিনে
মরম কেউ তো বুঝবে না।
যে জন আপন নিয়ে আছে বসে
থাক না সে তাকিয়ে বসে,
হউক না নাম তার দেশ-বিদেশে
ফক্কা বিনে মিলবে না।
যে জন আপন ছেড়ে বেরিয়ে গেছে,
দুনিয়ার পায় প্রাণ ঢেলেছে;

আত্মনির্ঝর কোথায় আছে

পেয়েছে রে তার নিশানা।

বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত—"মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী",

'পল্লীসেবা', পৃষ্ঠা—১১

(১৮)

আমরা নেহাৎ গরীব

আমরা নেহাৎ ছোট,

তবু আছি ত্রিশ কোটী

জেগে ওঠ।

জুড়ে দে ঘরে তাঁত,

সাজা দোকান,

বিদেশে না যায় ভাই

গোলারি ধান,

মোটা খাবো

ভাই রে পরবো মোটা,

আমরা মাখবো না লেভেণ্ডার

চাই না অটো।

নিয়ে যায় মায়ের দুধ পরে দুয়ে

উপোসী রব কি ঘরে শুয়ে,

শোন্ বিদেশী আমরা বুঝেছি সব

খেলনা দিয়ে মোদের সোনা লোট।

বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত—"মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী",

'পল্লীসেবা', পৃষ্ঠা—৪৮

১৯)

আমার ভেতর আসল আমি

যখন আমার জাগে,

আমিই তখন বিশ্বময়

ভিক্ষা তখন বিশ্ববাসী

আমার কাছেই মাগে।

আমিই তখন বিশ্বগুরু
আমার বীণাই বাজে।
আমার ইচ্ছায়ই লেগে আছে,
যে যার আপন কাজে।
আমার আদেশ মান্য করেই
চলছে সবেই ভাই,
তাই তো আমার সেই "আমিটা"
জাগিয়ে তোলা চাই ॥

বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত—"মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী",
'পল্লীসেবা', পৃষ্ঠা—৩৬

(৮০)

একবার ব্যাকুল প্রাণে তাঁরে ডাকো রে।
দীন দয়াময়ী শ্যামা মায়ে রে ॥
পতিত পাবনী, অধম তারিণী।
মায়ের দীন জনে, বড় দয়া রে ॥
হইবে দয়া, ঘুচিবে মায়া,
প্রেমের সাগরে যাবি ভেসে রে ॥
ত্রিগুণ ধারিণী, কলুষ নাশিনী।
মোহ আঁধার যাবে ঘুচে রে ॥
সাকার আকার, নিরাকার নির্বিকার।
তারিণী তার এ মুকুন্দে রে ॥

বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত—"মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী"
'সমাজ', পৃষ্ঠা—৩৪

(৮১)

এ সব চার পাগলের খেলা,
একটা সাদা, একটা লাল,
একটা কালী, একটা কালা ॥

সবই এক ভাবের পাগল,
এক যোগেতে কবে সকল,
বুঝতে গেলে বাঁধায় রে গোল,
এমনি মজার খেলা ,
যে বোঝে তার যায় রে ঘুচে,
এ সংসারের খেলা ,
ডুবে যায় তাঁর প্রেম-সাগরে,
যে সাগরের নাই রে তলা ॥
খেলিছে নিত্য নূতন,
কি ভাবেতে খেলে কখন,
বোঝে সে জন হয় রে যে জন,
সে পাগলের চেলা ,
বুঝবে কি ভাই বোঝা কঠিন,
পাগলা পাগলির খেলা ।
কুলকুণ্ডলিনী মহারাণী,
মূলাধারে পাবের ভেলা ॥

বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী",
'সমাজ', পৃষ্ঠা—৩২

(৮২)

এ সব দেখে শুনে ধাঁধা লাগে
বুঝে ওঠা দায় ।
এর কোন্‌টা যে ঠিক,
কোন্‌টা বেঠিক
ঠিক করতে না পারি তায় ॥
কেউ সত্য পথে চলে,
ভাসে শুধু নয়ন-জলে,
কত পাপী ভূমণ্ডলে,
হেসে নেচে চলে যায় ॥
কেউ সারাদিন খেটে খেটে,
দিনান্তে ভাই পায় না খেতে,

কারো খাবার দিনে রাতে,

জোটে কত কেবা খায়॥

বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী",

'ব্রহ্মচারিণী', পৃষ্ঠা—১৯

(৮৩)

একি আরতি তব বিশ্বপতি
তোমারি বিশ্ব মন্দিরে।
ওঠে অযুত কণ্ঠে উদার গীতি,
তোমার পানে গম্ভীরে॥
বাজে শঙ্খ ঘোর শননে,
চন্দ্র তারকা কাঁপে গগনে,
জলদ মন্দ্রে প্রচারে পবনে,
ভুবনে ভুবনে অধীরে॥
নিষাদ বিখাত গান্ধার তান,
মূর্ত রাগিণী লভিল প্রাণ
দিক দিগন্ত কম্পমান,
শিহরে ধরণী বে—
জয় জয় জয় মহিমময,
চির-সুন্দর মঙ্গলালয,
মূরতি ধরিয়া উঠুক আরতি,
মন-প্রাণ শরীরে॥

বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী",

'ব্রহ্মচারিণী', পৃষ্ঠা—২৭

(৮৪)

কমল কাননে
রবি শশী কোণে,
মক্কা বৃন্দাবনে
যমুনা পুলিনে;
যেখানে যখন,
মজে তাঁর মন,

হয় সে মগন,
বাঁশরী বাজাই ॥
মাঝে মাঝে থাকি ;
আঁখি মুদে বসি,
দেখি কাল শশী,
চুপি চুপি আসি,
হৃদি কুঞ্জবনে,
মাবে উঁকি ঝুঁকি।
মুকুন্দ ধরি বলে গেলে,
যায় গো পালাই ॥

বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী",
'সমাজ', পৃষ্ঠা—৬

(৮৫)

কাঁপায়ে মেদিনী কর জয়ধ্বনি
জাগিয়া উঠুক মৃতপ্রাণ।
জীবন রণে জীবন দানে
সবারে করহ আগুয়ান ॥
হাতে হাতে ধরি ধরি দাঁড়াইব সারি সারি,
প্রাণে বাঁধিবে তবে প্রাণ।
আলস্য জড়তা নিরাশ বারতা
দূরে করিবে প্রয়াণ ॥
তরুণ তপনে মধুর কিরণে,
সদা কি হাসিবে প্রাণ।
সুখের কোলে ভাবেতে গলে
কে রবে কে রবে শয়ান ॥
সারিতে দেশের কাজ পর রে বীরের সাজ
করে লয়ে করম-নিশান।
জীবন ব্রত সাধ অবিরত
এ নহে বিরামের স্থান।

বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী",
'পল্লীসেবা,' পৃষ্ঠা—৯

(৮৬)

কে যেন ঐ চাঁদের কোণে
উঁকি মেরে কথা কয় ;
ধরতে গেলে দেয় না ধরা,
চাঁদের মাঝেই লুকিসে রয় ।
রূপটি দেখে অনুমানি,
যেন গড়া চাঁদের সুধাছানি,
ঐ রূপের ছটায়ই হযে গেছে,
বিশ্বখানা সুধাময ।
বাজায় এক পাগলা বাঁশী,
সেও ঢালে সুধারাশি,
একূল ওকূল দু'কূল ছাপি,
প্রেম-যমুনা উজান বয় ।
সব দিয়ে যা ছিল শেষে,
সে আমিটাও আজ গেল ভেসে,
রইল না আব আমার কিছু,
রূপ-সাগরে হইনু লয ॥

বসুমতী সাহিত্য মন্দিব কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসেব গ্রন্থাবলী",
'পল্লীসেবা,' পৃষ্ঠা—১৮

(৮৭)

কে ও রণরঙ্গিণী, প্রেম তবঙ্গিণী
নাচিছে উলঙ্গিনী, আসব আবেশে হায ॥
কুন্তল দল দল, চুম্বে চরণতল,
মধুব্রত চঞ্চল, ঝঙ্কাবে পায পায ॥
তুঙ্গপয়োধরা, রঙ্গে লাস্য পরা,
সঙ্গে কামধুরা, কোটী যোগিনী ধায়,
হুঙ্কারে ঘন ঘন, কম্পিত ত্রিভুবন,
শঙ্কিত দেবগণ, শঙ্কর লোটে পায় ॥
লাস্য সমুল্লাসে, চন্দ্র সূর্য খসে,

কক্ষ ভ্রষ্টাকাশে, গ্রহ তারা নিভে যায়,
গভীর অন্ধকারে, বিশ্বব্যাপ্ত করে,
সপ্ত সাগর নীরে মুগ্ধ ধরণী ডুবায় ॥

বধ বধ হন হন, প্রহরণ ঝঞ্চন,
প্রবল প্রভঞ্জন, বুঝি প্রলয় ঘটায়,
কোটী বিজলী হাসি, বিম্বিত ভীম অসি,
নিশুম্ভে রণে নাশি, শোণিত তৃষ্ণা মিটায় ॥

ভীষণাদপি ভীষণা, প্রেম-ফুল্লাননা,
হেরি নিরভয়মনা, ইন্দুপদে বিকায়,
কালী করুণা বশে, শমনে জয়ী অনায়াসে,
কাটিযা অষ্টপাশে, মহা শিবে সে মিলায় ॥

বসুমতী সাহিত্য মন্দিব কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী",
'ব্রহ্মচারিণী', পৃষ্ঠা—২০

(৮৮)

গেলে কল্পতরু-মূলে,
চারি ফল মিলে,
তাই ভেবে প্রেম উথলে রে।
বদন ভবিয়ে প্রেমেতে মাতিয়ে,
সুধা-মাখা নাম গাও না রে ॥
যে নামেতে শিলে,
ভেসেছে সলিলে,
যে নামের বলে,
পাষাণ যায় গলে,
সেই নাম-ব্রহ্ম,
গাও কুতূহলে,
তোর মায়ার বন্ধন যাবে কেটে বে ॥
যে নাম স্মরিলে,
আনন্দ উথলে,
প্রাণ যায় গলে,
যে নাম কলিকালে,
পারের ভেলা বলে,

সে নাম-রসে

মুকুন্দ ডোব রে।

বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী",

'সমাজ', পৃষ্ঠা—৭

(৮৯)

চল্ রে পল্লী ব্রজে চলে যাই

সহরে বৃন্দাবাণী,

ইট পাথরে সহর বোঝাই।

কুটীলতা কপটতা

নাই সেখানে সরসতা,

ভাইকে সেথা পর করে দেয়

গৃহলক্ষ্মী যায় রে পালাই।

কারো নাই এক ছটাক জমি

এমন জাগার পায়ে নমি,

খেতে পায় না দুটি বেগুন

দুটি বেগুন-চারা লাগাই।

ফুরিয়ে গেলে বাজার খরচ

বাবুরা, হাওলাত কিম্বা করেন কবজ,

আমরা সেদিন পল্লীবাসী,

শাক শব্জীতে দিনটা কাটাই।

বাবুরা সহরের মায়া ছেড়ে,

পল্লীতে না এলে ফিরে,

বাজবে না করমের বিষাণ,

ঘুচবে না এ দেশের বালাই।

বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী",

'পল্লীসেবা', পৃষ্ঠা—৩৯

(৯০)

জাগ রে জাগ রে ডাক রে ডাক রে,

মাত রে মায়ের নাম-গানে,

প্রেমানন্দময়ী প্রেমানন্দ দানে,

তুষিবেন আপন সন্তানে।
ঘুচিবে আঁধার পড়িবি আলোকে,
নাচিবে ভারত নাচিবে পুলকে,
আবার ফুটিবে পারিজাত মল্লিকে,
ভারত-নন্দন-কাননে।
পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি মায়ের কৃপায়,
অঘটন ঘটে যদি মা ঘটায়,
রতি মতি ভক্তি থাকিলে সে পায়,
ভয় কি তরঙ্গ-তুফানে॥

বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী",
'ব্রহ্মচারিণী', পৃষ্ঠা—৫

(৯১)

(ডাকো) দীনে দয়া কর দেখি গো,
দীন-দয়াময়ী শ্যামা-মা।
সবাই বলে দীন তারিণী,
দেখি সে নামের মহিমা॥
জাগ কুলকুণ্ডলিনী,
অজ্ঞানে জ্ঞানদায়িনী ;
মোহ আঁধার যাক্ মা কেটে,
জুড়াই আঁখি রূপ দেখে মা॥
হৃদি-পদ্ম উঠলে ফুটে,
মায়ার বাঁধন যাবে টুটে.
আনন্দে আনন্দময়ীর,
প্রেম-সাগরে ডুব দেবো মা॥
নাম-রসে যাই মা মজে,
নামের ভেরী উঠুক বেজে,
মুকুন্দের সাধ মিটে যাক্,
নেচে গেয়ে যাই চলে মা॥

বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী",
'ব্রহ্মচারিণী', পৃষ্ঠা—৩৫-৩৬

(৯২)

থাকুক আমার বিয়ে,
চাই না আমি এম. এ, বি. এ.
কিনতে হয় যা টাকা দিয়ে
ছাগল গরুর মতন
যাদের ছেলের হাটে গিয়ে
সোনার চেইন সোনার ঘড়ি
গর্ব যাদের গলায় পরি,
অমন পশু কিনো না গো
টাকা-কড়ি দিয়ে।
কুলীন চেয়ে ভাল কুলী
মুচি ডোম কসাইগুলি
সারা জীবন ফিরে কেবল
ছুরি শানায়ে
যখন যারে কায়দায় পায়
যে ঠেকেছে মেয়ের দায়
ধর্ম ভুলে চর্ম খুলে
কর্ম সারে গিয়ে।
বেচবে কেন ভিটে মাটি
মজবে কেন আমার তরে
ভিটেয় পুকুর দিয়ে।
যে করবে তোমার দুর্গতি
ভজব কি সে পশুপতি
পূজবো না হয় পশুপতি
উমার মত গিয়ে।

বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী",
'সমাজ', পৃষ্ঠা—৩০

(৯৩)

দুনিয়া আজব তেরা ঢং,
আব্‌ছে আব দেল্‌

বেকুব বন যায়,
দেখ্‌কে তেরা রং।
লেড়কা বালা—
লালন পালন কব,
কেতনি দুধ পিলাওযে,
ওহি যব্‌ নবক পবসে,
ছি-ছি কব ঘিনাওযে।
মাটী দেকব বদন বানায়া,
হো যাযে গা মাটী,
কেযছা বেকুব ঝুঁটালেতে—
ছোড্‌ দেতে হ্যাঁয খাঁটী।

বসুমতী সাহিত্য মন্দিব কর্তৃক প্রকাশিত 'মুকুন্দদাসেব গ্রন্থাবলী",
'সমাজ', পৃষ্ঠা—১৯-২০

(৯৪)

দীন তাবিণী পতিত পাবনী
অধম-তাবিণী তুই শ্যামা,
জাগো মা কুলকুণ্ডলিনী
ডাকে ভকতি-ভজন-বিহীন জনা।
তুই না জাগালে কেউ জাগিবে না
কাল ঘুম মোদেব কাবোই ভাঙ্গিবে না,
এ ঘোব বজনী আব পোহাবে না,
সবই হযেছে শব মা,
সে শবোপবি এসে দাঁড়া ত্রিনযনা,
ভ্রামবী ভবানী ভৈরবী ভীষণা,
আজ নাচ মা,
ত্রিশকোটী শবোপরি নাচ আজ
তাথৈ তাথৈ থৈ ধিন্ ধিন্ ধিনা।
বাতুল চবণ পবশ পাইযা
ত্রিশকোটী মরা উঠিবে বাঁচিয়া,
দেখলে মাযের শ্রী উঠিবে শিহরি
কাঁদিযা উঠিবে প্রাণ,

তখন কোটী কণ্ঠ মিলে একবার হুঙ্কারিলে
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে
তবে সিদ্ধি হবে মা
ভারতের চির-আকাঙ্ক্ষিত স্বরাজ-সাধনা।

বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী",
'পল্লীসেবা', পৃষ্ঠা ৩

(৯৫)

ধেৎতেরি বড় দেক্ সেক্ লাগে
ছেলের কপালে মারো
দু'শো ঝেঁটা।
কবে আসবেন কল্কী
বিলম্বে আর ফল কি,
এলে পরে সব,
ঘুচে যেতো লেঠা॥
রসটা কি দারুণ,
বীর কি বীভৎস,
হাস্য কি করুণ;
সব কাজে ছেলেরা—
জিজ্ঞাসে দরুন,
তর্কে পঞ্চানন,
ইয়ারকিতে জেঠা
পড়ে অল্প কিছু,
খায় বার্ডছাই,
মুখে বলে মাইরি,
যাদু মরে যাই;
মায়ের উপর চটা
বউকে বলে ভাই:
টেরী পাকানো মাথে,
চোখে চশমা আঁটা।

মা বেটী অভাগী,
গুদাম ভাড়া পাবে,
ওল্‌ড ইডিয়েট বাপটা ,
বসে বসে খাবে,
গিন্নি কেবল
মাসোহারা নেবেন,
কোমল করে তাব
সয কি বাট্‌না বাটা ?

বসুমতী সাহিত্য মন্দিব কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসেব গ্রন্থাবলী",
'সমাজ', পৃষ্ঠা—৬

(৯৬)

নে চষে নে চষে ভুঁই ।
এই লাঙ্গলে শাঁখা শাড়ী,
এই লাঙ্গলে গোলা বাড়ী,
সিকের উপর উঠবে হাড়ি
যদি লাঙ্গল য়ুই ।
জানি নাকো বাবুয়ানা,
চিনি নাকো সোনা দানা,
নাইকো মোদেব খাট বিছানা
মাটির উপর শুই ॥
চাই নাকো ভাই মোণ্ডা মিঠাই,
চিড়া মুড়ির অভাব কি ভাই,
ঘবে আছে লক্ষ্মী গাই,
যোগায় দুধ দই ॥
গোলা ভরে তুলবো ধান.
অতিথ সাধুব বাখবো মান,
দযাল ঠাকুর ভগবান,
ভক্তি বলে জয়ী ॥

বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী",
'ব্রহ্মচারিণী', পৃষ্ঠা — ২৭

পিরিতি করিবি, পিরিতে মজিবি,
পিরিতি পরাণ পাখী,
সু'জন দেখিয়া, করিবি পিরিতি,
প্রহরী রাখিবি আঁখি।
সু'জনে সু'জনে, হইলে পিরিতি,
থাকিবি পরম সুখে,
অরসিক সনে, করিলে পিরিতি,
জনম গোয়াবি দুঃখে।
পিরিতি সাধন, পিরিতি ভজন,
এ তিন ভুবন সার রে,
পিরিতের মত, না হলে পিরিতি ;
কিসে হবি ভব পার রে।
পিরিতে জীয়ন, বিচ্ছেদে মরণ,
পিরিতে করো না হেলা,
পিরিতি রতন, কর রে যতন,
পিরিতি পারের ভেলা।
পিরিতের জন, জান রে সে জন,
সৃজন করে যে জনে।
শ্রীগুরু আদেশে, মুকুন্দ কহিছে,
পিরিতি মায়ের সনে॥

বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী",
'সমাজ', পৃষ্ঠা—৩২

তুলনীয় :—

"বিহি একচিতে ভাবিতে ভাবিতে
নিরমাণ কৈল 'পি'।
রসের সাগর, মন্থন করিতে,
উপজিল তাহে 'রী'।
পুন যে মথিয়া, অমিয়া উঠিল,
ভিঞাইল তাহে 'তি'।
সকল সুখের আথর এ-তিন
তুলনা দিব যে কি ?" —চণ্ডীদাস।

পাঠিয়ে দে মা আনন্দময়ী,
দেখা মা তোর সে সন্তানে।
যে জন ভোগের মাঝে ত্যাগের ছবি
দেখাতে পারে জীবনে॥
ঘুমিয়েছিনু এমন ঘুম মা,
সাড়া পায়নি কেউ ডেকে,
এলো একটা প্রভাতী হাওয়া,
কোন্ অজানা দেশেব থেকে,
জেগেছি উঠে বসেছি
আঁখি খুলেছি মা ;
পেলে এখন পথের সন্ধান,
যে পথেতে মুক্তি মিলে,
যাত্রা কবি জয় মা বলে,
মা তোর কোটী-কোটী ছেলে ;
কিন্তু বক্তা হলেই হন এখন
দেশেব নেতা,
বলে বেড়ান ত্যাগেব কথা,
মাথা নাই তার মাথা ব্যথা,
তাদের অনেকেরই কথায,
কাজে মা এক দেখিনে॥
চাই মা এখন এমন গুরু,
জীবন যাহার কর্ম্মময,
আপন জন্মভূমির লাগি,
তিল তিল করে হচ্ছে ক্ষয ;
ত্যাগই যাহার মূল মন্ত্র,
জীবনে আর মরণে,
শুনলে মা তাঁর অভয় বাণী,
সবার প্রাণই যাবে গলে ;
আমাদের মরা হাড়েই খেলবে ভেল্কী,
সূর্য্যের মতন উঠবো জলে।

জ্বালিয়ে দিলে জ্ঞানের বাতি,
খুঁজবো করে পাতি পাতি,
এ জগতের হীরা মতি,
এনে দেবো মা তোর চরণে ॥

বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী",
'কর্মক্ষেত্র', পৃষ্ঠা—৩২-৩৩

(৯৯)

বিশ্বপ তব বিশ্ববীণায পঞ্চমে ধরেছে তান।
তা নইলে কি এমনি করে পাগল হতো সবাব প্রাণ ॥
ধনী মানী মেথর কুলি
বৃদ্ধ যুবা বালকগুলি,
তাই তো সবে আপন-হাবা,
হিন্দু পার্শী মুসলমান ॥
অজানা দেশেব টানে
কাবো মানা কেউ না মানে,
কালেব স্রোতে ভাসিযে তবী
আজ সবাই তবী বায উজান ॥
এই তো বে ভাই কালেব গতি,
আজ পতন কাল উন্নতি,
উঠলে পবেই নামতে হবে,
আমাব প্রেমমযেব এই বিধান ॥

বসুমতী সাহিত্য মন্দিব কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী",
'পল্লীসেবা', পৃষ্ঠা—১২, 'কর্মক্ষেত্র', পৃষ্ঠা—৪০

(১০০)

বাবু ওম্‌দা ওম্‌দা চিজ—
ছগাৎ নেহি, যেইছি তেইছি কো
হাম দেগি নেহি ॥
মাতা পিতাকো
যো খানে না দেই,

আউরাৎ ছোড়কো যো,
রেণ্ডী ভেজি ;
হাম উস্‌কো দেগি,
গঙ্গা কিড়ামে হাম্
সাচ্চি কহি হাম্ সাচ্চি কহি।
না মানে দেওতা ভি না মানে পীর,
পয়জারছে যিস্‌কো না—
নোয়ে শির ;
হাম উস্‌কো দেগি,
গঙ্গা কিড়ামে হাম সাচ্চি কহি—
হাম সাচ্চি কহি।

বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী,"
'সমাজ', পৃষ্ঠা—১৮

তুলনীয় : —

"কি রঙ্গ দেখালে হরি কলিতে!
জানে না ধর্ম্মাধর্ম্ম, মানে না গুরু ব্রহ্ম
সুগম্য অগম্য গম্য, গম্য পথে চলিতে॥
পিতা মাতার অন্ন দিতে, দিনে দৈন্য দশা যার,
বনিতার গহনা দিতে, রাতে সে হয় জমিদার ;
ভুলাতে রমণীর মন, করতে পারে সে দেশভ্রমণ ;
দিনান্তে পারে না শুধু, হরি নামটি জপিতে॥
শ্বশুর সম্বন্ধী এলে লুটে পড়ে তাদের পায়,
গুরু এলে না নোয়ায় মাথা, পাছে টেরি ভেঙ্গে যায়।
মরি কি হায় হায়, জীর্ণ বসন মায়ের গায়,
শখের শাড়ী শালীকে দেয়, মুখের কথা না খসিতে॥
কৃষ্ণ পূজা—বিষ্ণু পূজা, উঠে গেছে কলিকালে,
কালের ধর্ম্ম দেখে লোকে, মুখে হরি হরি বলে ;
এ দেশেতে রব না ভাই, ঘরে ঘরে স্ত্রী সাধনা
ডুবিল এ সংসারখানা গাজা-গুলি-মদেতে॥"*

---

* এই গানটি মুকুন্দদাসের সমসাময়িক বঙ্গীয় কীর্তনবিশারদ শ্রীমৎ রুক্মিণীরঞ্জ গোস্বামী, ভক্তি রত্ন ও ভক্তিভূষণ মহোদয়ের গানের খাতা হইতে গৃহীত হইল।

(১০১)

বল কেমন করে কি সন্ধানে যাই সেখানে
মনের মানুষ যেখানে।
আঁধার ঘরে জ্বলছে বাতি দিবা রাতি
নাই সেখানে ॥
যেতে পথে কাম নদীতে পারি দিতে ত্রিবেণী ;
কত সাধুর ভরা যাচ্ছে মারা
পড়ে নদীর ঘোর তুফানে ॥
রসিক যারা পার হয় তারা, ত্রিবেণীর সে ধারটি দিয়ে
ঐ যে উজান নদী যাচ্ছে বেয়ে
যারা মায়ের সাধন জানে ॥

বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী",
'পল্লীসেবা', পৃষ্ঠা—১৫

(১০২)

বিশ্ব-প্রসবিনী, ত্রিলোক-পালিনী,
প্রলয়কারিণী, ত্রিগুণময়ী শ্যামা।
অসুরনাশিনী, নৃমুণ্ডমালিনী,
শ্মশানচারিণী, ভীষণা ভীমা শ্যামা ॥
শত কোটি যোগিনী
নাচিছে সঙ্গে,
থিয়া থিয়া ধেই ধেই,
কত না রঙ্গে,
রুধির শতধারা বহিছে অঙ্গে,
মত্ত মধুপানে, মাতঙ্গিনী শ্যামা ॥
হা-হা-হা-হা-হি-হি-হি-হি
অট্ট অট্ট হাসে,
শিষ্টপালিনী আজ দুষ্ট বিনাশে,
কম্পিত অরিকুল শঙ্কিত ত্রাসে,
আনন্দে শবোপরি, নৃত্য করিতেছে শ্যামা ॥

অগণিত দেবগণ গাহিছে জয়-গীতি,
রবি শশী তারকা করিছে আরতি,
জাগিল না ভারত, গেল না ভীতি,
উঠালে না তাঁরে তুমি, দীনতারিণী শ্যামা ॥

বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী,"
'কর্মক্ষেত্র', পৃষ্ঠা—২৮ ২৯

(১০৩)

ভাই চল্ রে চল্ রে চল্
করমের নিশান উড়ায়ে চল্ ,
বাজা মা-নামের ভেরী,
ধরা হউক রে টল্‌মল।
চল্ চল্ চল্ ॥
বসে কি ভাবিস্ তোরা,
ডাকছে মা দিস্ নে সাড়া,
তোরা কি জ্যান্তে মরা হলি রে সকল ॥
চল্ চল্ চল্ ॥
দেবতা ঐ মাথার 'পরে,
অভয় দিচ্ছেন অভয় করে ,
যায় যদি প্রাণ দেশের তরে,
পাবি মোক্ষ ফল।
চল্ চল্ চল্ ॥
মায়ের নামের ডঙ্কা দিয়ে,
দাঁড়া রে তোরা বুক ফুলিয়ে,
দেখে মুকুন্দ জয় মা বলে,
বাজাক রে বগল।
চল্ চল্ চল্ ॥

বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী",
'কর্মক্ষেত্র', পৃষ্ঠা—৩৮

(১০৪)

ভারত-শ্মশান মাঝে

আমি রে বিধবা-বালা।

বিষের মূরতি করে,

বিধি আমায় পাঠাইলা ॥

পিতা-মাতা নির্দয় হয়ে,

পরের হাতে সঁপে দিয়ে,

ছিঁড়ে নিয়ে কমল-কলি,

কণ্টকে গাঁথিল মালা ॥

জানি না সে কেমন পতি,

মনে নাই রে সে মূরতি,

তথাপি যুবতী হয়ে,

পেটে অন্ন নাই দু'বেলা ॥

বিবাহ কি তাও জানি নে,

কেবল মাত্র পড়ে মনে,

অনিচ্ছাতে শৈশবেতে,

খেলেছি এক দুঃখের খেলা ॥

না বুঝিলাম ভালবাসা ;

নাহি সুখ, নাহি আশা,

কারে কবো এ দুর্দশা,

কে বুঝিবে মর্ম-জ্বালা ॥

বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী,"

'সমাজ', পৃষ্ঠা—২

(১০৫)

ভালবাসতে যদি হয়,

তাঁরে শুধু ভালবাস,

যে-জন প্রেমময়।

বাইরে শুধু চক্ষু বুজে,

মনের মানুষ মরো খুঁজে,

প্রাণের প্রাণ যে-জন সে যে,

প্রাণের মাঝেই রয়।
সবার চেয়ে মিষ্টি সে জন,
সবায় চেয়ে ভালো,
সবার চেয়ে মধুর বড়,
তাঁরি রূপের আলো ;
সকল রসের রসিক তিনি,
এমনি রসময়,
তাঁর সনে তোর কি না চলে,
কোন্‌টা বা না হয় ;
(তাঁরে) পেয়েছে যে দেয় না সাড়া
পেয়েছে তাঁরে আপন-হারা—
(যেমন) উপরে জল রয়েছে থির—
মাঝে তুফান বয়।

বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী",
'সমাজ', পৃষ্ঠা—৩১-৩২

(১০৬)

মন পাগলা রে—
আনন্দে গুরু-গুণ গাও।
আনন্দে গুরু-গুণ গাও—
আনন্দে গুরু-গুণ গাও
আনন্দে গুরু-গুণ গাও ॥
মাতৃরজে, পিতৃবীজে,
গুরু দিলেন তরী সেজে,
হেন তরী না বুঝিয়ে—
কু-জলে ডুবাও ॥
চৌদ্দ পোয়া নৌকার দারা,
লোহা ছাড়া তক্তা গড়া,
অনুরাগের বাদাম দিয়ে,
ধীরে ধীরে যাও ॥

নয়ন দু'টি রঙ্গে-ভরা,
চরণ দু'টি রসের-ঘোড়া,
হাত দু'খানি শ্রীগুরুর—
চরণ সেবায় দাও ॥
ধনরত্ন যত ছিল,
কামিনী তো হরে নিল,
এখন কেবল শুধু ডিঙ্গা,
ঘাটে ঘাটে বাও ॥

বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী,"

'সমাজ', পৃষ্ঠা—১৭

(১০৭)

মা একি মজার খেলা তাস,
পেতেছ এ ভবের খেলায়।
বেঁটে মা আপন হাতে,
রং সব রেখেছ হাতে,
বদ্ রং বাজারে দিলে,
দেখে পেলো হাস ॥
হবে বলে সাত তুরুক,
দু'খানা রং-এ বেঁধেছ মুখ,
ছ'রং-এ করেছ তুরুক ;
হয়, সাধে কি হতাশ।
কে বোঝে মা তোমার বাজী,
কারে কি ভাবে করো রাজী,
পাঁচ দশে পঞ্চাশের বাজী,
ফেরাই দিচ্ছে পাশ।
কেন করো এত ছলনা,
মুকুন্দে দিচ্ছ যাতনা,
যাবে মা যাবে জানা,
পেলে হাতের পাঁচ।

বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী,"

'কর্মক্ষেত্র', পৃষ্ঠা—১৫

(১০৮)

রূপের হাট দেখিবি ভাই,
রূপের বালাই লয়ে মরে যাই।
আকাশটি ঐ রূপে ভরা,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে রূপ-পসরা
পথে ঘাটে রূপের ছড়া,
রূপ বিনে আর কথা নাই।
পাতায পাতায রূপ ফলেছে,
বনময় ঐ রূপ জ্বলেছে,
রূপের মালা গলে ঠাকুর,
খোঁজে কোথায আছে রাই।
ডালে ডালে পাখীর মেলা,
খেলছে রূপের মোহন খেলা,
গাচ্ছে রূপের মধুর গীতি
নাচছে রূপের করে বডাই।
আয রে হেথা রূপ-পিয়াসী,
দেখবি ও রূপ রাশি রাশি,
কত নিবি, নিযে চল্ রে,
দেশে দেশে রূপ বিলাই।

বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী"
'সমাজ', পৃষ্ঠা—১৫

(১০৯)

সাধে কি আর হচ্ছ রাজী,
তোমায় রাজী করেছে।
সেদিনই জানি ধরবে চরকা
তোমার গিন্নী যেদিন ধরেছে
মায়ে যেমন রাঁধে তেমন,
বুনে রাঁধেন ছাই।

গিন্নী যেদিন রাঁধেন সেদিন,
অমৃতের মতন খাই।
এই যে দেশের কথা রাজেন,
সেই দেশেরই তো তুমি।
তোমার দোষ নয়,
দেশের হাওয়া
ঐ জায়গাযই গোল বেঁধেছে॥
তাই মুকুন্দের কান্নাকাটি,
আজ সকল গিন্নীর পায়ে ধরা,
তোমরা যদি ধরতে চরকা মা,
পঁচিশ জনও শতকরা,
তবে বাবুরা পেতেন পথটা
উঠে যেতো এই দেশটা
আমিও বলতেম বুক ফুলিয়ে,
বাঙলার সাধনায় সিদ্ধি হয়েছে॥

বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী",
'পল্লীসেবা', পৃষ্ঠা—১৯-২০

(১১০)

শ্যামা নামের ডঙ্কা বাজা রে।
বাজা রে বাজা রে বাজা,
এ দেহে ভাই তুই রাজা,
দু'জন কুজন প্রজা,
রেখে কারাগারে॥
শঙ্কা কি রে ডঙ্কা দিতে,
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ যাতে,
যে নামেতে বিশ্বনাথে,
বিষ পান করে;
নামের জোরে মৃত্যুঞ্জয়,
মৃত্যুকে করেছেন জয়,

অভয় পদে কি আর ভয়,

ভয় করো ভাই কারে ॥

বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী,"

'ব্রহ্মচারিণী', পৃষ্ঠা—৩৩-৩৪

(১১১)

এসেছ নেংটা যাইবে নেংটা,

মাঝখানে কেন গণ্ডগোল।

কেউ বলে বাবা, কেউ বলে দাদা,

কেউ বলে ভাই, আবোল তাবোল ॥

জননী জঠরে দশমাস ছিলি,

ভূমিষ্ঠ হইয়ে মা ডাক শিখিলি,

করি স্তন পান জীবন বাঁচালি,

এখন ভুলে গেলি সে মা মা বোল ॥

মণি-মুক্তা আদি ধন অগণিত,

বোকা তুমি ভাই তাই যতন করো এত,

মিছে ধন আশায় হয়ে বিচলিত,

টাকা টাকা টাকা করেছ রোল ॥

ভাই বন্ধু আদি পরিজন যত,

শেষের সাথী এরা কেউ নয় রে তো,

কালী কালী কালী বল অবিরত,

যদি অন্তে পেতে চাস্ মায়েরি কোল ॥

বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী,"

'ব্রহ্মচারিণী', পৃষ্ঠা—৩৪-৩৫

(১১২)

আমরা কেন ভোগে ভুলিব,

আমরা যে ভাই ত্যাগীর ছেলে,

এখন ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে,

অনুমানি তা গেছি ভুলে ॥

মনে নাই যে মোদের পূর্বপুরুষগণের স্মৃতি,
কেহ দণ্ডী ব্রহ্মচারী, কেহ সন্ন্যাসী, কেহ যতি,
যোগাসনে বসে কাটাতো কাল কুতূহলে ॥
মনে করলে হতো তারা,
এ ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি,
তা না হয়ে নিবিড় বনে,
নীরবে রইতো দিবারাতি ;
কত রাজরাজেশ্বর আসি,
তাঁদের চরণতলে বসি,
কৃপাবিন্দু লাভের তরে,
পা ধোয়াতো আঁখি জলে ॥
এখন দেখছি কাল স্রোতে,
বইছে তার বিপরীত ধারা,
ত্যাগীর ছেলে ভোগীর পাযে,
ঢালছে কত অশ্রুধারা ;
পাপ উদর, আর স্বার্থের লাগি,
আত্ম-গৌরব হারালে ?
এখনো সময় আছে,
বসে যা রে গভীর ধ্যানে,
ডেকে ডেকে কেঁদে কেঁদে,
বাধ্য কর সে ভগবানে ;
পুনঃ যদি তা পারিস হতে,
তবেই দেখবি এ ভারতে,
বইবে আবার উল্টো স্রোত,
ভাসবি সুখের হিল্লোলে ।
যাও না পুনঃ গুরু-গৃহে,
ধর না ব্রহ্মচারীর বেশ,
করো উচ্চ বেদধ্বনি,
সাম-গানে জাগাও না দেশ ;
হও না পুনঃ সর্বত্যাগী,
রও না জগৎ মঙ্গলে ।

পুনঃ যদি সাধনাতে
একটি ব্রাহ্মণ হতে পারো,
তবে কটাক্ষেতে কোটী কোটী,
ত্যাগী ছেলে সৃজিতে পারো ;
তবেই যাবে এ দুর্গতি,
নৈলে রে ভাই অধোগতি,
এতেই ডুবে যাবে রে ভাই,
মোহ-সিন্ধুর অতল জলে ॥

বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী",
'ব্রহ্মচারিণী', পৃষ্ঠা—২৩-২৪

(১১৩)

বল ভাই মেতে যাই বন্দেমাতরম্
বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম ।
ভারত সন্তান, নিয়ে মায়ের নাম,
হও আগুয়ান, নাচবে এ প্রাণ,
নাম মধুরম ;
বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্ ।
নাম গানে, এ মরা প্রাণে,
জ্বলছে আগুন, জ্বলিবে দ্বিগুণ,
নামই রুদ্রম্ ;
বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্ ।
আসবে প্রাণে বল, মায়ের নাম কর সম্বল,
দেল দরিয়ায় উঠবে তুফান,
মন্ত্র গভীরম্ ;
বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্ ।

বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী",
'পল্লীসেবা', পৃষ্ঠা—৩৯

(১১৪)

আমরা মানুষ হতে চাই,
মানুষ যদি হবি মানুষের

সঙ্গ নে রে ভাই।

মুসলমানের ছেলে হবো

খাঁটি মুসলমান;

ধরবো লাঙ্গল চষবো জমি

গোলায় তুলবো ধান;

লেখাপড়া শিখতেই হবে,

হজরতের দোহাই।

ওরে ভাই জোলা তাঁতি

ছাড় রে হিংসা দ্বেষ,

কাপড়ে ষাট কোটী টাকা

নিয়ে যায় বিদেশ;

চালা মাকু দেশের টাকা

দেশেই রাখা চাই।

মাছের বংশ কমে গেছে

পড়ছি বড় ফেরে,

বাংলার বাজার ভরে দিত

মোদের জগৎ বেড়ে;

আমার কেবল শিখতে হবে

মাছের চাষটা ভাই।

মুচীর ছেলে আমার কর্ম

জুতা তৈয়ারী,

কিসের চীনা কিসের দিল্লী

কিসের টেনারী;

হস্তশিল্পের উন্নতি বই

এদেশের মুক্তি নাই।

বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী",

'পল্লীসেবা' পৃষ্ঠা—৩৬-৩৭

(১:৫)

রঞ্জি পূরব দিক্ বিভাগে,

জাগে অরুণ তরুণ রাগে।

জাগে ধরণী নবানুরাগে, অরুণ বরণী
জাগ জাগ ব্রহ্মবিদ্যা জননী।
আয়াহি বরদে দেবী ওঁ,
ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনী॥
হাসি সুহাসি তামসি নাশি,
বিতরি বিশ্বে কিরণরাশি।
পূরব তোরণ হইতে বহিয়া,
দিব্য আলোক-তরণী,
প্রথম জগতে প্রথম ঋষির
আহ্বানভূতা জননী।

বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী",
'পল্লীসেবা', পৃষ্ঠা—২৭-২৮

ভণিতা-বিভ্রাট

(১)

সাবধান—সাবধান—
আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড,
রুদ্র দৃপ্ত মূর্তিমান।
ঐ শোন তাঁর গরজে কম্বু অম্বুধি যথা উচ্ছলে,
প্রলয় ঝঞ্ঝা ইরম্মদে মৃত্যু ভীষণ কল্লোলে।
হুঙ্কার শুনি গভীর মন্দ্র, কাঁপিছে তারকা সূর্য চন্দ্র,
বিদরে আকাশ স্তব্ধ বাতাস-
শিহরি উঠিছে জগৎ প্রাণ।
ভ্রুকুটি কুটিল রক্ত নেত্রে চিত্র ভানু উজ্জ্বলে,
উঠিছে কিরীটী গরিমা দীপ্ত ভেদিয়া সূর্য মণ্ডলে।
অগণিত করে ঝলসে কৃপাণ তপ্ত রক্ত করিতে পান,
বলদর্পির চরণাঘাতে—
ত্রিভুবন ভীত কম্পমান।
ত্রিভুবন জুড়ি বিরাট দেহ ভেবেছ কি আর পলাইবে কেহ,
এখনো চরণে শরণ লহ—
নতুবা নাহি বে পরিত্রাণ।

এই গানটির রচয়িতা—কবি হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সুরকার ও যাত্রা-গীতিকার—চারণ-কবি মুকুন্দদাস। কিন্তু গানটি মুকুন্দদাসের নামে চলিয়া আসিতেছে। মুকুন্দপুত্র—শ্রীকালীপদ দাস মহাশয় তাঁহার সংগৃহীত "চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী" গ্রন্থে এই গানটি মুকুন্দদাসের গান বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন (গীতসংখ্যা—৩৩, পৃষ্ঠা—২৫-২৬, ১ম সংস্করণ ১৩৬৩)। শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সংগৃহীত ও সংকলিত—"চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী" গ্রন্থেও এই গানটি মুকুন্দদাসের বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে (গীত-সংখ্যা—৩, পৃষ্ঠা—২)। আবার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীমদনগোপাল গুপ্ত কর্তৃক

প্রকাশিত—"মুকুন্দদাসের গীতাবলী" গ্রন্থেও দেখি এই গানটি মুকুন্দদাসের (গীতসংখ্যা—১, পৃষ্ঠা—২)। কিন্তু কার্যতঃ এই গানটি 'কবিরত্ন" হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের। ভণিতায় কাহারও নাম না থাকায় এবং বহু যাত্রা-আসরে মুকুন্দদাস কর্তৃক নাটকীয় ভঙ্গীতে কম্বুকণ্ঠে গীত হওয়ায় হেমকবি নেপথ্যে চলিয়া গিয়াছেন। হেমকবি "দাদাঠাকুর" নামে একখানি বই লিখিয়া মুকুন্দদাসকে দেন, যাহার ভিতরে "সাবধান!" সাবধান!" প্রভৃতি গান রহিয়াছে। মুকুন্দদাস বইটির কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া, নিজের লেখা কিছু গান তাহাতে যুক্ত করিযা "দাদাঠাকুর" নামের পরিবর্তে "আদর্শ" নাম দিয়া সমাজে প্রচার করিয়া বইখানিকে জনপ্রিয় করিয়া তোলেন।

(২)

ফুল বাগানে নানা রঙের ফুটল ফুল।
তারে ভাবতে গেলে প্রাণ আকুল।
সে ফুল অধোমুখে রয়,
কারো ভাগ্যগুণে ঊর্ধ্বমুখী হয়।
সে সন্ধানে যে রয়েছে,
তাঁরে লোকে কয় বাতুল।
যে জন যোগ্য মালী হয,
সদা সে বাগানে পড়ে রয়।
সে গন্ধে যাঁর মন মজেছে,
কে আছে তাঁর সমতুল।
কহে দাস মুকুন্দ ভাই
মায়ের সাধনা বিনা অন্য কিছু নাই।
সাধ্যবস্তু সাধনে পাই,
শ্রীগুরুর শ্রীচরণ মূল।

"মুকুন্দ"-ভণিতাযুক্ত এই গানটি মুকুন্দদাসের নয়, ইহা কবি কৃষ্ণকান্তের। মুকুন্দপুত্র শ্রীকালীপদ দাস মহাশয় তাঁহার সংগৃহীত "চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী" গ্রন্থে (গীতসংখ্যা—৫৭, পৃষ্ঠা—৪৫) কেবলমাত্র "কৃষ্ণকান্ত"-ভণিতার স্থলে "মুকুন্দ"-ভণিতাযুক্ত করিয়া মুকুন্দের রচিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যথা:—

কৃষ্ণকান্তের—"কৃষ্ণকান্ত বলে ভাই,
যা'র সাধন বিনে
অন্য কিছু নাই।"
কালীপদ দাসের—"কহে দাস মুকুন্দ ভাই,
মায়ের সাধন বিনা অন্য কিছু নাই।"

"বসুমতী সাহিত্য মন্দির" কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গীতাবলী"তে "সমাজ" নামক যে পালাগান প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এই গানটি "কৃষ্ণকান্তের" ভণিতায় (পৃষ্ঠা—১৩-১৪) প্রকাশিত হইয়াছে—

"ফুলবাগানে নানা-রঙ্গের
ফুটল ফুল ;
তারে ভাবতে গেলে হয়
প্রাণাকুল।"—ইত্যাদি

মুকুন্দদাসের নিকটতম আত্মীয় ও কীর্তন-সঙ্গী শ্রীমনোমোহন নাগ মহাশয়ও তাঁহার গানের খাতায় এই গানটি "কৃষ্ণকান্তে"র (গীতসংখ্যা—৭৫, পৃষ্ঠা—১৪৯) বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

"পল্লীসেবা" যাত্রাভিনয়ে পল্লী-সমিতির চালক "নিতাই"-এর মুখ দিয়া যেন মুকুন্দদাস বলিতেছেন—"এই বাংলার বাগানে ফুল অনেকই ফোটে, কিন্তু যত্নের অভাবে বনের ফুল বনেই ঝরে পড়ে যায়, রেখে যায় কেবল স্মৃতি। মালীর অভাব, তাই পুষ্পও চয়ন করা হয় না, মালাও গাঁথা হয় না, মায়ের পায়ে অর্ঘ্যও দেওয়া হয় না।"

(৩)

দেখলেম ভাই জাতি কুলবিচারে।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র হিন্দু মুসলমান,
কালেতে ছাড়ে না কারে।
যতক্ষণ রাস্তার উপরে ততক্ষণ জাত বিচারে,
খেয়াঘাটে গেলে পরে, এক নৌকায় সব চড়ে,
খেয়ার কড়ি ঘাট মাঝিতে সমান আদায় করে—
ঐ মাঝির সনে যান সুহৃদ পিরীত,
মাঝি সুহৃদে দুই একজন ছাড়ে।

রেলগাড়ী আর স্টীমার তাতে জাতি যায় না রে।
মুসলমান ভাইতে আমাদের হুঁকার জলটি মারে।
আর এক বিচার বাংলা দেশের লোক-আচারে,
নমঃ কামায় না শূদ্রের নাপিতে,
মুসলমান কামাইতে পারে॥
দেখলেম ভাই শ্রীক্ষেত্রেতে, সবে খায় একত্রেতে,
মুসলমান জাতি মাত্র যেতে নাহি পাবে।
দাস মুকুন্দ বলে হ'ল না রে বিচার –
কি হয় শেষে মোর কপালে॥
ভারতের ধর্মালয়ে হাকিমেরা বিচার করে,
দুই পক্ষের সাক্ষী শুনে সূক্ষ্ম বিচার করে,
সত্য মিথ্যা দেখেন তাঁরা আইন অনুসারে—
কিবা হিন্দু কি মুসলমান—
সকলই এক গারদে ভরে॥

গানটি মুকুন্দপুত্র শ্রীকালীপদ দাস মহাশয় তাঁহার সংগৃহীত "চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী" গ্রন্থে মুকুন্দের রচিত গীত (গীতসংখ্যা—২২, পৃষ্ঠা—১৭-১৮) বলিয়া স্থান দিয়াছেন। কিন্তু গীতটি কাঙ্গাল হরনাথের। ৺সুরেশ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার কারাবাসকালীন লিখিত ঘটনাবলীতে ইহা একজন অজ্ঞাত কবির রচনা বলিয়াছেন। কিন্তু মুকুন্দের কীর্তন-সঙ্গী শ্রীমনোমোহন নাগ মহাশয়ের "গানের খাতায়" ইহা কাঙ্গাল হরনাথের গান বলিয়া চিহ্নিত আছে। গীতসংখ্যা—৫৮, পৃষ্ঠা—১৫। মূল গীতটি পনর লাইনের (দ্বাদশ অধ্যায়—"যাত্রা আন্দোলনের ইতিহাস ও মুকুন্দদাস" দ্রষ্টব্য)। তাহাকে ঈষৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করিয়া কবিপুত্র বাইশ লাইনে স্থান দিয়াছেন। যথা, মূল গীতে আছে,—

"এ ভারতের কর্তা যিনি, নামটি তার মহারাণী
দুই পক্ষের সাক্ষী জানি সমান বিচার করে।
ন্যায় অন্যায় দেখেন তিনি আইন অনুসারে॥"

সংশোধিত রূপ :—

"ভারতের ধর্মালয়ে হাকিমেরা বিচার করে,
দুই পক্ষের সাক্ষী শুনে সূক্ষ্ম বিচার করে।
সত্য মিথ্যা দেখেন তাঁরা আইন অনুসারে—"

স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায় যে, মূল গীতটি সংশোধিত রূপের চেয়েও কত সুন্দর ও ইঙ্গিতবহ। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বে এই পুরাতন গানটির মধ্যে মুকুন্দ একটি প্রাণস্পর্শী দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া স্বীয় এবং কবিত্বপূর্ণ অপরের সঙ্গীত বাদ দিয়া এই সঙ্গীতটিকেই প্রাধান্য দিয়া অস্পৃশ্যতা বর্জনাংশে যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। মুকুন্দদাস বলিয়াছেন—"ঐ পদের মধ্যে লেখকের সাধন সম্পদ আছে, যাহা সুভদ্র ভাষার কবিত্বপূর্ণ গানে নাই।" ভবিষ্যৎদ্রষ্টা মুকুন্দ সেদিন প্রয়োজনে যে গীত সংযোজন করিয়াছিলেন, আজকের দিনে তাহা কত সত্য। —"এ ভারতের কর্তা যিনি, নামটি তাঁর সবাই জানি।"

(৪)

বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান—
তুমি কি এমনি শক্তিমান॥
আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে এমন অভিমান—
তোমাদের এমনি অভিমান॥
চিরদিন টানবে পিছে, চিরদিন রাখবে নিচে—
এত বল নাই রে তোমার, সবে না সেই টান॥
শাসনে যতই ঘেরো আছে বল দুর্বলেরও,
হও না যতই বড়ো আছেন ভগবান।
আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নে রে,
বোঝা তরী ভারী হলেই ডুববে তরীখান॥

গীতিকার ও সুরকার—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। "রবীন্দ্র রচনাবলী" (৪র্থ খণ্ড) "স্বদেশ" পর্যায়ের গীত, গীতসংখ্যা—৪৮, পৃষ্ঠা—২০৭, স্বরবিতান—৪৬।

এই উল্লেখযোগ্য গীতটি মুকুন্দপুত্র শ্রীকালীপদ দাস মহাশয় তাঁহার সংগৃহীত ও সংকলিত "চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী" গ্রন্থে মুকুন্দের গীত বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। গীতসংখ্যা—৫০, পৃষ্ঠা—৩৯-৪০। মূল গীতটি দশ লাইনের। কালীপদবাবু তাহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ষোল লাইনের গীতে পরিণত করিয়াছেন। যথা :—প্রথম দুই লাইনের পর আছে—

"আমাদের ভাঙ্গাগড়া তোমার হাতে,
এমনি অভিমান তোমার এমনি অভিমান॥"

তারপর—

"শাসনে যতই ঘের,
আছে বল দুর্বলের-ও
হও না কেন যতই বড় আছেন ভগবান,
আমাদের আছেন ভগবান ॥"

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

"চিরদিন টানবে পিছে, চিরদিন রাখবে নিচে।"

পরিবর্তিত রূপ—

'চিরদিন চলবো সাথে,
চিরদিন টানবে পিছে।"

এমনিভাবেই রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গীতের "ভাঙ্গাগড়া" চলিয়াছে আমাদেরই হাতে।

(৫)

শুনি মাভৈঃ মাভৈঃ ধ্বনি মাভৈঃ মাভৈঃ।
অভয় তো হয়ে গেছি, ভয় আর কই ॥
বিপদ পাহাড়ের মত,
আসুক না আসবে কত,
ঐ পদে হবে হত—
ব্রহ্ম কবচ ঐ ॥
ঐ পদ থাকিলে বুকে,
হাজার শত্রু আসুক রুখে,
ছাই পড়বে তাদের মুখে,
হব জগজ্জয়ী ॥
শোক বিপদ দুঃখ দৈন্য,
পাপ তাপের যত সৈন্য,
কাকে-ও না করি গণ্য,
বৈকুণ্ঠেতে রই ॥
ও পদে মন থাকে যবে,
এমন কেউ দেখি না ভবে,
যারে দেখলে ডর হবে
যত ছোট হই ॥

গীতিকার ও সুরকার—মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত। যাত্রা-গীতিকার ও সুরকার—চারণ-কবি মুকুন্দদাস। এই গানটি অশ্বিনীকুমারের প্রিয় গান। "অধ্যয়ন" কর্তৃক প্রকাশিত "অশ্বিনীকুমার রচনাসম্ভার" গ্রন্থে এই গীতটি সংগৃহীত হইয়াছে। গীতসংখ্যা—১২, পৃষ্ঠা—(পরিশিষ্ট—গান) ১০।

কিন্তু মুকুন্দপুত্র এই গানটিকে সংক্ষিপ্ত আকারে মুকুন্দের গান বলিয়া "চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী" গ্রন্থে স্থান দিয়াছেন। গীতসংখ্যা—৩, পৃষ্ঠা—২। যথা :—

"শুনি মাভৈঃ মাভৈঃ ধ্বনি মাভৈঃ মাভৈঃ—
আমি অভয় তো হয়ে গেছি ভয় আর কই।
বিপদ পাহাড়ের মত আসুক না আসবে কত,
ঐ পদে হতে হবে ব্রহ্মকবচ ঐ॥
ঐ পদে মন থাকে যবে, এমন কেউ দেখি না ভবে,
যারে দেখলে ভয় হবে যতই ছোট হই॥
শোক বিষাদ দুঃখ দৈন্য, পাপ তাপের যত সৈন্য,
আমি কাকে-ও না করি গণ্য বৈকুণ্ঠেতে রই॥"

লুকান মাণিক তুলবি যদি
ডুব দে প্রেম-সাগরের জলে।
খুঁজলে পরে যেথা-সেথা
সে ধন কি ভাই অমনি মিলে?
প্রেমেরই সাগরে কারা,
হয়ে যেন মাতোয়ারা,
অহর্নিশ ডুব-ডুব-ডুব, ডুব দিতেছে দলে দলে॥
তারা বুঝি খোঁজ পেয়েছে,
তাই তো কেবল ডুবতে আছে,
তাদের সাথে ডুব দে যদি
তুলবি মাণিক, পরবি গলে॥

গীতিকার ও সুরকার—মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত। যাত্রা-গীতিকার—চারণ-কবি মুকুন্দদাস।

মুকুন্দদাস রচিত "সমাজ" নামক যাত্রাগানে এই গানটি ভাবুক-কবি, গায়ক ও শিল্পী "সত্য"-এর নামভূমিকায় স্বয়ং মুকুন্দদাস বহু আসরে আবেগময় ভঙ্গীতে উদাত্তকণ্ঠে গাহিয়াছেন। "বসুমতী সাহিত্য মন্দির" কর্তৃক প্রকাশিত

"মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী"তে (১৪ পৃষ্ঠায়) "সমাজ" যাত্রাগানে এই গানটি উৎকলিত হইয়াছে। ভণিতায় কোন নাম না থাকায় এবং মুকুন্দদাস কর্তৃক নিজের রচিত যাত্রাগানে নিজে গান করায় ইহা মুকুন্দদাসের রচিত বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু মূলতঃ গানটির রচয়িতা—মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত। তিনি যে সকল ধর্মসঙ্গীত লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য। "অধ্যয়ন" কর্তৃক প্রকাশিত "অশ্বিনীকুমার রচনাসম্ভার" গ্রন্থে পরিশিষ্ট "গান"-এর পর্যায়ে ইহা সংগৃহীত হইয়াছে। গীতসংখ্যা—১৭, পৃষ্ঠা—১৩। গানটি বাউল সুরে গীত হইয়াছে।

(৭)

ঝড়ের মুখে, পাখীর বাসা যেমন টলমল
যেমন নলিনদলে জল,
ক্ষণিকের রঙ্গীন জীবন,
তেমনি চপল, তেমনি চপল।
আজ আছে কাল রবে কিনা,
কে বলিবে বল॥
তাঁরি লাগি ও ভোলা মন,
কেন রে এত আয়োজন—
কড়া বুলি কড়া আঁখি,
তোদের মন ভরা গরল!
ভোরের বেলায় আলোর খেলায়
শিশির উজ্জল ;
সেই আলো তার বুকের মাঝে,
শুকিয়ে তোলে জল॥
সুখের দিনের এই যে নেশা,
এই আলো আর জলে মেশা ;
দিন না যেতে ফুরিয়ে যে যায়, দিনের সম্বল।
সুখ যে হবে দুঃখের সাথী,
নিভবে প্রদীপ রাতারাতি।
তারার পানে লক্ষ্য রেখে,
আপন পথে চল॥

এই গানটি রচনা করেন—মহিলা-কবি প্রিয়ংবদা দেবী। সুরকার ও যাত্রা-গীতিকার—চারণ-কবি মুকুন্দদাস।

শ্রীযুক্ত কালীপদ দাস মহাশয় তাঁহার সংগৃহীত "চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী" গ্রন্থে এই গানটি মুকুন্দের গান বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। গীতসংখ্যা—৬৩, পৃষ্ঠা—৫০-৫১। কিন্তু গীতিকার ও সুরকাররা এবং সঙ্গীত বিশেষজ্ঞরা জানেন এই গানটি—প্রিয়ংবদা দেবীর। শ্রীযুক্ত মনোমোহন নাগ মহাশয়ের "গানের খাতাতে"-ও এই গানটি প্রিয়ংবদা দেবীর নামে লিখিত আছে। গীতসংখ্যা—১২৩, পৃষ্ঠা—২৪৩।

(৮)

জাগ ভারতবাসী রে, আর কত ঘুমাবি রে,
বল সবে হয়ে এক মন, 'বন্দেমাতরম্।'
(ভাই রে ভাই) জননী আর জন্মভূমি,
স্বর্গ হতে শ্রেষ্ঠ জানি রে।
দু'য়ে ভক্তি নাহি যার, নরকে নিবাস তার,
পুরাণে লিখেছেন মুনিগণ॥
(ভাই রে ভাই) হিন্দু আর মুসলমান,
এক মায়েরই দু'টি সন্তান রে।
একত্র হইয়ে সবে মায়ের পূজা কর ভবে,
ধন্য হবে মানবজীবন॥
(ভাই রে ভাই) কামার কুমার জোলা তাঁতী,
হায় হায় করে দিবা রাতি রে।
ইংরেজী শিক্ষার গুণে, সকলে বিদেশী কিনে,
কি খেয়ে রাখিব জীবন॥
(ভাই রে ভাই) ভারতের সুসন্তান,
কর সবে অবধান রে।
বিলাতী লবণ চিনি, অপবিত্র শাস্ত্রে শুনি,
ছুঁইও না ভাই চিনি আর লবণ॥
(ভাই রে ভাই) একটি সুসন্তান হলে
মা সুখী হন ভূমণ্ডলে রে।
চল্লিশ কোটী সন্তান যাঁর, আজ কি দুর্দশা তাঁর।
দেখ সবে মেলিয়া নয়ন॥

(ভাই রে ভাই) ঘোড়ারে মারিলে চুঁশ্—
সেও ফিরে করে রোষ রে।
আমরা এমন জাতি, খাইয়ে ফিরিঙ্গীর লাথি,
ধূলা ঝেড়ে চলে যাই ভবন॥

গীতিকার ও সুরকার—কবি মমীন্দদীন। যাত্রা-গীতিকাব ও সুরকার—মুকুন্দদাস।

কিন্তু এই গানটি মুকুন্দপুত্র মুকুন্দের গীত বলিযা তাঁহার সংগৃহীত "চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী" গ্রন্থে স্থান দিযাছেন। গীতসংখ্যা—৩৫, পৃষ্ঠা—২৭-২৮।

মূল গীতটিতে সাত বার "বন্দেমাতরম্" বলা হইযাছে। যথা :—

(১) বল সবে হয়ে একমন, "বন্দেমাতরম্"।
(২) ধন্য হবে মানব-জীবন, "বন্দেমাতবম্"।
(৩) পুরাণে লিখেছেন মুনিগণ, "বন্দেমাতরম্"।
(৪) ছুঁয়ো না ভাই চিনি আর লবণ, "বন্দেমাতরম্"।
(৫) দেখ সবে মেলিযা নয়ন, "বন্দেমাতরম্"।
(৬) কি খাইয়ে বাঁচবো জীবন, "বন্দেমাতরম্"।
(৭) ধূলা ঝেড়ে চলে যাই ভবন, "বন্দেমাতরম্"।

কিন্তু সংগৃহীত গীতটিতে একবার মাত্র "বন্দেমাতরম্" বলা হইযাছে।

কীর্তনাশ্রিত পাঁচালী ঢঙে ও ভাটিযালী সুরে লিখিত মূল গীতটি। কিন্তু মুকুন্দের অধিকাংশ গীতই দেশাত্মবোধক এবং বাউল সুবে গীত ও রচিত। স্পষ্টতই বোঝা যায যে, মুকুন্দদাসের রচিত গীতগুলিতে যে ভাব, ভাষা ও সুরের সন্ধান পাওযা যায় তাহা হইতে এই গীতটি স্বতন্ত্র। এতবাব "বন্দেমাতরম্"—ধ্বনির প্রাধান্য মুকুন্দের রচিত কোন গীতে দেখা যায না। তাহা ছাড়া "ভাই রে ভাই" শব্দের আধিক্যও লক্ষণীয।

মূল গীতটি শ্রীমনোমোহন নাগ মহাশযের "গানের খাতায" যথার্থভাবে লিপিবদ্ধ হইযাছে। গীতসংখ্যা—১৩, পৃষ্ঠা—২৫-২৬।

কেবলমাত্র আগের লাইন পরে এবং পরের লাইন আগে কবিলেই অন্যের রচিত গীত নিজের হয় না। মুকুন্দদাস নিজে ভাল গীত রচনা করিতে পারিতেন। সুতরাং অন্যের গীত ভাঙিয়া-চুরিয়া নিজের নামে করিবার মত হীন মনোবৃত্তি তাঁহার ছিল না। মুকুন্দদাস ছিলেন স্বভাব-কবি। আসরে দাঁড়াইয়াই গীত রচনা করিয়া সুর দিতে পারিতেন। তাই তো তিনি একাধারে ছিলেন—গীতিকার ও সুরকার।

জাতের নামে বজ্জাতি সব, জাত জালিয়া খেল্‌ছ জুয়া।
ছুঁলে পরেই জাত যাবে, জাত ছেলের হাতের নয় তো মোয়া॥
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি,
ভাবলি এতে জাতির জান্,
তাই তো বেকুব করলি তোবা
এক জাতিরে একশো থান,
এখন দেখিস্ ভারত জোড়া
পড়ে আছি বাসি মড়া
জাত নাই আজ, আছে শুধু জাত শেয়ালের হুক্কাহুয়া॥

গীতিকার ও সুরকার—কাজী নজরুল ইস্‌লাম। যাত্রা-গীতিকার ও সুরকার—চারণ-কবি মুকুন্দদাস।

মুকুন্দদাস রচিত "পল্লীসেবা" নামক যাত্রাগানে এই গানটি পল্লী-সমিতির চালক নিত্যানন্দের ভূমিকায় স্বয়ং মুকুন্দদাস বহু আসরে আবেগময় ভঙ্গীতে উদাত্তকণ্ঠে গাহিয়াছেন। ছুঁতমার্গগামী সমাজে জাতের নামে যে ভণ্ডামি, মূঢ়তা, বঞ্চনা চলিতেছে, তাহারই বিরুদ্ধে ধিক্কারে আবেগে কবির জেহাদ। "বসুমতী সাহিত্য মন্দির" কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলীতে" (৪৩ পৃষ্ঠায়) "পল্লীসেবা" যাত্রাগানে এই গানটি উৎকলিত হইয়াছে। ভণিতায় কোন নাম না থাকায় এবং মুকুন্দদাস কর্তৃক নিজের রচিত যাত্রাগানে নিজে গান করায় গীতটি মুকুন্দদাসের রচিত বলিয়া অনেকে মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র " ধ্র ও শ্রীমদনগোপাল গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসেরগীতাবলী" গ্রন্থে (গীতসংখ্যা—২৫, পৃষ্ঠা—১৪) ইহা মুকুন্দদাসের গীত বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে। মূলত এই গানটির রচয়িতা বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইস্‌লাম। তাঁহার রচিত "বিষের বাঁশী" কাব্যগ্রন্থে (নবজাতক প্রকাশন, তৃতীয় সং, পৃষ্ঠা—৫৩-৫৪) "জাতের বজ্জাতি" শিরোনামায় ইহা স্থান পাইয়াছে। "পল্লীসেবা"-য় বা "মুকুন্দদাসের গীতাবলীতে" যে গীতটি সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা ' 'ক্ষিপ্ত ও প্রক্ষিপ্ত। তাই উৎসাহী পাঠকদের মূলভাবটি অনুধাবনের জন্য সম্পূর্ণ গীতটি নিম্নে দেওয়া হইল :—

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেল্‌ছ জুয়া।
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয় ত মোয়া॥

হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাবলি এতেই জাতির জান,
তাইত বেকুব, করলি তোরা এক জাতিকে একশখান
এখন দেখিস্ ভারত-জোড়া
পচে আছিস্ বাসি মড়া,
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত শেয়ালের হুক্কাহুয়া ॥

জানিস নাকি ধর্ম সে যে বর্মসহ সহনশীল,
তাকে কি ভাই ভাঙতে পারে ছোঁওয়া ছুঁয়ির ছোট্ট ঢিল ॥
যে জাত ধর্ম ঠুন্‌কো এত,
আজ নয় কাল ভাঙবে সে ত,
যাক্ না সে জাত জাহান্নামে, রইবে মানুষ, নাই পরোয়া ॥

দিন-কানা সব দেখতে পাস্‌নে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে
কেমন ক'রে পিষছে তোদের পিশাচ জাতের জাঁতাকলে।
(তোরা) জাতের চাপে মারলি জাতি,
সূর্য ত্যজি নিলি বাতি,
(তোদের) জাত-ভগীরথ এনেছে জল জাত-বিজাতের
জুতো ধোওয়া ॥
মনু ঋষি অণু সমান বিপুল বিশ্বে যে বিধির,
বুঝলি না সেই বিধির বিধি, মনুর পায়েই নোয়াস্ শির।
ওরে মূর্খ ওরে জড়,
শাস্ত্র চেয়ে সত্য বড়,
(তোরা) চিনলি নে তো চিনির বলদ, সার হ'ল তাই
শাস্ত্র বওয়া ॥
সকল জাতিই স্পষ্টি যে তাঁর, বিশ্বমায়ের বিশ্বঘর,
মায়ের ছেলে সবাই সমান, তাঁর কাছে নয় আত্মপর!
(তোরা) স্পষ্টিকে তার ঘৃণা ক'রে
স্রষ্টায় পূজিস্ জীবন ভ'রে,
ভস্মে ঘৃত ঢালা সে যে বাছুর মেরে গাভী দোওয়া ॥

বলতে পারিস্ বিশ্বপিতা ভগবানের কোন্ সে জাত ?
কোন্ ছেলের তাঁর লাগলে ছোঁওয়া অশুচি হন জগন্নাথ ?
নারায়ণের জাত যদি নাই,
তোদের কেন জাতের বালাই ?
(তোরা) ছেলের মুখে থুথু দিয়ে মা'র মুখে দিস্
ধূপের ধোঁয়া ॥
ভগবানের ফৌজদারী কোর্ট নাই সেখানে জাত বিচার,
(তোর) পৈতে টিকি-টুপি টোপর সব সেথা ভাই একাকার
জাত সে শিকেয় তোলা রবে,
কর্ম নিয়ে বিচার হবে,
(তা পর) বামুন চাঁড়াল এক গোয়ালে, নরক
কিম্বা স্বর্গে থোওয়া ॥
(এই) আচার-বিচার বড় ক'রে প্রাণ দেবতায়
ক্ষুদ্র ভাবা
(বাবা) এই পাপেই আজ উঠতে বসতে সিঙ্গী
মামার খাচ্ছ থাবা।
(তাই) নাইক অন্ন, নাইক বস্ত্র,
নাই সম্মান, নাইক অস্ত্র,
(এই) জাত জুয়ারীর ভাগ্যে আছে আরো অশেষ
দুঃখ সওয়া ॥

মুকুন্দদাসের গান ও গানের বৈশিষ্ট্য

"মুকুন্দদাসের গান"—বলিলেই আমরা বুঝি 'স্বদেশী গান'—স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় যাহার জন্ম-খ্যাতি-ব্যাপ্তি-সিদ্ধি। এই স্বদেশী গান গাহিয়াই মুকুন্দদাস, "চারণকবি" নামে পরিচিতি লাভ করেন। মুকুন্দদাসের গান ঘুম ভাঙানির গান, মরা গাঙে বান ডাকবার গান, শৃঙ্খল মোচনের গান, ফাঁসীর মঞ্চে মরণজয়ীর গান। তাই মুকুন্দদাসের গান একান্তভাবেই মুকুন্দদাসের নিজস্ব সৃষ্টি—ভাবে-ভাষায়-সুরে-ছন্দে-রচনায়-পরিবেশনায় অনবদ্য! উদার ও উদাত্ত কণ্ঠে এমন মন-মাতানো ও শিহরণ জাগানো গান একমাত্র মুকুন্দদাসই পারেন, আর কেহই নন। মুকুন্দদাস একটি যুগ, একটি ইতিহাস, একটি বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এবং ভবিষ্যৎ বাংলার নির্ভীক চেতনার এক নির্ভরযোগ্য প্রতিশ্রুতি!—

"আমি দশ হাজার প্রাণ যদি পেতাম
তবে ফিরিঙ্গি বণিকের গৌরব রবি
অতল জলে ডুবিয়ে দিতাম।"

সেদিন প্রকাশ্যে এই গান গাহিয়া বেড়ানো চরম দুঃসাহসের কাজই ছিল। মুকুন্দদাস ছিলেন এই 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথে' একক যাত্রী, অগ্নিযুগের অন্যতম ঋত্বিক!

মুকুন্দদাসের মূলমন্ত্র বা চাবিকাঠি ছিল গানের মাধ্যমে দেশবাসীকে স্বদেশ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা। মন-মাতানো ও উম্মাদনার গান, যার বেশী ভাগই রচনা করিয়াছেন চারণকবির বন্ধু—হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বাকী গানগুলির মধ্যে রহিয়াছে বৈষ্ণব পদাবলী, লোকসংগীত, রবীন্দ্ররচনা এবং কবির নিজস্ব রচিত শতাধিক গান, যার সুর তিনি নিজেই দিয়াছেন। "মাতৃপূজা" তাঁহার প্রথম প্রকাশ্য যাত্রাভিনয়। তাঁহার সংগীতের এই নবীন ভাবধারায় দেশে অসীম আলোড়ন সৃষ্টি করে। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের শোষণের ইঙ্গিত চারণকবির উদাত্তকণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

"বাবু বুঝবে কি আর ম'লে –
ছিল ধান গোলাভরা, শ্বেত ইঁদুরে করল সারা।
চোখের ঐ চশমা জোড়া, দেখনা বাবু খুলে।"

-শুধু এই একটি গানের জন্য মুকুন্দদাসের তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

মুকুন্দদাসের যাত্রাভিনয় বা সংগীতের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। একদিকে যেমন ছিল ইংরেজ বিদ্বেষ, অপরদিকে তেমনি ছিল চাষা-জোলা-তাঁতীদের কথা, হিন্দু-মুসলিমদের মিলন গান ; তথাকথিত বাবুদের প্রতি বিদ্বেষ। সরল সহজ ভাষায় গান আর বক্তৃতা - আজকালকার অভিনয়শৈলীতে ভাবা যায় না। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বাঙালীর জাতীয় জীবনে তখন মরা গাঙে বান ডাকে। দেশভক্তদের নিকট সত্য হইয়া উঠে স্বদেশী ভাব গ্রহণ এবং বিদেশী ভাব বর্জন। ফলে একদিকে বাঙালীর বিলাতী বর্জনের উগ্র প্রয়াস, অপরদিকে বৃটিশ আমলাতন্ত্রের লাঠির ঘায়ে বিলাতী প্রচলনের দম্ভ ও নির্যাতন। বিদেশী শাসকের এই নির্মম নির্যাতনে একটু-ও দমিত না হইয়া মুকুন্দদাস তদানীন্তন বাংলার ছোট লাট স্যার বামফিল্ড ফুলার সাহেবকে উদ্দেশ করিয়া বজ্রকণ্ঠে গান ধরেন—

"ফুলার—আর কি দেখাও ভয় ?
দেহ তোমার অধীন বটে, মন তোমার নয়।"

ইংরেজের বিরুদ্ধে দেশকে মাতাইবার জন্য তাঁহার মন্ত্র ধ্বনি দেন মরণ-ঝাঁপ—

"ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে
মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে।"

মুকুন্দদাস স্বাধীনতার সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান, তাঁতী-জোলা সকলকে এক সুরে ডাকিয়াছেন—

"চালারে তাঁত সাজরে তাঁতী
দেখে নিও বিদেশী তাঁতী
বুঝিয়ে তাদের দিতে হবে
আমরা সবাই দুনিয়ার—
রাখিস রে রাখিস মনে
হিন্দু-মুসলমান ভাই দু'জনে।
এক হয়ে আজ নামতে হবে,
লাগতে হবে মার সেবা'য়।"

আবার চাষী বন্দনায় তিনি গাহিয়া উঠিয়াছেন—

' স্বরাজ যেদিন মিলবে সেদিন

চাষীর লাগি কাঁদিবে প্রাণ

তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়ে

সম্ভ্রমে তোরা তুলিবি তান।"

আবার—

"ধন্যদেশের চাষা

তার চরণধূলি পড়লে মাথায় প্রাণ হযে যায় খাসা।"

জাতিভেদ—ছুঁৎমার্গের বিরুদ্ধেও কবির অমর নির্ঘোষ, বহু শ্রুত-সংগীত—

" জাতের নামে বজ্জাতি সব

জাত জালিয়া খেলছে জুয়া

ছুঁলে পরেই জাত যাবে—

জাত ছেলের হাতে নয়ত মোযা।"

তথাকথিত আধুনিক-আধুনিকাদেব প্রতি-ও মুকুন্দদাস সোচ্চার এবং নির্ভীক ধ্বনিতে ভীত ছিলেন না—

"ঘোর কলিকাল যা দেখি সব উল্টো তোর।

নৈলে, মা করবেন দাসীপনা,

গিন্নী উঠবেন মাথার পর॥"

আবাব—

"বাবুদের পাযে নমস্কার

দেখলাম ভাই ঘোর কলিতে, এ জগতে—

ভাল-মন্দের নাই বিচার।

বাবুর বিদ্যার নামে নবডঙ্কা,

বলে গুড্ নাইট—

গুড্ মর্নিং স্যার।

বাবুব বৌ হয়েছে রং-এর বিবি,

স্বামী মানে না

আজ ভাসুর-শ্বশুর কেয়ার করে না

বাপ্‌কে বলে মাইডিয়ার।"

অপরদিকে মাতৃবন্দনায়, মাতৃ-আরাধনায়, মাতৃ আহ্বানে, শ্রদ্ধায় ভক্তিতে কবি মাতৃজাতির প্রতি কত আশাপরায়ণ, কত আবেগ কম্পিত, কি বিপুল প্রত্যাশী—

"শক্তি স্বরূপিণী যারা—
এ দুর্দিনে কেন তারা
ভোগে বিলাসে মজে—
মৃতপ্রায় পড়ে রবে।
বীর সাজে সাজিয়ে
দে সন্তানগণে
অবহেলে যেন তারা
জয়ী হয় রণে
অর্ঘ্য দিতে মাতৃচরণে সমবেত
হোক সবে বম্ বম্ হর রবে।"

বিদ্রোহী কবির গানে জায়া-জননীর প্রতি আহ্বান—

"পরোনা রেশমী চুড়ি বঙ্গনারী"

কবির সেই আকুল আহ্বান আজো কানে বাজে, আজও বাজে দেশ মাতৃকার সাধনবাণী—

"হাসিতে খেলিতে আসিনি এ জগতে,
করিতে হবে মোদের মায়েরই সাধনা।"

কর্মযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ার সে কম্বুনাদ—

"করমেরই যুগ এসেছে—
সবাই কাজে লেগে গেছে,
মোরা শুধু রব কি শয়ান?"

আর ত ঘুমাইবার সময় নাই, কারণ—

"বান এসেছে মরা গাঙে খুলতে হবে নাও।"

সুতরাং—

"জাগতে হবে উঠতে হবে
লাগতে হবে কাজে—
জগৎমাঝে কেউ বসে নাই
মোদের কি ঘুম সাজে?"

—ধিক্কারে আবেগে, আদরে, মাতৃমন্দনার উন্মাদনায় জনমানসে এক স্বভাব-কবি দেশকে জাগ্রত করার আসর বাঁধিয়াছিলেন—গ্রামে-গ্রামান্তরে, শহরের উপকণ্ঠে। উন্মত্ত হইয়া ছুটিয়াছেন দেশকে জাগাইতে। হিন্দু-মুসলমান, তাঁতী জোলা, নিরক্ষর সমাজে অভিনব নিজস্ব এক শৈলীতে—যেখানে তিনি বিদ্রোহ

ভঙ্গিমায় একক, বাংলার সেই চারণকবি আজ তথাকথিত শিক্ষিতসমাজের নব-ইতিহাসের মূল্যায়নে বিস্মৃতপ্রায়।

নাটকের ষড়ঙ্গের মধ্যে সংগীত (Melody) একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। গ্রীক নাটকে 'কোরাস' বাংলায় 'বিবেকে'র রূপ লাভ করিয়াছে, সংগীত শ্রোতাকে ঘটনার জটিলতা হইতে সাময়িক আনন্দদানের জন্য (Dramatic Relif) কিংবা নাটকের ভাব-বিশ্লেষক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। হুজগনার যথার্থ ই বলিয়াছেন—"In the weeding of the arts poetry is the man, music the woman—poetry must lead, music must follow.' মুকুন্দদাসের যাত্রায় অবিস্মরণীয় গানগুলি কেবল ঘরে ঘরেই প্রচারিত হয় নাই, সমাজ বিপ্লবের অগ্নিকণাও সেই সঙ্গে ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। চারণকবি মুকুন্দদাস এই সমাজ বিপ্লবের অগ্রদূত ছিলেন। যে-কোন দেশবরেণ্য রাজনৈতিক নেতার চেয়ে এই দিক দিয়া তাহার দান কম মূল্যবান ছিল না।

যাত্রা ইতিহাসের সূত্রপাত হইতেই গান ব্যবহৃত হইয়াছে, শুধু ব্যবহৃত হয় নাই ; মুখ্য ভূমিকাই গ্রহণ করিয়াছে। মুকুন্দদাসের যাত্রা-গানের ভূমিকা ছিল সর্বাধিক এবং তাহা নিম্নরূপ :—

প্রথমত : অভিনয়-ক্রিয়া সচল, সজীব, সুন্দর এবং তাহা সার্থক করিবার জন্য যাত্রায় গানের ব্যবহার করা হইয়াছে। গানগুলি সংলাপের সঙ্গে মূল বিষয়-বস্তুর সঙ্গে এমন ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, এইগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বা বাহুল্য বলিয়া মনে হয় না, অপরিহার্য বলিয়া মনে হয়। মনে হয় গানগুলি যাত্রার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। "ইহার মূল্য ভিতরের ভাবে—অন্তরের যে সাধনা, যে তপস্যার শিখা একটু প্রকাশ করিতেছে ও অপর প্রাণে সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছে – তাহাতেই।"

দ্বিতীয়ত : একটানা অভিনয়ে দর্শকদের মন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। এইজন্য যাত্রায়, নাটকে বা ছায়াছবিতে গানকে Dramatic Relief (আনন্দ বিরতি) হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই দিক হইতে দেখিলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মুকুন্দদাসের যাত্রায় গানকে শুধু Dramatic Relief হিসাবে ব্যবহার করা হয় নাই—ব্যবহার করা হইয়াছে সঞ্জীবনী মন্ত্র হিসাবে, যাত্রার প্রাণ প্রতিষ্ঠা কল্পে। মুকুন্দদাসের যাত্রা কতগুলি কথার সমষ্টি নয়—গানের সমষ্টি। মুকুন্দ-দাসের যাত্রা কথামালা নয়—গীতিমালা, দেশমাতৃকার উদ্দেশ্যে নিবেদিত পুষ্প-হার। মুকুন্দদাসের গানের ভাষা, ছন্দ ও রচনারীতি ভাবানুসারী হইয়া সুন্দর

রসমূর্তি লাভ করিয়াছে। তাই মুকুন্দদাসের যাত্রায়—বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য এবং দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য গানের ব্যবহার করা হইয়াছে। আবার ইহাও লক্ষণীয় যে, "একদিন যে সংক্ষেপমন্ত্র কবির কবিতায় প্রথম প্রকাশ পাইয়াছিল, সেই মন্ত্রগুলি পরবর্তীকালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের হাতে অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত হইয়া উচ্চ কবিতালোকে স্থান পাইয়াছে।"

তৃতীয়ত: নিখিলের সুপ্তির দুয়ারে আসিয়া উষা যখন তাহার আলোকরশ্মির হাজার তার বাজাইয়া তোলে, তখন আলোকের বর্ণে বর্ণে অমরাবতীর জীবন-নাট্যের যে খেলা চলে—তাহারই নাট্যরূপের জন্য প্রয়োজন হয়—"গান"। মুকুন্দদাসের যাত্রায় ইহার প্রভাব সুদূর প্রসারী। মুকুন্দদাসের যাত্রাগানে, সুর তরঙ্গে দুর্দান্ত বৃটিশ সরকার প্রমাদ গণে, বীর সেনানীরা 'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে যায় জীবনের জয়গান' ভয়াল আশীবিষও স্তব্ধ হইয়া যায়, হিংস্র বন্যপ্রাণীও যেন ক্ষণিকের জন্য হিংসাকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া অন্য প্রাণীর সঙ্গে 'একাত্ম' হইয়া উঠে, পুত্রহারা জননীও ভুলিয়া যায় তার বেদনা। এইখানেই মুকুন্দদাসের যাত্রা গানের শাশ্বত অবদান

চতুর্থত: পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কণ্ঠ বা যন্ত্রসংগীত প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। মুকুন্দদাসের যাত্রা স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় অভিনীত হওয়ায় পরিবেশ পূর্ব হইতেই তৈরী থাকে এবং শ্রোতাদের মন উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে—নামভূমিকায় মুকুন্দদাসের অভিনয় দেখিবার জন্য। ফলে যাত্রা বা নাটকে কণ্ঠ বা যন্ত্র সংগীতের দ্বারা পরিবেশ সৃষ্টির যে রীতি বা 'রেওয়াজ' আছে—মুকুন্দদাসের যাত্রায় সেই ভূমিকা খুবই সামান্য।

পঞ্চমত: কোনও চরিত্র বিকাশের প্রয়োজনে বা সংলাপ বা অভিনয়কে অর্থবহ করিয়া তুলিবার জন্য মুকুন্দদাস যাত্রায় সংগীতের সাহায্য লইয়াছেন। তাঁহার সংগীত মানব জীবনের এক অকৃত্রিম ঐশ্বর্য এবং এক পরম সম্পদ। সুরের ও তালের বৈচিত্র্যে, রাগ-রাগিণীর যথার্থ ব্যবহারে 'সামগান'-ই যেমন ভারতীয় মার্গ-সঙ্গীতে প্রথম পদক্ষেপ, তেমনি মুকুন্দদাসের গান স্বদেশী যাত্রার প্রথম বিজয়াভিযান!

ষষ্ঠত: কোন বিশেষ আদর্শের প্রচার বা নীতি-উপদেশ দানের জন্য; এক কথায় শিক্ষা ও আনন্দদানের জন্য মুকুন্দদাস তাঁহার যাত্রায় সংগীতকে অপরিহার্য করিয়া তুলিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"রচনার প্রধান গুণ সরলতা ও স্পষ্টতা।" মুকুন্দদাসের গানে এই 'সরলতা ও স্পষ্টতা' আবেগময় ভাষায় রচিত হওয়ায় তাহা পথ চলা পথিকের পাথেয় এবং মুক্তিকামী মানুষের

জয়গান। বিশেষ করিয়া আর্য যাত্রার পর্বে গঠিত অন্ত্যমিলযুক্ত তানপ্রধান ষোড়শাক্ষর পয়ার ছন্দে রচিত গানগুলি দেশাত্মবোধের সহজ আবেগময় ভাবের উপযুক্ত বাহনই যে হইয়াছে, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

সপ্তমত : মুকুন্দদাসের গানের মূল বৈশিষ্ট্য এই যে—উহা আধুনিককালের মত যন্ত্র-সংগীত নয়, উহা কণ্ঠ-সংগীত, হৃদয় বীণার মর্ম-সংগীত, যন্ত্র বা মাইকের ভূমিকা সেখানে নগণ্য। আসরের নিয়ম রক্ষার জন্য সামান্য কিছু যন্ত্রপাতি থাকিলেও মাইকের প্রচলন বড় একটা ছিল না। দরাজ সুরেলা গলায় উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বা আসরে হৃদয়-তন্ত্রীকে জাগাইয়া যে গান, তাহাই মুকুন্দদাসের গান। "প্রাণহীন এদেশেতে গানহীন যেথা চারিধার"—সেখানে প্রাণের ও গানের সঞ্চার করিয়া মুকুন্দদাস যে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় অধ্যায়।

অষ্টমত : আধুনিককালে "টেপরেকর্ডে" যেমন গান ধরিয়া রাখা যায়, বিভিন্ন দৃশ্যে বাজানো যায়, অথবা ইচ্ছানুযায়ী গান পূর্ব হইতে ছকে বাঁধা নিয়মে বাঁধিয়া রাখা যায়—মুকুন্দদাসের যাত্রাগানে তাহা নাই। 'থিয়েট্রিক্যাল পার্টি' বলিতে যাহা বোঝায়, তখন তাহা ছিল না এবং 'টেপরেকর্ডের' প্রচলনও বর্তমানের মত তখন হয় নাই। তাই মুকুন্দদাসের গানে যে মৌলিকত্ব, নূতনত্ব, বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব দেখা যায়, বর্তমানে তাহা দুর্লভ বলিলেও চলে। মুকুন্দদাসের গানছিল যাত্রার প্রাণ, তাঁহাকে বাদ দিয়া যাত্রার কথা কল্পনা করা যায় না। তাই মুকুন্দদাসের যাত্রায় গানের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এই অর্থে "গীতাভিনয়" নামকরণ সার্থক। মুকুন্দদাসের পর "স্বদেশীযাত্রার ধারা একপ্রকার লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র স্বদেশী যাত্রাই নহে, যাত্রার উপর এক দিকে কলকাতার ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চ ও অন্যদিকে চলচ্চিত্রের প্রভাববশতঃ ইহা বর্তমানে সকল বৈশিষ্ট্য হারাইয়াছে। তবে যাত্রার অনেক উপকরণ বাংলা নাটকের মধ্যে এখনও বাঁচিয়া আছে" (বাংলা নাটকের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য)।

পরিশেষে বলিব, যাত্রা বা নাটকে বিষয়ানুযায়ী গান সংযোজন করা হয়। ঐতিহাসিক নাটকে যে ধরনের গান ব্যবহার করা হয়, পৌরাণিক বা ধর্মমূলক নাটকে তাহা হয় না। আবার পারিবারিক বা সামাজিক নাটকে যে-সব গান থাকে তাহা একান্তভাবে সমাজাশ্রয়ী, মুকুন্দদাসের যাত্রাগানে ঠিক এমনটি দেখা যায় না। তাঁহার সব যাত্রাই স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় সৃষ্টি হওয়ায় তাহা পারিবারিক পরিবেশে সামাজিক। কিন্তু এই সব যাত্রায় স্বদেশপ্রীতি, পরিবারিক

স্থিতি এবং সামাজিক উন্নতি ছাড়াও ঐতিহাসিক, আধ্যাত্মিক, ধর্মনৈতিক ও অলৌকিক ঘটনামূলক গানের সমাবেশ দেখা যায়। শ্যাম-শ্যামার মাহাত্ম্য-সূচক সংগীত যেমন আছে, তেমনি আছে বাউল সংগীত, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল গীতি, সাধন গীতি ও বিভিন্ন কবির রচিত দেশাত্মমূলক গান। 'এক অঙ্গে এত রূপে'-র সমাবেশ বড় একটা দেখা যায় না। এইখানেই মুকুন্দদাসের গানের বৈশিষ্ট্য।

মুকুন্দদাসের সংগৃহীত প্রতিটি গানের উৎস-নির্দেশ

অ

আ

১৯ আয় না রে ভাই আপনি হাঁটি—দাস, গী—৫৮, পৃ—৪৫-৪৬।
বসুমতী, "কর্মক্ষেত্র", পৃ—৪৫।

২০। আয় মা তারিণী করাল বদনী—দাস, গী—১৭, পৃ—১৩।
বসুমতী, "পল্লীসেবা", পৃ—৫।

২১। আয় রে বাঙালী আয় সেজে আয়—দাস, গী—২৫, পৃ—২০।
চট্টো, গী—৪, পৃ—২-৩।
গুপ্ত, গী—৬, পৃ—৪-৫।
বসুমতী, "পল্লীসেবা", পৃ—৩৫।

*২২। আয় রে সকলে, ভাই ভাই মিলে—মনো, গী—২০৪, পৃ—১৭৬।

এ

২৩। একবার ব্যাকুল প্রাণে তাঁরে ডাকো রে—বসুমতী, "সমাজ", পৃ—৩৪।

২৪। একি আরতি তব বিশ্বপতি—বসুমতী, "ব্রহ্মচারিণী", পৃ—২৭।

২৫। এখনো খোলেনি আঁখি যার—দাস, গী—২১, পৃ—১৬-১৭।
চট্টো, গী—১৪, পৃ—৮।
গুপ্ত, গী—১৬, পৃ—৯-১০।

২৬। এডিটর খোঁজ রাখে ক'জনার—দাস, গী—৪৪, পৃ—৩৪-৩৫।
বসুমতী, "কর্মক্ষেত্র", পৃ—৪।

২৭। এ ভবে পাগল চেনা বিষম দায়—দাস, গী—৪৩, পৃ—৩৪।
বসুমতী, "কর্মক্ষেত্র", পৃ—১৩-১৪।

২৮। এমন দিন কি আসবে মোদের—দাস—গী—৪১, পৃ—৩২-৩৩।
বসুমতী, "ব্রহ্মচারিণী", পৃ—৩৭-৩৮।

২৯। এ সব চার পাগলের খেলা—বসুমতী, "সমাজ", পৃ—৩২।

৩০। এ সব দেখে শুনে ধাঁধা লাগে—বসুমতী, "ব্রহ্মচারিণী", পৃ—১৯।

৩১। এসেছে নেংটা যাইবে নেংটা—বসুমতী, "ব্রহ্মচারিণী", পৃ—৩৪।

৩২। এসেছে ভারতের নব জাগরণ—দাস, গী—৬৮, পৃ—৫৫।
চট্টো, গী—২০, পৃ—১১-'২।
গুপ্ত, গী—২৮, পৃ—১০-১১।
বসুমতী, "পল্লীসেবা", পৃ—৪১।

ক

৩৩ কমল কাননে রবি শশী কোণে—"সমাজ", পৃ—৬।

৩৪। করমেরই যুগ এসেছে—দাস, গী—১৯, পৃ—১৫।
চট্টো, গী—২২, পৃ—১২-১৩।
বসুমতী, "কর্মক্ষেত্র", পৃ—৩০-৩১।
গুপ্ত, গী—২৩, পৃ—১৩-১৪।

৩৫। কার কম্বু নিনাদে জানি অমৃত বরষিল—দাস, গী—৫, পৃ—৩-৪।

৩৬। কাঁপায়ে মেদিনী কর জয়ধ্বনি—বসুমতী, "পল্লীসেবা", পৃ—৯।

৩৭। কি আনন্দধ্বনি উঠল বঙ্গভূমে—দাস, গী—৪২, পৃ—৩৩-৩৪।
বসুমতী, "কর্মক্ষেত্র", পৃ—১৬।

*৩৮। কুলকুণ্ডলিনী তুমি কে—মনো, গী—৯১, পৃ—৯ , পৃ—১৮১।

৩৯। কে ও রণরঙ্গিণী, প্রেম-তরঙ্গিণী—বসুমতী, "ব্রহ্মচারিণী", পৃ—২০।

৪০। কেতবধারী হোমরা চোমরাই—চট্টো, গী—১৩, পৃ—৭-৮।
গুপ্ত, গী—১৩, পৃ—৮।

৪১। কে যেন ঐ চাঁদের কোণে—বসুমতী, "পল্লীসেবা", পৃ—১৮।

৪২। কোন ফাগুনের হাওয়া এ যে—দাস, গী—২৩, পৃ—১৮-১৯।

**৪৩। কৃষ্ণ নাম বড়ই মধুর—স্ব. গুপ্ত—ডায়েরী।

গ

৪৪। গেলে কল্পতরুমূলে—বসুমতী, "সমাজ", পৃ—৭

ঘ

৪৫। ঘোর কলিকাল যা দেখি সব উল্টা—দাস, গী—১১, পৃ—৮।
চট্টো, গী—২৭, পৃ—১৫-১৬।
বসুমতী, "ব্রহ্মচারিণী", পৃ—২৩।
গুপ্ত, গী—২৭, পৃ—১৫।

চ

৪৬। চল্ রে পল্লী ব্রজে চলে যাই—বসুমতী, "পল্লীসেবা", পৃ—৩৯।

ছ

৪৭। ছল চাতুরী কপটতা—দাস, গী—৬৬, পৃ—৫৩-৫৪। চট্টো, গী—৯, পৃ—৫। গুপ্ত, গী—১২, পৃ—৭।

৪৮। ছাত্র মনতরী গড়িয়া মাকে স্মরিয়া—দাস, গী—৫৩, পৃ—৪১—৪২।

৪৯। ছেড়ে দাও কাঁচের চুড়ি বঙ্গনারী—দাস, গী—৫৯, পৃ—৪৬-৪৭।
পাঠান্তর—বসুমতী, "কর্মক্ষেত্র", পৃ—৪৬।

জ

ড

ত

*৬৩। তোরা পাস করে হোস্ মরা—মনো, গী—৭, পৃ—১৩।
৬৪। তোরা সবে কোদাল ধর—চট্টো, গী—৮ পৃ—৪-৫।
বসুমতী, "পল্লীসেবা", পৃ—৮।
গুপ্ত, গী—৮, পৃ—৫-৬।

থ

৬৫। থাকুক আমার বিয়ে—বসুমতী, "সমাজ", পৃ—৩০।

দ

৬৬। দীন তারিণী পতিত পাবনী—বসুমতী, "পল্লীসেবা", পৃ—৩।
৬৭। দুনিয়া আজব তেরা ঢং—বসুমতী, "সমাজ" পৃ—১৯-২০।
৬৮। দেশের লক্ষ্মী গেছে ছেড়ে—চট্টো, গী—১৫, পৃ,—৮-৯।
গুপ্ত, গী—১৪, পৃ—৮-৯।

ধ

৬৯। ধেৎতেরি বড় দেক্ সেক্ লাগে—বসুমতী, "সমাজ", পৃ—৬।

ন

*৭০। নগর চেয়ে কানন ভাল—মনো, গী—১১৫, পৃ—২২৭
৭১। নে চষে নে চষে ভুঁই—বসুমতী, "ব্রহ্মচারিণী", পৃ—২৭।

প

৭২। পতিত পাবনী অধম তারিণী—দাস, গী—৭০, পৃ—৫৬-৫৭।
বসুমতী, "সমাজ", পৃ—৩১।
৭৩। পণ করে সব লাগ রে কাজে—দাস, গী—১৬, পৃ—১২।
চট্টো, গী—২, পৃ—১-২।
গুপ্ত, গী—২, পৃ—২-৩।
বসুমতী, "কর্মক্ষেত্র", পৃ—১০।
৭৪। পাঠিয়ে দেমা আনন্দময়ী—বসুমতী, "কর্মক্ষেত্র", পৃ—৩২-৩৩।
৭৫। পিরিতি করিবি, পিরিতে মজিবি—বসুমতী, "সমাজ", পৃ—৩২।
৭৬। পুঁটলী বেঁধে ঘরের কোণে—বসুমতী, "পল্লীসেবা", পৃ—২০-২১।
চট্টো, গী—১১, পৃ—৬। গুপ্ত, গী—১১—৭।

ফ

৭৭। ফুল্লার—আর কি দেখাও ভয়?—দাস, গী—৭৪, পৃ—৫৯।

ব

*৭৮। বন্দে জননী তব রাতুল চরণ—মনো, গী—১৭৪ পৃ—১০৬।

৭৯। বন্দেমাতরম্ বলে নাচ রে সকলে—দাস, গী—৩৪, পৃ—২৬-২৭।

৮০। বল কেমন করে কি সন্ধানে যাই—বসুমতী, "পল্লীসেবা", পৃ—১৫

৮১। বল ভাই যেতে যাই বন্দেমাতরম্—বসুমতী, "পল্লীসেবা", পৃ -৪৯।

৮২। বল শ্যামাঙ্গিনী যোগিনী সঙ্গিনী—দাস, গী—৪৬, পৃ—৩৬-৩৭।
বসুমতী, "সমাজ", পৃ—১৩।

৮৩। বান এসেছে মরা গাঙে—দাস, গী—২৯, পৃ—২৩।
পাঠান্তর—চট্টো, গী—১৬, পৃ—৯।
গুপ্ত, গী—১৯, পৃ—১১। বসুমতী, "ব্রহ্মচারিণী",
পৃঃ—২৬।

৮৪। বাবু ওম্‌দা ওম্‌দা চিজ—বসুমতী, "সমাজ", পৃ—১৮।

৮৫। বাবুদের পায়ে নমস্কার—দাস, গী—৬৭, পৃ—৫৪।
চট্টো, গী -২৬, পৃ—১৫। গুপ্ত, গী—২৮,
পৃ -১৫-৬।

৮৬। বাবু বুঝবে কি আর মলে—দাস, গী—২৭, পৃ—২১-২২।

৮৭। বিরাট তুমি মহান তুমি—দাস, গী—৩৬, পৃ—২৮-২৯।

৮৮। বিশ্বপতির বিশ্ববীণায়—বসুমতী, "কর্মক্ষেত্র", পৃ—৪০।

৮৯। বিশ্ব-প্রসবিনী, ত্রিলোক পালিনী—বসুমতী, "কর্মক্ষেত্র",
পৃ—২৮-২৯।

ভ

৯০। ভরসা মায়ের চরণ তরণী—দাস, গী—৭, পৃ—৫।
বসুমতী, "কর্মক্ষেত্র", পৃ—৩৯-৪০।

৯১। ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে—দাস, গী—৬, পৃ—৪।

৯২। ভাই চল্ রে চল্ রে চল্—বসুমতী, "কর্মক্ষেত্র", পৃ—৩৮।

৯৩। ভাই রে ধন্য দেশের চাষা—দাস, গী—১৪, পৃ—১০-১১।
চট্টো, গী—২৩, পৃ—১৩-১৪। গুপ্ত, গী—২২, পৃ—১২-১৩।
বসুমতী, "কর্মক্ষেত্র", পৃ—২৬।

৯৪। (ভাই রে) মাটিই খাঁটী ভবে—দাস, গী—৫২, পৃ—৪১।

৯৫। ভাই রে মানুষ নাই রে দেশে—দাস, গী—৪, পৃ—৩। চট্টো, গী—১০, পৃ—৫-৬। গুপ্ত, গী—৯, পৃ—৬।

৯৬। ভারত শ্মশান মাঝে—বসুমতী, "সমাজ", পৃ—২৫। চন্দ্র, গী—৯, পৃ—১১।

৯৭। ভারতের ভগ্ন প্রাণগুলি—দাস, গী—১, পৃ—১। চন্দ্র, গী—৩, পৃ—২।

৯৮। ভালবাসতে যদি হয়—বসুমতী, "সমাজ", পৃ—৩১-৩২।

ম

৯৯। মন পাগলা রে আনন্দে গুরু গুণ গাও—বসুমতী, "সমাজ", পৃ—১৭।

১০০। মা আমার বিশ্বরাণী—দাস, গী—১৫, পৃ—১১।
চট্টো, গী—১৮, পৃ—১০-১১।
গুপ্ত, গী—১৭, পৃ—১০।
বসুমতী, "ব্রহ্মচারিণী", পৃ—৮-৯।

১০১। মা একি মজার খেলা তাস—বসুমতী, "কর্মক্ষেত্র", পৃ—১৫।

১০২। মাকে ডাক দেখি—দাস, গী—৩০, পৃ—২৩।
বসুমতী, "ব্রহ্মচারিণী", পৃ—১৫।

১০৩। মা মা বলে ডাক্ দেখি ভাই—চট্টো, গী—১, পৃ—১।
দাস, গী—৬৪, পৃ—৫১-৫২।
বসুমতী, "কর্মক্ষেত্র", পৃ—৩।

১০৪। মানস নয়ন কবি উন্মীলন—চট্টো, গী—২১, পৃ—১২।
দাস, গী—৪৫, পৃ—৩৫-৩৬।
চন্দ্র, গী—১০, পৃ—১২-১৩।

১০৫। মায়ের ডাকে সব জেগেছে—চট্টো, গী—৮, পৃ—৪।
বসুমতী, "পল্লীসেবা", পৃ—১৩।
গুপ্ত, গী—৪, পৃ—৩-৪।

১০৬। মায়ের জাতি জাগিয়ে তোল—দাস, গী—৪৯, পৃ—৩৮-৩৯।
বসুমতী, "কর্মক্ষেত্র", পৃ—১৮।

১০৭। মায়ের নাম নিয়ে ভাসান তরী—দাস, গী—২, পৃ—১-২।
বসুমতী, "পল্লীসেবা", পৃ—২৬।

১০৮। মায়ের নাম ডঙ্কা দিয়ে—দাস, গী—৩৭, পৃ—২৯-৩০।
বসুমতী, "পল্লীসেবা", পৃ—৪।

১০৯। মায়ের নামের বাদাম উড়িয়ে—দাস, গী—৫৫, পৃ—৪৩-৪৩।
বসুমতী, "পল্লীসেবা", পৃ—৩৩।

১১০। মূর্ত করিয়া লুপ্ত গরিমা—দাস, গী—৩৯, পৃ—৩১।

১১১। মোরা ঢুকেছি যে রঙ্ মহলে—চট্টো, গী—২৮, পৃ—১৬।
গুপ্ত, গী—২৯, পৃ—১৬।

র

১১২। রঞ্জি পূরব দিক্ বিভাগে—বসুমতী, "পল্লীসেবা", পৃ—২৭-২৮।

১১৩। রাম রহিম না জুদা কর ভাই—দাস, গী—৫৬, পৃ—৪৪।
বসুমতী, "কর্মক্ষেত্র", পৃ—২৬

১১৪। রূপের হাট দেখিবি ভাই—বসুমতী, "সমাজ", পৃ—১৫।

শ

১১৫। শ্যামা নামের ডঙ্কা বাজা রে—বসুমতী, "ব্রহ্মচারিণী", পৃ—৩৩-৩৪।

*১১৬। শ্যামা মা তোর পাগলা ছেলে—মনো, গী—২০২, পৃ—১৭০।

স

১১৭। সকল কাজের মিলবে সময়—দাস, গী—২০, পৃ—১৫-১৬।
চট্টো, গী—৬, পৃ—৩-৪। বসুমতী, "কর্মক্ষেত্র",
পৃ—২১। গুপ্ত, গী—৭, পৃ—৫।

১১৮। সময় ফিরিয়া কেবা পায়—দাস, গী—৪৮, পৃ—৩৮।
বসুমতী, "পল্লীসেবা" পৃ—২১-২২।

১১৯। সাধে কি আর হচ্ছ রাজী—বসুমতী, "পল্লীসেবা", পৃ—১৯।

*১২০। সাধে কি বলি গো পাষাণী—মনো, গী—৯৫, পৃ—১৮৯।

*১২১। সোনার ঘরে জ্বালিয়ে আগুন—মনো, গী—১ ৭, পৃ—২৩১।

১২২। স্বরাজ সেদিন মিলিবে যেদিন—দাস, গী—১০, পৃ—৭।
চট্টো, গী—১৭, পৃ—৯-১০। গুপ্ত, গী—১৫,
পৃ—৯। বসুমতী, "কর্মক্ষেত্র", পৃ—৫০।

১২৩। স্বরাজ স্বরাজ করিস তোরা—দাস, গী—৩২, পৃ—২৪-২৫।

হ

১২৪। হবে নামতে ধুলার তলে—দাস, গী—৭১, পৃ—৫৭-৫৮।

*১২৫। হরি বল রে মন আমার—মনো, গী—৬, পৃ—১৩।

১২৬। হাসিতে খেলিতে আসিনি এ-জগতে দাস, গী—১৩ পৃ—৯-১০।
চন্দ্র, গী—২, পৃ—২। চট্টো, গী—২৪,
পৃ—১৪। গুপ্ত, গী—২৪, পৃ—১৪।

*১২৭। হা হা হা, হি হি হি, দুনিয়াটাই গোল—
মনো, গী—১১৯, পৃ—২৩৫।

(*) তারকা চিহ্নিত গীতগুলি মুকুন্দদাসের অপ্রকাশিত গীত।

(**) দ্বি-তারকা চিহ্নিত গীতটি মুকুন্দদাসের রচিত প্রথম অপ্রকাশিত গীত।

॥ মুকুন্দদাসের যাত্রা গ্রন্থাবলী ॥

মুকুন্দদাসের যাত্রা-পরিচিতি

সমাজ

চারণকবি মুকুন্দদাসের "সমাজ" নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বলিদান' নাটকের অনুকরণে রচিত। ইহার বিষয়বস্তু বাঙলার কৌলীন্য প্রথার মর্মান্তিক দৃশ্য ও পণপ্রথার কুফল। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা 'কামিনী মুখুয্যে' সমাজের অনুশাসনরূপে শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া কন্যা সরোজ ও নির্মলাকে যথাক্রমে মাতাল বিনোদ ও যক্ষ্মারোগাক্রান্ত বুড়ো জামাই-এর হাতে অশ্রু সজল চোখে অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার মর্মভেদী হাহাকারে আমাদের চোখেও জল আসে—"উঃ, দুনিয়ায় টাকা কি আজব জিনিস! টাকা নেই, অথচ আমি নিজে কুলীন, একটু বংশজে নেমে যদি মেয়ের বিয়ে দিই, তা হলে কি সমাজ আমাদের দেশে রাখবেন? সমাজ বলেন, জাত যাবে, কথা উঠলেই নাক সেঁটকান, এদিকে যে ঘরে ঘরেই, বিপদ, তা সমাজ একবারও ভেবে দেখছেন না। ধিক্ এমন নচ্ছার সমাজে, ধিক্ আমার কুলীনত্বে।" ফলে সরোজ অচিরেই স্বামীর হৃদয়হীনতা ও শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল। আর নির্মলার প্রত্যাবর্তন ঘটিল বিধবার সাজে। অথচ এমন জামাইদের হাতে কন্যা তুলিয়া দিতেও কামিনীবাবু নিঃস্ব—চতুর্দিকের চাপে পড়িয়া তাহার কাছে মৃত্যুই একান্তভাবে কাম্য। অপরদিকে চারিত্রিক ও মানসিক ভারসাম্যও তিনি হারাইযা ফেলিয়াছেন। তাই কন্যাকে 'উনুন থেকে কিছু ছাই বেড়ে' খাইতে বলেন। গিন্নিকে (নলিনী) বলেন—"অদৃষ্টে যা আছে তা দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, গাছতলা, গিন্নি—গাছতলা।"

সমাজ ব্যবস্থার এই নির্মমতার মধ্যে 'সত্য' (অভিনয়ে মুকুন্দদাস) আসিয়াছেন দেবতার আশীর্বাদরূপে সমাজ সংস্কার করিতে। তাঁহারই প্রচেষ্টায় সমাজে বা গ্রামে 'মরানদীতে বান এসেছে', ঘুমন্ত দেশবাসী জাগিয়া উঠিয়াছে, সম্মিলিতভাবে কাজ করিবার প্রেরণা পাইযাছে। 'সত্য'রূপী মুকুন্দদাস ক্ষুব্ধ কণ্ঠে অথচ আবেগে গাহিযাছেন—

"মানুষ নাই এ দেশে
সকল মেকি, সকল ফাঁকি
যে যায় মজে আপন রসে।"

চতুর্বিংশ দৃশ্যে পরিসমাপ্ত এই পালাগানে সংগীতের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য মুকুন্দদাসের প্রতিটি যাত্রায় সংগীতেরই প্রাধান্য। আসরে কালীমূর্তি সামনে রাখিয়া মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত মুকুন্দদাস যাত্রারম্ভ করিতেন এবং প্রস্তাবনায় ও উপসংহারে শ্যামাসংগীত গাহিতেন। যথা, 'সমাজ' যাত্রাগানে—

"কিছু নাই সংসারের মাঝে,
কেবল কালী, নাম সার রে—
আমার মন কালী, ধন কালী,
প্রাণ কালী আমার রে।"

যাত্রার শেষেও দেখি সত্যরূপী মুকুন্দদাসের ব্যাকুল আহ্বান—

"একবার ব্যাকুল প্রাণে তাঁরে ডাকো রে।
দীন দয়াময়ী শ্যামা মায়েরে॥
পতিত পাবনী, অধম তারিণী।
মায়ের দীনজনে বড় দয়া রে।"

আদি ও অন্তে শ্যামা সংগীত—মুকুন্দদাসের যাত্রা গানে ইহা একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। তাঁহার রচিত সব যাত্রাই এইভাবে অভিনীত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, যাত্রাগুলি 'অঙ্ক' ভাগে বিভক্ত না হইয়া 'দৃশ্য'ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। প্রায় প্রতিটি দৃশ্যে নাম ভূমিকায় মুকুন্দদাসের আবির্ভাব। ইহা আধুনিক পেশাদার যাত্রা-গানে বা রঙ্গমঞ্চে 'নাম ভূমিকা'র এইরূপ প্রাধান্য সচরাচর দেখা যায় না। গণতান্ত্রিক সমাজে গণনাট্যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চরিত্রও প্রধান চরিত্রকে ম্লান করিয়া দিতে পারে। কিন্তু মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রায় লোকশিক্ষা প্রচারে ও আনন্দদানে মুকুন্দদাসকেই নেতৃত্ব দিতে হইয়াছে। তাই যাত্রা আসরে তাঁহার আবির্ভাবেই অন্যান্য চরিত্রগুলি সতেজ সজীব ও চঞ্চল হইয়া উঠে। কীর্তনে যেমন 'দোহারে'-র প্রয়োজন আছে, মুকুন্দদাসের যাত্রায় অন্যান্য চরিত্রগুলির প্রয়োজনীয়তা সেইরূপ। কীর্তনিয়া যেমন গানে 'আখর' দেন, মুকুন্দদাসও তেমনি স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী আসরে দাঁড়াইয়া উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগে 'আখরে'র কাজ করিতেন বক্তৃতা বা গানের মাধ্যমে। আধুনিককালে রচনা করেন একজন, পরিচালনা করেন অন্যজন এবং নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হন জনপ্রিয় অভিনেতা বা অভিনেত্রী। কিন্তু স্বদেশী যাত্রা রচনায়-প্রযোজনায় -পরিবেশনায়-পরিচালনায় মুকুন্দদাস একক শিল্পী, তিনিই কেন্দ্রীয় চরিত্র। তাই তাঁহার যাত্রার নাম—'মুকুন্দদাসের যাত্রা' বা 'মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রা।'

আবার যাত্রা আন্দোলনের ইতিহাসে দেখি নাটকের মত যাত্রাও পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। প্রতিটি অঙ্কই একাধিক দৃশ্যে বিভক্ত। এক অঙ্কের শেষে এবং আর এক অঙ্কের আরম্ভের মধ্যবর্তী সময়টুকুতে গানসহনৃত্য বা শুধু নৃত্য পরিবেশন করা হয়। মুকুন্দদাসের যাত্রায় 'অঙ্ক'-বিভাগ না থাকায় একাধিক দৃশ্যের পারম্পর্য রক্ষা করিয়াছে গান এবং দুইটি দৃশ্যের মধ্যবর্তী সময়টুকু পূরণ করিয়াছে—বক্তৃতা বা গান। এইখানে বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে আধুনিক যাত্রাগানে সাজ-সজ্জার বৈচিত্র্য বা বাহুল্য থাকায় এবং প্রয়োজনে একজনকে একাধিক চরিত্রে অভিনয় করিতে হওয়ায় একটি অঙ্কের শেষে আর একটি অঙ্ক আরম্ভ করিতে সময় লাগে। এই সময় দর্শকবৃন্দ যাহাতে অধৈর্য হইয়া না পড়েন (এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যাহাতে তৈরি হইতে পারেন) তাহার জন্য পরিবেশন করা হয়—নৃত্য, গীত বা যন্ত্রসংগীত। মুকুন্দদাসের যাত্রা 'স্বদেশী যাত্রা' হওয়ায় সাজ-সজ্জার বাহুল্য ছিল না। গৈরিক বসনে এবং সাদাসিদা পোশাকে অভিনয় হইত। তাহা ছাড়া একই ব্যক্তিকে একটি যাত্রাগানে একাধিক চরিত্রে অভিনয় করিতে হইত না। ফলে পোশাক পরিবর্তন করিতে না হওয়ায় সময়-ও কম লাগিত এবং দর্শকরাও অধৈর্য হইতেন না, অধীর আগ্রহে পরবর্তী দৃশ্যের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতেন। আধুনিক যাত্রা বা নাটকে suspense-এর বড় অভাব, কিন্তু মুকুন্দদাসের যাত্রায় প্রতিটি দৃশ্যেই এই ভাব ছিল। দৃশ্যের পর দৃশ্য চলিতেছে আর শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন—কোথাও ছেদ নাই, অধৈর্য নাই, একটানা পালাগান দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্য দিয়া পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। 'Dramatic Relief' বলিতে নাটকে আমরা বুঝি, মুকুন্দদাসের যাত্রায় তাহা আমরা বক্তৃতা বা গানের মাধ্যমে উপলব্ধি করি। 'সমাজ' যাত্রা-গানে ২৭টি গান সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে, তন্মধ্যে—

> "ছেলের বাপ বসে আছে পাঁচ হাজারের আশে,
> মেয়ের বাপের ভাঙ্গা কপাল চোখের জলে ভাসে।"

এই গানটি সমাজের একটি বিশেষ দিকের অর্থাৎ পণপ্রথার বিরুদ্ধে নিষ্ফল ক্রন্দন হইলেও—

> "থাকুক আমার বিয়ে
> চাইনা আমি M. A., B. A.
> কিনতে যা হয় টাকা দিয়ে।"

—এই গানের শেষে দেখা যাইত বহু যুবক বিনাপণে বিবাহ করিতে আগ্রহ

প্রকাশ করিয়াছেন। গানের মাধ্যমে এইরূপ মানসিক পরিবর্তন ও উন্মাদনা সৃষ্টিই মুকুন্দদাসের যাত্রা-গানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

মূলতঃ "সমাজ" পালাগানটি বহুবিচিত্র বাঙালী সমাজের দর্শন স্বরূপ এবং পণপ্রথার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। এখানেও দেখি,- "সত্য"রূপী মুকুন্দদাসের আহ্বানে অনুপ্রাণিত 'নগেনে'র ত্যাগেই লোভী বা কৃপণ পিতার সতদৃষ্টি লাভ—"নগেনের ত্যাগেই আমায় এমন করে পাগল করে দিয়েছে। সত্য সত্যই বর্তমানে আদর্শ চরিত্রের প্রয়োজন, যা দেখে সমাজ অগ্রসর হবে।" বর্তমানে আইন করিয়া পণপ্রথা 'রদ' করিয়া দিলেও মনের দিক হইতে সাড়া না পাওয়ায় অর্থাৎ মানসিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না হওয়ায় তাহা আজও চলিতেছে, পদ্ধতিটা সামান্য পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র। তাই মুকুন্দদাসের যাত্রা-গানের আবেদন আজও আছে।

পল্লীসেবা

"পল্লীসেবা"—মুকুন্দদাসের আর একখানি উল্লেখযোগ্য যাত্রা। যাত্রাটি উদ্দেশ্যমূলক এবং "সমাজ" যাত্রাগানের ন্যায় প্রস্তাবনায় ও উপসংহারে আছে মাতৃবন্দনা। পল্লীসেবাই যে সমাজসেবা, সমাজসেবাই যে দেশসেবা—ষোলটি দৃশ্যে তাহা রূপায়িত হইয়াছে। "পল্লীসেবা" যাত্রাভিনয়ে মুকুন্দদাস বলিয়াছেন—"এখন আমাদের রজঃগুণটিই জাগিযে তুলতে হবে। দেশময় এখন সেই আলোচনাই হওয়া উচিত। আমাদের দুর্দশা দেখেই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "ওরে তোরা বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে কিছুদিন শিকেয় তুলে রাখ। কৃষ্ণ ভজনই করতে চাস্ তবে কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণকে ডাক, জাতিটা একটু গা ঝাড়া দিয়ে উঠুক। যে জাতির ভাত জোটে তো ডাল জোটে না, তার কাছে প্রেমের কথা বলায় কোন ফল হবে কি? রজঃগুণের কথা বলো, জাতিটা উঠে দাঁড়াক। পেট ভরে খাক্, খেতে পারলেই গাযে একটু বল পাবে। তখন আর মা-বোনের ইজ্জৎ বাঁচাবার জন্য তাকে সংবাদপত্রে চোখের জল ফেলতে হবে না।" পল্লীসেবাই যে ভারতসেবা, নর-নারায়ণের সেবা- গান্ধীজী তাহা অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিতেন। তাই গান্ধীজীর স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় মুকুন্দদাস এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন, "আনন্দমঠ"-এর মধ্যে যেমন সন্ন্যাসী-

বিদ্রোহের কথা বলিয়া ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র দেশবাসীকে মাতৃসেবার মন্ত্রে আহ্বান জানাইয়াছিলেন, মুকুন্দদাসও তেমনি 'নিতাই'কে সমাজসেবী হিসাবে ঘুমন্ত পল্লীর ঘুম ভাঙাইবার কাজে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। যাত্রাভিনয়ে দেখি 'নিতাই'-এর ভূমিকায় মুকুন্দদাসের ব্যাকুল আহ্বান—

"আয় মা তারিণী করাল-বদনী
ডাকিনী যোগিনী সব নিয়ে আয়।
শ্মশানবাসিনী শ্মশানরঙ্গিণী
ভারত শ্মশানে নাচবি গো আয়।"

তখন পরিপূর্ণ আসরে বিদ্যুৎচমকের মত শিহরণ খেলিয়া যাইত এবং এক স্বর্গীয় আবেশে শান্ত সমাহিত হইয়া যেন শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁহার বক্তৃতা ও গান শুনিত এবং অভিনয় দেখিত। প্রচারকের এমন ব্যক্তিত্ব ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নাই, ভবিষ্যতেও দেখা যাইত কিনা সন্দেহ। মুকুন্দদাস নিজেই নিজের তুলনীয়, তাঁহার কোন বিকল্প নাই।

বলা বাহুল্য, এই 'করাল-বদনী কালী'—বাজনৈতিক কালী, জীবনে যিনি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইয়া নিজের নামটি পর্যন্ত (মুকুন্দদাসের বাল্যকালের নাম—যজ্ঞেশ্বর) নূতন করিয়া লইয়াছিলেন, তিনি যে কালীকে আহ্বান করিলেন তাহা যেন রাজনৈতিক প্রয়োজনে। তখন বৃটিশরূপী অসুব, যথা—

"ফুলাব—আর কি দেখাও ভয়?
দেহ তোমার অধীন বটে।
মন তো তোমাব নয়॥"

এবং ভারতমাতারূপী কালী, যথা—

"জাগো গো জাগো জননী।
তুই না জাগিলে শ্যামা, কেউ জাগিবে না গো মা,
জাগো গো জাগো জননী
তুই না নাচালে, কারো নাচিবে না ধমনী।'

এই রূপকটা তখন দেশে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। মুকুন্দদাস ছিলেন স্বভাব কবি। অদ্ভুত ছিল তাঁহাব কবিত্বশক্তি ও সৃজনী শক্তি। আসবে দাঁড়াইয়া সময়োপযোগী গান রচনা করিয়া তাৎক্ষণিক সুর সহযোগে গাহিবাব মত ঐন্দ্রজালিক শক্তি ছিল তাঁহার। দেশকে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন বলিয়া দেশের মানুষ তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিল, তাঁহার যাত্রাগানে পাগলপারা হইত এবং নূতন জীবন লাভ করিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহাকেই অনুসরণ করিত। যাত্রা

আন্দোলনের ইতিহাসে মুকুন্দদাসের স্থান ও মান কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর এইখানেই মিলিবে।

মুকুন্দদাসের যাত্রা গানের মূল বৈশিষ্ট্য হইতেছে—সংলাপ অপেক্ষা গানের প্রাধান্য বেশী। "পল্লীসেবা" যাত্রাভিনয়ে ৩০টি সংগীত আছে—যাহা কখনও 'বিবেকে'র কাজ করিয়াছে, কখনও সংলাপ-এর পরিপূর্ণতার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, আবার কখনও কার্যকরী উপায় ও পথ নির্ধারণের জন্য গীত হইয়াছে। মালঞ্চে ফুল থাকিলেই মালা গাঁথা হয় না, তার জন্য চাই নিপুণ মালাকার। মুকুন্দদাস এইরূপ একজন নিপুণ মালাকার ছিলেন। তিনি নূতন ভাবে, নূতন ঢঙে, নূতন বেশে, নূতন পটভূমিকায় যে 'নূতন মালা' গাঁথিলেন, তাহা—

"গৌড়জন যাহে—
আনন্দ করিবে পান সুধা নিরবধি।"

কবির যাত্রা-গানে ও মঞ্চায়নে ছিল অভিনবত্ব। তাই তাঁহার 'নূতন যাত্রা'র নাম স্বদেশী যাত্রা। স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় এই যাত্রার সৃষ্টি এবং স্বদেশী আন্দোলনেই ইহার আবেদন সবচেয়ে বেশী। নাট্যমঞ্চে কোন এক উপাখ্যানকে কেন্দ্র করিয়া এক ঘটনা সংস্থাপনের মাধ্যমে কোন এক ভূমিকায় মঞ্চে নামিয়া আসিলেন চারণের বেশে মুকুন্দদাস। কণ্ঠে, তাঁহার আধুনিক যাত্রামঞ্চে 'ক্ষ্যাপা'র গান, সহসা আবার তিনি অবতীর্ণ হন কথকের ভূমিকায়, চকিতে বক্তব্য ঘুরাইয়া নামিয়া আসেন 'কবিয়ালে'র ভূমিকায়। অথচ তিনি মূলতঃ 'ক্ষ্যাপা'ও নন, 'কবিয়াল'ও নন—তিনি ছিলেন চারণকবি। তাঁহার সংগীতকে আমরা 'গীতি নক্‌শা' বা 'গীতি বিচিত্রা' বলিতে পারি না। এক কথায় এই-গুলিকে আমরা 'Melodrama'-ও বলিতে পারি না। মুকুন্দের সুরমার্গ কণ্ঠ, বলিষ্ঠ প্রাণস্পর্শী বক্তব্য ও কার্যকরী আদর্শ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনা সংঘাত ও সংগীত বাদ্যের বহিঃপ্রকাশ শুধু নূতন নয়—অভিনব ও অতুলনীয়। তিনি এক নূতন যুগের নূতন মানুষ।

সত্যই মুকুন্দদাস ছিলেন নূতন যুগের দিশারী, সংগ্রামী, কষ্টসহিষ্ণু ও বাস্তববাদী দেশপ্রেমিক। তিনি তাঁহার স্বদেশী যাত্রাগানে দেশকে এবং জাতিকে স্বাবলম্বী হইবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন—

"সাধিতে দেশের কাজ পরয়ে বীরের সাজ
করে লয়ে করম নিশান।
জীবন ব্রত সাধ অবিরত—
এ নহে বিরামের স্থান॥"

কর্মের মাধ্যমেই কর্মীর পরিচয় পাওয়া যায়—বক্তৃতার দ্বারা নয়। তাই 'পল্লীসেবা' আরম্ভ হইবে, পল্লী হইতে, শহর হইতে নয়। যাহা কিছু পরিকল্পনা তাহা আসিবে কৃষিভিত্তিক গ্রাম বাংলা হইতে। গ্রামের উন্নতিতেই শহরের উন্নতি দেশের শ্রীবৃদ্ধির অর্থ গ্রাম বাংলার শ্রীবৃদ্ধি। কারণ দেহের সমস্ত রক্ত মুখে উঠিলে তাহাকে যেমন স্বাস্থ্য বলে না, তেমনি অল্প সংখ্যক 'উপরতলা' লোকের বা শহরের উন্নতি ঘটিলেই দেশের উন্নতি ঘটে না। মুকুন্দদাস এই কথা মনে রাখিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এই যুগেরই আহ্বান—

"তোরা সবাই কোদাল ধর—
দেশ থেকে তাড়াতে হবে ম্যালেরিয়া জ্বর।
মাথা গুঁজে ভাবলে বসে হবে না দেশের কল্যাণ।
কোমর বেঁধে হতে হবে সবায় আগুয়ান॥"

এইজন্য 'মূক-ম্লান-মুখে' ভাষা এবং 'শ্রান্ত-শুষ্ক-ভগ্নবুকে' আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগাইবার জন্য 'নিতাই' ডাক দিয়াছেন পল্লীবাসীকে—

"মায়ের ডাকে সব জেগেছে,
যে যার কাজে লেগে গেছে
তোমরাই মায়ের জাতি,
বসে থাকবে কি নীরবে।
শক্তি স্বরূপিণী যাঁরা,
ও দুর্দিনে কেন তারা,
ভোগে বিলাসে মজে
মৃতপ্রায় পড়ে রবে॥
জাগাও সকলে আজি
নিদ্রিতা শকতি,
তোমাদেরই হাতে মাগো,
ভারতের মুক্তি॥"

—আজিকার দুর্দিনে এই গান যত প্রচারিত হয় ততই মঙ্গল। দেশের গণদেবতা আজ জাগিয়াছে তাই ছুঁৎমার্গগামী সমাজ ভয়ে কম্পিত, শঙ্কিত এবং ইহাদের দ্বারা নিন্দিত। মুকুন্দদাস বিশ্বাস করিতেন মনুষ্যত্বে—বর্ণভেদে নয়, সম্প্রদায়ে নয়। তিনি যে 'সাম্যবাদে'র চারণকবি—

"গাহি সাম্যের গান—
সেখানে আসিয়া একত্র হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান।
সেখানে মিশিছে হিন্দু-বৌদ্ধ মুসলমান খৃষ্টান॥"

ব্রাহ্মণ-শূদ্র, বৃহৎ-ক্ষুদ্র মানুষের কৃত্রিম পরিচয়, মানুষের একমাত্র পরিচয় সে মানুষ—'সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই।' মানুষের গৌরব জাতে নয়, অর্থে নয়—মনুষ্যত্বে। মুকুন্দদাস এই মানুষের কবি, 'জগৎ জুড়িয়া যে জাতি আছে' সেই মানুষ জাতির কবি। তাই তিনি গাহিলেন—

"জাতের নামে বজ্জাতি সব, জাত-জালিয়াৎ খেলছে জুয়া।
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতে নয় তো মোয়া॥"

মুকুন্দদাস শুধু প্রচারক ছিলেন না, সমাজ সংস্কারক রূপে তাঁহার পরোক্ষ ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। "পল্লীসেবা"র একটি গান এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়—

"সাধে কি আর হচ্ছ রাজী,
তোমায় রাজী করেছে।
সেদিনই জানি ধরবে চরকা
তোমার গিন্নী যেদিন ধরেছে।"

—জাতিকে ও দেশকে সামাজিক কুসংস্কারের উর্ধ্বে উঠিয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে এবং সামাজিক গণ্ডী ভাঙিয়া দিয়া তাঁতী-জোলা প্রভৃতিকে কোলে তুলিয়া লইতে হইবে—ইহাই ছিল মুকুন্দদাসের প্রাণের কথা, সমাজতন্ত্র-বাদের গোড়ার কথা।

ব্রহ্মচারিণী

"ব্রহ্মচারিণী" পালাগানটি মুকুন্দদাসের স্বপ্ন ও সাধনার রূপরেখা। মুকুন্দ-দাসের বন্ধু বিধুভূষণ বসু তাঁহার রচিত "দীনবন্ধু" নামক একখানি বই মুকুন্দদাসকে অভিনয় করিতে দেন এবং পরে অর্থের বিনিময়ে মুকুন্দদাসকেই বই-এর স্বত্ব বিক্রয় করেন। মুকুন্দদাস বিধুবাবুর অনুমতি লইয়া বইখানির অনেক পরিবর্তন সাধন করিয়া "ব্রহ্মচারিণী" নাম দিয়া গ্রন্থখানিকে জনপ্রিয় করিয়া গেলেন। চতুর্দশ দৃশ্যে পালাগান সমাপ্ত। বিবাহিতের আদর্শ জীবন গঠনকল্পে একদল ব্রহ্মচারিণীর প্রয়োজন মুকুন্দদাস উপলব্ধি করিয়াছিলেন। "ব্রহ্মচারিণী" তাঁহার সেই উপলব্ধির ফল। মুকুন্দদাসের মহিলা আশ্রমের পরিকল্পনা ফলশ্রুতি—"ব্রহ্মচারিণী"। আনন্দময়ীর মত মহিলা যাঁহার আপন বৈধব্য সংসারকে পরিত্যাগ করিয়া কাশীবাসী হইতে চলিয়াছেন, প্রেমানন্দ

তাঁহাকে ডাক দিয়াছেন মায়ের সেবায়—তিনিই তাঁহার 'ব্রহ্মচারিণী'। ফলে লাঞ্ছিতা-বঞ্চিতা বিধবারা জীবনে বাঁচার অর্থ খুঁজিয়া পায়—'ব্রহ্মচারিণী'-র আদর্শের জাদুস্পর্শে। বলা-বাহুল্য, মুকুন্দদাসের কন্যা 'সুলভা'-ও প্রথম জীবনে 'ব্রহ্মচারিণী'-র আদর্শে নিজেকে পরিচালিত করেন।

সংগীতের যে দুইটি ভাগ প্রধানত প্রচলিত, তাহার মধ্যে একটি রাগ-সংগীত, অপরটি প্রবন্ধ সংগীত। রাগ-সংগীত প্রাচীনকালের মত বর্তমান কালেও উচ্চাঙ্গ-সংগীত এবং প্রবন্ধ-সংগীত হইতেছে—দেশ প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের গান, যাহা অনেক সময় স্থান বিশেষে ও অবস্থা বিশেষে "লোক-গীতি" নামে পরিচিত, কিন্তু মোটের উপর রাগ-সংগীত ও প্রবন্ধ-সঙ্গীতকে 'দেশীয় সংগীত' নামে অভিহিত করা যায়। মুকুন্দদাসেব গানগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, রাগ সংগীতের চেয়ে প্রবন্ধ সংগীতেব সংখ্যা বেশী। কাবণ প্রবন্ধ-সংগীতের সঙ্গে আছে বক্তৃতা, আবৃত্তি ও সংলাপ। মুকুন্দদাসের সব যাত্রা-গানেই ইহার প্রভাব দেখা যায়—"ব্রহ্মচারিণী" ও "কর্মক্ষেত্র" পালাগানে ইহার প্রাধান্য বেশী পরিলক্ষিত হয়। "ব্রহ্মচারিণী" যাত্রাগানে ২৪টি গীত সংযোজন করা হইয়াছে এবং পূর্বোক্ত যাত্রাগুলির মত মাতৃবন্দনায় আরম্ভ ও শেষ।

মুকুন্দদাস প্রথমে গুরু রামানন্দ কর্তৃক কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হন। তাঁহার কুলদেবতা—"রাধা-গোবিন্দ"। কিন্তু তিনি জন্মাবধি 'মা' 'মা', বলিয়া কালী-মাতার আরাধনা করিয়াছেন। তাহার অনেক গানেই মায়ের নামেরই জয় ঘোষণা করা হইয়াছে। "ব্রহ্মচারিণী" পালাগানে ২৪টি সংগীতের মধ্যে ৯টি সংগীত মাতৃবন্দনামূলক। কর্মজীবনে মুকুন্দদাস ব্রহ্মচারিণী সরোজিনী দেবীর নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন। ইনি "আনন্দময়ী দেবী" নামে খ্যাত। মুকুন্দদাস যে আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার ভিতরে কালীমন্দির তৈরি করিয়া কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার ইষ্ট-দেবীর নামানুসারে কালীবাড়ির নাম রাখা হইয়াছিল। বেশ কিছুদিন যাবৎ ইহা ভগ্ন অবস্থায় ছিল বর্তমানে ইহার সংস্কার চলিতেছে, এই আনন্দময়ী দেবীর পরিকল্পিত আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া মুকুন্দদাস "ব্রহ্মচারিণী" পালাগান রচনা করিয়াছিলেন। "মাতৃপূজা", "ব্রহ্মচারিণী" ইত্যাদি যাত্রাভিনয়ে কালীমাহাত্ম্য জ্ঞাপক গীতগুলি ও অন্যান্য ভজন সংগীতগুলি রাগাত্মিকা পর্যায়ের অন্তর্গত। যথা, ব্রহ্মচারীগণ গাহিয়াছেন—

"জাগরে জাগরে ডাকরে ডাকরে
মাতরে মায়ের নাম গানে,

প্রেমানন্দময়ী প্রেমানন্দদানে,

তুষিবেন আপন সন্তানে।

ঘুচিবে আঁধার পড়বি আলোকে,

নাচিবে ভারত নাচিবে পুলকে,

আবার ফুটিবে পারিজাত মল্লিকে

ভারত-নন্দন-কাননে।”

এই ‘ভারত-নন্দন-কাননের সেরা ফুল-সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁহার রচিত “আনন্দমঠে’র ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া মুকুন্দদাস এক শ্রেণী সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীর প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন, “ব্রহ্মচারিণী” সেই প্রয়োজনের ফসল।

কর্মক্ষেত্র

চারণকবি মুকুন্দদাসের সমাজচেতনার আর একটি বলিষ্ঠ রূপায়ণ—“কর্মক্ষেত্র।” ‘মায়ের শ্রীচরণতরী ভরসা’ করিয়া তিনি কর্মক্ষেত্রে দেহতরী ভাসাইয়াছেন। প্রস্তাবনায় তাই তিনি বলিয়াছেন—

“মা মা বলে ডাক দেখি ভাই

ডাক দেখি ভাই সবে রে।

মা-মা বলে কাঁদলে ছেলে,

মা কি পারে রইতে রে।”

‘মা মা’ বলিয়া ডাকিলে কর্মযোগের মাধ্যমে মায়ের সাড়া মিলবে এবং তখন—

“তরুণ অরুণ কিরণে প্রকৃতি

সেজেছে নূতন করিয়া,

প্রভাতী গাইছে পঞ্চম রাগে,

জাগরণ-গীতি পাপিয়া।”

—সপ্তম দৃশ্যে পরিসমাপ্ত ‘কর্মক্ষেত্র’ পালাগানের ইহাই মূল বক্তব্য। এখানে ২৪টি গীতের সন্নিবেশ হইয়াছে, তন্মধ্যে ১০টি রাগ সংগীত এবং ১৪টি প্রবন্ধ সংগীত। সংগীতগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব যে, ভাষাই সুরকে

চালিত করিয়াছে। দরাজ গলায় আসর উপযোগী যে সুরেই মুকুন্দদাস গানগুলি গাহিয়াছেন, তাহা যেন ঐ গানের একমাত্র সুর বলিয়া মনে হইয়াছে, যন্ত্রসংগীত কণ্ঠসংগীতের আবেগে ও উত্তেজনায় ডুবিয়া গিয়াছে। এইখানেই মুকুন্দদাস অনন্য!

"কর্মক্ষেত্র"-পালাগানে আছে জমিদার নন্দলালের শহর প্রীতি ও নূতন বি. এল. পাস করা ছেলে সুরেশের শহুর জীবনের মোহ এবং তাঁহাদের এই মোহভঙ্গের পরিণতি। ইহারই পাশাপাশি আছে "বাউল"-এর ভূমিকায় চারণকবির দেশগঠনে নারীজাতির প্রতি আহ্বান—

"ছেড়ে দাও রেশমী চুড়ি বঙ্গনারী
কভু হাতে আর পরো না,
জাগো গো ও জননী ও ভগিনী,
মোহের ঘুমে আর থেকো না।"

আসরের শেষে দেখা যাইত—'চিকের আড়ালে রাশীকৃত রেশমী চুড়ি মা বোনেরা ভাঙিয়া ফেলিয়াছেন। এমনি শক্তি ছিল মুকুন্দদাসের যাত্রাগানে—যাহা কোন লেখক লেখার মাধ্যমে, কোন বক্তা বক্তৃতার মাধ্যমে, এমন কি কোন গায়ক গানের মাধ্যমে এইরকম উন্মাদনা সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্বদেশী যাত্রাগানের ধারা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলা যাইতে পারে। ১৯২১ খৃঃ—মহাত্মা গান্ধীর পরিচালনায় আন্দোলনের ঢেউ আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপী বিস্তৃত। মুকুন্দদাস-ও জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকেই এই আন্দোলনে ডাক দিলেন –

"করমেরই যুগ এসেছে, সবাই কাজে লেগে গেছে.
মোরাই শুধু রব কি শয়ান।
চিরদিন রব নীচে, চলব সবার পিছে পিছে
সহিব শত অপমান।"

অতএব—

"পণ করে সব লাগ রে কাজে,
খাটব মোরা দিন কি রাত,
(এই) বাংলা যখন পরের হাতে
কিসের মান আর কিসের জাত॥"

—মুকুন্দদাস ছিলেন অত্যন্ত বাস্তববাদী মানুষ এবং সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি। যাঁহারা শুধু সাহিত্যের নামে বেসাতী করেন, ভঙ্গি দিয়া চোখ ভুলান এবং

নকল নেতা সাজিয়া 'কাজ করো, কাজ করো' বলিয়া বক্তৃতা দেন ; তাঁহাদের প্রতি মুকুন্দদাসের বিদ্রূপূর্ণ উক্তি—"ও বক্তৃতা এখন তোমরা কিছুদিন করো না। তাদের পেটের জোগাড় করে কাজের কথা বলো, দেখবে কাজের লোক কত পাও।" তাই সব কিছু পরিকল্পনা করিবার আগেই তিনি বলিতেন

"সকল কাজের মিলবে সময়,
আগে দুটি ভাতের জোগাড় কর,
তোরা পেটের জোগাড় কর।"

এই 'পেটের জোগাড়' করিবার জন্য তিনি ঘরে ঘরে চরকার 'কর্মক্ষেত্র' তৈরি করিতে বলেন –

"চরকা আমার পিতামাতা
চরকা বন্ধু সখা,
চরকায় ভাত কাপড় পরি,
জোড়ায় জোড়ায় শাখা,
চরকা প্রাণের সখা ॥
হাতের কঙ্কণ নাকের বেসর,
পরি ঢাকাই শাড়ী,
সুতো কেটে পরেছি এবার
হাতির দাঁতের চুড়ী,
চরকা আর কি ছাড়ি ॥"

একদিন 'জোড়ায় জোড়ায় শাঁখা', 'ঢাকাই শাড়ী' আর 'হাতির দাঁতের চুড়া'—চরকার কল্যাণে আমায় বাংলার ঘরে ঘরে চরকার গান শোনা গিয়াছে। চরকাই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতীক এবং অন্যতম কুটীর শিল্প। এই শিল্পের উন্নতি—জাতির উন্নতি, এই শিল্পের মাহাত্ম্য জ্ঞাপক গান —স্বদেশী গান। এই গানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—মুকুন্দদাস। "যাত্রাগানের ভিতর দিয়া দেশাত্মবোধের বাণী তিনি বাংলার দূরতম পল্লী অঞ্চল পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়াছেন। কেবল রাজনৈতিক মুক্তি সংগ্রামই তাঁহার যাত্রা রচনার বিষয় ছিল না, সমাজ সংস্কারও তাঁহার লক্ষ্য ছিল" (বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, ডঃ আশুতোষ ভট্যাচার্য্য)। স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর মুক্তিযুদ্ধে এই সর্বত্যাগী সমর্পিত সন্ন্যাসী তাঁহার বলিষ্ঠ সংগঠন, আর জ্বালাময়ী সুরধারায় যে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যে অনন্যপূর্ব

বৈশিষ্ট্যে প্রতিটি হতাশ দেশপ্রেমিকের বুকে জাগরণের আশা জাগাইয়াছিলেন—আমরা বাঙালী কালের গতিতে সেই বীর সেনানীকে বিস্মৃতির অতল গর্ভে হারাইয়া ফেলিয়াছি। ইহা আমাদের গৌরব নয়—ইহা আমাদের লজ্জা, দেশের লজ্জা, আগামী দিনের মানুষের নিকট অবহেলার লজ্জা। এই লজ্জার হাত হইতে আমরা সেইদিন মুক্তি পাইব, যেদিন মুকুন্দদাসের প্রদর্শিত পথে 'চাষার লাগি কাঁদিবে প্রাণ'।

মুকুন্দদাস শুধু প্রচারক ছিলেন না, নির্ভীক সমালোচকও ছিলেন। সভ্যতার প্রদীপ যাহাদের হাতে তাহাদের কথা কেহ জানে না, সংবাদপত্রেও তাহাদের কথা বড় একটা দেখা যায় না; দুঃখে ইহাদের জীবনগড়া এবং দুঃখে ইহাদের জীবন শেষ—উপরতলায় যাঁহারা থাকে তাহাদের কথাই সংবাদ-পত্রের মাধ্যমে সবাই জানে। এই বিষয়ে মুকুন্দদাসের কণ্ঠে তীব্র শ্লেষাত্মক গান, আজিও 'এডিটরদে'র কানে বাজে—

"এডিটর খোঁজ রাখে ক'জনার
আমরা ত্রিশ কোটি মায়ের ছেলে,
নাম ছাপে সে দু'-চার জনার।"

এমন শ্লেষাত্মক কণ্ঠও আবার আবেগও বিগলিত হইত, কাতরতায় আকুল হইত—

"স্বরাজ সেদিন মিলবে যেদিন
চাষার লাগিয়া কাঁদিবে প্রাণ,
তাঁদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়ে
সপ্তমে তোরা তুলিবি তান।"

মুকুন্দদাস মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন—"জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে, সে জাতির নাম মানুষ জাতি। তাই গিল্টিকরা চাকচিক্যময় সভ্যতায় যাঁহারা লালিত-পালিত, তাহাদের চেয়েও 'ও-পারের প্রাঙ্গণের ধারে' যাহারা আছে—তাহাদের সম্মানে যে জাতির সম্মান তাহা তিনি গানের মাধ্যমে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

"ভাইরে, ধন্য দেশের চাষা!
এদের চরণধূলি পড়লে মাথায় প্রাণ হয়ে যায় খাসা।
এরা কপটতার ধার ধারে না, সত্য ছাড়া মিথ্যা কয় না।
প্রাণের কথা গুছিয়ে বলার নাইকো এদের ভাষা।"

'এই প্রাণের কথা গুছিয়ে বলার' জন্য মুকুন্দদাসের আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল

এবং এইখানেই তাঁহার যাত্রা ও গানের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা। দেশকে হৃদয়ের খুব কাছে টানিয়া তাহার দুঃখ-দুর্দশা দূর করিবার জন্য ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে—ইহাই কবির সহজ সরল আন্তরিক সঙ্কল্প। কোনরূপ ভাবালুতা, কোনরূপ বাগাড়ম্বর, কোনরূপ উচ্ছ্বাসপ্রবণতা নাই, আছে শুধু বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং ঐকান্তিক অনুভূতি। তাই গানটি সংবেদনশীল মনে যথেষ্ট প্রভাব সঞ্চার করে।

পরিশেষে বলিব, দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিবার জন্য মুকুন্দদাস যে সব যাত্রা ও গান রচনা করিয়াছিলেন; তাহাতেই আজকাল অনেকেই তাঁহাকে "চারণকবি" বলিয়া অভিহিত করেন। কিন্তু ইহাই তাঁহার একমাত্র পরিচয় নয়, তিনি ছিলেন একজন চিন্তাশীল সমাজতাত্ত্বিক—যিনি বাংলার জনজীবনের বিচিত্র মানসিক প্রবণতাগুলি অত্যন্ত যত্ন করে লক্ষ্য করিয়াছেন এবং বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি যুগের প্রয়োজনে "চারণকবি" নন—ভবিষ্যৎ বাংলার রূপরেখার দিশারী, একক অপ্রতিদ্বন্দ্বী চারণ সম্রাট !

।। মুকুন্দদাসের যাত্রা গ্রন্থাবলী ।।

"বসুমতী সাহিত্য মন্দির" কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী" নামে যে গ্রন্থ প্রকাশিত আছে, তাহাতে চারণ-কবি মুকুন্দদাসের "সমাজ", "পপল্লীসেবা", "ব্রহ্মচারিণী" এবং "কর্মক্ষেত্র"—এই চারিটি যাত্রাগানের পরিচয় পাওয়া যায়। মুকুন্দদাসের প্রথম যাত্রা গ্রন্থ "মাতৃপূজা"র পাণ্ডুলিপি ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করায় তাহা প্রকাশের সুযোগ পায় নাই। কিন্তু তাঁহার "পথ" যাত্রাটি প্রকাশিত হইলেও আজ আর তাহা পাওয়া যায় না। ভবিষ্যতে কোন সহৃদয় ব্যক্তি বা সংস্থার মারফৎ মকুন্দদাসের অপ্রকাশিত বা লুপ্তপ্রায় যাত্রা ও গান পাইলে, তাহা প্রকাশের ইচ্ছা আমাদের রহিল। বর্তমানে "চারণ-কবি মুকুন্দদাস" গ্রন্থের পরিপূর্ণতার জন্য বসুমতী কতৃক প্রকাশিত উপরোক্ত চারিটি যাত্রাগান প্রকাশিত হইল। ইহার জন্য আমরা 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির"-এর কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞ ও ঋণী।

স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে মকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রার প্রভাব অপরিসীম। "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী" বলিতে এই স্বদেশীযাত্রার সংকলন বুঝাইবে। যাত্রাগুলি বর্তমানে আর প্রকাশিত হয় না। তাই এই সংকলনটি একদিকে যেমন গ্রন্থের গৌরববৃদ্ধি করিবে, অপরদিকে তেমনি মকুন্দদাসের যাত্রার সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত হইবার সুযোগ দিবে। তাহা ছাড়া স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে মুকুন্দদাসের স্থান ও মান নির্ণয়ে এই সংকলনটি বিশেষভাবে সাহায্য করিবে। আমরা উৎসাহী পাঠক ও অনুরাগী যাত্রামোদী-দের কথা চিন্তা করিয়া প্রথমে "মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রা"র সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া পরে যাত্রাগুলি সাজাইলাম। আশা করি আমাদের এই প্রচেষ্টা সুধী-সমাজে স্বীকৃতি লাভ করিবে।

॥ মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রা ॥

স্বদেশী যুগের অমর কবি—চারণ-কবি মুকুন্দদাস। তাঁহার স্বদেশী যাত্রা ও গান স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তিনি শুধু

কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন অভিনেতা, নাট্যকার, সুগায়ক এবং সুবক্তা। আসর বুঝিয়া গান করিতে বা বক্তৃতা দিতে তাঁহার সমকক্ষ সে যুগে বড় একটা কেহই ছিলেন না। সাধারণত সাহিত্যিক, রাজনীতিক, নাট্যকার ও গীতিকার বলিতে যাহা বুঝায়, মুকুন্দদাসকে সেইরূপ বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না। তাঁহার যাত্রা ও গান তাঁহাকে যত বড় করিয়াছিল, তিনি ছিলেন তাহার চেয়েও বড়। স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় তাঁহার আবির্ভাব ও সার্থকতা এবং সে যুগের যাত্রা আন্দোলনের ইতিহাসে তিনি ছিলেন —একক অপ্রতিদ্বন্দ্বী চারণ-সম্রাট।

বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। তাহার অতীত ইতিহাস বহু গৌরবময় অধ্যায়ে লিখিত হইলেও আজ তাহা স্মৃতি-চারণায় পর্যবসিত হইয়াছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এপার বাংলা ও ওপার বাংলায় যাঁহারা চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন চারণ-কবি মুকুন্দদাস তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। "বণিকের মানদণ্ড" যখন "রাজদণ্ড"-রূপে দেখা দিল, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যখন ব্রিটিশের সিংহাসন কম্পিত হইয়া উঠিল; যখন ব্রিটিশের 'settled fact'-কে 'unsettled' করিবার জন্য হাজার হাজার বাঙালী মরণজয়ী সংগ্রামে মাতিয়া উঠিল —তখন মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের উৎসাহে-প্রেরণায় এবং হেমকবির সাহচর্যে মুকুন্দদাস স্বদেশী যাত্রা ও গানের মাধ্যমে এই আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনে রূপ দিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন মানবপ্রেমিক এবং মানবধর্মের প্রচারক। তাঁহার সব কাজের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল —মনুষ্যত্বের জাগরণ। তাই তিনি বলিয়াছিলেন —শুধু নীরস বক্তৃতায় নয়, ঘুমন্ত ও অধঃপতিত জাতিকে দেহে-মনে-প্রাণে সুস্থ, সবল ও প্রকৃতিস্থ করিয়া তুলিতে হইলে চাই স্বদেশী গান ও যাত্রা। তাঁহার "মাতৃপূজা", "পথ", "সাথী", "সমাজ", "পল্লীসেবা", "ব্রহ্মচারিণী", "কর্মক্ষেত্র" প্রভৃতি নাটকগুলি সেই উদ্দেশ্যেই লিখিত হওয়ায় অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই সব নাটকে তিনি—Collective Farming. Co-operatve Banking, Cottage Industry, বিদেশী দ্রব্য বর্জন, শারীরিক শক্তি অর্জন ইত্যাদি বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাব ছিল প্রতি পাঁচখানা গ্রাম লইয়া হইবে এক একটি মৌজা, প্রতি মৌজায় থাকিবে আমানতী ব্যাঙ্ক—এবং সেই ব্যাঙ্কের সাহায্যে ও মাধ্যমে এই পাঁচখানি গ্রামে চলিবে যৌথভাবে চাষ, কারবার ও কুটীরশিল্প। বর্তমানে গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ পরিকল্পনার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে এইগুলি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় নিঃসন্দেহে বলা যায়

যে, আধুনিক সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন—চারণ-কবি মুকুন্দদাস।

মুকুন্দদাস ছিলেন অত্যন্ত বাস্তববাদী মানুষ এবং সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি। যাঁহারা শুধু সাহিত্যের নামে বেসাতী করেন, ভঙ্গি দিয়া চোখ ভুলান এবং নকল নেতা সাজিয়া "কাজ করো; কাজ করো" বলিয়া গগনভেদী চিৎকার করেন ও বক্তৃতা দেন; তাহাদের প্রতি মুকুন্দদাসের বিদ্রূপপূর্ণ উক্তি—"ও বক্তৃতা এখন তোমরা কিছুদিন করো না। তাদের পেটের জোগাড় করে কাজের কথা বলো; দেখবে তোমরা কাজের লোক কত পাও।" বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী "শার্ঙ্গদেব" মহাশয় বলেন—"মুকুন্দদাস তাঁর অভিনয়ে একজন উপদেষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। সেটা তাঁর নির্দিষ্ট পার্ট হলেও সেটা ছিল নামে মাত্র। সেই ভূমিকাটুকুকে অবলম্বন করে নানা প্রসঙ্গে তিনি মর্মস্পর্শী বক্তৃতা এবং গান করে যেতেন। বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রোতাকে আহ্বান করে তিনি তাদের নানা ত্রুটির কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন, উন্নতির জন্য আবেদন করতেন, তাদের জাতীয়তাবোধ এবং সমাজ-চেতনা উদ্দীপ্ত করতে চেষ্টা করতেন। তারপরে আবার ফিরে আসতেন তাঁর ভূমিকায়। তাঁর অভিনয়গুলিতে প্রত্যেকটি চরিত্র ছিল সমাজের এক একটি বিশেষ রূপের প্রতীক। আমাদের সমাজের প্রায় প্রতিটি 'ভিলেন'কেই তিনি তাঁর অভিনয়ে নিপুণভাবে রূপায়িত করেছেন। এই নৈপুণ্য এবং যথাযথ চরিত্র বিশ্লেষণের জন্য শ্রোতাদের উপর তাঁর প্রভাব যে কি বিরাট ছিল, তা না প্রত্যক্ষ করলে ধারণা করা যায় না।" এই অর্থেই মুকুন্দদাস চারণ-কবি এবং অগ্নিযুগের অন্যতম ঋত্বিক।

মুকুন্দদাস ছিলেন মনে-প্রাণে চারণ-কবি। স্বামীজীর "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরাণ নিবোধত" অভিমন্ত্রের অগ্নিশুদ্ধ সাধক ও চারণ এবং মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত "আনন্দমঠের" সন্ন্যাসী। পরনে গৈরিক আলখাল্লা, কোমরে দৃঢ়বদ্ধ গৈরিক উত্তরীয়, বুকে অসংখ মেডেল এবং মাথায় পাগড়ী—ঠিক যেন স্বামী বিবেকানন্দের পোশাক আর "কপাট বিশাল বুক, জিনি ইন্দীবর মুখ।" মাঝবয়সী বয়স, বাবরীচুল এবং সুপুষ্ট গোঁফ—সব কিছু মিলিয়া যেন একটি বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সর্বত্র বিরাজ করিত। সুসজ্জিত আসরে, উৎকণ্ঠিত শ্রোতাদের মাঝখানে যখন তিনি গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিতেন—

"আয় মা তারিণী করালবদনী
ডাকিনী যোগিনী সব নিয়ে আয়।

শ্মশানবাসিনী শ্মশানরঙ্গিনী
ভারতশ্মশানে নাচবি গো আয়।"

—তখন পরিপূর্ণ আসরে বিদ্যুৎ চমকের মত শিহরণ খেলিয়া যাইত এবং এক স্বর্গীয় আবেশে শান্ত সমাহিত হইয়া যেন শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁহার বক্তৃতা ও গান শুনিত ও অভিনয় দেখিত। প্রচারকের এমন ব্যক্তিত্ব ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নাই, ভবিষ্যতেও দেখা যাইবে কিনা সন্দেহ। মুকুন্দদাস নিজেই নিজের তুলনীয়, তাঁহার কোন বিকল্প নাই।

মুকুন্দদাস ছিলেন সংগ্রামী, কষ্টসহিষ্ণু ও বাস্তববাদী দেশপ্রেমিক। তিনি তাঁহার স্বদেশী-যাত্রা ও গানে দেশকে ও জাতিকে স্বাবলম্বী হইবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন। তাই সব কিছু পরিকল্পনা করিবার আগেই তিনি বলিতেন—

"সকল কাজের মিলবে সময়,
আগে দুটি ভাতের জোগাড় কর,
তোরা পেটের জোগাড় কর॥"

কর্মের মাধ্যমেই কর্মীর পরিচয় পাওয়া যায়—বক্তৃতার দ্বারা নয়। তাই পল্লীসেবা যে ভারত সেবা, দরিদ্র সেবাই যে নারায়ণ সেবা, সমাজসেবাই যে দেশসেবা—মুকুন্দদাস তাঁহার কম্বুকণ্ঠে সেই আহ্বানেরই ডাক দিয়াছিলেন—

"তোরা সবাই কোদাল ধর—
দেশ থেকে তাড়াতে হবে ম্যালেরিয়া জ্বর;
মাথা গুঁজে ভাবলে বসে হবে না দেশের কল্যাণ
কোমর বেঁধে হতে হবে সবায় আগুয়ান।"

জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে তিনি সম্মিলিতভাবে কাজ করিবার আহ্বান জানাইয়াছিলেন—

"করমেরই যুগ এসেছে, সবাই কাজে লেগে গেছে,
মোরাই শুধু রব কি শয়ান।
চিরদিন রব নীচে, চলব সবার পিছে পিছে
সহিব শত অপমান॥"

অতএব—

"পণ করে সব লাগ রে কাজে,
খাটব মোরা দিন কি রাত,
(এই) বাংলা যখন পরের হাতে
কিসের মান আর কিসের জাত॥"

সামাজিক অসাম্য জাতিভেদ, ভণ্ডামি, বঞ্চনা ও মূঢ়তার বিরুদ্ধে ছিল তাঁহার বিদ্রোহ—

"ছল চাতুরী কপটতা মেকি মাল
আর চলবে ক'দিন?
হাড়ি মুচির চোখ খুলেছে
দেশের কি আর আছে সেদিন॥"

দেশের গণদেবতা আজ জাগিয়াছে, তাই ছুঁৎমার্গগামী সমাজ ভয়ে কম্পিত, শঙ্কিত ও ইহাদের দ্বারা নিন্দিত। মুকুন্দদাস বিশ্বাস করিতেন—"জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে, সে জাতির নাম মানুষ জাতি।" তাই তিনি বলিলেন—

"জাতের নামে বজ্জাতি সব, জাত-জালিয়াৎ খেলছ জুয়া।
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয় ত মোয়া॥"

জাতিকে ও দেশকে সামাজিক কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠিয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে এবং সামাজিক গণ্ডী ভাঙ্গিয়া দিয়া তাঁতী জোলা প্রভৃতিকে কোলে তুলিয়া লইতে হইবে, ইহাই ছিল মুকুন্দদাসের প্রাণের কথা—

"ডেকে নে তাঁতী জোলা
ছাড়িয়ে নেংটি তিলক ঝোলা,
খুলে দে তাঁতের মেলা প্রতি ঘর ঘর।
কামার কুমার চামার মুচি
তারাই কাজের, তারাই শুচি
ধর জড়িয়ে গলা তাদের
ভুলে আপন পর॥"

মুকুন্দদাস শুধু প্রচারক ছিলেন না, সমাজ-সংস্কারক রূপে তাঁহার পরোক্ষ ভূমিকা বিশেষ লক্ষণীয়—

"সাধে কি আর হচ্ছ রাজী,
তোমায় রাজী করেছে।
সেদিনই জানি ধরবে চরকা
তোমার গিন্নী যেদিন ধরেছে॥"

আবার "কর্মক্ষেত্র" অভিনয়ে "এডিটর"দের লইয়া তীব্র শ্লেষাত্মক গান আজও যেন "এডিটর"দের কানে বাজে—

"এডিটর খোঁজ রাখে ক'জনার।
আমরা ত্রিশ কোটি মায়ের ছেলে,
নাম ছাপে সে দু'চার জনার।"

বর্তমান যুগে শিক্ষিত বেকার-সমস্যা সকল সমস্যার ঊর্ধ্বে। এই সমস্যার সমাধান না হইলে সমাজের কোন সমস্যারই সমাধান হইবে না। অথচ এই বেকার-সমস্যা এত তীব্র আকারে দেখা দিবার মূলে আছে চাকুরিহীন জীবন অভিশপ্ত ভাবা এবং কায়িক শ্রমের প্রতি অশ্রদ্ধা ভাব পোষণ করা। মুকুন্দদাস তাই বলেন

"ওরে বি-এ, এম-এ, পাশ করে
নোকরী যদি নাহি মিলে,
ভাবনা কেন কিসের ভয় মিশে যাও না
চাষার দলে।
খেটে পরে খামার কর, শক্ত করে লাঙ্গল ধর,
দু'দিন পরে দেখতে পাবি,
ঘুচে গেছে হাহাকার।"

কৃষিপ্রধান এই বাংলাদেশ। এখানে প্রায় শতকরা আশি জনই কৃষির উপর নির্ভরশীল। অথচ এই কৃষিকার্যই সমাজে তেমন আদর পায় না এবং কৃষক-সমাজ অবহেলিত, নিন্দিত ও ঘৃণিত অবস্থায় কালাতিপাত করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায় ইহারা সভ্যতার প্রদীপ। মাথায় করিয়া প্রদীপটি ধরিয়া রাখিয়াছে। প্রদীপের তলায় থাকে অন্ধকার, ইহারা অন্ধকারের জীব। আর উপরতলায় যারা থাকে তারা পায় শুধু আলো। মুকুন্দদাস ইহাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়া আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—

"ভাই রে, বঙ্গ দেশের চাষা।
এদের চরণধূলি পড়লে মাথায়
প্রাণ হয়ে যায় খাসা॥
অন্ধ তোরা চিনলি না রে এই দেশের
এই চাষা,
যারা প্রাণ দিয়েও দেশকে বাচায়
একই স্বর্গ যাদের আশা।"

মুকুন্দদাস "সবার পিছে সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে" যাহারা আছে

তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন এবং সমাজে দুষ্টক্ষতের মত যে অচ্ছুৎপ্রথা বাঁচিয়া আছে তাহার বিরুদ্ধে, মানবতার কাছে, মানুষের কাছে আবেদন জানাইযাছেন—

"দেখলেম ভাই জাতিকুল বিচারে,
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয, বৈশ্য, শূদ্র, হিন্দু, মুসলমান,
কালেতে ছাড়ে না কারে ॥
যতক্ষণ রাস্তার উপরে, ততক্ষণ জাতবিচারে,
খেয়া ঘাটে গেলে পরে, এক নৌকায সবে চড়ে ॥"

এই প্রসঙ্গে মুকুন্দদাস কোনরূপ আপোস মীমাংসার পথে যান নাই, তিনি দৃপ্তকণ্ঠে গানের মাধ্যমে, অভিনয়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত জানাইযাছেন -

"আমরা বিচার করে চলবো না
মান-অভিমান রাখবো না
ধনী কি দীন বাছবো না।
হিন্দু-পার্শী-জৈন-সাঁই
মুচি-মেথর, ডোম-কসাই
আমরা সকলে এক মাযের ছেলে,
এই মহামন্ত্র ভুলবো না।"

এপার বাংলা ও ওপার বাংলার মুক্তি-সংগ্রামের অবসান ঘটিযাছে। কিন্তু মুক্তি-সংগ্রামের অবসান ঘটিলেও জাতীয় সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। এখন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে। ইহার জন্য চাই সাম্প্রদাযিক প্রীতি ও ভালবাসা। কেননা, সাম্প্রদায়িকতার বিষ জাতিকে ও দেশকে কি সর্বনাশা পথে চালিত করে তাহা আমরা দীর্ঘদিন পরাধীন থাকিয়া জীবন দিয়া উপলব্ধি করিয়াছি। আবার স্বাধীনতালাভের পরেও সেই অশুভ শক্তির হাত হইতে রেহাই পাই নাই। মুকুন্দদাস সারাজীবন এই মহামিলনের গান গাহিয়াছেন। তাহার স্বদেশী যাত্রা ও গান এই মহামিলনের মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়াছে।

"রাম রহিম না জুদা কর ভাই
মনটা খাঁটি রাখ জী ;
দেশের কথাটা ভাব ভাই রে,
দেশ আমাদের মাতাজী।

স্থিতি এবং সামাজিক উন্নতি ছাড়াও ঐতিহাসিক, আধ্যাত্মিক, ধর্মনৈতিক ও অলৌকিক ঘটনামূলক গানের সমাবেশ দেখা যায়। শ্যাম-শ্যামার মাহাত্ম্য-সূচক সংগীত যেমন আছে, তেমনি আছে বাউল সংগীত, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল গীতি, সাধন গীতি ও বিভিন্ন কবির রচিত দেশাত্মমূলক গান। 'এক অঙ্গে এত রূপে'-র সমাবেশ বড় একটা দেখা যায় না। এইখানেই মুকুন্দদাসের গানের বৈশিষ্ট্য।

মুকুন্দদাসের সংগৃহীত প্রতিটি গানের উৎস-নির্দেশ

অ

১। অগ্নিময়ী মায়ের ছেলে—দাস, গী—৩৮, পৃ—৩০।

২। অতীত গিয়াছে অতীতে মিলায়ে—দাস, গী—২৬, পৃ—২০-২১।

বসুমতী, "ব্রহ্মচারিণী", পৃ—৩১।

৩। অমল আনন্দে নাচ বীব ছন্দে—দাস, গী—৬৫, পৃ—৫২।

আ

৪। আপন চেনা কঠিন ভবে—দাস, গী—৭২, পৃ—৫৮।

৫। আপন নিয়ে থাকলে পরে—বসুমতী, "পল্লীসেবা", পৃ—১১।

৬। আবার যখন গান ধরেছি—দাস, গী—১২, পৃ—৯।

বসুমতী, "ব্রহ্মচারিণী", পৃ—১৩-১৪।

৭। আমরা কেন ভোগে ভুলিব—বসুমতী, "ব্রহ্মচাবিণী", পৃ—২৩-২৪।

৮। আমরা নেহাৎ গবীব—বসুমতী, "পল্লীসেবা", পৃ—৪৮।

৯। আমরা বিচাব করে চলব না—দাস, গী—৬৯, পৃ—৫৫-৫৬।

১০। আমরা মানুষ হতে চাই—বসুমতী, "পল্লীসেবা", পৃ—৩৬-৩৭।

*১১। আমার বাঁধন ছাড়া প্রাণ—মনো, গী—৬, পৃ—২২৯।

১২। আমাব ভিতর আসল আমি—বসুমতী, "পল্লীসেবা", পৃ—৩৬।

১৩। আমি এক ধর্ম অনুরাগী—চট্টো, গী—১২, পৃ—৬-৭।

গুপ্ত, গী— ০, পৃ—৬-৭।

১৪। আমি গাইব কি আব শুনবে কে বে—গুপ্ত, গী—৫, পৃ—৪।

চট্টো, গী—৫, পৃ—৩।

১৫। আমি গান করিতাম গাইতে দিলে গান—দাস, গী—৬০, পৃ—০৭-৪৮।

১৬। আমি দশ হাজার প্রাণ যদি পেতাম—দাস, গী—৭৩, পৃ—৫৮-৫৯।

১৭। আমি যাঁরে চাই তাঁরে কোথা পাই—দাস, গী—৮, পৃ—৫-৬।

বসুমতী, "সমাজ", পৃ—৫-৬

১৮। আর কারে করি ভয়—দাস, গী—`৪, পৃ—১৯।

এ

ক

৩৪। করমেরই যুগ এসেছে—দাস, গী—১৯, পৃ—১৫।
চট্টো, গী—২২, পৃ—১২-১৩।
বসুমতী, "কর্মক্ষেত্র", পৃ—৩০-৩১।
গুপ্ত, গী—২৩, পৃ—১৩-১৪।

৩৫। কার কম্বু নিনাদে জানি অমৃত বরষিল—দাস, গী—৫, পৃ—৩-৪।

৩৬। কাঁপায়ে মেদিনী কর জয়ধ্বনি—বসুমতী, "পল্লীসেবা", পৃ—৯।

৩৭। কি আনন্দধ্বনি উঠল বঙ্গভূমে—দাস, গী—৪২, পৃ—৩৩-৩৪।
বসুমতী, "কর্মক্ষেত্র", পৃ—১৬।

*৩৮। কুলকুণ্ডলিনী তুমি কে—মনো, গী—৯১, পৃ—৯ , পৃ—১৮১।

৩৯। কে ও রণরঙ্গিণী, প্রেম-তরঙ্গিণী—বসুমতী, "ব্রহ্মচারিণী", পৃ—২০।

৪০। কেতবধারী হোমরা চোমরাই—চট্টো, গী—১৩, পৃ—৭-৮।
গুপ্ত, গী—১৩, পৃ—৮।

৪১। কে যেন ঐ চাঁদের কোণে—বসুমতী, "পল্লীসেবা", পৃ—১৮।

৪২। কোন ফাগুনের হাওয়া এ যে—দাস, গী—২৩, পৃ—১৮-১৯।

**৪৩। কৃষ্ণ নাম বড়ই মধুর—সু. গুপ্ত—ডায়েরী।

গ

৪৪। *গেলে কল্পতরুমূলে—বসুমতী, "সমাজ", পৃ—৭

ঘ

৪৫। ঘোর কলিকাল যা দেখি সব উল্টা—দাস, গী—১১, পৃ—৮।
চট্টো, গী—২৭, পৃ—১৫-১৬।
বসুমতী, "ব্রহ্মচারিণী", পৃ—২৩।
গুপ্ত, গী—২৭, পৃ—১৫।

চ

৪৬। চল্ রে পল্লী ব্রজে চলে যাই—বসুমতী, "পল্লীসেবা", পৃ—৩৯।

ছ

৪৭। ছল চাতুরী কপটতা—দাস, গী—৬৬, পৃ—৫৩-৫৪। চট্টো, গী—৯, পৃ—৫। গুপ্ত, গী—১২, পৃ—৭।

৪৮। ছাত্র মনতরী গড়িয়া মাকে স্মরিয়া—দাস, গী—৫৩, পৃ ৪১—৪২।

৪৯। ছেড়ে দাও কাঁচের চুড়ি বঙ্গনারী—দাস, গী—৫৯, পৃ—৪৬-৪৭।
পাঠান্তর—বসুমতী, "কর্মক্ষেত্র", পৃ—৪৬।

জ

৫০। জাগ গো জাগ জননী, দানব দলনী—দাস, গী—৩১, পৃ—২৪।
বসুমতী, "পল্লীসেবা", পৃ—৪৬;
"কর্মক্ষেত্র", পৃ—১৮-১৯।

৫১। জাগতে হবে উঠতে হবে লাগতে হবে কাজে—দাস, গী—২৮, পৃ—২২। চট্টো, গী—২৫, পৃ— ৪-১৫। গুপ্ত, গী—২৬, পৃ—১৪-১৫। বসুমতী, "ব্রহ্মচারিণী", পৃ—২৯।

৫২। জাগ মা কুল কুণ্ডলিনী—দাস, গী—৭৫, পৃ—৬০।

৫৩। জাগ রে জাগ রে ডাক রে—বসুমতী, "ব্রহ্মচারিণী", পৃ—৫।

৫৪। জাগ রে ভাই সবে স্মরিয়া কেশবে—দাস, গী—১৮, পৃ—১৪।
চট্টো, গী—১৯ পৃ—১১।
গুপ্ত, গী—২০, পৃ—১১-১২।
বসুমতী, "ব্রহ্মচারিণী", পৃ—২৯।

৫৫। জাত সে জাতির—দাস, গী—৯, পৃ—৬।

৫৬। জ্বাল্ জ্বাল্ জ্বাল্ কামনা অনল—দাস, গী—৫১, পৃ—৪০।
বসুমতী, "ব্রহ্মচারিণী", পৃ—১১-১২।

ড

৫৭। ডাকবো কি শুনবে রে—দাস, গী—৬২, পৃ—৪৯-৫০। বসুমতী, "কর্মক্ষেত্র", পৃ—১৯-২০।

৫৮। (ডাকো) দীনে দয়া কর—বসুমতী, "ব্রহ্মচারিণী", পৃ—৩৫-৩৬।

ত

৫৯। তরুণ অরুণ কিরণে প্রকৃতি—দাস, গী—৪৭, পৃ ৩৭-৩৮। বসুমতী, —"কর্মক্ষেত্র", পৃ—৫৩

৬০। তরুণ যখন উঠেছে ক্ষেপিয়া—দাস, গী—৫৪, পৃ—৪২-৪৩।

৬১। তুমি যদি আবার বাজাতে মোহন বাঁশরী—দাস, গী—৬১,
পৃ—৪৮-৪৯।

৬২। তোদের নাম জগৎ জোড়া—দাস, গী—৪০, পৃ—৩১-৩২।

*৬৩। তোরা পাস করে হোস্ মরা—মনো, গী—৭, পৃ—১৩।

৬৪। তোরা সবে কোদাল ধর—চট্টো, গী—৮ পৃ—৪-৫।

বসুমতী, "পল্লীসেবা", পৃ—৮।

গুপ্ত, গী—৮, পৃ—৫-৬।

থ

৬৫। থাকুক আমার বিয়ে—বসুমতী, "সমাজ", পৃ—৩০।

দ

৬৬। দীন তারিণী পতিত পাবনী—বসুমতী, "পল্লীসেবা", পৃ—৩

৬৭। দুনিয়া আজব তেরা ঢং—বসুমতী, "সমাজ" পৃ—১৯-২০।

৬৮। দেশের লক্ষ্মী গেছে ছেড়ে—চট্টো, গী—১৫, পৃ,—৮-৯।

গুপ্ত, গী—১৪, পৃ—৮-৯।

ধ

৬৯। ধেৎতেরি বড দেক্ সেক্ লাগে—বসুমতী, "সমাজ", পৃ—৬

ন

*৭০। নগর চেয়ে কানন ভাল—মনো, গী—১১৫, পৃ—২২৭

৭১। নে চষে নে চষে ভুঁই—বসুমতী, "ব্রহ্মচারিণী", পৃ—২৭

প

৭২ পতিত পাবনী অধম তারিণী—দাস, গী—৭০, পৃ—৫৬-৫৭।

বসুমতী, "সমাজ", পৃ—৩১।

৭৩ পণ করে সব লাগ রে কাজে—দাস, গী—১৬, পৃ—.২।

চট্টো, গী—২, পৃ—১-২।

গুপ্ত, গী—২, পৃ—২-৩।

বসুমতী, "কর্মক্ষেত্র", পৃ—১০।

৭৪। পাঠিয়ে দে মা আনন্দময়ী—বসুমতী, "কর্মক্ষেত্র", পৃ—৩২-৩৩।

৭৫। পিরিতি করিবি, পিরিতে মজিবি—বসুমতী, "সমাজ", পৃ—৩২।

৭৬। পুঁটলী বেঁধে ঘরের কোণে—বসুমতী, "পল্লীসেবা", পৃ—২০-২১।

চট্টো, গী—১১, পৃ—৬। গুপ্ত, গী—১১—৭।

ফ

৭৭। ফুলার—আর কি দেখাও ভয়?—দাস, গী—৭৪, পৃ—৫৯।

ব

*৭৮। বন্দে জননী তব রাতুল চরণ—মনো, গী—১৭৪ পৃ—১০৬।

৭৯। বন্দেমাতরম্ বলে নাচ রে সকলে—দাস, গী—৩৪, পৃ—২৬-২৭।

৮০। বল কেমন করে কি সন্ধানে যাই—বসুমতী, "পল্লীসেবা", পৃ—১৫

৮১। বল ভাই মেতে যাই বন্দেমাতরম্—বসুমতী, "পল্লীসেবা", পৃ—৪৯।

৮২। বল শ্যামাঙ্গিনী যোগিনী সঙ্গিনী—দাস, গী—৪৬, পৃ—৩৬-৩৭।
বসুমতী, "সমাজ", পৃ—১৩।

৮৩। বান এসেছে মরা গাঙে—দাস, গী—২৯, পৃ—২৩।
পাঠান্তর—চট্টো, গী—১৬, পৃ—৯।
গুপ্ত, গী—১৯, পৃ—১০। বসুমতী, "ব্রহ্মচারিণী", পৃঃ—২৬।

৮৪। বাবু ওম্‌দা ওম্‌দা চিজ—বসুমতী, "সমাজ", পৃ—১৮।

৮৫। বাবুদের পায়ে নমস্কার—দাস, গী—৬৭, পৃ—৫৪।
চট্টো, গী—২৬, পৃ—১৫। গুপ্ত, গী—২৮, পৃ—১৫-১৬।

৮৬। বাবু বুঝবে কি আর মলে—দাস, গী—২৭, পৃ—২১-২২।

৮৭। বিরাট তুমি মহান তুমি—দাস, গী—৩৬, পৃ—২৮-২৯।

৮৮। বিশ্বপতির বিশ্ববীণায়—বসুমতী, "কর্মক্ষেত্র", পৃ—৪০।

৮৯। বিশ্ব-প্রসবিনী, ত্রিলোক পালিনী—বসুমতী, "কর্মক্ষেত্র", পৃ—২৮-২৯।

ভ

৯০। ভরসা মায়ের চরণ তরণী—দাস, গী—৭, পৃ—৫।
বসুমতী, "কর্মক্ষেত্র", পৃ—৩৯-৪০।

৯১। ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে—দাস, গী—৬, পৃ—৪।

৯২। ভাই চল্ রে চল্ রে চল্—বসুমতী, "কর্মক্ষেত্র", পৃ—৩৮।

৯৩। ভাই রে ধন্য দেশের চাষা—দাস, গী—১৪, পৃ—১০-১১।
চট্টো, গী—২৩, পৃ—১৩-১৫। গুপ্ত, গী—২২, পৃ—১২-১৩।
বসুমতী, "কর্মক্ষেত্র", পৃ—২৬।

৯৪। (ভাই রে) মাটিই খাঁটী ভবে—দাস, গী—৫২, পৃ—৪১।

৯৫। ভাই রে মানুষ নাই রে দেশে—দাস, গী—৪, পৃ—৩। চট্টো, গী—১০, পৃ—৫-৬। গুপ্ত, গী—৯, পৃ—৬।

৯৬। ভারত শ্মশান মাঝে—বসুমতী, "সমাজ", পৃ—২৫।
চন্দ্র, গী—৯, পৃ—১১।

৯৭। ভারতের ভগ্ন প্রাণগুলি—দাস, গী—১, পৃ—১।
চন্দ্র, গী—৩, পৃ—২।

৯৮। ভালবাসতে যদি হয়—বসুমতী, "সমাজ", পৃ—৩১-৩২।

ম

৯৯। মন পাগলা রে আনন্দে গুরু গুণ গাও— বসুমতী, "সমাজ", পৃ—১৭।

১০০। মা আমার বিশ্বরাণী—দাস, গী—১৫, পৃ—১১।
চট্টো, গী—১৮, পৃ—১০-১১।
গুপ্ত, গী—১৭, পৃ—১০।
বসুমতী, "ব্রহ্মচারিণী", পৃ—৮-৯।

১০১। মা একি মজার খেলা তাস—বসুমতী, "কর্মক্ষেত্র", পৃ—১৫।

১০২। মাকে ডাক দেখি—দাস, গী—৩০, পৃ—২৩।
বসুমতী, "ব্রহ্মচারিণী", পৃ— ১৫।

১০৩। মা মা বলে ডাক্ দেখি ভাই—চট্টো, গী—১, পৃ —১।
দাস, গী— ৬৪, পৃ—৫১-৫২।
বসুমতী, "কর্মক্ষেত্র", পৃ—৩।

১০৪। মানস নয়ন কবি উন্মীলন—চট্টো, গী—২১, পৃ—১২।
দাস, গী—৪৫, পৃ—৩৫-৩৬।
চন্দ্র, গী—১০, পৃ—১২-১৩।

১০৫। মায়ের ডাকে সব জেগেছে—চট্টো, গী—৮, পৃ—৪।
বসুমতী, "পল্লীসেবা", পৃ—১৩।
গুপ্ত, গী—৪, পৃ—৩-৪।

১০৬। মায়ের জাতি জাগিয়ে তোল—দাস, গী—৪৯, পৃ—৩৮-৩৯।
বসুমতী, "কর্মক্ষেত্র", পৃ—১৮।

১০৭। মায়ের নাম নিয়ে ভাসান তরী—দাস, গী—২, পৃ—১-২।
বসুমতী, "পল্লীসেবা", পৃ—২৬।

১০৮। মায়ের নাম ডঙ্কা দিয়ে—দাস, গী—৩৭, পৃ—২৯-৩০।
বসুমতী, "পল্লীসেবা", পৃ—৪।

১০৯। মায়ের নামের বাদাম উড়িয়ে—দাস, গী—৫৫, পৃ—৪৩-৪৩।
বসুমতী, "পল্লীসেবা", পৃ—৩৩।

১১০। মূর্ত করিয়া লুপ্ত গরিমা—দাস, গী—৩৯, পৃ—৩১।

১১১। মোরা ঢুকেছি যে রঙ্‌মহলে—চট্টো, গী—২৮, পৃ—১৬।
গুপ্ত, গী—২৯, পৃ—১৬।

র

১১২। রঞ্জি পূরব দিক্‌ বিভাগে—বসুমতী, 'পল্লীসেবা", পৃ—২৭-২৮।

১১৩। রাম রহিম না জুদা কর ভাই—দাস, গী—৫৬, পৃ—৪৪।
বসুমতী, "কর্মক্ষেত্র", পৃ—২৬

১১৪। রূপের হাট দেখিবি ভাই—বসুমতী, 'সমাজ", পৃ—১৫।

শ

১১৫। শ্যামা নামের ডঙ্কা বাজা রে—বসুমতী,"ব্রহ্মচারিণী", পৃ—৩৩-৩৪।

*১১৬। শ্যামা মা তোর পাগলা ছেলে—মনো, গী—২০২, পৃ—১৭০।

স

১১৭। সকল কাজের মিলবে সময়—দাস, গী—২০, পৃ—১৫-১৬।
চট্টো, গী—৬, পৃ—৩-৪। বসুমতী, "কর্মক্ষেত্র",
পৃ-২১। গুপ্ত, গী—৭, পৃ—৫।

১১৮। সময় ফিরিয়া কেবা পায়—দাস, গী—৪৮, পৃ—৩৮।
বসুমতী, "পল্লীসেবা" পৃ—২১-২২।

১১৯। সাধে কি আর হচ্ছ রাজী—বসুমতী, "পল্লীসেবা", পৃ—১৯।

*১২০। সাধে কি বলি গো পাষাণী—মনো, গী—৯৫, পৃ—১৮৯।

*১২১। সোনার ঘরে জ্বালিয়ে আগুন—মনো, গী—১ ৭, পৃ—২৩১।

১২২। স্বরাজ সেদিন মিলিবে যেদিন—দাস, গী—১০, পৃ—৭।
চট্টো, গী—১৭, পৃ—৯-১০। গুপ্ত, গী—১৫,
পৃ—৯। বসুমতী, "কর্মক্ষেত্র", পৃ—৫০।

১২৩। স্বরাজ স্বরাজ করিস তোরা—দাস, গী—৩২, পৃ—২৪-২৫।

হ

(*) তারকা চিহ্নিত গীতগুলি মুকুন্দদাসের অপ্রকাশিত গীত।

(**) দ্বি-তারকা চিহ্নিত গীতটি মুকুন্দদাসের রচিত প্রথম অপ্রকাশিত গীত।

॥ মুকুন্দদাসের যাত্রা গ্রন্থাবলী ॥

মুকুন্দদাসের যাত্রা-পরিচিতি

সমাজ

চারণকবি মুকুন্দদাসের "সমাজ" নাট্যচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বলিদান' নাটকের অনুকরণে রচিত। ইহার বিষয়বস্তু বাঙলার কৌলীন্য প্রথার মর্মান্তিক দৃশ্য ও পণপ্রথার কুফল। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা 'কামিনী মুখুয্যে' সমাজের অনুশাসনরূপে শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া কন্যা সরোজ ও নির্মলাকে যথাক্রমে মাতাল বিনোদ ও যক্ষারোগাক্রান্ত বুড়ো জামাই-এর হাতে অশ্রু সজল চোখে অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার মর্মভেদী হাহাকারে আমাদের চোখেও জল আসে—"উঃ, দুনিয়ায় টাকা কি আজব জিনিস! টাকা নেই, অথচ আমি নিজে কুলীন, একটু বংশজে নেমে যদি মেয়ের বিয়ে দিই, তা হলে কি সমাজ আমাদের দেশে রাখবেন? সমাজ বলেন, জাত যাবে, কথা উঠলেই নাক সেটকান, এদিকে যে ঘরে ঘরেই, বিপদ, তা সমাজ একবারও ভেবে দেখছেন না। ধিক্ এমন নচ্ছার সমাজে, ধিক্ আমার কুলীনত্বে।" ফলে সরোজ অচিরেই স্বামীর হৃদয়হীনতা ও শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল। আর নির্মলার প্রত্যাবর্তন ঘটিল বিধবার সাজে। অথচ এমন জামাইদের হাতে কন্যা তুলিয়া দিতেও কামিনীবাবু নিঃস্ব—চতুর্দিকের চাপে পড়িয়া তাহার কাছে মৃত্যুই একান্তভাবে কাম্য। অপরদিকে চারিত্রিক ও মানসিক ভারসাম্যও তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তাই কন্যাকে 'উনুন থেকে কিছু ছাই বেড়ে' খাইতে বলেন। গিন্নিকে (নলিনী) বলেন—"অদৃষ্টে যা আছে তা দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, গাছতলা, গিন্নি—গাছতলা।"

সমাজ ব্যবস্থার এই নির্মমতার মধ্যে 'সত্য' (অভিনয়ে মুকুন্দদাস) আসিয়াছেন দেবতার আশীর্বাদরূপে সমাজ সংস্কার করিতে। তাঁহারই প্রচেষ্টায় সমাজে বা গ্রামে 'মরানদীতে বান এসেছে', ঘুমন্ত দেশবাসী জাগিয়া উঠিয়াছে, সম্মিলিতভাবে কাজ করিবার প্রেরণা পাইয়াছে। 'সত্য'রূপী মুকুন্দদাস ক্ষুব্ধ কণ্ঠে অথচ আবেগে গাহিয়াছেন—

"মানুষ নাই এ দেশে
সকল মেকি, সকল ফাঁকি
যে যায় মজে আপন রসে।"

চতুর্বিংশ দৃশ্যে পরিসমাপ্ত এই পালাগানে সংগীতের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য মুকুন্দদাসের প্রতিটি যাত্রায় সংগীতেরই প্রাধান্য। আসরে কালীমূর্তি সামনে রাখিয়া মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত মুকুন্দদাস যাত্রারম্ভ করিতেন এবং প্রস্তাবনায় ও উপসংহারে শ্যামাসংগীত গাহিতেন। যথা, 'সমাজ' যাত্রাগানে—

"কিছু নাই সংসারের মাঝে,
কেবল কালী, নাম সার রে—
আমার মন কালী, ধন কালী,
প্রাণ কালী আমার রে।"

যাত্রার শেষেও দেখি সত্যরূপী মুকুন্দদাসের ব্যাকুল আহ্বান—

"একবার ব্যাকুল প্রাণে তাঁরে ডাকো রে।
দীন দয়াময়ী শ্যামা মায়েরে॥
পতিত পাবনী, অধম তারিণী।
মায়ের দীনজনে বড় দয়া রে।"

আদি ও অন্তে শ্যামা সংগীত—মুকুন্দদাসের যাত্রা গানে ইহা একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। তাঁহার রচিত সব যাত্রাই এইভাবে অভিনীত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, যাত্রাগুলি 'অঙ্ক' ভাগে বিভক্ত না হইয়া 'দৃশ্য'ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। প্রায় প্রতিটি দৃশ্যে নাম ভূমিকায় মুকুন্দদাসের আবির্ভাব। ইহা আধুনিক পেশাদার যাত্রা-গানে বা রঙ্গমঞ্চে 'নাম ভূমিকা'র এইরূপ প্রাধান্য সচরাচর দেখা যায় না। গণতান্ত্রিক সমাজে গণনাট্যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চরিত্রও প্রধান চরিত্রকে ম্লান করিয়া দিতে পারে। কিন্তু মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রায় লোকশিক্ষা প্রচারে ও আনন্দদানে মুকুন্দদাসকেই নেতৃত্ব দিতে হইয়াছে। তাই যাত্রা আসরে তাঁহার আবির্ভাবেই অন্যান্য চরিত্রগুলি সতেজ সজীব ও চঞ্চল হইয়া উঠে। কীর্তনে যেমন 'দোহারে'-র প্রয়োজন আছে, মুকুন্দদাসের যাত্রায় অন্যান্য চরিত্রগুলির প্রয়োজনীয়তা সেইরূপ। কীর্তনিয়া যেমন গানে 'আখর' দেন, মুকুন্দদাসও তেমনি স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী আসরে দাঁড়াইয়া উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগে 'আখরে'র কাজ করিতেন বক্তৃতা বা গানের মাধ্যমে। আধুনিককালে রচনা করেন একজন, পরিচালনা করেন অন্যজন এবং নাম, ভূমিকায় অবতীর্ণ হন জনপ্রিয় অভিনেতা বা অভিনেত্রী। কিন্তু স্বদেশী যাত্রা রচনায়-প্রযোজনায় -পরিবেশনায়-পরিচালনায় মুকুন্দদাস একক শিল্পী, তিনিই কেন্দ্রীয় চরিত্র। তাই তাঁহার যাত্রার নাম—'মুকুন্দদাসের যাত্রা' বা 'মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রা।'

আবার যাত্রা আন্দোলনের ইতিহাসে দেখি নাটকের মত যাত্রাও পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। প্রতিটি অঙ্কই একাধিক দৃশ্যে বিভক্ত। এক অঙ্কের শেষে এবং আর এক অঙ্কের আরম্ভের মধ্যবর্তী সময়টুকুতে গানসহনৃত্য বা শুধু নৃত্য পরিবেশন করা হয়। মুকুন্দদাসের যাত্রায় 'অঙ্ক'-বিভাগ না থাকায় একাধিক দৃশ্যের পারম্পর্য রক্ষা করিযাছে গান এবং দুইটি দৃশ্যের মধ্যবর্তী সময়টুকু পূরণ করিয়াছে—বক্তৃতা বা গান। এইখানে বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে আধুনিক যাত্রাগানে সাজ-সজ্জার বৈচিত্র্য বা বাহুল্য থাকায এবং প্রয়োজনে একজনকে একাধিক চরিত্রে অভিনয় করিতে হওয়ায় একটি অঙ্কের শেষে আর একটি অঙ্ক আরম্ভ করিতে সময লাগে। এই সময দর্শকবৃন্দ যাহাতে অধৈর্য হইযা না পড়েন (এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যাহাতে তৈরি হইতে পারেন) তাহার জন্য পরিবেশন করা হয়—নৃত্য, গীত বা যন্ত্রসংগীত। মুকুন্দদাসের যাত্রা 'স্বদেশী যাত্রা' হওযায় সাজ-সজ্জার বাহুল্য ছিল না। গৈরিক বসনে এবং সাদাসিদা পোশাকে অভিনয় হইত। তাহা ছাড়া একই ব্যক্তিকে একটি যাত্রাগানে একাধিক চরিত্রে অভিনয করিতে হইত না। ফলে পোশাক পরিবর্তন করিতে না হওয়ায় সময়-ও কম লাগিত এবং দর্শকরাও অধৈর্য হইতেন না, অধীর আগ্রহে পরবর্তী দৃশ্যের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতেন। আধুনিক যাত্রা বা নাটকে suspense-এর বড় অভাব, কিন্তু মুকুন্দদাসের যাত্রায প্রতিটি দৃশ্যেই এই ভাব ছিল। দৃশ্যের পর দৃশ্য চলিতেছে আর শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন—কোথাও ছেদ নাই, অধৈর্য নাই, একটানা পালাগান দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্য দিযা পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। 'Dramatic Relief' বলিতে নাটকে আমরা বুঝি, মুকুন্দদাসের যাত্রায় তাহা আমরা বক্তৃতা বা গানের মাধ্যমে উপলব্ধি করি। 'সমাজ' যাত্রা-গানে ২৭টি গান সন্নিবিষ্ট করা হইযাছে, তন্মধ্যে—

> "ছেলের বাপ বসে আছে পাঁচ হাজারের আশে,
> মেয়ের বাপের ভাঙ্গা কপাল চোখের জলে ভাসে।"

এই গানটি সমাজের একটি বিশেষ দিকের অর্থাৎ পণপ্রথার বিরুদ্ধে নিষ্ফল ক্রন্দন হইলেও—

> "থাকুক আমার বিয়ে
> চাইনা আমি M. A., B. A.
> কিনতে যা হয টাকা দিয়ে।"

—এই গানের শেষে দেখা যাইত বহু যুবক বিনাপণে বিবাহ করিতে আগ্রহ

প্রকাশ করিয়াছেন। গানের মাধ্যমে এইরূপ মানসিক পরিবর্তন ও উন্মাদনা সৃষ্টিই মুকুন্দদাসের যাত্রা-গানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

মূলতঃ "সমাজ" পালাগানটি বহুবিচিত্র বাঙালী সমাজের দর্শন স্বরূপ এবং পণপ্রথার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। এখানেও দেখি,- "সত্য"রূপী মুকুন্দদাসের আহ্বানে অনুপ্রাণিত 'নগেনে'র ত্যাগেই লোভী বা কৃপণ পিতার সতদ্দৃষ্টি লাভ—"নগেনের ত্যাগেই আমায় এমন করে পাগল করে দিয়েছে। সত্য সত্যই বর্তমানে আদর্শ চরিত্রের প্রয়োজন, যা দেখে সমাজ অগ্রসর হবে।" বর্তমানে আইন করিয়া পণপ্রথা 'রদ' করিয়া দিলেও মনের দিক হইতে সাড়া না পাওয়ায় অর্থাৎ মানসিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না হওয়ায় তাহা আজও চলিতেছে, পদ্ধতিটা সামান্য পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র। তাই মুকুন্দদাসের যাত্রা-গানের আবেদন আজও আছে।

পল্লীসেবা

"পল্লীসেবা"—মুকুন্দদাসের আর একখানি উল্লেখযোগ্য যাত্রা। যাত্রাটি উদ্দেশ্যমূলক এবং "সমাজ" যাত্রাগানের ন্যায় প্রস্তাবনায় ও উপসংহারে আছে মাতৃবন্দনা। পল্লীসেবাই যে সমাজসেবা, সমাজসেবাই যে দেশসেবা—ষোলটি দৃশ্যে তাহা রূপায়িত হইয়াছে। "পল্লীসেবা" যাত্রাভিনয়ে মুকুন্দদাস বলিয়াছেন— "এখন আমাদের রজঃগুণটিই জাগিয়ে তুলতে হবে। দেশময় এখন সেই আলোচনাই হওয়া উচিত। আমাদের দুর্দশা দেখেই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "ওরে তোরা বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে কিছুদিন শিকেয় তুলে রাখ। কৃষ্ণ ভজনই করতে চাস্ তবে কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণকে ডাক, জাতিটা একটু গা ঝাড়া দিয়ে উঠুক। যে জাতির ভাত জোটে তো ডাল জোটে না, তার কাছে প্রেমের কথা বলায় কোন ফল হবে কি? রজঃগুণের কথা বলো, জাতিটা উঠে দাঁড়াক। পেট ভরে খাক্, খেতে পারলেই গায়ে একটু বল পাবে। তখন আর মা-বোনের ইজ্জৎ বাঁচাবার জন্য তাকে সংবাদপত্রে চোখের জল ফেলতে হবে না।" পল্লীসেবাই যে ভারতসেবা, নর-নারায়ণের সেবা-- গান্ধীজী তাহা অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিতেন। তাই গান্ধীজীর স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় মুকুন্দদাস এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন, "আনন্দমঠ"-এর মধ্যে যেমন সন্ন্যাসী-

বিদ্রোহের কথা বলিয়া ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র দেশবাসীকে মাতৃসেবার মন্ত্রে আহ্বান জানাইয়াছিলেন, মুকুন্দদাসও তেমনি 'নিতাই'কে সমাজসেবী হিসাবে ঘুমন্ত পল্লীর ঘুম ভাঙাইবার কাজে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। যাত্রাভিনয়ে দেখি 'নিতাই'-এর ভূমিকায় মুকুন্দদাসের ব্যাকুল আহ্বান—

"আয় মা তারিণী করাল-বদনী
ডাকিনী যোগিনী সব নিয়ে আয়।
শ্মশানবাসিনী শ্মশানরঙ্গিণী
ভারত শ্মশানে নাচবি গো আয়।"

তখন পরিপূর্ণ আসরে বিদ্যুৎচমকের মত শিহরণ খেলিয়া যাইত এবং এক স্বর্গীয় আবেশে শান্ত সমাহিত হইয়া যেন শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁহার বক্তৃতা ও গান শুনিত এবং অভিনয় দেখিত। প্রচারকের এমন ব্যক্তিত্ব ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নাই, ভবিষ্যতেও দেখা যাইত কিনা সন্দেহ। মুকুন্দদাস নিজেই নিজের তুলনীয়, তাঁহার কোন বিকল্প নাই।

বলা বাহুল্য, এই 'করাল-বদনী কালী'—রাজনৈতিক কালী, জীবনে যিনি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইয়া নিজের নামটি পর্যন্ত (মুকুন্দদাসের বাল্যকালের নাম—যজ্ঞেশ্বর) নূতন করিয়া লইয়াছিলেন; তিনি যে কালীকে আহ্বান করিলেন তাহা যেন রাজনৈতিক প্রয়োজনে। তখন বৃটিশরূপী অসুর, যথা—

"ফুসার—আর কি দেখাও ভয়?
দেহ তোমার অধীন বটে।
মন তো তোমার নয়॥"

এবং ভারতমাতারূপী কালী, যথা—

"জাগো গো জাগো জননী।
তুই না জাগিলে শ্যামা, কেউ জাগিবে না গো মা,
জাগো গো জাগো জননী
তুই না নাচালে, কারো নাচিবে না ধমনী।"

এই রূপকটা তখন দেশে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। মুকুন্দদাস ছিলেন স্বভাব কবি। অদ্ভুত ছিল তাঁহার কবিত্বশক্তি ও সৃজনী শক্তি। আসরে দাঁড়াইয়া সময়োপযোগী গান রচনা করিয়া তাৎক্ষণিক সুর সহযোগে গাহিবার মত ঐন্দ্রজালিক শক্তি ছিল তাঁহার। দেশকে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন বলিয়া দেশের মানুষ তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিল, তাঁহার যাত্রাগানে পাগলপারা হইত এবং নূতন জীবন লাভ করিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহাকেই অনুসরণ করিত। যাত্রা

আন্দোলনের ইতিহাসে মুকুন্দদাসের স্থান ও মান কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর এইখানেই মিলিবে।

মুকুন্দদাসের যাত্রা গানের মূল বৈশিষ্ট্য হইতেছে—সংলাপ অপেক্ষা গানের প্রাধান্য বেশী। "পল্লীসেবা" যাত্রাভিনয়ে ৩০টি সংগীত আছে—যাহা কখনও 'বিবেকে'র কাজ করিয়াছে, কখনও সংলাপ-এর পরিপূর্ণতার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, আবার কখনও কার্যকরী উপায় ও পথ নিধারণের জন্য গীত হইয়াছে। মালঞ্চে ফুল থাকিলেই মালা গাঁথা হয় না, তার জন্য চাই নিপুণ মালাকার। মুকুন্দদাস এইরূপ একজন নিপুণ মালাকার ছিলেন। তিনি নূতন ভাবে, নূতন ঢঙে, নূতন বেশে, নূতন পটভূমিকায় যে 'নূতন মালা' গাঁথিলেন, তাহা—

"গৌড়জন যাহে—
আনন্দ করিবে পান সুধা নিরবধি।"

কবির যাত্রা-গানে ও মঞ্চায়নে ছিল অভিনবত্ব। তাই তাঁহার 'নূতন যাত্রা'র নাম স্বদেশী যাত্রা। স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় এই যাত্রার সৃষ্টি এবং স্বদেশী আন্দোলনেই ইহার আবেদন সবচেয়ে বেশী। নাট্যমঞ্চে কোন এক উপাখ্যানকে কেন্দ্র করিয়া এক ঘটনা সংস্থাপনের মাধ্যমে কোন এক ভূমিকায় মঞ্চে নামিয়া আসিলেন চারণের বেশে মুকুন্দদাস। কণ্ঠে, তাঁহার আধুনিক যাত্রামঞ্চে 'ক্ষ্যাপা'র গান, সহসা আবার তিনি অবতীর্ণ হন কথকের ভূমিকায়, চকিতে বক্তব্য ঘুরাইয়া নামিয়া আসেন 'কবিয়ালে'র ভূমিকায়। অথচ তিনি মূলত 'ক্ষ্যাপা'ও নন, 'কবিয়াল'ও নন—তিনি ছিলেন চারণকবি। তাঁহার সংগীতকে আমরা 'গীতি নকশা' বা 'গীতি বিচিত্রা' বলিতে পারি না। এক কথায় এই-গুলিকে আমরা 'Melodrama'-ও বলিতে পারি না। মুকুন্দের সুরমাধুর্য কণ্ঠ, বলিষ্ঠ প্রাণস্পর্শী বক্তব্য ও কার্যকরী আদর্শ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনা সংঘাত ও সংগীত বাদ্যের বহিঃপ্রকাশ শুধু নূতন নয়—অভিনব ও অতুলনীয়। তিনি এক নূতন যুগের নূতন মানুষ।

সত্যই মুকুন্দদাস ছিলেন নূতন যুগের দিশারী, সংগ্রামী, কষ্টসহিষ্ণু ও বাস্তববাদী দেশপ্রেমিক। তিনি তাঁহার স্বদেশী যাত্রাগানে দেশকে এবং জাতিকে স্বাবলম্বী হইবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন—

"সাধিতে দেশের কাজ পরয়ে বীরের সাজ
করে লয়ে করম নিশান।
জীবন ব্রত সাধ অবিরত—
এ নহে বিরামের স্থান॥"

কর্মের মাধ্যমেই কর্মীর পরিচয় পাওয়া যায়—বক্তৃতার দ্বারা নয়। তাই 'পল্লীসেবা' আরম্ভ হইবে, পল্লী হইতে, শহর হইতে নয়। যাহা কিছু পরিকল্পনা তাহা আসিবে কৃষিভিত্তিক গ্রাম বাংলা হইতে। গ্রামের উন্নতিতেই শহরের উন্নতি দেশের শ্রীবৃদ্ধির অর্থ গ্রাম বাংলার শ্রীবৃদ্ধি। কারণ দেহের সমস্ত রক্ত মুখে উঠিলে তাহাকে যেমন স্বাস্থ্য বলে না, তেমনি অল্প সংখ্যক 'উপরতলা' লোকের বা শহরের উন্নতি ঘটিলেই দেশের উন্নতি ঘটে না। মুকুন্দদাস এই কথা মনে রাখিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এই যুগেরই আহ্বান—

> "তোরা সবাই কোদাল ধর—
> দেশ থেকে তাড়াতে হবে ম্যালেরিয়া জ্বর।
> মাথা গুঁজে ভাবলে বসে হবে না দেশের কল্যাণ।
> কোমর বেঁধে হতে হবে সবায় আগুয়ান॥"

এইজন্য 'মূক-ম্লান-মুখে' ভাষা এবং 'শ্রান্ত-শুষ্ক-ভগ্নবুকে' আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগাইবার জন্য 'নিতাই' ডাক দিয়াছেন পল্লীবাসীকে—

> "মায়ের ডাকে সব জেগেছে,
> যে যার কাজে লেগে গেছে
> তোমরাই মায়ের জাতি,
> বসে থাকবে কি নীরবে।
> শক্তি স্বরূপিণী যাঁরা,
> ও দুর্দিনে কেন তারা,
> ভোগে বিলাসে মজে
> মৃতপ্রায় পড়ে রবে॥
> জাগাও সকলে আজি
> নিদ্রিতা শকতি,
> তোমাদেরই হাতে মাগো,
> ভারতের মুক্তি॥"

—আজিকার দুর্দিনে এই গান যত প্রচারিত হয় ততই মঙ্গল। দেশের গণদেবতা আজ জাগিয়াছে তাই ছুঁৎমার্গগামী সমাজ ভয়ে কম্পিত, শঙ্কিত এবং ইহাদের দ্বারা নিন্দিত। মুকুন্দদাস বিশ্বাস করিতেন মনুষ্যত্বে—বর্ণভেদে নয়, সম্প্রদায়ে নয়। তিনি যে 'সাম্যবাদে'র চারণকবি—

"গাহি সাম্যের গান—
সেখানে আসিয়া একত্র হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান।
সেখানে মিশিছে হিন্দু-বৌদ্ধ মুসলমান খৃষ্টান ॥"

ব্রাহ্মণ-শূদ্র, বৃহৎ-ক্ষুদ্র মানুষের কৃত্রিম পরিচয়, মানুষের একমাত্র পরিচয় সে মানুষ—'সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই।' মানুষের গৌরব জাতে নয়, অর্থে নয়—মনুষ্যত্বে। মুকুন্দদাস এই মানুষের কবি, 'জগৎ জুড়িয়া যে জাতি আছে' সেই মানুষ জাতির কবি। তাই তিনি গাহিলেন—

"জাতের নামে বজ্জাতি সব, জাত-জালিয়াৎ খেলছে জুয়া।
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতে নয় তো মোয়া ॥"

মুকুন্দদাস শুধু প্রচারক ছিলেন না, সমাজ সংস্কারক রূপে তাঁহাব পরোক্ষ ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। "পল্লীসেবা"র একটি গান এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়—

"সাধে কি আর হচ্ছ রাজী,
তোমায় রাজী করেছে।
সেদিনই জানি ধরবে চরকা
তোমার গিন্নী যেদিন ধরেছে।"

—জাতিকে ও দেশকে সামাজিক কুসংস্কারে ঊর্ধ্বে উঠিয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে এবং সামাজিক গণ্ডী ভাঙিয়া দিয়া তাঁতী-জোলা প্রভৃতিকে কোলে তুলিয়া লইতে হইবে—ইহাই ছিল মুকুন্দদাসেব প্রাণেব কথা, সমাজতন্ত্র-বাদেব গোডাব কথা।

ব্রহ্মচারিণী

"ব্রহ্মচারিণী" পালাগানটি মুকুন্দদাসের স্বপ্ন ও সাধনার রূপরেখা। মুকুন্দ-দাসের বন্ধু বিধুভূষণ বসু তাঁহার রচিত "দীনবন্ধু" নামক একখানি বই মুকুন্দদাসকে অভিনয় করিতে দেন এবং পরে অর্থের বিনিময়ে মুকুন্দদাসকেই বই-এর স্বত্ব বিক্রয় করেন। মুকুন্দদাস বিধুবাবুর অনুমতি লইয়া বইখানির অনেক পরিবর্তন সাধন করিয়া "ব্রহ্মচারিণী" নাম দিয়া গ্রন্থখানিকে জনপ্রিয় করিয়া গেলেন। চতুর্দশ দৃশ্যে পালাগান সমাপ্ত। বিবাহিতের আদর্শ জীবন গঠনকল্পে একদল ব্রহ্মচারিণীর প্রয়োজন মুকুন্দদাস উপলব্ধি করিয়াছিলেন। "ব্রহ্মচারিণী" তাঁহার সেই উপলব্ধির ফল। মুকুন্দদাসের মহিলা আশ্রমের পরিকল্পনা ফলশ্রুতি—"ব্রহ্মচারিণী"। আনন্দময়ীর মত মহিলা যাঁহার আপন বৈধব্য সংসারকে পরিত্যাগ করিয়া কাশীবাসী হইতে চলিয়াছেন, প্রেমানন্দ

তাঁহাকে ডাক দিয়াছেন মায়ের সেবায়—তিনিই তাঁহার 'ব্রহ্মচারিণী'। ফলে লাঞ্ছিতা-বঞ্চিতা বিধবারা জীবনে বাঁচার অর্থ খুঁজিয়া পায় 'ব্রহ্মচারিণী'-র আদর্শের জাদুস্পর্শে। বলা-বাহুল্য, মুকুন্দদাসের কন্যা 'সুলভা'-ও প্রথম জীবনে 'ব্রহ্মচারিণী'-র আদর্শে নিজেকে পরিচালিত করেন।

সংগীতের যে দুইটি ভাগ প্রধানত প্রচলিত, তাহার মধ্যে একটি রাগ-সংগীত, অপরটি প্রবন্ধ সংগীত। রাগ-সংগীত প্রাচীনকালের মত বর্তমান কালেও উচ্চাঙ্গ-সংগীত এবং প্রবন্ধ-সংগীত হইতেছে—দেশ প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের গান, যাহা অনেক সময় স্থান বিশেষে ও অবস্থা বিশেষে "লোক-গীতি" নামে পরিচিত। কিন্তু মোটের উপর রাগ-সংগীত ও প্রবন্ধ-সঙ্গীতকে 'দেশীয় সংগীত' নামে অভিহিত করা যায়। মুকুন্দদাসের গানগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, রাগ সংগীতের চেয়ে প্রবন্ধ সংগীতের সংখ্যা বেশী। কারণ প্রবন্ধ-সংগীতের সঙ্গে আছে বক্তৃতা, আবৃত্তি ও সংলাপ। মুকুন্দদাসের সব যাত্রা-গানেই ইহার প্রভাব দেখা যায়—"ব্রহ্মচারিণী" ও "কর্মক্ষেত্র" পালাগানে ইহার প্রাধান্য বেশী পরিলক্ষিত হয়। "ব্রহ্মচারিণী" যাত্রাগানে ২৪টি গীত সংযোজন করা হইয়াছে এবং পূর্বোক্ত যাত্রাগুলির মত মাতৃবন্দনায় আরম্ভ ও শেষ।

মুকুন্দদাস প্রথমে গুরু রামানন্দ কর্তৃক কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হন। তাঁহার কুলদেবতা—"রাধা-গোবিন্দ"। কিন্তু তিনি জন্মাবধি 'মা' 'মা', বলিয়া [illegible]-মাতার আরাধনা করিয়াছেন। তাঁহার অনেক গানেই মায়ের নামে জয় ঘোষণা করা হইয়াছে। "ব্রহ্মচারিণী" পালাগানে ২৪টি সংগীতের [illegible] ২টি সংগীত মাতৃবন্দনামূলক। কর্মজীবনে মুকুন্দদাস ব্রহ্মচারিণী সরোজিনী দেবীর নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন। ইনি "আনন্দময়ী দেবী" নামে খ্যাত। মুকুন্দদাস যে আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার ভিতরে কালীমন্দির তৈরি করিয়া কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার ইষ্ট-দেবীর নামানুসারে কালীবাড়ির নাম রাখা হইয়াছিল। বেশ কিছুদিন যাবৎ ইহা ভগ্ন অবস্থায় ছিল বর্তমানে ইহার সংস্কার চলিতেছে, এই আনন্দময়ী দেবীর পরিকল্পিত আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া মুকুন্দদাস "ব্রহ্মচারিণী" পালাগান রচনা করিয়াছিলেন। "মাতৃপূজা", "ব্রহ্মচারিণী" ইত্যাদি যাত্রাভিনয়ে কালীমাহাত্ম্য জ্ঞাপক গীতগুলি ও অন্যান্য ভজন সংগীতগুলি রাগাত্মিকা পর্যায়ের অন্তর্গত। যথা, ব্রহ্মচারীগণ গাহিয়াছেন—

"জাগরে জাগরে ডাকরে ডাকরে
মাতরে মায়ের নাম গানে,

প্রেমান্দময়ী প্রেমানন্দদানে,

তুষিবেন আপন সন্তানে।

ঘুচিবে আঁধার পডবি আলোকে,

নাচিবে ভাবত নাচিবে পুলকে,

আবার ফুটিবে পারিজাত মল্লিকে

ভারত-নন্দন-কাননে।"

এই 'ভাবত-নন্দন-কাননেব সেরা ফুল-সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। তাহার রচিত "আনন্দমঠে'ব ভাবধাবায় অনুপ্রাণিত হইয়া মুকুন্দদাস এক শ্রেণী সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীব প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন, "ব্রহ্মচারিণী" সেই প্রয়োজনেব ফসল।

কর্মক্ষেত্র

চারণকাব মুকুন্দদাসেব সমাজচেতনার আব একটি বলিষ্ঠ রূপায়ণ—"কর্মক্ষেত্র।" 'মায়েব শ্রীচরণতরী ভবসা' করিয়া তিনি কর্মক্ষেত্রে দেহতবী ভাসাইয়াছেন। প্রস্তাবনায় তাই তিনি বলিয়াছেন—

"মা মা বলে ডাক দেখি ভাই

ডাক দেখি ভাই সবে রে।

মা-মা বলে কাঁদলে ছেলে,

মা কি পারে রইতে রে।"

'মা মা' বলিয়া ডাকিলে কর্মযোগেব মাধ্যমে মাযেব সাডা মিলবে এবং তখন—

"তরুণ অরুণ কিরণে প্রকৃতি

সেজেছে নূতন করিয়া,

প্রভাতী গাইছে পঞ্চম রাগে,

জাগরণ-গীতি পাপিয়া।"

—সপ্তম দৃশ্যে পরিসমাপ্ত 'কর্মক্ষেত্র' পালাগানের ইহাই মূল বক্তব্য। এখানে ২৪টি গীতের সন্নিবেশ হইয়াছে, তন্মধ্যে ১০টি রাগ সংগীত এবং ১৪টি প্রবন্ধ সংগীত। সংগীতগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব যে, ভাষাই সুরকে

চালিত করিয়াছে। দরাজ গলায় আসর উপযোগী যে সুরেই মুকুন্দদাস গানগুলি গাহিয়াছেন, তাহা যেন ঐ গানের একমাত্র সুর বলিয়া মনে হইয়াছে ; যন্ত্রসংগীত কণ্ঠসংগীতের আবেগে ও উত্তেজনায় ডুবিয়া গিয়াছে। এইখানেই মুকুন্দদাস অনন্য !

"কর্মক্ষেত্র"-পালাগানে আছে জমিদার নন্দলালের শহর প্রীতি ও নূতন বি. এল. পাস করা ছেলে সুরেশের শহর জীবনের মোহ এবং তাঁহাদের এই মোহভঙ্গের পরিণতি। ইহারই পাশাপাশি আছে "বাউল"-এর ভূমিকায় চারণকবির দেশগঠনে নারীজাতির প্রতি আহ্বান—

"ছেড়ে দাও রেশমী চুড়ি বঙ্গনারী
কভু হাতে আর পরো না,
জাগো গো ও জননী ও ভগিনী,
মোহের ঘুমে আর থেকো না।"

আসরের শেষে দেখা যাইত—'চিহ্নের আড়ালে বাশীকৃত রেশমী চুড়ি মা বোনেরা ভাঙিয়া ফেলিয়াছেন। এমনি শক্তি ছিল মুকুন্দদাসের যাত্রাগানে—যাহা কোন লেখক লেখার মাধ্যমে, কোন বক্তা বক্তৃতার মাধ্যমে, এমন কি কোন গায়ক গানের মাধ্যমে এইরকম উন্মাদনা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্বদেশী যাত্রাগানের ধারা লুপ্ত হইয়া য়াছে বলা যাইতে পারে। ১৯২১ খৃঃ—মহাত্মা গান্ধীর পবিচালনায় আ 'লনের ঢেউ আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপী বিস্তৃত। মুকুন্দদাস-ও জাতিধর্ম f বিশেষে সকলকেই এই আন্দোলনে ডাক দিলেন —

"করমেরই যুগ এসেছে, সবাই কাজে লেগে গেছে,
মোরাই শুধু রব কি শয়ান।
চিরদিন রব নীচে, চলব সবার পিছে পিছে
সহিব শত অপমান।"

অতএব—

"পণ করে সব লাগ রে কাজে,
খাটব মোরা দিন কি রাত,
(এই) বাংলা যখন পরের হাতে
কিসের মান আর কিসের জাত॥"

—মুকুন্দদাস ছিলেন অত্যন্ত বাস্তববাদী মানুষ এবং সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি। যাঁহারা শুধু সাহিত্যের নামে বেসাতী করেন, ভজি দিয়া চোখ ভুলান এবং

নকল নেতা সাজিয়া 'কাজ করো, কাজ করো' বলিয়া বক্তৃতা দেন ; তাঁহাদের প্রতি মুকুন্দদাসের বিদ্রূপপূর্ণ উক্তি—"ও বক্তৃতা এখন তোমরা কিছুদিন করো না। তাদের পেটের জোগাড় করে কাজের কথা বলো, দেখবে কাজের লোক কত পাও।" তাই সব কিছু পরিকল্পনা করিবার আগেই তিনি বলিতেন—

"সকল কাজের মিলবে সময়,
আগে দুটি ভাতের জোগাড় কর,
তোরা পেটের জোগাড় কর।"

এই 'পেটের জোগাড়' করিবার জন্য তিনি ঘরে ঘরে চরকার 'কর্মক্ষেত্র' তৈরি করিতে বলেন —

"চরকা আমার পিতামাতা
চরকা বন্ধু সখা,
চরকার ভাত কাপড় পরি,
জোড়ায় জোড়ায় শাঁখা,
চরকা প্রাণের সখা ॥
হাতের কঙ্কণ নাকের বেসর,
পরি ঢাকাই শাড়ী,
সুতো কেটে পরেছি এবার
হাতির দাঁতের চুড়ী,
চরকা আর কি ছাড়ি ॥"

একদিন 'জোড়ায় জোড়ায় শাঁখা', 'ঢাকাই শাড়ী' আর 'হাতির দাঁতের চুড়ী'—চরকার কল্যাণে আসায় বাংলার ঘরে ঘরে চরকার গান শোনা গিয়াছে। চরকাই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতীক এবং অন্যতম কুটীর শিল্প এই শিল্পের উন্নতি—জাতির উন্নতি, এই শিল্পের মাহাত্ম্য জ্ঞাপক গান —স্বদেশী গান। এই গানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—মুকুন্দদাস। "যাত্রাগানের ভিতর দিয়া দেশাত্মবোধের বাণী তিনি বাংলার দূরতম পল্লী অঞ্চল পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়াছেন। কেবল রাজনৈতিক মুক্তি সংগ্রামই তাঁহার যাত্রা রচনার বিষয় ছিল না, সমাজ সংস্কারও তাঁহার লক্ষ্য ছিল" (বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, ডঃ আশুতোষ ভট্ট্যাচার্য্য)। স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর মুক্তিযুদ্ধে এই সর্বত্যাগী সমর্পিত সন্ন্যাসী তাঁহার বলিষ্ঠ সংগঠন, আর জ্বালাময়ী সুরধারায় যে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যে অনন্যপূর্ব

বৈশিষ্ট্যে প্রতিটি হতাশ দেশপ্রেমিকের বুকে জাগরণের আশা জাগাইয়াছিলেন —আমরা বাঙালী কালের গতিতে সেই বীর সেনানীকে বিস্মৃতির অতল গর্ভে হারাইয়া ফেলিয়াছি। ইহা আমাদের গৌরব নয়—ইহা আমাদের লজ্জা, দেশের লজ্জা, আগামী দিনের মানুষের নিকট অবহেলার লজ্জা। এই লজ্জার হাত হইতে আমরা সেইদিন মুক্তি পাইব, যেদিন মুকুন্দদাসের প্রদর্শিত পথে 'চাষার লাগি কাঁদিবে প্রাণ'।

মুকুন্দদাস শুধু প্রচারক ছিলেন না, নির্ভীক সমালোচকও ছিলেন। সভ্যতার প্রদীপ যাহাদের হাতে তাহাদের কথা কেহ জানে না, সংবাদপত্রেও তাহাদের কথা বড় একটা দেখা যায় না; দুঃখে ইহাদের জীবনগড়া এবং দুঃখে ইহাদের জীবন শেষ—উপরতলায় যাঁহারা থাকে তাহাদের কথাই সংবাদ-পত্রের মাধ্যমে সবাই জানে। এই বিষয়ে মুকুন্দদাসের কণ্ঠে তীব্র শ্লেষাত্মক গান, আজিও 'এডিটরদে'র কানে বাজে—

"এডিটর খোঁজ রাখে ক'জনার
আমরা ত্রিশ কোটি মায়ের ছেলে,
নাম ছাপে সে দু'-চার জনার।"

এমন শ্লেষাত্মক কণ্ঠও আবার আবেগও বিগলিত হইত, কাতরতায় আকুল হইত—

"স্বরাজ সেদিন মিলবে যেদিন
চাষার লাগিয়া কাঁদিবে প্রাণ,
তাঁদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়ে
সপ্তমে তোরা তুলিবি তান।"

মুকুন্দদাস মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন—"জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে, সে জাতির নাম মানুষ জাতি। তাই গিল্টিকরা চাকচিক্যময় সভ্যতায় যাঁহারা লালিত-পালিত, তাহাদের চেয়েও 'ও-পারের প্রাঙ্গণের ধারে' যাহারা আছে—তাহাদের সম্মানে যে জাতির সম্মান তাহা তিনি গানের মাধ্যমে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

"ভাইরে [illegible] দেশের চাষা!
এদের [illegible] পদধূলি পড়লে মাথায় প্রাণ হয়ে যায় খাসা।
এরা কপটতার ধার ধারে না, সত্য ছাড়া মিথ্যা কয় না।
প্রাণের কথা গুছিয়ে বলার নাইকো এদের ভাষা।"

'এই প্রাণের কথা গুছিয়ে বলার' জন্য মুকুন্দদাসের আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল

এবং এইখানেই তাঁহার যাত্রা ও গানের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা। দেশকে হৃদয়ের খুব কাছে টানিয়া তাহার দুঃখ-দুর্দশা দূর করিবার জন্য ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে—ইহাই কবির সহজ সরল আন্তরিক সঙ্কল্প। কোনরূপ ভাবালুতা, কোনরূপ বাগাড়ম্বর, কোনরূপ উচ্ছ্বাসপ্রবণতা নাই, আছে শুধু বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং ঐকান্তিক অনুভূতি। তাই গানটি সংবেদনশীল মনে যথেষ্ট প্রভাব সঞ্চার করে।

পরিশেষে বলিব, দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিবার জন্য মুকুন্দদাস যে সব যাত্রা ও গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই আজকাল অনেকেই তাঁহাকে "চারণকবি" বলিয়া অভিহিত করেন। কিন্তু ইহাই তাঁহার একমাত্র পরিচয় নয়, তিনি ছিলেন একজন চিন্তাশীল সমাজতাত্ত্বিক—যিনি বাংলার জনজীবনের বিচিত্র মানসিক প্রবণতাগুলি অত্যন্ত যত্ন করে লক্ষ্য করিয়াছেন এবং বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি যুগের প্রয়োজনে "চারণকবি" নন—ভবিষ্যৎ বাংলার রূপরেখার দিশারী, একক অপ্রতিদ্বন্দ্বী চারণ সম্রাট!

॥ মুকুন্দদাসের যাত্রা গ্রন্থাবলী ॥

"বসুমতী সাহিত্য মন্দির" কর্তৃক প্রকাশিত "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী" নামে যে গ্রন্থ প্রকাশিত আছে, তাহাতে চারণ-কবি মুকুন্দদাসের "সমাজ", "পপল্লীসেবা", "ব্রহ্মচারিণী" এবং "কর্মক্ষেত্র"—এই চারিটি যাত্রাগানের পরিচয় পাওয়া যায়। মুকুন্দদাসের প্রথম যাত্রা গ্রন্থ "মাতৃপূজা"র পাণ্ডুলিপি ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করায় তাহা প্রকাশের সুযোগ পায় নাই। কিন্তু তাঁহার "পথ" যাত্রাটি প্রকাশিত হইলেও আজ আর তাহা পাওয়া যায় না। ভবিষ্যতে কোন সহৃদয় ব্যক্তি বা সংস্থার মারফৎ মুকুন্দদাসের অপ্রকাশিত বা লুপ্তপ্রায় যাত্রা ও গান পাইলে, তাহা প্রকাশের ইচ্ছা আমাদের রহিল। বর্তমানে "চারণ-কবি মুকুন্দদাস" গ্রন্থের পরিপূর্ণতার জন্য "বসুমতী" কর্তৃক প্রকাশিত উপরোক্ত চারিটি যাত্রাগান প্রকাশিত হইল। ইহার জন্য আমরা "বসুমতী সাহিত্য মন্দির"-এর কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞ ও ঋণী।

স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রার প্রভাব অপরিসীম। "মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী" বলিতে এই স্বদেশীযাত্রার সংকলন বুঝাইবে। যাত্রাগুলি বর্তমানে আর প্রকাশিত হয় না। তাই এই সংকলনটি একদিকে যেমন গ্রন্থের গৌরববৃদ্ধি করিবে, অপরদিকে তেমনি মুকুন্দদাসের যাত্রার সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত হইবার সুযোগ দিবে। তাহা ছাড়া যাত্রা আন্দোলনের ইতিহাসে মুকুন্দদাসের স্থান ও মান নির্ণয়ে এই সংকলনটি বিশেষভাবে সাহায্য করিবে। আমরা উৎসাহী পাঠক ও অনুরাগী যাত্রামোদী-দের কথা চিন্তা করিয়া প্রথমে "মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রা"র সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া পরে যাত্রাগুলি সাজাইলাম। আশা করি আমাদের এই প্রচেষ্টা সুধী-সমাজে স্বীকৃতি লাভ করিবে।

॥ মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রা ॥

স্বদেশী যুগের অমর কবি—চারণ-কবি মুকুন্দদাস। তাঁহার স্বদেশী যাত্রা ও গান স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তিনি শুধু

কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন অভিনেতা, নাট্যকার, সুগায়ক এবং সুবক্তা। আসর বুঝিয়া গান করিতে বা বক্তৃতা দিতে তাঁহার সমকক্ষ সে যুগে বড় একটা কেহই ছিলেন না। সাধারণত সাহিত্যিক, রাজনীতিক, নাট্যকার ও গীতিকার বলিতে যাহা বুঝায়, মুকুন্দদাসকে সেইরূপ বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না। তাঁহার যাত্রা ও গান তাঁহাকে যত বড় করিয়াছিল, তিনি ছিলেন তাহার চেয়েও বড়। স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় তাঁহার আবির্ভাব ও সার্থকতা এবং সে যুগের যাত্রা আন্দোলনের ইতিহাসে তিনি ছিলেন—একক অপ্রতিদ্বন্দ্বী চারণ-সম্রাট।

বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। তাহার অতীত ইতিহাস বহু গৌরবময় অধ্যায়ে লিখিত হইলেও আজ তাহা স্মৃতি-চারণায় পর্যবসিত হইয়াছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এপার বাংলা ও ওপার বাংলায় যাঁহারা চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন—চারণ-কবি মুকুন্দদাস তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। "বণিকের মানদণ্ড" যখন "রাজদণ্ড"-রূপে দেখা দিল, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যখন ব্রিটিশের সিংহাসন কম্পিত হইয়া উঠিল; যখন ব্রিটিশের 'settled fact'-কে 'unsettled' করিবার জন্য হাজার হাজার বাঙালী মরণজয়ী সংগ্রামে মাতিয়া উঠিল—তখন মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের উৎসাহে-প্রেরণায় এবং হেমকবির সাহচর্যে মুকুন্দদাস স্বদেশী যাত্রা ও গানের মাধ্যমে এই আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনে রূপ দিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন মানবপ্রেমিক এবং মানবধর্মের প্রচারক। তাঁহার সব কাজের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল—মনুষ্যত্বের জাগরণ। তাই তিনি বুঝিয়াছিলেন—শুধু নীরস বক্তৃতায় নয়, ঘুমন্ত ও অধঃপতিত জাতিকে দেহে-মনে-প্রাণে সুস্থ, সবল ও প্রকৃতিস্থ করিয়া তুলিতে হইলে চাই - স্বদেশী গান ও যাত্রা। তাঁহার "মাতৃপূজা", "পথ", "সাথী", "সমাজ", "পল্লীসেবা", "ব্রহ্মচারিণী", "কর্মক্ষেত্র" প্রভৃতি নাটকগুলি সেই উদ্দেশ্যেই লিখিত হওয়ায় অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই সব নাটকে তিনি—Collective Farming, Co-operatve Banking, Cottage Industry, বিদেশী দ্রব্য বর্জন, শারীরিক শক্তি অর্জন ইত্যাদি বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাব ছিল—প্রতি পাঁচখানা গ্রাম লইয়া হইবে এক একটি মৌজা; প্রতি মৌজায় থাকিবে আমানতী ব্যাঙ্ক—এবং সেই ব্যাঙ্কের সাহায্যে ও মাধ্যমে এই পাঁচখানি গ্রামে চলিবে যৌথভাবে চাষ, কারবার ও কুটীরশিল্প। বর্তমানে গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ পরিকল্পনার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে এইগুলি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় নিঃসন্দেহে বলা যায়

যে, আধুনিক সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন—চারণ-কবি মুকুন্দদাস।

মুকুন্দদাস ছিলেন অত্যন্ত বাস্তববাদী মানুষ এবং সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি। যাঁহারা শুধু সাহিত্যের নামে বেসাতী করেন, ভঙ্গি দিয়া চোখ ভুলান এবং নকল নেতা সাজিয়া "কাজ করো ; কাজ করো" বলিয়া গগনভেদী চিৎকার করেন ও বক্তৃতা দেন ; তাহাদের প্রতি মুকুন্দদাসের বিদ্রূপপূর্ণ উক্তি— "ও বক্তৃতা এখন তোমরা কিছুদিন করো না। তাদের পেটের জোগাড় করে কাজের কথা বলো ; দেখবে তোমরা কাজের লোক কত পাও।" বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী "শার্ঙ্গদেব" মহাশয় বলেন—"মুকুন্দদাস তাঁর অভিনয়ে একজন উপদেষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। সেটা তাঁর নির্দিষ্ট পার্ট হলেও সেটা ছিল নামে মাত্র। সেই ভূমিকাটুকুকে অবলম্বন করে নানা প্রসঙ্গে তিনি মর্মস্পর্শী বক্তৃতা এবং গান করে যেতেন। বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রোতাকে আহ্বান করে তিনি তাদের নানা ত্রুটির কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন, উন্নতির জন্য আবেদন করতেন, তাদের জাতীয়তাবোধ এবং সমাজ-চেতনা উদ্দীপ্ত করতে চেষ্টা করতেন। তারপরে আবার ফিরে আসতেন তাঁর ভূমিকায়। তার অভিনয়গুলিতে প্রত্যেকটি চরিত্র ছিল সমাজের এক একটি বিশেষ রূপের প্রতীক। আমাদের সমাজের প্রায় প্রতিটি 'ভিলেন'কেই তিনি তাঁর অভিনয়ে নিপুণভাবে রূপায়িত করেছেন। এই নৈপুণ্য এবং যথাযথ চরিত্র বিশ্লেষণের জন্য শ্রোতাদের উপর তাঁর প্রভাব যে কি বিরাট ছিল, তা না প্রত্যক্ষ করলে ধারণা করা যায় না।" এই অর্থেই মকুন্দদাস চারণ-কবি এবং অগ্নিযুগের অন্যতম ঋত্বিক।

মুকুন্দদাস ছিলেন মনে-প্রাণে চারণ-কবি। স্বামীজীর "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরাণ নিবোধত" অভিমন্ত্রের অগ্নিশুদ্ধ সাধক ও চারণ এবং মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত "আনন্দমঠের" সন্ন্যাসী। পরনে গৈরিক আলখাল্লা, কোমরে দৃঢ়বদ্ধ গৈরিক উত্তরীয়, বুকে অসংখ্য মেডেল এবং মাথায় পাগড়ী—ঠিক যেন স্বামী বিবেকানন্দের পোশাক আর "কপাট বিশাল বুক, জিনি ইন্দীবর মুখ।" মাঝবয়সী বয়স, বাবরীচুল এবং সুপুষ্ট গোঁফ—সব কিছু মিলিয়া যেন একটি বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সর্বত্র বিরাজ করিত। সুসজ্জিত আসরে, উৎকণ্ঠিত শ্রোতাদের মাঝখানে যখন তিনি গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিতেন—

"আয় মা তারিণী করালবদনী
ডাকিনী যোগিনী সব নিয়ে আয়।

শ্মশানবাসিনী শ্মশানরঙ্গিনী

ভারতশ্মশানে নাচবি গো আয়।"

—তখন পরিপূর্ণ আসরে বিদ্যুৎ চমকের মত শিহরণ খেলিয়া যাইত এবং এক স্বর্গীয় আবেশে শান্ত সমাহিত হইয়া যেন শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁহার বক্তৃতা ও গান শুনিত ও অভিনয় দেখিত। প্রচারকের এমন ব্যক্তিত্ব ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নাই, ভবিষ্যতেও দেখা যাইবে কিনা সন্দেহ। মুকুন্দদাস নিজেই নিজের তুলনীয়, তাঁহার কোন বিকল্প নাই।

মুকুন্দদাস ছিলেন সংগ্রামী, কষ্টসহিষ্ণু ও বাস্তববাদী দেশপ্রেমিক। তিনি তাঁহার স্বদেশী-যাত্রা ও গানে দেশকে ও জাতিকে স্বাবলম্বী হইবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন। তাই সব কিছু পরিকল্পনা করিবার আগেই তিনি বলিতেন—

"সকল কাজের মিলবে সময়,

আগে দুটি ভাতের জোগাড় কর,

তোরা পেটের জোগাড় কর।"

কর্মের মাধ্যমেই কর্মীর পরিচয় পাওয়া যায় বক্তৃতার দ্বারা নয়। তাই পল্লীসেবা যে ভারত সেবা, দরিদ্র সেবাই যে নারায়ণ সেবা, সমাজসেবাই যে দেশসেবা—মুকুন্দদাস তাঁহার কম্বুকণ্ঠে সেই আহ্বানেরই ডাক দিয়াছিলেন—

"তোরা সবাই কোদাল ধর—

দেশ থেকে তাড়াতে হবে ম্যালেরিয়া জ্বর।

মাথা গুঁজে ভাবলে বসে হবে না দেশের কল্যাণ

কোমর বেঁধে হতে হবে সবায় আগুয়ান।"

জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে তিনি সম্মিলিতভাবে কাজ করিবার আহ্বান জানাইয়াছিলেন—

"করমেরই যুগ এসেছে, সবাই কাজে লেগে গেছে,

মোরাই শুধু রব কি শয়ান।

চিরদিন রব নীচে, চলব সবার পিছে পিছে

সহিব শত অপমান॥"

অতএব—

"পণ করে সব লাগ রে কাজে,

খাটব মোরা দিন কি রাত,

(এই) বাংলা যখন পরের হাতে

কিসের মান আর কিসের জাত॥"

সামাজিক অসাম্য জাতিভেদ, ভণ্ডামি, বঞ্চনা ও মূঢ়তার বিরুদ্ধে ছিল তাঁহার বিদ্রোহ—

"ছল চাতুরী কপটতা মেকি মাল
আর চলবে ক'দিন?
হাড়ি মুচির চোখ খুলেছে
দেশের কি আর আছে সেদিন॥"

দেশের গণদেবতা আজ জাগিয়াছে, তাই ছুঁৎমার্গগামী সমাজ ভয়ে কম্পিত, শঙ্কিত ও ইহাদের দ্বারা নিন্দিত। মুকুন্দদাস বিশ্বাস করিতেন—"জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে, সে জাতির নাম মানুষ জাতি।" তাই তিনি বলিলেন—

"জাতের নামে বজ্জাতি সব, জাত-জালিয়াৎ খেলছ জুয়া।
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয় ত মোয়া॥"

জাতিকে ও দেশকে সামাজিক কুসংস্কারে ঊর্ধ্বে উঠিয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে এবং সামাজিক গণ্ডী ভাঙ্গিয়া দিয়া তাঁতী জোলা প্রভৃতিকে কোলে তুলিয়া লইতে হইবে, ইহাই ছিল মুকুন্দদাসের প্রাণের কথা—

"ডেকে নে তাঁতী জোলা
ছাড়িয়ে নেংটি তিলক ঝোলা,
খুলে দে তাঁতের মেলা প্রতি ঘর ঘর।
কামার কুমার চামার মুচি
তারাই কাজের, তারাই শুচি
ধর জড়িয়ে গলা তাদের
ভুলে আপন পর॥"

মুকুন্দদাস শুধু প্রচারক ছিলেন না, সমাজ-সংস্কারক রূপে তাঁহার পরোক্ষ ভূমিকা বিশেষ লক্ষণীয়—

"সাধে কি আর হচ্ছ রাজী,
তোমায় রাজী করেছে।
সেদিনই জানি ধরবে চরকা
তোমার গিন্নী যেদিন ধরেছে॥"

আবার "কর্মক্ষেত্র" অভিনয়ে "এডিটর"দের লইয়া তীব্র শ্লেষাত্মক গান আজও যেন "এডিটর"দের কানে বাজে—

"এডিটর খোঁজ রাখে ক'জনার।
আমরা ত্রিশ কোটি মায়ের ছেলে,
নাম ছাপ সে দু'চার জনার।"

বর্তমান যুগে শিক্ষিত বেকার-সমস্যা সকল সমস্যার উর্ধ্বে। এই সমস্যার সমাধান না হইলে সমাজের কোন সমস্যারই সমাধান হইবে না। অথচ এই বেকার-সমস্যা এত তীব্র আকারে দেখা দিবার মূলে আছে চাকুরিহীন জীবন অভিশপ্ত ভাবা এবং কায়িক শ্রমের প্রতি অশ্রদ্ধা ভাব পোষণ করা। মুকুন্দদাস তাই বলেন-

"ওরে বি-এ, এম-এ, পাশ করে
নোকরী যদি নাহি মিলে,
ভাবনা কেন কিসের ভয় মিশে যাও না
চাষার দলে ;
খেটে পরে খামার কর, শক্ত করে লাঙ্গল ধর,
দু'দিন পরে দেখতে পাবি,
ঘুচে গেছে হাহাকার।"

কৃষিপ্রধান এই বাংলাদেশ। এখানে প্রায় শতকরা আশি জনই কৃষির উপর নির্ভরশীল। অথচ এই কৃষিকার্যই সমাজে তেমন আদর পায় না এবং কৃষক-সমাজ অবহেলিত, নিন্দিত ও ঘৃণিত অবস্থায় কালাতিপাত করে। রবীন্দ্র-নাথের ভাষায় বলা যায় -ইহারা সভ্যতার প্রদীপ। মাথায় করিয়া প্রদীপটি ধরিয়া রাখিয়াছে। প্রদীপের তলায় থাকে অন্ধকার, ইহারা অন্ধকারের জীব। আর উপরতলায় যারা থাকে তারা পায় শুধু আলো। মুকুন্দদাস ইহাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়া আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—

"ভাই রে, ধন্য দেশের চাষা।
এদের চরণধূলি পড়লে মাথায়
প্রাণ হয়ে যায় খাসা॥
অন্ধ তোরা চিনলি না রে এই দেশের
এই চাষা,
যারা প্রাণ দিয়েও দেশকে বাঁচায়
একই স্বর্গ যাদের আশা।"

মুকুন্দদাস "সবার পিছে সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে" যাহারা আছে

তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন এবং সমাজে দুষ্টক্ষতের মত যে অচ্ছুৎপ্রথা বাঁচিয়া আছে তাহার বিরুদ্ধে, মানবতার কাছে, মানুষের কাছে আবেদন জানাইয়াছেন—

"দেখলেম ভাই জাতিকুল বিচারে,
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, হিন্দু, মুসলমান,
কালেতে ছাড়ে না কারে॥
যতক্ষণ রাস্তার উপরে, ততক্ষণ জাতবিচারে.
খেয়া ঘাটে গেলে পরে, এক নৌকায় সবে চড়ে।"

এই প্রসঙ্গে মুকুন্দদাস কোনরূপ আপোস মীমাংসার পথে যান নাই, তিনি দৃপ্তকণ্ঠে গানের মাধ্যমে, অভিনয়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত জানাইয়াছেন

"আমরা বিচার করে চলবো না
মান-অভিমান রাখবো না
ধনী কি দীন বাছবো না।
হিন্দু-পার্শী-জৈন-সাহ
মুচি-মেথর, ডোম-কসাই
আমরা সকলে এক মায়ের ছেলে,
এই মহামন্ত্র ভুলবো না।"

এপার বাংলা ও ওপার বাংলার মুক্তি-সংগ্রামের অবসান ঘটিয়াছে। কিন্তু মুক্তি-সংগ্রামের অবসান ঘটিলেও জাতীয় সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। এখন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে। ইহার জন্য চাই সাম্প্রদায়িক প্রীতি ও ভালবাসা। কেননা, সাম্প্রদায়িকতার বিষ জাতিকে ও দেশকে কি সর্বনাশা পথে চালিত করে তাহা আমরা দীর্ঘদিন পরাধীন থাকিয়া জীবন দিয়া উপলব্ধি করিয়াছি। আবার স্বাধীনতালাভের পরেও সেই অশুভ শক্তির হাত হইতে রেহাই পাই নাই। মুকুন্দদাস সারাজীবন এই মহামিলনের গান গাহিয়াছেন। তাহার স্বদেশী যাত্রা ও গান এই মহামিলনের মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়াছে।

"রাম রহিম না জুদা কর ভাই
মনটা খাঁটি রাখ জী,
দেশের কথাটা ভাব ভাই রে,
দেশ আমাদের মাতাজী।

হিন্দু মুসলমান এক মায়ের ছেলে

তফাৎ কেন কর জী ॥”

মুকুন্দদাস তাই-মহামিলনের চারণ-কবি। শহরের জীবনে যেখানে নিরবচ্ছিন্ন ক্ষতির খতিয়ান সেখানে মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রা ও গানে এমন এক মহামিলনের পরিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে—যেখানে হৃদয় হৃদয়ের সহিত আলাপ করে, মন মনের সহিত মিলিয়া যায় এবং আত্মা আত্মার সহিত আপনার বিনিময় করিতে চায়। এইখানেই মুকুন্দদাসের স্বদেশীযাত্রা ও গানের অভিনবত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব।

"যাত্রা অনেকদিন ধরিয়া লোকের প্রীতি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই দীর্ঘ শতাব্দীর পর শতাব্দীর রূপ পরিবর্তিত হয় নাই। সকল দেশেই দেখা যায় আদিতে নাট্যের বিকাশ মন্দিরপ্রাঙ্গনে এবং নাট্যের বিষয় মানব-জীবনে দৈবপ্রভাব। পুণ্যের জয় ও পাপের ক্ষয়, চিরন্তন ভাল-মন্দের দ্বন্দ্ব প্রায় অধিকাংশ জাতির নাটকে প্রতিভাত। আমাদের দেশে আদিম কাল হইতে নাটকের ও নাট্যশালার উদ্দেশ্য—ধর্মের মহিমা কীর্তন পুরাণের উপাখ্যানেব মাধ্যমে। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ছোটখাট সুখদুঃখ, আনন্দ ও ব্যথা আমাদের নাট্যের বিষয়ীভূত হয় নাই। আমাদের প্রাচীন যাত্রায় খালি পুরাণ-কথাই আবালবৃদ্ধবনিতার মানসগোচর করা হইত। ইংরাজীতে যাহাকে বলে 'SECULAR DRAMA' আমাদের যাত্রায় কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিল না। অবশ্য বিদ্যাসুন্দরকে 'SECULAR DRAMA' ধরা হইলে এ কথার ব্যতিরেক ঘটে। স্বদেশী আন্দোলনে দেশে যে সাড়া পড়ে সেই সময় অদ্ভুত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নট মুকুন্দদাস যাত্রাকে রাজনৈতিক আন্দোলনের কাজে লাগান। থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পরেই ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকের আরম্ভ। যাত্রার দুর্ভাগ্য বাঙলার থিয়েটার আজকালকার যাত্রাকে অত্যন্ত প্রভাবান্বিত করিয়াছে। এইজন্যই আজ ত্রিশ বৎসর থেকে যাত্রার দল হইয়া দাঁড়াইয়াছে 'থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টি', তবুও যাত্রাই বাঙলার খাঁটি নাট্য, একেবারে বাঙালীর নিজস্ব। আমাদের জাতীয় নাট্য বলিয়া যদি কিছু থাকে সেটি হইতেছে যাত্রা।"

—নাট্যশালা প্রসঙ্গে

—শিশিরকুমার ভাদুড়ি।

সমাজ

—ঃ*ঃ—

মুকুন্দদাস প্রণীত

নায়ক

কামিনী মুখুয্যে	···	গৃহস্থ।
সত্য	···	ভাবুক।
দীনেশ	···	সেবক।
বিনোদ	···	কামিনীবাবুর জামাতা।
শরৎ চ্যাটার্জী	···	ধনী গৃহস্থ।
নগেন	···	ঐ পুত্র।

মেথর, মুদী, চাকর, সেবকগণ, বৈষ্ণবগণ, ঘটক, পুরোহিত, বুড়ো জামাই।

নায়িকা

কালীতারা	···	বিনোদের মা।
নলিনী	··	কামিনীবাবুর স্ত্রী।
সরোজ	···	ঐ কন্যা।
নির্মলা	··	ঐ কন্যা।
প্রমীলা	···	ঐ কন্যা।
প্রমদা	··	শরৎবাবুর স্ত্রী।

প্রতিবেশিনী, ঝি, মেথরাণী, বৈষ্ণবী।

সমাজ

—:*:—

প্রথম দৃশ্য

ঋষি-বালকগণ

(গীত)

"কিছু নাই সংসারের মাঝে,
কেবল কালী নাম সার রে—,
আমার মন কালী, ধন কালী,
প্রাণ কালী আমার রে—
(কেহ) সংসারে এসেছে বড় সুখে আছে,
পেয়েছে রাজ্যভার রে,—
কাঙ্গালেরি ধন, ও রাঙ্গা চরণ,
হৃদয়ে পরেছি হার রে—।
এ তনু ধারণে, এ তিন ভুবনে,
যাতনা নাহিক কার রে—,
হেরিলে শ্রীমুখ দূরে যায় দুখ,
এই গুণ শ্যামা মা'র রে।
কমলাকান্ত হইয়ে ভ্রান্ত,
বেড়াইছে বারে বার রে,—
মায়ের অভয় চরণ লয়েছি শরণ,
অনাযাসে হবো পার রে—।"

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—কামিনীবাবুর বাড়ী।

(কামিনীবাবু ও নলিনী)

নলিনী। এখন কেমন আছ?

কামিনী। ভাল, সরোজ কোথায়?

নলিনী। কাল সমস্ত রাত তোমায় বাতাস করেছিল, এই ভোরের বেলায় আমি তাকে একটু শুতে পাঠিয়েছি। যাবে না,—তবু আমি তাকে জোর করে পাঠিয়েছি।

কামিনী। সরোজ আমায় বাতাস করেছিল, আমি কি করেছি জানো?

নলিনী। কাল তোমার বড় অসুখ করেছিল, সারারাত ছটফট্ করেছ।

কামিনী। আমি বাপ হয়ে তার মৃত্যু কামনা করেছি।

নলিনী। ছিঃ ছিঃ, ও-কথা মুখে আনতে নেই, সরোজকে তুমি যত ভালবাস, আমি তত বাসি না।

কামিনী। তুমি বুঝতে পারছ না গিন্নি? সত্যই মৃত্যু কামনা করেছি। সরোজ আমাদের শত্রু, সরোজ হতে আমাদের সর্বনাশ হবে। উঃ, কন্যাদায়! কন্যাদায়, গৃহস্থ ঘরে কি সর্বনেশে ব্যাপাব!

নলিনী। তুমি অত ভাবছ কেন? বর কি আর জুটবে না?

কামিনী। কি যে জুটবে তা ভগবানই জানেন।

নলিনী। অত ভাবলে আর চলে না, বলি মেয়ে কি কারো হয না?

কামিনী। মেয়ে হয়, কিন্তু এমন স্নেহের পুতলী কার আছে বলো, আমার মুখ ভার দেখলে তার চোখে জল আসে, এ রত্ন আমি কার ঘবে বিলিয়ে দেব? উঃ, দুনিয়ায় টাকা কি আজব জিনিস! টাকা নেই, অথচ আমি নিজে কুলীন, একটু বংশজে নেমে যদি মেয়েব বিয়ে দিই, তা হলে কি সমাজ আমায দেশে রাখবেন? সমাজ বলেন, জাত যাবে, কথা উঠলেই নাক সেটকান, এদিকে যে ঘবে ঘরেই এ বিপদ, তা সমাজ একবারও ভেবে দেখছেন না। ধিক এমন নচ্ছার সমাজে, ধিক্ আমার কুলীনত্বে!

নলিনী। বলি অত ভাবছ কেন? আমাদের যেমন অবস্থা, সেই বকম ঘর-বর দেখে সম্বন্ধ ঠিক করো না। গৃহস্থ ঘব হয, আনে নেয খায়, ছেলেটি লেখাপড়া জানে, কানা-খোঁড়া না হয, তা হলেই তো হলো।

কামিনী। গৃহস্থ ঘর হয়, আনে নেয় খায়, লেখা-পড়া করে, কানা-খোঁড়া না হয়, তার দর কত জানো? পাঁচ হাজার টাকা। আমায় বেচলেও হবে না।

নলিনী। হ্যাঁ, পাঁচ হাজার টাকা! বলি মেয়ের বিয়ে কি কেউ দিচ্ছে না?

কামিনী। তুমিও বিয়ে দিতে চাও দাও, ঘটক তিন-চারটা সম্বন্ধ এনেছে।

নলিনী। তা বেশ, ওরই মধ্যে একটা দেখেশুনে দাও না।

কামিনী। আগে সম্বন্ধের কথাই শোন, প্রথমটির বাপের আড়াই কাঠা জমির উপরে একখানা বাড়ী, শুনতে পাই, বাড়ীখানা বাঁধা দিয়ে ছ'খানা ঘর তুলেছে, আঠারো বছরের ছেলে, স্কুল ছেড়ে দিয়েছেন, বাপের অন্ন ধ্বংসাচ্ছেন, আর সখের থিয়েটার করে বেড়াচ্ছেন। তার দর নগদ হাজার টাকা, হাজার টাকার গহনা, ঘড়ি, ঘড়ির চেইন, খাট-বিছানা। প্রায় তিন হাজার টাকার ধাক্কা, আমায় বেচলেও তা হবে না। আর-একজনের বাপ কোন হাউসে চাকুরী করতেন, চোর বদনাম নিয়ে বাড়ীতে বসে আছেন, ছেলেও ছ'বার পুলিসে জরিমানা দিয়েছেন, হ্যাণ্ড-নোটের দালালী করেন, মাসের মধ্যে প্রায় পনর দিন বাড়ী থাকেন না; বে' করতে তত ইচ্ছা নেই, তবে এক রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজত্ব পেলে মেয়েব বাপের মাথা কিনে বে' করতে রাজী হতে পারেন। এখন দেখ কোন্ পাত্র পছন্দ করবে?

ননিনী। হ্যাঁ গা, তা ঘরে ঘরেই তো এই বিপদ, এর কেউ কোন উপায় করে না গা? এই যে কত সভা করে, কত বক্তৃতা দেয়, যাতে লোকের জাত-কুল রক্ষা হয়, এমন কেউ কিছু করে না গা?

কামিনী। যার ছেলে আছে, সে দাঁও কষে বসে আছে, আর যার মেয়ে আছে, সে আমার মত ফ্যা ফ্যা করে বেড়াচ্ছে; আর তার ঘরেব গিন্নি তোমার মত বলেন, হ্যাঁ গা, এর কেউ কিছু করে না গা? যাঁরা বক্তৃতা দেন, মেয়ের বিয়ের খরচ কমাবার জন্য চেষ্টা করেন, তাঁদের ছেলের সাথে মেয়েব বিয়ের কথা বললে বলেন—আমার ছেলের এখনো বিয়ে করার সময় হয়নি, ওদিকে ঘটক পাঠিয়ে খোঁজ নিচ্ছেন কে দশ-বিশ হাজার টাকা ছাড়বে। সেদিন যিনি সভায় হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তাঁর ছেলের সাথে বিয়েব কথা পেড়েছিলাম, তাতে আজ তিনদিন তিনি আমার সাথে দেখাই করেননি।

নলিনী। তা হলে ঐ এণ্ট্রেন্স পাশ করা ছেলেটির সাথেই বিয়ে স্থির করো।

কামিনী। তা বেশ, তা হলে সব প্রস্তুত করো।

নলিনী। হ্যাঁ গা, তুমি এখনো ছ'মত করছ? এ সম্বন্ধ কি ছাড়তে আছে? বাঁধা-সাধা দিয়ে যেমন করে হোক্ বিয়ে দাও, আর ভাবছ কি?

কামিনী। গিন্নি, ভাবছি কি? ভাবছি অনেক। হাতে মাত্র তিনশ' টাকা আছে, বাকী সব ধার, ভরসার মধ্যে তালপাতার ছাউনি, চাকুরী-টুকুন। কথার ভাব বুঝেছ? দু' হাজারের কম হবে না; আমি কি দিয়ে কি করবো? আচ্ছা ঐ দোজপক্ষের পাত্রটির কথা কি বলো?

নলিনী। হ্যাঁ, চাল নেই, চুলো নেই, দু' দু'টো সতীন-বেটা, এ সম্বন্ধ করে আজন্ম মেয়েটাকে দুঃখ দেবে, এই কি তোমার ইচ্ছা?

কামিনী। কাঙ্গালের আবার ইচ্ছা-অনিচ্ছা কি? বাড়ি বাঁধা দিয়ে দু'হাজার টাকা কর্জ করলে মনে কর এ জীবনে আর শোধ হবে? এক মেয়ে বিয়ে দিয়ে তুমি সগুষ্টি মজতে বলো?

নলিনী। আমি আর তোমাকে কি বলবো? যা ভাল বোঝ, তাই করবে। ছেলেমেয়ের জন্যই সব, ছেলেমেয়ের জন্যই সংসার-ধর্ম।

কামিনী। তুমি কি মেয়ের বিয়ে দিয়ে পথে বসতে চাও?

নলিনী। বরাতে থাকে, বসবো। কাল পথে বসবো বলে কি আজই মেয়েটাকে ধরে জলে ফেলে দেবো? তোমার যতদূর সাধ্য চেষ্টা করো, বেটা ছেলে, বুক-ভাঙ্গা হও কেন?

কামিনী। গিন্নি, আমিও লোককে উপদেশ দিতাম, কিন্তু সংসার বড় কঠিন। এ বন্ধু-বান্ধবহীন অরণ্য, আগে বুঝে না চললে পরে নিশ্চয়ই পস্তাতে হবে।

নলিনী॥ অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে, তুমি এ সম্বন্ধ ছেড় না।

কামিনী। অদৃষ্টে যা আছে তা দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, গাছতলা, গিন্নি—গাছতলা।

নলিনী। দেখো, টেনে-টুনে সংসার চালানো যাবে, এখন মেয়ে পার করো, তার পর দেখা যাবে।

কামিনী। টানবে আর কত? মাইনে তো আর দেড় শ'-এর বেশী আসবে না? যা ভাল বোঝ কর, আমি বাড়ীখানা বাঁধা দেবার যোগাড় করি গে।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—বিনোদবাবুর বাড়ী।

(কালীতারা, ঘটক, বিনোদ, সত্য, সেবকগণ)

ঘটক। আপনি নিজে গিয়ে দেখে আসুন। একটা গাউন পরিয়ে দিলে আপনি ইহুদীর মেয়ে না ঠাওরান, তখন আমায় বলবেন।

বিনোদ। লেখপড়া জানে?

ঘটক। আজ্ঞে, আদরের মেয়ে, মাষ্টার রেখে লেখাপড়া শিখিয়েছে। এক্ট যা করে, তা যদি শোনেন, তা হলে আপনি থিয়েটারে যাওয়া ছেড়ে দেবেন। আর গান যা করে, তা যদি শোনেন, তা হলে মনে করবেন যে গহরজান বায়নায় এসেছে।

বিনোদ। রসিক তো?

ঘটক। নাটক পড়েছে, নভেল পড়েছে, রুমালে এসেন্স মেখে কেবল নাকের ধারে ঘুরাচ্ছে। বাঁড়ি-হেঁসেলের নাম করেছেন কি, মূর্চ্ছা! আপনি দেখেই আসুন না? তবে গিন্নি-ঠাকরুণ একটু অমত করছেন, সেইটে আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে। ঐ যে তিনি এদিকেই আসছেন, ভয় কি? আমিও যতদূর পারি বোঝাতে চেষ্টা করবো।

(কালীতারার প্রবেশ)

কালী। কি ঠাকুর? আমার ছেলের সম্বন্ধ করা তোমার কর্ম নয়।

বিনোদ। কার কর্ম নয়? ঐ ঘটকীর দেখা মেয়ের সাথে আমার বিয়ে দেবে মনে করেছ, তা হচ্ছে না। এই মেয়ের সাথে হয় তো বিয়ে করবো, তা না হলে বিয়েই করবো না, তোমায় এক কথায় বলে দিচ্ছি।

ঘটক। মা ঠাকরুণ। কি সম্বন্ধটাই এনেছি, একবার কান পেতে শুনুন; কামিনী মুখুয্যের বড় মেয়ে, নৈকুষ্য-কুলীন, যারে আপনারা মুখ্যি বলেন। দু' ছুট গহনা, এক ছুট রুপোর, আর এক ছুট সোনার। এক একখানা গহনা যেন এক একখানা শীল। ঘড়ি, ঘড়ির চেইন, খাট-বিছানা আরও কত কি!

কালী। বলি নগদ কত?

ঘটক। ঐটেই কিছু কম। বলেন, আমি কুলীন, আমি আবার টাকা দিয়ে মেয়ের বে দেবো? তবে যৌতুক-স্বরূপ হাজার টাকা দিতে পারি।

কালী। পোড়া কপাল! ছেলের মন হয়েছে, তাই করতে যাচ্ছি। দু'হাজার টাকা দিতে বল গে। আর সোনার গহনা আমি দু'শো ভরি ওজন করে নেবো। আর আজকাল নাকি সোনার দান-সামগ্রী হয়েছে, তাই দিতে হবে, রুপোয় চলবে না। আমার পাশ করা ছেলে, একখানা বাড়ী লিখে দিলে তবে ঠিক হয়।

বিনোদ। মা, তুমি পেড়া-পিড়ি করতে চাও করো, আমি মানা করছিনে, কিন্তু যদি এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে দাও, তবে জেনো বিনোদ Bachelor থাকছেন, আর কলেজ ছেড়ে বিলেতে যাচ্ছেন। মনে করেছিলুম. F. A. পরীক্ষাটা আর একবার দেবো, তা আর হচ্ছে না।

কালী। নে নে চুপ কর।

(সত্যের প্রবেশ)

সত্য। নে নে চুপ কর বললেই কি আর চুপ করবে মা? যখন চুপ করার দিন ছিল, তখন চুপ করেছে, এখন সে দিনও নেই, সে কালও নেই। যখন বুকে ছিল, তখন তোমার ছিল, এখন তোমার কে? ছেলে। সে তো ভুল, এখন পাশ করেছে, দর বেড়েছে, চোখ খুলেছে, ধরাখানা দেখছে সরার মতন। বলিহারি যাই ছেলে! ছেলে নয় তো রাস্তায় কুলী, ছেলের রকম দেখলে হয়! কৈ, আমার তো এতগুলি ছেলে আছে, তার একটিও তো এমন হয়নি। যাক্‌, ধাবে যাই, মায়ে-ছেলের রঙ্গ দেখি গে।

কালী। এ পাগলটা আবার কোত্থেকে এলো?

সত্য। এলো চুলো থেকে, পাগল বলে পাগল, সংসার নয় তো গোলক ধাঁধা, এরা দু'জনেই সেই ধাঁধায় পড়ে ঘুরছে। ঘোর ঘোর, ঘুরবে না তো করবে কি? ঘুরাচ্ছে তাই ঘুরছে।

কালী। তুই এখানে কি চাস?

সত্য। আমি তো সর্বত্রই চেয়ে বেড়াচ্ছি, আমি কি চাই, তা শুনবে?

(গীত)

আমি যাঁরে চাই,
তাঁরে কোথা পাই,

ঠিকানা না পাই

শুনি সর্ব ঘটে,
ঘটে মঠে পটে,
রয় সে নিকটে,
দেখা নাহি পাই ॥

কালী। কোথায় থাকে তাও বলতে পারিস নে?

সত্য। কি করে বলবো মা? তবে গুরুদেবের মুখে শুনেছি।—

কমল কাননে
রবি শশী কোণে,
মক্কা বৃন্দাবনে
যমুনা পুলিনে,
যেখানে যখন,
মজে তাঁর মন,
হয় সে মগন,
বাঁশরী বাজাই ॥
মাঝে মাঝে থাকি,
আঁখি মুদে বসি,
দেখি কাল শশী,
চুপি চুপি আসি,
হৃদি কুঞ্জবনে,
মারে উঁকি ঝুঁকি।
মুকুন্দ ধরি বলে গেলে,
যায় গো পালাই ॥

বিনোদ। এইও Damn, নিকালো হিঁয়াসে, ক্যা মাংতে হিঁয়া?

সত্য। আরে বাপ রে, ভাষা আর বাকী রাখলে না দেখছি! একেবারে সব বিদ্যায় এক কলম! অবাক করেছে, ভেবেছিলাম আমিই পাগল, এখন দেখছি যে আমার চেয়েও আছে। সাধে কি আর পাগল হয়েছি বাবা? এসব দেখেশুনেই মাথাটা বিগড়ে গেছে। বলি হ্যাঁগা? এ ছেলেটি কি তোমার?

কালী। হ্যাঁ, তা দিয়ে তোর কাজ কি?

সত্য। কাজ আছে গো, কাজ আছে। বলি যখন হয়েছিল, তখন আঁতুড় ঘরে নুন্ খাইয়ে মেরে ফেলতে পারনি?

কালী। দূর হ, দূর হ এখান থেকে, তা না হলে ঝেঁটা দিয়ে তোর কপালের কাঁটা খুলে দেবো

সত্য। তা আমার খুলতে হবে না গো, আমার খুলতে হবে না। দু'দিন পরে ঐ ঝেঁটা তোমার নিজের কপালেই উঠবে। কি বলবো আমার এমন ছেলে হত তো, গলায় ছুরি বসিয়ে দিতুম।

বিনোদ। **You damn, go out, go out !**

সত্য। বাপ রে, সরে পড়াই ভাল ; ছেলের যা রকম দেখতে পাচ্ছি, তাতে দু'ঘা বসিয়ে দিতেও পারে। যাই বাবা, মানে মানে মান নিয়ে পালাই।

(গীত)

ধেৎতরি বড় দেক্ সেক্ লাগে
ছেলের কপালে মাবো
দু'শো ঝেঁটা
কবে আসবেন কল্কী
বিলম্বে আর ফল কি,
এলে পরে সব,
ঘুচে যেতো লেঠা ॥
কোথা হতে এলেন,
বসটা কি দারুণ,
বীব কি বীভৎস,
হাস্য কি করুণ,
সব কাজে ছেলেরা—
জিজ্ঞাসে দরুন,
তর্কে পঞ্চানন,
ইয়ারকিতে জ্যেঠা।
পড়ে অল্প কিছু,
খায় বার্ডছাই,
মুখে বলে মাইরি,
যাদু মরে যাই,
মায়ের উপর চটা,
বউকে বলে ভাই,

টেরি পাকানো, মাথে,
চোখে চশমা আঁটা।
মা বেটী অভাগী,
গুদাম ভাড়া পাবে,
ওল্ড ইডিয়েট বাপটা,
বসে বসে খাবে,
গিন্নি কেবল,
মাসোহারা নেবেন,
কোমল করে তাব
সয় কি বাট্না বাটা? (প্রস্থান)

বিনোদ। ঠাকুর! এ লোকটাকে তুমি চেনো?

কালী। হ্যাঁ, আমি চিনি, আমাদের পাড়ায় ভিক্ষে-শিক্ষে করে খায়। দেখ, আমি তোর মন্দকাবী নই। দু'বার ফেল করে এণ্ট্রেসটা পাশ করেছিস। পাশ কবেছিস বলেই আজ দর বেড়েছে। তা যাও ঠাকুর! দু'হাজাব টাকা দিতে বল গে, ছেলের মন হয়েছে, তাতেই এত কমে রাজী হচ্ছি।

ঘটক। তা কি করবো মা ঠাকুরুণ, আমাব কপাল, সে এক কথার লোক, নড়-চড় হবাব উপায় নেই। আমাব মতে করে ফেলুন, বয়স তো আব কম হযনি? আব কত দিন হাঁড়ি ঠেলবেন?

বিনোদ। তুমি যে বললে বান্নাব নাম শুনলে ফিট্ হয়!

ঘটক। হযই তো, হয়ই তো। তুমি চুপ কর না। তোমাব মাকে নানা কথা দিযে বোঝাচ্ছি।

কালী। হ্যাঁ, যা বলেছ বাছা, আব হাঁড়ি ঠেলতে পারি না। গতর ভেঙ্গে গেল। তা যাও, দেড় হাজাব টাকা দিতে বল গে; আমি রাজী আছি।

বিনোদ। আব দেড় পয়সাও নয, আমি চল্লুম, কাব বে দাও আমি দেখবো!
(প্রস্থান)

ঘটক। আর কিছুই হবে না, ঐ হাজার টাকায হয তো বলুন। তা না হয় আমি সবে পড়ি।

কালী। তা দেখ, ছেলের একান্ত ইচ্ছা, আর কিছু বাড়িযে দাও গে।

ঘটক। না গো না, আর কিছুই বাড়বে না।

কালী। দেখো! আমি কিন্তু সোনা ওজন করে নেবো!

ঘটক। তার জন্ম ভাবনা কি মা? আমিও দাঁড়িপাল্লা ঠিক করেই রাখবো।

কালী। তা যাও, ছেলে একেবারে ঝুঁকে পড়েছে ; তাই এত সস্তায় ছাড়লুম।

ঘটক। তা হ'লে প্রস্তুত হউন, কাল গায়ে হলুদ, পরশু বিয়ে। (স্বগত) এ বেটী ঘটক বিদায় যা করবে তা মা গঙ্গাই জানেন। (প্রস্থান)

কালী। বড় সস্তায় ছাড়লুম, সস্তায় ছাড়লুম।

(সত্যের প্রবেশ)

সত্য। বলি ছাড়লে কেন? ঐ গো-শালায় বেঁধে রাখো ; বাঁধতে পারবে না তো আমায় বলো, আমি বেঁধে দিচ্ছি, আরও বড় হবে, দর আরো বাড়বে। কসাইগিরি না করলে কি আর গতর মোটা হয়? হা-রে মাংস-লোভী সমাজ! ভাল মাংস খেতে শিখেছ, ছেলের মাংস, মেয়ের মাংস। ছেলে-মেয়ে বেচে না খেলে কি দিন চলে না? তবে মর গে, গলায় কলসী বেঁধে জলে ডুবে মর গে! তুমি মরলে সমাজের কিছু বয়ে যাবে না, বরং কল্যাণ হবে, কারণ দেশের একটা শত্রু নষ্ট হয়ে যাবে। কি করি, কোথা যাই? যাই, মায়ের পায়ে ধরে দেখি (পদ ধারণ)! মা, মা ; দেশকে রক্ষা করো, দেশ উৎসন্নে গেল, কসাই-বৃত্তি ছাড়!

কালী। (পদাঘাত করিয়া) আরে মলো, এটা আবার এমন করছে কেন? দূর হ' এখান থেকে। (প্রস্থান)

সত্য। পদাঘাত করে চলে গেলে? যাও, জন্মের মত যাও, চুলোয় যাও। মা নয় রাক্ষসী, মায়ের যোগ্য নয়। কি সর্বনাশ, যেদিকে চাই, সেদিকেই হাহাকার। যেদিকে চাই, সেদিকেই দেখতে পাই, সতীর নয়ন-জলে দেশ ভেসে যাচ্ছে। দেশ উৎসন্নে গেল, আর কি দেশ থাকবে? যে দেশে অবলার 'পরে এত অত্যাচার, সে দেশের মঙ্গল হতে পারে কি? ধিক্ সমাজ, ধিক তোরে! ইচ্ছা হয় তোকে ধরে পিষে পিষে জন্মের মত নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে, দেশে শান্তি স্থাপন করি, মায়ের মুখে হাসি দেখি। যাই, আর এখানে দাঁড়াতে পারছি না, মাথা ঘুরছে, শ্রীগুরু-কল্পতরুমূলে একটু বিশ্রাম করি। (প্রস্থান)

(সেবকদের গীত)

গেলে কল্পতরু মূলে,
চারি ফল মিলে,
তাই ভেবে প্রেম উথলে রে

বদন ভরিয়ে প্রেমেতে মাতিয়ে,
সুধা-মাখা নাম গাও না রে।
যে নামেতে শিলে,
ভেসেছে সলিলে,
যে নামের বলে,
পাষাণ যায় গলে,
সেই নাম-ব্রহ্ম,
গাও কুতূহলে,
তোর মায়ার বন্ধন, যাবে কেটে রে॥
যে নাম স্মরিলে,
আনন্দ উথলে,
প্রাণ যায় গলে,
যে নাম কলিকালে,
পারের ভেলা বলে,
সে নাম-বসে
মুকুন্দ ডোরে রে॥ (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—উদ্যান

(সত্য, নগেন, সেবকগণ)

সত্য। সংসার নয় তো গোলক-ধাঁধা। ঢুকলে আর রক্ষা নেই। কত রং-বেরঙের লোক দেখতে পাচ্ছি, কেউ হাসছে, কেউ নাচছে, কেউ গাচ্ছে। কিন্তু বাবা! এর সকলের পেটেই জিলিপির প্যাঁচ। হাতে ছুরি, সময় আর সুবিধা পেলে, গলায় বসাতে কেউ ত্রুটি করে না গো, কেউ ত্রুটি করে না। যিনি অলকা তিলকা পরে সর্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ লাগিয়ে মালা টপ্ টপ্ করছেন, তিনিও গোলক-ধাঁধার হাত এড়াতে পারেননি; কারণ মালা টিপতে টিপতে সুদের টাকার হিসাব করতেও তিনি দ্বিধা বোধ: করেন না। আর যিনি সতীর উপরে কটাক্ষ হেনে পাপের মাত্রা বেশী বাড়িয়ে যাচ্ছেন, তিনিও গোলক-ধাঁধা। ঠাকুর, কত দিনে এই গোলক-ধাঁধার

হাত এড়াবো, তা তুমিই জানো। থেকে থেকে গুরুদেবকেই ভুলে যাচ্ছি। একটু শ্রীগুরুর চরণ চিন্তা করি না কেন।

(নগেনের প্রবেশ)

নগেন। গুরুদেব ! দাস নগেন প্রণাম করছে !

সত্য। নগেন এসেছ ? এস বাবা, আশীর্বাদ করি, মায়ের কৃপা লাভ করে কৃতার্থ হও। এতদিন আসনি কেন ?

নগেন। বিষয়-কার্যে এত ব্যস্ত ছিলাম যে, দেখা করার সময় করে উঠতে পারিনি।

সত্য। আরে ইচ্ছা থাকলে, ওর মধ্যেও সময় করে নেওয়া যায়। যাক্ ভাল আছ তো ?

নগেন। আপনার শ্রীচরণাশীর্বাদে ভাল আছি। ভগবানের কৃপায় আপনার মঙ্গল তো ? আর বুড়ো দাদাহবা কেমন আছেন ?

সত্য। আমার গুরুদেবের কথা জিজ্ঞেস করছ ? তাঁর আর ভাল-মন্দ কি ? পূর্বেও যেমন ছিলেন, এখনও তেমনিই আছেন, তবে মাঝে মাঝে বলেন, আজকাল নিদ্রাদেবীর দয়া বড় বেশী অনুভব করছি, প্রায় সময়ই শুয়ে কাটাই।

নগেন। একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি ?

সত্য। অনায়াসে জিজ্ঞেস করতে পারো।

নগেন। মানব-জীবনের কর্তব্য কি ?

সত্য। বড় কঠিন প্রশ্ন ! আমি যতদূর বুঝি, তাতে নর-সেবাই মানব-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।

নগেন। সে নর-সেবা কিরূপ, বুঝিয়ে বলুন !

সত্য। তুমি দরিদ্র-বন্ধু সভার কার্যাবলী দেখলে সহজেই বুঝতে পারবে।

নগেন। তাঁদের কার্যাবলী কি রকম ?

সত্য। তাঁদের প্রথম কাজ ভিক্ষা করে কিছু অর্থ সঞ্চয় করা, সে অর্থ দিয়ে যার খাবার নেই, তাকে দু'টি অন্নের সংস্থান করে দেওয়া, রোগীর সেবা করা, অর্থাভাবে যে সকল ছেলেরা লেখা-পড়া করতে পারে না, তাদের সেই জন্যে কিছু সাহায্য করা। আরো কত কি তাঁরা করেন। আমার মনে হয়, ইহাই প্রকৃত মানুষের কাজ।

নগেন। চমৎকার ! আমি তাঁদের সাথে মিলে কাজ করবো, আমায় তাঁদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবেন ?

সত্য। তা বেশ। আনন্দের সাথে তাঁদের সাথে গিয়ে কাজে যোগ দাও, সংসারের অনেক কাজ করতে পারবে। ও কিসের গোলমাল হচ্ছে?

নগেন। তা এদিকেই ত আসছে মনে হয়।

(সেবকদের প্রবেশ)

(গীত)

আয় ভাই আয় মাতি নব বলে
এই মহাব্রত সাধিব সকলে,
অদম্য উৎসাহে যতন করিলে,
স্বরগ হইবে মরত ধাম।
ঘৃণা অভিমানে দিব না বেদনা
পশু-পক্ষী-কীট তাঁহারি রচনা,
প্রচারি জীবনে দয়ার মহিমা,
অহিংসা-মন্ত্র জপ অবিরাম।
সত্যের নিশান তুলিয়ে গগনে,
পবিত্রতামৃত পূরিয়ে পরাণে
প্রেম-ডোরে বাঁধি ভাই-ভগ্নীগণে,
চল, পূর্ণ হবে যত মনস্কাম।
অগ্নিদাহে কেহ সর্বস্ব খোয়ায়,
দাঁড়িয়ে না রব পুতুলের প্রায়,
রোগীর শিয়রে মৃত্যুর শয্যায়,
জাগিব, গাহিব, তাঁহারি নাম॥
সাহিত্য-সাগরে রতন খুঁজিয়ে
বিশ্ব-শিল্পী পায় শিল্পজ্ঞান লয়ে,
সঙ্গীতের সুধা চৌদিকে ঢালিয়ে,
মানব-মহত্ত্বে তুলিব তান॥
গুরুজন-পদ ধূলি মাথে নিয়ে,
সত্য-প্রেম-শুদ্ধি-পতাকা উড়িয়ে,
ভাসানু তরণী ধ্রুবতারা চেয়ে,
ঐ দেখা যায় স্বরগ ধাম॥

সত্য। কিহে দীনেশ? এ বালককে কোথেকে নিয়ে এলি?

দীনেশ। এ একটি অনাথ বালক, জাতিতে মেথর, কলেরা হয়ে রাস্তায় পড়ে

ছিল, আমরা একে Hospital-এ নিয়ে যাচ্ছি। চেষ্টা করে দেখি, বাঁচান যায় কিনা!

সত্য। বেশ করেছ, বড় সুন্দর কাজ করেছ দীনেশ। যাও, তা হলে আর বিলম্ব করো না, তোমরা কিন্তু ধারে থেকে এর যত্ন নিও। মেথরের ছেলে বলে প্রাণে যেন ঘৃণা আসে না। সকলেই এক ভগবানের সন্তান, ভগবানের থেকেই এসেছে, আবার তাতেই গিয়ে মিলবে।

দীনেশ। আমরা দু'জন করে এর সেবায় নিযুক্ত থাকবো, তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

সত্য। দু'জন কেন, চারজন করে এর সেবায় নিযুক্ত থাকবে। প্রাণ দিয়েও যদি বালককে রক্ষা করতে পার, তার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করবে। এর মা-বাপ কেউ আছে কিনা তা জানতে পেরেছ কি?

দীনেশ। সে খোঁজেও লোক পাঠান হয়েছে।

সত্য। বেশ করেছ, তবে আর বিলম্ব করো না, Doctor Mukerjeeকে খবর দাও, তাঁকে বলো তিনি যেন যত্ন করে এর চিকিৎসা করেন। টাকার জন্যে তোমরা ভেব না; টাকা যত লাগে, তা আমি দেবো। তোমরা আমায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় খবর দিও।

দীনেশ। তা নিশ্চয় দেবো। আয় ভাই, যাবার সময় আবার ঐ গানটি গেয়ে যাই। গুরুদেব বলেছেন, ঐ গানটিই আমাদের সাধনা।

(গীত)

আয় ভাই আয়, মাতি নব বলে,
এই মহাব্রত সাধিব সকলে;
অদম্য উৎসাহে যতন করিলে,
স্বরগ হইবে মরত ধাম।—ইত্যাদি।

নগেন। গুরুদেব? এ সব বালক, এরা কারা?

সত্য। এই মাত্র তোমায় যে সব ছেলেদের কথা বলেছিলাম, এই সে সব ছেলেরা। এরা কি মানুষ? এরা দেবতা। দেখলে না সব বড় বড় লোকের ছেলে একটা মেথরের ছেলেকে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে! এ দেখে কার না আনন্দ হয়, বল দেখি?

নগেন। সে কথা আর বলতে? আপনার কথা, আর এ সব দেখে-শুনে আমার মনে হয়, এদের পায়ের উপরে পড়ে থাকি, ওদের চরণ-ধূলি মাথায় নিয়ে কৃতার্থ হই।

সত্য। সত্য সত্যই এদের পদ-ধূলি নিলে মানুষ পাপ-মুক্ত হয়। এরাই প্রকৃত মানুষ, আর এরা যা করে যাচ্ছে, ইহাই প্রকৃত মানুষের কাজ। এ সব কাজে মানুষের মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়। শ্রীচৈতন্যদেব যেমন আচণ্ডালে কোল দিয়ে, তাঁর প্রেমের বন্যায় জগৎ প্লাবিত করেছিলেন, তোমরা যতদিন সেই শ্রীচৈতন্যের আদেশে অনুপ্রাণিত হয়ে আচণ্ডালে কোল দিতে না পারবে, ততদিন পর্যন্ত তোমাদের ভারতের কল্যাণ নেই।

(ঢোল দিতে দিতে একটি সেবকের প্রবেশ)

সত্য। কিরে? তুই আবার কিসের ঢোল দিচ্ছিস?

সেবক। আজ বেলা তিনটের সময় সম্মানের দালানে গরীব-দুঃখীদের শীতবস্ত্র দেওয়া হবে?

সত্য। কে দেবে?

সেবক। দরিদ্র-বন্ধু সভা হতে দেওয়া হবে। (প্রস্থান)

নগেন। ধন্য, ধন্য এদের শিক্ষা, ধন্য এদের সাধনা, ধন্য এদের শিক্ষাদাতা গুরু! এ না হলে কি আর মানুষের মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়?

সত্য। কি নগেন, তুমি অবাক হলে নাকি?

নগেন। গুরুদেব। সত্য সত্য আমি অবাক হয়েছি। আপনি আমায় আদেশ করুন, আমি এদের চরণ-তলে বসে সেবা-ধর্ম শিক্ষা করে নিই!

সত্য। যাও নগেন! আনন্দের সহিত আরো দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করবে। যাবার বেলায় তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, তুমি কামিনী মুখুয্যেকে চেন?

নগেন। হ্যাঁ, তাঁকে আমি বিলক্ষণ চিনি, তিনি কোন কোন সময় আমার গুরুর কাজ করেছেন।

সত্য। তা হলে তুমি এখন তাঁর শিষ্যের কাজ করো। বর্তমানে তিনি বড়ই বিপদাপন্ন—তিনটি মেয়ে, একটি মেয়ে বিয়ে দিতেই তিনি বাড়ীখানা বাঁধা দিয়েছেন, আরো দু'টি মেয়ে তাঁর ঘরে। যদি পারো, তাঁকে কিছু সাহায্য করো। তোমার বাবার প্রচুর সম্পত্তি রয়েছে, তুমিও এম্-এ পাশ করেছ। কিছু সাহায্য করলে আমি খুবই আনন্দিত হবো।

নগেন। আপনার আদেশ প্রতিপালন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

সত্য। আশীর্বাদ করি, মা তোমার মঙ্গল-ইচ্ছা জয়-যুক্ত করবেন। সেবকদের ওখানে যাবার পূর্বে কালীমন্দিরে একবার আমার সাথে দেখা করে যেও, আমি তোমায় ধর্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বলে দেবো।

নগেন। যে আজ্ঞে! (উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—কামিনীবাবুর বাড়ী।

(কামিনী, নলিনী, ঝি)

কামিনী। কি কেলেঙ্কার! কেলেঙ্কারের একশেষ, যতদূব কেলেঙ্কারী হতে হয়, তা হয়েছে। যে লোক কথা কইতে প্যারে না, তারও হাত-নাড়া সহ্য করতে হলো। পাছ্‌-দুয়ারের কুকুর, সেও কিনা হাত নাড়ে! মেয়ের জন্য বরাতে আরও কি আছে, তা কে জানে!

নলিনী। হ্যাঁ গা। ও মিন্সে কে? ও অমন করে হাত-মুখ নাড়ল কেন?

কামিনী। কে জানে বল, শুনতে পাই বেযানেব নাকি সম্পর্কে ভাই হয়, হ্যাণ্ড-নোটের দালালী কবে। লগ্ন ভ্রষ্ট হলো, ববযাত্রীবা কেউ খেতে পারলে না। ভাগ্যে দশজন ভদ্রলোক ছিল। বব নিযে উঠে যেতে চায়, এত বড় স্পর্ধা!

নলিনী। হ্যাঁ, যা হবার তা হয়েছে, এখন বেযানেব পাওনা মনে ধরলে হয়। ঐ যে ঝি মাগী এদিকে আসছে, এব ভাব তো কিছুতে বুঝতে পারছি না।

(ঝি'ব প্রবেশ)

ঝি। হু-হু-হু—

নলিনী। হু কি বল্? সরোজ ভাল আছে তো? তুই সেখান থেকে চলে এলি কেন? মাগীব মুখে কথা নেই!

ঝি। (কেঁদে) আরে রসো না, আগে একটু জিরুই, এক ঘটী জল খাই, তবে তো মুখে রা সরবে!

নলিনী। কেন রে, কি হযেছে? তুই বুঝি সেখানে কোন্দল কবেছিস?

ঝি। হয়েছে কি তা শুনবে? তোমার মেয়েব জন্য এখন গর্দান দিতে বলো কি?

নলিনী। তোর কথার ভাব যে কিছুই বুঝতে পারছি না, বলি খুলেই বল্ না?

ঝি। বলবো, শুনবে? পাল্কী খুলে বউয়ের মুখ দেখে অমনি মাগী কেঁদে উঠলো, বলে, কোথাকার হা-হাবাতের মেযে আনলুম গো, পাতা-কুড়ানীর মেয়ে আনলুম গো, আমার বিনোদের বরাতে এই ছিল গো, কর্তা কোথা গেলে গো!

নলিনী। হ্যাঁরে, মেয়ে-ছেলে বরণ করলে না?

ঝি। হ্যাঁ, বরণ করবে? শোন, এগিয়ে শোন। এই বেটা ম'লে যেমন চিকুটি ঝাড়ে, সেই রকম চিকুটি ঝাড়তে লাগলো। মেয়ে-ছেলে ঘরে নিলে, মাগীরা সব দেখতে এলো, এক একবার বউয়ের মুখ দেখে আর চিকুটি মেরে ওঠে, আর গয়নাগুলি ছুঁড়ে ফেলে দিলে, বলে কিনা ফুঁয়ে গয়না উড়বে।

নলিনী। ফুঁয়ে গয়না উড়বে? এত ভারি ভারি গয়না দিলুম, তা একবার মুখেও আনলে না?

ঝি। তা, আর অতগুলি দিলেও মন উঠতো না! এখন টাকা নিয়ে মায়ে-পোয়ে ঝগড়া হচ্ছে।

নলিনী। তারপর, তারপর?

ঝি। তারপর আর কি? তোমার মেয়ে-জামাই ছেড়ে শেষে আমার উপর ঝুঁকলো, আমি অমনি দৌড়ে পালালুম। আজ দু'দিন আমায় কিছু খেতেও দেয়নি। (কান্না)

নলিনী। তোকে এই দু'দিন খেতেও দেয়নি?

ঝি। হ্যাঁ, খেতে দেবে? লাঠি নিয়ে মারতে এলো, আমি অমনি দৌড়ে পালালুম, বুড়ো বয়সে মার খেয়েছিলুম আর কি? মাগীর আমার গতর দেখলে হয়!

কামিনী। যাও যাও, যেখানে মেয়ে-কর্তা, সেখানে কাজ করা ভাল হয়নি; কেবল তোমার কথায় পড়ে এ কাজ করতে হলো।

নলিনী। আমি এর কি জানি? তুমিই ত সব দেখে-শুনে এলে।

কামিনী। যাও, যা হবার তা হয়েছে, এখন আর কথা বলাবলি করে কাজ কি?

নলিনী। শুনতে পাই, তোমার বেয়ান মাগী বড়ই খারাপ।

কামিনী। তোমার জামাইও ত তত ভাল হবে না। যখন হাতে হাতে ধরে দিলাম, তখন বললেম, বাবা! এখন তোমারই সব। তাতে ছোঁড়া বিড় বিড় করে কি বলতে লাগলো, আমি ভাল বুঝতে পারলুম না। আমার বোধ হলো, যেন ড্যাম্ ড্যাম্ করতে লাগলো। যাক্, এখন আর ভাবলে তো চলবে না? ফুল-শয্যার যোগাড় কর গে।

নলিনী। হ্যাঁ, যা হবার তা-তো হয়েছেই, এখন ফুল-শয্যাটা যাতে ভাল করে দিতে পারো, তার চেষ্টা করো।

কামিনী। ফুল-শয্যা যে ভাল করে দিতে বলছ, হাতে যে একটি পয়সাও নেই; কি দিয়ে কি করবো? যা ভাল বোঝ কর গে, আমি এখন চল্লুম। (সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—বিনোদবাবুর বাড়ী।

(বিনোদ, কালীতারা, সরোজ, প্রতিবেশিনী, সত্য)

কালী। দেখ, দেখ, গয়নাগুলির শ্রী দেখ।

প্রতিবেশিনী। তাই ত, গয়না তো মন্দ দেয়নি, বেশ গয়না দিয়েছে।

কালী। বলি, বিয়ে কারো না দিয়ে থাকো, বিয়ে কি দেখওনি?

প্রতিবেশিনী। ফিরিয়ে দাও গো, ফিরিয়ে দাও, পছন্দ না হয়ে থাকে, ফিরিয়ে দাও।

কালী। না গো না, আমি তেমন ছোটলোকের মেয়ে নই; ঐ মিন্সে ছোটলোকপনা করেছে বলে কি আমিও ছোটলোক হবো?

বিনোদ। ড্যাম ইট্, আমি জানি এটা একটা ব্লাক বি

কালী। অবাক করেছে মা, অবাক করেছে! দেখ দেখ গয়নাগুলির শ্রী দেখ; নাকটা যেন কিলিয়ে ভেঙ্গেছে, চোখ দুটো যেন গেছে, চুল গোছটা যেন ঝেঁটা।

প্রতিবেশিনী। তা তোমার মতন কি আর হয় গা? শুনতে পাই, তুমি এ বাড়ীতে পা দেওয়া মাত্র বাড়ীখানা যেন দপ্ দপ্ করে জ্বলতে লাগলো।

কালী। না গো না, তবে আমরা সুন্দরী না হলেও এমন কালো পেঁচা এসেছিলুম না।

প্রতিবেশিনী। তা তোমার মতন হাস্য-বদনী কি কেউ হয় গা?

বিনোদ। ড্যাম ইট্ মা! ভাল চাও তো শীঘ্র একে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দাও। বল, বল, আমাদের Party

কালী। দেখ, গয়নাগুলির শ্রী দেখ, গা জ্বলে যাচ্ছে!

প্রতিবেশিনী। তা, মেয়ের বাপ তো টাকাও দিয়েছে, ভেঙ্গে গড়িয়ে দাও না?

কালী। হ্যাঁ, টাকা দিয়েছে,

বিনোদ। মা, টাকা বের করো, টাকা বের করো।

কালী। ঐ শ্যামাই যত নষ্টের মূল।

(নেপথ্যে) কোন্ বাড়ী, কোন্ বাড়ী ?

প্রতি। বিনোদের মা ! ঐ বুঝি ফুল-শয্যা নিয়ে এসেছে, শীঘ্র ফুল-শয্যা করাও।

কালী। চলো মা চলো, মিন্সে কি পাঠিয়েছে, দেখে আসি গে।

(সকলের প্রস্থান)

সরোজ। মা সর্বমঙ্গলে ! কি করলে মা ! বিনা অপরাধে ভীষণ অত্যাচার, স্বামীও পায়ে ঠেলে চলে গেলেন, এখন দাঁড়াই কোথা মা ? বিপদ-বারিণি, এস মা, এ বিপদ হতে আমায় রক্ষা করো মা ! জানি, আমার চোখের জল, তোমার ঐ পাষাণ-বুক নরম করতে পারবে না, তবু ডাকি মা, সন্তান মায়ের কাছে কাঁদে, তাঁর কাছেই প্রাণের বেদনা জানিয়ে শান্তি পায়। মা রক্ষা করো, স্বামীর মন বদলে দাও, তাঁকে সুমতি প্রদান করো !

(গীত)

জাগ-গো জননী, দানব-দলনী,
ডাকে কাঙ্গালিনী কাতরে ;
রক্ষ মা তারিণী, ত্রিগুণ-ধারিণী,
পড়েছি অকূল পাথারে।
শুনি সাধু-মুখে, পড়িয়ে বিপাকে,
যে ডাকে তোমাকে, রক্ষ মা তাহাকে।
পড়েছি সঙ্কটে, কেহ নাই নিকটে,
তুমি সর্বঘটে, তাই ডাকি মা তোমারে।
নাম নিয়ে তরী, ভাসালেম শঙ্করী,
অকূল সাগরে, ধরে দিলেম পাড়ি,
না হলে কাণ্ডারী, ডুবে যাবে তরী,
কলঙ্ক তোমারি, রটিবে সংসারে।

(সত্যের প্রবেশ

সত্য। মা ভৈঃ, চিন্তা কি মা সরোজ ? মাকে ছ ? প্রাণ খুলে ডাকো, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়া যদি ঘটান, ব অঘটনও ঘটবে। তুমি সতী, পতি-পরায়ণা সতীর আবার চিন্তা কি যে দেশ সতীর আদর্শ, যে দেশের সতী হাসতে হাসতে জ্বলন্ত চিতায় স্বামীর পদাঙ্কানুসরণ

করেছে, তুমি তাঁদের মেয়ে, তোমার আবার কিসের ভয় ? তবে কি জানো, তোমার স্বামী একজন নব্য বাবু, বর্তমান শিক্ষায় শিক্ষিত, তোমাকেও একটু নব্যভাবে চলতে হবে, তা না হলে স্বামীর মনোমত হবে কেন ? অমনভাবে একটা ঘোম্‌টা টেনে দিয়েছ, আজকাল মেয়েরা কি অমন করে ঘোম্‌টা দেয় ? অমন কপাল-ভরা সিন্দুর দিয়েছ, তা কি এখন এ দেশের মেয়েদের কপালে আছে ? পূর্বে ছিল, যখন এ দেশে আট মণ চাল টাকায় বিকাতো। এখন সে দিনও নেই, সে কালও নেই। যাক, যা বলতে এসেছিলাম, যা করছ, তাই করে যাও, মাকে ডাকো, মনে রেখো পতিই সতীর পরম গুরু, সেই প্রকৃত দেবতা। তিনি যাই কেন হউন না, তাঁকে দেবতার আসন থেকে নামিও না। তাঁর চরণে ভক্তি যদি অটল রাখতে পারো, তা হলে একদিন সে তোমায় গ্রহণ করবেই করবে। তুমি যদি তাঁর উপরে শ্রদ্ধা অটল রাখতে পারো, তা হলে আমিই তোমার বিনোদকে আবার তোমার কাছে এনে দেবো। ভয় নেই, তুমি তোমার কর্তব্য করে যাও। ঐ যে তোমার শাশুড়ী এদিকে আসছেন, আমি সরে পড়ি। কি দুর্দান্ত মেয়ে, বাপ রে ! (প্রস্থান)

কালীতারা, প্রতিবেশিনী, বিনোদের প্রবেশ)

(গীত)

সরোজ। জাগ-গো জননী পতিত-পাবনী
ডাকে কাঙ্গালিনী কাতরে।

কালী। ও পোড়ার-মুখী ! বলি কাকে ডাকছিস্, কাকে ডাকছিস্ ? ইচ্ছা হচ্ছে মুখখানা থেতো করে দিই, থেতো করে দিই !

সরোজ। আমায় মেরো না মা, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় মেরো না !

কালী। ও পোড়ার-মুখী, আমি মারলুম, আমি মারলুম ! কলঙ্ক নিতে বউ ঘরে আনলুম, মুখে আগুন, মুখে আগুন !

সরোজ। আর আমায় মের না মা, আর আমায় মের না !

প্রতি। দেখ বিনোদের মা, তুমি শীগ্‌গির ফুল-শয্যার আয়োজন করো।

কালী। (সরোজকে ধরে) বসো, এখানে বসো।

সরোজ। না গো, আর আমি ওখানে যাবো না, তুমি আমায় বাবার বাড়ীতে পাঠিয়ে দাও।

কালী। দূর হ' হতভাগী! (ধাক্কা দেয়)

(সরোজের পতন ও মূর্ছা)

কালী। ওগো দেখ তো মরলো নাকি?

বিনোদ। মা, আর ফুল-শয্যায় কাজ নেই, তুমি টাকা বের করো, টাকা বের করো।

কালী। ওগো দেখ, মরলো নাকি দেখ!

প্রতি। চোখে-মুখে জল দাও, জল দাও।

বিনোদ। টাকা বের করো মা, টাকা বের করো, জাপান যাবো, জাপান যাবো।

প্রতি। দেখ বিনোদের মা, তুমি কি মেয়েমানুষ? আজ দু'দিন ধরে মেয়েটাকে যন্ত্রণা দিচ্ছ, তোমার ঘটে এতটুকু আক্কেল নেই? এই মেয়ে যদি তোমার তাড়নায় মরে যায়, তবে যে হাতে দড়ি পড়বে, তা কি ভেবে দেখেছ? তোমার এই দাগা-সার-ছেলে, তার বিয়ে দিয়ে রাজরাণী হবে ভেবেছ? রূপের ধুঁচনী, অন্ধকারে কথা কইলে ছেলে-পিলে ভয়ে আঁত্‌কে ওঠে! এমন সোনার চাঁদ বউ পছন্দ হচ্ছে না? ভাবছ বউকে যাতনা দিয়ে আবার টাকা গুনবে? তা হচ্ছে না, মায়ে-পোয়ে থানায় গিয়ে কড়িকাঠ গুনতে হবে; হতচ্ছাড়ী লক্ষ্মী-ছাড়া মাগী!

কালী। ওগো, কর্তা কোথা গেলে গো? একবার এসে দেখ গো, তোমার বিনোদের বরাতে এই ছিল গো, কি সর্বনাশ হলো গো······ও শ্যামা—ও শ্যামা, বলি এ পোড়ার-মুখোটা গেল কোথায়? এ পেত্নীকে আজই বাড়ী থেকে দূর করে দেবো। (প্রস্থান)

বিনোদ। কি ক্যাডাভেরাস্, কি ক্যাডাভেরাস্! ও মা, টাকা দাও, টাকা দাও, জাপান যাবো যে! (প্রস্থান)

প্রতি। চল্ মা, ঘরে চল্, আর কেঁদে কি হবে? বরাতে যা ছিল, তাই হয়েছে, এখন বাপেরবাড়ী যাবার যোগাড় দেখ গে। এমন শাশুড়ী-জামাই যদি কারো ভাগ্যে জুটে থাকে, তবে, তাদের মুখে চুলোর আগুন ধরিয়ে দেবে। এমন শাশুড়ী-জামাইর কপালে ঝেঁটা, কপালে ঝেঁটা! (উভয়ের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—কালী মন্দির।

(সত্য, নগেন, বৈষ্ণবীগণ ও সেবকগণ)

(গীত)

সেবকগণ। সদানন্দময়ী কালী,

মহাকালের মন-মোহিনী,

আপন সুখে আপনি নাচ মা,

আপনি দাও মা করতালি

আদিভূতা সনাতনী,

শূন্যরূপা শশী-ভালী,

ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন,

মুণ্ড-মালা মা কোথা পেলি।

সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী,

যন্ত্র মোরা তন্ত্রে চলি,

যেমন রাখ মা তেমনি থাকি,

যেমন বলাও তেমনি বলি।

অশান্ত কমলাকান্ত,

দিয়ে বলে মা গালাগালি।

সর্বনাশী ধরে অসি

ধর্মাধর্ম মা দুটি খেলি।

সত্য। মাকে আমার যত দেখি ততই আনন্দ হয়। ভক্ত গেয়েছেন,—

"মায়ের হেরিলে শ্রীমুখ, দূরে যায় দুঃখ,

এই গুণ শ্যামা মা'র রে।"

সত্যই মা'র শ্রীমুখ দর্শন করলে, আমার বলতে আর কিছুই থাকে না। যদি কিছু থাকে তাও চিরদিনের মত ঐ রূপ-সাগরে ডুবে যায়। আমার আমিত্ব যায়, বিশ্ব মধুময় হয়ে উঠে। আনন্দম্, আনন্দম্! ওরে তোরা মায়ের নাম কীর্তন কর, মায়ের নাম কীর্তন কর।

(গীত)

সেবকগণ—

বল শ্যামাঙ্গিনী, যোগিনী-সঙ্গিনী,

উলঙ্গিনী, একি রঙ্গ।

মত্ত-মাতঙ্গিনী, কলুষ-নাশিনী,
বিভীষিকা কেন, করে ভুজঙ্গ ॥
উগ্র-চণ্ডা মূর্তি, ভীমা ভয়ঙ্করা,
লম্ফে ঝম্পে দম্ভে, কম্পে বসুন্ধরা :
দেখে অট্টহাসি, যোগিনীর পারা,
ত্রাসিত ভেল, মন-মাতঙ্গ ॥
ক্ষেপেছ রঙ্গিণী, মেতেছ রঙ্গে,
ভূত পিশাচ, যোগিনী-সঙ্গে ;
দনুজ নাশিছ, সমর-রঙ্গে,
ক্ষেপা-বক্ষে ক্ষেপী, হয়ে উলঙ্গ ॥
তব লীলা শ্যামা, কে পারে বর্ণিতে,
যারে দাও বর্ণিতে, সে পারে বর্ণিতে :
জ্বলিতেছে হিয়া, যে পাপ-বহ্নিতে,
নারি মা বর্ণিতে, নারি নিবারিতে ;
বড় দয়া তব, শুনি কাঙ্গালেতে,
নিবেদন করে, রাখি চরণেতে ;
চরণ যুগলেতে, যেন দেখিতে দেখিতে
মুকুন্দের খেলা, হয় মা, ভঙ্গ ॥

(নগেনের প্রবেশ)

নগেন। গুরুদেব ! একা একা পাগলের মতন কি বলছিলেন ?

সত্য। কিছুই ত বলিনি নগেন ? একটু মায়ের নাম কীর্তন করছিলাম।

নগেন। যাই বলুন না কেন, আপনাকে কিন্তু অনেকেই পাগল বলে উপহাস করে।

সত্য। তা করবে না কেন ? এমন-ধারা চেহারা যদি হয়, তাকে পাগল ছাড়া আর কি বলবে ? বলতে দাও, যার যা খুশী তাকে তাই বলতে দাও, সংসারের ভাল-মন্দের দিকে চাইতে গেলে কি আর কর্তব্যের পথে অগ্রসর হওয়া যায় নগেন ? পাগল বলবেই বা না কেন ?

(গীত)

ফুল-বাগানে নানা-রঙে
ফুটল ফুল ;

তারে ভাবতে গেলে হয়
প্রাণাকুল।
সে ফুল অধো-মুখে রয়
কারো, ভাগ্য গুণে উর্ধ্ব-মুখী হয়,
সে সন্ধানে যে রয়েছে,
তারে লোকে কয় বাতুল।
যে জন যোগ্য মালী হয়,
সদা, সে বাগানে পড়ে রয়,
সে গন্ধে যার মন মজেছে,
কে আছে তার সমতুল।
কৃষ্ণকান্ত বলে ভাই,
মা'র সাধন বিনে
অন্য কিছু নাই ;
সাধ্য বস্তু সাধনে পাই,
শ্রীগুরুর শ্রীচরণ-মূল ॥

নগেন। গুরুদেব ! আপনি মাকে কি বলে ডাকেন ?

সত্য। মা যখন আমাকে যা বলে ডাকান, আমি মাকে তখন তাই বলেই ডাকি।

নগেন। তবে কি মাকে যা-তা বলে ডাকলেই তিনি সাড়া দেন ?

সত্য। নিশ্চয়, মা যে আমার পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরেন। মায়ের নাম ছাড়া জগতে আর আছে কি বলতে পারো ? যা কিছু দেখছ, বিশেষ করে চেয়ে দেখ, প্রত্যেক বস্তুর গায়ে লেখা আছে, মায়ের নাম। আকাশের ভীষণ গর্জনে মায়ের নাম, পাখীর ডাকে মায়ের নাম। মাকে যা বলে কেন ডাক না, মা তাতেই উত্তর দেন, তবে কিনা একটু ভক্তি চাই।

নগেন। গুরুদেব ! যিনি জগৎ-জননী, তিনি এরূপ নেংটা কেন ?

সত্য। মাকে নেংটা দেখে অবাক হয়েছ নগেন ? অবাক হবার তো কিছুই নেই ? মাকে নেংটা দেখে মনে করো না মায়ের আমার কাপড় নেই। কুবের যাঁর ভাণ্ডার, তাঁর কাপড়ের অভাব কি ? তবে মায়ের কাপড় পরার অবসর নেই। সর্বদাই ত সন্তান প্রসব করতে হচ্ছে। নেংটা থাকার সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্যই হচ্ছে জগৎবাসীকে শিক্ষা দেওয়া। বিশ্ব-জননী কিনা, তাই সন্তানগণকে শিক্ষা দিচ্ছেন।

নগেন। কি শিক্ষা দিচ্ছেন ?

সত্য। মা নেংটা হয়ে জগতকে কি শিক্ষা দিচ্ছেন, বলে দেবো নগেন ? মা নেংটা হয়ে জগতকে বলছেন, 'দেখ রে জগৎবাসী ! আমি যেমন নেংটা, তেমন নেংটা না হলে আমায় পাওয়া যায় না।' দেখছিও তাই ! মহাপুরুষেরা সবাই ত নেংটা ছিলেন। বুদ্ধদেব নেংটা ছিলেন, শঙ্করাচার্য নেংটা ছিলেন, শ্রীচৈতন্যদেব নেংটা ছিলেন, ত্রৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী নেংটা ছিলেন, পরমহংসদেব নেংটা ছিলেন। বরিশালের কালী-বাড়ীর সোমাঠাকুরও নেংটা ছিলেন। "নেংটা" শব্দের অর্থ হচ্ছে অষ্টপাশ মুক্ত। শ্রীধাম বৃন্দাবনের দিকে তাকালেও দেখতে পাবে, যতদিন ব্রজগোপীদের বস্ত্র হরণ না হলো, ততোদিন পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের পতিরূপে লাভ করা হয়নি। মা যে আমার লুকানো মাণিক রে ! এ মাণিক পেতে হলে কি করতে হয় জানো ?

(গীত)

লুকানো মাণিক তুলবি যদি,
ডুব দে প্রেম-সাগরের জলে।
খুঁজলে পরে, যেথা-সেথা,
সে ধন কি ভাই অমনি মিলে।
প্রেমের সাগরে কারা
হয়ে যেন মাতোয়ারা,
অহর্নিশি ডুব্‌ ডুব্‌ ডুব্‌,
ডুব দিতেছে দলে দলে।
তাঁরা বুঝি খোঁজ পেয়েছে,
তাই অত ডুবতে আছে,
তাদের সঙ্গে ডুব দে যদি—
তুলবি মাণিক পরবি গলে।

নগেন। গুরুদেব ! বর্তমান সময় দেশে যে মায়ের পূজা হচ্ছে, এ কি আপনি প্রকৃত পূজা মনে করেন ?

সত্য। নগেন ! দেশে এখন আর মায়ের পূজা কোথায় ? পূজার নাম করে কিছু সময় ফুর্তি করা, আর রাত্রি জেগে ডাক্তার ডাকার ব্যবস্থা হচ্ছে মাত্র। সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক, এই তিনপ্রকার পূজা শাস্ত্রে পাওয়া যায়। রাজসিক আর তামসিক পূজা নিয়েই ত আমরা ব্যস্ত, সাত্ত্বিক

পূজা কৈ ? তা ত কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। নগেন ! বিশ্ব-জননীর পূজা করি, সৃষ্টী-স্থিতি প্রলয়-কর্ত্রী যিনি, তাঁর পূজা করছি, এ যদি প্রাণে বিশ্বাস থাকে তা হলে কি মায়ের কাছে খেমটা নাচাতে সাহস হয় ? বিশ্ব-জননীর পূজা করছি, এ যদি উদ্দেশ্য হয়, তা হলে · মায়ের কাছে, মদ খেয়ে উলঙ্গ হয়ে নৃত্য করতে সাহস হয় ? আজকাল পুরোহিত ঠাকুর মহাশযদের কিছু না বললে নয়। শক্তি-পূজা করবেন, শ্যামা-পূজা, আসনের উপবে বসেই যজ্‌মানকে আদেশ করেন, ওরে, এক বোতল মদ নিয়ে আয়। যিনি একটু পণ্ডিত, তিনি শুদ্ধ ভাষায বলেন, ওরে একটু 'কারণ' নিয়ে আয। জিজ্ঞেস করি পণ্ডিত-মণ্ডলীর কাছে, কোন্ তন্ত্রে পেয়েছেন, শুড়ীব ভাত-চো জল দিয়ে মাযের পূজা করতে হয ? জাতি-বিচারের চুল-চেরা হিসাবটি বেশ আছে, ওদিকে শুড়ীর ভাত-পচা জল খাচ্ছেন, তাতে জাতের কিছু হয না। কেউ কেউ বলেন, আরে ও মদ কি আর অমনি থাকবে ? ও যে শোধন করে নেবো। শোধন করা যেন মুখের কথা, শুনেছি ভক্ত-শ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপু যখন বিষ খেতে দিযেছিলেন, তখন 'হরি বোল', 'হরি বোল' বলে সে বিষকে অমৃত করেছিলেন। বিষকে অমৃত করাই হচ্ছে শোধন করা। বর্তমান শোধনের পরিণাম কি জানো ? হয় বেশ্যা-বাড়ী, না হয রাস্তায় পড়ে গড়াগড়ি। পূজা দেখবে নগেন ? আমাদের পূজা দেখ। ঢাক নেই, ঢোল নেই, চাল নেই, কলা নেই, দীপ নেই দূর্বা নেই। আমি আছি, আর আমার মা আছেন। এ পূজায় পুরোহিতেরও প্রয়োজন নেই। উকীল, মোক্তার দিযে কি আর ঐ দরবারে সওযাল-জবাবে চলে ? এ পূজার পুরোহিত আমি, মন্ত্র আমার গুরু-বাক্য, প্রেম পুষ্প, ভক্তি চন্দন, শ্রদ্ধা নৈবেদ্য, অনুরাগ বাতি, মন অগ্নি, আত্মদান আহুতি, নাম নিশান, বিবেক দক্ষিণা। পূজা করবে তো, এ পূজা করো নগেন, মায়ের কৃপা পাবে, দেশ শক্তিশালী হবে ; ভারতের লুপ্ত গৌরব আবার তোমরা ফিরিযে আনতে সক্ষম হবে। ও কি ! একদল বৈষ্ণব এদিকে আসছে না ? বোধ হয়, ভিক্ষা করতে আসছে !

(বৈষ্ণবদের প্রবেশ)

(বৈষ্ণবগণের গীত)

রূপের হাট দেখিবি ভাই,
রূপের বালাই লয়ে মরে যাই
আকাশটি ঐ রূপে ভরা,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে রূপ-পসরা,
পথে ঘাটে রূপের ছড়া,
রূপ বিনে আর কথা নাই।
পাতায় পাতায় রূপ ফলেছে,
বনময় ঐ রূপ জ্বলেছে,
রূপের মালা গলে ঠাকুর,
খোঁজে কোথায় আছে রাই।
ডালে ডালে পাখীর মেলা,
খেলছে রূপের মোহন খেলা,
গাচ্ছে রূপের মধুর গীতি
গাচ্ছে রূপের করে বড়াই।
আয় রে হেথা রূপ-পিয়াসী,
দেখবি ও রূপ রাশি রাশি,
কত নিবি, নিয়ে চল রে,
দেশে দেশে রূপ বিলাই।

বৈষ্ণব। জয় রাধে গোবিন্দ, জয় রাধে গোবিন্দ! বাবা, আমাদের কিছু ভিক্ষা দাও গো।

সত্য। আপনাদের গানটি তো বড় মধুর, বড়ই মিটি!

বৈষ্ণব। আহা-হা, ভগবারনর রূপ যেন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে!

সত্য। ভগবানের রূপ যে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েশে; তার আর সন্দেহ কি? পাতায় পাতায় যার ভগবানের রূপ দর্শন হয়েছে, এমন যে বৈষ্ণব, তাঁর আর ভিক্ষার প্রয়োজন কি?

বৈষ্ণব। আপমি বলেন কি? বৈষ্ণবের ভিক্ষা না করলে চলবে কেন? ভিক্ষাই তো একমাত্র ধর্ম।

সত্য। হ্যাঁ, পাঁচ মুষ্টি ভিক্ষা গ্রহণ করাই বৈষ্ণবের দৈনন্দিন কর্তব্য। কারণ বৈষ্ণবের সঞ্চয় নেই। তা আপনার ভিক্ষা ত আজ কম হয়নি?

বৈষ্ণব। (ঝুলি দেখিয়ে) এতে আর কত হবে? সের তিনেক চাল মাত্র।

সত্য। তিন সের চাল কি আপনি একদিনে খেতে পারেন ?

বৈষ্ণব। আমি একলা কেন খাবো গো ? আমার যে সংসার আছে !

সত্য। বৈষ্ণবের আবার সংসার কি ? তোমার সঙ্গে এ-সব কারা ?

বৈষ্ণব। আজ্ঞে, এইটি আমার আশ্রয় ঠাইন ; এইটি আমার শিষ্য, আর এইটি আমার পুত্র।

সত্য। এ মেয়েটি কি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী ?

বৈষ্ণব। আজ্ঞে তা হবে কেন ? শ্রীগুরু আশ্রয় দিয়েছেন।

সত্য। তা হলে ইনি তোমার মা !

বৈষ্ণব। আরে ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ ! তা হবে কেন গো, তুমি কি পঞ্চ-রসিকের ধর্ম জান না ?

সত্য পঞ্চ-রসিকের ধর্ম বলে কি আছে তা জানি নে। তবে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে দেখেছি, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এই পঞ্চটি রস বা ভাব আছে, যে ভাবের দ্বারায় ব্রজবাসী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাধনা করেছিলেন।

বৈষ্ণব। আরে, তুমি কি চণ্ডীদাস-রজকিনীর কথাও শোননি ?

সত্য। তবে কি তুমি বলতে চাও, তুমি সেই চণ্ডীদাস-রজকিনীর ধর্ম সাধন করছ ? ভণ্ড, ছোট মুখে বড কথা, স্বর্গের দেবতায় আর বিষ্ঠার কৃমিতে সমজ্ঞান ? স্বর্গের পারিজাতের সঙ্গে শিমূলের তুলনা ? যে চৈতন্য প্রকৃতির মুখ দর্শন করতেন না, প্রকৃতির মুখ দর্শন করেছিলেন বলে, যিনি ভক্ত হরিদাসকে অনায়াসে ত্যাগ করেছিলেন, যিনি শুদ্ধ জ্ঞানময়, নির্মল, পবিত্র, নির্বিকার, দীনজনের একমাত্র বান্ধব, তুমি তাঁর পবিত্র সনাতন বৈষ্ণব ধর্মে কলঙ্ক লেপন করছ, দূর হয়ে যাও এখান থেকে।

বৈষ্ণব। কিরে বেটা ! তোর এত বড় স্পর্ধা ! তুই বৈষ্ণব-অপরাধের ভয় করিস্ নে ? আমি তোকে অপরাধী করলাম।

সত্য। বাবাজী ! বৈষ্ণব-অপরাধ ভয় করবো না কেন ? বৈষ্ণব-অপরাধে সাধকের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সে বৈষ্ণব কি তুমি ? তুমি কি মনে কর, তুমি একজন বৈষ্ণব ? বৈষ্ণব হওয়া কি মুখের কথা ? শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে গোস্বামী বলেছেন।

বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্ধেক
বেদ মুখে মানে,

বেদ-নিষিদ্ধ পাপ করে,
ধর্ম নাহি গণে ;
ধর্মচারীর মধ্যে
বহুত কর্ম-নিষ্ঠ,
কোটী কর্ম-নিষ্ঠ মধ্যে
এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ
কোটী জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ মধ্যে—
একজন মুক্ত,
কোটী মুক্ত মধ্যে দুর্লভ,
এক কৃষ্ণ ভক্ত।

বৈষ্ণব হওয়া মুখের কথা নয় বাবাজী। মালা গলে আর তিলক কাটলেই বৈষ্ণব হওয়া যায় না। তুলসীদাস বলতেন :—

তুলসী পিদ্‌নে হরি মিলে তো,
হাম পিদ্‌নে ঝাড়,
পাথর পূজলে হরি মিলে তো,
হাম পূজে পাহাড়,
নিত্‌ নাহনে হরি মিলে তো,
জল জন্তু হই,
ফল মূল খাকে হরি মিলে তো
বাদুড় বাদুড়ী।
তিবাণ ভোখ্‌নে হরি মিলে তো,
বহুত মৃগী অজা,
স্ত্রী ছোড়কে হরি মিলে তো,
বহুত মিলতো খোঁজা।
দুধ পিক্‌নে হরি মিলে তো
বহুত বৎস বালা,
মীরা কহে বিনা প্রেমসে ;
না মিলে নন্দলালা।

বাবাজী, তুমি যে আমায় অপরাধী করছ, তুমি-ই যে শ্রীচৈতন্যদেবের কাছে অপরাধী !

বৈষ্ণব। আমি কি করে অপরাধী হলেম ?

সত্য। আচ্ছা বাবাজী ! তুমি শ্রীচৈতন্যদেবকে মান ?

বৈষ্ণব। তা আর মানি না ? তিনিই বৈষ্ণবের একমাত্র আরাধ্য দেবতা।

সত্য। তাঁর বাক্য মান ?

বৈষ্ণব। মানি না—তাঁর বাক্যই বৈষ্ণবের একমাত্র মন্ত্র।

সত্য। যদি তাই হয়, তবে তিনি বার বার বলে গেছেন—কলির জীব, "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং ; কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" এ কালে নাম ভিন্ন অন্য কোন সাধনার ব্যবস্থা তিনি করে যাননি। ঠাকুরের নাম-কীর্তন-রূপ মহা-যজ্ঞের দ্বারাই এ যুগে শ্রীকৃষ্ণের সাধনা করতে হবে।

বৈষ্ণব। তবে তো আমি সত্য সত্যই অপরাধী, আমার গতি কি হবে ?

সত্য। ভুল যদি বুঝে থাকো, তবে আর ভয়ের কোন কারণ নেই। ঠাকুরের নাম করো, পবিত্র হয়ে যাবে।

হরি শব্দের বহু অর্থ
দুই মুখ্যতম,
সর্ব অমঙ্গল হরে —
প্রেম দিয়া হরে মন ;
যৈছে তৈছে যোহি কোহি
করয়ে স্মরণ,
চারি বিধ তাপ তার
করে সংহরণ।
নাম কীর্তন করো,
নামেতেই প্রেম হবে,
প্রেমেতেই গোবিন্দ
প্রাপ্তি হবে।

বৈষ্ণব। হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল ! (প্রস্থান)

সত্য। (বৈষ্ণবীকে লক্ষ্য করে) মা, ধর্ম সাধন করতে এসে পাপের স্রোতে

গা ভাসিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছিস্ মা! নিদ্রিত শক্তিকে জাগিয়ে তোল মা, ভেবে দেখ্ তুই কে? তোরা না জাগলে যে ছেলেগুলিও জাগবে না মা! ঐ ভণ্ডের সাথে মিশে নরকের দ্বার পরিষ্কার করে লাভ কি? নির্জনে বসে গিয়ে কৃষ্ণের নাম কীর্তন করো, তিনিই তোমার সকল মলিনতা ধুয়ে-মুছে তাঁর আপনার করে নেবেন। ঐ ভণ্ডের সাথে আর যেও না।

বৈষ্ণবী। না বাবা, আমার ভুল আমি বুঝতে পেরেছি, তুমিই আমার মুক্তিদাতা। তুমি আশীর্বাদ করো, তোমার আশীর্বাদেই আমি কৃষ্ণ-সেবার যোগ্য হতে পারবো।

(প্রস্থান)

(হরিচরণ মণ্ডলের প্রবেশ)

(গীত)

মন পাগলা রে—
আনন্দে গুরু-গুণ গাও।
আনন্দে গুরু-গুণ গাও—
আনন্দে গুরু-গুণ গাও
আনন্দে গুরু-গুণ গাও॥
মাতৃ রজে, পিতৃ বীজে,
গুরু দিলেন তরী সেজে,
হেন তরী না বুঝিযে—
কু-জলে ডুবাও॥
চৌদ্দ পোয়া নৌকার দাড়া,
লোহা ছাড়া তক্তা গড়া,
অনুরাগের বাদাম দিয়ে,
ধীরে ধীরে যাও॥
নয়ন দু'টি রঙ্গে ভরা,
চরণ দু'টি রসের ঘোড়া,
হাত দু'খানি শ্রীগুরুর—
চরণ সেবায় দাও॥

ধন রত্ন যত ছিল,
কামিনী তো হরে নিল,
এখন কেবল শুধু ডিঙ্গা,
ঘাটে ঘাটে বাও ॥

সত্য। কি ভাই! তোমার বাড়ী কোথায়? নাম কি?

হরিচরণ। আমার নাম হরিচরণ মণ্ডল, বাড়ী ফল্‌সী। আপনার কাছে আমার একটি জিজ্ঞাস্য আছে, জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

সত্য। অনায়াসে জিজ্ঞেস করতে পার।

হরিচরণ। আজ্ঞে, আমি কোন এক ফণ্ডে দু'শত টাকা দিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের এখন আর কোন খোঁজই পাচ্ছি না। এ টাকা আদায়ের কোন উপায় আছে কি?

সত্য। তোমার কোন দলিলপত্র আছে?

হরিচরণ। আছে, এই দেখুন।

(দলিল প্রদান)

সত্য। তবে তুমি এই দলিল দিয়ে আদালতের সাহায্যে টাকা আদাযের চেষ্টা করো।

হরিচরণ। আদালতের সাহায্য ভিন্ন টাকা আদায়ের অন্য কোন পথই নেই?

সত্য। আমি তো অন্য পথ আর কিছুই দেখছি না।

হরিচরণ। সত্যই আদালতের সাহায্য ভিন্ন উপায় নেই?

সত্য। তারা সব ভদ্রলোক, আদালতের সাহায্য ভিন্ন আর কি উপায়ে টাকা আদায় করবে?

(হরিচরণ দলিল ছিঁড়ে ফেলে দেয়)

সত্য। আহা-হা, এ করো কি? গরীব মানুষ, দু'শ' টাকার একটা দলিল এমন করে নষ্ট করে দিলে?

হরিচরণ। আজ্ঞে, রাধারাণী আমায় ডেকেছেন, শ্রীবৃন্দাবনে যাচ্ছি, এখন বসবো নালিশ করতে? আমি সামান্য গাইতে পারি, আমার গিন্নি করতাল বাজাতে পারে, দু'জনে নাম-কীর্তন করে শ্রীবৃন্দাবনের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াবো। এখন কি আর নালিশ-ফালিশ ভাল লাগে?

সত্য। ভাই। ধন্য তোমার সাধনা, ধন্য তোমার ত্যাগ। আশীর্বাদ করো, যেন আমরাও তোমার আদর্শে তৈরী হতে পারি। নগেন! ইনিই প্রকৃত বৈষ্ণব। আসক্তিশূন্য না হওয়া পর্যন্ত বৈষ্ণবতা ফুটে ওঠে না। তুমি একে পাঁচটি টাকা দিয়ে দিও। আপনি যাবার সময় আপনার ভক্ত-কণ্ঠে আমাদের একটি নাম-কীর্তন শুনিয়ে যাবেন কি?

হরিচরণ। ঠাকুরের নাম করবো, তাতে আর আপত্তির কি থাকতে পারে?

(গীত)

হরে কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণ
বল হরে কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ—কৃষ্ণ,
রাম নারায়ণ কৃষ্ণ,
গোবিন্দ মধুসূদন।
গোপাল গোবিন্দ, কৃষ্ণ,
নৃসিংহ বামন কৃষ্ণ,
হরে মুরারে কৃষ্ণ,
কালী কাত্যায়নী কৃষ্ণ;
গোবর্ধন-ধারী কৃষ্ণ,
মদন-মোহন কৃষ্ণ,
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত কৃষ্ণ,
কংস-নিসূদন॥
সৃজক পালক কৃষ্ণ,
ভাগীরথী গঙ্গা কৃষ্ণ,
কালীয় দমন কৃষ্ণ,
মুকুন্দের শ্রীগুরু কৃষ্ণ,
ব্রজের জীবন কৃষ্ণ,
পুরুষ প্রকৃতি কৃষ্ণ,
জনক জননী কৃষ্ণ,
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন॥
ত্রিগুণ অতীত কৃষ্ণ,

ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ,
মোক্ষ-প্রদায়ক কৃষ্ণ,
পরমাত্মারূপী কৃষ্ণ,
বাঞ্ছা-কল্প-তরু কৃষ্ণ,
অগতির গতি কৃষ্ণ,
এ দীনে কৃপা কর কৃষ্ণ,
হে পতিত পাবন ॥

(প্রস্থান)

সত্য। অপূর্ব দর্শন হলো। নগেন, ধর্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে যা বলে দিলাম মনে রেখ, এই তোমার প্রচার্য বিষয়। তুমি এখন যাও, আমিও কামিনীবাবুর বাড়ীর দিকে চল্লুম।

(উভয়ের প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—রাজপথ।

(বিনোদ, মেথর, মেথরাণী)

বিনোদ। টাকা যা পেয়েছি, তা দিয়ে তো একটা টম্‌টম্‌ কিনেছি। টম্‌-টম্‌ না হলে river side-এ হাওয়া খাওয়ার বড়ই অসুবিধে হয়। বাকী টাকা যা ছিল, তাও তো সবই ফুরিয়ে গেল। এখন ফুর্তি চলবে কি দিয়ে? ফুলকুমারীকে বলে এসেছি, তাকে পাঁচ দিনের মধ্যে আমি পাঁচ শ' টাকা দেব। তা না দিলে সে-ই বা কি মনে করবে? এখন উপায় কি? টাকা কর্জ চাইলেও কেউ দেবে না। আজ এমন আনন্দের দিন, কিন্তু হাতে টাকা নেই। বহু কষ্টে এক বোতল মদ কিনে এনেছি। হ্যাঁ, টাকা যোগাড় করার এক উপায় আছে। স্ত্রীর হাতে কয়েকখানা গহনা দেখেছি, যাই দেখি শ্বশুরবাড়ীর দিকে, যদি কোনরকমে

সেগুলি সট্‌কাতে পারি, তবেই কিস্তিমাৎ করতে পারবো। আর ভাবনা কি মন, ফুর্তি করতে করতে চলো।

(মদ খাওয়া)

(মেথর, মেথরাণীর প্রবেশ)

বিনোদ। এ-ই—ইস্‌মে ক্যা হ্যায ?

মেথর। ক্যা মাংতা হ্যায বাবু ?

বিনোদ। চাট মাংতা হ্যায। চাট হ্যায ?

মেথব। এ মেথবাণী ! চাট চাতেহে, চাট।

মেথরাণী। দে দেও না থোড়াসা।

মেথব। এ বাবু, চাট চাতেহো, কেযা ছোলা ভাজা ?

বিনোদ। হাঁ হাঁ, দে দেও।

মেথব। হাঁ বাবু, আচ্ছা চিজ্‌ হ্যায মেবা পাস্‌, তোমাবা লায়েক চিজ হ্যায।

(গীত)

বাবু ওম্‌দা ওম্‌দা চিজ্‌—
ছগাৎ লেহি, যেইসি তেইসি-কো
হাম দেগি নেহি॥
মাতা পিতাকো
যো খানে না দেই,
আউবাৎ ছোডকো যো,
বেণ্ডী ভেজি,
হাম উসকো দেগি,
গঙ্গা কিডামে হাম্‌
সাচ্চি কহি হাম্‌ সাচ্চি কহি।
না মানে দেওতা ভি না মানে পীব,
পয়জারছে যিস্‌কো না—
নোযে শিব ;
হাম উস্‌কো দেগি

গঙ্গা কিড়ামে হাম সাচ্চি কহি—
হাম সাচ্চি কহি।

বিনোদ। এই—তেরা নাম কেয়া হ্যায় ?

মেথর। মেরা নাম লছ্‌মন।

বিনোদ। তোম্ কেয়া কাম করতা হ্যায় ?

মেথর। হাম্ মেথর।

বিনোদ। এই ও Damn! হট্ যাও হিঁয়াসে—হট্ যাও!

মেথর। আউর কাঁহা হট্ যায়েঙ্গে বাবু, আপ্‌কো তক্‌লিফ হয় তো আপ্ হট্ যাইয়ে।

বিনোদ। হাম হট্ যায়েঙ্গে, শালা! হাম হট্ যায়েঙ্গে!

মেথর। কাঁহে বুড়া বাৎ ছোঁড়তা হ্যায় বাবু ? আউড় থোড়া উধার হোনেছে তো ড্রেনমে গির যায়েঙ্গে, আপ্ হট্ যাইয়ে।

বিনোদ। শালা, হাম্ হট্ যায়েঙ্গে, শালা ?

মেথর। বাবু, বুড়া বাৎ মৎ বলো, হাম তোমকো এয়সা বাৎ ছোড়া কভি ?

বিনোদ। ছোড়া নেহি হারামজাদ! আউর থোড়া ইধার হোনেছে—তো মেরা বদন্‌মে লাগ্ যাতা।

মেথর। লাগা তো নেহি, যব লাগ্ যাতা তো ক্যা হ্যায় ? হাম্ আদ্‌মী নেহি হ্যায় ?

বিনোদ। শালা, মেথর আবার আদ্‌মী ?

মেথরাণী। এ বাবু, ঝাড়ু দেখা হ্যায়!

মেথর। ক্যা করতা হ্যায়, আরে ঠার যা, হাম্‌সে বাৎ-চিৎ হোনে দে। এই বাবু, মেথর আদ্‌মী নেহি হ্যায় ? তোমারা দো হাত হ্যায়, মেরা ভি দো হাত হ্যায়। তোম রুটী খাতে হে, হাম্ ভি রুটী খাতে হে, তোমারা আক্কেল হ্যায়, মেরা ভি থোড়া-বহুৎ হ্যায়, তোম্ নকৃরি করতে হো, হাম ভি নকৃরি করতা হ্যায়। তোম্ নকৃরি কর্‌কে ক্যা করতে হো—দারু পিতে হো, দুনিয়াকো কুছ্ কাম তুম্‌সে হোয় ?

বিনোদ। হাম্ দুনিয়াকো কাম করতে নেহি তো, তু করতে শালা ? কাল

হাম্ chairman-কো পাস report দেকে তুম্‌কো মজা দেখ্‌লায়েঙ্গে শালা !

মেথর। চেয়ারম্যানকো পাস্ রিপোর্ট দেকে ক্যা মজা দেখ্‌লাওগে বাবু? সরকার মেরা ওয়াস্তে দোসরা রাস্তা বানায়া নেহি—ইস্‌মে তুম্ ভি চলোগে হাম্ ভি চলেঙ্গে। বোলতা হ্যায় দুনিয়াকো কাম কর্‌তা হ্যায়? কেয়া কাম করতে হো বাবু? দারু পিনা দুনিয়াকো কুছ্ কাম হ্যায়? রেণ্ডীবাড়ী যানা দুনিয়াকো কুছ্ কাম হ্যায়? দুনিয়াকো কাম হাম্ করতে হে।

বিনোদ। তু করতে শালা?

মেথর। আলবৎ বেইমান। হাম্ দুনিয়াকো সেবা করতা হ্যায়। আজ যব এ কাম ছোড়কে হাম্ হট্ যাই, ময়লাকো বদ্‌বুছে কাল এ সহরমে বেমারী লাগ্ যায়েঙ্গে, কেৎনা আদ্‌মী মর্ ভি যায়েঙ্গে! হাম্ তোম্‌লোক কো সেবা করতে হ্যায়, আর তোম্‌লোক হাম্‌কো ঘিন্ করোগে। এ বড়া সরম কো বাৎ হ্যায়। হুঁশিয়ার হো যা, বাবু, হুঁশিয়ার হো যা, হাম্ তেরা মাইকো কাম করতা হ্যায়।

বিনোদ। যা যা বেটা, তুমসে মেরা আক্কেল কম নেহি।

মেথর। তেরা আক্কেল হ্যায় ইস্‌মাফিক মালুমই দেতে হ্যায়। যিস্‌কো আক্কেল হ্যায়, ও কভি নেই বোলেঙ্গে তু ছোটা হাম্ বড়া। ছোটা বড়া কই বাত হ্যায়? মালেক তোম্‌কো ভি পয়দা কিয়া হাম্‌কো ভি পয়দা কিয়া। তোম্ ভি মাটী হো যাওগে, হাম্ ভি মাটী হো যায়েগা। বাবু গরুর মৎ করনা, গরুর বুড়া হ্যায়, মালিক-কো মরজি ছে আজ তোম্ রুপাযাওয়ালা, ভদর আদমী। মেরা ভি এ্যায়সা তগ দির হো সেকতা। হারে বাবু কোন হ্যায়, আভি দুনিয়ামে তো রূপচাঁদ বাবু হ্যায়। যিস্‌কো রূপীয়া হ্যায়, ওহি বাবু নাম লেতেহে। মেরা যব রুপায়া হো যায়, তব তেরা মাফিক নফর ভি হাম রাখ সেকতা।

বিনোদ। কি, শালা মেথরের সাথে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলছি. ভদ্রলোকে দেখলে আমায় কি বলবে? হট্ যাও শালা, হট্ যাও শালা! (প্রস্থান)

মেথরাণী। এ বাবু! ঝাড়ু দেখা হ্যায় বেইমান, হুঁশিয়ার হো যা!

মেথর। ঠার যা মেরি জান, দুনিয়াকো এয়সাই হাল হ্যায়।

(গীত)

দুনিয়া আজব তেরা ঢং,
আব্ ছে আব দেল্
বেকুব বন যায়,
দেখ্ কে তেরা রং।
লেড়কা বালা—
লালন পালন কর,
কেতনি দুধ পিলাওয়ে,
ওহি যব্ নরক পরশে,
ছি ছি কর ঘিনাওয়ে।
মাটী দেকের বদন বানাযা,
হো যায়েগা মাটী,
কেয়সা বেকুব ঝুঁটা লেতে—
ছোড় দেতে হায় খাঁটী।

মেথর। মেথরাণী—বড়ি দের হো গিযা; রাস্তামে কোই আপছার্ কো সাথ মোলাকাৎ হয় তো, জরুর কুছ্ না কুছ্ জরিমানা কর্ দেঙ্গে। জলদি জানা চাহিয়ে।

মেথরাণী। চল্ মেরি জান। (প্রস্থান)

নবম দৃশ্য

স্থান—কামিনীবাবুর বাড়ী।

(কামিনী, নলিনী, ঝি, সরোজ, বিনোদ)

কামিনী গিন্নি! চারা নেই, খুঁজে পেতে প্রথম পক্ষে দিয়ে দেখা গেল, শেষে এই হলো, মেয়েটা এসে বিধবার মত ঘাড়ে পড়লো।

নলিনী। বলি, এবার সব ভাল রকম খোঁজ-খবর নিয়েছ তো?

কামিনী। হ্যাঁ, এবার তো আর ঘটকের মুখের কথায় নয়? পাত্রটি আমার জানা, সরকারী চাকুরী করেন, দেড়-শ' টাকা মাইনে পান। দোষের মধ্যে প্রথম পক্ষের দু'টি ছেলে আছে, কিছু দিতে-থুতে হবে না। তাতেই প্রায় পাঁচ শ' টাকা খরচ পড়বে, তাই ভাবছি বাড়ীখানা সেকেণ্ড মর্‌গেজ না দিলেই নয়, অথচ প্রথম মর্‌গেজের এক পয়সাও পরিশোধ করতে পারিনি, অথচ ধার না করলেও চলবে না।

নলিনী। বরটির বয়স বোধ হয় একটু ভারী হয়েছে?

কামিনী। হ্যাঁ, দ্বিতীয় পক্ষের যেমন হয়, ষাটের ভেতর। লোকটি অতি ভদ্র, কিছুই দিতে-থুতে হবে না, যা বলেছি, তাতেই রাজী হয়েছেন। খরচ-খরচা বাবদ নগদ পাঁচ শ' টাকা ধরে দিতে হবে মাত্র। এখন সব যোগাড় কর, কাল গায়ে হলুদ, পরশু বিয়ে হবে।

নলিনী। বড্ড যে তাড়াতাড়ি, এর মধ্যে কি করে যোগাড় করবে?

কামিনী। তা হবে না কেন? আমাদের তো পাঁচ শ' ধরে দিতে হবে মাত্র, আর কিছুই করতে হবে না।

নলিনী। তবুও যে বড্ড তাড়াতাড়ি!

কামিনী। কি করবো বলো, ফুল-শয্যার পর দিনই সে তার চাকুরী স্থানে চলে যাবে।

(ঝি'র প্রবেশ)

ঝি। ওগো! বাইরে জামাইবাবু এসেছে গো, জামাইবাবু এসেছে!

নলিনী। সত্যি নাকি ঝি, সত্যি নাকি?

ঝি। সত্যি না-কি মিথ্যে? আমি কি তোমার জামাইবাবুকে চিনিনে? সেই যে মুখে চুরট টানে, আর ড্যাম্ ড্যাম্ বলে।

কামিনী। এত রাত্রে কি মনে করে?

নলিনী। হাজার হোক্ জ্ঞান হয়েছে কিনা! আর এদানিক আমরাও তো জামাই আনতে পাঠাইনি! তাই বোধ হয় পত্রের অছিলাতে এসেছে।

কামিনী। দিনের বেলায় এলে পাঁচজনে দেখতে পেতো। যাক, আমি তারে বাড়ীর ভেতরে পাঠিয়ে দিই গে।

নলিনী। তুমিও তাড়াতাড়ি এসো, রাত অনেক হয়ে গেছে, খাওয়া-দাওয়া

করবে না? মেয়েটা মনের দুঃখে দিন-রাত কেঁদে কাটায়। যাই, আমিও তাকে একটু সাজিয়ে-গুজিয়ে দিই গে!

(উভয়ের প্রস্থান)

দশম দৃশ্য

স্থান – কামিনীবাবুর বাড়ী।

(বিনোদ, ঝি, সরোজ, কামিনী, নলিনী)

ঝি। দাদাবাবু, আস্তে চলো, পড়ে যাবে যে!

বিনোদ। ড্যাম্ ইট্, তাঁকে নিয়ে এসো। তাঁকে নিয়ে এসো।

ঝি। আরে আসবেন বই কি! আসবেনই তো, যখন এসেই পড়েছ, তখন, দেখা হবেই। অত ব্যস্ত কেন? বসো, একটু জল খাও, তার পর দেখা হবে এখন।

বিনোদ। ড্যাম্ ইট্, জল-টল খেতে হবে না, সত্বর তাঁকে নিয়ে এসো।

ঝি। বলি এখনই আনতে হবে?

বিনোদ। হ্যাঁ-হ্যাঁ নিয়ে এসো।

ঝি। ও দিদিমণি! আরে চট করে চলে এসো গো, চট করে এসো। বাবুর যে আর তর সয় না গো!

(প্রস্থান)

বিনোদ। ফুল, ফুল! জানের জান মেরা! সবুর করো, গয়না খুলে নিয়েই গোলাম হাজির হচ্ছে। একটু জল টেনে নিই (মদ খায়), বাঃ, কি মজাদার চিজ! কৈ, কে আছিস, জলদি নিয়ে আয়।

(সরোজকে নিয়ে ঝি'র প্রবেশ)

ঝি। আহা—হা, দিদিমণির কি লজ্জা! পোড়া কপাল, বলি এত লজ্জা কেন? পরের কাছে তো আর যাচ্ছ না? এ যে প্রাণেশ্বর গো! ঝেঁটা মারি ঐ প্রাণেশ্বরের কপালে! ও দাদাবাবু? এই যে এনেছি, এখন বুঝে-সুঝে নাও। বলি আমায় কিছু পুরস্কার দেবে না?

বিনোদ। হ্যাঁ, তা পাবে, এখন যাও।

ঝি। তবে এখন যাবো?

বিনোদ। হ্যাঁ, চলে যাও।

ঝি। দুনিয়ার রকমই এই, কাজ ফয়সালা হয়ে গেলে, শেষে এমনিই বিদায় দেয়। যাক্, চল্লুম দিদিমণি! একটু সাবধান থেকো, রকম বুঝেছ তো? বেশী বাড়াবাড়ি করলে ডাক দিও, আমি ঐ পাশের ঘরেই থাকবো। লক্ষ্মী-ছাড়া মরলে বাঁচি!

(প্রস্থান)

বিনোদ। ড্যাম্, বলি তোমার গয়না কোথায়?

সরোজ। আমার তো গয়না কিছুই নেই, পাঠিয়ে দেবার সময় শাশুড়ী-ঠান সবই খুলে রেখে দিয়েছেন। শুধু দু'গাছা বালা সাথে দিয়ে দিয়েছেন।

বিনোদ। মিথ্যা কথা কইতে শিখেছ? বাপের বাড়ী থেকে গুণ হয়েছে? যাও, গয়না পরে এসো। যাও, আমি অমন ভালবাসি নে।

সরোজ। আমার গয়না কিছুই নেই।

বিনোদ। তবে তোমার মা'র গয়নাগুলিই পরে এসো!

সরোজ। মা'র তো কিছুই নেই, সবই বাঁধা পড়েছে।

বিনোদ। হায়, তবে কি হবে? ফুল! আমি যে আশা করে এসেছিলাম, তা হলো না। গয়না নেই, গয়না নেই, সব জুচ্চুরী, গয়না নেই!

সরোজ। হ্যাঁগা! তুমি অমন করছ কেন?

বিনোদ। কি করছি, কি করছি? গয়না নেই, তবে দাও, তোমার ঐ বালা দু'গাছা আমায় দাও, আ-মা-য় দাও। (পতন)

সরোজ। মা মা, শিগ্‌গীর এসো, শিগ্‌গীর এসো!

(নলিনীর প্রবেশ)

নলিনী। কেন রে কি হয়েছে?

সরোজ। দেখ—দেখ—মা, কি করছে!

নলিনী। ও—মা, এ কি ব্যাপার? ও ঝি, কর্তাকে ডাক্ তো, কর্তাকে ডাক্ তো!

(কামিনীবাবুর প্রবেশ)

কামিনী। কেন, কি হয়েছে?

নলিনী। দেখ, জামাই কেমন করছে!

কামিনী। গিন্নি! তোমার সরোজের বিকার হয়েছিল, বড্ড ভেবেছিলে, মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছিলে, কালীঘাটে বুক চিরে রক্ত

দিয়েছিলে, আবার প্রার্থনা করো, আবার দেবতার কাছে মানসিক করো, সরোজ মরুক, তিনটে মেয়ে একসঙ্গে মরুক, অহ—হ—কি সর্বনাশ, কি সর্বনাশ!

নলিনী। ওগো, না গো না, তুমি ভাল করে দেখ, বোধ হয়, কে কি খাইয়েছে; তুমি শিগ্‌গীর ডাক্তার ডাক।

বিনোদ। ফুল—ফুল—

কামিনী। গিন্নি! দেখছো কি? দুর্দান্ত মাতাল, কোন বেশ্যার বাড়ী গিয়েছিল, সেখানে মদ খেয়েছে, এখন নেশার ঝোঁকে তার নাম করছে। মাথায় জল দাও, আজ এখানেই থাক্, কাল গাড়ী করে বাড়ীতে পাঠিয়ে দিও। গিন্নি! মনে করো সরোজ বিধবা, বিধবারও অধম, নচ্ছার মাতালের স্ত্রী। গিন্নি, আমাদের উচিত কি জানো? সরোজকে নিয়ে জলে ডোবা, তা না হলে দিন দিন আরোও যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে। উঃ, আমার মাথা ঘুরছে, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না, আমি যাই। ভয় নেই, মরবে না, তোমার সরোজের তেমন বরাত নয়। (প্রস্থান)

বিনোদ। কুছ্ পরোয়া নেই—গয়না নেই, গয়না নেই, দেখে নেবো, দেখে নেবো! (প্রস্থান)

নলিনী। চল্ মা সরোজ, ঘরে চল্। আমাদের যেমন অবস্থা, তোর অদৃষ্টেও তেমনই জুটেছে মা। আয় আমার সাথে আয়, হা ভগবান, শেষে এই করলে! (উভয়ের প্রস্থান)

একাদশ দৃশ্য

স্থান—কামিনীবাবুর বাড়ী।

(কামিনী, নলিনী, শশীবাবু, সরোজ, পুরোহিত, নির্মলা, সত্য)

কামিনী। পুরোহিত মহাশয়! বিবাহের সময় হয়েছে কি?

পুরোহিত। হ্যাঁ-হ্যাঁ, সময় হয়ে গেছে, শীঘ্র শীঘ্র কন্যা সম্প্রদান করুন। তা না হয়ে লগ্নভ্রষ্ট হবে যে!

(সত্যের প্রবেশ)

সত্য। অনেক দুঃখেও লোকের হাসি পায়, আজ আমারও তাই। এ দৃশ্য দেখে কার না দুঃখ হয়? যার না হয় সে পাষাণ, পাষাণ হতেও কঠিন। বলি কামিনীবাবু, আপনার আক্কেল কি একেবারে গেছে? আপনি জেনে-শুনে এ মেয়েটাকে বিধবা করতে যাচ্ছেন? এর চেয়ে অবিবাহিতা থাকা কি ভাল ছিল না?

কামিনী। কি করবো বাবা! আমি কি সাধ করে এই বুড়োর গলায় মেয়েকে দিচ্ছি? সমাজ—সমাজ! আজ যদি মেয়ের বিয়ে না দি, কাল যে সমাজ নাকসেট্ মারবেন। সমাজ—সমাজ!

সত্য। আপনায় আর কি বেশী কথা বলবো, কন্যাদায়গ্রস্ত লোকের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। যাক্, একবার বরকে বলে দেখি! বলি ও বুড়ো! বাঃ! বাছাধনের কি চেহারা! ও বুড়ো! আরে এটা কানেও কম শোনে নাকি গো?

ঝি। আজ্ঞে হঁ্যা, একটু জোর করে বলুন।

সত্য। হঁ্যা হে বুড়ো, কাল যাবে কাঠের নীচে, আজ যে এখানে বর সেজে বিয়ে করতে বসেছো? এ পাকা চুলে একটু লজ্জাও নেই?

শশী। এ বেটা নচ্ছার কোথা হতে এলো রে? বেটা মুখ সামলে কথা বলিস, আমি কি বুড়ো হয়েছি?

সত্য। না, বুড়ো হবে কেন? তুমি দেখছি কচি খোকা। ইচ্ছা হচ্ছে এখনই বিয়ে করিয়ে দিই, কিন্তু কি করবো, শক্তি নেই। তাই নীরবেই সহ্য করে যেতে হবে।

শশী। তবে-রে শালা! ছোট মুখে বড় কথা? মার—মার তো শ াকে!

সত্য। বুড়ো বয়সে তেজ তো কম নয়! বাড়ীতে বড় বড় দু'টি ছেলে আছে, তাদের বিয়ে করিয়ে বউ ঘরে এনে আনন্দ কর, সুখী হতে পারবে।

শশী। আরে মূর্খ, তাদের কি বিয়ে করার সময় হযেছে?

সত্য। না, তাদের বিয়ে করার সময় হবে কেন, তোমার বিয়ে করার সময় হয়েছে! যমরাজ এসে ঘাড়ে চেপেছে কিনা!

শশী। আরে আমি কি এখনই মরবো?

সত্য। তা মরবে কেন? দীর্ঘজীবী হও! বোধ হয় কালই তোমায় শ্মশানে যেতে হবে। কেন অকালে এমন সুন্দর ফুলটিকে বৃক্ষচ্যুত করতে

যাচ্ছ বাবা? পায়ে পড়ি, বাড়ী যাও। এ বুড়ো বয়সে আর রসিকতার প্রয়োজন নেই।

শশী। এ বেটা তো বড়ই জ্বালাতন করে তুললে! বলি কামিনীবাবু! এ বেটাকে তাড়িয়ে দিন তো!

সত্য। আর তাড়িয়ে দিতে হবে না, আমি নিজেই যাচ্ছি। মরুভূমিতে জল সেচনে কোন ফলই হবে না। হায় রে দেশ, তোর কপালে শেষে এই ছিল? যে দেশে আশী বছরের বুড়ো বিয়ের জন্য পাগল, সে দেশের কচি কচি ছেলেরা যে বিয়ের জন্য পাগল হবে, তার আর বিচিত্র কি?

(গীত)

মানুষ নাই এ দেশে
সকল মেকি, সকল ফাঁকি,
যে যার মজে আপন রসে।
দেখছি কত মস্ত,
সবাই আপন নিযে ব্যস্ত,
মুখ-খানা বড় মিষ্ট,
অন্তর ভরা বিষে;
কথার বেলায় বৃহস্পতি,
কাজে কেউ না ঘেঁষে,
বলতে গেলে এ সব কথা—
ওহে পাগল বলে হেসে হেসে।
স্বার্থ-ছাড়া কথা কয় না,
অর্থ ছাড়া কাজ করে না,
দেখতে শুনতে রকমটি বেশ,
চিনবার যো নাই বেশে,
ছেলের বাপ বসে আছেন,
পাঁচ হাজারের আশে—
মেয়ের বাপের ভাঙ্গা কপাল,
চোখের জলে ভাসে।

যে দেশ সকল দেশের সেরা,
সে দেশের এমনি ধারা,
দেখে শুনে ইচ্ছা হয়,
চলে যাই বিদেশে ;
তবু কেবল বসে আছি,
ক্ষেপা-মাগীর আশে,
মুকুন্দের ভরসা আছে,
আসবে বেটী দিবে পিষে।

(প্রস্থান)

কামিনী। পুরোহিত মহাশয়! আর বিলম্ব করছেন কেন ?

পুরোহিত। না, আর বিলম্ব করা যায় না। বাজা রে, বাজা! ও বুড়ো ? মন্ত্র পড়ো—মাঘে মাসি—

শশী। মাঘে মাসি।

পুরোহিত। শুক্ল পক্ষে—

শশী। শুক্ল পক্ষে।

পুরোহিত। তৃতীয়াং তিথৌ—

শশী। তৃতীয়াং তিথৌ।

পুরোহিত। ভরদ্বাজ গোত্রস্য—

শশী। ভরদ্বাজ গোত্রস্য।

পুরোহিত। শশীকুমার দেবশর্মণঃ—

শশী। শশীকুমার দেবশর্মণঃ।

পুরোহিত। কন্যা সম্প্রদান—

শশী। কন্যা সম্প্রদান।

পুরোহিত। দধে—

শশী। দধে।

কামিনী। সরোজ ? বর-কনে ঘরে নিয়ে যাও, আমি বামুন-কায়েতদের পাতা করে দিই গে।

পুরোহিত। চলুন, আমিও পরিবেশনে যাচ্ছি।

(উভয়ের প্রস্থান)

ঝি। আহা হা—জামাতা বাবাজীর কি চেহারা! যেন ঘেয়েল বাঘ!

সরোজ। বুড়ো বাঁদর, বুড়ো বাঁদর, চলো আমাই, ঘরে চলো। কুলীনত্বের মুখে ঝেঁটা। (সকলের প্রস্থান)

দ্বাদশ দৃশ্য

স্থান—সত্যের আশ্রম।

(সত্য, নগেন)

সত্য। নগেন, কামিনীবাবু কাল যে কাজ করেছেন, তা মনে হলেও আমার হৃৎকম্প হয়। তুমি শশীবাবুকে চেন? রেলওয়েতে কাজ করতেন, এখন পেন্সন পাচ্ছেন, আশী বছরের বৃদ্ধ, যক্ষ্মা কাশের রোগী, কামিনীবাবু নগদ পাঁচশ' টাকা দিয়ে তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা নির্মলাকে তাঁর কাছে দান করেছেন। ডাক্তার মুখার্জী আমায় যা বললেন, তাতে মনে হয় আর দু'এক দিনের বেশী এ রোগী বাঁচবে না।

নগেন। আপনি বলেন কি! শুনেই যে আমার ভয় হচ্ছে।

সত্য। নগেন, বর্তমান হিন্দু সমাজের এই অবস্থা সবএই দেখতে পাওয়া যায়। কামিনীবাবুর বর্তমান অবস্থা দেখে আমার থেকে থেকেই হরিপদবাবুর কথা মনে পড়ছে। হরিপদ ভট্টাচায নামে এক ব্রাহ্মণ-সন্তান অর্থাভাবে তাঁর মেয়েদের বিয়ে দিতে না পেরে একটা বটগাছের সঙ্গে গলায় দড়ি দিয়ে ভব-যন্ত্রণার শেষ করেছেন। কামিনীবাবুর এ মেয়েটিও বিধবা হয়ে ঘরে এলে তিনিও যাতে আত্মহত্যা না করেন, সেদিকে এখন থেকেই তোমরা বিশেষ লক্ষ্য রাখবে। দীনেশ, সুরেশ প্রভৃতি সেবকদের জানিয়ে দাও, তারাও যেন সতর্ক থাকে। কামিনীবাবুকে রক্ষা করাই এখন তোমাদের সব চেয়ে বড় কাজ; কারণ, তিনি তোমাদের প্রতিবেশী। প্রতিবেশীকে যাঁরা রক্ষা করতে না পারেন, স্বরাজ পাবার আশা করাই তাঁদের পক্ষে ভুল। সাবধান থেকো কিন্তু, আমিও তোমাদের সাথে সাথেই থাকবো।

নগেন। আদেশ বর্ণে বর্ণে প্রতিপালিত হবে। (প্রস্থান)

ত্রয়োদশ দৃশ্য

স্থান—কামিনীবাবুর বাড়ী।

(কামিনী, রামচাঁদ মুদী, নলিনী, সরোজ)

মুদী। বাবু, বাড়ী আছেন?

কামিনী। কে তুমি? কেন ডাকছ?

মুদী। আমি রামচাঁদ। বা , যারা নালিশ করলে, তারা মাস মাস কিস্তি পাচ্ছে, আর আমি ভাল মানষি করে কিচ্ছু করিনি, তাই আমার টাকার নামটিও করছেন না।

কামিনী। কি করবো বাবা? কিছুদিন সয়ে-সয়ে নাও, দু'টো মেয়ে পার করতে বড়ই জড়িয়ে পড়েছি, কিছুদিন অপেক্ষা করো, আমি সকলের দেনাই পরিশোধ করবো।

মুদী। কতদিন সইব মশায়? আর কতদিন সইব? হেঁটে হেঁটে পায়ের জুতো পর্যন্ত ছিঁড়ে গেল, আর আপনার কাছে তাগাদায় আসতে পারবো না বলে দিচ্ছি।

কামিনী। আর ক'টা দিন বিলম্ব কর ভাই, আর এদানিং তো তোমার দোকান থেকে সব নগদই আনা হচ্ছে, আর দু'টো দিন অপেক্ষা করো, আমি বাড়ীখানা বেচতে পারলেই সব দেনা পরিষ্কার করবো।

মুদী। বুঝেছি মশায়, বুঝেছি। সহজে আদায় হবার উপায় নেই, আমারও আদালতে যেতে হবে। তা চললাম, কিছুদিন পরেই বুঝতে পারবেন আমি কেমন রামচাঁদ। (প্রস্থান)

কামিনী। ইচ্ছা হচ্ছে কাপড় ফেলে পালাই। অফিসের দারোয়ানের কাছে পর্যন্ত দেনা হয়ে পড়েছি, আর তো অপমান সহ্য করতে পারি না, এখনই মৃত্যু বাঞ্ছনীয়। মা কালী! কি করলে মা? আমায় মুক্তি দাও মা, মুক্তি দাও।

(নলিনীর প্রবেশ)

নলিনী। ওগো সর্বনাশ হয়েছে গো, সর্বনাশ হয়েছে।

কামিনী। কি হয়েছে, কি হয়েছে?

নলিনী। নির্মলার জামাইয়ের কাল রাত্রে মৃত্যু হয়েছে, নির্মলা এসেছে।

কামিনী। হা ভগবান! কি করলে, এ কি করলে?

(নির্মলার প্রবেশ)

নির্মলা। বাবা! আমি এসেছি।

কামিনী। এসেছ! তা বেশ করেছ মা, আমিও যেমন হতভাগা, তোমাদের বরাতও তাই।

নির্মলা। বাবা! তুমি অমন করলে আমি কোথায় যাবো?

কামিনী। সাধে কি আর অমন করছি মা? আমি কি খেতে দেবো? আমার যে কিছুই নেই, সব গেছে মা, সবই গেছে।

নলিনী। হ্যাঁগা, তুমি স্থির হও। ভেবে ভেবে যে একেবারে দুর্বল হয়ে পড়েছি। যাও মা, ঘরে যাও, কিছু খাবার খাও গে।

(নির্মলার প্রস্থান)

কামিনী। গিন্নি! আর তাকিয়ে কি হবে? আমি যে ভেবে কূল পাচ্ছি নে। এখনো একটি মেয়ে ঘরে, তারও বিয়ে দিতে হবে। হ্যাঁ—এক উপায় আছে, শুনবে?

নলিনী। কি, বলো?

কামিনী। তোমার তো রোজই ব্যামো হয়, আজ না হয় কাল মারা যাবে, আর আমার সজ্ঞানে গঙ্গা-যাত্রা, আর অন্য উপায় নেই গিন্নি, আর অন্য উপায় নেই।

নলিনী। বলি তুমি অত ভ্যবছ কেন? আমাদের মুখের দিকে চেয়ে একটু স্থির হও, তোমার মেয়েদের দশা কি হবে? একটি সধবা হয়েও বিধবার মতন ঘরে পড়ে আছে, আর একটি নিরাশ্রয়া হয়ে চলে এসেছে, আর একটি বালিকা, যে সংসারে ভাল-মন্দ কিছুই বোঝে না, তাদের দশা কি হবে?

কামিনী। তাদের উপায়ের কথা বলছ, একটু একটু আফিং কিনে দাও, একেবারে সব গোল মিটে যাক্। গিন্নি! শুভক্ষণে সংসার করেছিলেম, শুভক্ষণে কন্যারত্ন প্রসব করেছিলে, এখন পরম শুভদিনের কত বাকী, তাই ভাবছি।

(নির্মলার প্রবেশ)

নির্মলা। মা, ঘরে যে খাবার কিছুই নেই।

নলিনী। অপেক্ষা করো মা, আমি বাজার থেকে খাবার আনিয়ে দিচ্ছি।

হ্যাঁগা, তোমার কাছে কি পয়সা আছে ? থাকে তো দুটি পয়সা দাও, বাছা আমার দু'দিন উপবাসী।

কামিনী। খেতে পাওনি মা, খেতে পাওনি ? আমিও উপবাসী, আমারও ক্ষুধা পেয়েছে, আর কিছু না পাও মা, উনুন থেকে কিছু ছাই নিয়ে এসো ; বাবা-মেয়ে দু'জনে একসঙ্গে বসে খাই। শুভক্ষণে সব জন্মেছিলে !

নলিনী। হ্যাঁগা ! তুমি তো এমন ছিলে না ? পেটের সন্তানকে আজ তুমি কি সব বলছ ?

কামিনী। গিন্নি, তোমারই সন্তান, আমার তো নয় ? তোমার দরদ আছে, আমার তো নেই ? আমি কি দিয়ে কি করবো ? আমার যে কিছুই নাই। আমার মাথা ঘুরছে, আমি যাই, আমি যাই।

নলিনী। কোথায় যাও, কোথায় যাও ?

কামিনী। কোথা যাচ্ছি তা শুনবে ? বাড়ীখানা বেচতে। (উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্দশ দৃশ্য

স্থান—পুকুর পাড়।

(নির্মলা)

নির্মলা। মা বসুমতি ! শুনেছি তুমি সকলের মা। তুমি বিদীর্ণ হয়ে তোমার কোলে আমায় স্থান দাও মা। আর তো আমার স্থান নেই মা ! নিশানাথ ! তুমি সাক্ষী। তারামালা ! তোমরা রজনী প্রহরী, তোমরাও সাক্ষী। সকলে বলে জল নারায়ণ, আমি অভাগিনী নারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ করে অনেকবার শীতল হয়েছি, আজ জন্মের মত শীতল হতে চল্লেম। ছিদ্র-ঘট ! তুমিও পরিত্যক্তা, আজ আমিও পরিত্যক্তা, তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু। পোড়া-প্রাণ এখনো তোর দেহের জন্য মমতা ! আর কত দিন তুষানলে জলবি ? ছিদ্র-ঘট, তুমিই আমার সহায়, পোড়া-প্রাণ যদি শেষ দেহের মমতা করে, তখন তুমি আমায় সলিল-গর্ভে ধরে রেখো। নিশানাথ ! অপরাধ নিও না !

(গীত)

ভারত-শ্মশান মাঝে
আমি রে বিধবা-বালা।
বিষের মূরতি করে,
বিধি আমায় পাঠাইলা।
পিতামাতা নিদয় হয়ে,
পরের হাতে সঁপে দিয়ে,
ছিঁড়ে নিয়ে কমল-কলি,
কণ্টকে গাঁথিল মালা॥
জানি না সে কেমন পতি,
মনে নাই রে সে মূরতি,
তথাপি যুবতী হয়ে,
পেটে অন্ন নাই দু'বেলা॥
বিবাহ কি তাও জানি নে,
কেবল মাত্র পড়ে মনে,
অনিচ্ছাতে শৈশবেতে,
খেলেছি এক দুঃখের খেলা।
না বুঝিলাম ভালবাসা,
নাহি সুখ, নাহি আশা,
কারে কবো এ দুদশা,
কে বুঝিবে মর্ম্ম-জ্বালা॥

(জলে ঝম্প প্রদান)

পঞ্চদশ দৃশ্য

স্থান—পথ।

(নগেন, দীনেশ, সত্য, কামিনী, নির্ম্মলা, নলিনী)

নগেন। ভাই দীনেশ, গুরুদেব বলেছেন সর্বদা কামিনীবাবুর উপরে লক্ষ্য রাখতে। চল আমরা কামিনীবাবুর বাড়ীর দিকে যাই।

দীনেশ। চলুন, আমি সর্বদার জন্যই প্রস্তুত হয়ে আছি। কালও একবার সে-বাড়ী গিয়েছিলাম।

(সত্যের প্রবেশ)

সত্য। নগেন! এই কি তোমাদের কর্তব্যজ্ঞান? কত করে বলে দিয়েছি, কামিনীবাবুর উপর লক্ষ্য রেখো। যাও, কামিনীবাবুর বাড়ীতে যাও, বালিকা আত্মহত্যা করছে, দেখ তাকে রক্ষা করতে পার কিনা। (সকলের প্রস্থান)

পট পরিবর্তন

দীনেশ। কোন্ দিকে গিয়েছে তা কি করে জানবো?

নগেন। একজন বললে, কলসী হাতে করে জল আনতে গিয়েছে।

দীনেশ। এখানে দাঁড়িয়ে কি ভাবছ, যাও, ঐ পুকুরটা দেখো গে।

নগেন। পেয়েছি রে পেয়েছি, গলায় কলসী বেঁধে জলে ডুবে মরেছে।

(কামিনী ও নলিনী ও সত্যের প্রবেশ)

নলিনী। মা নির্মলে! চলে গিয়েছিস মা? বড় জ্বালায় জলে গিয়েছিস, বিধবা হয়ে আমার বাড়ী এলি, আমি পোড়া-কপালী তোকে এক মুষ্টি অন্ন দিতে পারলুম না। তাই কি সেই অভিমানে আমায় ছেড়ে চলে গেলি মা নির্মলে! দাঁড়া মা, আমিও তোর সঙ্গে যাই। (পতন)

কামিনী। খুঁজে পাওয়া গেছে, লক্ষ্মীছাড়া মা আমার রাস্তায় যাবে না, তাই জলে ডুবে সকল জ্বালার শান্তি করেছে। বেশ হয়েছে, বেশ করেছ, কোন অজ্ঞাত রাজ্যের যাত্রী, বেশ যাত্রা করেছ মা, যাও, আমিও আসছি। না—না, মা বুঝি ঘুমিয়েছে! ডাকি। নির্মল! নির্মল মা আমার, ওঠ, ওহো—হো, কি সর্বনাশ হলো রে!

দীনেশ। কামিনীবাবু, স্থির হউন, যে চলে গেছে, তাকে তো আর পাবেন না। মায়াময় সংসারের এই খেলা!

কামিনী। বাবা দীনেশ! আমি স্থির হবো? মেয়ে আমার জলে ডুবেছে কেন জানো? আমি বাপ হয়ে তাকে ছাই খেতে বলেছিলাম, সেই অভিমানে মা আমায় ত্যাগ করে চলে গেছে।

মা নির্মলে! একবার কথা ক', বাবা বলে ডাক! ওঃ! কি সর্বনাশ, কি সর্বনাশ!

সত্য। সমাজ, এই তো সমাজের চিত্র, এ দেখে-শুনেও আমাদের চৈতন্য হচ্ছে না। এখনো গৌরব করে বলি আমাদের সমাজ বড় সমাজ, এই কি তার পরিণাম? দীনেশ, তোদের মুখ দেখলেও পাপ হয়; কত করে বলে দিয়েছি, কামিনীবাবুর উপরে লক্ষ্য রেখো; একটি বালিকাকে রক্ষা করতে পারলি না, তোদের দিয়ে কোন্ কাজ হবে রে? বসে আছিস কি মনে করে? এ যে আত্মহত্যা, পুলিস জানতে পারলে যে গোলমালের সৃষ্টি করে তুলবে! শীগ্‌গির এখান থেকে সরিয়ে নাও। আমি এদের বাড়ীর ভেতরে নিয়ে যাচ্ছি। কামিনীবাবু, চলুন, ভেবে কি হবে? বর্তমানে সমাজের যে এই অবস্থা, তা তো দেখতেই পাচ্ছেন।

কামিনী। গিন্নি। চলো, আর ভেবে কি হবে? দেখো তোমার আমার কেউ না যায়। (সকলের প্রস্থান)

ষোড়শ দৃশ্য

স্থান—সত্যের আশ্রম।

(সত্য, নির্মলা)

সত্য। যে গানটি শিখিয়ে দিয়েছি, সে গানটি গাও দেখিনি মা।

(গীত)

নির্মলা।
প্রেম যে আমার পরশমণি
প্রেমে বিপদ সম্পদ গণি॥
বন্ধু যদি দেয় যাতনা,
স্বর্গ-সুখ কি তার তুলনা,
লোহা যে তায় হয় গো সোনা,
পাথর গলে হয় নবনী॥
বিকট বিজন শ্মশান,
হয় মনোরম ফুলের বাগান,

মৃত্যু হয় অমৃত সমান,
দিব্যধাম হয় অবনী ॥
বঁধু আমার ছুঁয়ে দিলে,
পাথর যে ভাসে জলে,
মরা গাছ সাজে মুকুলে,
আমায় হাসে গো চাঁদিনী ॥

নির্মলা। আপনি আমায় এমন করে বাঁচালেন কেন? যার স্বামী নেই, তার এ জগতে থেকে সমাজের ভারকে আরো গুরু করে লাভ কি? আমার তো মরণই মঙ্গল ছিল।

সত্য। এ তুমি বলো কি মা? তোমার প্রাণটা কি কম মূল্যবান মনে করো? এই যে গানটি গাইলে মা, তার কিছুই কি বুঝতে পার নি? ভগবানের দেওয়া সুখটুকু নিতে পারো, আর দুঃখটুকু নিতে পারবে না কেন মা? তবে তাঁর সাথে প্রেম হলো কই? বলছো তুমি অভাগিনী, আমি বলি তুমি ভাগ্যবতী। আজ ব্রহ্মচারিণী হয়ে সমাজে যে আদর্শ রেখে যেতে পারবে, বিধবা না হলে কি তা দিয়ে যেতে পারতে মা? তাই দুঃখিত না হয়ে, আমাদের পুরাতন ব্রহ্মচারিণীদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, জগতের সেবায় আত্মনিয়োগ করে ধন্য হও। বলছো পতি নেই, সে আবার কি? জগৎপতি গোবিন্দই তো এখন তোমার পতি, তাঁর চরণে আত্ম-সমর্পণ করে তাঁর সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করো। আর এই নাও, প্রাণের গভীরতম প্রদেশের লুক্কায়িত ধন দিচ্ছি,—গীতা। এই গীতা শ্রদ্ধার সহিত অধ্যয়ন করো, তবেই দেখতে পাবে মা, এই মায়াময় সংসারে গোবিন্দ ভিন্ন আর দ্বিতীয় কেউ নেই। এই নামাবলী গ্রহণ করো, মহাপাত্র গ্রহণ করো, আর আত্মরক্ষার জন্য এই বিজয়-ত্রিশূল গ্রহণ করো। তোমাকে আর সংসারে ফিরে যেতে হবে না, আমার মায়ের মন্দিরে চলো, আমি তোমায় মায়ের সেবায় নিযুক্ত করছি। আমরা কয়েকজন ভাই আছি, তোমাদের মতন কয়েকজন ব্রহ্মচারিণী বোনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে দিদি। তোমাকে আদর্শ রেখে তোমার মতন কয়েকজন ব্রহ্মচারিণী তৈরী করতে পারি কিনা, আমি সে চেষ্টা করবো। চলো, আমার মায়ের মন্দিরে চলো,

আমি তোমায় মায়ের পায়ে উৎসর্গ করে তোমার কল্যাণের পথকে প্রশস্ত করে দেবো।

নির্মলা। আপনি আমাব ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

('প্রণাম)

সত্য। আশীর্বাদ কবছি, মা আনন্দময়ী তোমায শান্তি দান করুন।

(উভযেব প্রস্থান)

সপ্তদশ দৃশ্য

স্থান সত্যেব আশ্রম।

(নগেন, সত্য)

সত্য। নগেন। নির্মলাকে তো বাঁচিয়েছি। তুমি কামিনীবাবুকে এ সংবাদ দিও না। কাবণ, কামিনীবাবু জানতে পাবলে হ তো নির্মলাকে ঘবে নিযে যেতে চাইবেন। নিমলাকে আদর্শ বেখে, তাব মত কযেকটি ব্রহ্মচাবিণী তৈবী কবতে পাবি কিনা আমি সে চে া কববো।

নগেন। নির্মলা কি সেভাবে জীবন াপন কবতে প্রস্তুত হযেছে?

সত্য। যতদূব বুঝতে পেবেছি, তাতে মনে হয, জগতেব সেবাই সে ববণ করে নিযেছে। বর্তমানে তাকে আমি মাযেব মন্দিবে বেখেছি। যাক্, আজ আমি তোমায একটি আদেশ কববো, সে আদেশ তোমায প্রতিপালন কবতে হবে।

নগেন। কি আদেশ কববেন করুন, এ দাস সে আদেশ পালন কবতে প্রাণ পর্যন্ত দিতেও কুণ্ঠাবোধ কববে না।

সত্য। আমি তা জানি, কিন্তু বর্তমান আদেশ পালন কবতে তোমায কিছু বেগ পেতে হবে নগেন।

নগেন। আপনাব আদেশ প্রতিপালনেব জন্য যে আমি প্রাণও দিতে পাবি, তা কি আপনি জানেন না?

সত্য। সবই জানি। আদেশ আব কিছুই নয। তুমি বিয়ে কবে সংসাবী হও, এ আমাব ইচ্ছে নয়, কিন্তু সমাজেব অত্যাচাবে,—আদর্শ

স্থাপন করার জন্য আজ আমি তোমাকে বিয়ে করতে আদেশ করছি, তুমি বিয়ে করো।

নগেন। গুরুদেব! পায়ে ধরে বলছি, আমায় ক্ষমা করুন, অন্য আদেশ করুন, এ আদেশ আমি পালন করতে পারবো না।

সত্য। নগেন! ভয় করো না, আমি তোমাকে দিয়ে স্বার্থান্ধ সমাজের চোখ খুলে দিতে চাই। তুমি আনন্দে অগ্রসর হও, এতে যদি তোমার কোন অপরাধ হয়, তুমি যদি আমায় বিশ্বাস করো, তবে জেনো, আমি তোমার সকল অপরাধ মাথায় বহন করে তোমার মুক্তির পথ প্রশস্ত করে দেবো।

নগেন। (স্বগতঃ) জানি না গুরুদেবের মনে কি আছে। জীবনে কত পরীক্ষাই না দিয়েছি, আজ আবার কোন পরীক্ষা করবেন, তা তিনিই জানেন। (প্রকাশ্যে) গুরুদেব! তোমার আদেশ প্রতিপালন করতেই চললুম, কিন্তু দেখো ঠাকুর, মায়াময় সংসারে প্রবেশ করে যদি কোন পাপে পতিত হই, পাপের কণা মাত্রও যদি আমার দেহ স্পর্শ করে, তা হলে তখন ঐ শ্রীচরণ-তরণী দানে দাসকে উদ্ধার করতে যেন ভুল না। তোমার চরণে আমার এই প্রার্থনা রইল। (প্রণতঃ)

সত্য। মাভৈঃ,—যাও নগেন, ভয় নেই। তুমি যেমন আমায় আত্মসমর্পণ করে যাচ্ছ, আমি তেমনি তোমায় মা আনন্দময়ীর হাতেই সঁপে দিচ্ছি। যদি এক দিনের জন্যও মায়ের নাম কীর্তন করে থাকি, তবে নিশ্চয় জেনো, মা সর্বমঙ্গলা তোমার মঙ্গলই করবেন। কামিনীবাবুর ছোট মেয়ে প্রমীলাকে বিয়ে করো।

নগেন। আদেশ শিরোধার্য।

সত্য। প্রতিজ্ঞা করো, একটি পয়সাও গ্রহণ করতে পারবে না।

নগেন। প্রতিজ্ঞা করছি, আমি একটি পয়সাও গ্রহণ করবো না।

সত্য। তুমি এম-এ পাশ করেছ তোমার বাবা দশ-বিশ হাজার টাকার আশায় বসে আছেন, তার কথা উপেক্ষা করে চলতে হবে।

নগেন। যে আজ্ঞে, তাই হবে।

সত্য। নগেন! সত্যিই তুমি ত্যাগী! সমাজের প্রত্যেক যুবক যদি তোমার মত ত্যাগ স্বীকার করতে পারতো, তা হলে আমাদের এমন করে পদদলিত, লাঞ্ছিত, ঘৃণিত জীবন যাপন করতে হতো না।

যুবকগণ, তোমরা জাতির এবং দেশের ভবিষ্যৎ। নগেনের মতন আজ তোমরাও প্রতিজ্ঞা করো, বিয়ে করে টাকা নেবো না, শ্বশুরের রক্ত শোষণ করে সমাজকে কলঙ্কিত করবো না। যদি না পারো, তবে স্কুল-কলেজ ছেড়ে বাড়ী যাও, তোমাদের দ্বারা দেশের কিছুই হবে না। যদি পারো, তবে আমি জোর করে বলতে পারি, দেখবে কিছুদিন পরেই এ পতিত সমাজ আবার উন্নতির চরম স্থান অধিকার করেছে। যাও নগেন! তোমার বাবার সাথে গিয়ে কথা বলো। বাবাকে রাগিও না, তাঁকে বুঝিয়ে বলো, তাঁর অভিসম্পাত যেন মাথায় না পড়ে।

নগেন। যে আজ্ঞে! (প্রস্থান)

অষ্টাদশ দৃশ্য

স্থান—শরৎবাবুর বাড়ী।

(শরৎ, লক্ষ্মী, নগেন)

শরৎ। গিন্নি। এতদিনে আমার মনোবাসনা পূর্ণ হলো। মেয়ের বিয়েতে যা খরচ করেছি, তার দুনো আদায় করবো। তোমার নগেন বিয়ে করতে রাজী হয়েছে।

লক্ষ্মী। হ্যাঁ, রাণী এসে বলে গেল; তা যখন মতই হয়েছে, তখন একটা সম্বন্ধ স্থির করে ফেল।

শরৎ। তোমার কথার জন্যই আমি বসে আছি মনে করো না, আমি সেদিন ঘটক পাঠিয়ে দুটি সম্বন্ধ স্থির করেছি। তার একটি নবীনবাবুর মেয়ে, আর একটি শশীবাবুর মেয়ে, শশীবাবুর মেয়েটি ঘোর, তবে তিনি দিতে চাচ্ছেন বেশ। শশীবাবু নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন। এখন তোমার কি মত তা স্থির করো। নবীনবাবুও ঐরকমই দিতে চান তাঁর মেয়েটি সুন্দর।

লক্ষ্মী। নগেনের বউটি যেন সুন্দর হয়!

শরৎ। আজকালের ভেতরেই একটা পাকাপাকি করে ফেলতে হবে।

নগেনের একজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে যাবো, সে মেয়ে পছন্দ করবে।

(নগেনের প্রবেশ)

লক্ষ্মী। কেমন রে নগেন ? আজ কর্তা তা হলে মেয়ে দেখে আসুক ?

নগেন। বাবাকে দেখতে যেতে হবে না, আমি নিজেই ঠিক করেছি।

লক্ষ্মী। তুই বুঝি তোর মামা-বাড়ীর শশীবাবুর মেয়েকে দেখেছিস্ ?

নগেন। আমি শশীবাবুকে চিনিনে, আমি কামিনীবাবুর মেয়েকে বিয়ে করবো।

লক্ষ্মী। কামিনীবাবু কে রে ?

নগেন। কেন মা, আমাদের পাড়ার কামিনী মুখুয্যে !

লক্ষ্মী। ঐ শোন, তোমার ছেলেব মত হয়েছে নয় ? হ্যাঁরে নগেন, তুই কি সত্য সত্যই বিয়ে করবি নে ?

নগেন। আমি তো বিয়ে করতে প্রস্তুতই আছি। আমি কি বাবার কাছে মিছে কথা বলছি মা ?

লক্ষ্মী। তা বলে ঐ লক্ষ্মীছাড়া ঘরে বিয়ে করবি কি রে ? ঐ সেদিন অন্নাভাবে একটা মেয়ে জলে ডুবে মারা গেছে, তুই লেখাপড়া শিখেছিলি কেন রে ?

নগেন। লেখাপড়া শিখে যা হওয়া উচিত, তাই তো হবাব চেষ্টা করছি মা। তুমি একবার তোমার নিজের সন্তান রাণীর কথা মনে করো না !

লক্ষ্মী। তার কথা তুলিস নে, রাণীর শ্বশুর চামার।

নগেন। তার দোষ তো এই, তুমি যা তাকে দিয়েছ, তা তার মনে ধরছে না, সে আরো টাকা চাচ্ছে ; এই দোষ থেকেই তো সে তার বউকে যাতনা দিচ্ছে ? এ দোষ যা যেখানে আছে, সেখানে এই ফলই ফলবে। এক বীজে কখনও দু'ফল ফলে না মা। তুমি তোমার ছেলের বিয়েতে টাকার কামড় করো না।

শরৎ। তুই বলিস্ কি রে ? আমি সম্বন্ধ স্থির করেছি, সব ঠিক !

নগেন। বাবা, এ আপনি বলেন কি ? আপনি জগৎ-পূজ্য ব্যক্তি, আপনার এক পুত্র, সে পুত্র আপনি বিক্রয় করবেন ? কবে আমাদের বংশে এ হীন কাজ হয়েছে যে, আজ আমায় টাকা নিয়ে বিয়ে করতে হবে ? এই জন্যই কি আপনি আমায় উচ্চ-শিক্ষা দিয়েছিলেন ? এই জন্যই কি আমাকে আদর্শ পুত্র

বলে পরিচয় দেন? আমায় বিয়ে করিয়ে কুল-কর্ম করবেন, কুললক্ষ্মী ঘরে আনবেন, তাতে আপনি আমায় বিক্রয় করবেন? ছি ছি বাবা। আজ আপনার এ মতিভ্রম কেন? এ কুসংস্কার পরিত্যাগ করুন।

শরৎ। মেয়ের বিয়েতে কতগুলি টাকা খরচ করেছি, তা জানো?

নগেন। এ আপনি কি বলছেন? রাণীর শ্বশুর আপনাকে পীড়ন করেছে বলে কি আপনি আর একজনকে পীড়ন করবেন? এই দোষেই দেশ উচ্ছন্নে যাচ্ছে, বড় বড় ঘর দেনাদার হচ্ছে, গৃহস্থ ফকির হচ্ছে, বালিকা-হত্যা হচ্ছে। এই কন্যাদায়ে দেশের সর্বনাশ হয়ে গেল। কন্যার জন্ম ঘোর অমঙ্গল বলেই সকলে মনে করছেন। আপনি আদর্শ দেখিয়ে সমাজকে শিক্ষা দিন যে, পুত্রের বিবাহ আসুরিক সন্তান বিক্রয় নয়। পুত্রের পুত্র বংশের স্তম্ভ, পিণ্ডদান অধিকারী, সেই পুত্রের মাতা তার মাতামহের সর্বনাশের হেতু হবে? ঐ কু-প্রথাতেই দেশের ধর্ম-কর্ম আচার-ব্যবহার সব নষ্ট হয়ে গেছে। আপনি স্বার্থ ত্যাগ করে সকলকে শিক্ষা দিন, জগতে কীর্তি স্থাপন করুন, আপনার কৃপায় আমিও ধন্য হবো।

শরৎ। যে টাকাগুলি মেয়েদের বিয়েতে খরচ করেছি, সেগুলিও কি তুলবো না?

নগেন। এ বিরাট ত্যাগের যুগে আপনার মুখে একথা শোভা পায় কি? আপনিও আজ ত্যাগের আদর্শ দেখিয়ে স্বার্থান্ধ সমাজের চোখ খুলে দিয়ে তাকে কল্যাণের পথে নিয়ে চলুন।

শরৎ। বাবা নগেন! আমি তোর বাপ নই, তুই-ই আমার শিক্ষাদাতা বাপ। তুই যা মনে করিস, আমি তাই-ই করবো, তোমার কথায় আমি কুলপ্রথা রক্ষা করবো। গিন্নি! অমত করো না, নগেন বড়ই সুন্দর প্রস্তাব করেছে।

লক্ষ্মী। নগেনের বউটি যেন খুব সুন্দর হয়। (সকলের প্রস্থান)

উনবিংশ দৃশ্য

স্থান—কামিনীবাবুর বাড়ী।

(কামিনী, নলিনী, প্রমীলা, চাকর, সরোজ)

প্রমীলা। মা, তুমি অমন করো না। যে গেছে তাকে তো আর ফিরে পাবে না। এখন আমাদের দিকে তাকাও। বাবাও কেমন হয়ে গেছেন, আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন, চলো, আজ বাবাকে সামনে বসে খাওয়াবে চলো।

নলিনী। প্রমীলা, নির্মলা আমার বড় জ্বালায় জ্বলে গিয়েছে রে! বাছা আমার জ্বলে জ্বলে ভুর হয়েছিল, তাই, এ শীতল জলে জন্মের মতন শীতল হয়েছে। এখানে এলেই একটু শান্তি পাই, তাই এখানে বার বার আসি।

প্রমীলা। মা, মা। ঐ বাবার গলা শোনা যাচ্ছে। চলো মা, চলো, তাঁকে বসে খাওয়াবে চলো।

(কামিনীর প্রবেশ)

কামিনী। গিন্নি এখানে? ও কে, প্রমীলা? তুমিও কাঁদতে শিখেছ? কাঁদ, কাঁদ, আমার মেয়ে যখন হয়েছ, তখন না কেঁদে উপায় আছে কি? কাঁদ, কাঁদ মা, খুব কাঁদতে হবে।

প্রমীলা। বাবা, তুমি অমন করো না, মাকে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে যাও, সকাল থেকে এখানে বসে আছে, কিছুই খায়-দায় নি।

কামিনী। কিছুই খায় নি? খেতে হবে, খেতে হবে। না খেয়ে থাকতে পারবে না, আজ না হয় কাল খাবে, পেট বুঝবে না। তুমি না খাও না খাবে, আমি না খেয়ে থাকতে পারবো না। আমার বড় খিদে, বড় খিদে।

নলিনী। বাছা আমার এইখানে বসে সূর্যের পানে তাকিয়ে থাকতো। তুমি দেখেছিলে?

কামিনী। হ্যাঁ দেখেছিলাম, সেই দেখাই আমার শেষ দেখা গিন্নি—সেই দেখাই আমার শেষ দেখা। আর কি দেখা হবে না? হবে—হবে,

ইহকালে না হোক পরলোকে হবে। যাই, মাকে খুঁজে দেখি গে। প্রমীলা, চিন্তা করো না মা, আমি তোমারও বিয়ে দেবো, যাই যাই, পাত্র খুঁজিগে।

প্রমীলা। বাবা, আমার বর তোমার খুঁজতে হবে না, বাবা।

(গীত)

থাকুক আমার বিযে
চাই না আমি এম্, এ, বি, এ,
কিনতে হয় যা টাকা দিয়ে,
ছাগল গরুর মতন
যাদের ছেলেব হাটে গিযে।
সোনার চেইন সোনার ঘড়ি
গর্ব যাদের গলায পরি,
অমন পশু কিনো না গো
টাকা কড়ি দিযে।
কুলনি চেযে ভাল কুলী
মুচি ডোম কসাইগুলি,
সারা জীবন ফিবে কেবল
ছুরি শানায়ে।
যখন যারে কায়দায পায
যে ঠেকেছে মেয়ের দায়,
ধর্ম ভুলে চর্ম খুলে
কর্ম সারে গিয়ে।
বেচবে কেন ভিটে মাটি
মজবে কেন আমার তরে
ভিটেয় পুকুর দিয়ে।
যে করবে তোমার দুর্গতি
ভজব কি সে পশুপতি,
পূজবো না হয় পশুপতি
উমার মত গিয়ে।

অনেকের সর্বনাশ হয়ে গেছে, আমি সে সর্বনাশ হতে দেবো না, তোমার বিয়ে দিতেই হবে। যাই যাই, পাত্র খুঁজে দেখিগে।

(সরোজের প্রবেশ)

সরোজ। বাবা! তোমার কি শরৎবাবুর সাথে দেখা হয়েছে ?

কামিনী। না মা, কখন দেখা করবো ? প্রমীলার বিয়ে নিয়ে বড়ই ব্যস্ত আছি।

সরোজ। বাবা, প্রমীলার বিয়ের জন্য ভেবো না, শরৎবাবু তোমার সাথে দেখা করে নগেনের সাথে প্রমীলার বিয়ে স্থির করে যাবেন। তুমি শরৎবাবুর সাথে দেখা করে স্থির করো।

কামিনী। আর ঠিক কি মা ? তাড়াতাড়ি বিয়ে, তোমাদেরও দুটির তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়েছিলুম, কেমন বিয়ে দিয়েছিলুম, ভাল নয় কি ? যাই, যাই প্রমীলার বিয়ের পাত্র দেখিগে।

(চাকরের প্রবেশ)

চাকর। বাবু! বাইরে পরোয়ানা নিয়ে প্যাঁদা দাঁড়িয়ে আছে, মুদী দস্তকের পরোয়ানা বের করেছে।

কামিনী। তবে কি হবে ? আর বুঝি মান রাখতে পারলুম না। ও কে ? বিপদের বন্ধু এসেছে ? দাঁড়াও—একটু দাঁড়াও—আমি যাচ্ছি ! মা নির্মলে ! এই আমি আসছি, আমায় ধরবে, আমায় ধরবে—হা—হা—হা !

(প্রস্থান)

নলিনী। সরোজ ! দেখ্ দেখ্, কর্তা পাগলের মতন কোন্ দিকে ছুটে গেল, দেখ্ ! (সকলের প্রস্থান)

বিংশ দৃশ্য

স্থান—গোয়ালঘর।

(কামিনী, সত্য)

কামিনী। হা—হা—হা, আমায় ধরবে ? এই যে এসেছ বন্ধু, আর বিলম্ব নেই, আমি যাচ্ছি। ঐ বুঝি প্যাঁদা আসছে ! কোথায় পালাবো ?

কি বলছো বন্ধু, বিলম্ব করতে পারবে না? আমার মত অনেক হতভাগা আমার জন্য অপেক্ষা করছে, তাদের কাছে নিয়ে যাবে? তা বেশ, আমিও যাচ্ছি। বাইরে বড় ভিড়, তাই এ গোয়াল-ঘরে এসেছি, বড় যত্নে গোশালা প্রস্তুত করেছিলুম, গো-দুগ্ধে সন্তান প্রতিপালন করবো, কিন্তু হতভাগার ঘরে গো-লক্ষ্মী থাকবে কেন? আমার সব গেল—, সব গেল—ওহো—, কি হলো—রে—? ও কে—নির্মলা? দাঁড়িয়ে কি বলছ মা? আমি তোমাকে ছাই খেতে বলেছিলুম, আর সেই মুখে আমি অন্ন খাচ্ছি—? না মা—আর খাবো না—, খাওয়া শেষ করে দিচ্ছি—, একটু অপেক্ষা করো—দু'জনে একসঙ্গেই থাকবো—। ছুরি চাই, কি বলছো—ছুরিতে হবে না? যদি হৃদয়ের মর্মস্থল ভেদ করতে না পাবে? রজ্জু চাই—, এই যে রজ্জু পেয়েছি! যাই—মা নির্মল, দাঁড়া মা, আসছি—!

(গমনোদ্যত)

(সত্যের প্রবেশ)

সত্য। কোথায় যাচ্ছেন? আত্মহত্যা করতে? কার জন্যে? নির্মল আপনার কে? যাঁর জিনিস তিনিই নিয়ে গেছেন, মায়াময় সংসারে কেউ কারো নয়। বিপদে পড়েছেন,—মাকে ডাকুন।

(গীত)

পতিত-পাবনী অধম-তারিণী
দীন দয়াময়ী শ্যামা রে।
এ ঘোর অকূলে পার হবি হেলে,
পরাণ খুলিয়ে ডাক রে॥
মধুর কণ্ঠে যদি ডাক নিরবধি
ভেসে ভেসে আঁখি জলে,
হউক না পাষাণ মায়ের পরাণ
সে পাষাণ যাইবে গলে;
মায়ের কাঁদবে পরাণ
ছেলের লাগি,
ছেলের চোখে জল দেখিলে!

ছেলে কাঁদে যার   সে মা কি রে আর
ঘুমাতে কখনো পারে রে ॥
কুণ্ডলিনী জাগিবে রে,
মনের আঁধার ঘুচিবে রে,
মরা প্রাণ আবার নেচে উঠিবে রে ;
জাগলে শ্যামা,
শুনবি মায়ের অভয় বাণী,
বিপদ সাগরে   ভয় রবে না রে
অনায়াসে যাবি পারে,
যদি ডাক প্রাণভরে   ব্যাকুল অন্তরে,
কেঁদে কেঁদে অভয়ারে ;
বিপদ রবে না তোমার,
আর আর বিপদ,
মুকুন্দের জননী   পতিত-পাবনী,
তরাতে পতিত জনে রে ॥

সত্য। কামিনীবাবু! স্থির হউন, আপনার দুঃখের দিন কেটে গেছে, সুখের দিন অতি নিকটে। বিশ্বাস না হয়, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

(উভয়ের প্রস্থান)

একবিংশ দৃশ্য

স্থান—সত্যের আশ্রম।

(সত্য, বিনোদ)

সত্য। বিনোদ! তোমায় এত করে বোঝালাম, কিন্তু এখনো পর্যন্তও তুমি বুঝতে পারলে না যে, তোমার জীবনের পরিণাম কি? বিয়ে করে হাজার টাকা পেয়েছিল, তা বেশ্যাবাড়ী আর মদ খেয়ে লুটিয়ে দিয়েছ, বাড়ীখানা বিক্রী করেও কম টাকা পাওনি, কিন্তু তাও তোমার মদেই খরচ হয়ে গেছে। এখন পরবার কাপড়

নেই, ভিক্ষা করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছ, এখনো বুঝতে পারনি মূর্খ, বেশ্যাবাড়ীর পরিণাম কি ?

বিনোদ। গুরুদেব, সত্যই বলছি, আমি এখনো পর্যন্তও আমার মনকে ফেরাতে পারিনি।

সত্য। সেখানে যেতে কেন ?

বিনোদ। তাকে বড়ই ভালবাসতাম, তাই সেখানে গিয়ে পড়ে থাকতাম। তাকে দেখলে আমি আমায় হারিয়ে যেতাম। কি যে হয়ে যেতাম, তা আপনায় বোঝাতে পারবো না। তাকে ভালবাসতাম, গুরুদেব। তাকে ভালবাসতাম।

সত্য। আরে বেশ্যা কি আর ভালবাসার জিনিস হতে পারে? কাকে ভালবাসতে হয় তা আগে অনেক দিন বলেছি, আজ আবার বলছি।

(গীত)

ভালবাসতে যদি হয়,
তাঁরে শুধু ভাল বাস,
যে জন প্রেম-ময়।
বাইরে শুধু চক্ষু বুজে,
মনের মানুষ মরো খুঁজে,
প্রাণের প্রাণ যে জন সে জন
প্রাণের মাঝেই রয়।
সবার চেয়ে মিষ্টি সে যে,
সবার চেয়ে ভাল,
সবার চেয়ে মধুর বড়
তাঁরি রূপের আলো ;
সকল রসের রসিক তিনি,
এমনি রসময়
তাঁর সনে তোর কিনা চলে
কোন্‌টা বা না হয় ;

(তাঁরে) পেয়েছে যে দেয় না সাড়া
পেয়ে তাঁরে আপন-হারা
(যেমন) উপরে জল রয়েছে থির
মাঝে তুফান বয়।

বিনোদ। তবে আমার এ অবস্থা কেন? আমি তাঁকে তেমন করে ভালবাসতে পারি না কেন? এ সকল কার খেলা?

(গীত)

সত্য।
এ সব চার পাগলের খেলা,
একটা সাদা, একটা লাল,
একটা কালী, একটা কালা॥
সবই এক ভাবের পাগল,
এক যোগেতে করে সকল,
বুঝতে গেলে বাধায় রে গোল,
এমনি মজার খেলা;
যে বোঝে তার যায় রে ঘুচে,
এ সংসারের খেলা;
ডুবে যায় তাঁর প্রেম-সাগরে,
যে সাগরের নাই রে তলা॥
খেলিছে নিত্য নূতন,
কি ভাবেতে খেলে কখন,
বোঝে সে জন হয় রে যে জন
সে পাগলের চেলা;
বুঝবে কি ভাই বোঝা কঠিন,
পাগলা পাগলির খেলা।
কুলকুণ্ডলিনী মহারাণী
মূলাধারে পারের ভেলা॥

বিনোদ। গুরুদেব! কি শোনাচ্ছ? আমায মুক্তির পথ দেখিয়ে দাও! আমি যে এখনো তাকে মন থেকে সরাতে পারছি নে। পিরিতের

এত জ্বালা, তা পূর্বে বুঝতে পারিনি, আমায় বুঝিয়ে পথ ধরিয়ে দাও—

সত্য। স্বর্গের সোনা এখন নরকে স্থান পেয়েছে, যে পিরিত চণ্ডীদাসের সাধনা, যে পিরিত বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের মূল তত্ত্ব তা কিনা আজ যেখানে-সেখানে বিকিয়ে যাচ্ছে। হা রে, পিরিত কি মুখের কথা, চণ্ডীদাস বলতেন—

বিহি একচিতে ভাবিতে ভাবিতে
নিরমাণ কৈলা পি,
রসের সাগর মন্থন করিতে,
তাতে উপজিল রি ;
পুন যে মথিল অমিয় না হলো,
তাতে ভিঞাইল তি,
(পিরিতি) এ তিন আখর
ভুবনেবি সার
তুলনা দেব যে কি !

সে পিরিতি এখন যেখানে-সেখানে। হা রে। পিবিতি কাব সাথে কবতে হয় তা জানিস্ ?

(গীত)

পিরিতি কবিবি, পিবিতে মজিবি,
পিরিতি পবাণ পাখী,
সু-জন দেখিযা, করিবি পিরিতি,
প্রহরী রাখিবি আঁখি।
সু-জনে সু-জনে, হইলে পিরিতি,
থাকিবি পরম সুখে,
অরসিক সনে, করিলে পিরিতি,
জনম গোঁয়াবি দুখে।
পিরিতি সাধন পিরিতি ভজন,
ঐ তিন ভুবন সার রে,
পিরিতের মত, না হলে পিরিতি,
কিসে হবি ভব পার রে।

পিরিতে জীবন, বিচ্ছেদে মরণ,

পিরিতে করো না হেলা,

পিরিতি রতন, কর রে যতন,

পিরিতি পারের ভেলা।

পিরিতের জন, জান রে সে জন,

স্বজন করে যে জনে।

শ্রীগুরু আদেশে, মুকুন্দ কহিছে,

পিরিতি মায়ের সনে॥

বিনোদ। গুরুদেব! আমায় রক্ষা করুন, বলে দিন আমার গতি কি হবে!

সত্য। আর ভয় নেই, পূর্ব পাপের জন্য যখন অনুতপ্ত হয়েছ, চোখে জল পড়েছে, তখন সব পাপই ধুয়ে-মুছে যাবে। যাও, বাড়ী যাও, কামিনীবাবু এখনো বেঁচে আছেন, তাঁর কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করো। তোমার সহধর্মিণীর প্রাণেও আঘাত কম দাও নি, তার কাছেও ক্ষমা ভিক্ষা করো, তাঁরা যদি তোমায় ক্ষমা করেন, তবেই তোমার মঙ্গল হবে।

বিনোদ। যে আজ্ঞে, আমি তাই করবো, আমার ভুল আমি বুঝতে পেরেছি।

সত্য। ভয় নেই, মা তোমার মঙ্গলই করবেন। (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বাবিংশ দৃশ্য

স্থান—কামিনীবাবুর বাড়ী।

(কামিনী, নলিনী, শরৎবাবু)

কামিনী। হায় অদৃষ্ট! আর কত কাল যে এ যাতনা ভোগ করতে হবে, তা ভগবানই জানেন। পেটে ভাত নেই, পরবার কাপড় নেই, রাস্তায় দাঁড়িয়েছি। ভগবান! আর কত দুঃখ দেবে? এখন আমায় রেহাই দাও।

(শরৎবাবুর প্রবেশ)

শরৎ। কামিনীবাবু বাড়ী আছেন কি? কামিনীবাবু!

কামিনী। আর লোকের কাছে মুখ দেখাবার ইচ্ছা নেই। মৃত্যু কামনা করছি, এখন মরলেই বাঁচি।

শরৎ। কামিনীবাবু বাড়ীতে আছেন কি ? ভেবে ভেবে ভদ্রলোকের মাথাই খারাপ হয়ে গেছে। ইনি আমাদের দেশের একজন বিদ্বান লোক, আজ এঁর অবস্থা দেখে কার না দুঃখ হয় ? কামিনীবাবু!

কামিনী। (চমকিত হয়ে) কে আপনি ? আসুন, আসুন আসতে আজ্ঞা হয়। আমি একটু অন্যমনা ছিলাম, ত্রুটি মার্জনা করবেন।

শরৎ। আমার কাছে আপনার ওভাবে কথা বলার কোন প্রয়োজন নেই, আমি আপনার প্রতিবেশী, আপনার জন।

কামিনী। তার আর সন্দেহ কি ?

শরৎ। আমি আপনার একটা সুসংবাদ দিতে এসেছি, সংবাদ শুনলে আপনি আনন্দিত হবেন, এ বিশ্বাসও আমার আছে।

কামিনী। এমন কি সংবাদ আছে, তা বলুন, আমার জীবন-ভরা দুঃখ, সুসংবাদ জীবনে বড় পাই নি।

শরৎ। আপনার সাথে যে আমার খুব নিকট সম্বন্ধ হতে চলেছে।

কামিনী। সে কি রকম ?

শরৎ। আমার ছেলে তো এতদিন বিয়ে করতে রাজী হয় নি, কিন্তু ভগবানের কি শুভ ইচ্ছা তা জানি না, তার বিয়ের মত হয়েছে।

কামিনী। কে ? নগেন ?

শরৎ। আজ্ঞে হ্যাঁ, তার পরে সে আবার আপনার মেয়ে প্রমীলাকেই পছন্দ করেছে, আপনি আপনার মেয়ে বিয়ে দিতে প্রস্তুত আছেন কিনা, তা জানতেই আমি এসেছি।

কামিনী। (স্বগতঃ) এ কি—আমি স্বপ্ন দেখছি ? ভগবান তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

শরৎ। আপনি ভাবছেন কি ?

কামিনী। কিছু নয়, তবে আমার মত কাঙালের মেয়ে আপনার ঘরে যাবে, আমার মেয়ের এমন বরাত হবে—তা ভাবতে পারছিনে।

শরৎ। আপনি বিয়ে দিতে প্রস্তুত আছেন কিনা তাই বলুন, মনে রাখবেন, আমি আমার ছেলে বিক্রয় করবো না। আপনার থেকে এক পয়সাও গ্রহণ করবো না।

কামিনী। তা হলে এ অমৃত খেতে আমার অরুচি হবার কোনই কারণ নেই। আমি আনন্দের সহিত আপনার প্রস্তাব সমর্থন করছি।

শরৎ। তা হলে আপনি দয়া করে এই পাঁচ শ' টাকার নোট গ্রহণ করুন।

মনে করবেন না আমি আপনার মেয়ের পণ দিচ্ছি। আপনি বর্তমানে যে অবস্থায় আছেন, তা আমি জানি, তাই আপনার কিছু সাহায্য করছি। মেয়ের গহনার জন্যও আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমার মাকে আমি আমার মনের মতন করেই সাজিয়ে নেবো। আপনি আনন্দে বিয়ের আয়োজন করুন, আপনার আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করুন। টাকা যত লাগে তা আমিই দেবো। আমার নগেনের বিয়ের জন্য আমি এক কপর্দকও গ্রহণ করতে প্রস্তুত নই। (প্রস্থান)

কামিনী। ইনি কি দেবতা? মানব-বেশে এসে আমায় কৃতার্থ করে গেলেন! গিন্নিকে এ আনন্দের ভাগ না দিয়ে তো পারি না। ডাকি, গিন্নিকে ডাকি। গিন্নি? গিন্নি, ছুটে এসো, আজ বড়ই আনন্দের দিন।

(নলিনীর প্রবেশ)

নলিনী। বলি এত আনন্দ হলো কিসে?

কামিনী। আনন্দেরই কথা গিন্নি। এমন আনন্দ তো জীবনে কখনো পাইনি! সরোজ যা বলেছিল তাই ঠিক! শরৎবাবু এসেছিলেন। নগেনের সাথে প্রমীলার বিয়ে স্থির করে গেলেন।

নলিনী। আমাদের এমন সৌভাগ্য হয়েছে? বোধ হয় মা এতদিনে মুখ তুলে চাইলেন। আমাদের কি দিতে হবে?

কামিনী। তিনি তাঁর ছেলের বিয়েতে এক কপর্দকও গ্রহণ করবেন না। বরং আমায় বিয়ের খরচ বাবদ পাঁচ শ' টাকা দিয়ে বলে গেছেন, আপনি আনন্দে বিয়ের আয়োজন করুন—টাকার প্রয়োজন হলে আমি আরো টাকা আপনায় দেবো।

নলিনী। মনে হয় নগেনের ইচ্ছায়ই একাজ হয়েছে—তা না হলে শরৎবাবু টাকা না নিয়ে ছেলের বিয়ে দেন? আরো এমন গরীবের ঘরে?

কামিনী। তা হতে পারে। তবে শরৎবাবুর হাত কোনদিনই ছোট নয়, তিনি অনেক টাকা অনেক সময় গরীবের সেবায় দান করেন। এখন তুমি আর বিলম্ব করো না, বিয়ের আয়োজন করো। কাল গায়ে হলুদ, পরশু বিয়ে।

নলিনী। আচ্ছা, আমি এখন যাচ্ছি। (প্রস্থান)

কামিনী। আমিও যাই, আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদের সংবাদ দিই গে, এমন সৌভাগ্য তো আমার জীবনে আর কখনও হয় নি। ভগবান, যে

তোমায় ধরে থাকে, তাকে তুমি এমনি করেই শাস্তি দান করো।
ধন্য তুমি, আজ ধন্য হলো তোমার দয়াময় নাম। (প্রস্থান)

ত্রয়োবিংশ দৃশ্য

স্থান—কামিনীবাবুর বাড়ী।

বিবাহসভা।

(কামিনী, শরৎ, নগেন, নলিনী, পুরোহিত, সরোজ, প্রমীলা, সত্য প্রতিবেশিগণ ও বিনোদ)

কামিনী। শরৎবাবু! আজ আপনি সমাজে যে ত্যাগের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করলেন, তা সত্যই সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী যাঁরা আছেন, তাঁদের সকলেরই গ্রহণ করা কর্তব্য। আপনার মত ত্যাগী লোকেরই বর্তমান সমাজে প্রয়োজন। আদর্শ যতই সমাজের সামনে উপস্থিত হবে, সমাজের উন্নতিও ততই হবে। তাই বর্তমানে বক্তৃতায় কিছু হবে না, চাই ত্যাগের আদর্শ।

শরৎ। নগেনের ত্যাগেই আমায় এমন করে পাগল করে দিয়েছে। সত্য সত্যই বর্তমানে আদর্শ চরিত্রের প্রয়োজন, যা দেখে সমাজ অগ্রসর হবে। পুরোহিত মহাশয়! আপনি আপনার কার্য শেষ করুন!

কামিনী। (কন্যা সম্প্রদান)

মেয়েরা। (হুলুধ্বনি)

সত্য। সমাজ যদি এ বিয়েকে অনুকরণ করে চলেন, তা হলে নিশ্চয়ই সমাজের আনন্দের দিন আসবে। নগেন! সংসারে চলেছ, যাও, কিন্তু পরমহংসদেবের কথাটা যেন ভুলে যেও না। সংসারই যদি করতে হয় নগেন, তা হলে মায়ের কাছে একখানা আম্‌মোক্তারনামা দিয়ে নাও। যাও কালীমন্দিরে যাও, মায়ের চরণামৃত গ্রহণ করে সংসারে প্রবেশ করো গে। বিনোদ! যাও, কামিনীবাবুর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করো।

বিনোদ। (কামিনীবাবু এবং তাঁর স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইল)

শরৎ। **চলুন, এখন আমরা সকলে মায়ের মন্দিরে যাই।**

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্বিংশ দৃশ্য

স্থান—শ্রীশ্রীকালী-মন্দির।

(শরৎবাবু, কামিনীবাবু, বিনোদ, নগেন, সরোজ, সত্য, নলিনী)

সত্য। নগেন! মায়ের নামকীর্তন করো। সকলে—

(কীর্তন)

একবার ব্যাকুল প্রাণে তাঁরে ডাকো রে।
দীন দয়াময়ী শ্যামা মায়েরে॥
পাতিতপাবনী, অধমতারিণী।
মায়ের দীন জনে, বড় দয়া রে॥
হইবে দয়া, ঘুচিবে মায়া
প্রেমের সাগরে, যাবি ভেসে রে॥
ত্রিগুণধারিণী, কলুষনাশিনী।
সাকার আকার, নিরাকার নির্বিকার।
তারিণী তার, এ মুকুন্দেরে॥

=যবনিকা=

পল্লীসেবা

—ঃ*ঃ—

মুকুন্দদাস প্রণীত

নায়ক

পূজারী		
সন্ন্যাসী		কর্মগুরু।
নিত্যানন্দ		পল্লী-সমিতির চালক।
শরৎ রায়	...	জমিদার।
রাজেন্দ্র		ঐ পুত্র।
গোপী		ঐ জ্ঞাতি।
পঞ্চানন		ঐ ।
প্রমোদ		পল্লী-সেবক।
সতীশ		কর্মীসঙ্ঘের নেতা।
শিবরাম		টোলের পণ্ডিত।
আবদুল কাদের		জনৈক কর্মী।

সেবকগণ, ছাত্রগণ, বানিয়া, প্যাদা, প্রজাগণ, দেওয়ান, চাকর, দরোয়ান।

নায়িকা

অমলা		শরৎবাবুর স্ত্রী।
লীলা	.	ঐ মেয়ে।
নির্মলা	...	ঐ পুত্রবধূ।
নিত্যকালী		শিবরামের স্ত্রী।
বিমলা	...	শিক্ষিতা মেয়ে।
সুলভা		নিত্যানন্দের ভগ্নী।
শান্তি, জ্যোতি, শৈল		ছাত্রীত্রয়।
ঊর্মিলা	...	দামোদর রায়ের মেয়ে
ভিখারিণী	...	শরৎবাবুর প্রজা।

পল্লীসেবা

—:*:—

প্রস্তাবনা

স্থান—বঙ্গোপসাগর-কূল

(গীত)

পূজারী । দীনতারিণী পতিতপাবনী
অধমতারিণী তুই শ্যামা মা ;
জাগো মা কুলকুণ্ডলিনী
ডাকে ভকতি-ভজন-বিহীন জনা ।
তুই না জাগালে কেউ জাগিবে না,
কাল ঘুম মোদেব কারোই ভাঙ্গিবে না ;
এ ঘোরা রজনী আর পোহাবে না,
সবই হযেছে শব মা ;
সে শবোপরি এসে দাঁড়া ত্রিনয়না,
ভ্রামরী ভবানী ভৈরবী ভীষণা,
আজ নাচ মা ,
ত্রিশকোটি শবোপরি নাচ আজ
তাথৈ তাথৈ থৈ ধিন্ ধিন্ ধিনা ।
বাতুল চরণ পরশ পাইয়া
ত্রিশ কোটী মড়া উঠিবে বাঁচিয়া ;
দেখলে মায়ের শ্রী উঠিবে শিহরি
কাঁদিয়া উঠিবে প্রাণ ;
তখন কোটী কণ্ঠ মিলে একবাব হুঙ্কারিলে
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে
তবেই সিদ্ধি হবে মা
ভারতের চির-আকাঙ্ক্ষিত স্বরাজ-সাধনা ।

মা, একদিন ছিল, যেদিন বাঙ্গালায় বাঙ্গালী তোমায় আহ্বান করেছে। অকুণ্ঠিত-চিত্তে তাদের কোষাগারের দ্বার মুক্ত করে সমগ্র পৃথিবীর অন্নের সংস্থান করে দিয়েছে। বাঙ্গালার পূজার বাজারে শুধু বাঙ্গালী নয়, পৃথিবীর নরনারী আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়তো। কিন্তু আজ বাঙ্গালীর কোষাগার শূন্য, আতঙ্কে শুকিয়ে গেছে প্রাণ, একমুষ্টি অন্নের জন্য আজ তারা পরের দ্বারস্থ। তোমার পায়ে অর্ঘ্য দেবার সামর্থ্য তাদের নেই। সেদিন অতীতের কাল-স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে কোন সাগরের অতল-তলে ডুবিয়ে দিয়েছে তা কে জানে? ভক্ত নীলকণ্ঠ গাইতেন :

যার কপালে আগুন ধরে,
তার কেউ দেখে না মুখ, ব্রহ্মাণ্ড বৈমুখ ;
সুখ নাই তার ত্রিসংসারে।
আগে তার ঘরে প্রবেশ করে ব্যাধি,
পরে মরে তার পুত্র পৌত্রাদি—
জামাতা কি কন্যা দৌহিত্র থাকে যদি,
পোষ্য-পুত্র নিলেও মরে।
জলে করলে ঘর ঘরে লাগে আগুন,
পোড়ে কোঠা-বাড়ী ছোটে টালি চুণ ;
যার কপালে যখন লাগাও আগুন,
তার লোহার কড়িতেও ঘুণ ধরে।
ক্ষেত্রে হয় না শস্য, বৃক্ষে হয় না ফল,
দুগ্ধবতী গাভী দুগ্ধহীন সকল ;
সরোবর শূন্য শুকিয়ে যায় জল,
জল বিনে মীন মরে।

সত্য সত্যই বাঙ্গালীর কপালে অগুন ধরেছে! বাঙ্গালী তার জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে আজ সে পরমুখাপেক্ষী লাঞ্ছিত পদদলিত ; পরে দিলে সে খায়—নইলে তার উপোষ! তাই বড় দুর্দিনের সময়ে মা, তোমার শারদীয় উৎসবের ঘণ্টা বাজালে!

আজ তোমায় কি দিয়ে বাঙ্গালী বরণ করে ঘরে নিয়ে যাবে? তার আছে কি! শ্মশানে থাকে কি? আছে, চিতা-ভস্ম, আছে অস্থি-কঙ্কাল। অন্ন-চিন্তা চমৎকার, নগ্ন বাঙ্গালী অনাহারে, অর্ধাহারে আজ সে মরণ-সাগরের পারে দাঁড়িয়ে। তাই আজ মরণের পথে মরঃ-কান্না কেঁদেই সে তোমায় আহ্বান করবে। বাঙ্গালায় আজ যে ঘোর অমানিশা। রাজ-রাজেশ্বরী—এসো মা, আজ সপ্তকোটী বাঙ্গালীর ভগ্ন-হৃদয়ে তোমার ভৈরবী মূর্তি নিয়ে। বাঙ্গালার গগন-পবন কম্পিত করে মহোল্লাসে অট্ট অট্ট হাস্যে বাঙ্গালীর গৃহ-শ্মশানে করো আজ তাণ্ডব নৃত্য। শিবা-মুখরিত ভয়াল শ্মশানে "হিলি-হিলি কিলি-কিলি" করে নাচুক তোমার ডাকিনী যোগিনী; হোক মা তোমার মহাপ্রলয়ের বৈষ্ণবী লীলার ধ্বংস-যজ্ঞের চির সমাধান! সৃষ্টি করো বাঙ্গালায় আজ এক নূতন বীর জাতি, দাও তাদের নূতন প্রাণ, নব ভাবে নবোদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত হয়ে করুক তারা প্রতিগৃহে তোমার উৎসবের মঙ্গল-ঘট স্থাপনা। বাজুক দামামা, কাড়া, ঘণ্টা, ঢোল, শঙ্খ, করতাল, জয়ডঙ্কা, খোল, নাচুক ধমনী শুনিয়ে সে রোল; সপ্ত-কোটী-কণ্ঠ-কলকল-নিনাদে বিশ্ব বিকম্পিত করে বাঙ্গালী করুক তোমার বিজয়-বার্তা ঘোষণা। দাও তাদের বাহুতে শক্তি, হৃদয়ে ধর্মের তেজ, প্রাণে নূতন প্রেরণা; জয়োল্লাসে মাতৃগরবে গর্বিত বাঙ্গালী করুক তোমার পূজার বেদী রচনা; বীরাচারী বাঙ্গালী বীরাচারে করুক তোমার জগন্ময়ী রূপের বিরাট আয়োজন।

হায় মা, রুগ্নদেহ, ভগ্নমন, অবসন্ন প্রাণ, আশাহত চিন্তাক্লিষ্ট বাঙ্গালী আমরা দাঁড়াইয়ে আছি শুধু অহমিকার উচ্চ-গিরি-শিরে। নাহি পথ—আছে একটি মাত্র পথ, বাণিজ্য—সে পথ রোধি বিদেশী বণিকগণ বিস্তারিয়া আঁধার বদন। আর এক পদ মাত্র অগ্রসিলেই বাঙ্গালীর আশাহত জীবনের হইবে নির্বাণ। তথাপি, জানি আমি, বাজিলে নামের ভেরী তমজাল যাইবে ছিঁড়িয়া। কিন্তু চলিয়াছে সব, কিছুদিন পরে বাঙ্গালীর আপনার বলিতে আর রহিবে না কিছু। ঐ দেখ বাঙ্গালীর রক্ত চুষি তরঙ্গ-সঙ্কুল কাল-স্রোত বাঙ্গালার বুক চিরি পশ্চিম সাগরে চলিয়াছে ছুটি। তাই প্রার্থনা করি—আশিস্ কর মা আজি, অহমিকার

উচ্চ-গিরি হতে বাঙ্গালী ঝাঁপায়ে পড়ুক ঐ কাল-স্রোতের উত্তাল তরঙ্গের মাঝে, পাউক তারা শীতল সমাধি। কিন্তু মরিবে না মায়ের সন্তান। তুচ্ছ প্রাণ দান করি পাইবে তারা দেব-জীবন। আবার আবার বহুদিন পরে মর্মর-মণ্ডিত কক্ষে স্বর্ণ বেদিকায় স্থাপিবে সে মাতৃ-মূর্তি রতন মন্দিরে। তখনি—তখনি উল্লাসে আবেশে মাতি . জননীরে চাহি বাঙ্গালী গাহিবে আবার "বন্দেমাতরম্"!

(প্রস্থান)

প্রথম দৃশ্য

স্থান—মেঘনা নদীর তীরে শ্মশান।

(সন্ন্যাসী, নিত্যানন্দ, গ্রাম্য বালকগণ)

(গীত)

বালকগণ।

মায়ের নামের ডঙ্কা দিয়ে.
চল রে শঙ্কা যাবে দূরে,
শুনিস রে কালের ভেরী,
আজ উঠছে বেজে আজব সুরে।
রেখে দে রে পুঁটলী বাঁধা,
আর তোদের কাগজে কাঁদা,
ধরে দে মা নামের সারি,
দীপক রাগে ভারত জুড়ে।
মা জগদম্বার কৌশলে,
যখন আগুন উঠছে জ্বলে,
দিয়ে দে আজ পূর্ণাহুতি,
খেয়ে নিক মা উদর পুরে।
মরণ সাগর করলে মথন,
তবেই নাকি মিলবে রতন,
তাই তো এত ডাকা ডাকি
করছি তোদের ঘুরে ঘুরে।

ক্ষেপেছে ক্ষেপা মাগী,
ভয় কি, মরবি বাঁচবার লাগি,
দেখুক আজ বিশ্ববাসী
ভারতবাসী নয় রে কুঁড়ে।

(প্রস্থান)

(সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

সন্ন্যাসী। এই তো শ্মশান, এই তো জীবের শেষ বিশ্রাম স্থান। রাজা হও, প্রজা হও, ধনী, নির্ধন হও, একদিন সকলকেই আসতে হবে এই মহা শ্মশানে। তাই মহাপুরুষেরা বলেন—শ্মশান শুধু শেষ বিশ্রাম স্থানই নয়, মহাযোগীর পূর্ণ যোগের স্থান। এই শ্মশান-বৈরাগ্য না হওয়া পর্যন্ত যোগীর কোন সাধনাই নাকি সিদ্ধ হতে পারে না; তাই আজ সব জায়গা ঘুরে এই মহা-শ্মশানে এসে দাঁড়িয়েছি। এখন যোগে বসবো, দেখি যোগে সিদ্ধিলাভ করতে পারি কিনা! কিন্তু স্থির হয়ে বসতে পারব কি? ভিতরে যে বাসনার আগুন এখনো দাউদাউ করে জ্বলছে। চোখ বুজে যখনই বসি, তখন চারিদিক থেকে কারা যেন চীৎকার করে বলে ওঠে—ওগো এখনো তোমার যোগে বসবার সময় হয় নি, কর্ম করতে হবে। তবে কি আমার কর্ম এখনো শেষ হয় নি? আমি কি তাঁর কৃপা লাভের যোগ্য হই নি? না—না, তিনি তো তাঁর চরণ ধূলায় আমায় বঞ্চিত করেন নি? তিনি যে তাঁর সবখানি দিয়ে আমায় ভালবেসেছেন, আমি যে তাঁরই হয়ে গেছি। তবে আমার এ কর্মের জন্য আদেশ কেন? ওঃ, বুঝেছি, বিরাট কর্মী তিনি—কর্মীই তিনি ভালবাসেন। আমাদের কর্মের ভিতর দিয়েই তাঁর কাছে গিয়ে পৌছাতে হবে; তাই—এই সাবধানতা। আচ্ছা, তাই হবে ঠাকুর! তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ইচ্ছা নেই, যত ইচ্ছা সবই তোমার পায়ে বলি দিয়ে বের হয়ে এসেছি। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক; তাতেই পূর্ণানন্দ। আমি কর্ম করবো, আমি কর্ম করবো—কিন্তু একা তো হবে না, কর্মী চাই। ডাকি—ডাকি—'হরিবোল', 'হরিবোল'। আজ এ মহা-শ্মশানে দাঁড়িয়ে হরিধ্বনি করছি, এ হরিধ্বনিতে রস নেই, শুকনো, মানবের ভীতির সঞ্চার

হয়। কিন্তু যার এই শ্মশানের হরিধ্বনি শুনে প্রাণে প্রেমের তুফান বয়ে যায়, সেই নাকি প্রকৃত প্রেমিক। আছ কি এমন প্রেমিক, যার এই হরিধ্বনি শুনে প্রাণে প্রেমের তুফান বয়ে যায়? এসো, তোমায় আমি চাই, আমার সবখানি প্রাণ দিয়ে আমি তোমায় ভালবাসবো!

(নিত্যানন্দের প্রবেশ)

(গীত)

আয় মা তারিণী করালবদিনী,
ডাকিনী যোগিনী সব নিয়ে আয়।
শ্মশানবাসিনী, শ্মশানরঙ্গিণী
ভারত-শ্মশানে নাচবি গো আয়।
শ্মশানের শোভা মুনি-মনোলোভা,
হবে কি শোভা, বেরোবে কি আভা,
তুই মা না এলে তুই না নাচিলে,
দুর্নীতি সব না দলিলে পায়।
ডাকিনী যোগিনী লইয়ে সঙ্গে
নাচ গো রঙ্গিণী নানা রঙ্গে ভঙ্গে;
ঘোর অমানিশি হাস অট্টহাসি,
এমন শ্মশান পাবি নে ধরায়।
এই নিশি দিনে এ মহা-শ্মশানে
পেলে ও চরণে পূজিতেম যতনে
হইয়ে মাতাল নাম-সুধা-পানে,
লুটিত মুকুন্দ চরণ-ধূলায়।

নিতাই। কে আপনি?

সন্ন্যাসী। দুনিয়ায় একলা থাকতে হয়, সেও ভাল, কিন্তু সুজন না পেলে আর পিরিত করছি না। চণ্ডীদাস বলতেন—

"শুন গো সজনী, আমার বাত্
পিরিতি করিবি সুজন সাথ্।"

ধাক্কা সামলাতে সামলাতে সারা যৌবনটা কাটিয়েছি, এ বয়সে আর নূতন আঘাত সহ্য হবে না।

নিতাই। আমি আপনায় কোন আঘাত দিতে আসি নি। আমি জানতে চাই আপনি কে? এই মহা-শ্মশানে দাঁড়িয়ে ভাবছেন কি?

সন্ন্যাসী। ভাবছি কি, তা শুনবে? তা বলতে পারি না। কিন্তু ভাবছি অনেক। তুমি কে? এখানে এসেছ কেন?

নিতাই। আমি মাঝে মাঝে শ্মশানে আসি, যতটা সময় এখানে থাকি, বেশ শান্তি পাই। প্রেমময়ের প্রেমেব হাওযা আমার প্রাণকে প্রেম-বসে ভবপুব কবে দিযে যায।

সন্ন্যাসী। পাঁচ শ' বছব পূর্বে এই বাংলায় শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমের ফিলসফি প্রচাব কবে গেছেন। আজও সে নিকষিত হেম, সে প্রেম মূর্ত হয়ে উঠল না, কেবল কথা—কেবল কথা। আমিও সে প্রেমের পথেব যাত্রী, কিন্তু সঙ্গী ব্যতীত একা সে পথে অগ্রসর হতে সাহস হচ্ছে না। তাই সঙ্গী খুঁজতে এই মহা-শ্মশানে এসেছি।

নিতাই। এ যে মহা-শ্মশান। এখানে কি তা পাবেন? লোকালয়ে যান—অনেক শিষ্য জুটবে।

সন্ন্যাসী। আমাব সংগী যদি পাই, তবে এই শ্মশানেই পাবো। শ্মশানে আসতে যে ভয পায, সে আমাব সাথী হতে পাববে না। তাই শ্মশানেই আমি আমাব বন্ধুব অন্বেষণ কবছি।

'চণ্ডীদাস-বাণী শুন বিনোদিনী,
পিবিতি না কহে কথা,
পিবিতি লাগিযা পবাণ ছাড়িলে
পিবিতি মিলযে তথা।"

ঘৃণা কবলেও যে আমায ভালবাসবে, সেই প্রেমই উত্তম। অর্থাৎ যে আমাব জন্য মবতে প্রস্তুত নয, তাব সাথে আমাব পিবিত হবাব সম্ভাবনা নেই।

নিতাই। তা হলে আপনি এমনই একজন খুঁজছেন, যে আপনাব জন্য মরতে প্রস্তুত!

সন্ন্যাসী। হ্যাঁ, আমি এমনই একজন খুঁজে বেড়াচ্ছি, এমন মানুষের একট মহামেলা বসাতে চাই।

"সাধ কখনো মিটে না ভাই,
সাধে পড়ুক বাজ।"

হবি, হরি—এ সাধে যেন আমার বাজ না পড়ে।

নিতাই। আপনি কি কাউকে ভালবেসেছেন? সে কি আপনার প্রাণে আগুন জ্বেলে দিয়ে গেছে?

সন্ন্যাসী। হ্যাঁ—তাই, আমার বুকভরা আগুন গো, বুকভরা আগুন। "ও দু'টি চরণ শীতল জানিয়া শরণ লইনু আমি" বলে একনিষ্ঠ হযে সেখানেই পড়ে ছিলাম। প্রেমের অগ্নি-পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হয়েছি।

নিতাই। আমারও তাই। আমার হৃদয়ের দেবতা, আমার প্রেমের ঠাকুর, প্রণয়ের ধন, বড় দযাময তিনি। আমি তাঁকে প্রাণ দিযে ভালবাসি। ছোট-মুখে বড় কথা বলতে নেই—আমার কথা এ পর্যন্তই থাক।

সন্ন্যাসী। কেন সাধ করে এ গরল খেতে চাও? কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে সিনান করে কি আর ঘরে ফিরতে পারবে?

নিতাই। ঘর আমাব পব হয়ে উঠেছে, তাই এই কালীব সাগবে ঝাঁপ দেব বলে আমার শ্মশানে আসা।

সন্ন্যাসী। প্রাণের ভিতর বিষেব জ্বালা। ভাব ভাষায ব্যক্ত করতে পাবি না, যাকে ভালবাসি, তাকে তৃপ্তি দিতে পাবি না। তুমি কি আমার শত ত্রুটি মার্জনা কবতে পারবে?

নিতাই। আপনি যদি আমায আপনার সহযাত্রী করেন, তবে আমি আপনাব শত ত্রুটি মার্জনা কবতে প্রস্তুত আছি।

সন্ন্যাসী। আমি তাকেই চাই, যে আমার শত ত্রুটি মার্জনা কববে। আমি যে অকিঞ্চন, আমি যে ভিখারী, দীন হীন কাঙ্গাল! তবু আমাব পিরিতের সাধ। পঙ্গুর গিরি-লঙ্ঘন, বামনেব চাঁদ ধরাব মত আমার ইচ্ছা, তা কি তুমি পূর্ণ করতে পাববে?

নিতাই। তা জানি না, তবে আপনি যা আদেশ করবেন, তা যদি আমাব বিবেক-বিরুদ্ধ না হয, তা হলে আমি আপনার আদেশ প্রতি-পালন করতে প্রাণ পর্যন্ত দিতে কুণ্ঠা বোধ করবো না।

সন্ন্যাসী। আনন্দম্! যদি এ পথে আসতে চাও, সুখের জন্য এসো না। কোন সাধ বুকে নিযে এক পা অগ্রসর হযো না,—ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে যেতে হবে। সর্বাগ্রে সমর্থ হও, প্রেমেব কুটিল পথে একমাত্র বীরাচারই অগ্রসর হতে সক্ষম।

নিতাই। আমি তা জানি। আজ বাঙ্গালায় যে ভাব নেমে এসেছে, সেই সুমধুর বংশীধ্বনি বাঙ্গালার গগন-পবন কম্পিত করে উদীয়মান

নূতন তন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ করে তুলছে, সে বেদ-বিধি ছাড়া, ভারতের প্রাচীন পুঁথির সাথে এ নবতন্ত্রের সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। সর্বত্যাগীর দল ভিন্ন এ অনাসৃষ্টি পিরিতের সাথে যোগ দেবে কে ?

সন্ন্যাসী। হ্যাঁ, তাই বটে।

"পিরিতের পারা বেদ-বিধি ছাড়া
বিধির ভিতরে নাই,
পিরিতি যাহার বিধি-অগোচব
ব্রজপুরে তার ঠাঁই।"

এই নব-বৃন্দাবনের এই নূতন ব্রজধামের গোপ-গোপী, ওগো, তোমরা যে যেখানেই আছ ছুটে এসো। তোমাদের মিলনক্ষেত্রই যে শ্রীবৃন্দাবন! তোমাদেব লীলা-ভূমি যে ব্রজভূমি! নিতাই, আমি চললুম—তোমার জন্যই আমাব শ্মশানে আসা। সময়ে দেখা হবে। কর্ম—কর্ম—কর্ম!

(প্রস্থান)

নিতাই। দাঁড়াও, যেও না। আমায ভাল কবে পিরিত বুঝতে দাও। একি, চলে গেলে? আচ্ছা, যাও। আমি যে তোমায়ই খুঁজছিলাম। শ্মশানেই মহাপুরুষেব দেখা পাওয়া যায; তাই তো আমি শ্মশান ভালবাসি। আজ দেখা দিযে চলে গেলে কেন? আচ্ছা, যাও মহাপুরুষ! সমযে যখন দেখা হবে বলেছ—তখন দেখা হবেই। এ আশাযই বুক বেঁধে চললুম। সাধনাই দীর্ঘ কালকে সংক্ষেপ করতে পারে; কিন্তু সে কাল তো দু'এক বছর নয়? যারা নূতন যুগের আহ্বান-সঙ্গীত গান করছেন, তারা যতদিন না আমাদেব জীবনকে নূতন তন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ কবে তুলছেন, ততদিন আমাদের কোন সুবিধাই আশাকে সার্থক করতে পারবে না। কারণ, যিনি যুগ-প্রবর্তক, তিনি অসাধারণ ধৈর্যশীল, তিনি নিজের অবস্থা দেখেই বুঝতে পেরেছেন, আমাদের উন্নতির যুগ আসতে বিলম্ব কত! তাই বলি, হে ভারতের নূতন সাধক, মনে রেখো, কতখানি ধৈর্য, কতখানি শক্তিলাভ করে এই যুগ-প্রবর্তকের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব! (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজেন্দ্র রায়ের বাগানবাড়ী।

(রাজেন্দ্র, নিত্যানন্দ, সেবকগণ)

নিতাই। রাজেন, রাজেন।

রাজেন। আসুন, আসুন, আসতে আজ্ঞা হয়।

নিতাই। বহুদিন তোমার সাথে দেখা নেই—ভাল আছ তো ?

রাজেন। আপনার আশীর্বাদে ভালই আছি। অসময়ে কি মনে করে ?

নিতাই। এবার তোমাদের শারদীয় উৎসবের বরাদ্দ কত ?

রাজেন। তা এখনো ঠিক হয়নি। তবে অন্যান্য বছরের মত এবার সমারোহ হবে না।

নিতাই। কিছু না হলেই বা ক্ষতি কি ? কতকগুলি টাকা উড়িয়ে দেওয়া বই তো উৎসব আর কিছুই হচ্ছে না ? এখন যদি টাকাই খরচ করতে হয়, তবে এমন কাজ করতে হবে, যেন তাতে দেশের কিছু কল্যাণ হয়।

রাজেন। আমার ইচ্ছাও তাই। বাজে খরচ করার সময় এখন আর নেই—প্রবৃত্তিও হয় না।

নিতাই। আরে, মায়ের পূজার প্রধান উপকরণই হচ্ছে ভক্তি। বৃথা আড়ম্বরে কি আর মায়ের পূজা হয় ? পরমহংসদেব বলতেন—ধ্যান্ করবে বনে কিংবা কোণে। রাজসিক পূজা করে তো এতদিন দেখা গেল, এখন মায়ের সাত্ত্বিক পূজা যাতে দেশময় হয়, সেজন্যই সকলকে উঠে-পড়ে লাগা প্রয়োজন। তাতে না হলে শক্তি জাগ্রত হবে না।

রাজেন। আমিও একথাটা অনেক দিন থেকে ভাবছি, কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারছি না।

নিতাই। আমার প্রাণে একটা ভাব এসেছে, তা তোমাকে বলবো বলেই আজ আমি এখানে এসেছি। ভারত-গঙ্গায় বান ডেকেছিল, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কর্মীদের গঠনকার্যের পাণ্ডুলিপি অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির ফাইলেই ঘুমুচ্ছে। এদিকে তো বান চলে গিয়ে নদীও

প্রায় শুকিয়ে উঠলো। তাই আমার ইচ্ছা—সেই পাণ্ডুলিপির দিকে না তাকিয়ে আমরা দু'জনে গঠনকার্যে নেমে যাই।

রাজেন। গঠনকার্য সম্বন্ধে আপনি কি মনে করেন?

নিতাই। আমার তো মনে হয়, পল্লী-সংস্কার করাই গঠনকার্যের মস্ত বড় দিক। কারণ পল্লীর সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন সার্থক হতে পারে না।

রাজেন। আমারও মনে হয় তাই; পল্লী-সংস্কার করাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

নিতাই। তোমার চিন্তা-প্রণালী আর আমার চিন্তা-প্রণালী বেশ মিলে যাচ্ছে। এসো না আমরা দু'জনেই কাজ আরম্ভ করে দিই।

রাজেন। আমার কোনই আপত্তি নেই। আপনার আদেশ আমি বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করতে প্রস্তুত আছি।

নিতাই। একখানা পল্লী নিয়েই আমাদের কাজ আরম্ভ করতে হবে। ঐ একখানা যদি গড়ে তুলতে পারি, তবে ঐ পল্লীর আদর্শেই ভারতের সকল পল্লী গড়ে উঠবে।

রাজেন। কোন্ পল্লীতে আরম্ভ করলে কাজ ভাল হবে মনে করেন?

নিতাই। তোমাদের বানিয়াজোয়ার পল্লীখানাই কার্যের উপযুক্ত স্থান বলে আমার মনে হয়। সে পল্লীতে ৩৩ হাজার লোকের বাস, তার মধ্যে ২০ হাজারই মুসলমান। বাংলায় এত বড় পল্লী আর নেই। আমি সে পল্লী ঘুরে যা বুঝতে পেরেছি, তাতে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিরই স্বদেশের উন্নতির জন্য যত্ন আছে।

রাজেন। সে পল্লীতে বর্তমানে আপনি কি কাজ আরম্ভ করতে চান?

নিতাই। সকলে যার যার নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে—এই দেখাতে চাই। স্বাবলম্বী হওয়াই বর্তমান যুগের সাধনা বলে আমি মনে করি।

রাজেন। তাতে আর সন্দেহ কি? তবে তারা সকলে আপনার উপদেশ মত কাজ করবে কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

নিতাই। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। বান যখন আসে, তখন শুধু নদীই জলে ভরপুর হয় না—নালা, খাল সবই ভরপুর করে দিয়ে যায়। বানের মুখে আমি আমার কর্মতরী ধরে দিতে চাই, কূল পাব কিনা, তা ঠাকুর জানেন। সে ভাবনা করেও কোন লাভ নেই।

রাজেন। আমায় কি আদেশ হয় বলুন; আপনার আদেশ যথাসাধ্য প্রতিপালন করতে আমি চেষ্টা করব।

নিতাই। আমি পল্লী-সেবক সঙ্ঘ তৈরী করে তাদের নিয়ে কিছু কিছু কাজ আরম্ভ করেছি। বোধ হয় তাদের সঙ্গে তোমার দেখা হয় নি। ছেলেগুলি খুব খাটছে।

রাজেন। এতদিন তো আপনি আমায় একথা বলেন নি।

নিতাই। বলবার সময় হয়ে ওঠে নি, তাই আজ বলতে এসেছি। তোমায় বাদ দিয়ে কি আর আমি কিছু করতে পারি রাজেন! তুমিই যে আমার কর্মের মস্ত বড় সহায়। বানিয়াজোয়ারই তোমাদের জমিদারীর ভিতর শ্রেষ্ঠ স্থান। শুধু ঐ একখানা পল্লীতে তোমাদের বার্ষিক ৭৫ হাজার টাকা আয় হয়। গত দু'বছর অজন্মায় প্রজারা কেউ খাজনা দিতে পারে নি, দেওয়ান চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ লিখে খত নিয়েছে। যদি পার, তবে ঐ খাজনাগুলি মাপ দিয়ে দলিল-গুলি তাদের ফিরিয়ে দাও। কাজ করতে হলে সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করাই হচ্ছে কর্মীর সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য।

রাজেন। কথাটা ভাববার বিষয় বটে। তবে বাবার সাথে কথা না বলে আমি আপনাকে কোন জবাব দিতে পারি না।

নিতাই। তোমার বাবাকে যদি তুমি বুঝিয়ে বল, তবেই কাজ হয়ে যাবে। তাঁর প্রাণ আমাদের চেয়ে উন্নত। কারণ, তিনি আজীবন পল্লী-সেবা করেই আসছেন।

রাজেন। বাবাকে বললে তিনি আমার কথা রক্ষা করবেন এ বিশ্বাস আমারও আছে। আচ্ছা, আপনি এখন যান, আমি বাবার সাথে কথা বলে আপনাকে জানাব।

নিতাই। আমিও তাঁকে বলবো, আশা করি হয়ে যাবে।

রাজেন। বানিয়াজোয়ারে নাকি ম্যালেরিয়া আরম্ভ হয়ে গেছে?

নিতাই। তার প্রতিকারের জন্যই আমি পল্লী-সেবক তৈরী করেছি। কিছু কাজও আরম্ভ করেছি।

রাজেন। একটা ঔষধালয় বসাতে পারলে ভাল হয়।

নিতাই। ওকথা মুখেই এনো না। ঔষধ খেয়ে খেয়েই জাতটা মরতে বসেছে। কুইন্যাইন দিয়ে ম্যালেরিয়া দূর করার চেষ্টা হচ্ছে; কিন্তু এই কুইনাইনে যে ম্যালেরিয়া কালাজ্বর দেশে এসেছে, এ সহজ কথাটা জন-সমাজ একটু তলিয়ে দেখছেন না। আমি তাকে অন্য উপায়ে তাড়াব।

রাজেন। ও কারা গান গাইছে না ?

নিতাই। বোধ হয় পল্লী-সেবকগণই আসছে।

(পল্লী-সেবকদের প্রবেশ)

(গীত)

তোরা সবে কোদাল ধর।
দেশ থেকে তাড়াতে হবে ম্যালেরিয়া জ্বর।
মাথা গুঁজে ভাবলে বসে
হবে না দেশের কল্যাণ,
কোমর বেঁধে হতে হবে
সবায় আগুয়ান,
ভয় কি রে ভাই একজন আছেন,
মাথার উপর।
ঝড়ের মতন আয় রে মেতে
সাগর করে প্রাণ।
দ্বেষ-হিংসা দল রে পায়ে
মান অপমান ;
দেখবি যদি মায়ের হাসি
প্রেমের সবোবব।

নিতাই। কি রে, তোরা কোথায় যাচ্ছিস ?

১ম সেবক। বানিয়াজোয়ারের জঙ্গলগুলি সব পবিষ্কার করে দিতে হবে। সে পল্লীতে ম্যালেরিয়া আরম্ভ হয়ে গেছে !

রাজেন। তোমরা কি সকলেই এ মহাব্রতে দীক্ষিত হয়েছ ?

২য় সেবক। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরা পাচটি গ্রাম নিয়ে একটি কর্মীসঙ্ঘ গঠন করেছি। আমাদের উদ্দেশ্য পল্লী-সংস্কার করা, দেশের জঙ্গল-কচুরী নষ্ট করে দেওয়া, নালা-খাল সব ভরে দেওয়া, যেন মশা জন্মাতে না পারে।

নিতাই। আচ্ছা রাজেন ! আমি, এখন যাই, তুমি সেবকদের সাথে আলোচনা কর। (প্রস্থান)

রাজেন। তোমাদের সঙ্ঘের সভ্য কত হবে ?

১ম সেবক। বর্তমানে আমরা প্রায় ৫০ জন হব।

রাজেন। তোমাদের সঙ্ঘের চালক কি নিতাইবাবু ?

২য় সেবক। আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনিই আমাদের দিয়ে কাজ করাচ্ছেন। আমরা ভাগ্যবান যে, এমন দেবতার মত মানুষ আমরা আমাদের চালক পেয়েছি।

রাজেন। তোমাদের খরচপত্র কি সব তিনিই চালাচ্ছেন ?

১ম সেবক। তিনি কিছু কিছু সাহায্য করেন বটে, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকেরই খামার-জমি আছে। দু'টি ডাল-ভাতের জন্য কারোরই তেমন ভাবতে হয় না। তবে ছোট একটি ফাণ্ড তৈরী করা হয়েছে, যার অত্যন্ত অভাব তাকে ঐ ফাণ্ড হতে কিছু কিছু সাহায্য করা হয়।

রাজেন। ম্যালেরিয়া দূর করার জন্য তোমরা বদ্ধপরিকর হয়েছ, এ উত্তম কথা। কিন্তু তা কি তোমরা পারবে ? কত ডাক্তার ফেল হয়ে গেল।

২য় সেবক। ও ডাক্তারের কর্ম নয়, আমরাই পারবো। আমরা কি মানুষ নই ? এ দেশে পূর্বে তো এ সব ব্যাধি ছিল না, আমাদের অলসতার জন্যই এ সব ব্যাধি আজ পল্লী আক্রমণ করেছে। আমরা যখন আবার গা' ঝাড়া দিয়ে উঠে-পড়ে কাজে লেগেছি, তখন ওর বাবার সাধ্যি নেই যে, ও পল্লীতে থাকতে পারে।

রাজেন। অতি সত্যি কথা। তোমরা যখন আবার কর্মী সেজে কাজে লেগেছ, তখন আর ভয় নেই, দেশে শান্তি আবার ফিরে আসবেই। কিন্তু ভাই সকল, এ অদম্য উৎসাহ যেন ভেঙ্গে না যায়। কাজে পরিশ্রান্ত হয়ে যেন কর্ম ত্যাগ কর না। তবেই তোমরা কর্মের বিজয়-দুন্দুভি বাজাতে সক্ষম হবে। আমিও তোমাদেরই একজন, তোমাদের যখন যা প্রয়োজন, আমায় জানিও—আমার প্রাণ দিয়েও যদি তোমাদের সেবা করতে পারি, তাতেও পশ্চাৎপদ হবো না।

১ম সেবক। আমাদের নেতার কাছে আপনার কথা শুনেছি। তিনিই আপনাদের কথা বলে আমাদের অনেক সময়ে উৎসাহিত করেন।

রাজেন। তিনি শুধু তোমাদেরই চালক নন, আমারও নমস্য। অমন মানুষ, অমন অদম্য উৎসাহী কর্মবীর দেশে ক'জন আছেন জানি না। কিছু দিন পর এঁর কর্ম এই ভারতময় ছড়িয়ে পড়বে বলে আমার মনে হয়। পল্লী-সংস্কার করতে হলে তোমরা তাঁরই উপদেশ মত

চলবে। দাও, আমায়ও তোমাদের কোদাল দাও, আজ হতে আমিও তোমাদেরই একজন।

২য় সেবক। (কোদাল দিয়ে) এই নিন কোদাল। আপনাকে যখন পেয়েছি, তখন আমাদের সিদ্ধি নিশ্চয়। বল ভাই,—কালী মাঈকী জয়!"

(সেবকদের গীত)

কাঁপায়ে মেদিনী কর জয়ধ্বনি,
জাগিয়া উঠুক মৃত প্রাণ।
জীবন রণে জীবন দানে
সবারে করহ আগুয়ান॥
হাতে হাতে ধরি ধরি দাঁড়াইব সারি সারি,
প্রাণে বাঁধিবে তবে প্রাণ।
আলস্য জড়তা নিরাশ বারতা
দূরে করিবে প্রয়াণ॥
তরুণ তপনে মধুর কিরণে,
সদা কি হাসিবে প্রাণ।
সুখের কোলে ভাবেতে গলে
কে রবে কে রবে শয়ান॥
সাধিতে দেশের কাজ পর রে বীরের সাজ
করে লয়ে করম-নিশান।
জীবন ব্রত সাধ অবিরত
এ নহে বিরামের স্থান॥

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজেন্দ্রপুর জমিদার-বাড়ী।

(শরৎ রায়, অমলা, নিত্যানন্দ, রাজেন)

শরৎ। এবার দাদার তরফে থিয়েটার হবে। আমাদের কর্মচারীরাও থিয়েটারের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তোমাদের কি মত?

অমলা। আমার বিশেষ মত নেই। তার পরে, এ গাঁয়ে থিয়েটার করতে পারে এমন গাইয়ে-বাজিয়েও কেউ নেই।

শরৎ। ও-বাড়িতে কলকাতা থেকে মাইনে করা লোক এনেছে, আমাদেরও তেমনি করে লোক এনেই করতে হবে। তারপরে ও-বাড়িতে হবে, আমাদের বাড়ীতে হবে না, এ-ই বা কেমন দেখায়?

অমলা। কেমন আবার দেখাবে কি? ও-বাড়ি তো আর পরের বাড়ী নয়? তোমারই ভায়ের বাড়ী। হাঁড়ি পৃথক হয়েছে বলে কি তার সাথে ছোটখাট ব্যাপার নিয়েও জেদাজেদি করতে হবে? তুমি তো এমন ছিলে না, আজ তোমার এ জেদ কেন?

শরৎ। তুমি জেদের কি দেখলে? তারা থিয়েটার করবে, আমাদের বাড়ীতেও এরা থিয়েটার করবে।

অমলা। কলকাতা থেকে যখন লোক আনার ব্যবস্থা হচ্ছে, তখন এ জেদ বই আর কিছুই নয়। তার পরে, এর ভবিষ্যৎ ভাল হবে বলেও আমার মনে হয় না।

(নিত্যানন্দের প্রবেশ)

নিতাই। আমারও ঐ মত। থিয়েটারের ভবিষ্যৎ যে খুবই দুঃখময় হবে, তা আমি খুবই জোর করে বলতে পারি। এই থিয়েটারের প্রথম ফল হবে দু'বাড়ীতে দলাদলি, পরে হবে মামলা-মোকদ্দমা, পরিণামে উভয় সংসার পথে দাঁড়াবেন।

অমলা। আপনি এসে ভালই হয়েছে। একটু ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে যান, আমি হার মেনেছি।

শরৎ। এ নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা হবে কেন নিতাই?

নিতাই। এর পরিণামই তাই। ছোটখাট ব্যাপার নিয়েই মনোমালিন্য আরম্ভ হয়, পরে সে অনেক দূর গড়ায়। বড় ব্যাপার নিয়ে কোন সংসারেই প্রথম গোল বাধে না। এই থিয়েটারে গোল হবেই, এর পরিণাম তাই।

শরৎ। ও ছেলেপুলেরা করবে, তাতে আমাদের ভিতরে দলাদলি বা গোল হবার কি কারণ আছে?

নিতাই। ছেলেপুলেদের ভিতরেই আগে হবে, তারপরে উভয় পক্ষ উভয় পক্ষ থেকে ইন্ধন যোগাবেন।

শরৎ। আমাদের বাড়ীর ছেলেপুলেরা তেমন নয়, এরা সকলেই সরল।

অমলা। তুমিও তো সরল ছিলে, আজ এমন হলে কেন?

শরৎ। কি ছিলেম, আর কি হলেম!

অমলা। আমি তোমার সাথে তর্ক করতে চাই না। কিছু সময় পরে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে, কি করতে যাচ্ছ!

নিতাই। কলকাতা থেকে লোক এনে যখন থিয়েটার করার আয়োজন হচ্ছে, তখন সরলে গরল ঢুকতে বেশী সময় লাগবে না। কারণ, যাদের মাইনে করে আনা হচ্ছে, তাদের সকলকেই আমি চিনি। তারা সকলেই চরিত্রহীন, মদ আর বেশ্যা, এ দু'টিই হচ্ছে তাদের চিরসঙ্গী। তাই বলছি, যত্ন করে অলক্ষ্মী সংসারে ঢুকিয়ে কাজ নেই।

অমলা। ইনি যা বলছেন, তা বর্ণে বর্ণে সত্য, তুমি ছেলেদের থিয়েটার করার জন্য উৎসাহিত করো না, পরিণাম বিষময় হবে। একান্তই যদি থিয়েটার করতে চায়, তবে নিজেরা করুক, কলকাতা থেকে লোক এনে কাজ নেই।

শরৎ। ও-বাড়ীতে তারা লোক এনেছে, এরা না আনলে তাদের সাথে পেরে উঠবে কেন?

অমলা। জেদ নাকি হয়নি। তোমার প্রাণের ভাব যে তুমিই প্রকাশ করে ফেলেছ! এ জেদের কথা বই আর কিছুই নয়।

শরৎ। জেদের তুমি কি দেখলে?

অমলা। জেদ নয় তো কি? এ তো আর পয়সা নিয়ে থিয়েটার হবে না, যে লোক না শুনলেই লোকসান হবার সম্ভাবনা। না-ই বা হলো তাদের মতন, তাতে ক্ষতি কি? এই গোড়ামিতেই কিন্তু সর্বনাশ হয়। শ্রীপুরের জমিদার-বাড়ী এই থিয়েটারেই ধ্বংস হয়ে গেছে। এত বড় ঘর, কিন্তু আজ তাঁরা পথে দাঁড়িয়ে।

(রাজেনের প্রবেশ)

শরৎ। কিরে খোকা! থিয়েটার করতে যে ইনি নিষেধ করছেন, এর পরিণাম নাকি ভাল হবে না। নিত্যানন্দও তাই বলছে।

রাজেন। ইনি যা বলেন, আমাদের তাই করতে হবে। আমারও থিয়েটার করার ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু হিসাব করে দেখলাম, এতে কমপক্ষে পাঁচ হাজার টাকা খরচ হবে। দেশের এই দুর্দিনের সময়ে এতগুলি টাকা বাজে খরচ করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নয়। টাকার এখন দেশে যথেষ্ট প্রয়োজন, কারণ অর্থাভাবে সব কাজই পণ্ড হতে চলেছে।

শরৎ। পূজোয় বরাবর যে খরচ আমাদের হয়ে আসছে, এবারও তাই হবে। তার ভিতরে যদি ওরা থিয়েটার করতে পারে, তা করুক না, তাতে ক্ষতি কি? গ্রামের লোকও একটু আনন্দ পাবে।

রাজেন। সে খরচ আমি এবার অন্যভাবে করতে চাই। আমরা জমিদার, প্রজা পালন করাই আমাদের একমাত্র ধর্ম। এই যুগই হচ্ছে সেবার যুগ। তাদের সেবা করাই হচ্ছে আমাদের প্রকৃত দেবার্চনা। কিন্তু, তা না করে আমরা এতদিন পূজা-পূজা করে কেবল একটা বৃথা আড়ম্বর করেছি মাত্র। তাই, আমি এবার ভগবানের সত্যিকার পূজা করবো মনে করেছি। আমাদের দেবতারা সব উপোস করছেন, তাঁদের ভোগের যোগাড় করতে হবে। সে দেবতাদের পূজা না করলে কোন দেবতাই পূজা গ্রহণ করতে পারেন না।

শরৎ। তুই আবার কোন্ দেবতাদের কথা বলছিস?

নিতাই। রাজেন যে দেবতাদের কথা বলছে, তারাই আপনার প্রকৃত দেবতা। আর তাদের পূজা করাই শ্রীভগবানের সত্যিকার পূজা। তারা আপনার অন্নহীন, বস্ত্রহীন, দীন হীন প্রজা, আজ তাদের পূজার জন্য সর্বস্বান্ত হতে হবে। এ সর্বস্বান্তের পরিণাম ধ্বংস নয়, অক্ষয় অমর আদর্শ জগতের সামনে দাঁড় করান, আমাদের দেশের রাজা-জমিদারদের মোহ-ঘুম চিরদিনের জন্য ভেঙ্গে দেওয়া—মনে রাখবেন।

(গীত)

আপন নিয়ে থাকলে পরে
আপন কভু তো চিনবে না;
আপন-হারা বেহুঁস বিনে
মরম কেউ তো বুঝবে না।
যে জন আপন নিয়ে আছে বসে
থাক না সে তাকিয়া ঠেসে,
হউক না নাম তার দেশ-বিদেশে
ফক্কা বিনে মিলবে না।
যে জন আপন ছেড়ে বেরিয়ে গেছে,
দুনিয়ার পায় প্রাণ ঢেলেছে;
আত্ম-নির্ঝর কোথায় আছে
পেয়েছে রে তার নিশানা।

শরৎ। আমার জমিদারীর ভিতরে নিরন্ন প্রজা আছে, এ তো আমায় কেউ কখনো বলেনি! তা হলে কি প্রতি বৎসর দেশভ্রমণে আমি হাজার হাজার টাকা লুটিয়ে দিতুম? তুমি আমার চোখ খুলে দিলে। বল, বল নিতাই, আমার কোন্ স্থানের প্রজারা অন্নাভাবে মারা যাচ্ছে, আমি তাদের সেবার জন্য আমার কোষাগারের দ্বার উন্মুক্ত করে দিচ্ছি।

নিতাই। আপনার বানিয়াজোয়াব পরগণার প্রজারা আজ অন্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে ধ্বংসের পথে চলেছে, তাদের রক্ষা করুন, তাদের বাঁচান!

শরৎ। আমার বানিয়াজোয়ার আজ ধ্বংসেব পথে, যার খেয়ে আমি মানুষ? কৈ, এ কথা তো দেওয়ান আমায় কখনো বলে নি—একমাত্র শুনেছি তারা গত দু'বৎসর অজন্মার জন্য খাজনা দিতে না পেরে টাকার জন্য তমশুক দিয়েছে।

রঞ্জেন। হ্যাঁ, দিয়েছে বটে, কিন্তু তাতে কর্মচারিগণ কারিগরি করে চক্রবৃদ্ধির হারে সুদ লিখে নিয়েছে! যদি জমিদারী রক্ষা করতে চান, তবে প্রজাদের সুখ-দুঃখের সাথী হউন, তা না হলে এ জমিদারী থাকবে না, থাকতে পারে না।

শরৎ। বটে! কর্মচারীরা এমনি অত্যাচারী হয়েছে? আচ্ছা, দেখা যাবে! নিতাই, আমি আজই আমার প্রজা-মহাল দেখতে যাব; আর এবার পূজার আয়োজন আমি নিজেই করবো। মায়ের অজস্র সন্তান অনাহারে থাকবে, আর আমি মায়ের পূজার নাম করে বৃথা আড়ম্বরে হাজার হাজার টাকা লুটিয়ে দেবো, তা হবে না। এবার দরিদ্র-নারায়ণের পূজাই মায়ের পূজার বিশেষত্ব থাকবে। তোমরা সর্বত্র এ কথা প্রচার করে দাও, যার যা অভাব, তা যেন তারা আমায় নির্ভয়ে জানায়, আমি আমার প্রজার অভাব পূরণের জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছি।

নিতাই। আনন্দম্! এই তো চাই। প্রজা মরবে ভাতে, আর জমিদার কলকাতা গিয়ে হাজার হাজার টাকা লুটিয়ে দেবেন তাঁর বিলাস-বাসনা চরিতার্থের জন্য! প্রজার প্রয়োজন হলেও সে মনিবের দেখা পাবে না, তার প্রাণের বেদনা জানাবার জায়গা নেই, এ অবস্থায় জমিদারী বেশীদিন স্থায়ী হতে পারে কি?

রাজেন। নিশ্চয়ই নয়। বর্তমানে বাঙ্গালার জমিদারের অবস্থা যতটা অবগত হয়েছি, তাতে কারোই আভ্যন্তরিক অবস্থা তত ভাল নয়। প্রায় সকলেই দেনাদার হয়ে পড়েছেন। তার কারণ, প্রজার সাথে কারোরই সম্বন্ধ নেই, পরের হাতেই তাঁরা সকলে খেয়ে থাকেন। প্রজাই হচ্ছে তাদের লক্ষ্মী, তাদের সেবায় আত্মসমর্পণ না করলে লক্ষ্মী ঘরে অচলা হতে পারেন না।

শরৎ। অতি সত্য কথা। নিত্যানন্দ, যাও, প্রচার কর, আমি তাদের একজন হয়ে আজ তাদের সাথে গলাগলি হতে চলেছি; আর তাদের সেবার জন্য আজ তাদের চরণে আত্মসমর্পণ করবো! নিতাই, তুমি যাবার আয়োজন্ করগে, আমি প্রস্তুত হয়ে আসছি। রাজেন, তুমিও যাও, দেওয়ানকে বলো, যেন আমার কোষাগারের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। আমার প্রজা অনাহারে মরবে, এ দেখার চেয়ে আমার মৃত্যু শতগুণে মঙ্গল। (প্রস্থান)

(গীত)

নিতাই। বিশ্বপতির বিশ্ববীণায় পঞ্চমে ধরেছে তান।
তা নইলে কি এমনি করে পাগল হতো সবার প্রাণ॥
ধনী মানী মেথর কুলি
বৃদ্ধ যুবা বালকগুলি,
তাই তো সবে আপন-হাবা,
হিন্দু পার্শী মুসলমান॥
অজানা দেশের টানে
কারো মানা কেউ না মানে,
কালের স্রোতে ভাসিয়ে তরী
সবাই তরী বায় উজান॥
এই তো রে ভাই কালের গতি,
আজ পতন কাল উন্নতি,
উঠলে পরেই নামতে হবে,
প্রেমময়ের এই বিধান॥

(প্রস্থান)

অমলা। রাজেন, তুইও কর্তার সাথে যা; তা না হলে কখন কি করে বসবেন, প্রজার কষ্ট সইতেই পারেন না।

রাজেন। আমি বাবার সাথে নিশ্চয়ই যাবো। শুধু উনি নন, কোন জমিদারই তাঁর প্রজার কষ্ট সইতে পারেন না। প্রজা সন্তান বই তো নয়! তবে যাদের আপন প্রজা সম্বন্ধে উদাসীন দেখতে পাই, তাঁদের কানে প্রজার অবস্থা ঠিক ঠিক ভাবে পৌঁছায় না। মূল হচ্ছে—এদেশে এখন কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারী পাওয়া দুর্লভ হয়ে উঠেছে। জমিদার একটা ভুল করছেন, সেই ভুল তাঁকে বুঝিয়ে দেয় এইটুকু সৎ-সাহসও আজকাল অনেক কর্মচারীতে দেখা যায় না। বাঙ্গালী তার জাতির বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে।

অমলা। হ্যাঁরে, তাই যদি না হবে, তবে সোনার দেশে আজ এমনভাবে হাহাকার উঠবে কেন?

রাজেন। মা, তুমি আর বিলম্ব করো না, বাবার কাপড়-জামা সব গুছিয়ে রাখো গে। এবার মায়ের পূজার আনন্দের তুফান বইবে—এইটি জেনে রাখতে পারো। এবার মায়ের মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত থাকবে, এবার সকলেই মায়ের পূজার অধিকার পাবেন। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—শিবরাম পণ্ডিতের বাড়ী।

(শিবরাম, নিত্যকালী, নিত্যানন্দ, সেবক)

শিবরাম। ছেলেটার আজ ক'দিন জ্বর। আজ পথ্য কি দেবে? সকলে কবিরাজ ডাকতে বলছেন—জ্বরটা নাকি ভাল নয়।

নিত্যকালী। কবিরাজ ডাকার মতন অবস্থা এখনো হয় নি, যখন হবে, আমি তোমায় জানাব।

শিবরাম। নিধি মামা বলে গেলেন, খোকার জন্য ডাক্তার ডাকো। তুমি বলছ এখনো সময় হয় নি!

নিত্যকালী। আমি যা বলছি, তাই ঠিক। জ্বর হলেই ঔষধ দিতে নেই। জ্বর আপনা থেকেই আসে, আপনা থেকেই ছেড়ে যায়। যতটা সময় নিয়ে আসে, ততটা সময় সে থাকবেই। ডাক্তার বেটে খাওয়ালেও জ্বর ছাড়ানো যায় না।

শিবরাম। তা হলে ডাক্তার ডাকতে নিষেধ করছ?

নিত্যকালী। বর্তমানে কোনই প্রয়োজন নেই, বোধ হয় প্রয়োজন হবেও না। কারণ, আমি তাকে ঔষধ দিয়েছি।

শিবরাম। সে কি? তুমি কি ঔষধ জানো?

নিত্যকালী। হ্যাঁ, বাবা-মা'র কাছে শিখেছি। আমাদের অসুখ হলে তিনি ডাক্তার কখনো ডাকেন নি। জঙ্গল থেকে গাছ পাতা এনে আমাদের খাওয়ায়ে দিতেন—আমরা ভাল হয়ে যেতাম।

শিবরাম। পূর্বে আমাদের দেশে এই সব ছিল। গৃহিণী মাত্র সকলেই মুষ্টিযোগ জানতেন। সে সব এখন দেশ থেকে নির্বাসিত হয়েছে। তাই, এখন কথায় কথাযই ডাক্তার ডাকতে হয়।

নিত্যকালী। এত ডাক্তার-কবিরাজের সৃষ্টিও সেইজন্যই হয়েছে। আর এরা কি নিষ্ঠুর। সেদিন হরি গোয়ালার ছেলেটি মারা গেল, বাড়ীশুদ্ধ কান্নাকাটি, ডাক্তার তার ভিজিটের টাকার জন্য ঝগড়া বাধিয়ে দিলেন।

শিবরাম। তাই যদি না হবে, তবে এই সোনার দেশে আজ হাহাকার উঠবে কেন? আমরা আমাদের জাতির বৈশিষ্ট্য নষ্ট করে ফেলেছি।

নিত্যকালী। তুমি ছেলের জন্য ভেব না, আমি তাকে যে ঔষধ দিযেছি, তাতে সে ভাল হযে যাবে।

শিবরাম। কি ঔষধ দিলে?

নিত্যকালী। জ্বর আসা মাত্রই আমি তাকে তুলসীপাতার রস সৈন্ধব লবণ দিযে খাওযায়ে দিযেছি।

শিবরাম। এতে কি হবে?

নিত্যকালী। তুলসীপাতার রস খাওয়ালে জ্বর আর মন্দের দিকে যেতে পারে না। ম্যালেরিযায় তুলসীপাতার রস ব্রহ্মাস্ত্র। যে বাড়ীতে তুলসীগাছ থাকে সে বাড়ীতে ম্যালেরিয়া প্রবেশ করতেই পারে না। তুলসীগাছের এতই শক্তি।

শিবরাম। তুমি দেখছি অনেক খবর রাখো।

নিত্যকালী। রাখবো না কেন? পূর্বে এদেশের মেয়েরা সকলেই মুষ্টিযোগ জানতেন। ঐটি শেখা গৃহিণীদের প্রধান কর্তব্য ছিল। কিন্তু এখন গৃহিণীরা কেবল হারমনিয়ম বাজান, আর কবিতা পাঠ করেন। গৃহিণী হতে হলে কি প্রয়োজন, তার দিকে কারোরই নজর নেই। গৃহিণীরা যদি এই মুষ্টিযোগটি শিখতেন, তবে এত

ডাক্তার-কবিরাজও দেশে হতো না। প্রতি বৎসর ব্যাধিতে আশি-লক্ষ লোকও ভারতবর্ষে মারা যেত না।

শিবরাম। যা বলেছ তা ঠিক, আজকাল মেয়েদের বিদ্যালয়ে এ সকল শেখাবার কোন ব্যবস্থাও দেখতে পাচ্ছি না। যা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তাতে মাতৃশক্তি জাগবে তো না-ই, বরং মরে যাবে।

নিত্যকালী। আমারও তাই মনে হয়। যতদিন তোমরা দেশের বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে গৃহিণী তৈরী করবার উপযোগী করে না তুলবে ততদিন তোমাদের জাতির কল্যাণ নেই।

শিবরাম। তুমি মাঝে মাঝে আমায় একথা বল বটে, কিন্তু কি করা যায়? যাদের কথা দশজনে শোনে, তারা যদি এ কার্যে ব্রতী হন, তবে দেশের মেয়ে-বিদ্যালয়গুলি সংস্কার হতে পারে। আমাদের রামা-শ্যামার কথা শোনে কে?

(নিত্যানন্দের প্রবেশ)

নিতাই। ঠিক বলেছ, পণ্ডিতজী! বল্‌নেওয়ালা চাই। শুধু বল্‌নেওয়ালায়ও আজকাল কিছু করে উঠতে পারবে না। বল্‌নেওয়ালাকে করনেওয়ালা হওয়া চাই। ঐ মেয়ে-বিদ্যালয় যাতে সংস্কার করা যায়, সেদিকেই এখন সকলকে উঠে পড়ে লাগতে হবে। কারণ, মা তৈরী না হওয়া পর্যন্ত যোগ্য ছেলে পাবার আশা করাই বাতুলতা। তাই ছেলেদের দিকে না তাকিয়ে মেয়েদের দিকে তাকানই আগে প্রয়োজন। কারণ, বিদেশী যে এখন আমাদের অন্দরমহল পর্যন্ত ঢুকে পড়েছে!

শিবরাম। তুমিই কেন বল না? বল্‌নেওয়ালা তো তুমিও একজন কম নও? আমরা নূতন যা কিছু শুনি, সে তো তোমারই কাছে!

নিতাই। শুধু বললেই কি হবে দাদা? পূর্বেই বললুম, করনেওয়ালা হওয়া চাই। তাই তো হতে পারিনি, তাই চুপ করেই থাকতে হয়। তবে স্বভাবটার দোষ হয়ে গেছে, নিজের দিকে না তাকিয়েও অনেক সময়ে অনেক কথা বলে ফেলি।

শিবরাম। তাতে কি কোন কাজ হচ্ছে না মনে কর?

নিতাই। কিছু হচ্ছে না, এ মনে হয় না। বর্তমানে না হলেও কোনদিন হবে—এ বিশ্বাস আমার আছে। কেউ না শুনলেও কথাগুলি বাতাসের গায়ে থেকে যাবে, একদিন কাজে আসবেই আসবে।

জগতে ব্যর্থ কিছুই হয় না। ঐ ভরসায়ই তো মাঝে মাঝে আমাদের মায়েদের বলি।

(গীত)

মায়ের ডাকে সব জেগেছে,
যে যার কাজে লেগে গেছে,
তোমরাই মায়ের জাতি,
বসে থাকবে কি নীরবে।
শক্তি-স্বরূপিণী যাঁরা,
এ দুর্দিনে কেন তাঁরা,
ভোগে বিলাসে মজে
মৃতপ্রায় পড়ে রবে॥
জাগাও সকলে আজি,
নিদ্রিতা শকতি,
তোমাদেরি হাতে মাগো,
ভারতের মুকতি।
শিখাও সন্তানগণে মাতৃ-ভকতি,
করম-মন্ত্রে দীক্ষিত কর সবে॥
বীরসাজে সাজিয়ে দে সন্তানগণে,
অবহেলে যেন তার জয়ী হয় রণে।
অর্ঘ্য দিতে হবে, মাতৃ-চরণে
বিস্মিত করি ধরা বম্ বম্ হর রবে॥

শিবরাম। এ তো চমৎকার! এ তুমি গাঁয়ে গাঁয়ে প্রচার কর, তোমার সাধনা ব্যর্থ হবে না।

নিতাই। ব্যর্থ হবে না এ বিশ্বাস আমারও আছে। ঠাকুরের সৃষ্ট জীব প্রত্যেকেই কোন না কোন প্রয়োজন সাধনের জন্য জগতে এসেছে। কেউ ব্যর্থ হয় না। দেখছ না বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহের কথা বলে বাংলায় তখন কেমন হাস্যাস্পদ হয়েছিলেন? কিন্তু আজ বহু বৎসর পরে তাঁরই কথার প্রতিধ্বনি পাঞ্জাবে মূর্তিমান হয়ে উঠেছে। তাঁরা শতকরা ৪০টি বিধবার বিয়ে দিয়ে ফেলেছেন, বাংলায়ও মাঝে মাঝে হচ্ছে।

শিবরাম। বর্তমানে মহাত্মাজীও ঐ কথাটার উপরে বেশ জোর দিচ্ছেন।

নিতাই। সমাজ সম্বন্ধে যাঁরা চিন্তা করেন, তাঁরা সকলেই এখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা সমর্থন করেন। আমাদের বাংলাদেশে ৪ লক্ষ বিধবা, এর অধিকাংশই নিরাপদ বলে আমার মনে হয় না; কারণ, অনেক স্থলে রক্ষকগণকেই এখন ভক্ষক স্বরূপ দেখতে পাচ্ছি। যে সকল বিধবারা এ অবস্থায় আছেন, তাঁদের কি বিয়ে হওয়া উচিত নয়? তবে কিনা মহাত্মা যে বলেছেন, ১৫ বছরে বিধবা হলেই তার পিতামাতার কর্তব্য তাকে বিবাহের জন্য উৎসাহিত করা। এ কথাটা আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি না। কারণ, ওঁরা মায়ের জাতি, ওঁদের অত ছোট মনে করাও পাপ। যদি করেন, বালিকা বালব্রহ্মচারিণীর আদর্শ নিয়ে সমাজে দাঁড়াতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁকে বিয়ের জন্য বিরক্ত না করে ঐ ব্রহ্মচারিণী তৈরী হবার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেওয়াই নেতাদের কর্তব্য। কথা হচ্ছে এই, যার মন বুড়ো হয়েছে তার বয়স যদি পনর বছরও হয়, তবে তাকে বিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই, যার মন বুড়ো হয় নি, তার বয়স যদি ৪০ বছর হয় তবে তার বিয়ে দিয়ে দাও। তাতে সমাজের কল্যাণ বই অকল্যাণ হবে না।

শিবরাম। আমাদের প্রতি গৃহেই সে শিক্ষার ব্যবস্থা হতে পারে।

নিতাই। পারে বটে, কিন্তু তার সম্ভাবনা বর্তমানে বড়ই কম।

শিবরাম। তার কারণ কি মনে করো?

নিতাই। কারণ, আমাদের গার্হস্থ্য জীবনে পূর্বের মত সংযম নেই। সংযম আমরা বহুদিন হারিয়ে ফেলেছি, যা আমাদের জাতির বিশেষত্ব ছিল। ভোগীর ঘরে ত্যাগী তৈরী হবার আশা করাই ভুল। মেয়ে বিধবা হয়ে ঘরে এলে তখন তার জনক-জননীকেও ঐ সঙ্গে সঙ্গে সতী সাজতে হয়; কিন্তু তাকি আমরা পারি। নিজে ভোগী হয়ে মেয়েকে সতীধর্ম শিক্ষা দেবার স্পর্ধা করা কি বাতুলতা নয়।

শিবরাম। এ কথা আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

নিতাই। না করে উপায় কি। আচ্ছা পণ্ডিতজী, বল তো, আমাদের ঘরে বিধবার দৈনন্দিন কর্ম কি?

নিত্যকালী। কর্ম হচ্ছে, দাসীর মত দিনরাত পরিশ্রম করা।

নিতাই। হ্যাঁ, আমাদের জন্য কালিয়া, পোলাও প্রভৃতি রান্না করে

ষোড়শোপচারে খাওয়ায়ে, বেলা তিনটের সময় গিয়ে সে খাবে কুমড়োপাতার ঝোল আর স্থক্ত দিয়ে ভাত। তার উপরে ভ্রাতৃবধূর উপদেশ বাণী, 'খেতে হলে কাজ করতেই হবে।' মাসে ২।১ দিন কৃপা করে হয়ত ভ্রাতৃবধূ বলেন—'ঠাকুরঝি, এক চামচ দুধ নিয়ে খেও।' এ কি তাদের উপরে অত্যাচার করা হচ্ছে না?

নিত্যকালী। অত্যাচার বলে অত্যাচার! তাঁদের সমস্ত জীবনকে ব্যর্থ করে তাঁদের অফুরন্ত আকাঙ্ক্ষাকে নিরাশার কালসাগরে চিরদিনের জন্য ডুবিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

শিবরাম। এখন কি করা যায় তাই বল! তোমার কথায় আমার যে দিকটা অন্ধকার ছিল, সে দিকটা আজ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

নিতাই। আমার মতে, ভগবান যখন তাঁর ছোট সংসারখানা ভেঙ্গে ফেলেছেন, তখন তাঁকে ঠাকুরের বিরাট সংসারের গৃহিণী করে দাও, জগতের সেবায় সে আত্মসমর্পণ করে নিজেও কৃতার্থ হউন, সমাজকেও কৃতার্থ করুন।

শিবরাম। গার্গী, সুলভা ব্রহ্মচারিণীর আদর্শ নিয়ে কি সকল বিধবাই দাঁড়াবে মনে কর?

নিতাই। পূর্বেই বললুম যে তা ইচ্ছা না করে, তাকে বিয়ে দিয়ে দাও। সে সংসার করুক—তাতেই তার কল্যাণের পথ পরিষ্কার হবে, সমাজেরও কিছু ভার লাঘব হবে।

শিবরাম। তুমি যে ব্রহ্মচারিণীদের ক্ষেত্র তৈরী করতে চাচ্ছ, সে ক্ষেত্র তৈরী করা কি সহজ কথা মনে কর? আর সে ক্ষেত্রোপযোগী গুরু কই?

নিতাই। তাই তো বলছি, তোমরা মেয়ে বিদ্যালয় তৈরী কর, গুরু ওখান থেকেই পাবে।

শিবরাম। আমি পণ্ডিতমণ্ডলীর সাথে আলোচনা করেছি, অনেক বৃদ্ধ পণ্ডিত আনন্দের সহিত এ সকল বিদ্যালয়ের কার্যভার গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছেন।

নিত্যকালী। তাতে আমার যথেষ্ট আপত্তি আছে কারণ, বৃদ্ধদের ভিতরেও অনেক খোকা দেখতে পাওয়া যায়।

নিতাই। বৌদির কথাটা একেবারে মিথ্যে নয় আমাদেরও তাদের হাতে কার্যভার দিতে আপত্তি আছে। মেয়েদের তৈরী করতে হলে

মেয়ে-গুরু ভিন্ন মেয়ে তৈরী হতেই পারে না। যদি হয়, তবে তার ফল বিষময় হবার সম্ভাবনা বেশী।

শিবরাম। তুমি যা বলেছ, এ কি তোমার প্রত্যক্ষ করা কথা?

নিতাই হ্যাঁ, এ দেশের অনেক গুরু-মেয়েদের গুরুগিরি করতে গিয়ে একূল ওকূল দু'কূল হারিয়েছেন। পণ্ডিতজী, মেয়েদের গুরুগিরি করা সহজ নয়। এ অতি উচ্চস্তরের সাধকের প্রয়োজন। বাউলদের একটা গান আমি তোমায় শোনাচ্ছি, তবেই বুঝতে পারবে।

(গীত)

বল কেমন করে কি সন্ধানে যাই সেখানে
মনের মানুষ যেখানে।
আঁধার ঘরে জ্বলছে বাতি দিবা রাতি
নাই সেখানে॥
যেতে পথে কাম-নদীতে পারি দিতে ত্রিবেণী,
কত সাধুর ভরা যাচ্ছে মারা
পড়ে নদীর ঘোর তুফানে॥
রসিক যারা পার হয় তারা, ত্রিবেণীর সে ধারটি দিয়ে,
ঐ যে উজান নদী যাচ্ছে বেয়ে
যারা মায়ের সাধন জানে॥

একটা কথা পণ্ডিতজী, চিন্তা করো না। তুমি যে পুরুষ-গুরু দিয়ে মেয়েদের দীক্ষিত করতে যাচ্ছ, যদি কোন মেয়ে জিজ্ঞেস করে বসেন যে, কুলকুণ্ডলিনী কি, তিনি থাকেন কোথায়? তখন ঐ গুরু তাকে কি জবাব দেবে?

শিবরাম। সে তার গুরু-মুখে যা শুনেছে, তাই বলবে।

নিতাই। কি করে সে বলবে? ঐ প্রশ্নের জবাব দিতে হলেই তাকে এমন সকল কথা পাড়তে হবে, যা মেয়ে-পুরুষে হতেই পারে না। পুরুষের মেয়েদের কাছে সে কথা বলতে যাওযাও যা, তাদের মাতৃত্বের অবমাননা করাও ঠিক তাই।

শিবরাম। কথাটা মূল্যবান সন্দেহ নেই। এখন কথা হচ্ছে যে, সে মেয়ে-গুরু মিলে কই? সাধারণ মেয়ে-বিদ্যালয় করা হয়, তারই শিক্ষয়িত্রী মিলে না, যদি মিলে, সে খৃষ্টান, নয় ব্রাহ্ম। হিন্দু-ঘরে সে মেয়ে দুর্লভ।

নিতাই। হিন্দু-ঘরেও সে মেয়ে আছে, তবে কিনা সংখ্যায় বড়ই কম। যারা আছে তারাও সমাজের ভয়ে বের হতে পারে না। অভিভাবকগণও তাদের ঘরের বাইরে আসতে দিতে প্রস্তুত নন। তারা ঘর থেকে বেরিয়ে এলে আর তাদের ঘরে ফিরে যেতে না হয়, এমন স্থান যদি তোমরা তৈরী করতে পার, তবে মেয়ের অভাব হবে বলে আমার মনে হয় না। পণ্ডিতজী, এই বাংলার বাগানে ফুল অনেকই ফোটে, কিন্তু যত্নের অভাবে বনের ফুল বনেই ঝরে পড়ে যায়, রেখে যায় কেবল স্মৃতি। মালীর অভাব, তাই পুষ্পও চয়ন করা হয় না মালাও গাঁথা হয় না, মায়ের পায়ে অর্ঘ্যও দেওয়া হয় না।

(সেবকের প্রবেশ)

সেবক। আপনাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছি!

নিতাই। সে কি। তোমরা এখনো খাবার নিয়ে বানিয়াজোয়ার যাও নি।

সেবক। হ্যাঁ, তা নিয়ে দশজন সেখানে চলে গেছেন। আপনাকে সাথে করে জমিদারবাবু যেতে ইচ্ছা করেছেন, তাই আপনাকে খবর দিতে এসেছি।

নিতাই। পণ্ডিতজী, তবে এখন যাই। বানিয়াজোয়ার থেকে এসে আবার কথা হবে। চল ভাই। (উভয়ের প্রস্থান)

নিত্যকালী। যা বলে গেল শুনলে তো!

শিবরাম। এর সাধনা ব্যর্থ হবার নয়। চল, এখন আমার আহ্নিকের সময় হয়ে এলো। ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, যেন ওর সাধনা সিদ্ধ হয়। (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—মেয়েদের বিদ্যালয়-গৃহ।

(সুলভা, বিমলা ও মেয়েরা)

(গীত)

মেয়েরা। ঘোর ঘোর ঘোর ঘোর রে আমার
সাধের চরকা ঘোর।
ঐ স্বরাজ রথের আগমনী শুনি
চাকার শব্দে তোর॥

ঘোর ঘোর ঘোর ঘোর রে জোর,
ঘর ঘর ঘর ঘূর্ণিতে তোর ঘুচুক ঘুমের ঘোর
তুই ঘোর ঘোর ঘোর ;
তোর ঘুর চাকাতে বলদর্পীর তোপ
কামানের টুঁটুক জোর ॥
তোর ঘোরার শব্দে ভাই, শুনতে যেন পাই,
খুলল ভারত সিংহদুয়ার আর বিলম্ব নাই,
ঘুরে আসলো ভারত-ভাগ্য-রবি,
কাটলো দুঃখের রাত্রি ঘোর ॥
হিন্দু মুস্‌লেম দুই সোদর,
তাদের মিলন সূত্র ডোর রে,
রচলি চক্রে তোর—তুই ঘোর ঘোর ঘোর !
তোর মহিমায় বুঝলো দু'ভাই,
মধুর কেমন মাযের ক্রোড় ॥
এই সুদর্শন-চক্রে তোর,
ছুটলো সব গোমব—তুই ঘোব ঘোব ঘোব ;
আর লুটতে নাববে সিন্ধু ডাকাত,
বৎসরে পঁয়ষট্টি ক্রোড় ॥
শাসতে জুলুম নামতে জোর,
খদ্দর বাস বর্ম তোব রে,
অস্ত্র শস্ত্র ডোর, তুই ঘোর ঘোর ঘোর ;
আমরা ঘুমিযে ছিলাম জেগে দেখি,
চলছে চরকা রাত্রি ভোর ॥

সুলভা আমাদের বিদ্যালয়ের বাৎসরিক উৎসব আরম্ভ হয়ে গেছে, তাই তোমায় নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছিলুম। না এলে খুবই দুঃখিত হতাম।

বিমলা তোমার পত্র পেয়েই ছুটে এসেছি। বাল্যবন্ধুর আকর্ষণ, না এসে কি থাকা যায় ভাই।

সুলভা সে দাবী নিয়েই তো পত্র লেখা। তা না হলে তোমায় পত্র লিখতে পারি এমন শক্তি আমার কই? তুমি এখন বি. এ. পড়, আর আমি পড়ে আছি কোথায় ?

বিমলা। তোর চিরদিনই ঐ এক কথা। বি. এ. পড়ি বলেই কি তোর সাথে ভালবাসার বাঁধনটা ছিঁড়ে ফেলতে হবে নাকি?

সুলভা। উচ্চশিক্ষা পেলেই মানুষ শিক্ষাভিমানী হয়, তাই ভয় বোন্। থাক্ এ সব কথা। এবার পূজোর ছুটিতে কি করবে মনে করেছ?

বিমলা। আমি ভাবছি বঙ্কিমবাবুর বইগুলি সব পড়ে ফেলবো।

সুলভা। আমাদের মা বলেন, ও সব মেয়েদের পড়তে নেই। ও সব বইতে নাকি জীবন খেলো করে দেয়।

বিমলা। বঙ্কিম-সাহিত্য জীবন খেলো করে দেয়, এ এক নূতন কথা শুনলুম। বঙ্কিম-সাহিত্য যে না পড়েছে, তার জীবনটাই ব্যর্থ, রসশূন্য।

সুলভা। তা হতে পারে; কিন্তু আমরা একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেছি বলে তো মনে হয় না। বঙ্কিম-সাহিত্যের সমালোচনার যোগ্যতা আমার নেই। তিনি বর্তমান ভারতের "মন্ত্রগুরু", তাঁর পায়ে আমরা কোটি কোটি প্রণাম করি। তবে তাঁর "আনন্দমঠ" আর "দেবী চৌধুরাণী" আমরা খুব আনন্দের সহিতই পাঠ করতুম। দেবী চৌধুরাণী আদর্শ মেয়ে বটেন। কিন্তু সে দেবী তৈরী করার মত ভবানী পাঠক এখন আর বাংলায় নেই; তাই সে বই পড়াও বন্ধ করেছি।

বিমলা। নেই কি করে বলো? আমি তা দেখছি বাংলায় সে মানুষের অভাব নেই।

সুলভা। থাকলে কি এতদিনেও তাঁর একটা সাড়া পাওয়া যেত না?

বিমলা। আমরা সাড়া পাই। তোমরা তো আর ছেলেদের সাথে মেলামেশা করো না? করলে বুঝতে পেতে দেশে সে মানুষ আছে কি না!

সুলভা। ঐটে মাপ কর ভাই। সত্য সত্যই আমরা পুরুষ-ঘেঁষার দলে নেই। মা বলেন, মেয়ে-পুরুষে মিলে কাজ করবার সময় এখনো ভারতে আসে নি।

বিমলা। তোমাদের ভিতরে গোড়ামি এমনভাবে প্রবেশ করেছে, তা পূর্বে জানলে কখনো তোমার সাথে দেখা করতে আসতুম না। তোমাদের মা লেখাপড়া কি পর্যন্ত করেছেন?

সুলভা। ডিগ্রী পান-নি বটে, ডিগ্রীপ্রাপ্ত অনেক মেয়ে-পুরুষ তাঁর পদধূলি নিয়ে কৃতার্থ হন দেখতে পাই।

বিমলা। বর্তমান জগতের কোন খোঁজ রাখেন না, ধর্ম-ধর্ম করেই মাথা ঘামান?

সুলভা। তিনি বলেন, মেয়েদের বাইরে কোন কাজ নেই, তাদের কাজ ভিতরে। কারণ তারা গৃহলক্ষ্মী, সংসার গড়ে তুলতে হবে তাদের। ধর্মজীবন গঠন করা আগে প্রয়োজন, তারপরে অন্য কাজ। তিনি আমাদের সীতা, সাবিত্রীর আদর্শেই গড়ে তুলতে চান, তাই আমাদের বিদ্যালয়ের সাহিত্য করেছেন 'রামায়ণ' আর 'মহাভারত'।

বিমলা। বর্তমান জগতের সাথে যখন তোমাদের কোন সম্বন্ধ নেই, তখন তোমার সাথে তর্কে কোন ভল হবে না ; তুমি এক পথের যাত্রী, আর আমি অন্য এক পথের যাত্রী।

সুলভা। পথ ভিন্ন হতে পারে, গন্তব্যস্থান বোধ হয় এক। কারণ তুমিও মেয়ে আর আমিও মেয়ে।

বিমলা। তা তো বটেই।

সুলভা। তবে কথা কইতে আপত্তি কি ? আলোচনায় প্রাণের আবর্জনা অনেক পবিষ্কার হয়।

বিমলা। তা হতে পাবে, কিন্তু লক্ষ্যচ্যুত হবাব সম্ভাবনা আছে।

সুলভা। ও দুবলের কথা। বিচাব না করে, কল্যাণেব পথে আজ পর্যন্ত কেউ অগ্রসর হতে পেবেছেন বলে তো শুনি নি।

বিমলা। তোমার সাথে তো আব বিচার হচ্ছে না, হচ্ছে তর্ক।

সুলভা। তর্ক হচ্ছে মনে না করে বিচার হচ্ছে মনে কর না।

বিমলা। বাইরের জগতের যখন কোন খোঁজ রাখ না, তখন হবে কি করে? বর্তমান ভারতের আন্দোলনটা ভাল করে বুঝতে হবে। ওতপ্রোত-ভাবে তার সাথে মিলে যেতে না পারলে আমাদের কর্তব্য শেষ হবে কি? তাই আমি সংবাদপত্রগুলিকে বিশেষভাবে পড়ি বাইরের খবব জানবার জন্য।

সুলভা। আমাদের মা'ও মাঝে মাঝে পড়ে শোনান। কিন্তু তাতে মেয়েদের কর্তব্য নেতারা আজ পর্যন্ত তেমন কিছু নির্দেশ কবে দেন নি। যদি দিতেন, তবে গৃহলক্ষ্মী তৈরী হবাব মতন শিক্ষা-ক্ষেত্রও দেশে দু'চারটি তৈরী হত।

বিমলা। মেয়ে-বিদ্যালয় কি দেশে কম ?

সুলভা। ও বিদ্যালয় নামে মাত্র, কিন্তু তাতে আমাদের জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা কি আছে? যে শিক্ষা সে বিদ্যালয়ের মেয়েরা পাচ্ছেন, তাতে মাতৃশক্তি দিন দিন মরে যাচ্ছে বই তো নয়! যে শিক্ষায়

মাতৃশক্তি জাগ্রত হয়, সে শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা বলে মেনে নিতে হবে।

বিমলা। তা হলে তোমার মতে সে বিদ্যালয়ের কোন সার্থকতাই নেই !

সুলভা। মনে হয় তাই। মাতৃশক্তির জাগরণ ও বিদ্যালয়ে হতেই পারে না। ও বিদ্যালয়ে দেশের অকল্যাণ বই কল্যাণ হবে না। মনে রাখতে হবে, এ ইয়োরোপ নয়, এ ভারতবর্ষ ! তাই ভারতের পুরাতন আদর্শ নিয়েই মা তৈরী করার ব্যবস্থা করতে হবে।

বিমলা। সে বিদ্যালয়ে যে মা তৈরী হচ্ছে না, এ কি করে বলো ?

সুলভা। কি করে বলি, তা শুনবে ? ভাই, অসন্তুষ্ট হয়ো না কিন্তু। ও বিদ্যালয়ে তৈরী হচ্ছেন কতকগুলি মেমসাহেব। দেখছ না, কাপড় এখন ১২ হাতের কম হয় না, কারণ, কাপড়টা মেমদের মতন গাউন করে পরতে হবে তো। দশটা সেপটিপিন না হলে পোশাকটা মানানসই করে পরা যায় না ; সিঁথিতে সিন্দূর নেই — তার বদলে হয়েছে কপালভরা টিপ। সিঁথিতে পূর্বে ছিল মধ্য দিয়ে, এখন হয়েছে টেরী। হাতে রুমাল তো ঘুরছেই। বিমলা, এই কি শিক্ষা ? এ শিক্ষায় কি মাতৃশক্তি জাগবে ? এর পরিণাম, আমাদের জাতির বৈশিষ্ট্য নষ্ট করে মেয়েদের ধ্বংসের পথে শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে দেওয়া। মনে রেখো, যে নেতাই যা করুন না কেন, মা-তৈরী না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা দেশের কর্মী ছেলেও পাবেন না, কাজও তাঁদের এগুবে না।

বিমলা। তোমার সাথে তর্ক যে ক্রমেই জটিল হয়ে উঠলো। তোমার কথা শুনে মনে হয় তোমার মা উচ্চশিক্ষার ঘোর বিরোধী।

সুলভা। যাক্, এ সব কথা পরে হবে। চলো এখন খাই গে।

বিমলা। এ আলোচনায় তৃপ্ত হতে পারলুম না।

সুলভা। তোমায় আজ আমার তৃপ্ত করে দিতেই হবে। আমি যে মায়ের আদেশ পেয়েছি। আজ আমি তোমায় গাউন ছাড়িয়ে আমাদের দেশী মেয়ে সাজাবো, তবেই হবে আমাদের এ বছরের উৎসবের সার্থকতা।

বিমলা। আচ্ছা চলো, যদি ভুল বুঝিয়ে দিতে পারো, চিরদিন তোমাদের পায়ে বিক্রীত হয়ে থাকবো।

সুলভা। খাবার বেলায় মেয়েদের একটা গান শুনে নাও না। আরে, দাদা

তোদের সেদিন যে গানটা শিখিয়ে গেছেন, সেই গানটা গা দেখিনি।

(মেয়েদেব মিলিত গীত)

কে যেন ঐ চাঁদেব কোণে
উঁকি মেবে কথা কয,
ধবতে গেলে দেয না ধবা,
চাদেব মাঝেই লুকিয়ে বয়।
বপটি দেখে অনুমানি,
েন গডা চাঁদেব সুধা ছানি,
ঐ রূপেব ছটাযই হযে গেছে,
বিশ্বখানা সুধামষ।
বাজায এক পাগলা বাঁশী,
সেও ঢালে সুধাবাশি,
একূল ওকূল দু'কূল ছাপি,
প্রেম-যমুনা উজান বয।
সব দিযে যা ছিল শেষে,
সে আমিটাও আজ গেল ভেসে,
বইল না আব আমাব কিছু,
রূপ সাগবে হইনু লয॥

(সকলেব প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—শবৎবাবুব বাড়ী।

(বাজেন, নির্মলা, অমলা, লীলা, নিতাই, সেবকগণ।)

অমলা। অমন করে বসে আছিস কেন বাবা? কোন অসুখ কবে নি তো?

বাজেন। না, কিন্তু ভাল লাগে না মা—কিছুই যেন ভাল লাগে না!

অমলা। কি হযেছে, বুঝিয়ে বল্ না? খুলে বল্ না।

রাজেন। আমি কাল থেকে চাষার দলে মিশে চাষা সাজবো—আচ্ছা মা, আমাদেব শান্তিপুর পরগণায় প্রায় তিন হাজাব বিঘা জমি আমাদেব

খাসে পড়ে আছে, সে জমিগুলিতে কার্পাসের চাষ দিলে ভাল হয় না? আমি কিছু উৎপন্ন করতে চাই, এর-তার ঐশ্বর্য ভাণ্ডার থেকে অর্থ সঞ্চয় না করে প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে কিছু সঞ্চয় করতে চাই।

অমলা। সে কথা আমি কি বলবো, তোমরা যা ভাল মনে করো তাই করবে। তবে ওঁকে জিজ্ঞেস করে দেখলে ভাল হয়।

রাজেন। আচ্ছা মা, বাবাকে বলে তুমি আমায় বিশ হাজার টাকা দেওয়াতে পারো?

অমলা। এত টাকা দিয়ে কি করবি?

রাজেন। একটা বড় করে চরকার কারখানা খুলবো। কারণ তাঁতির দেশে অভাব নেই; সুতোটা কোনরকমে তৈরী করে নিতে পারলে বিদেশকে কাপড়ের জন্য বছরে ষাট কোটি টাকা দেবার প্রয়োজন হয় না।

অমলা। কাজটা মন্দ নয়, তবে মহাত্মার কথায় মনে হয় তিনি কারখানার পক্ষপাতী নন। তিনি চান প্রতি ঘরে চরকা চলে, তাই দেখতে।

রাজেন। আমারও কারখানা করার ইচ্ছা নেই, বাড়ী বাড়ী চরকা দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু তাতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, তাই তোমার কাছে টাকা চাইছি। আমি আমাদের সকল পরগণাতেই ঘরে ঘরে চরকা দিতে চাই, যেন আমাদের প্রজারা সকলেই খদ্দর পরতে পারে।

অমলা। এ কথা তুমি কর্তাকে জানাও; তিনি খুব আনন্দিত হবেন বলেই আমার বিশ্বাস, টাকাও দিতে পারেন।

রাজেন। মা, তোমার এম, এ, পাশ করা ছেলে তাঁতি হবে, চাষা হবে, এতে তোমার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হবে না তো?

অমলা। ছেলের কথা শোন, সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে কেন? বরং ওতে আরো সম্মান বৃদ্ধি হবে। বড়ঘরের ছেলেরা আত্মসম্মান বলি দিয়ে চাষার দলে মিশে যদি কাজ করে তবে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। আমাদের দেশের অনাবাদী জমিগুলি সব আবাদ হলে, দেশ অর্থশালী হতো। দেশের মধ্যে যে মহা আন্দোলনের স্রোত চলেছে, এতে সকলেরই গা ঢেলে দেওয়া কর্তব্য। তা না হলে ভারতের ভবিষ্যৎ বড়ই অন্ধকার।

(নিতাইয়ের প্রবেশ)

নিতাই। এমন মা না হলে কি আর এমন ছেলে তৈরী হয়? বড় ঘরের ছেলেদেরই এখন হাতে কোদাল নিয়ে চাষার দলে মিশে কাজে নামতে হবে, তা না হলে তারা আপনার জন হয়ে আমাদের কার্যে সহায় হবে কেন? মানের গোড়ায় ছাই ঢেলে এখন চাষার দলে মিশে লাঙ্গল ধরাই হচ্ছে এ যুগের বড় কর্তব্য, কারণ মাটি চষেই আমাদের সোনা তুলতে হবে। মা, তোমার রাজেন তাই করতে যাচ্ছে, তুমি তাকে আশীর্বাদ করো, যেন তার মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

অমলা। মা কি কখনো সন্তানের অমঙ্গল চিন্তা করে? রাজেন আমার সমাজ এবং দেশের মুখ উজ্জ্বল করুক, এই তো আমার ভগবানের কাছে প্রার্থনা। রাজেন দেশের কাজে লাগলে সে অনেক কাজ করতে পারবে, সে বিশ্বাস আমার আছে। ওর প্রাণ সরল এবং উদার। আমি বাল্যকাল থেকে ওকে এই আদর্শেই তৈরী করে এসেছি। আচ্ছা রাজেন, আমি এখন যাই। কর্তাকে আমি বুঝিয়ে বলবো। আশা করি তুমি টাকা পাবে।

(প্রস্থান)

(লীলার প্রবেশ)

রাজেন। কিরে? তোরা কোত্থেকে এলি?

লীলা। দাদা, তোমাদের সব কথা ঐ আড়াল থেকে শুনেছি, শুনে আর আনন্দ ধরে না। দাদা, আমার সাথে এসো, আমরা একটা নূতন কাজ আরম্ভ করেছি তা তোমায় দেখাবো।

রাজেন। তোরা আবার কি কাজ আরম্ভ করেছিস।

(চরকা হস্তে নির্মলার প্রবেশ)

রাজেন। একি! তুমি আবার এ অবস্থায় কেন। এ দেখছি একটা ভয়ানক ষড়যন্ত্র চলছে! নিতাই দাদা, এ সব কি?

নিতাই। দেখতেই তো পাচ্ছ ওরা চরকা ধরেছে।

লীলা। ঘোর ষড়যন্ত্র দাদা, তোমরা এতদিন এর ঘোর বিরোধী ছিলে, তাই আমরা গোপনে একাজ করেছি।

রাজেন। তাই তো দেখছি বোন। এ চরকা কবে এলো। বাবা কিছু বলেন নি।

লীলা। বাবাকে জানিয়ে কি আর করেছি! তোমরা থাকো বাইরের ঘরে। সেদিন নিতাই দাদার বোন সুলভা এসেছিলেন, তিনিই আমাদের সকলকে চরকা দিয়ে গেছেন। বলি ও বউদি। শীতের দিনে একেবারে ঘামিয়ে গেলে যে। পাখা করতে হবে নাকি? এদিকে এগিয়ে এসো না!

রাজেন। (সুতো হাতে নিয়ে) বাঃ, বেশ সুতো, এ কার হাতের সুতো লীলা?

লীলা। বৌদির। আমি একশ' নম্বরের সুতো কাটতে পারি। মা আর বৌদি একশ' কুড়ি নম্বরের সুতো কাটতে পারেন। দু'মাসেব চেষ্টায় আমাদের এতটা হয়েছে। কাজ শক্ত নয়।

রাজেন। বলিস কিরে, দু'মাস ধরে তোরা এ কাজ করছিস অথচ. আমি জানি না! অবাক করেছিস বোন! ও কি? তুমি অত জড়সড় হচ্ছ কেন? তুমি ভাবছো আমি তোমার উপর রাগ করবো? ভুল—ভুল, আমি বড়ই প্রীত হয়েছি। তোমরা যে এমন সুন্দর সুতো তুলতে শিখেছো তাতে আমি গর্ব বোধ করছি। তবে, তোমার বাবা সরকারী চাকুরী করেন, তিনি কিছু মনে না করেন।

নির্মলা। তুমি আমার বাবাকে অত ছোট মনে করো না। অবশ্য যতদিন তিনি চাকুরী করবেন, ততদিন তিনি তাঁর মনিবের হুকুম মতন কাজ করতে বাধ্য। তা না হলে তাঁর কর্তব্যের ত্রুটি হয়। তবে তিনি আজ পর্যন্ত তাঁর বিবেকের বাইরে কিছু করেন নি, এ আমি তোমায় জোর করেই বলতে পারি।

লীলা। দাদা, তুমি আমাদের বিদ্যালয়ে ভর্তি হবে? বৌদি তোমায় সুতো তোলা শেখাবেন। রাজী আছো?

রাজেন। হ্যাঁ, আমারও শিখতেই হবে। আজই যদি শেখাতে চাস, আমি রাজী আছি।

(গীত)

নিতাই। সাধে কি আর্ হচ্ছ রাজী,
তোমায় রাজী করেছে।
সে দিনই জানি ধরবে চরকা
তোমার গিন্নী যে দিন ধরেছে।

মায়ে যেমন রাঁধে তেমন,
বোনে রাঁধেন ছাই।
গিন্নী যেদিন রাঁধেন সেদিন,
অমৃতের মতন খাই।
এই যে দেশের কথা রাজেন,
সেই দেশেরই তো তুমি।
তোমার দোষ নয়,
দেশের হাওয়া,
ঐ জায়গায়ই গোল বেঁধেছে॥
তাই মুকুন্দের কান্নাকাটি
আজ সকল গিন্নীর পায়ে ধরা,
তোমরা যদি ধরতে চরকা মা,
পঁচিশজনও শতকরা,
তবে বাবুরা পেতেন পথটা
উঠে যেতো এই দেশটা
আমিও বলতেম বুক ফুলিয়ে,
বাঙ্গলার সাধনায় সিদ্ধি হয়েছে॥

(প্রস্থান)

রাজেন। কি অদম্য উৎসাহী কর্মবীর!

লীলা। আমাদেরও যা কিছু দেখতে পাচ্ছ, তা ওঁর উপদেশেই হয়েছে। ইনিই সুলভাকে দিয়ে আমাদের সুতো তোলা শিখিয়েছেন। তিনি প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসেন। কত ভাল ভাল বই আমাদের পড়ে শোনান।

রাজেন। আমরা ভাগ্যবান যে, এমন একনিষ্ঠ সাধক আমরা আমাদের পল্লীতে পেয়েছি। নির্মলা যে চুপ করে রইলে? অথচ মুখের দিকে চাইলে মনে হয় ভেতরে আনন্দের তুফান বয়ে যাচ্ছে।

নির্মলা। যা বলেছ, তা ঠিক, আমি এ মাসে সুতোর দাম ১৫ টাকা পেয়েছি।

রাজেন। এক মাস সুতো কেটে এত টাকা পেয়েছ?

নির্মলা। তুলোটা যদি নিজেদের খামার থেকে পেতাম, বাজার থেকে কিনতে না হতো, তবে আরো অনেক বেশী পেতাম। মা পেয়েছেন ২২ টাকা।

রাজেন। সুতো বিক্রী করলে কোথায়?

নির্মলা। আমাদের গাঁয়ের পল্লী-সমিতি কিনে নিয়ে যায়। শুধু আমাদেরই নয়, এ গাঁয়ে প্রায় সকল মেয়েরাই সুতো কাটেন। সেবকরাই বাড়ী বাড়ী তুলো দিয়ে যান, সুতো তোলা হলে, তাঁরাই এসে দাম দিয়ে নিয়ে যান। আমাদের এ পরগণার তাঁতিরাই কাপড় তৈরী করে দেন। তাই তো এদেশে এখন সকলেই খদ্দর পরেন।

রাজেন। কিছুদিন হয় তাই দেখছি বটে, কিন্তু ঠিক করে উঠতে পারি নি, এত খদ্দর কোথা হতে আসে! যাক, ভগবান আমার কার্যের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছেন। তুলোর চাষই এখন প্রয়োজন। তাই করতে হবে। দেশ তবে কর্তব্য বুঝেছে, মহাত্মার ক্রন্দন ব্যর্থ হয় নি।

নির্মলা। এ সবই নিতাইবাবুর কর্ম। তিনিই রাজেন্দ্রপুর পল্লী-সমিতির চালক।

রাজেন। যে মেয়েটি তোমাদের সুতো তোলা শিখিয়েছেন, তিনি কার মেয়ে?

লীলা। তিনি যে নিতাইবাবুরই বোন। নাম সুলভা। ভাই, বোন দুটিই রত্ন, সুলভা প্রতিজ্ঞা করেছেন, চিরদিন কুমারী থেকে দেশের সেবা করবেন। দাদাও তাই।

রাজেন। সুলভাকে আমি কখনো দেখি নি, আবার যখন আসবে তখন আমায় জানাবে।

নির্মলা। বাবা কোথায় গেছেন?

রাজেন। যান নি, যাবেন। বানিয়াজোয়ার পরগণার প্রজারা দু' বছর অজন্মায় বড়ই বিপদাপন্ন হয়ে পড়েছেন।

লীলা। আমরা সঙ্গে গেলে কি কোন ক্ষতি হবে? বাবাকে বলো আমরাও তাঁর সঙ্গে যাবো।

রাজেন। সে তো আনন্দের কথা। তোরা সাথে গেলে প্রজারা তোদের দেখে খুবই আনন্দিত হবেন।

(নেপথ্যে গীত)

পুঁটলী বেঁধে ঘরের কোণে,
আর কি বসে থাকা যায়।

নির্মলা। ও কারা গান গাইছে?

লীলা। বোধ হয় পল্লী-সেবকরা আসছে।

(সেবকদের প্রবেশ)

(গীত

সেবকগণ। পুঁটলী বেঁধে ঘরের কোণে,
আর কি বসে থাকা যায়।
দেবতা আজ ঘরের দ্বারে,
অর্ঘ্য দিতে হবে পায়॥
হিসাব রেখে শিকেয় তুলি,
লুটিয়ে নে মা'র চরণ ধূলি
সাধনার ধন চরকাগুলি,
মাথায় তুলে দেখা তায়॥
চালা রে তাঁত সাজ রে তাঁতি,
দেখে নিক বিদেশী তাঁতি,
বুঝিয়ে দিতে হবে তাদের,
আমরাও মানুষ এ দুনিয়ায়॥
রাখিস্ রে রাখিস্ মনে,
হিন্দু-মুসলমান ভাই দু'জনে,
এক হয়ে আজ নামতে হবে,
লাগতে হবে মা'র সেবায়॥
দেশের ধান যায় বিদেশে,
রাখতে হবে তারে দেশে,
করতে হবে ধর্ম-গোলা,
প্রতি পল্লী প্রতি গাঁয়॥

রাজেন। তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

১ম সেবক। আমরা মুষ্টিভিক্ষার চাল নিতে এসেছি।

রাজেন। এখান থেকে তোমরা কোথায় যাবে?

২য় সেবক। সমিতিতে। তারপরে যাবো বড়াইল গ্রামে কচুরী পরিষ্কার করে দিতে। সে গাঁয়ে চাষাদের জমিতে ফসল দেওয়া কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

রাজেন। তোমরা খুবই বড় কাজে হাত দিয়েছ; সমস্ত দেশটা কচুরীতে ছেয়ে ফেলেছে। তোমরা কি এ কাজ পারবে?

২য় সেবক। নিরাশার কথা বলছেন কেন? মানুষে না পারে কি?

রাজেন। তোমাদের সাহসকে ধন্যবাদ।

১ম সেবক। ধন্যবাদের কিছুই নেই, যেদিন পল্লী-সেবক সেজেছি সেদিনই জানি আমাদের অসাধ্য সাধন করতে হবে। আমাদের লক্ষ্যই হচ্ছে নিজেদের কাজ নিজেরাই করে নেবো। পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকবো না।

২য় সেবক। নিজের কাজ নিজেকেই করে নিতে হয়। কেউ কারো কিছু করে দেয় না, পরমুখাপেক্ষী হয়েই আমরা মরতে বসেছি।

রাজেন। যা বললে তা ঠিক, আমরা অলস বলেই আজ মরণের পথে চলেছি।

১ম সেবক। তা না হলে আমরা একটা সামান্য কচুরীর অত্যাচার থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারি না, আমরা আবার স্বরাজ চাই! আমাদের লজ্জা হওয়া উচিত।

রাজেন। এ সব কথা তোমরা কোথায় শিখলে?

২য় সেবক। আমরা আমাদের নেতার কাছে শুনেছি। তিনি বলেন—ম্যালেরিয়ায় দেশ উচ্ছন্নে যাচ্ছে, তা দূর করবেন কিনা সরকার বাহাদুর? কেন? তোমরা তোমাদের পল্লীটা নিজেরাই কেন পরিষ্কার করে নাও না? খেতে, শুতে, বসতে সব কাজই পরের উপরে নির্ভর! এ করলে কি আর জাতি বাঁচে?

রাজেন। হ্যাঁ ভাই, কেবল আমরাই পরের উপরে নির্ভর করে চলেছি। তা না হলে জগতে সকল জাতিই আপন আপন পায়ে দাঁড়িয়ে তাদের অভাব পূরণ করে নিচ্ছে। তোমাদের সাথে আলোচনায় তৃপ্ত হয়েছি, ভগবান তোমাদের মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবেন। তোমরা নির্ভয়ে এ কথা প্রচার করো। দেশকে স্বাবলম্বী করে তোল।

২য় সেবক। আমরা আমাদের দেশকে স্বাবলম্বী করে তুলবোই।

রাজেন। প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। নিতাই দাদা তোমাদের সেবার যোগাড় করতে পারলে হয়। অর্থাভাবে সকল অনুষ্ঠানই ধ্বংস হতে চলেছে।

১ম সেবক। সেজন্য আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমরা ভিক্ষার উপরে বা মাহিনার উপরে নির্ভর করে দাঁড়াই নি যে, আমাদের অনুষ্ঠান অর্থাভাবে ভেঙ্গে যাবে। বর্তমানে আমাদের শিল্প-বিভাগে যা আয় হচ্ছে, তাতেই বেশ চলে যেতে পারবে। তারপরে কাজ দেখাতে পারলে আপনিই কি টাকা না দিয়ে পারবেন?

২য় সেবক। টাকায় মানুষ করে না, মানুষেই টাকা করে। কর্ম যাদের সাধনা, টাকা তাদেব দাসী। কর্মীর সেবার জন্তই ভগবান টাকার সৃষ্টি করেছেন, অলসের জন্ম নয়

রাজেন। হ্যাঁ, কাজ দেখাতে পারলে টাকা এসে তোমাদের পায়ে লুটিয়ে পড়বে।

১ম সেবক। বছরে বাংলার যে টাকাগুলি সরকার বাহাদুর ডাক্তারকে দেন, সে টাকাগুলি আমাদের হাতে দিলে আমরা এক বছরে বাংলার স্বাস্থ্য ফিরিয়ে এনে দিতে পারি। আমরা এখন যাই, অন্ত সময় দেখা করবো।

রাজেন। আচ্ছা ভাই, এসো, তোমাদের অমূল্য সময় নষ্ট করতে ইচ্ছা করি না।

(নিতাইয়ের প্রবেশ)

নিতাই। রাজেন! Yes, time is money. সময়ের মূল্য অনেক বেশী।

(গীত)

সময় ফিবিযে কেবা পায ?
—না যায।
কেবল শুনিনু কানে,
না চাহিনু তার পানে,
শুধু উপেক্ষিনু তারে,
হেলায় হেলায়॥
এখনো যা আছে কিছু
ধরিলে তাহারে এঁটে,
যে ক'টা দিন আছে বাকী
আনন্দেই যেত কেটে,
কিন্তু এমন অন্ধ মোরা,
এমনই কপালপোড়া,
বিধির লিপি কপাল জোড়া,
কথায় কথায়॥
মোরা যেমন ফুটবলে (Foot ball)
কিক্ দিয়েই ধরা জিনি।

বিধিরে ভেবেছ বুঝি,
তেমন একটি হাবা তিনি।
বিশ্বপতি কর্ম্মময়,
হাবা ছেলের বাবা নয়,
কর্ম ভালবাসেন তিনি,
কর্ম্মীই তাঁর কৃপা পায়॥
কর্মক্ষেত্রে এসে যারা,
কর্মই করে না সাথী,
ক্ষণস্থায়ী যেন ভাই,
তাদেরই জীবন-বাতি।
এ মহা কর্মের যুগে,
শান্তি নাই কর্ম ত্যাগে,
মুকুন্দ করেছে কর্ম,
শান্তিবারি পিপাসায়॥

(প্রস্থান)

রাজেন। দেখলে তো, এরা কি বিরাট কার্যে হাত দিয়েছে? ম্যালেরিয়া দূর করার জন্য এরা বদ্ধপরিকর হয়েছে। ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি স্থানগুলি যখন এরা নষ্ট করে দিচ্ছে, তখন এ দূর হবেই। নির্মলা, দেশ জেগেছে, তা না হলে ছেলেরা পল্লী-সেবায় এভাবে প্রাণ উৎসর্গ করতো না, চলো এখন, বাবার বানিয়াজোয়ার যাবার যোগাড় করিগে।

(সকলের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—গাড়ো পাহাড়।

(সন্ন্যাসী, সতীশ ও নিতাই)

সন্ন্যাসী। তুমি এখানে কি করে আমার খোঁজ পেলে?

সতীশ। আমার পল্লী-সেবকরা আমায় জানিয়েছে।

সন্ন্যাসী। তুমি কি তাদের কাছে আমার কথা বলেছ?

সতীশ। না বলে পারি কি করে? তাদের কাছে আমার অব্যক্ত কিছুই নেই। আপনার এখানে কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?

সন্ন্যাসী। না, আমি বেশ আনন্দেই আছি। পাহাড়ী ভাইদের সাথে মিলে-মিশে প্রাণটা সরস হয়ে যাচ্ছে। তোমার কর্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি এখানেই থাকবো মনন করেছি।

সতীশ। তা হলে আমার উপরে যথেষ্টই কৃপা করা হবে। জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে তোলাই যখন আপনার উপদেশ, তখন এই গাড়ো আর খাসিয়া, এ দুটো জাতি সম্বন্ধে আমরা কি করতে পারি সে দিকটা একটু ভাববেন। এরা জাতিতে হিন্দু, অধিকাংশই শৈব; এরা এখন খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছে। এদের ভেতরে এখন থেকে যদি গঠন-কার্য আরম্ভ না করা হয়, তবে কিছুদিন পরে এরা সকলেই খৃষ্টান হয়ে যাবে। এ দুটি জাতি একটা মস্তবড় শক্তি। তাই আপনি ঐ দিকটায় একটু বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন, এই আমার প্রার্থনা।

সন্ন্যাসী। ওদিকটা আমার চোখে পড়েছে বলেই আমি ওদের ভেতরে থাকা স্থির করেছি। শুধু গাড়ো-খাসিয়াই নয়, নমঃশূদ্র ভাইদের দিকেও চাইতে হবে। ঐ জাতিটাও বাংলাব একটা মস্তবড় শক্তি।

সতীশ। তা হলে স্রোতও ফিরে যাবে সন্দেহ নেই। কারণ, ওরা একজন হিন্দু ধর্মপ্রচারকই চায। আচ্ছা, আমরা যে ভাবের চিত্র জাতির কাছে ধরে আসছি, তা কার্যে পরিণত করতে আমাদের কোন্ পন্থা অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ মনে করেন?

সন্ন্যাসী। ভেতর থেকেই আমাদের মুক্তিব বাতাস বইবে। বাইরের উৎপীড়ন আমাদের ততদিনই সহ্য করতে হবে, যতদিন আমরা ভেতর থেকে শুদ্ধ হয়ে না উঠবো।

সতীশ। আমারও মনে হয় তাই। দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা, সকল রকম ক্লেশ আমাদের নীরবে সহ্য করে যেতে হবে। কারণ ঐগুলিই হচ্ছে আমাদের জীবনের অগ্নিপরীক্ষা।

সন্ন্যাসী। হ্যাঁ সতীশ, তাই বটে! যেদিন আমরা আগুনের মত শুদ্ধ হয়ে উঠবো, সে দিনই আমাদের বাইরের দাবানল নির্বাপিত হবে। আকাশের মেঘ যেমন চিরদিন সূর্যকে আবৃত করে রাখতে পারে না, সেইরূপ আমাদের প্রকাশের পথেও কোন বাধাই চিরস্থায়ী হবে না।

সতীশ। বাইরের উৎকট বিঘ্নে যে আমাদের গতির পথ রুদ্ধ হবে না, তা আমি জানি। যারা স্বর্গের অমৃত আহরণ করার স্পর্ধা রাখে, এই মরজগৎকেই আবার স্বর্গের ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ করে তুলতে চায়, তারা অসাধ্য সাধন করবেই। কারণ, তাদের প্রধান অবলম্বনই হচ্ছে ভগবৎ বিশ্বাস। সে বিশ্বাস অজেয়, জগতের যুক্তি-তর্কের ঘোরতর শরবর্ষণেও উহা অভেদ্য।

সন্ন্যাসী। হ্যাঁ সতীশ তাই বটে! "বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর"। সহায়হীন সম্বলহীন আমরা একমাত্র বিশ্বাসের বলেই নূতন সৃষ্টি গড়ে তুলতে উদ্যত হয়েছি। এতে চাই সাহস, চাই ধৈর্য।

সতীশ। তা আমি বুঝতে পেরেছি, তাই তো আমার পল্লী-সেবকদের দিয়ে এ কথা প্রচার করছি।

সন্ন্যাসী। সতীশ! আজ গতির পথে বাধা বলে যে সব চিত্র দেখছো বস্তুতঃ ওগুলি বাধা নয়। মনে রেখো—চাই বিরাট স্পর্ধা, চাই বাধার সম্মুখে বুক উঁচু করে দাঁড়ানো, তা হলেই দেখবে বাধা বলে কোন অন্তরায়ই তোমার গতির পথকে রুদ্ধ করে নেই; বরং ওগুলি তোমার পরম সহায়ক। তাই তো নূতন সাধককে সর্বাগ্রে আত্মপ্রতিষ্ঠায় দৃঢ় করে তুলতে হবে। কারো দানের উপরে বা অনুগ্রহের উপরে নির্ভর করে যেন তিনি দাঁড়াবার সঙ্কল্প না করেন। যাঁর সৃষ্টি-সামর্থ্য নেই, আপনার আহারের সংস্থান ভার সমাজের উপরে চাপিয়ে সমাজ-সেবায় অগ্রসর হচ্ছেন, তাঁর দ্বারা আপাততঃ কিছু কাজ হতে পারে; কিন্তু এই সকল লোকের দ্বারা সমাজ দিন দিন ভারগ্রস্ত হয়ে স্থবির হবে, সন্দেহ নেই। সতীশ, তাই সমাজের প্রত্যেক ব্যষ্টিশক্তি হবে স্বাধীন, স্বাবলম্বী এবং প্রত্যেকেই আপনাকে জানবেন এবং আপনার সংসারটি গুছিয়ে নেবেন। পরে এইরূপ ব্যষ্টিশক্তি নিয়েই গড়ে তুলতে হবে সমষ্টিকে, এই সমষ্টিই হবে বাংলার নূতন জাতি।

সতীশ। হ্যাঁ, এই তো আমাদের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অন্তরায় হবে জগতের আসুরিক শক্তি, তার সাথে বিরোধ করতে বিরত হবে কারা, যারা সংসারে মরতে এসেছে। আমরা যে অমর, ভগবান দেব-রাজ্য গড়ে তুলবার ভার যে আমাদের উপরেই ন্যস্ত করেছেন। আমরাই যে জগতের ব্রাহ্মণ; জগৎকে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত যে আমাদেরই করতে হবে।

সন্ন্যাসী। সতীশ ! আজ আমি আনন্দে ভরপুর, যে তোমার মত সাধক কর্মী পেয়েছি। তুমি যখন ইচ্ছা করবে তখনই আমার দেখা পাবে। তোমার ভয় নেই, নির্ভয়ে কাজ করে যাও। (প্রস্থান)

সতীশ। চরণ-ধূলি যখন পেয়েছি, তখন আর আমার ভয় কি? আমি নির্ভয়েই কাজ করবো। এস ভাই বাঙ্গালী! জগতের অহিত সাধন করা তো তোমাদের ব্রত নয়, মানুষকে দেবতা করে তুলবার আকাঙ্ক্ষা তোমাদের; একটু সাহসে ভয় করে দাঁড়াও। নানা স্বার্থে পার্থিব মোহে জাতিটা দিশেহারা, তার হৃদয়ে নূতন শক্তি দিতে হলে একদল সনাতনপন্থী সন্তানকে দাঁড়াতে হবে সকলের সামনে। তাই আমি আজ যুক্ত-করে তোমাদের সকলকে আহ্বান করছি। (প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—বানিয়াজোয়ার।

(দরিদ্র প্রজাগণ, শরৎবাবু, রাজেন, দেওয়ান, প্যাদা, বানিয়া, নিতাই, ভিখারী, ভিখারিণী)

(গীত)

প্রজাগণ। পেটের খিদায় জ্বইলা গো মইলাম,
উপায় কি করি ?
ওকি দারুণ আহাল পড়িয়াছে রে ভাই,
ধান টাকায় বিকায় এক পশারী॥
আড়াই কুড়ি টাকা গো দেনা,
কর্জ হাওলাত পাওয়া যায় না,
মহাজনে ক্রোক দিছে জমি আর বাড়ী।
আবার চৌকীদারি টেক্স গো নিল,
আমার থালি লোটা নিলাম করি॥
পাটের টাকায় দিলাম গো কিন্যা,
বিবিরে জারমণির গয়না,
আর হাওয়ার চুড়ি।

জারমণির গয়না কেউ বন্ধক নেয় না রে
ভাইঙ্গা গেছে ঠুন্‌কো চুড়ি ॥
মনের দুঃখ কইমু বা কারে
ছেইলা মাইয়া কাইন্দা মরে ;
পরিবার হায় ভাত বেগরে
হইয়াছে পাটখড়ি ।
আমার ছাতি ফাটিয়া যায় রে দেখিয়া
আল্লা আমি কেন না মরি ॥
মমিন বলে করি গো মানা,
ভাতের দুঃখ আর রবে না ;
বিদেশী চিজ্‌ আর কিনব না,
কও কছম করি ।
তবে দেশের টাকা রইবে রে দেশে
লক্ষ্মী ঘরে আসবে রে ফিরি ॥

(সেবকগণের প্রবেশ)

১ম সেবক । আপনাদের জন্য আমরা খাবার এনেছি, আপনারা সব এক জায়গায় বসুন । আমরা আপনাদের খাবার দিচ্ছি ।

ভিখারী । দাও, দাও, পেট জ্বলে গেল, আজ সাতদিন খাই না—সাঁতদিন খাই না ।

২য় সেবক । এই নিন্‌ । (খাবার দেওযা । একটি বালক হাত থেকে কেড়ে নিয়ে খেলো)

ভিখারী । আরে করলি কি ? করলি কি ? আমি যে আজ সাত দিন খাই না ।

ভিখারীর পুত্র । আমিও যে আজ পাঁচ দিন খাই না ।

২য় সেবক । আপনারা স্থির হয়ে বসুন, আমরা সকলকেই খাবার দেবো ।

ভিখারিণী । স্থির হয়ে বসবার কি আর শক্তি আছে বাবা ? মৃত্যু-যন্ত্রণা হচ্ছে, মরতে চলেছি । আচ্ছা দাও, আমি বসলুম ।

(১ম সেবক সকলের হাতে খাবার দিল । ভিখারিণী ছেলের হাত থেকে নিয়ে খেলো)

২য় সেবক । এ করলেন কি ? এ যে আপনারই ছেলে !

ভিখারিণী। হউক না ছেলে, আমি আগে বাঁচি, তা'রপরে দেখবো ছেলে। আমাদের ফজলু খেতে না পেয়ে ছেলে-মেয়ে কেটে নিজের গলায় দড়ি দিয়েছে।

১ম সেবক। পেটের জ্বালা মানুষকে পশুত্বে পরিণত করে দেয়। হায় রে দেশ, শেষে তোর কপালে এই ছিল!

(প্যাদা ও বানিয়ার প্রবেশ)

১ম সেবক। আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?

প্যাদা। আমরা রহমত-উল্লার জমিগুলি সব ক্রোক দিতে এসেছি।

বানিয়া। রহমত-উল্লা টাকা দেবে কিনা বলো? তা না হলে আমি তোমার জমি ক্রোক দেব।

২য় সেবক। এ রাক্ষস, না পিশাচ? এ অবস্থায়ও কি কেউ ক্রোক নিয়ে আসে? তুমি কার জমি ক্রোক দিতে এসেছ?

বানিয়া। ঐ রহমত-উল্লার।

১ম সেবক। দেখতে পাচ্ছ না ওর অবস্থা? এমন অবস্থায়ও কেউ কখনো মালক্রোক নিয়ে আসে?

বানিয়া। ওর যথেষ্ট জমি আছে, সেগুলি আমায় ছেড়ে দিলেই তো হয়। আমি আরো কিছু টাকা দিতেও প্রস্তুত আছি।

(শরৎবাবু, নিত্যানন্দ, রাজেন, সতীশ ও দেওয়ানের প্রবেশ)

নিতাই। ঐ দেখুন, আপনার প্রজার অবস্থা, তার উপরে বানিয়ার অত্যাচার!

শরৎ। এই কি আমার বানিয়াজোয়ার? যার খেয়ে আমি মানুষ?

নিতাই। এর উপরে আবার দেওয়ান দলিলে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ লিখে নিয়েছেন।

রাজেন। উপযুক্ত কর্মচারী বটে, ওকেও সর্বস্বান্ত করে ঐ চাষার দলে পরিণত করলে এ পাতকের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হয়।

শরৎ। অপেক্ষা কর রাজেন, আমায় ভাল করে দেখতে দাও। আমাকেও আজ প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে; প্রজা সুখে আছে কি দুঃখে আছে এ চিন্তা তো ভুলেও কখনো করি নি, তাই আমি অপরাধী!

রাজেন। শুধু আপনি নন, বাংলার সকল জমিদারই প্রজার কাছে অপরাধী। একদিন সকলেরই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কারো কারো প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভও হয়েছে।

শরৎ। আমার প্রজার সম্পত্তিতে বানিয়া ক্রোক এনেছে কেন? এরা দেশের কে?

সতীশ। এই বানিয়া জাতিই বর্তমানে বাংলা গ্রাস করে বসেছে। এদের হাত থেকে কারোই নিস্তার নেই; এরা এখন শুধু বণিক নয়, জমিদার হতে চলেছে। নদীয়ার ভেতরে এরা দু'তিনখানা জমিদারী কিনেও ফেলেছে। আস্তে আস্তে বাংলার সকল জমিদারই এদের হাতে বিকোতে বাধ্য হবেন। শুনতে পাই, বাংলার অনেক জমিদারই এদের কাছে দেনাদার হয়ে পড়েছেন।

শরৎ। আমি তো আর দেনাদার হই নি? ওরা আমার এখানে কেন?

রাজেন। এ দেওয়ান মহাশয়ের কর্ম, ইনিই এদের এখানে এনে বাজার মিলিয়েছেন। এরা একজন নয়, বানিয়াজোয়ারময় এই বানিযার দল। বর্তমানে এরাই তো দেশের জমিদার, আপনি তো খাজনা পান মাত্র।

সতীশ। গত বছর এ অজন্মার দিনেও এরা এখান থেকে এক লক্ষ মণ ধান চালান দিযেছে।

শরৎ। দেওয়ান, তুমি এব কি জবাব দিতে চাও?

দেওয়ান। এরা হুজুরে যথেষ্ট টাকা নজর দিযে জমি পত্তন নিয়েছে।

শরৎ। কার হুকুমে তুমি বিদেশী লোকের কাছে জমি পত্তন করলে?

দেওয়ান। আজ্ঞে, এরা—অ্যা, অ্যা—

রাজেন। নিমকহারাম।

নিতাই। রাজেন, স্থির হও, টাকায মানুষে সবই করতে পারে। ইনিও নজরানা কম পান নি।

শরৎ। নিতাই, তুমি এখন কি করতে বলো?

সতীশ। সবটা শুনে নিন্। এই বানিয়ার দল চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ লিখে, জমি রেহাণ রেখে, অনেকের জমিই এরা হাতে এনেছে। শস্য জন্মাবার পূর্বেই এরা কৃষকদের দাদন করে। তাই অতি কম টাকায় এরা কৃষকদের থেকে শস্য খরিদ করে নেয। পরে কলকাতা চালান করে, অর্থাৎ বিদেশের জাহাজে ওঠে, তাই তো দেশে দুর্ভিক্ষ হয়।

শরৎ। এখন উপায়?

নিতাই। উপায় হচ্ছে, প্রত্যেক ডিহি কাছারীতে Estate থেকে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করে দেওয়া। প্রজাদের বলে দিতে হবে, তাদের যখন

যার টাকার প্রয়োজন, তা যেন ঐ ব্যাঙ্ক থেকে নেয়। দাদন করে ঐ বানিয়াদের মত শস্যগুলি সব হাতে করা। সর্বসাধারণকে জানিয়ে দিতে হবে, বানিয়াদের কাছ থেকে কেউ টাকা ধার না নেয়, ওদের কাছে কেউ শস্য বিক্রী না করে। তা হলেই তারা আস্তে আস্তে দেশ থেকে সরে পড়বে। তা না হলে ওদের সরাবার আর কোন পথ আমি দেখতে পাচ্ছি না।

শরৎ। উত্তম পরামর্শ বটে !

রাজেন। যে টাকার খৎ নেওয়া হয়েছে তার কি করা যাবে ?

শরৎ। হ্যাঁ, দেওয়ান তুমি সে দলিলগুলি সব নিয়ে এসো।

(দেওয়ানের প্রস্থান)

শরৎ। আমি একেবারে অবাক হয়েছি।

সতীশ। আপনি সময় থাকতে টের পেয়েছেন। তা না হলে আপনারও বানিয়ার হাতে বিকাতে হতো। বাংলার জমিদারগণ কর্মচারীর হাতেই থান, নিজেরা অলস, কিছুই দেখেন না। তাই তো আজ সকল জমিদারেরই ভেতরে ভেতরে একটা হাহাকার চলেছে।

রাজেন। মোকদ্দমার সংখ্যাও প্রত্যেক জমিদারের সরকারে বেড়ে গেছে বলে শোনা যাচ্ছে।

নিতাই। বেড়েছে কি একটু ? সেদিন বরিশালের কোন ভদ্রলোক বললেন, কোন এক জমিদারের ষোল হাজার টাকার মহলে এক বছরে বিশ হাজার টাকা মোকদ্দমা খরচই হয়েছে।

শরৎ। এ ব্যাপারটা কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না।

নিতাই। জমিদারদের প্রজা সম্বন্ধে ঔদাসীন্য। তার পরে মোকদ্দমা না বাধলে কর্মচারীদেরই বা পেট চলে কি করে ? যে টাকা তাদের মাইনে দেওয়া হয়, তাতে তাদের সংসার চলে না। ওদের মাইনে কিছু বাড়িয়ে দিলে বোধ হয়, মোকদ্দমার সংখ্যাও কিছু কমে যায়।

রাজেন। প্রত্যেক জমিদারেরই এদিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

সতীশ। তা না হলে কোন জমিদার বাংলায় দাঁড়াতে পারবেন না। প্রজার সাথে মোকদ্দমা করে আজ পর্যন্ত কোন জমিদারই জয়ী হতে পারেন নি।

শরৎ। এর কি কোন প্রতিকার হতে পারে না ?

নিতাই। সহজ পন্থাই হচ্ছে, যখন কোন মহলে গোল বাধে, তখন সেখানে কর্মচারীদের না পাঠিয়ে জমিদারের নিজে গিয়ে প্রজাদের সাথে আপোষ করে ফেলা।

শরৎ। জমিদার নিজে গেলেই কি গোল মিটে যায় ?

নিতাই। নিশ্চয় ! প্রজারা মনিবকেই চায়। আপনারা প্রজাদের থেকে যতই দূরে থাকবেন, তারাও দিন দিন ততই পর পর হয়ে পড়বে।

(দেওয়ানের খৎ নিয়ে প্রবেশ)

শরৎ। নিতাই, কি করতে হবে ?

রাজেন। আমার হাতে দিন। (খৎ নিয়ে ছিঁড়ে ফেলা) ভাই সকল, আজ থেকে তোমরা মুক্ত।

প্রজাগণ। কর্তার জয় হউক, কর্তার জয় হউক ! মনিব নয় তো আমাদের বাপ !

শরৎ। বেশ করেছিস রাজেন ! আমারও ঐ ইচ্ছাই ছিল।

(গীত)

নিতাই। সাধে কি বলি—

মায়ের নাম নিয়ে ভাসান তরী
যেদিন ডুবে যাবে রে।
সেদিন রবি চন্দ্র ধ্রুব তারা
তারাও ডুবে যাবে রে॥
নব ভাবের নবীন তরী
মাকেই করেছি কাণ্ডারী।
হউক না কেন তুফান ভারী
আর কি তরী ডোবে রে॥
বহুদিন পরে আবার
মরা গাঙ্গে পেয়ে জোয়ার।
জোয়ারে ধরেছি পাড়ি
আর কি পাড়ি ঠেকে রে॥
মুকুন্দদাসে ভণে
উজানেও ভয় করি নে।
মায়ের নামের বাদাম টেনে
উজান ধরে যাবো রে॥

শরৎ। দারোয়ান, এদের যেতে দাও। কাছারী থেকে তোমরা টাকা নিয়ে যেও। দেওয়ান, আমি তোমায় চাকুরী থেকে অবসর দিলাম।

নিতাই। ছেলেদের জন্যও চারটি বিদ্যালয় করতে হবে। কৃষক ছেলেরা সকলেই যাতে একটু লেখাপড়া শিখতে পাবে, সেদিকেও আমাদের লক্ষ্য রাখা প্রযোজন। সর্বসাধারণের ভেতরে শিক্ষা বিস্তার করাই হচ্ছে বর্তমানে সবচেয়ে বড় কাজ।

রাজেন। তা তো করতেই হবে। পল্লী-সংস্কার করতে হলে শিক্ষা বিস্তাবই হচ্ছে তার একটা মস্ত বড় দিক।

নিতাই। চারটি করতে হবে ধর্মসভা, প্রত্যেক গৃহস্থকে বলে দিতে হবে, সন্ধ্যার পরে সকলে যেন ঐ সভায় উপস্থিত থাকেন। চারটি বক্তা আমাদের নিযুক্ত করতে হবে, তারা ধর্মোপদেশের সঙ্গে সঙ্গে দেশের বর্তমান অবস্থা এবং অন্যান্য দেশের ইতিহাস তাদেব শোনাবে।

রাজেন। এতে কি উপকার হবে মনে করেন ?

নিতাই। আমার একজন জাপানী বন্ধু আমায় বলেছিলেন, তাঁরা এভাবে ধর্মসভা করেই সর্বসাধারণের ভিতরে জাতীয় ভাবটাকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। বর্তমানেও তাঁদের দেশে এমন ধর্মসভা আছে।

শবৎ। সুন্দর প্রস্তাব, দেশের কথা সর্বসাধারণের ভেতরে প্রচার করার এ অতি প্রশস্ত পথই বটে। তবে অনেক জমিদারেরই বিশ্বাস লেখাপড়া শিখলেই প্রজাবা মনিবকে মানতে চায় না।

নিতাই। ঐটেই হচ্ছে জমিদাবের মস্ত বড ভুল। প্রজা শিক্ষিত হলে যে মনিবেরই যথেষ্ট লাভ। কারণ, শিক্ষায মানুষের দায়িত্বজ্ঞান জন্মায়; খাজনা তহশীলেব জন্যও তখন এত কর্মচারীর প্রয়োজন হয না। তবে শিক্ষা পেলে মানুষকে দাবিয়ে কাজ করাব সুবিধে থাকে না। তা নাই বা থাকলো, তাতে ক্ষতি কি ? আমি মানুষ, আমি কারো চেযে ছোট নই, এ জ্ঞানটা সকলের ভেতরে ফুটিযে তুলতে পারলেই তো আমাদেব সাধনা সিদ্ধ হবে। দেশের কল্যাণই যখন আপনার ব্রত, তখন যে পথে তা হতে পারে, সে পথই আপনি মুক্ত বাখতে বাধ্য।

শরৎ। তা তোমরা যা ভাল মনে কর, কবো। আমার প্রজা সব আনন্দে আছে এ জানতে পারলেই আমি তৃপ্ত হবো। ওদেব কল্যাণের

জন্ম অজস্র খরচ করতে রাজী আছি। আমি আজই রাজেন্দ্রপুরে যাব, তোমরা এ জায়গার কাজ শেষ করে এসো।

(প্রস্থান)

নিতাই। আমাকেও আজই যেতে হবে, মৌলবী আবদুল কাদের আমাদের কার্যে যোগ দিয়েছেন। তাঁকে দিয়েই আমি মুসলমানদের ভেতরে গঠনকার্য আরম্ভ করতে চাই।

রাজেন। তাঁর সাথে আমারও মাঝে মাঝে দেখা হয়, লোকটি বেশ মিষ্টি এবং স্বদেশ-প্রাণ।

নিতাই। রাজেন, আনন্দে ভরপুব হয়েই যাচ্ছি, মনে হয় আমাদের সুদিন অতি নিকটে। চলো ভাই, তোমবাও চলো, ঠাকুব তোমাদেব সাধনা অপূর্ণ বাথবেন না।

সেবকদের। (গীত)

জাগ রে ভাই সবে, স্মরিয়ে কেশবে,
জয় জয় ববে, কাঁপায়ে মেদিনী।
দুঃখ-নিশা মোদেব হল অবসান,
উদিত পূববে সুখ দিনমণি॥
এ নব উষাতে জাগিয়ে নিলে প্রাণ,
ঘুমাবে না কভু আর ভারত-সন্তান।
দেখিলে মায়েব দশা কেঁদে উঠিবে প্রাণ,
করম-সিন্ধু-নীরে ভাসা বে তরণী॥
জাগিল য়ুরোপ জাতি নবীন আলোকে,
জাগিল ক্ষুদ্র জাপান নবীন পুলকে॥
ভাবত জাগিলে এ নব আলোকে,
পলকে জিনিতে পাবে বে ধরণী॥
মুকুন্দদাসে কয় আর কারে করিস ভয়,
অভয়দায়িনী কুমিল্লায় দিয়াছেন অভয়;
বাজাও বিজয় ডঙ্কা কাঁপুক রে ধরণী॥

(সকলের প্রস্থান)

নবম দৃশ্য

স্থান—শিবরাম পণ্ডিতের বাড়ী।

(পণ্ডিত, নিতাই, নিত্যকালী, সেবক ও আবদুল কাদের)

পণ্ডিত। গিন্নি, নিতাইয়ের অসাধ্য কিছুই নেই। শরৎবাবুকেও মাতিয়ে তুলেছে।

নিত্যকালী। যে যে শক্তিশালী ও ভগবৎ-বিশ্বাসী, তা ওকে যেদিন দেখেছি, সেদিনই বুঝতে পেরেছি।

পণ্ডিত। সকলেই বলেন, এটা গঠন করার যুগ, নিতাই সে গঠনকার্যে প্রাণ ঢেলে দিয়েছে। পল্লী-সেবকরা তার কথায় প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে।

নিত্যকালী। তা দেবে বই কি! ওর গঠনকার্যের বিশেষত্বই এই যে, সে ভারতের পুরাতনকেই আবার নূতন করে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাই তার কথায় সকলে সাড়া দেয়।

পণ্ডিত। বর্তমান গঠন-কর্মীদের সকলেরই ঐ মত।

নিত্যকালী। কে বলে? গঠন-কর্মীদের ভেতরে মতানৈক্য যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কেউ কেউ সমাজকে ইউরোপের ছাঁচে ঢেলে গঠন করতে চাইছেন, কিন্তু নিতাইবাবু সমাজ গঠন করার জন্য ইউরোপ থেকে কিছুই আনতে প্রস্তুত নন। ভারত যা ছিল, সেই পুরাতন ভারতকেই আবার তিনি নূতন করে আনতে চান।

পণ্ডিত। বিদেশের যেটুকুন ভাল, তা আমাদের আনতেই হবে, তা না হলে চলবে কেন?

নিত্যকালী। সে বিদেশের জড়বিজ্ঞান আনতে সর্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু সমাজকে ইউরোপের ছাঁচে ঢেলে করতে সে একেবারেই অনিচ্ছুক। সে মুক্ত কণ্ঠেই বলে, সমাজ গঠন করতে বিদেশ থেকে আনবার মত আমাদের কিছুই নেই। কারণ সমাজ বলতে সে দেশে কিছুই নেই।

পণ্ডিত। সে দেশে সমাজ নাই। এ নিতাই বলে কি?

নিত্যকালী। ইউরোপের সমাজকে সে বলে উচ্ছৃঙ্খল সমাজ। শৃঙ্খল যে সমাজের নেই সে সমাজের ধ্বংস হবেই, সে জাতির পতনও অবশ্যম্ভাবী।

পণ্ডিত। আমাদের সমাজেরই বা শৃঙ্খলা কোথায়?

নিত্যকালী। বাঁধন একটু শিথিল হয়েছে বটে, কিন্তু ইউরোপের মতন ভারতবর্ষ তার জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারায় নি।

পণ্ডিত। এ কথা কি করে বলো?

নিত্যকালী। ইউরোপের দিকে চেয়ে দেখ না? ইটালী সেই ইটালী নেই, রোম সে রোম নেই, গ্রীস সে গ্রীস নেই, কিন্তু ভারতে যা ছিল এখনো ঠিক তাই আছে। ইহা সেই পুরাতন যুগের সমাজ-সংস্কারক বা ঋষিদের দূরদর্শিতার ফল। এত কষে বাঁধন না দিলে ভারতবর্ষও আজ ইউরোপের মতন নিজেকে হারিয়ে ফেলতো।

পণ্ডিত। নিতাই দেখছি তোমায়ও মাতিয়ে তুলেছে! আত্মবিশ্বাসী কর্মী বটে!

নিত্যকালী। কিছুদিন পরে তুমিও মেতে উঠবে। ঐ যে গান শোনা যাচ্ছে, বোধ হয় তিনি এসেছেন।

(নিতাইয়ের প্রবেশ ও গীত)

রক্তি পূরব দিক্ বিভাগে,
জাগে অরুণ তরুণ রাগে।
জাগে ধরণী নবানুরাগে, অরুণ-বরণী,
জাগ জাগ ব্রহ্মবিদ্যা জননী।
আয়াহি বরদে দেবী ওঁ,
ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনী॥
হাসি সুহাসি তামসি নাশি,
বিতরি বিশ্বে কিরণরাশি!
পূর্ব তোরণ হইতে বাহিয়া,
দিব্য আলোক-তরণী।
প্রথম জগতে প্রথম ঋষির
আহ্বানভূতা জননী॥

পণ্ডিত। কি ভায়া! আজ যে বড় আনন্দ দেখছি?

নিতাই। আনন্দ করবো না? আনন্দই যে আমার সাধনা।

পণ্ডিত। ভক্ত কি আনন্দেরই সাধনা করে?

নিতাই। আর কার সাধনা করবে? আনন্দই তো ভগবানের স্বরূপ। আনন্দের সাধনা যে করে, সেই তো প্রকৃত ভক্ত।

(সেবকের প্রবেশ)

সেবক। আপনি শীগগির চলুন, শীগগির চলুন!

নিতাই। কি হয়েছে?

সেবক। দামোদরবাবুর ছেলে সমিতিতে খবর দিয়েছে, তার মেয়েকে কাল সন্ধ্যার সময় কারা জোর করে নিয়ে গেছে।

নিতাই। খবর পেয়ে তোমরা কি করেছ?

সেবক। সেবকদের চারিদিকে অনুসন্ধান করতে পাঠিয়েছি, কেউ এখন পর্যন্ত ফেরে নি।

নিতাই। আচ্ছা তুমি যাও, আমি কিছু সময় পরে সমিতিতে যাবো। তুমি যাবার সময় সতীশকে খবর দিয়ে যাও।

(সেবকের প্রস্থান)

পণ্ডিত। নিতাই! গাঁয়ে আর থাকা পোষাচ্ছে না দেখছি! অমুকের স্ত্রীকে ঘর থেকে টেনে নিয়ে গেল, অমুকের বোনকে বেইজ্জৎ করল, দেশের এ হলো কি?

নিতাই। দুর্বলের যা হওয়া উচিত, তাই হচ্ছে।

পণ্ডিত। এ তুমি বলো কি?

নিতাই। সাধে কি আর বলি ভাই? দেশের কর্মীরা হয়েছেন সব বিশ্ব-প্রেমিক, প্রচার করছেন তাঁরা সত্যের বারতা। অথচ এদিকে যে বিশাল জাতিটা পড়ে রয়েছে তমঃ গুণেরও নীচের স্তরে সেইটে বোধ হয় তাঁরা ভাববার অবসর পান নি।

পণ্ডিত। তুমি যে ধান ভানতে রামের গীত সুরু করে দিলে!

নিতাই। তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে হলে ঐ রামের গীত যে আপনা থেকেই এসে পড়ে। আচ্ছা পণ্ডিতজী, বল তো সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, না তমঃ, রজঃ, সত্ত্ব!

পণ্ডিত! সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ।

নিতাই। কি করে হয়?

পণ্ডিত। পুরাকাল থেকে তো এ কথাই শুনে আসছি।

নিতাই। এ ত্রিগুণের কথা হতে পারে, কিন্তু ইহাই কি সোপান? মানুষ

কিন্তু সত্ত্ব পেরিয়ে রজঃতে আসে, না রজঃ পেরিয়ে সত্ত্বে যায়, এর কোন্‌টা বলতে চাও ?

পণ্ডিত। রজঃ পেরিয়েই সত্ত্বে যায়।

নিতাই। যদি তাই হয়, তবেই বলো তমঃ পেরিয়ে রজঃ, তারপরে সত্ত্ব !

পণ্ডিত। এ কথায় তুমি কি বোঝাতে চাও ?

নিতাই। এই বোঝাতে চাই যে, বিশাল জাতিটা পড়ে রয়েছে তমঃগুণেরও নীচের স্তরে।

পণ্ডিত। এ কথা তুমি কি করে বলো ?

নিতাই। কি করে বলি শুনবে ? তমঃগুণী যারা, তাদের ভেতরেও একটু স্পন্দন দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের যে সে স্পন্দনটুকুও নেই, আমরা যে একেবারে জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি ! তাই এ জাতির কাছে এখন সত্ত্বের বারতা প্রচার করায় কি সত্যের অপলাপ করা হচ্ছে না ?

পণ্ডিত। তা এক রকম হচ্ছে বই-কি !

নিত্যকালী। বই-কি কেন ? হচ্ছে বল না, ন্যাকা সাজো কেন ?

নিতাই। তাই তো বলি পণ্ডিতজী, এখন আমাদের রজঃগুণটিই জাগিয়ে তুলতে হবে, দেশময় এখন সেই আলোচনাই হওয়া উচিত। আমাদের দুর্দশা দেখেই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ওরে তোরা বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে কিছুদিন শিকেয় তুলে রাখ। যদি ভজনই করতে চাস, তবে কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণকে ডাক, জাতিটা একটু গা ঝাড়া দিয়ে উঠুক। যে জাতির ভাত জোটে তো ডাল জোটে না, ডাল জোটে তো ভাত জোটে না, তার কাছে প্রেমের কথা বলায় কোন ফল হবে কি ? রজঃগুণের কথা বলো, জাতিটা উঠে দাঁড়াক। পেট ভরে খাক, খেতে পারলেই গায়ে একটু বল পাবে। তখন তার মা-বোনের ইজ্জৎ বাঁচাবার জন্য তাকে সংবাদপত্রে চোখের জল ফেলতে হবে না। মনে রেখো, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা দুর্বলের জন্য নয়, তাই তো আমি ঠাকুরকে বলি—

(গীত)

ঠাকুর, বাজাও তোমার বিজয়-শঙ্খ,
উদ্যত কর খড়্গ।

প্রলয়-পেষণে কর বিচূর্ণ,

পাপ-দনুজ-বর্গ ॥

ভ্রূকুটী-কুটিল করাল ভীম ভৈরব ভয়াল,

রাজ সমারোহে এস মহারাজ

কাঁপায়ে মর্ত স্বর্গ ॥

নমঃ নমঃ নমঃ বিকট ভীষণতম,

এস বজ্র-নিনাদে রথ-ঘর্ঘরে

কাঁপায়ে মর্ত স্বর্গ ॥

পণ্ডিত। তোমার কথাগুলি খুবই মূল্যবান। বিশেষভাবে এ কথা জনসমাজে প্রচার করা প্রযোজন। হিন্দু-মুসলমানের যাতে মিলন হয়, সেজন্য কত সভা কত বক্তৃতা হচ্ছে, কিন্তু তথাপি দেশের এই অবস্থা—এ বড়ই লজ্জার কথা কিন্তু!

নিতাই। পণ্ডিতজী! দুর্বলে সবলে কখনো বন্ধুত্ব হয় কি? কাগজে লেখাপড়া করেও মিলনের সম্ভাবনা নেই। মিলন হবে শক্তির ভিতর দিয়ে। হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই যেদিন শক্তিশালী হয়ে উঠবে, সেদিনই হবে প্রকৃত মিলন। শক্তির ভিতর দিয়েই সে মিলন আসবে। আমি ভারতে সে মিলনই দেখতে চাই।

(আবদুল কাদেরের প্রবেশ)

নিতাই। এই যে আবদুল কাদের এসেছে!

আবদুল। আদাব—আদাব!

নিতাই। আদাব। তোমার কথা বার বার মনে পড়ছিল। তোমার কাজ কেমন চলছে?

আবদুল। গ্রাম্য মৌলবীরা সব কাজ পণ্ড করে দিচ্ছে। বোধ হয় শীঘ্রই হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ বাধবে।

নিতাই। নূতন করে আর বাধবে কি, বেধেই তো আছে। আমি অনেক দিনই বলেছি, তোমাদের আ, লে, বে পড়া মৌলবী আর আমাদের ভট্টাচার্যি পুরোহিতের দল থাকতে দুই জাতির মিলন হবে না। মৌলবীরা বলেন কি?

আবদুল। হিন্দু-মুসলমানের যাতে মিলন হয়, গরু যাতে কোরবানী না হয়, সেজন্য আমি অনেক স্থানে বক্তৃতা করেছিলাম, কিন্তু মৌলবীরা

তার ঘোর প্রতিবাদ করলেন। বললেন যে, এতে কোরাণের সম্মান ক্ষুণ্ণ করা হয়। চাষা লোক তাদের কথাই মেনে নিলে।

নিতাই। তুমিও যে একজন মৌলবী, ইংরেজী পড়ুয়া, এ কথা তাদের কাছে বলেছিলে কি?

আবদুল। না, সে কথা তো বলিনি!

নিতাই। ঐটেই মস্তবড় ভুল করেছ। আবার কোথাও বক্তৃতা করতে গেলে ও কথাটা বলে নিও, ডিগ্রীর সম্মান এ দেশে যথেষ্ট আছে, চিরদিন থাকবেও।

পণ্ডিত। ক্ষেত্র মতন ব্যবস্থা করাই যুক্তিযুক্ত।

নিতাই। তারপরে কোরবানী শুধু বক্তৃতায়ই বন্ধ হবে না। গো-মাতা জিনিসটা কি, তার প্রয়োজনীয়তা কত, সে কথা কৃষকদের খুব ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

আবদুল। কি করতে হবে বলে দিন! আমি সর্বসাধারণের ভিতরে সে কথা বিশেষভাবে প্রচার করবো।

নিতাই। কোরবানীর জন্য যে শুধু মুসলমানই দায়ী তা নয, হিন্দুরাও এজন্য যথেষ্ট দায়ী। বাংলার হিন্দু জমিদারের প্রত্যেকেরই গোচারণ-ভূমি ছিল। মায়ের মুখের গ্রাস কেড়ে নিযে সে সকল জমিতে এখন প্রজা পত্তন করে জমিদারীর আয় বৃদ্ধি করেছেন। তাই কৃষক এখন আর মায়ের আহার যোগাতে পারছে না। পশ্চিম বাংলায় তো অনেক হিন্দু কসাইদের কাছেই গরু বিক্রী করেন। তাঁদেরও সতর্ক করে দেবে, তাঁরা যেন কসাইদের কাছে গরু বিক্রী না করেন। কসাইদের কাছে গরু বিক্রী করাও যা, কোরবানী করাও ঠিক তাই।

পণ্ডিত। এইটে কিন্তু আমি জানতুম না।

নিতাই। "There are many things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy" দেশের অনেক খবরই অনেকে রাখেন না। যাক, যা বলতে যাচ্ছিলাম। বক্তৃতার সময় আমাদের দেশের সাথে ইউরোপের একটু তুলনা করে দেখিয়ে দিও।

আবদুল। কি বলতে হবে বলে দিন!

নিতাই। আমি একটা হিসাব তোমায় বলে দিচ্ছি, সর্বসাধারণকে শুনিয়ে দিও, তা হলেই তাদের একটু চৈতন্য হবে।

আবদুল। আমি আনন্দের সহিত প্রচার করবো ; আমায় ভাল করে বুঝিয়ে দিন।

নিতাই। ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান স্থান, তাই গরুই এ দেশের প্রাণ। এ দেশে পূর্বে শতকরা তিন শ' গাভী ছিল, এখন আমাদের দেশ থেকে ইউরোপে গাভীর সংখ্যা অনেক বেশী। ভারতের শক্তিহীনতার এবং পতনের এও একটা মস্তবড় দিক। কারণ, কথায় বলে পেটে না খেলে পিঠে সয় না। আমরা পুষ্টিকর খাদ্য কি এখন আর কিছু পাই, না কি কিনে খাবার মত পয়সা আমাদের আছে? তাই দুর্বল হয়ে গেছে প্রাণ ; শক্তিহীন হয়ে গেছে জাতি। অষ্ট্রেলিয়ায় শতকরা ১৬০টি গাভী, নিউজিল্যাণ্ডে ১৫০, কেপ-কলোনীতে ১২০, জেনেভায় ৮০, আমেরিকায় ৭৯, ডেনমার্কে ৫০, বর্তমানে ভারতবর্ষেও তিন শ'-এর স্থলে ৫০-এ এসে দাঁড়িয়েছে, এখন ভেবে দেখো আমরা মরণের কোন্ প্রান্তসীমায় এসে দাঁড়িয়েছি!

আবদুল। ইয়া আল্লা!

পণ্ডিত। নিতাই, আমার মাথা ঘুরছে।

নিতাই। পণ্ডিতজী, গো-মাতাই হচ্ছে শক্তির উৎস, অথচ সে মায়ের দিকে আমাদের কারোরই লক্ষ্য নেই। আমাদের পতন কি অবশ্যম্ভাবী নয়?

আবদুল। আমি ভাবতে পারি না, আমাদের ভবিষ্যৎ কি?

নিতাই। ভবিষ্যৎ অন্ধকার! যদি উজ্জ্বল করতে চাও, তবে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিকে গো-মাতার দিকে লক্ষ্য করতে বলো। ভাই ভাই দ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে উভয়ে গলাগলি হও। নিজের স্বার্থ নিজেরা বুঝে নিয়ে একটা বিরাট জাতিসঙ্ঘ গড়ে তোল, ছাড়ুক তারা মিলিতকণ্ঠে হুঙ্কার, জগৎ জুড়ে উঠুক একটা কম্পন, জগৎ বিস্মিত হউক, দেখে এই ত্রিশকোটী নর-নারীর স্বদেশপ্রেম।

আবদুল। নেতারা বলেন, হিন্দু-মুসলমানে মিলন না হলে কিছুই হবে না। সে মিলন কি হবে মনে করেন?

নিতাই। তুমি আসার পূর্বে আমাদের এ সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। জগতে অসম্ভব কিছুই নেই, সবই হতে পারে। তবে মিলন শুধু বক্তৃতায় হবে না, মিলন হবে শক্তিতে শক্তিতে। আমাদের উভয় জাতির ভিতরে এমন কয়েকজন সন্তান চাই, যাদের কর্মই হবে উভয়

জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে তোলা। তখন ঐ শক্তির ভিতর দিয়ে যে মিলন হবে, সে মিলনই হবে মধুর।

আবদুল। আমারও মনে হয় তাই। দুর্বলে সবলে বন্ধুত্ব হলেও সে ক্ষণস্থায়ী। আচ্ছা, আমি এখন যাই, আপনার আদেশ বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করতে চেষ্টা করবো।

নিতাই। ভয় কি? উপরে খোদা আছেন। (আবদুলের প্রস্থান)

পণ্ডিত। বেশ ছেলেটি তো!

নিতাই। ভাল-মন্দ সকল জাতির ভিতরেই আছে। আমি একে দিয়েই মুসলমান সমাজে গঠনকার্য আরম্ভ করেছি। তার কথা তার মুখেই মানায় ভালো। আচ্ছা, আমি এখন যাই, সন্ন্যাসীর কাছে যেতে হবে। (প্রস্থান)

নিত্যকালী। দেখলে তো ওর কার্যের ধারা?

পণ্ডিত। নিতাই-ই আমাদের দেশ উজ্জ্বল করবে। আশীর্বাদ করছি, মা ওর সাধনা পূর্ণ করুন। (উভয়ের প্রস্থান)

দশম দৃশ্য

স্থান সতীশের বাড়ী।

(সতীশ, গোপীনাথ, সেবক)

গোপী। সতীশ বাড়ী আছ? সতীশ!

সতীশ। কে, গোপী! এত রাত্রে কি মনে করে?

গোপী। জরুরী কিছু না থাকলে কি আর গোপী শর্মা এত রাত্রে বেরয়?

সতীশ। গিন্নীর কোন অসুখ হয় নি তো?

গোপী। হ্যাঁ—সে অসুখের জন্য কি আর আমি ভাবি? আর এত সোহাগও আমার নেই।

সতীশ। থাকবে কি করে? পুনার মাকে যেদিন থেকে সেবাদাসী করেছ, সেদিন থেকে বোধ হয় সোহাগ কমে গেছে, তা না হলে পূর্বে তো সোহাগ কম দেখি নি! আচ্ছা গোপী, ঐ বিধবাটার সর্বনাশ করে নরকের দ্বার পরিষ্কার করলে কেন? আর এই সুন্দর পল্লীটাকেই বা উচ্ছন্নে দিতে বসেছ কেন, বলতে পারো?

গোপী। এ কথা তোমায় কে বললে যে, আমি পুনার মার সর্বনাশ করেছি? বরং সে-ই আমার একশ' টাকা নিয়ে আর দিলে না।

সতীশ। দিলে না কি? তার স্বামীর শ্রাদ্ধের সময় সে তার ভিটে-বাড়ী মর্টগেজ রেখে টাকা ধার নেয়। টাকার দায়ে তার বাড়ীখানা নিয়ে নিয়েছ! সে এখন পরের বাড়ীতে দাসীপনা করে খায়।

গোপী। সে বাড়ীখানা যে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি, তা বুঝি শোন নি? কেবল দোষটাই দেখো!

সতীশ। কথা বাড়িও না, অনেক শুনতে হবে। আমি এ গাঁয়ের সব খবর রাখি এবং যার যা কথা তা সবই আমি শুনি। কৃপা করে তাকে বাড়ী ফিরিয়ে দাও নি, তার সতীত্বের বিনিময়ে হতভাগিনী বাড়ী ফিরে পেয়েছে।

গোপী। তুমি দেখছি আমায় রীতিমত আক্রমণ করতে আরম্ভ করলে, সতীশ! এত বাড়াবাড়ি ভাল মনে হয় না।

সতীশ। আক্রমণ তোমায় মোটেই করি নি, তা হলে তুমি এতক্ষণ মাটির সাথে মিশে যেতে। আমার কানে আজই এ কথা এসেছে, তা না হলে এতদিনে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে ফেলতাম। যাক, তোমার সাথে কথা কইতেও এখন আমার ঘৃণা বোধ হয়। আমি তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি, ভবিষ্যতের জন্য তুমি সতর্ক হও। আমি বর্তমানে পল্লী-সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করেছি। পল্লী-সংস্কার করাই এখন আমার জীবনের লক্ষ্য। পিশাচের তাণ্ডব-নৃত্য এ পল্লীতে আর হতেই পারবে না।

গোপী। বটে! আচ্ছা, আমি চললুম। মনে রেখো, আমি তোমার ভাতে-কাপড়ে নই। আমার যা খুশী তাই করবো, তোমার শক্তি থাকে তো তুমি আমার বিরুদ্ধাচরণ করো।

সতীশ। উত্তম, তোমার-যা খুশী তাই তুমি করে যাও! বাবা কয়েকটা টাকা রেখে গেছেন, তার গরমাই ধরেছে বুঝি? পুনঃপুনঃ তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি, কোন ত্রুটি পেলে হাড় ক'খানাও থাকবে না!

গোপী। এতদূর? আচ্ছা, দেখা যাবে! (প্রস্থান)

(সেবকদের প্রবেশ)

১ম সেবক। কত জায়গা অনুসন্ধান করলুম, কিন্তু মেয়েটার কোন খোঁজই পাচ্ছি না।

সতীশ। কোন খোঁজই পেলে না? কোথায় কোথায় খুঁজলে?

২য় সেবক। এ পল্লী তো তন্ন তন্ন করা হয়েছেই, আশেপাশের পল্লীগুলিও খোঁজ করা হয়েছে।

সতীশ। আমার মনে হয় এ গাঁয়েই কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে আছে। এ কোন গরীব লোকের দ্বারা হয় নি। গ্রামের যারা অর্থশালী লোক তারাই অত্যাচারী অনেক বেশী।

১ম সেবক। মেয়েটার মা বললেন গোপীবাবু মাঝে মাঝে সে বাড়ীতে যেয়ে আড্ডা মারেন।

সতীশ। বটে! তবে আর যায় কোথায? এইমাত্র যে বদমাযেসটা আমার কাছে এসেছিল। এই দিকেই গেছে, ওকে follow করো, দেখো কোথায় যায়! এত রাত্রে যখন বেরিয়েছে, তখন নিশ্চয়ই কোন মতলব আছে। আর বিলম্ব করা ঠিক নয়, এসো, আমরা বেরিয়ে পড়ি। (সকলের প্রস্থান)

একাদশ দৃশ্য

স্থান—গোপীবাবুর বাসা বাড়ী।

(গোপী, ঊর্মিলা, সেবকগণ ও সতীশ)

ঊর্মিলা। গোপীবাবু, আজ তিন-চারদিন আমায ধরে এনেছেন, এখন আমায় ত্যাগ করুন, আমার সর্বনাশ করবেন না। আমার বাপ-দাদার নাম কলঙ্কিত করবেন না।

গোপী। শিকার পেয়ে বাঘ কথনো শিকার ছেড়ে দেয়? তোমার জন্য যে আমায় অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে ঊর্মিলা। তোমায় যেদিন দেখেছি, সেদিন থেকেই আমি আত্মহারা হযেছি। তুমি যা চাইবে আমি তোমায় তাই দিতে প্রস্তুত আছি, আমার কথা মত কাজ করো!

ঊর্মিলা। গোপীবাবু, আমি তোমার প্রলোভনে ভুলে যাবো, এত দুর্বল আমায় তুমি মনে করো না। আমি সতী আমার সম্মান আমি নিজেই রক্ষা করতে জানি।

গোপী। ও বীরত্ব এখন রেখে দাও, এখন তুমি আমার মুঠোর মধ্যে, এখন আমি তোমায় যা ইচ্ছা করতে পারি। এতদিন তোমায় বুঝিযে দেখলুম, যখন তুমি কিছুতেই আমায় গ্রহণ করতে প্রস্তুত

হচ্ছ না, তখন আমি জোর করে যা হয় করবো। দেখি তোমায় কে রক্ষা করে?

উর্মিলা। চন্দ্র-সূর্য যখন এখনো পূর্বের মতই উদিত হচ্ছেন, তখন নিশ্চয়ই ভগবান আছেন। তোমার যা খুশী তুমি করতে পারো, কিন্তু মনে রেখো, ভগবানই সতীর মান রক্ষা করবেন।

(উর্মিলাকে ধরতে যাওয়া)

উর্মিলা। হা ভগবান! (মূর্চ্ছা)

(সতীশ ও সেবকগণের প্রবেশ)

সতীশ। মাভৈঃ মাভৈঃ, ভয় নেই মা—সতীর মান ভগবানই রক্ষা করেন। সেবকগণ, কুকুরকে এমনভাবে পিটাবে যেন কিছুদিন স্মরণ থাকে যে, এই কর্মের এই ফল।

(সেবকগণের গোপীকে প্রহার)

সতীশ। কি হে, তোমায় যে সতর্ক করেছিলাম, তা আজই ভুলে গেছ? এখন তোমায় কে রক্ষা করে?

গোপী। সতীশ, আমি তোমার বাল্যবন্ধু। আমায় ক্ষমা করো, আমায় আর মেরো না! আমি আর কখনো এমন কাজ করবো না।

সতীশ। আমাদের গাঁয়ে তুমিই একটি কুলাঙ্গার জন্মেছ, তোমায় আজ এমন করে তৈরী করে দিতে হবে, যেন ভবিষ্যতে আর কখনো এমন জঘন্য কার্যে হাত না দাও। কুলাঙ্গার! ভদ্রবংশে জন্ম নিয়ে বাপ-দাদার নাম কলঙ্কিত করতে বসেছ? তোমার ক্ষমা নেই।

গোপী। আজ তোমরা আমায় ছেড়ে দাও! প্রতিজ্ঞা করছি আর কখনো এমন কাজ করবো না।

সতীশ। তোমার প্রায়শ্চিত্ত এখনো হয়নি!—মা ওঠ! আর ভয় নেই, ভগবানই তোমায় রক্ষা করেছেন। পিশাচ! মায়ের চরণ ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করে বিদায় নাও। ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হও, মনে রেখো, আবার কখনো এমন কাজ করলে তোমার প্রাণ নিতেও আমি কুণ্ঠা বোধ করবো না।

গোপী। (উর্মিলার পায়ে ধরে) মা, আমার অপরাধ ক্ষমা করো!

সতীশ। সেবকগণ, কুলাঙ্গারকে যেতে দাও। (গোপীর প্রস্থান)

উর্মিলা। আপনারা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনারা দেবতা, আমায় বাড়ীতে পৌছিয়ে দিন।

সতীশ। সেবকগণ, তোমরা একে বাড়ীতে দিয়ে এসো। এর বাবা-মাকে বলো, এ নিয়ে সমাজে এখন কিছু কিছু আলোচনা হচ্ছে, বোধ হয় কর্তারা কেউ কেউ এদের সমাজচ্যুত করবারও পরামর্শ করছেন। তাঁরা যেন সে আন্দোলনে ভীত না হন। তাঁর মেয়ে যে সতী সে প্রমাণ আমরাই করবো। আমি নেতার কাছে যাচ্ছি, তিনি বোধ হয় খুবই ব্যস্ত আছেন। এ সংবাদে তিনি খুবই প্রীত হবেন, সন্দেহ নেই। (সকলের প্রস্থান)

দ্বাদশ দৃশ্য

স্থান—আনন্দময়ীর বাড়ী।

(নিতাই, রাজেন, সতীশ ও সেবকগণ)

নিতাই। আজ তোমরা কি কাজ করেছ ?

১ম সেবক। বড়াইল গ্রামের জলাশয়গুলি সব পরিষ্কার করে দিয়ে এলুম। আর জঙ্গলগুলি সব আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছি।

২য় সেবক। মায়ের অবস্থা দেখলে দুঃখ হয়, কারো ঘরেই কিছু নেই, ভিতরে ভিতরে একটা হাহাকার চলেছে; দু'বেলা ভাত অনেকেরই জোটে না, ভদ্র অভদ্র সব সমান হয়ে উঠেছে।

নিতাই। এর কারণ কিছু নির্দেশ করতে পেরেছ কি ?

সতীশ। অলসতাই এর প্রধান কারণ বলে আমার মনে হয়।

নিতাই। আমারও মনে হয় তাই। কাজ দেশে অনেকই আছে, সে কাজ করে পেট ভরাচ্ছে অন্য দেশী লোক। আমরা করছি উপোস; চোখ থাকতে আমরা অন্ধ।

(রাজেনের প্রবেশ)

নিতাই। এসো ভায়া ! ছেলেদের কাছে পল্লীর অবস্থাটা শোন।

রাজেন। শুনবো আর কি ? নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি। এখন কি উপায় অবলম্বন করলে জাতটা বাঁচে, তাই বলুন !

নিতাই। উপায় বলে দেওয়া সহজ, কিন্তু সে পথে কি কেউ চলবে মনে করো ?

সতীশ। বলুন, চেষ্টা করে দেখবো।

নিতাই। কর্ম, কর্ম, কর্ম।

রাজেন। কি কাজে লাগতে বলেন? কাজ কি এখন দেশে আছে?

নিতাই। ঐ জায়গায়ই তো আমাদের মস্তবড় ভুল। বাংলা দেশে কাজের অভাব কি? তবে বলবে যে, ওটা আমাদের চোখে পড়েও পড়ে না। কারণ, তাতে রাতারাতি বড় মানুষ হওয়া যায় না। কেউ কখনো রাতারাতি বড় মানুষ হতেও পারে নি। যাঁরা বর্তমানে আমাদের দেশে ধনী বলে পরিচিত, তাঁরা পূর্বে সকলেই আমাদের মতন গরীব ছিলেন। অক্লান্ত পরিশ্রম আর অধ্যবসায়ের বলেই আজ তাঁরা অর্থশালী হয়েছেন। আমাদের যে ও দুটিরই অভাব। তা না হলে আজ আমাদেরই বাংলা, অথচ তা লুটে নিচ্ছে মারোয়াড়ী, ভাটীয়া, দিল্লীওয়ালা, ইংরেজ। কুলী মজুর সব উড়ে, বাসার চাকর বামুনও উড়ে। ত্রিশ টাকার চাকুরীর জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলছ কেন? যাও না, ঐ নারায়ণগঞ্জের ঘাটে গিয়ে কুলীর কাজ করো না কেন, মাসে পঞ্চাশ-ষাট টাকা পাবে! কারো তোষামুদীর প্রয়োজন হবে না। কেউ যাবে কি? মান খসে যাবে! এ কথা বল তো লাঠি নিয়ে মারতে আসবে। ভিক্ষায় মান যায় না, কাজ করে খাবে তাতে মান যাবে। এ জাতির কল্যাণ নেই, কল্যাণ হতে পারে না।

রাজেন। সকলে বলেন—বাঙ্গালী বুদ্ধির ক্ষেত্রে সকলের অগ্রণী, কিন্তু বুদ্ধির তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না!

নিতাই। দেখবে কি! একমাত্র অন্ন-সমস্যার সমাধান করতে না পেরে বাঙ্গালী আজ মরতে বসেছে।

সতীশ। এই ধ্বংসোন্মুখ জাতিটাকে বাঁচাবার কি কোন পথই নেই?

নিতাই। থাকবে না কেন, অভিমানী হয়ে গেছে জাতি, বিলাসে ব্যসনে হয়ে গেছে আত্মহারা, নাম নিয়েছে "বাবু"। যদি এ জাতিকে বাঁচাতে চাও তবে অভিমানকে পদদলিত করে যে যে কাজের যোগ্য তাকে সে কাজে লেগে যেতে বলো।

রাজেন। হ্যাঁ, ইহাই একমাত্র পথ বটে।

নিতাই। রাজেন, কি বলবো দুঃখের কথা, আজ বাঙ্গালী সকল ব্যবসা-বাণিজ্য হতে বিতাড়িত। তার কারণ সে সততা হারিয়েছে, যেটা বাঙ্গালী জাতির বিশেষত্ব ছিল। কলকাতার দিকে চেয়ে দেখো, বাঙ্গালী ধুতি-চাদরে বাবু, কেরানীর দল, টাকা দেয়। কিন্তু যারা

কুড়িয়ে নিচ্ছে তারা সবই বিদেশী। চৌতলায় বসে তারা বাঙ্গালীর দুর্দশা দেখে খিল্‌খিল্ করে হাসছে।—গরুর গাড়ীর গাড়োযানগুলি পর্যন্ত হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। আর দু'চার বছর পরে এ কলকাতায় তোমরা একটি বাঙ্গালীকেও দেখতে পাবে কিনা, সে বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ আছে।

সতীশ। এবার কলকাতার অবস্থা যা দেখে এলাম, তাতে মনে হয় তাই। খাবার দোকানগুলিও এখন আর বাঙ্গালীব নেই।

বাজেন। এখন উপায কি?

নিতাই। উপায়—মাযের পাযে।

(গীত)

মায়ের নামে বাদাম উড়িয়ে দে রে,
উজান বা'তে বাদাম চাই,
বাংলা-দরিযাব মাঝে,
বড় জোরের কোটাল পড়ছে ভাই।
এমন ভাঙ্গন লাগছে গাঙ্গে,
এপার ওপার দু'পার ভাঙ্গে,
তার উপবে কাল বোশেখিব,
ঘনঘটা দেখতে পাই।
হুঁশিয়ার থাকিস দমকা হাওয়ায,
তোদের পালের দড়ি ছিঁড়ে না যায,
লক্ষ্য রাখিস মাযেব চরণ,
ভয কি পারের ভাবনা নাই।
এই ঝড বাদলে নৌকা ছাড়ি,
জমিযে দিতে পারলে পাড়ি,
এই বাঙ্গালীর জয়ের সারি,
গাইবে জগৎ শুনবি তাই।

রাজেন। যা বললেন, তার প্রতি বর্ণই সত্য। আচ্ছা বলুন তো, বাংলার বর্তমান জাগরণ কি সত্য? যদি সত্য হয়, তবে মানুষ এমন হতাশ ভগ্নমনে বসে আছে কেন? যাঁরা সংগ্রাম করছেন, তাঁদের সাথে আত্মশক্তি নিয়োগ করে দুর্গম যা, তা সুগম ও সহজ করে তোলে না কেন?

নিতাই। জাগরণ যে সত্য, তাতে কোন সন্দেহ নেই রাজেন!

রাজেন। যদি তা-ই হয় তবে মানুষ উঠে দাঁড়ায় না কেন?

নিতাই। পথ কই? পথ তৈরী করে দেবেন নেতারা, কিন্তু তাঁরা কি তা করছেন? বক্তৃতা বা একটা কাঁচা আমির লড়াই হচ্ছে মাত্র। আন্দোলনের নামে আন্দোলন চলে যাচ্ছে, কিন্তু তাঁদের Constructive Work-এর Programme আজও All India Congress Committee-র File-এ ঘুমাচ্ছে। গঠনকার্য শুধু বক্তৃতায় হয় না, ক্ষেত্রে নামতে হয়।

সতীশ। দেশের বর্তমান অবস্থা যা দেখতে পাচ্ছি তাতে ভয় হয়। মস্ত বড় একটা দলাদলি আরম্ভ হয়ে গেছে।

নিতাই। হউক না, ও যত হবে ততই ভাল, ওতে একটা দলের পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে। কোন দলই ব্যর্থ নয় সতীশ! ভগবানের ইচ্ছায়ই যখন সব হচ্ছে, তখন এ দলাদলিরও একটা সার্থকতা আছে। তোমরা কারো ইঙ্গিত বা নিন্দে না করে যে পথ তোমাদের ভাল লাগে সেই পথেই চলতে থাকো।

রাজেন। মনকে বোঝাতে পারি কই?

নিতাই। ঐ তো দোষ! আমি শ্রেষ্ঠ, জাতির মুকুটমণি, কেন না আমার মতন কবি, আমার মতন সাহিত্যিক, আমার মতন নেতা, আমার মতন দেশপ্রেমিক কে আছে? এই অভিমানেই বাঙ্গালীর পতন। মনে রেখো, ভ্রান্তি নেই একজনের। মানুষ মাত্র সকলেরই ভ্রান্তি আছে, মানুষ অভ্রান্ত হতেই পারে না? অভিমানকে চূর্ণ করে দিতে না পারলে হাজার আন্দোলন করো না কেন, এদেশে মিলন আসবে না।

রাজেন। অভিমানেই যে আমাদের পতন তা স্বীকার করতে বাধ্য। এখন কি করে অভিমানকে চূর্ণ করবো, তাই বলে দিন, আমরা সে কথা প্রচার করি।

নিতাই। রাজেন! তুমি সমাজের মুকুটমণি হও, তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু যাঁরা তোমায় মুকুটমণি করেছেন, তাঁদের দিকে তাকাও কি? ঐ যে শ্রাবণের অজস্র বারিধারায় মাথা পেতে, এক হাঁটু কর্দমে দাঁড়িয়ে কৃষক বাংলার মাটি চষে আহার্য যোগাড় করে দিচ্ছেন তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁদের মহত্ত্বের কথা ভুলে যাও কেন?

সতীশ। ঐ জায়গায়ই তো আমাদের মস্তবড় ভুল হয়ে যাচ্ছে।

নিতাই। যদি ভুল বুঝে থাকো, সতীশ, তবে সে ভুল সংশোধন করায় চেষ্টা করো। নচেৎ জাতির কল্যাণ নেই, ইহা ধ্রুব সত্য। তাই ধনীদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে বলো—বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে অসংখ্য সংগ্রহকারীকে দারিদ্র্যতার কঠোর বন্ধনে নিবদ্ধ করে রেখো না; তাঁদের মুক্ত করে দাও, দেখবে তাঁদের মুক্তির সাথে সাথে তোমাদেরও সকল বন্ধন খসে পড়ে গেছে।

রাজেন। যা বললেন তা সত্য। প্রকৃতির নির্মম আঘাতে যখন চৈতন্য ফিরে পাই তখন চীৎকার করি, সাত কোটী ভাই-বোন এক করার রাগিণী আলাপ করি।

নিতাই। ও আলাপেই কি জাতি জাগবে? অহঙ্কারের দীপ্ত মুকুট মাথা থেকে খসিয়ে, জন-শক্তির স্কন্ধদেশ থেকে নেমে, তাঁদের সাথে পদব্রজে মহাতীর্থে ছুটে যেতে না পারলে এ জাতির উত্থান সুদূরপরাহত।

রাজেন। শ্রেষ্ঠ আমি, মহৎ আমি, নেতা আমি, আমার পায়ের ধূলায় অপরে কৃতার্থ হয়ে যায়; এ ভুল কি ভাঙ্গবে না? বাংলার সাধনা কি শুধু মন আর বুদ্ধিগত হয়েই থাকবে? বিধাতার অজস্র অমৃত বর্ষণে সবখানি নূতন হয়ে মুক্তির আনন্দে বিশ্বের দেউলে বাঙ্গালী কি আর বিজয়-সঙ্গীত গাইবে না?

নিতাই। রাজেন, হতাশ হয়ো না, বাঙ্গালী আবার বিশ্বকে কম্পিত করে তাঁর বিজয়-সঙ্গীত গাইবেই গাইবে। কারণ এ শ্রীচৈতন্যের বাংলা, তাই প্রেমের বার্তা জগৎকে বাঙ্গালীরই শোনাতে হবে।

(সেবকদের প্রবেশ)

নিতাই। তোমরা এখন কোথায় গিয়েছিলে?

১ম সেবক। চুরি-ডাকাতি না হয় সেজন্য রাত্রে আমাদের পল্লীতে পাহারা দিতে হয়, তাই ঘুরে দেখে এলাম।

২য় সেবক। প্রসাদ পেতে চাই, ক্ষুধা পেয়েছে।

নিতাই। একটু অপেক্ষা করো, মায়ের ভোগ এখনো হয় নি।—রাজেন! ইউরোপের জনশক্তি ভেঙ্গে দিতে চায় ঐশ্বর্যের স্বর্ণপ্রাচীর, সম্পদ রাখতে চায় বিশ্বের এক কোণে স্তূপীকৃত। কিন্তু তা হবে না, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে সাথে তা জনসাধারণে বিতরিত হবেই। বাহিরকে নিয়ে যে টানাটানি, এর ফল বিপ্লব, রক্তারক্তি,

অভিজাত শ্রেণীর সহিত শ্রমজীবীর তুমুল সংগ্রাম। এ সংগ্রাম যাতে না বাধে সেইজন্যেই মহাত্মার বর্তমান আন্দোলন।

রাজেন। আজ আমার সকল সন্দেহ ভঞ্জন হলো। এখন আমাদের কার্য কি তা নির্দেশ করে দিন!

নিতাই। আমাদের এখন অন্তর পরিবর্তনের বিপুল শিক্ষা বিস্তার করতে হবে। আমাদের সাধনা শুধু ভাব-সাহিত্যের বাক্য-বিন্যাসই নয়, বিজ্ঞানালোকের অলৌকিক স্বপ্নগুলিকে মর্ত্যের বুকেসত্য করে ফুটিয়ে তোলা।

সতীশ। তা হলে এখন আমাদের অদম্য উৎসাহে কর্মক্ষেত্রে নামা কর্তব্য!

নিতাই। তা তো বটেই, বসে থাকার সময় এখন নেই। বাংলার নবীনকে এখন কর্মের মাঝেই দেখতে চাই। কথা তো অনেক দিনই শেষ হয়ে গেছে। আমি বর্তমানে সকল শ্রেণীর কর্মীদের ভেতরে একটা অন্তরগত মিলন দেখতে চাই।

রাজেন। তা হলে জনসাধারণের সাথে আমাদের একেবারে গলাগলি হয়ে পড়তে হবে, তা না হলে তাঁদের প্রাণের সাড়া পাওয়া যাবে না।

নিতাই। তাই তো আমি নেতাদের বলি, যদি সাধনায় সিদ্ধিলাভই করতে চান, তবে টাউনে Reception পাওয়া বন্ধ করুন, পল্লীতে জনসাধারণের ভেতরে গিয়ে দাঁড়ান, জাতীয় জীবনের প্রাণ কোথায়, তার সন্ধান মিলে যাবে। তাই আজ ভাঙ্গা বুক নিয়ে সকলের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি। সাড়া পাবো কি? হে বাংলার ধর্মপুরোহিতগণ! যদি বিজ্ঞানের মণিকোঠায় বসে আপন ধর্মকে নিবিড়ভাবে পেয়ে থাকো, তবে এ মিলনে তোমাদের জাতির বৈশিষ্ট্য বা নেতৃত্বের সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে না, বরং অহঙ্কারই ধূলায় লুটিয়ে পড়বে। কার প্রাণ আছে? কে আজ মিলন প্রত্যাশায় আপনার গণ্ডী ছেড়ে বিশ্বের মুক্ত প্রাঙ্গণে দাঁড়াতে প্রস্তুত; সিদ্ধপীঠ সোনার বাংলায় আজ যে লীলা সংগঠনের সূচনা দেখা যাচ্ছে এ মহালীলার সহতীর্থ কে আছ? কার হৃদয় আজ মহাকালীর পদভরে অকম্পিত রাখতে পারবে, সে ছুটে এসো। আমি আমার সমস্তখানি প্রাণ দিয়ে তোমায় আলিঙ্গন করে ধন্য হই।

(গীত)

আয় রে বাঙ্গালী আয় সেজে আয়
আয় লেগে যাই মায়ের কাজে;

দেখাই জগতে জেতো বাঙ্গালী
দাঁড়াতে জানে বীর সমাজে।
বহুদিন পরে ডাক এসেছে আজ,
ওরে বাঙ্গালী সাজ তোরা সাজ,
এখনো নীরবে নাহি কিরে লাজ,
ধিক্ রে তোদের ক্ষাত্রতেজে।
কোটীকণ্ঠে আজি জয় মা বলিয়া,
দ্বেষ হিংসা আদি চরণে দলিয়া,
দাঁড়া রে বাঙ্গালী আপনা ভুলিয়া,
সাজাই বাংলা নূতন সাজে।
মাভৈঃ ওঠ রে ও বাঙ্গালী বীর,
কত কাল রবি নত করি শির,
শুনেছি রে জয় বাঙ্গালী জাতির
অনাহত শব্দ ধ্বনির মাঝে।

রাজেন। (পদধূলি নিয়ে) আজ থেকে আপনি আমার দাদা নন, গুরু। আপনায় অনন্ত প্রণাম!

নিতাই এই তো সব মাটি করে দিলে ভাই, দাদাই তো ভাল ছিলাম। পরাধীনতার নিবিড় বন্ধন তোমার আত্মাকেও স্পর্শ করেছে দেখতে পাচ্ছি। স্বাবলম্বন স্বাধীনতা যদি তোমার অন্তর থেকে নির্বাসিত হয়ে থাকে, তবে তোমার মুক্তি সুদূরপরাহত। কেবল অন্ন-বস্ত্র সংগ্রহের জন্যই যে তুমি দাসখৎ সহি করেছ এমন নয়, নিজের অন্তর উদ্বুদ্ধ করার জন্যও তুমি পরের পায়ে আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছ, এ তোমার মস্তবড় ভুল রাজেন!

রাজেন। এ যে অতি পুরাতন বিধি, একে উপেক্ষা করে চলি কি করে?

নিতাই। সে যুগে আর এ যুগে যে অনেক ব্যবধান, রাজেন। নূতন বাংলাকে যখন নূতন করেই গড়ে তুলতে চাচ্ছ, তখন আর পুরাতনকে নিয়ে টানাটানি কেন? সবই নূতন হয়ে গড়ে উঠুক।

রাজেন। অতীতকে উপেক্ষা করে চলাই কি আপনার উদ্দেশ্য?

নিতাই। আমি কারোই উপেক্ষা করে চলতে প্রস্তুত নই, বাহিরের অবস্থা যে আমাদের অন্তরকেও আশ্রয় করেছে। পরের দাসত্ব না করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা যেমন আমাদের পক্ষে অসম্ভব, আত্মাকে

পেতে হলেও পরের পায়ে লুটিয়ে পড়াও তেমনি অনন্যগতি হয়ে পড়েছে। ওগো প্রভু! তুমি আমায় মুক্তি দাও, তোমার চরণ-ধূলায় আমায় কৃতার্থ করো! ধর্ম সাধনার পথে এরূপ দাস্য ভাবই চরম সিদ্ধির লক্ষণ বলে অনেকে মনে করেন। রাজেন, ইহাই কি মুক্তি? অন্তরে বাহিরে যে জাতি এমন করে বাঁধা পড়েছে, সে জাতির কি মুক্তি হতে পারে ভাই?

রাজেন। আপনার এ কথায় ভদ্রমণ্ডলীর প্রাণে বড়ই বাজবে বলে মনে হয়। এতে একটা মস্ত বড় ধর্ম-বিপ্লবও উপস্থিত হতে পারে।

নিতাই। তা হলে তো ভালোই হতো, কিন্তু তা হয় কই? তুমি ভয় করো না, আমার কথায় প্রকৃত ভক্তদের প্রাণে বাজবার কোন কারণ নেই। যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সত্যই গুরুবাদ দেশে ফুটে উঠেছিল, আমি সেই সত্য গুরুবাদকে দেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বর্তমান দাসত্ব আনয়নকারী গুরুবাদকে নির্মমভাবেই দেশ থেকে দূর করে দিতে চাই। মানুষের চরণে মানুষ বাঁধা পড়ে, যদি তার আত্মবিকাশের পথে অন্তরায় হয়, তবে যে বিশাল জাতিটা মরণের দিকেই ছুটে চলবে। যদি জীবন আনতে চাও তবে প্রতি মানবের আত্মমর্যাদা পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোল, প্রতি মানুষ আপনাকে ভগবানের যন্ত্রস্বরূপ উপলব্ধি করুক। ইহাই বর্তমান যুগের যুগধর্ম বলে আমি মনে করি।

সতীশ। তা হলে আমরা এ কথাই প্রচার করবো?

নিতাই। হ্যাঁ, আমি বর্তমান বাংলায় এরূপ ধর্মের বা সাধনারই প্রবর্তন দেখতে চাই। একজনকে ভগবানের অবতার বোধে সহস্র জনের পূজা করা জাতির কল্যাণ-সূচক নয়। যিনি অবতার, তাঁরও কর্তব্য শিষ্যদের অবতার করে তোলা। বর্তমানে তা হচ্ছে কি? গুরু তা করতে না পারলেই ভারতের অতীত ধর্মপ্রবাহের মত বর্তমান যুগধর্মও জাতির জীবনে কোন স্থায়ী শক্তি দিয়ে যেতে পারবেন না। অবতারের অন্তর্ধানের সাথে সাথে শিষ্য-প্রশিষ্য, নেড়া-নেড়ী বা ঘণ্টা-নাড়ার দলে পর্যবসিত হবেনই। তাই নূতন বাংলাকে সাবধান করে দাও, তাঁরা যেন ধর্ম ধর্ম করে কারো পায়ে লুটিয়ে না পড়েন। নিজের আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে তারা শক্তিমান হউন। যেমন মহাত্মা তাঁর আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করেই

আজ জগতে শ্রেষ্ঠ মানবের আসন গ্রহণ করে কৃতার্থ হয়েছেন।
তাই তো বলছি রাজেন, সাধনা কার, সাধনা তো আমার।

রাজেন। তাই নাকি ?

নিতাই। হ্যাঁ রাজেন, তাই।

(কবিতা)

আমার ভেতর আসল আমি
যখন আমার জাগে,
আমিই তখন বিশ্বময়
ভিক্ষা তখন বিশ্ববাসী
আমার কাছেই মাগে।
আমিই তখন বিশ্বগুরু
আমার বীণাই বাজে,
আমার ইচ্ছায়ই লেগে আছে,
যে যার আপন কাজে।
আমার আদেশ মান্য করেই
চলছে সবেই ভাই,
তাই তো আমার সেই "আমিটি"
জাগিয়ে তোলা চাই ॥ (প্রস্থান)

রাজেন। কৃতার্থোঽস্মি! চল ভাই, তোমাদের প্রসাদ বিতরণ করে দিই গে।

(সকলে মিলিত কণ্ঠে)
"কালী মাইকী"—জয়!

(সকলের প্রস্থান)

ত্রয়োদশ দৃশ্য

স্থান—নৈশবিদ্যালয় গৃহ।

(সতীশ, আবদুল কাদের ও ছাত্রগণ)

ছাত্রগণ— (গীত)

ধুয়া। আমরা মানুষ হতে চাই,
মানুষ যদি হবি মানুষের
সঙ্গনে রে ভাই।

মুসলমানের ছেলে হবো
খাঁটি মুসলমান ;
ধরবো লাঙ্গল চষবো জমি
গোলায় তুলবো ধান ;
লেখাপড়া শিখতেই হবে,
হজরতের দোহাই ।

বিহারী । ওরে ভাই জোলা তাঁতি
ছাড় রে হিংসা দ্বেষ,
কাপড়ে ষাট কোটী টাকা
নিয়ে যায় বিদেশ ;
চালা মাকু দেশের টাকা
দেশেই রাখা চাই ।

টোনা । মাছের বংশ কমে গেছে
পড়েছি বড় ফেরে,
বাংলার বাজার ভরে দিত
মোদের জগৎ বেড়ে ,
আমার কেবল শিখতে হবে
মাছের চাষটা ভাই ।

লালা । মুচীর ছেলে আমার কর্ম
জুতা তৈয়ারী,
কিসের চীনা কিসের দিল্লী
কিসের টেনারী,
হস্ত-শিল্পের উন্নতি বই
এদেশের মুক্তি নাই ।

ধলু । আজ মাষ্টারমশাই এতক্ষণ আসছেন না কেন ?

টোনা । বোধ হয় কারো বাড়ী অসুখ হয়েছে, সেখানে ঔষধ নিয়ে গেছেন । ইনি আসাবধি এ পল্লীতে ডাক্তারের ডাক বন্ধ হয়ে গেছে ।

লালা । তা হলে কি তিনি আমাদের একটা খবরও দিতেন না ?

বিহারী । হয় তো সে সময় তিনি করে উঠতে পারেন নি ।

ধলু । আমাদের শিক্ষার জন্য তিনি ম্যাজিক ল্যান্টার্ণ আনতে দিয়েছেন,

তা দিয়ে আমাদের দেশের স্বাস্থ্য কিভাবে নষ্ট হচ্ছে এবং কি উপায়ে স্বাস্থ্যের উন্নতি করা যায়, তাই তিনি দেখাবেন।

টোনা। আমাদের জন্য তিনি সর্বস্বান্ত হতে বসেছেন, কিন্তু তবুও আমাদের দেশের লোকের চোখ ফুটছে না।

লালা। চোখ ফুটছে না কি করে বলো?

বিহারী। যদি ফুটতো তবে যারা অর্থ ব্যয় করে ছেলে পড়াতে পারে না, তাদের ছেলেগুলি এখানে পাঠায় না কেন?

ধলু। সবেমাত্র বিদ্যালয় হয়েছে, এর উপকারিতা আজ পর্যন্ত সকলে বুঝতে পারে নি। আস্তে আস্তে ছেলে হবে।

টোনা। তা হবে বই কি! ক্রমেই তো ছেলে বাড়ছে। রাস্তা দিয়ে যখন বই নিয়ে যাই, তখন আমাদের পাড়ার ছেলেরা কত কথাই না জিজ্ঞেস করে! আমাদের পড়াশুনার কথা শুনে তারা কতই না আনন্দ প্রকাশ করে।

বিহারী। তাদের মুখের দিকে চাইলে তখন বোঝা যায় যে, তাদের ভিতরটাও যেন আমাদের ভাবেই অনুপ্রাণিত হয়ে আসছে।

ধলু। আরে, বিদ্যার্জনের ইচ্ছা কার না হয়? চোখ থাকতে যে আমরা অন্ধ, এ কথা সকলেই প্রাণে প্রাণে বেশ বোঝে। আমি এ চার মাসে বোধোদয় পড়ছি, কি আনন্দ!

লালা। আমার তো বোধোদয় প্রায় শেষ হয়ে এলো, এর পরে আমি তুলসীদাসের রামায়ণ পড়বো, বাংলা ভাষায় নাকি সে বই বেরিয়েছে।

টোনা। আরো কিছু পড়ে নিতে হবে, তা না হলে তুমি সে দোঁহার বুঝবে কি?

লালা। তা তো পড়তেই হবে। আমরা জাতিতে মুচী, বাবার কাছে সে দোঁহা মাঝে মাঝে শুনি; বড়ই মিষ্টি লাগে। নিজে যদি পড়তে পারি, তবে কতই না আনন্দ হবে!

টোনা। আমি জেলে, মাছের বংশ দিন দিনই কমে যাচ্ছে, কিসে তাদের বংশ বৃদ্ধি হয়, সেজন্য মাষ্টারমশাই নাকি আমায় মাছের চাষ শেখাবেন।

ধলু। হ্যাঁ যার যার জাতীয় ব্যবসা যাতে আমরা ভাল করে করতে পারি, আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যই নাকি তাই।

বিহারী। তা বই কি! চাকুরী তো আমাদের কেউ দেবেন না, আর সে বিদ্যা

হবার সম্ভাবনাও আমাদের নেই। জাত-ব্যবসার সুবিধে হয় এমন কিছু লেখাপড়া শিখতে পারলেই নিজেকে ধন্য মনে করি।

লালা। আরে, আমাদের জাত-ব্যবসার কাছে কি আর চাকুরী লাগে রে? স্বাধীনভাবে থেকে একবেলা খেলেও তাতে পূর্ণানন্দ।

বিহারী। তার আর সন্দেহ কি! দশ টাকা চালের বাজারে বাবুদের হাহাকার লেগে যায়, কিন্তু বাবা দু'খানা তাঁত চালিয়েই আমাদের খাইয়ে রেখেছেন। এই দুর্মূল্যের সময়ও আমরা কখনও একবেলা খাই নি।

ধলু। আমি মুসলমান, লাঙ্গলই আমার সম্বল। আমার শিখতে হবে কত রকম চাষ হতে পারে, আর জমিতে কোন্ ফসলে কোন্ সার দিতে হয়।

বিহারী। লেখাপড়া শেখাও তো জাত-ব্যবসার উন্নতির জন্য, মাষ্টারমশাই বলেন—অন্ততঃ মাসিকপত্রগুলি তোমরা পডতে পারো, এতটুকুন বিদ্যে তোমাদের হলেই হবে, এর বেশী পডে প্রয়োজন নেই।

(আবদুল কাদেরের প্রবেশ)

ধলু। ঐ যে তিনি এসেছেন!

সকলে। আদাব—আদাব—আদাব।

আবদুল। তোমাদের আর সকল কোথায়?—আর কি কথা হলো এতক্ষণ?

ধলু। অনেকেই আজ আসে নি। কথা অনেকই হয়েছে, শেষে মাসিক-পত্রগুলি আমরা ভাল করে পডতে পারি এতটুকুন লেখাপড়া আমাদের সকলেরই করতে হবে, এ পর্যন্ত এসে আলোচনা দাঁড়িয়েছে, আর আপনি এসে উপস্থিত হয়েছেন।

আবদুল। বেশ বেশ, এই তো চাই। এভাবে যদি তোমরা আলোচনা কর, তবেই আমাদের পথ অনেক পরিষ্কার হয়ে যাবে। মাসিকপত্রগুলি যদি রীতিমত অধ্যয়ন করতে পারো তবেই হবে, এর বেশী পড়ে তোমাদের প্রয়োজন নেই। মাসিকপত্র যদি একটা লোক রীতিমত পড়ে যায়, তবে সে একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত বলে সমাজে পূজিত হতে পারে।

বিহারী। তাই নাকি মাষ্টারমশাই?

আবদুল। হ্যাঁ বাবা, তাই। ওতে অনেক সংবাদ থাকে, শুধু ভারতের নয়, বিভিন্ন দেশের ইতিহাসও বর্তমানে লেখকরা সংক্ষেপে দিচ্ছেন। মনে রেখো বাবা, ইতিহাসই পড়বার জিনিষ।

ধলু। হাঁ, আপনি আর একদিনও এই ইতিহাস সম্বন্ধে বলেছেন। ইতিহাসে বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মে এবং তাদের দেশের নূতন নূতন আবিষ্কার দেখে আমাদের প্রাণে নূতনের একটা আকাঙ্ক্ষা বলবতী হয়ে ওঠে।

আবদুল। আকাঙ্ক্ষা জন্মালেই তো হলো রে! আকাঙ্ক্ষা জন্মে না বলেই তো বাঙ্গালী যুবকদের কোন কাজেই উৎসাহ নেই। ঐটে থাকলে বাঙ্গালী যুবক জগতে অনেক নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করতে পারতো, যা দেখে জগৎ বিস্মিত হতো। ভগবান বাঙ্গালীর মাথায় অনেক কিছু দিয়েছিলেন কিন্তু দেন নি অধ্যবসায়, দেন নি উৎসাহ আর কর্মের জন্য পিপাসা। ছেলেদের বিশেষ কিছু দোষ নেই, বর্তমান শিক্ষালয়গুলিই হচ্ছে কেরানী তৈরী করার যন্ত্র, বাপ-দাদা ঐ যন্ত্রে ফেলে ছেলেগুলিকে কেরানী তৈরী করে নিচ্ছেন, তাই তো আজ দেশে এই হাহাকার!

বিহারী। মাষ্টারমশাই। ওদেশের লোক কি করে এত নূতন নূতন জিনিষ আবিষ্কার করে?

আবদুল। করে সাধনায়। বাপ সাধনা করে যদি সিদ্ধ হতে না পারে তবে ছেলে আবার সেই সাধনায় ব্রতী হয়। আমাদের দেশে হয় ধর্মের সাধনা, আর তারা করে কর্মের সাধনা। ইংরেজ আর আমাদের মধ্যে মাত্র এইটুকুনই প্রভেদ। তা না হলে তারাও মানুষ, আমরাও মানুষ।

(সতীশের প্রবেশ)

সতীশ। মাষ্টার! ছেলেদের সাথে কি আলোচনা হচ্ছে?

আবদুল। ছেলেদের সাথে আলোচনায় আজ বেশ আনন্দ পাচ্ছি। ওদের ভিতরে যে একটা পিপাসা জেগেছে, তাতেই আমার পরিশ্রম আজ আমি সার্থক মনে করছি।

সতীশ। বাইরে থেকে আমি সবই শুনেছি। সব ছেলেদের ভিতরে এ আলোচনাটুকু শুনলেও ভবিষ্যতের জন্য একটু নিশ্চিন্ত হতে পারতুম। কিন্তু ছেলেদের বর্তমান আলোচনার বিষয়ই হচ্ছে Foct Ball.

আবদুল। হবে না! ছেলেদের দোষ কি? সে মাষ্টার কই, যে ছেলেদের মনুষ্যত্বের দিকটা ফুটিয়ে তোলে? সে মাষ্টার এবং সে শিক্ষা কোন একদিন বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে ছিল, যখন অশ্বিনী-বাবুর কার্যকরী শক্তি ছিল।

সতীশ। সে কথা আর বলতে! আমিও তো সে বিদ্যালয়েরই ছাত্র। তিনি ছাত্রদের জীবনে একটা নূতন ভাব জাগিয়ে দিতেন, ইহাই ছিল সে বিদ্যালয়ের বিশেষত্ব। মাষ্টার যাঁরা ছিলেন তাঁদের দেখলে মনে হতো যেন বাবার কোলে বসে তাঁরই স্নেহে ভরপুর হয়ে যাচ্ছি। খেলা-ধূলার সাথে কত গভীর তত্ত্বই না তাঁরা আমাদের শুনাতেন!

আবদুল। অশ্বিনীবাবু দেবতা, তাঁর কথা ছেড়ে দাও। তাঁর পায়ের ধূলা না পেলে কি আমরাই আজ এ কাজে আসতুম! আজকাল মাষ্টারদের ছেলেদের উপরে স্নেহ কত, তা শুনবে? ছেলেরা মাষ্টার দেখে মনে করে, ওটা একটা বাঘ; আর মাষ্টাররাও ছেলেদের দেখে মনে করে, ওটা একটা বাঁদর। সতীশ! গুরু-শিষ্যে এ সম্বন্ধ যেখানে, সেখানে তুমি কি আশা করতে পারো?

সতীশ। আশা তো ছেড়েই দিয়েছি। তবে স্কুল-কমিটি আর কলেজ-কমিটিকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখবো মনে করেছি; তাঁরা যেন শিক্ষক নিযুক্ত করার সময় তাঁদের একটু পরীক্ষা করে নেন। শুধু First Class ডিগ্রী দেখেই তারা যেন ভুলে না যান। হয় তো Third Class M. A.-এর ভিতরে ছেলেদের শিক্ষোপযোগী এমন সব জিনিষ আছে, যা ঐ First Class-এর মধ্যে নেই। তাই কমিটির কর্তব্য ঐ First Class-এর স্থানে Third Class-কে নেয়া। এ না হলে University সংস্কার হবার আর কোনই পন্থা নেই।

আবদুল। মাষ্টারদের মাইনেও কিছু বাড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন, ঐটেও তাঁদের কাজের একটা মস্ত বড় অন্তরায়। কারণ, ষোল আনা প্রাণ দিয়ে অনেকেই কাজ করতে পারেন না।

সতীশ। সে আশা আর করো না, বাড়ানো তো দূরের কথা বরং কমাবারই চেষ্টা হচ্ছে।

আবদুল। তাই যদি হয়ে থাকে, তবে মাষ্টারগুলি সব বেরিয়ে আসে না কেন?

সতীশ। তারা কেরানী বই তো নয়, সকলের একমত হবারও সম্ভাবনা নেই; বেরিয়ে এলে খাবে কি, এই ভয়!

আবদুল। ভয়! মাষ্টারদের আবার ভয় কি? শিক্ষা-বিভাগে যিনি জীবন কাটাতে চান, তাঁর জন্য তো প্রশস্ত পথই পড়ে রয়েছে। প্রতি পল্লীতে এখন আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। পাঁচটি পল্লী নিয়ে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে যদি মাষ্টারটি কৃষক বালকদের

শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন, তবে তাঁর অন্নের অভাব কি? তবে প্রথম একটু বেগ পেতে হবে, সেও এক মাসের বেশী নয়, পরে অবস্থা সচ্ছল হবে সন্দেহ নেই। এখন কথা হচ্ছে এই, ওঁরা সহরের নেশাটা ছাড়তে পারবেন কিনা সে বিষয়েই আমার সন্দেহ হচ্ছে।

সতীশ। নিতাই দাদা বলেন—সহরের নেশা ছাড়াতেই হবে, তা না হলে বাংলার অন্ন-সমস্যার সমাধান কিছুতেই হবে না। সহরমুখো হয়ে গেছে জাতি, তাকে আবার পল্লীমুখো করতে হবে। পল্লীতে ঐ চাষার কাছে রয়েছে বাংলার প্রাণ। তাদের সাথে আমরা যতই গলাগলি হবো ততই আমাদের হাহাকার দূর হবে; জাতিও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। তাই তো বলি, শিক্ষিত যুবক! হতাশ ভগ্নমনে বসে আছ কেন? এসো, আমাদের সাথে পল্লী-বৃন্দাবনে ছুটে এসো, শান্তি পাবে, একমুঠো অন্নের জন্য পরের দ্বারস্থ হতে হবে না।

আবদুল। নিতাই দাদা এ সম্বন্ধে ছেলেদের একটা গান শিখিয়ে গেছেন। ওরে তোরা সেই গানটা গা দেখিনি।

(ছেলেদের গীত)

চল্ রে পল্লী ব্রজে চলে যাই
সহরে কুব্জারাণী,
ইট পাথরে সহর বোঝাই।
কুটীলতা কপটতা
নাই সেখানে সরসতা,
ভাইকে সেথা পর করে দেয়
গৃহলক্ষ্মী যায় রে পালাই।
কারো নাই এক ছটাক জমি
এমন জায়গার পায়ে নমি;
খেতে পায় না দুটি বেগুন
দুটি বেগুন-চারা লাগাই।
ফুরিয়ে গেলে বাজার খরচ
বাবুরা, হাওলাত কিংবা করেন করজ;
আমরা সেদিন পল্লীবাসী,
শাক্-সব্জীতে দিনটা কাটাই।

বাবুরা সহরের মায়া ছেড়ে,
পল্লীতে না এলে ফিরে,
বাজবে না করমের বিষাণ,
ঘুচবে না এ দেশের বালাই।

সতীশ। তোমার বিদ্যালয় দেখে বড়ই প্রীতি হয়েছি। আমাদের ভিতরে তুমিই প্রকৃত কর্মবীর।

আবদুল। মাথা খারাপ হয়ে উঠলো বুঝি! আর কিছুদিন পরে একটা মওলানা উপাধি বসিয়ে দিও। এ দেশে অবতার হতে বড় বেশী বেগ পেতে হয় না, কয়েকটা বড় কথা আওড়াতে পারলেই হলো। কথায় কথায় যে দেশে অবতার সৃষ্টি হয়, সে দেশের মুক্তি বড় সহজে হতে চায় না। যাক, চলো এখন অন্য কাজে যাই।

সতীশ। চলো ভাই, তোমার নৈশ বিদ্যালয়ের শিক্ষাই আদর্শ শিক্ষা।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্দশ দৃশ্য

স্থান—গারো পাহাড়।

(সন্ন্যাসী ও সতীশ)

সন্ন্যাসী। দিনের পর দিন সাধনা কঠোর হতে কঠোরতর হয়ে উঠেছে; তরুণ ভারত তার জীবনের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করে দিতে কৃতসঙ্কল্প। জীবনের পরপারে যে সচ্চিদানন্দ সাগর আছে, সে অমৃতের সাথে ইহজীবনের সংযোগ তারা চায়। জীবনের এই অনন্ত স্বপ্ন তাদের মায়া নয়, মিথ্যাও নয়। দ্বন্দ্ব-কোলাহলপূর্ণ হীন জীবন যাপনের পূতিগন্ধময় নরকে আজ যে সত্যের বিমল কিরণ থেকে থেকে ঝিলিক মেরে যাচ্ছে, সে ক্ষীণ সঙ্কেতে ভারত এই জীবনেই অমৃতের আভাস পেয়েছে। তাই ভারতের প্রাণশক্তি আজ আপনাকে অনন্তভাবে পাবার জন্য অন্তর-বাহিরের অন্তরায় সব পদদলিত করে সত্যের সন্ধানে ছুটেছে। মরণকে যদি বার বার আলিঙ্গন করতে হয়, তাও সে করবে। ধর্ম-সাধনার ভিতর দিয়েই ভারত আজ জগৎকে সত্যরূপে পেতে চায়; তাই ভারতের জাতীয় পতাকা আজ ত্যাগ-বৈরাগ্য দ্যোতক ত্রিরঙ্গে রঞ্জিত।

(সতীশের প্রবেশ)

সন্ন্যাসী কে, সতীশ? এসো বাবা, আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম।

সতীশ। আজ আপনায় একটু চিন্তিত বলে মনে হচ্ছে? কোন নূতন খবর পেয়েছেন কি?

সন্ন্যাসী। না সতীশ, গঠনকার্যে মন-প্রাণ ঢেলে দাও, ভারতের ভবিষ্যৎ বড়ই উজ্জ্বল দেখতে পাচ্ছি। মনকে স্থির করো, পবিত্র করো, উজ্জ্বল করো, অনন্ত প্রসারিত করে ধরো, বিশ্বময়ের বিশ্বরূপে জীবন ধন্য হবে, কৃষ্ণময় হবে।

সতীশ। হাঁ্যা, ভারতবাসীর প্রাণে সত্যের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। এ সাড়া শুধু ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে পড়ে নি, জাতিগত জীবনেও জাগরণের সমুদ্র গর্জন শুনা যাচ্ছে। কেবল রাজনীতিকে লক্ষ্য করেই যে জাগরণের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে এমন নয়, সাহিত্যে, সমাজে, প্রতি গৃহস্থের জীবনেই জাগরণের রক্ত-কিরণ ছড়িয়ে পড়েছে।

সন্ন্যাসী। কি করে তা বুঝলে?

সতীশ। ভারতের সর্বত্রই আজ একটা মহোৎসবের কোলাহলে পূর্ণ। কোথাও ত্যাগ, কোথাও সেবা, কোন জায়গায় শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ের স্রোতও বইতে আরম্ভ করেছে। বিশেষ করে বাংলার তরুণ জীবনে অভূতপূর্ব উৎসাহ দেখা যাচ্ছে, দলে দলে ছেলেরা এসে কর্মে আত্মনিয়োগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন, ইহা আশার কথা, এবং ইহাই পূর্ণ জাগরণের লক্ষণ সন্দেহ নেই।

সন্ন্যাসী। হাঁ্যা সতীশ, সকল দিক থেকেই যে জাগরণের লক্ষণ মূর্ত হয়ে উঠেছে তা কারো অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে মনে রেখো, ভারতবাসীর জীবন সমুচ্চের পথে উঠিয়ে ধরার জন্যই আজ আমাদের এই বিরাট সাধনার আয়োজন। অন্তরের ডাক শোনা মানুষেরই এখন দরকার। আমাদের মিলন যেন উন্নত জীবনের মূর্ত প্রতীক হয়।

সতীশ। মার্জিত-বুদ্ধি অভিজাত শ্রেণীর লোক নিয়ে সভা-সমিতি করে বিশেষ কিছু লাভ হচ্ছে বা হবে বলে আমার মনে হয় না। যদি হতো তবে প্রাণের টানে সকলের কণ্ঠে শিবের বিষাণ গর্জিয়া ওঠে না কেন? তাই জীবনের মূল উৎস খুঁজে বের করতে না পারলে অজস্র পূতঃ সঞ্জীবনীর ধারাপ্রপাতেও এ মরা দেশকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব হবে না।

সন্ন্যাসী। হবে সতীশ, হবে,—অমৃতত্ব ও অমরত্বের কথা জাতিকে ভাল করে বুঝিয়ে দাও। অন্তর্দৃষ্টিহারা হয়ে যদি কোন মহৎ আদর্শে পা বাড়ান হয়, তবে জীবন-যজ্ঞ সার্থক হবে না, বরং আদর্শ ম্লান হয়ে পড়বে। ভগবানের সাথে জীবনের যদি নিত্য সম্বন্ধ না থাকে, তবে জগতের কোন আদর্শই ভারতবর্ষকে বাঁধতে পারবে না। ভগবানের জন্যই ভারত বার বার সর্বত্যাগী হয়েছে, ধন, মান, ঐশ্বর্য, রাজ্য কিছুতেই তো ভারতের বন্ধন সৃষ্টি করতে পারে নি, আজ কিসের বন্ধনে জাতির জীবন বাঁধতে চাও, সতীশ?

সতীশ। ভগবানকে ছেড়ে জীবনের কোন রসেই যে জাতি মাতাল হবে না, তা আমি জানি। ফাঁকি দিয়ে এ জাতিকে সাময়িক মাতানো খুবই সহজসাধ্য, কিন্তু তাতে যে প্রতিক্রিয়া হবে, তাতে দুর্দশা ক্রমে বেড়েই যাবে। তাই এই ভাগবতধর্মী বিশাল জাতিটাকে গড়ে তুলতে হবে ত্যাগ বৈরাগ্যের ভিতর দিয়ে।

সন্ন্যাসী। হ্যাঁ-হ্যাঁ—সতীশ! ত্যাগ—ত্যাগ, কিন্তু ত্যাগ করবে কি? সবখানিই যে বাকি রয়ে গেছে। নগ্ন হয়ে মাটির বুকে দাঁড়াতে পারলেই ত্যাগী হওয়া যায় না, সংসার সমাজ ত্যাগ করলেও ত্যাগ ব্রত সম্পন্ন হয় না, নৈষ্কর্ম্যও ত্যাগের লক্ষণ নয়। ত্যাগ করতে হবে অহঙ্কার। ভারতের ধন-ঐশ্বর্য, স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য বল-বীর্য সবই গেছে, আছে কেবল দারুণ অহঙ্কার। এই অহঙ্কার দেহ প্রাণ মনকে নিয়ে, তাই এবার কৃষ্ণসাগরে ডুব দিয়েই ভারতের নবজন্ম লাভ করতে হবে।

সতীশ। ইহা কি সম্ভব? বুকভরা এই অনন্ত সচ্চিদানন্দময়ের সবখানি নিয়ে ঘর করা কি সহজ কথা?

সন্ন্যাসী। সহজ কথা নয় বটে, কিন্তু তাই করতে হবে। সকলকে যদি ভাগবতময় করে তুলতে না পারো, তবে সৌরভহীন কুসুমের মতন জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। জীবনকে আচ্ছন্ন করে যদি ভগবান বাস না করেন, এ আবাস যদি তাঁরই কেলীকুঞ্জ না হয়, তা হলে তোমরা কোন্ আশায়, কোন্ সুখের কামনায় এই নিদারুণ দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে চলেছ, তা আমি বুঝতে পারছি না।

সতীশ। এই দুঃখের ভিতর দিয়েই পাবো আমরা অমৃতের সন্ধান। ভারত অনেক ভোগ করেছে, কোন ভোগেই তার আর স্পৃহা নেই, কেবল বাকী আছে তার সচ্চিদানন্দময়ের অনির্বচনীয় ভোগ।

সে ভোগ ভারতের নিত্য হচ্ছে। কিন্তু জীবন দিয়ে নয়; জীবনের চেতনায় সে আস্বাদ মূর্ত্ত হয়ে ওঠে নি বটে, কিন্তু জীবনের তলে সেই গোপন স্বরে এই মহাভাগের মেলা চলেছে, সেই মহোৎসবের উল্লাসধ্বনি মনের তারে মাঝে মাঝে মধুর মূর্চ্ছনা তুলে আবার নীরব হয়ে যাচ্ছে; এ যেন সেই আড়াল থেকে শ্যামের বাঁশী বাজার মত। অনন্যোপায় ভারত উন্মাদ হয়ে তাই জীবনের তলে ডুব দিয়েছে, কিন্তু সেই অগাধ রস-সাগরের তলা সে পায় নি; তা বলে হতাশের কিছু নেই। বর্ত্তমান ভারত কৃষ্ণসাগরের তলা না পেয়ে ফিরবে না।

সন্ন্যাসী। সতীশ, নিতাই আমার বেঁচে থাক; তোদের বুকভরা আশা দেখে আনন্দে ভরপুর হয়ে যাই। এমন বুকভরা আশা নিয়ে কৃষ্ণসাগরে ঝাঁপ না দিলে কি আর কূল পাবার যো আছে? তবে মনে রেখো, যে মন দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়, সে নীচের মন নয়; কাজেই বাসনার স্পর্শ সেখানে পৌছাতে পারে না। এই মনই হচ্ছে ভাগবত মন, ইহাই বিজ্ঞান। বিশ্বের আনন্দ এখানে অনাবিল তরঙ্গে নৃত্য-চঞ্চল। এই পরমানন্দে আজ ভারতকে সবখানি দিয়ে আত্মাকে অমৃতময় করে তুলতে হবে। ইহাই যে ভগবানের পূর্ণ স্বরূপ তা নয়, তবে এই পথ ধরেই ভারতকে তাঁর দিকে অগ্রসর হতে হবে। ভারত আজ এই অধ্যাত্ম সাধনায় উদ্বুদ্ধ, স্বরাজের পথে ভারত শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে চলেছে, এ আনন্দ নিয়েই আমি চির বিদায় গ্রহণ করতে পারবো। সতীশ, তোমরা কর্ম্ম করে যাও, মাভৈঃ—

(প্রস্থান)

সতীশ। আর একটু দাঁড়াও—আমি তোমায় ভাল করে দেখে নিই। চরণ-ধূলা নেবার সময়টুকুও আমায় দিলে না! আচ্ছা যাও প্রভু, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। হে ভারতের তরুণ! শুনলে তো যুগ প্রবর্ত্তকের কথা, তোমাদের এক নূতন জগৎ রচনা করতে হবে। সে জগৎ এমন দ্বন্দ্বময় নয়—সে জগৎ শান্তি ও সমতার জগৎ। সে জগৎ আনন্দ দিয়ে গড়া, আলো দিয়ে ছাওয়া। ভারতের পূর্ব সৃষ্টির বনিয়াদ পর্য্যন্ত উপড়ে যাবার উপক্রম হয়েছে, বাধা দিও না, পুরাতনের শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত হতে দাও। অতীতের স্মৃতি পর্য্যন্ত নতুন পথে বাধা জন্মায়। তোমরা পুরোভাগে দৃষ্টি রেখে অগ্রসর হও, পিছনের করুণ আহ্বানে মুখ ফিরিও না। মৃত যে সে

মুছে যাক, নতুন গড়ে উঠুক। পৃথিবীকে দানে দানে ছেয়ে ফেল। ত্যাগী তপস্বী হয়েই ভারতের তৃপ্তি, আমাদের সকলকেই তা হতে হবে; ইহাই বর্তমান যুগ-প্রবর্তক মহাত্মা গান্ধীর বাণী।

(নিতাইয়ের প্রবেশ)

নিতাই। হ্যাঁ—হ্যাঁ—সতীশ, ইহাই মহাত্মার বাণী, জগৎকে ব্রহ্মমন্ত্রে আমাদেরই দীক্ষিত করতে হবে। জগৎবাসী শোন, যুগ-প্রবর্ত্তকের বাণী শোন—

(গীত)

এসেছে ভারতে নব জাগরণ,
পেয়েছে ভারত নূতন প্রাণ।
মাতৃমন্ত্রে লয়েছে দীক্ষা
জগতে শিক্ষা করিবে দান।
স্তম্ভিত করে বিশ্ব-মানবে
শিষ্য করিবে জগৎখান
কহিছে সে আজ পূর্ণ বারতা
শোন্ রে সকলে পাতিয়া কান।
বিরাট ব্যোম ছত্রতলে
রবি শশী ঐ তাঁরি আখি জলে,
ইঙ্গিতে যাঁর ত্রিভুবন টলে
এ মরজগতে তিনিই গরীয়ান।
অমৃত তিনি শাশ্বত তিনি
তাঁরেই অর্ঘ্য করিবে দান।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চদশ দৃশ্য

স্থান—শরৎবাবুর বাড়ী

(শরৎ, পঞ্চানন, সতীশ ও নিতাই)

পঞ্চানন। শরৎ, আমায় ডেকে পাঠিয়েছ কেন?

শরৎ। বিশেষ প্রয়োজন আছে বলেই ডেকেছি। নিশি গাঙ্গুলী মহাশয়কে সাথে নিয়ে আসতে বলেছিলাম, তিনি আসেন নি?

পঞ্চানন। তাঁর বাড়ী হয়েই এলুম, তিনি বলে দিলেন শরৎবাবু আমায় যে জন্ত ডেকেছেন তা আমি বুঝতে পেরেছি ; আপনি শরৎবাবুকে বলবেন, তিনি যে ব্যবস্থা করবেন আমি তাই মেনে নেবো।

শরৎ। যাক, তা হলে না আসায় কোন ক্ষতি হবে না। শুনলুম আপনারা দামোদরবাবুকে সমাজচ্যুত কর'র জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন? তাঁর অপরাধ কি?

পঞ্চানন। এ তুমি বল কি? সেদিন তার মেয়েটা বের হয়ে গেল, তিন দিন পরে সে ঘরে এসেছে, তাকে আবার তিনি ঘরে স্থান দিয়েছেন, এ অপরাধ কি তাঁর কম হলো?

শরৎ। মেয়েটি বের হয়ে যায় নি। যতদূর খবর পেয়েছি, তাকে আপনাদের কুটুম্ব, এ গাঁয়ের কুলাঙ্গার গোপীবাবু পথ থেকে জোর করে টেনে নিয়ে গেছে। অথচ তার বাড়ীতে সেদিন আপনারা আনন্দে ফলার মেরে এলেন। বলি, তার অপরাধটা কি ঐ মেয়ের চেয়ে বেশী নয়?

পঞ্চানন। শত হলেও সে মেয়ে-মানুষ, পুরুষের পক্ষে কি একথা সাজে?

শরৎ। ঐ জায়গায়ই তো গোল; পুরুষের কিছুতেই দোষ হয় না, তারা শুদ্ধ গঙ্গাজল কিনা! মেয়েরা তাঁদের আত্মীয়ের সাথে একটু কথা বললেও তার সতীত্বের অবমাননা হয়। সাধে কি আর সমাজ উচ্ছন্নে যেতে বসেছে! মেয়েদের অভিসম্পাত আর চোখের জলে সমাজ জলে গেল, সমাজ জলে গেল।

পঞ্চানন। তুমি কি মনে করো, দামোদরবাবু তাঁর মেয়েকে ঘরে নিয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন?

শরৎ। শুধু বুদ্ধিমানের কাজই করেন নি, মেয়েটির ভবিষ্যতের পথ নিরাপদ করেছেন। আজ যদি তিনি মেয়েটিকে ঘরে স্থান না দিতেন, তবে কাল তাকে পথে দাঁড়াতে হতো। সমাজকে ভারগ্রস্ত করে সে এই বাংলার শ্মশানে পিশাচের তাণ্ডব নৃত্যে আত্মহারা হয়ে একটি পিশাচিনী সাজতো যাকে দেখে কাল আপনিও নাসিকা কুঞ্চিত করতেন।

পঞ্চানন। যেমন কাজ তেমনিই তার প্রায়শ্চিত্ত।

শরৎ। আমরাই যে সে পিশাচের দল। কই, আমাদের প্রায়শ্চিত্তের তো কোন ব্যবস্থাই সমাজপতিরা করে নি? করলে কি আর এই বিশাল জাতিটা আজ এমন করে ধ্বংসের পথে ছুটে চলতো? আমরা মেয়েদের প্রায়শ্চিত্ত করছি, ও প্রায়শ্চিত্ত নয়—সহস্র সহস্র

সতীলক্ষ্মী মায়ের সর্বনাশ করা হচ্ছে মাত্র। আজ বাংলায় যাদের আমরা পতিতা বলে ঘৃণা করছি, তার অধিকাংশই ভদ্র ঘরের মেয়ে, এবং তাদের ভেতরে নির্দোষের সংখ্যাই বেশী। এ সর্বনাশ কি সমাজের ধুরন্ধরদের অজ্ঞতার ফল নয়?

পঞ্চানন। তুমি এই জন্যই আমায় ডেকেছিলে?

শরৎ। হ্যাঁ, আপনাদের আমি সাবধান করে দিচ্ছি, আপনারা এ ব্যাপার নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করবেন না; তা হলে পরিণামে আপনাদের বড়ই অশান্তি ভোগ করতে হবে। পল্লী-সংস্কার আর জাতি-সংগঠনই বর্তমানে আমার ব্রত। আমি আমার রাজেন্দ্রপুরকে নূতনভাবে গড়ে তুলতে চাই, আপনাদের পুরাতন সমাজকে ভেঙ্গে চুরমার করে আমি নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করবো! প্রকৃত অপরাধী যে, তাকেই দণ্ড পেতে হবে। আমি আপনাদের গোপীনাথকেই এজন্যে সম্পূর্ণ অপরাধী মনে করি এবং তাকে এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের জন্য সমাজচ্যুত হয়ে থাকতে হবে, যতদিন পর্যন্ত আমি তার চরিত্র সম্বন্ধ সন্তোষজনক Report না পাই।

পঞ্চানন। গোপী আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, তাকে বাদ দিয়ে আমি থাকি কি করে?

শরৎ। তা হলে আপনারও ঐ কুলাঙ্গারের সাথে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কারণ, মনে করবো আপনিও ঐ পাতকীর একজন প্রশ্রয়দাতা।

পঞ্চানন। তা যা ভাল বোঝ তা করতে পারো; কিন্তু আমি যতদূর জানি, তাতে গোপী সম্পূর্ণ নির্দোষ, অন্য কোন লোকের দ্বারা এ কাজ হয়েছে।

সতীশ। নির্দোষ কি করে বলেন? আমি নিজে তার বাগানবাড়ী থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করেছি।

শরৎ। এখন আপনি কি বলতে চান?

পঞ্চানন। এর কথার উপরে বিশ্বাস করে কি তুমি তাকে শাস্তি দিতে চাও? এর দ্বারাই যে সে কাজ হয় নি, তা তুমি কি করে বুঝলে? আজ দু'দিন সেবক সেজেই এ নির্দোষ হয়ে গেল? এর চরিত্র সম্বন্ধেও কারো অভিজ্ঞতা কম নেই। রাইকিশোরবাবুর বাড়ীতে একে নিয়ে কেলেঙ্কারী কি কম হয়েছিল?

শরৎ। সেইটে হয়েছিল এই সেবক সমিতিটাকে ভাঙ্গবার জন্য, একে জব্দ করার জন্য। কিন্তু সে ঘটনা মূলে যে একেবারে ভিত্তিহীন, তা সকলেই একবাক্যে মেনে নিয়েছিলেন। যাক্, তা হলে আপনারা

বাড়াবাড়ি না করে ছাড়ছেন না? তবে এইটুকুন আপনি জেনে যেতে পারেন যে, দামোদরবাবুর বাড়ীতে কোন ব্যাপারে ভূরি-ভোজনের ব্রাহ্মণের অভাব হবে না।

পঞ্চানন। তা যা হয় হবে। শুধু ভোজনের কাঙ্গালী হয়েই তাঁর বাড়ীতে যেতাম না। সমাজকে উপেক্ষা করে এ বৃদ্ধ বয়সে চলবার আর ইচ্ছা নেই, জাতি ধর্ম দেখতেই হবে।

(নিতাইয়ের প্রবেশ)

নিতাই। হ্যাঁ, ব্রাহ্মণ। জাতি-ধর্ম দেখতেই হবে।

(গীত)

জাতের নামে বজ্জাতি সব,
জাত-জালিয়া খেলছ জুয়া,
ছুঁলে পরেই জাত যাবে,
জাত ছেলের হাতের নয় তো মোয়া
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি,
ভাবলি এতে জাতির জান,
তাই তো বেকুব করলি তোবা
এক জাতিকে একশখান;
এখন দেখিস ভারত জোড়া,
পড়ে আছিস বাসী মড়া,
জাত নাই আজ আছে শুধু,
জাত শেয়ালের হুক্কা হুয়া।

পঞ্চানন। বলি, ধর্ম-কর্ম এ সব তো দেখতে হবে?

নিতাই। জানিস না কি ধর্ম সে যে,
বর্ম সম সহনশীল,
তাকে কি ভাই ভাঙতে পারে,
ছোঁয়া-ছুঁইর ছোট্ট ঢিল,
যে জাত ধর্ম ঠুন্‌কো এত,
আজ নয় কাল ভাঙবে সে তো,
যাক্ না সে জাত জাহান্নামে,
রইবে মানুষ নাই পরোয়া।

বলতে পারিস বিশ্বপিতা
ভগবানের কোন্ সে জাত,
কোন্ ছেলের তাঁর লাগলে ছোঁয়া,
অশুচি হন জগন্নাথ।
নারায়ণের জাত যদি নাই,
তোদের কেন জাতের বালাই,
ছেলের মুখে থুথু দিয়ে,
মা'র মুখে দিস ধূপের ধোঁয়া।
ভগবানের ফৌজদারী কোর্ট,
নাই সেখানে জাত বিচার,
পৈতা টিকি টুপি টোপর,
সব সেথা ভাই একাকার,
জাত যে শিকেয় তোলা রবে,
কর্ম নিয়েই বিচার হবে।

পঞ্চানন। তারপর?

নিতাই। বামন চাঁড়াল এক গোয়ালে,
নরক কিম্বা স্বর্গে খোওয়া।

(প্রস্থান)

পঞ্চানন। যত সব বিধর্মী জুটে সমাজটাকে উচ্ছন্নে দিতে বসেছে! (প্রস্থান)

শরৎ। সতীশ, তুমিও যাও। দামোদরবাবুকে বলবে, তিনি যেন তাঁর বাবার বাৎসরিক শ্রাদ্ধের আয়োজন করেন, আমি নিজে উপস্থিত থেকে কার্য সমাধা করবো। আর রাজেন্দ্রপুরে প্রচার করে দাও গোপীকে নিয়ে যেন কেউ না খায়, এবং তার সাথে কেউ কথা না বলে। হয় সে তার চরিত্র সংশোধন করবে, না হয় তাকে এ পল্লী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করতে হবে। দামোদরবাবুকে আরো বলো, তিনি যেন সকলকেই নিমন্ত্রণ করেন, যার খুশী তিনি আসবেন, তার কর্তব্যের যেন ত্রুটি না হয়। তোমরাও গোপীকে সংশোধনের চেষ্টা করো। (উভয়ের প্রস্থান)

ষোড়শ দৃশ্য

স্থান—বিদ্যালয়

(বিমলা, সুলভা, নির্মলা, প্রফুল্ল, ছাত্রীগণ, সেবকগণ,
ফেরীওয়ালা, নিতাই)

নির্মলা। দিদি, তুমি আজ আমাদের সেই মারাঠা বীরের কবিতাটি একবার শোনাও।

(কবিতা পাঠ)

সুলভা। শুনিয়া জননী পুত্র তাঁহার
হারিয়া এসেছে রণে,
দুঃখে বিষাদে অশ্রু দু' ফোঁটা
ফেলিলা সংগোপনে।
অঞ্চলে মুছে আঁখি
পুত্রে কহিলা ডাকি,
ক্রোধ কম্পিত-কণ্ঠ তাঁহার ;
হা রে হতভাগা, হা রে,
যুদ্ধক্ষেত্রে তুচ্ছ এ প্রাণ
রাখিতে পারিলি না রে ?
লাজে অবনত শিরে
ফিরিয়া আসিলি ঘরে,
আপন জীবন দিতে পারিলি না,
আপদ যাইত চুকে ;
মারাঠা বীরের তনয় হইয়া,
ফিরে এলি কোন্ মুখে ?
রাজপুতগণ সনে,
যুঝিতে যুঝিতে রণে,
একদিন তোর স্বর্গীয় পিতা
প্রাণ দেন অবহেলে ;
হায় হতভাগা কুল-কণ্টক,
তুই না তাঁহারি ছেলে ?

পুত্র কিছু না কহে,
স্তব্ধ মৌন রহে,
জল্‌ জল্‌ জল্‌ অগ্নির সম,
জ্বলে উঠে আঁখি দুটি ;
মুক্ত কৃপাণ টানি লয়ে করে,
বাহিরে আসিলা ছুটি।
রণ-ভেরী ওঠে বাজি,
বাহির হইলা সাজি,
শত শত বীর সামরিক সাজে,
বম্‌ বম্‌ হর রবে ;
হেরেছে হেরেছে সেবার,
কিন্তু এবার জিতিতে হবে।
পুণ্য বিপাশা-তীরে,
সন্ধ্যা নামিছে ধীরে.
মিলিত তখন মারাঠা সৈন্য,
পুনঃ যুঝিবার তরে ,
চলিল যুদ্ধ মারাঠা-মোগলে,
সপ্ত দিবস ধরে।
এদিকে মারাঠা-পুরে,
শত শত ক্রোশ দূরে,
মারাঠা বীরের মহিষী,
উদাসীনা উন্মনা ,
পুত্রের লাগি ইষ্টদেবের,
করিছেন আরাধনা।
সপ্তাহকাল পরে,
ফিরিল আপন ঘরে,
যুদ্ধ বিজয়ী মারাঠা সৈন্য,
মত্ত বিজয়-নাদে ;
উড়ায়ে নিশান বাজায়ে বিষাণ,
হুঙ্কারী আহ্লাদে।
পুত্র আসিছে ফিরে,

বিজয়-মাল্য শিরে,
জননী তাহার চন্দন ফুল,
কুম্‌কুম্‌ নিয়ে করে ;
শুভ্র বসনে মধুর হাস্তে
দাঁড়ায়ে দুয়ার 'পরে।
পুত্রের লাগি তাঁহার,
সবুর সহে না আর,
সহসা সেথা বীর সেনাপতি,
কুর্নিস করে আসি,
নয়নে অশ্রু ঘর্ম ললাটে,
অধরে শুষ্ক হাসি ;
পুত্র রহিল কোথা,
জননীর ব্যাকুলতা,
হেরি সেনাপতি ফুঁকারি ওঠে ;
করপুটে মুখ ঢাকি,
জিতিয়া এসেছি আমরা,
কিন্তু তাহারে এসেছি রাখি।

নির্মলা। বীর জননীর বীর সন্তানই বটে, এমন মা-ই আমরা এখন চাই।

বিমলা। ইনি কে সুলভা ?

সুলভা। ইনি এই রাজেন্দ্রপুরের জমিদার শরৎবাবুর পুত্রবধূ। ইনিই এই বিদ্যালয়ের যাবতীয় খরচ বহন করেন। এক আদর্শ গৃহলক্ষ্মী তোমায় দেখাবো বলেই আজ আমি এঁকে খবর দিয়ে এখানে এনেছি।

নির্মলা। (নমস্কার করে) দিদি ইনি কে ? এঁকে তো আমি আর কখনো দেখি নি।

সুলভা। ইনি আমার একজন বাল্যবন্ধু, আমাদের বিষ্ণুপুর গ্রামের ডেপুটী ম্যাজিস্টেট নলিনীকান্ত রায় মহাশয়ের কন্যা। ইনি বর্তমানে বেথুন কলেজে Third year-এ পড়েন। আমাদের উৎসব দেখবার জন্য নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছিলাম, তাই আমাদের উৎসব দেখতে এসেছেন।

নির্মলা। বেশ, বেশ ! এঁরা এসে যদি আমাদের একটু উৎসাহিত করেন তবেও আমরা কিছুটা বল পাই। দিদি, আজ কাগজে অনেক ভারত-

মহিলার নাম দেখলাম, তাঁদের লেখা হয়েছে এঁরা অদ্ভুত প্রতিভা-শালিনী ভারত-মহিলা।

বিমলা। শুধু কি তাই! তাঁরা স্বদেশ-প্রেমিকা, স্বদেশ-মান্যা, সর্বজন-পূজিতা দেশ-কর্মিণী, ভারতবাসীর গৌরব।

নির্মলা। যে শিক্ষা পেয়ে তাঁরা আজ এ আসনে দাঁড়িয়েছেন, আমরা সে শিক্ষা পেলে কি তাঁদের মতন হতে পারি না?

সুলভা। কে বলে পারো না? শিক্ষা পেলে ভারত-মহিলা অঘটন ঘটাতে পারেন।

বিমলা। বর্তমান ভারতে অনেক মেয়ে আছেন, যাঁরা জননায়কত্বের দাবী করছেন এবং তাঁরা তা করতেও পারেন।

সুলভা। তা পারেন বটে, কিন্তু মনে রেখো বিমলা, মেয়েদের মাতৃত্বের সম্মান বহু উচ্চে। যে সকল মেয়েরা জননায়কত্বের দাবী করেন, তাঁদের ভেতরে মাতৃত্ব ঠিক ঠিক ভাবে ফুটে উঠেছে কিনা, সেইটেই হচ্ছে ভাববার বিষয়। আমাদের দেশে প্রচলিত কথা এই যে, মাতৃত্ব নারীকে দেবীর আসনে উন্নীত করে।

বিমলা। গত জার্মান-যুদ্ধের সময় সম্ভ্রান্ত ইংরেজ ঘরের মেয়েরা ভোগ-বিলাস তুচ্ছ করে রণক্ষেত্রে আহতের সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন, ইহা কি মাতৃত্বের জলন্ত দৃষ্টান্ত নয়?

সুলভা। ইহা রমণীর ধর্ম, দয়া, কোমলতা পরসেবা, পরের জন্য প্রাণ উৎসর্গের ইচ্ছা—এসব রমণীর রক্তমাংসের সঙ্গে বিজড়িত।

বিমলা। তা হলে মনে হয়, তোমরা মেয়েদের উচ্চশিক্ষা সমর্থন করো না?

সুলভা। উচ্চশিক্ষার বিরোধী আমরা নই, কারণ, উচ্চশিক্ষা বলতে যা বোঝায় তা এ দেশের মেয়েদের ভিতরেই ছিল, এখনো আছে। সীতা-সাবিত্রী যে উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন তা বোধ হয় অস্বীকার করতে পারবে না!

বিমলা। তা কি করে হয়? তাঁরাই যে আমাদের আদর্শ!

সুলভা। যদি তা-ই হয় তবে রামায়ণে সীতাদেবী বার বার বলেছেন, আমি ঋষিদের মুখে শুনেছি, আমি গুরুজনের কাছে উপদেশ পেয়েছি!

বিমলা। এ কথায় তুমি আমাকে কি বোঝাতে চাও?

সুলভা। এ কথায় আমি তোমাকে এই বোঝাতে চাই যে, তাঁরা পুঁথির তাড়া বগলে করে মোটর হাঁকিয়ে কখনো কলেজে যান নি।

বিমলা। তুমি বর্তমান শিক্ষার যতই ত্রুটি দেখাও না কেন, বর্তমান শিক্ষায় যে মেয়েদের কর্মকুশল ও স্বাবলম্বী করে দেয়, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

সুলভা। তা বটে, কিন্তু উহাতে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করে নারী সুষ্ঠু ও সবল হয়ে সংসার-যাত্রা সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে সক্ষম হন, এ কথা বোধ হয় কোন সমাজ-সেবকই জোর করে বলতে পারেন না।

বিমলা। কলেজে মেয়েদের আর কিছু হউক না হউক, একটা এই হয় যে, তাঁরা নানা শ্রেণীর লোকদের সাথে মেলামেশা করে ব্যায়াম, ভূয়োদর্শন ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

সুলভা। তখনকার মেয়েরা আধুনিক শিক্ষা পেতেন না বটে, কিন্তু তাঁরা রণক্ষেত্রে স্বামীর রথের অশ্ব চালনা করতেন। স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁরা মরতেন, আধুনিক মেয়েদের মতন তাঁরা কথায় কথায় মূর্চ্ছা যেতেন না।

নির্মলা। হ্যাঁ দিদি! এটা কিন্তু ঠিক বলেছ। আজকালকার মেয়েদের কথায় কথায় ফিট্ হয়; এ যেন একটা স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুলভা। আরে, তা আবার যারা বেশী সুন্দর তাদেরই বেশী হয়। গ্রাম্য ভাষায় ওকে বলে পেখ্না; আর সাহিত্যিকের ভাষায় ওকে বলে দুর্বলতা। প্রাচীন ভারতের মেয়েরা অল্প বয়সে বিয়ে বসতেন, বহু সন্তানের মা হবেন এই আশায়। কিন্তু আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েরা সন্তান প্রসব করার কথা মনে করে বিয়েই বসতে চান না। দেশ-প্রেমিকগণ নারীর এই সন্তানধারণের বিতৃষ্ণা দেখে দেশের ভবিষ্যৎ ভেবে চিন্তাকুল হয়ে পড়েছেন। এখন বুঝে দেখ বিমলা, যে শিক্ষায় নারীকে মাতৃত্বের ভয়ে ভীতা হতে হয়, সে শিক্ষাকে আমি কিরূপে প্রকৃত শিক্ষা বলে গ্রহণ করতে পারি?

নির্মলা। এই জন্যই নিতাইবাবু মেয়েদের বিদ্যালয়গুলিকে পুরাতন আদর্শ নিয়ে গড়তে যাচ্ছেন।

সুলভা। জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে হলে মেয়েদের বর্তমান শিক্ষালয়গুলির আমূল সংস্কার করতেই হবে। দাদা সেদিন বললেন, একটা বিজ্ঞাপনে দেখলুম সুলভা, বছরে ষোল লক্ষ লোকের বেশী মৃত্যু হয়। এর মধ্যে ছয় লক্ষের উপরে মরে যাদের বয়স দশ বছরের কম, আর প্রায় চার লক্ষ শিশু বছর না পুরতেই জননীর বুক খালি করে চলে যায়।

নির্মলা। দিদি, এ তুমি বলো কি? দেশের লোক কি সব ঘুমিয়ে আছে নাকি?

সুলভা। ঘুমিয়ে আছে বলেই তো দাদা সর্বদা মায়ের কাছে প্রার্থনা করেন।

(ছাত্রীদের গীত)

জাগ গো জাগো জননী, (ওমা শ্যামা)
তুই না জাগিলে শ্যামা,
কেউ জাগিবে না গো মা,
তুই না নাচালে কারো,
নাচিবে না ধমনী।
ডেকে ডেকে হনু সারা,
কেউ সারা দিলে না মা ,
তুই না জাগালে প্রাণ,
কাঁদিবে কি কারো প্রাণ ,
মা জাগিলে সবার প্রাণ,
পোহাবে কি রজনী।
নাম ধর দয়াময়ী,
দয়া কি মা আছে তোর,
দয়া থাকলে মরে কি আজ,
ত্রিশ কোটী ছেলে তোর ,
মরি তাতে ক্ষতি নাই,
বাসনা মা দেখে যাই,
ভারতের ভাগ্যাকাশে,
উঠেছে দিনমণি।
নিবেদিলাম তব পায়,
ঠেল না পায় তারিণী,
ছেলের কথা চিরকাল,
রাখে জানি জননী ;
মুকুন্দের কথা রাখ,
করুণা-নয়নে দেখো,
অকূলে পড়েছি মোরা,
তার দীন তারিণী।

বিমলা। (স্বগত) অপূর্ব আলোচনা! ক্রমেই যেন শিক্ষার অভিমান চূর্ণ হয়ে আসছে।

সুলভা। কলকাতায় গত বছরে দু'হাজার শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

বিমলা। মৃত্যুর কারণ কিছু নির্দেশ হয়েছে কি?

সুলভা। দাদা তো বলেন গৃহিণী ও ধাত্রীদের অজ্ঞতা। এ বিষয়ে মুসলমানদের দুর্দশাই বেশী। কলকাতায় মুসলমানদের শতকরা পঁচাত্তরটি শিশুর মৃত্যু হয়।

বিমলা। দেশে এমনভাবে আন্দোলনের স্রোত বয়ে যাচ্ছে, অথচ এদিকে কারো লক্ষ্য নেই, আশ্চর্য!

সুলভা। তাই তো দাদা বলেন—শিশুর মৃত্যুর আধিক্যে জাতির যে সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে, তা ভাবলেও বুক কেঁপে ওঠে। যাঁরা রাজনীতি অধিকার লাভের জন্য ব্যাকুল এবং সেজন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তাঁরা যে জাতির এই ধ্বংসের দিকে কেন লক্ষ্য করছেন না, তাই বুঝে উঠতে পারছি না।

বিমলা। তাই বটে, কাগজে দেখেছিলাম, পঞ্চাশ বছর পূর্বে ধাত্রী ও জননীদিগকে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় শিক্ষা প্রদানের উপযোগিতা অনুভব হয়েছিল।

সুলভা। তাই তো আজ অত্যন্ত পরিতাপের সহিত বলতে হচ্ছে বোন, পঞ্চাশ বছর পরে আজ দেশের লোক রাজনীতির আন্দোলনে যত ব্যস্ত, এদিকে তত মনোযোগী নন। দেশে যদি মানুষ না থাকে, তবে আন্দোলন চালাবে কে? তাই বলছি, আগে অকাল মৃত্যুর সংখ্যাটা কমাও, তারপরে তোমরা অন্য কার্যে হাত দাও, কাজ হবে সুন্দর।

নির্মলা। শ্বশুর বাড়ীতে প্রসূতির সেবাশুশ্রূষার অনেক সময় ত্রুটি হয়, এ জন্য দায়ী কে?

সুলভা। দায়ী বর্তমান সমাজ। মেয়ে জন্মগ্রহণ করলেই বাড়ীর লোকের মুখ অন্ধকার হয়, মা আপনাকে নিতান্ত অপরাধী মনে করেন। তারপর যদি মেয়েটার অসুখ হয়, তবে বাড়ীর লোকে তাচ্ছিল্যের ভাবে বলেন, এ মেয়ে মরবে না। সে যে অনাদরের, সেই বিশ্বাস বালিকার মনে বাল্যকাল থেকেই বদ্ধমূল হয়। তারপরে শ্বশুর বাড়ীতে সে "পরের মেয়ে" অধিকাংশ ঘরেই শাশুড়ী মাত্র। এসব

কারণেই প্রসবের পূর্বে জননীর দেহ দুর্বল হয়, তার ফলে শিশুও দুর্বল হয়। ঐ দৌর্বল্যই অনেক শিশুর মৃত্যুর কারণ।

নির্মলা। আমাদের বিদ্যালয়ের মেয়েদের এসব কথা ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে। তাদের মাতৃত্ব যাতে ফুটে ওঠে, সেদিকেই এখন আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

সুলভা। হ্যাঁ, মেয়েদের ঐ দিক্‌টায়ই বেশী লক্ষ্য রাখবে। আমাদের অবজ্ঞা ও কুসংস্কার ঐ আঁতুড়ঘরেই ফুটে ওঠে, তা যাতে না হয়, সে দিকটায়ই বিশেষ লক্ষ্য রাখবে। সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ঘরখানাই যেন আঁতুড়ঘরের জন্য দেওয়া না হয়। ছেলেদের যদি শক্তিশালী করে তুলতে চাও, তবে ঐ আঁতুড়ঘরই সর্বপ্রথম সংস্কার করে তুলতে হবে।

(গোবর ছড়া দিতে দিতে একটি বালিকার প্রবেশ)

সুলভা। প্রফুল্ল ? ও কি করছ ?

প্রফুল্ল। দেখতেই তো পাচ্ছ গোবর ছড়া দিচ্ছি। ভোর হয়ে গেছে যে !

বিমলা। এতে কি হয় ?

প্রফুল্ল। এতে গৃহস্থের স্বাস্থ্যোন্নতি হয়। গোবরে যেমন করে দুর্গন্ধ নাশ, তেমন করে ম্যালেরিয়া দূর, তার পরে গোবরের গন্ধ মনের পবিত্রতা আনয়ন করে।

বিমলা। গোবরের এত গুণ, তা জানতুম না, একটা জ্ঞান হলো।

প্রফুল্ল। গৃহস্থের মেয়ে, ঐ টুকুনই জান না, কেবল সাজ-পোশাকেরই পরিপাটী ! প্রত্যূষে সকল মেয়েদেরই গোবর ছড়া দেওয়া কর্তব্য। গোবর ছড়া দিয়ে শ্বশুর-শাশুড়ীর পাদোদক নিয়ে গৃহকার্য আরম্ভ করতে হয়। বুড়োরা বলেন এ না করলে নাকি প্রাণ সরস হয় না।

(প্রস্থান)

সুলভা। বিমলাকে এর একটু পরিচয় দিচ্ছি। এ নমঃশূদ্রের মেয়ে, ধাত্রী বিদ্যেটা বেশ আয়ত্ত করেছেন।

বিমলা। সে কাজ একে শেখালে কে ?

সুলভা। কেন ? আমাদের বিদ্যালয়েই শিখেছে। আমরা যে সবই জানি। আমরা আমাদের জাতীয় আদর্শ ম্লান করি নি, বরং উজ্জ্বল করে তুলবার চেষ্টা করছি।

(দূরে সেবকদের গান)

জাগো ভারতবাসী রে
কত ঘুমে রবে রে,
বল সব হয়ে একমন ,
বন্দে মাতরম্

বিমলা। ও কারা গান গাচ্ছে ?

সুলভা। বোধ হয় পল্লী-সেবকেরা প্রভাতী গাচ্ছে, এদিক দিয়েই যাবে, এস, আমরা একটু বসি।

(সেবকদের প্রবেশ ও গান)

ভাই রে ভাই—
জননী আর জন্মভূমি
স্বর্গ হতে শ্রেষ্ঠ জানি রে,
ছ'য়ে ভক্তি নাহি যার,
নরকে নিবাস তার,
পুবাণে লিখেছেন মুনিগণ ,
বন্দে মাতরম্।

ভাই বে ভাই—
হিন্দু আর মুসলমান,
এক মায়েরই দু'টি সন্তান রে,
একত্র হইবে সবে,
মায়ের পূজা কর ভবে,
ধন্য হবে মানব জীবন ,
বন্দে মাতরম্।

ভাই রে ভাই—
কামার কুমার জোলা তাঁতি,
হায় হায় করে দিবারাতি রে,
বিদেশী শিক্ষার গুণে,
সকলে বিদেশী কিনে,
কি খাইয়ে রাখিব জীবন ,
বন্দে মাতরম্।

ভাই রে ভাই—
ভারতের সুসন্তান,
কর সবে অবধান রে,
বিদেশী লবণ চিনি,
অপবিত্র শাস্ত্রে শুনি,
ছুঁয়ো না ভাই চিনি আর লবণ ;
বন্দে মাতরম্ ।

ভাই রে ভাই—
একটি সুপুত্র হলে
মা সুখী হন ভূমণ্ডলে রে,
ত্রিশ কোটী সন্তান যার,
আজ কি দুর্দশা তাঁর,
দেখ সবে মেলিয়ে নয়ন ,
বন্দে মাতরম্ ।

ভাই রে ভাই—
মেড়ারে মারিলে চুঁস্
সেও ফিরে করে রোষ রে,
আমরা এমন জাতি,
খাইয়ে পরের লাথি,
ধূল ঝেড়ে চলে যাই ভবন ,
বন্দে মাতরম্ । (প্রস্থান)

বিমলা । (স্বগত) এ কি শুনছি, একি দেখছি ? যতই দেখছি ততই তো আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি । কি শিক্ষার গৌরবে আত্মহারা হয়ে এদের অশিক্ষিতা মনে করেছিলাম, আজ সকল গর্ব চূর্ণ হয়ে আমার গর্বিত মস্তক যে আপনা হতেই ওদের চরণে লুটিয়ে পড়তে চাচ্ছে ! এদের পাণ্ডিত্যের কাছে যে আমাকে এখনো শিশু বলে মনে হয় ।

সুলভা । বিমলা ! ভাবছ কি ?

বিমলা । ভাবছি অনেক সুলভা, বোন ! আজ আমি একটা নূতন রাজ্যে নূতন হয়ে জন্ম নিয়েছি বলে মনে হচ্ছে । তুমি আজ আমায় কৃতার্থ করলে, তোমাদের উৎসবে এসে আজ আমার বিজয় উৎসব হয়ে গেল । আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি, তুমি আমার কর্তব্য স্থির করে দাও ।

সুলভা। আনন্দম্! কর্তব্য মহাত্মার আদেশ, চরকা ধরো, খদ্দর পরো। গৃহ-শিল্পের দিকেই এখন আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হবে। মনে রেখো আমাদের কাজ বাইরে কিছুই নেই, ভেতরে। মহাত্মা যে সকলকেই চরকা কাটতে বলছেন, ও সকলের কর্ম নয়; মেয়েদের হাতেই কোনদিন চরকা ছিল, আবার আমাদেরই ঐটে ধরতে হবে। ছেলেদের কাজ বাইরে যথেষ্ট আছে; চরকা কাটার চেয়েও অনেক বড় বড় কাজ তাদের করতে হবে, এবং সে জন্য ঘরে বসেই আমাদের তাদের সাহায্য করতে হবে।

বিমলা। তবে দাও, আমায়ও খদ্দর দাও। ঐ পোষাকগুলি এখন আমায় বড়ই জ্বালা দিচ্ছে।

(বাহিরে ফেরিওয়ালা)

"চাই দেশী কাপড় খদ্দর"

সুলভা। এদিকে নিয়ে এসো। ঐ ফেরিওয়ালা আসছে, আমি এখনই তোমায় খদ্দর দিচ্ছি।

(ফেরিওয়ালার গীত)

আমরা নেহাৎ গরীব,
আমরা নেহাৎ ছোট,
তবু আছি ত্রিশ কোটী,
জেগে ওঠ।
জুড়ে দে ঘরে তাঁত,
সাজা দোকান,
বিদেশে না যায় ভাই
গোলারি ধান;
মোটা খাবো,
ভাই রে পরবো মোটা,
আমরা মাখবো না লেভেণ্ডার,
চাই না অটো।
নিয়ে থায় মায়ের দুধ পরে দুয়ে,
উপোসী রব কি ঘরে শুয়ে,
শোন্ বিদেশী আমরা বুঝেছি সব,
খেলনা দিয়ে মোদের সোনা লোটো।

স্থলভা। ভাই, আমায় একখানা খদ্দরের শাড়ী দাও না!

ফেরী। (শাড়ী দিয়ে) এই নাও দিদি।

স্থলভা। দাম কত?

ফেরী। তিন টাকা পাঁচ আনা।

নির্মলা। আজ যান্, কাল এসে টাকা নিয়ে যাবেন।

ফেরী। যে আজ্ঞে! (প্রস্থান)

স্থলভা। এই নাও বোন্, এখানা আমি তোমায় Present করলুম। আশা করি খুব যত্ন করেই পরবে আর এই চরকাটি নাও, গৃহশিল্প শিক্ষা করে আদর্শ গৃহিণী হও, দেবতার কাছে আমি এই প্রার্থনাই করবো।

বিমলা। আমার লক্ষ্য কি তা বলে দাও!

স্থলভা। উত্তম, আমি দুটি আদর্শ তোমার সামনে উপস্থিত করছি, এর যেটি তোমার মনোনীত হয় সেটি তুমি নিজেই বেছে নিও। যদি গৃহিণী হতে চাও সীতা, সাবিত্রী বা দময়ন্তীর পদাঙ্কানুসরণ করে চলো। আর যদি ব্রহ্মবাদিনী হতে চাও তবে গার্গী ও স্থলভার পথ অনুসরণ করে চলো, ধন্য হবে, কৃতার্থ হয়ে যাবে।

বিমলা। সত্য সত্যই আজ তুমি আমায় কৃতার্থ করলে বোন, এসো তোমায় আলিঙ্গন করে ধন্য হই। (আলিঙ্গন)

(নিতাইয়ের প্রবেশ)

নিতাই। স্থলভা, মায়ের কৃপায় তোমার উৎসব আজ সার্থকই হয়েছে। তবে তোরা মায়েব নাম কীর্তন কর।

(মেয়েদের গান)

বল ভাই মেতে যাই বন্দে মাতরম্;
বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্।
ভারত সন্তান, নিয়ে মায়ের নাম,
হও আগুয়ান, নাচ্‌বে এ প্রাণ,
নাম মধুরম্,
বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্।
নাম গানে, এ মরা প্রাণে,

জলছে আগুন, জলিবে দ্বিগুণ,

নামই রুদ্রম্ ;

বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্ ।

আসবে প্রাণে বল, মায়ের নাম কর সম্বল,

দেল্-দরিয়ায় উঠবে তুফান,

মন্ত্র গভীরম্ ;

বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্ ।

"কালী মাঈকী জয় ।"

(যবনিকা পতন)

ব্রহ্মচারিণী

—:*:—

মুকুন্দদাস প্রণীত

নায়ক

প্রেমানন্দ		জনৈক ব্রহ্মচারী।
ব্রজেশ্বর	...	জমিদার।
ধীরেশ্বর	...	ঐ পুত্র।
হরগোবিন্দ		ঐ দেওয়ান।
দীনবন্ধু	...	ঐ গৃহস্থ প্রজা।
সুধীর		দীনবন্ধুর পুত্র
কালাচাঁদ	...	ঐ পুরাতন ভৃত্য।
রাজীব দত্ত		সুদখোর।
জগন্নাথ	.	ঐ পুত্র।
মতি দত্ত		ব্রজেশ্বরের কর্মচারী।
নিতাই দাস	...	দরিদ্র গৃহস্থ।

ভোলা, গোয়ালা, ভাস্কর, দারোগা, চৌকিদার, কৃষকবালকগণ,
শিবদাস, উকীল, গুরুদেব, ইত্যাদি।

নায়িকা

আনন্দময়ী		ব্রজেশ্বরের কাকিমা।
তারামণি	...	মতি দত্তের বিধবা ভগ্নি।
রাইমণি		ঐ মাতা।
জ্ঞানদা	..	রাজীব দত্তের স্ত্রী।

ব্রহ্মচারিণী, ছদ্মবেশী মা।

ব্রহ্মচারিণী

—:*:—

প্রস্তাবনা

স্থান—কৈলাসের উপবন।

(ব্রহ্মচারিণীগণ, প্রেমানন্দ ও মা)

(গীত)

ব্রহ্মচারিণীগণ। জাগ রে জাগ রে ডাক রে ডাক রে,
মাত রে মায়ের নাম-গানে ;
প্রেমানন্দময়ী প্রেমানন্দ দানে,
তুষিবেন আপন সন্তানে।
ঘুচিবে আঁধার পড়িবি আলোকে,
নাচিবে ভারত নাচিবে পুলকে,
আবার ফুটিবে পারিজাত মল্লিকে,
ভারত-নন্দন-কাননে।
পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি মায়ের কৃপায়,
অঘটন ঘটে যদি মা ঘটায়,
রতি মতি ভক্তি থাকিলে সে পায়,
ভয় কি তরঙ্গ তুফানে॥

(প্রেমানন্দের প্রবেশ)

প্রেমানন্দ। তোরা উপবনে বসে কি করছিস?

ব্রহ্মচারিণীগণ। আমরা মায়ের পূজার ফুল তুলছি।

প্রেমানন্দ। মা তো আমায় কর্মক্ষেত্রে পাঠাচ্ছেন, তোরাও কি আমার সঙ্গে যাবি?

ব্রহ্মচারিণীগণ। হ্যাঁ—আমরাও যাবো।

প্রেমানন্দ। ঐ যে মা এসেছেন।

(মায়ের প্রবেশ)

মা। প্রেমানন্দ! এখানে বসে কি ভাবছ? যাও, সমাজে যাও, গিয়ে আমার মাতৃ-শক্তিকে জাগ্রত করো।

প্রেমানন্দ। আমি কি তা পারবো মা?

মা। ভয় কি? আমিই তোমায় রক্ষা করবো। ধর এই বিজয় ত্রিশূল, এই ত্রিশূলই তোমায় রক্ষা করবে।। (ত্রিশূল প্রদান)

প্রেমানন্দ। (গ্রহণ করে) আনন্দম্! গাও দিদিরা, মায়ের জয়গীতি গান করো।

(গীত)

ব্রহ্মচারিণীগণ। জয় জয় সনাতনী, জগৎ পালিনী
বিশ্ব বিহারিণী ত্বং,
দুরিত হারিণী, বিপদ বারিণী
প্রেম-মধু দায়িনী ত্বং,
গাওত নাচত, বোলত ভোলা,
মন প্রাণ প্রমাদিনী ত্বং।
ডুবত ত্রিভুবন, প্রেম সলিলে,
প্রেম প্রবাহিণী ত্বং,
পিবত ভকত, চিত প্রমোদিত,
মোদ বিথারিণী ত্বং।
যাচত দীনজন, শ্রীপদ কমলে,
দীনজন জননী ত্বং
দেহিমে বুঁদ প্রেম, গাওত—গাওব—
পতিত জন তারিণী ত্বং।

প্রেমানন্দ। কালী মাঈকী জয়। (প্রস্থান)

প্রথম দৃশ্য

স্থান—দীনবন্ধু রায়ের বাড়ী।

(দীনবন্ধু, রাজীব দত্ত, সুধীর, রাইমণি, কালাচাঁদ, প্রেমানন্দ)

রাজীব। আপনারই তো হক মামলা, অথচ আপনি হেরে গেলেন?

দীনবন্ধু। হক বিহক বিচারকর্তার হাতে, তুমি আমি কি জানি ভাই?

রাজীব। আপনার সাত পুরুষের তালুক—জমিদার খাস করে নিলে?

দীনবন্ধু। হয়তো এই সাত পুরুষের মিয়াদী পাট্টাই বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।

রাজীব। তা বলে এমন নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা ঠিক নয়, একবার আপীল করে দেখলে পারতেন।

দীনবন্ধু। আমি প্রথম আদালতে মোকদ্দমা করতেই রাজী ছিলাম না। জমিদারবাবুদের প্রবল ধন বল, তাঁদের সাথে মামলা করা আমার সাজে না, মামলায় হারা-জেতা টাকার উপর নির্ভর করে।

রাজীব। তাই যদি বোঝেন, তবে তো জমিদারের সাথে রফা করে চললেই ভাল ছিল; ব্রজেশ্বরবাবুর সাথে আপোষ করলে আপনার সম্পত্তি আপনি ফিরে পেতেন।

দীনবন্ধু। তা হয় না দত্তমশায়, রায়মশায়ের সাথে আপোষ করার অর্থ তাঁর সাথে আদালতে মিথ্যা সাক্ষী দিতে রাজী হওয়া, গরীব চাষা প্রজাদের উপর অত্যাচার পীড়ন করার জন্য তাঁর সাথে লাঠি নিয়ে ধাওয়া, সতীর সতীত্ব নাশে সাহায্য করা, মানীর মান নাশে যোগ দেওয়া, এ সকল কার্যে আমি নিতান্ত অসমর্থ।

রাজীব। তা হলে তো আপনার বড় বিপদ দেখছি। ব্রজেশ্বরবাবুর ছলনায় আপনি যে ভিটায় থাকতে পারবেন, এমন সম্ভাবনা আমি দেখছি না।

দীনবন্ধু। তা তো আমি জানি, হয় তো আমায় গাছতলায় আশ্রয় নিতে হবে। মায়ের ইচ্ছা থাকে তো তাই হবে; অট্টালিকা আর গাছতলায় তফাৎই বা কি? দু'দশ দিনের জন্য একটা বিশ্রামের স্থান বই তো নয়?

রাজীব। তা বটে। মহাশয় ব্যক্তি কিনা, ক'দিনেরই বা ঘর-বাড়ী, ক'দিনের জন্যই বা সংসার! তবে কি জানেন, আপনার একটা বুনিয়াদি ঘর এমনভাবে উচ্ছন্নে যাচ্ছে দেখে প্রাণে বড় কষ্ট হয়। একবার আপীল করে দেখলে পারতেন, টাকার জন্য ভাবনা আপনার ছিল না, যত টাকা লাগে আমি দিচ্ছি। আপনাকে রক্ষা করতে আমি সর্বদার জন্যই প্রস্তুত আছি।

দীনবন্ধু। টাকাটা কি আপনি আমায় দান করবেন?

রাজীব। দান করবার সাধ্য কি আমার আছে?

দীনবন্ধু। তবে বিনা সুদে হাওলাত দেবেন?

রাজীব। তাই বা কি করে হয়? অল্প কিছু সুদ না পেলে আমিই বা খাই কি করে?

দীনবন্ধু। তবে সুদ-খতে দেবেন?

রাজীব। দেখুন, আপনাকে টাকা দেওয়া এ বেশী কথাই বা কি? তবে কি

না স্থ-খত আর মর্টগেজ একই কথা, আপনার খামার-জমি ক'খানা মর্টগেজ রাখলেই তো হলো!

দীনবন্ধু। আমায় মাফ করুন, আমি টাকাও ধার নেবো না—মামলাও করবো না, আপনি বৃথা কষ্ট করে এখানে এসেছেন।

(সুধীরের প্রবেশ)

সুধীর। ও পাড়ার মতি দত্তের মা আপনার কাছে এসেছেন।

দীনবন্ধু। কে মতি দত্তের মা—রামলোচন দাদার স্ত্রী? কেন, কি জন্য? মশাই, আপনি অনুগ্রহ করে এখন অন্যত্র যান, আমার কাছে বোধ হয় আপনার অন্য কোন কাজ নেই। (রাজীবের প্রস্থান)

দীনবন্ধু। মতির মাকে আসতে বলো।

(রাইমণির প্রবেশ)

এসো, এসো বউ ঠাকরুন! কি মনে করে?

রাইমণি। গোটাকতক দুঃখের কথা জানাতে এসেছি, আর তো জানাবার জায়গা নেই।

দীনবন্ধু। তোমার এমন কি দুঃখ! মতি ভাল আছে তো? বউ-মাটি ভাল আছেন তো?

রাইমণি। সবই তো ভাল, তবে আমি আজ ক'দিন উপোস করে আছি।

দীনবন্ধু। সে কি? তাই তো দেখছি। তোমার চেহারাখানা যে একেবারে শুকিয়ে গেছে, ব্যাপারটা কি? মতি তো এখন চাকুরিতে দু'পয়সা পাচ্ছে!

রাইমণি। তা কি জানো ঠাকুরপো, সেই চাকুরীই তো এখন আমার কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুমিই তো সুপারিশ করে চাকুরী দিয়েছিলে, এখন তার উন্নতিও হয়েছে। বউমাকে নিযে বাসা করেছে, আজ দু'মাসের ভেতরে আমাকে একটি পয়সাও দেয় না, চিঠিখানা লিখলেও তার উত্তর দেয় না। যদিও কালে-ভদ্রে দেয তাতেও লেখে আমার নিজেরই এখন আর খরচে কুলোয় না।

দীনবন্ধু। মাগো তারা! তুমি ছেলের বাসায় চলে যাও না কেন? তোমায় বুঝি নিতেও চায় না?

রাইমণি। আমাকে নিতে চায়, কিন্তু একটি বিধবা মেয়ে আমার সংসারে আছে, তার সে কুলে কেউ নাই; তাকে কোথায় ফেলে যাবো? সে নচ্ছারটা বলে, আমি পরের বোঝা বইতে পারবো না।

দীনবন্ধু। তা তো বটেই! মা-বোনের চেয়ে পর কে-ই বা আছে। এতদিন আমায় জানাও নি কেন? সে যাই হউক, তোমাকে যদি তোমার ছেলে বাসায় নিতে চায় তবে তুমি চলে যাও; আর তোমার মেয়েটাকে আমার এখানে রেখে যাও। মনে কিছু ভেব না, রামলোচন দাদা আমার পর নন, তাঁর মেয়ে আর আমার মেয়ে একই, আমার ছেলে-মেয়ে যদি খায়, তবে সেও দুটি খাবে। আপন বাড়ী-ঘরের মতন থাকবে। এখন বাড়ীর ভেতরে যাও, স্নানাদি করগে। সুধীর তোর জেঠাইমাকে ভেতরে দিয়ে আবার আসিস।

(সুধীর ও রাইমণির প্রস্থান)

দীনবন্ধু। মা আনন্দময়ী, সংসারটাকে কি করে তুললি মা? মানুষ অর্থ উপার্জন করে মা-বোনকে খেতে দেয় না, এর চেয়ে অধঃপতন আর কি হতে পারে?

(সুধীরের প্রবেশ)

দীনবন্ধু। এই মতির মাকে চেন? রামলোচন দত্ত আমাদের একজন গোমস্তা ছিলেন, আমরা তাঁকে দাদা বলে ডেকেছি, তিনিও আমাদের ছোট ভাইয়ের অধিক ভালবাসতেন। সেই রামলোচন দাদার স্ত্রী এই মতির মা, সম্পর্কে তোমাদের জেঠাইমা হন। দেখো, যেন ওঁর যত্ন-আদরের ত্রুটি না হয়!

সুধীন। মতি আমাদের মোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল।

দীনবন্ধু। সেকথা ভুলে যাও। যে মাকে খেতে দেয় না, সে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে তার আশ্চর্য কি? শোন যা বলি, আমার একজোড়া নূতন কাপড় কাল এনে রেখেছি জানো তো? সে কাপড় জোড়া তোমার জেঠাইমাকে দিয়ে দিও। বউমাকে দিয়ে প্রণামী বলে দিও, যেন গরীব বলে দিচ্ছ তা জানতে না পারে। আর গোলা থেকে একমণ ধান বের করে ওর বাড়ীতে পৌছিয়ে দিও। ওরে কালাচাঁদ, একবার এই দিকে আয় তো বাবা!

(কালাচাঁদের প্রবেশ)

কালাচাঁদ। কেন ডাকছেন কর্তা?

দীনবন্ধু। শোন, গোলা থেকে একমণ ধান বের করে আজই মতি দত্তের বাড়ীতে দিয়ে আয়।

কালাচাঁদ। তার বাড়ীতে আমি ধান বয়ে নিয়ে যাবো কেন?

দীনবন্ধু। দুটি বিধবা খেতে পায় না, ওরা আমাদের আত্মীয়া, খেতে না পেলে দিতে হয় না?

কালাচাঁদ। ভারি তো আত্মীয়া দেখছি, শালার বেটা শালা মতি দত্ত তোমার খেয়ে মানুষ, আবার তোমারই মোকদ্দমায় জমিদারেব টাকা খেয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে এলো! পরমেশ্বর বাঁচিয়েছেন, তা না হলে সেই মোকদ্দমায়ই তোমার জেল হতো। আমি তার বাড়ী ধান নিয়ে যেতে পারবো না, সে বেটা চাকুরী করে, মাসে তার শ' টাকা কামাই—তার মা খেতে না পায, মরুক, তাতে আমাদের কি? দেখো কর্তা, রাজ্যি সমেত লোক তোমায একটা বোকা পেয়েছে, দুঃখ-কষ্ট থাক আর না থাক, তোমার কাছে এসে বললেই হলো।

দীনবন্ধু। দেখো কালাচাঁদ, ও সব কথা বলতে নেই, ওদের যথার্থই কষ্ট, তুমি ধান ক'টা দিয়ে এসো। আমার গোলায ধান থাকতে যারা স্বজন, তারা যদি অনাহারে থাকে, তা হলে মা লক্ষ্মী যে কুপিতা হবেন!

সুধীর। আর অধিক দিন গোলায় ধান উঠবার সম্ভাবনা দেখছি না। জমিদার যেরূপ ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেছে, তাতে খামার-জমিগুলি দখল করে নিতে আর বেশী সময় লাগবে না। আব সেই জন্যে কোন মামলা বাঁধলে মতি দত্ত দেবে মিথ্যা সাক্ষ্য সবাব আগে।

দীনবন্ধু। সুধীর, তুমিও যেন বিরক্ত? এ কি শিখেছ বাবা! তোমাকে তো আমার সুশিক্ষিত বলে বিশ্বাস ছিল। খামাব-জমি জমিদারে যখন নেবে, নিযে যাবে—। নিজেও খাবো না, আত্মীয-স্বজনও খাবে না। যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ নিজেও খাচ্ছি, স্বজন-বান্ধবেও খাক। কালাচাঁদ! ধান ক'টা দিয়ে আসিস বাবা।

কালাচাঁদ। কর্তার ইচ্ছায কর্ম, এই লোকটাব যে কি ভাব, তা এখনও বুঝতে পারলাম না। (প্রস্থান)

(প্রেমানন্দের প্রবেশ)

প্রেমানন্দ। জয় মা আনন্দময়ী!

দীনবন্ধু। এ—কে, ব্রহ্মচারী ঠাকুব যে—প্রণাম! আপনি দেশে এলেন কবে?

প্রেমানন্দ। সদ্যই এসেছি, এখন প্রবাস ছেড়ে স্ববাস আশ্রয় করবো স্থির করেছি।

দীনবন্ধু। সে কি! সারা জীবন ব্রহ্মচারী থেকে, বহু তীর্থ পর্যটন করে, এ

বৃদ্ধ বয়সে গৃহবাসী হবেন, এ কেমন কথা? আর গৃহই বা আপনার কোথায়?

প্রেমানন্দ। গৃহ আমার সর্বত্রই। এই যে নীল-গগনতলে স্নিগ্ধ শ্যাম শোভায়-শোভিতা ধরণী তাঁর স্নেহময় বিশাল বক্ষ পেতে রেখেছেন, ওর সর্বত্রই আমার গৃহ, সর্বত্রই আমার আশ্রয়।

দীনবন্ধু। এ যে দেখছি বড রকমের গৃহবাস, ও সকল দার্শনিক কথার আমরা কি বুঝি!

প্রেমানন্দ। দার্শনিক কথা নয়, শোন রায়মশাই, এই দীর্ঘ জীবন মুক্তি-কামনায় বহু তীর্থ পর্যটন করেছি, অসংখ্য যতি-ব্রহ্মচারীর সাথে তর্কমীমাংসা করেছি, মুক্তির সন্ধান পেলুম না, আনন্দের আস্বাদ পেলুম না, কেবল কঠোর নীরস তর্কে প্রাণটা মরুভূমি করে তুলেছি। তর্কে কি আনন্দ মিলিয়ে দিতে পারে? শাস্ত্রে কি আনন্দ ধরিয়ে দিতে পারে? আনন্দময় যেচে না দিলে নাকি আনন্দ কারো ভাগ্যে ঘটে না, তাই আমার গুরুদেব বলতেন—

(গীত)

তর্ক ছাড়, তর্কে কি তাঁর পাবে মূল?
তর্ক সুখের প্রতিকূল।
ঐ দেখ মলয় লাগে গায়,
কেমন কোকিল শ্যামা গায়:
বাগান জোড়া গন্ধে ভরা,
ফোটে কত রঙ্গের ফুল॥
সে যে তৃষ্ণায় যোগায় জল,
ক্ষুধার বেলায় ফল,
তাঁর চাঁদের আলো রবির কিরণ,
কিনতে হয় কি দিয়ে মূল
সে আছে কি না আছে,
ভাবলে সরে যায় পিছে;
আছে বললে প্রাণের কাছে,
দাঁড়ায় হয়ে প্রেমাকুল॥

যদি তাঁর প্রেমটি প্রাণে পায়,
শত শাস্ত্র ভেসে যায় ;
তাঁরে পেলে ভাসাই জলে,
মন্ত্র তন্ত্র সকল ভুল ॥

দীনবন্ধু। এ যে ভক্তির গান, বেদান্ত দর্শনের কথা তো নয় !

প্রেমানন্দ। তার জন্যই তো তোমার কাছে ছুটে এসেছি ভাই। অনেক দিন পূর্বে তোমার কাছে শুনেছিলাম তারা মা আনন্দময়ী, সেইরূপ ডাক শুনতে তীর্থ ছেড়ে ছুটে এসেছি, একবার শোনাও তো ভাই ! হৃদয়ে আনন্দের ধারা ঢেলে দিয়ে দয়াময়ী নাম শোনাও তো !

দীনবন্ধু। এ কি অপূর্ব পরিবর্তন ?

প্রেমানন্দ। ঘোর পরিবর্তন। দয়াময়ী মায়ের দয়া, যখন নানা স্থান ঘুরে ঘুরে তর্ক করে করে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম, আমার পরম ভাগ্য, গুরুদেব এসে উপস্থিত! তিনি জ্ঞানাঞ্জন দিয়ে আমার নয়নের আঁধার ঘুচিয়ে দিলেন, ভক্তি-মন্ত্র কানে দিয়ে আমায় আনন্দের পথে তুলে নিলেন ; গুরুর কৃপায় আমি আনন্দসুধা পান করেছি, আমি অমর হয়েছি।

দীনবন্ধু। তবে আবার এ গৃহবাসে ফিরে এলেন কেন ?

প্রেমানন্দ। কর্ম করতে এসেছি।

দীনবন্ধু। আপনার আবার কর্ম কি ?

প্রেমানন্দ। কর্ম লোক-সেবা। মায়ের অনন্ত কোটী সন্তান, আমার অনন্ত কোটী ভাই হিন্দু-মুসলমান, এই ভ্রাতৃগণের সেবাই আমার মায়ের সেবা, গুরুদেবের এইরূপই আদেশ।

দীনবন্ধু। পবিত্র তীর্থধামে শত শত মুনি, ঋষি, ব্রহ্মচারীর সেবা পরিত্যাগ করে এ পল্লীবাসে ছুটে আসবার কারণ কি ?

প্রেমানন্দ। পল্লীগ্রামই সেবাব্রতের যোগ্যক্ষেত্র, নিগৃহীত, পীড়িত, অভাবগ্রস্তের স্থান এই পল্লীগ্রামেই ; যারা রোগী, তাদেরই ঔষধ চাই, আমার গুরুদেবের এইরূপই আদেশ।

দীনবন্ধু। বেশ, তবে আপনি আমার এখানেই থাকুন, আপনার গৃহবাস কোথাও নেই, আপন শিষ্যের গৃহের ন্যায় আমার গৃহে থাকলে আমি কৃতার্থ হবো।

প্রেমানন্দ। কে বলছে—আমার গৃহ নেই, আশ্রয় নেই ?

(গীত)

মা আমার বিশ্বরাণী
আমি তাঁর আদরের ছেলে,
কত রতন মানিক হীরে সোনা,
সবাই মায়ের পদতলে।
মা, সবায় দেছেন কোঠা গাড়ি,
আমার গাছ তলাতে বাড়ী,
এ ঘর ভাঙ্গবে নাকো টুঁটবে নাকো,
ক্ষয় হবে না কোন কালে।
মায়ের খাস তালুকে বসত করি,
জমিদারের কি ধার ধারি।
এর ডিক্রী নাইকো নিলাম নাইকো,
বিশ্ব ডুবুক না প্রলয়ের জলে,
শ্রীগুরুর কৃপা পেয়েছি,
খাঁটি সোনা হয়ে গেছি,
তাই মুকুন্দ আনন্দে নাচে,
জয় তারা জয় তারা বলে॥ (প্রস্থান)

দীনবন্ধু। কি অপূর্ব পরিবর্তন! এত বড় দার্শনিক পণ্ডিত, এখন যেন ভক্তিতে গদ্‌গদ হয়ে পড়েছে। মা আনন্দময়ী, তুমি কখন যে কাকে কি ভাবে চালাও, তা মা তুমিই জানো। জয় মা তারা—জয় মা তারা! (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—ব্রজেশ্বর রায়ের বাড়ী।

(ব্রজেশ্বর, হরগোবিন্দ, উকীল, রাজীব দত্ত, প্রেমানন্দ, গুরুদেব)

হরগোবিন্দ। হা—হা—হা—কি স্ফূর্তি, বুকের উপর দিয়ে যেন একটা পাহাড় নেমে গেল! বলি কর্তা, আজ বাঈজী আনবার হুকুম করতে হবে।

ব্রজেশ্বর। কিহে, তোমার যে দেখছি আজ বেজায় স্ফূর্তি!

হরগোবিন্দ। স্ফূর্তি করবো না! বলি কি কাণ্ডটাই না হয়ে গেল! সবাই বলেছিল এ অসম্ভব, কিন্তু আমি বলেছিলাম যে, টাকায় অসম্ভব কাজ জগতে কিছুই নেই। আর ব্রজেশ্বর রায়ের পক্ষে কোন্ কর্মই বা অসম্ভব হতে পারে? সাক্ষাৎ ভাগ্য-দেবতা লক্ষ্মী যাঁর ঘরে বাঁধা, তাঁর কি কোন কাজে পরাজয় হতে পারে?

উকীল! হা—হা—তাই বটে, রায়মশাইয়েব মতন লোক এদেশে—আরে এ দেশেই বা বলি কেন, এ জগতে ক'জন আছেন? স্বনামধন্য পুরুষ, যথার্থ ই Self-made man.

ব্রজেশ্বব। তোমাদের দশজনের সাহায্যেই মোকদ্দমাটা জিতেছি, তা না হলে আমি এমনই বা একটা কি!

হরগোবিন্দ। বলো কি? এ কি যে সে মোকদ্দমা? আমূল মিথ্যা, দলিল-দস্তাবেজ সব ঘর-গড়া! আরে এমন না করলে কি আর শত্রু জব্দ হয়? যাঁরা নিতান্ত ধর্মের ষাঁড়, তাঁরা হয তো বলবেন বড় অন্যায় কাজ, ঘোর অধর্ম! আরে, শত্রুদমন করতে হলে কি আর ধর্মাধর্ম দেখলে চলে? ধর্মাধর্ম—ও সব ছোটলোকে ভাবতে পারে, বড়লোকের শুধু ধর্ম নিযে বসে থাকলে চলবে কেন? বিষয়-কর্ম, মান-ইজ্জত এ সব বাঁচিয়ে তো চলতে হবে? আবে যুধিষ্ঠিরের মতন এমন ধার্মিক তো কেউ ছিল না কর্তা, তিনি কি করেছিলেন, 'অশ্বত্থামা হত, ইতি গজ।'

ব্রজেশ্বর। দাদা যে একেবারে পুরাণ পাঠ আরম্ভ করে দিলে? ও সব এখন রেখে দাও। শুনছি দীনবন্ধু রায় নাকি এতেও পথে আসছে না! এখনো আমার সাথে আপোষ করবে না, চাষা প্রজাদের নিযে দল পাকিয়ে বসে আছে। দীনবন্ধু রায়ের ছেলে সুধীরটা নাকি গুণ্ডার দলের সরদার হয়েছে, এ সব জব্দ করতে না পারলে, আমি যা করছি তা সবই মিথ্যা।

হরগোবিন্দ। রসো ভাযা, সব ঠিক হবে। দীনবন্ধু রায়কে পথের ফকির হতে হবে। তবে কি না কিছু টাকার প্রয়োজন।

ব্রজেশ্বর। টাকা যত লাগে নাও। মালখানায় না থাকে রাজীব দত্তের কাছ থেকে ধার করে, দীনবন্ধু রায়কে ভিটে ছাড়া করা চাই-ই; আর সেই বেয়াদপ ছেলেটাকে জেলে পাঠাতে হবে। পুত্রবধূটাকে নিয়ে দীনবন্ধু রায় ভিক্ষা মেগে খাবে, দেখে আমার প্রাণ শান্ত

হবে! হয় এই হবে, নচেৎ আমি জমিদারী বিক্রী করে সন্ন্যাসী হবো।

হরগোবিন্দ। আহা—আহা—বালাই—বালাই! এ সব কথা কি বলতে আছে? সব হবে ভায়া—সব হবে। তোমার মুখ দিয়ে যা বেরুবে তা বেদ-বাক্য, কার সাধ্য আছে তা লঙ্ঘন করে?

ব্রজেশ্বর। দেখো দাদা! আর একটা শত্রু আমার ঘরে রয়েছে, সেটাকে সরাতে না পারলে কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। সেই বিধবাটাই যে আমার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ালো!

হরগোবিন্দ। কে, তোমার কাকিমা? সেজন্য তোমার কোন চিন্তা নেই। তোমার গুরুদেব সেজন্য যথেষ্ট চেষ্টা করছেন, শুনতে পাচ্ছি তাঁর কাশী যাওয়া নাকি স্থির হয়ে গেছে। আর না-ই বা হলো কাশী যাওয়া, একটা উইল করে বসলেই তো হলো; সেজন্যেই তো এই উকীলবাবুকে ডেকে আনা হয়েছে।

ব্রজেশ্বর। ইনিই কি আমাদের ঘরের উকীল?

উকীল। আজ্ঞে না, এখনো আমায় খাঁটিভাবে নিযুক্ত করা হয় নি।

হরগোবিন্দ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—দীনবন্ধু রায়ের মোকদ্দমায় ইনিই সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। আর এঁর সাক্ষ্যতেই আমাদের জয়। আইনের বাজার আদালত কি না, তাই কর্তা, এদের সেখানে বড় দর।

ব্রজেশ্বর। বাবুকে ক'টাকা Fee দেওয়া হয়েছিল?

উকীল। আজ্ঞে চার টাকা।

ব্রজেশ্বর। বাবুকে আর গোটা চার টাকা বকশিস দিয়ে দাও।

উকীল। মহাশয়ের Estate-এর উকীল হবার আশায় এসেছি।

ব্রজেশ্বর। B. L., না P. L.?

উকীল। আজ্ঞে B. L. Second place occupy করেছিলাম।

ব্রজেশ্বর। নূতন উকীল?

উকীল। আজ্ঞে তিন বছর Practice করছি।

ব্রজেশ্বর। Fee কত?

হরগোবিন্দ। সে বড় সস্তা—বড় উদার অন্তঃকরণ, যে যা দেন তাতেই রাজী।

ব্রজেশ্বর। দেখুন উকীলবাবু! আপাততঃ আমার একটা উইল করতে হবে। উইলটা আমার কাকা মৃত্যুকালে করে গিয়েছিলেন, সে উইলে আপনাকে একটা সাক্ষী হতে হবে।

উকীল। মহাশয়ের হুকুম অমান্য করতে পারি না, তবে কি জানেন, আমরা Educated man, অতটা করতে গেলে আমাদের Prestige থাকে না।

ব্রজেশ্বর। তা Prestige-এর উচিত মূল্য পাবেন, আমার এই ষোল আনা Estate-এর আপনিই একমাত্র উকীল হবেন।

উকীল। আজ্ঞে, তা হলে কখন আসতে হবে?

ব্রজেশ্বর। দু'একদিনের মধ্যেই খবর করবো। আপনি এখন আসতে পারেন।

উকীল। তা হলে এখন আমি আসি—Good Bye! হরগোবিন্দবাবু, আপনি একটা কথা শুনুন। (দূরে গিয়ে) দেখুন, আপনিই আমার মুরুব্বি, আমায় যেন ভুলে না যান, আমা-দ্বারা আপনার অনেক কিছু হবে।

হরগোবিন্দ। তার ভাবনা নেই, তোমারই সব হয়ে যাবে।

উকীল। তবে এখন আমি— (করমর্দন করে প্রস্থান)

(গুরুদেবের প্রবেশ)

গুরুদেব। নারায়ণ—নারায়ণ—গোবিন্দ ভরসা!

ব্রজেশ্বর। আসুন, আসুন গুরুদেব! এ দাসেব আপনাব চবণই একমাত্র ভরসা।

গুরু। তা তো বটেই, শিষ্যের পক্ষে গুরুদেবই নারাযণ। তোমার তো আর গুরু-ভক্তির সীমা নেই বাবা!

ব্রজেশ্বর। এখন বলুন তো কাকিমার মত কি?

গুরুদেব। তার কি আর অমত হতে পারে? আমার আজ্ঞা কি হিন্দুব বিধবায় লঙ্ঘন করতে পাবে? সব ঠিক।

ব্রজেশ্বর। কিরূপ ঠিক হলো?

গুরু। তোমার খুল্লতাত পত্নী আনন্দময়ী কাশীবাস ইচ্ছা করেছেন। তাঁব জমিদারীর ইজারা তোমাকে দিয়ে যাচ্ছেন। তুমি তাঁকে ত্রিশ টাকা করে মাসে মাসে মাসোহারা দেবে। নারায়ণ—নারায়ণ!

হরগোবিন্দ। বেশ বেশ, না হবে কেন? দেবতা কিনা, দেবেব অসাধ্য কাজ কি আছে? তা কবে যাওয়া স্থির হলো?

ব্রজেশ্বর। তা হলো বটে, কিন্তু একটা বড়ই অন্যায় হলো।

হরগোবিন্দ। অন্যায় আবার কি হলো?

ব্রজেশ্বর। ত্রিশ টাকা মাসোহারা বড়ই বেশী।

গুরু। সেজন্য চিন্তা করো না বৎস, এখন যা হয় একটা স্থির হয়ে যাক, পরে যখন দেবে, তখন একটা স্থির করে নিও।

হরগোবিন্দ। তাও তো বটে, কাগজে লেখা-পড়া বই তো নয়। ত্রিশকে তিন করতেই বা কতক্ষণ! শূন্যটা পুঁছে ফেললেই তো ব্যস, হয়ে গেল।

ব্রজেশ্বর। যাক্, বাঁচা গেল। গুরুদেব! তা হলে আপনি সন্ধ্যা-আহ্নিকে যেতে পারেন।

গুরু। একটা কথা বলছিলাম কি বাবা ব্রজেশ্বর! আমি তো দু' একদিনের মধ্যেই গৃহে প্রত্যাবর্তন করবো মনে করেছি। ছেলেটার উপনয়ন আগামী মার্গশীর্ষে দেবো মনন করেছি। আর তোমার মা ঠাকুরানী বলে দিয়েছেন, তাঁর বড় পুত্রবধূটির সোনার বালা দু'গাছা ভগ্ন হয়ে গিয়েছে, তাঁর পরনের কাপড়খানা বড়ই জীর্ণ হয়ে পড়েছে, আমার দুগ্ধপানের বাটিটিও নাই, দুগ্ধবতী গাভীটিও এখন বৃদ্ধা, সম্বলের মধ্যে তোমার গুরুভক্তি, বাবা!

ব্রজেশ্বর। আচ্ছা, তা যথাসাধ্য চেষ্টা করা যাবে। আপনি এখন সন্ধ্যা-আহ্নিকে যান।

গুরু। কল্যাণ হউক, কল্যাণ হউক! (প্রস্থান)

ব্রজেশ্বর। ব্যাটা একটা লম্বা ফর্দ হেঁকে গেল, আমি যেন ওর কর্ষা প্রজা আর কি? কেবল সেই বিধবাটাকে হাত করবার জন্য তোমায় যা কিছু তোষামোদ। তার পরে তুমিও যেমন গুরু, আমিও তেমনি শিষ্য! এই যে দত্তমশায়, সংবাদ কি?

(রাজীব দত্তের প্রবেশ)

রাজীব। সংবাদ ভাল নয়। আমি হার মেনে গিয়েছি।

হরগোবিন্দ। আরে, কি হয়েছে বলো না?

রাজীব। আরে একেবারে কেঁচো হয়ে গেছে, তেজ বীর্য কিছুই নেই; প্রথমে আপীল করার কথা বললুম, সেধে টাকা ধার দিতে চাইলুম ব্যাটা কিছুতেই শুনলে না! বলে, আমি জমিদারের সাথে মামলা করবো না।

হরগোবিন্দ। না হয় থাক। তুমি এক কাজ করো, উকীল সাক্ষী রেখে আমি একখানা হাজার টাকার হাণ্ডনোট লিখিয়ে দিচ্ছি; তুমি নালিশ করে দাও। অগ্রিম ক্রোক জারী করে জমিগুলি সব বেচে আনতে হবে, তার পরে অস্থাবর।

ব্রজেশ্বর। দেখো দাদা! এখনো অনেক কাজ বাকী; দীনবন্ধু রায়কে তো ভিটে ছাড়া করতেই হবে, আর তার দলে যে সব চাষা প্রজারা মিলেছে, তাদের ঘর জ্বালিয়ে উচ্ছন্ন করে দিতে হবে। আর সেই মতি দত্তের বোনটাকে যে-কোন উপায়ে হউক, বের করে আনতেই হবে। এ যদি না পারো, তবে জানবো তোমরা কোন কাজেরই নও।

হরগোবিন্দ। ম'তের বোন ছুঁড়ী তো বড় চালাক দেখ্ছি! খেতে পায় না, ম'তে একটি পয়সা খরচও দেয় না। আর দেবেই বা কোথা হতে? কুড়ি টাকা মাইনের চাকুরী, মাগ পুষতেই কুলায় না, আর বোনকে সে খেতে দেবে কি? আমি সেদিন ম'তের কাছে একটা প্রস্তাব করলুম, তোমার বোনটাকে আমাদের বাড়ীর ঠাকরুনদের পরিচারিকা করে দাও, ভদ্রলোকের মেয়েকে কোন ইতর কাজ করতে হবে না। শুধু রাণীদের চুল বেঁধে দেবে, গয়না পরিয়ে দেবে! আরে, রাণীদেব যেমন সহচরী থাকে না, তেমনি ভাবে থাকবে। তা ম'তে ছেলে ভাল, সে এক কথায়ই রাজী, কিন্তু ছুঁড়ীটাও থাকতে চায় না, আর বুড়ীটাও তাকে দিতে চায় না। বলে কি না জাত যাবে! উঃ, কি বড় মানুষের জাত গো, খেতে পায না আবার জাত যাবে! সেদিন থেকে বুদ্ধিমান ছেলে ম'তে রেগে আটখানা হযে মা-বোনের খরচ একদম বন্ধ করে দিয়েছে। মাগী দু'টো খেতে পায না, তবু নেড়ামী ছাড়ছে না।

রাজীব। ও—তবে শোন ব্যাপারটা! আমি সেদিন দীনবন্ধু রাযের বাড়ী উপস্থিত থাকতেই ঐ মতির মা মাগী সেখানে গিয়ে উপস্থিত। দীনবন্ধু আমায় বাইরে যেতে বললে, মাগীটাকে কাছে ডেকে নিলে। দীনবন্ধু আমায় যেতে বললে বটে, কিন্তু আমি তো আর তেমন হাবা নই, একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনে যাই না কেন মাগীটা আর দীনবন্ধু কি কথা কয়! মাগীটা খেতে পায না সেই কথাই বললে, পরে বিধবা মেয়েটার কথাও বললে। দীনবন্ধু বললে, মেয়েটাকে আমার বাড়ীতে এনে রাখো। বোধ হয় সে সে-বাড়ীতেই আছে।

ব্রজেশ্বর। বটে! আবার রাঁড় পোষারও সখ আছে দেখছি! দেখো হরগোবিন্দ দাদা! দীনবন্ধু রায়ের উপর আমার এত আক্রোশ

কেন, তা জান? ব্যাটার সব কাজেই আমার সাথে আড়ি। সহজে না হয়, টাকা দাও, টাকায় না হয় জবরদস্তি করো, মোদ্দা—এ কার্যে অপারগ হলে জানবো, তোমরা আমার কোন কাজেরই নও।

(প্রেমানন্দের প্রবেশ)

প্রেমানন্দ। তা তো বটেই! একটা বিধবার সর্বনাশ না করলে চলবে কেন? তুমি জমিদার!

(গীত)

জ্বাল জ্বাল জ্বাল কামনা-অনল,
পড়বি যে দিন পুড়বি সে দিন,
এমনি মজার কল।
বুকের মাঝে মেটে চিতা,
কাঠ করে দে হাড়,
সকল শিরার রক্ত দিয়ে,
আহুতি কর সার;
আগুন যখন জ্বলবে—
গগন ছেয়ে উঠবে,
নিভাতে পারবি না দিয়ে
সাত সাগরের জল।
আপন ঘরে আগুন জ্বেলে,
বসে দেখছিস তোরা,
ফড়িং ভাবে আগুন মিষ্টি,
এমনি কপাল পোড়া!
যখন পাখা দুটি পুড়বে,
অবশ হয়ে পড়বে,
প্রাণ জ্বলুনি ছট্‌ফটানি,
কে জুড়াবে বল?

ব্রজেশ্বর। এটা আবার কে হে বিঁদঘুটে?

হরগোবিন্দ। কে জানে কোথাকার এক ভণ্ড যোগী! কি হে সন্ন্যাসী গোসাঞি, তোমার এখানে কি প্রয়োজন?

প্রেমানন্দ। আরে মানুষের বাড়ী, জমিদারের বাড়ী, এখানে কার না প্রয়োজন আছে? খোসামুদের প্রয়োজন আছে, সুদখোরের প্রয়োজন আছে, মদখোরের প্রয়োজন আছে, বেশ্যার প্রয়োজন আছে, একটা ভিখারীর প্রয়োজন নেই?

ব্রজেশ্বর। সেজন্য এখানে কেন? কাছারীতে যাও, সেখানে বরাদ্দ করা আছে।

প্রেমানন্দ। আমি তোমার কাছে কোন ভিক্ষার জন্য আসি নি, আমায় চিনে দেখো, আমি সেই প্রেমানন্দ ঠাকুর!

ব্রজেশ্বর। ও—তুমি সেই প্রেমানন্দ ঠাকুর! তুমি না বহুদিন হয় তীর্থবাসী হয়েছিলে?

প্রেমানন্দ। সকল তীর্থ ঘুরে এখন এই জন্মভূমি-তীর্থে মরতে এসেছি, বাবা।

ব্রজেশ্বর। তা বেশ, কাছারিতে যাও, খোরাকি পাবে।

প্রেমানন্দ। আমি তোমার কাছে খোরাকি ভিক্ষার জন্য আসি নি, অন্য একটি ভিক্ষার জন্য এসেছি। তা তুমি আমায় দাও, আমি চলে যাচ্ছি।

ব্রজেশ্বর। কি চাও বলো?

প্রেমানন্দ। দেখো ব্রজেশ্বর! আমি তোমার পিতার বন্ধু, তোমার সর্বনাশ হতে চলেছে, তুমি তা দেখতে পাচ্ছ না; আমি তোমায় দেখিয়ে দিতে এসেছি। প্রজা-পীড়ন, দুর্বলের উপর অত্যাচার, সতীর সর্বনাশ, এ সব ত্যাগ করো। আর আত্ম-সর্বনাশ করো না বাবা!

ব্রজেশ্বর। বটে! এই মুরুব্বিয়ানা করতে এসেছ? কে বলেছে আমি প্রজা পীড়ন করেছি, কোন্ সতীর সর্বনাশ করেছি? আরে রেখে দাও ঐ পর্যন্ত!

প্রেমানন্দ। দীনবন্ধু রায়ের উপরে অত্যাচার কি ধর্মসঙ্গত হয়েছে, আপন খুল্লতাত পত্নীর প্রতি ষড়যন্ত্র—এ কি ন্যায়সঙ্গত? গরীব রামলোচন দত্তের বিধবা কন্যার উপরে অসৎ অভিপ্রায়, এ কি মানুষের উচিত কর্ম? তোমার ঐশ্বর্য আছে, সম্পদ আছে, এরূপভাবে সে সবের অপব্যয় করো না! মনে রেখো ব্রজেশ্বর, ন্যায়ের দণ্ড যাঁর হাতে, তাঁর কাছে উকীল সাক্ষীর প্রয়োজন করে না।

(গীত)

মানস নয়ন, করি উন্মীলন,
চেয়ে দেখ, শিরে খাড়া,
ন্যায়েরি দণ্ড।

বিদ্যুৎ চমকে ঐ ঝলসে তীব্রানল,
অশনি গরজে কালরুদ্র প্রচণ্ড ॥
বিষয়-বৈভব-দম্ভ ধন-জন,
দলিত চূর্ণিত পলকে বিলীন,
কূটতর্ক ছল সেথা অকারণ,
সত্য দীপে জ্বলে অখিল ব্রহ্মাণ্ড ॥
ঐশ্বর্য সম্পদ পেয়েছ যাঁহারি দান,
দলিছ চরণে আজ তাঁহারি সন্তান ;
রুদ্র ক্রোধে তাঁর জ্বলিলে নয়ন,
কটাক্ষে ভস্ম যথা অনলে তৃণখণ্ড ॥
এখনো কেটে দে রে মোহঘোর তন্দ্রা,
এখনো জেগে ওঠ্ রে ছেড়ে কালনিদ্রা ;
পাইয়ে গোটাকত রজত মুদ্রা,
ভেব না করগত বিশ্ব অখণ্ড ॥

প্রেমানন্দ। শুনলে তো বাবা ব্রজেশ্বর! ধন পেয়েছ, সম্পদ পেয়েছ ; যাঁর ধনসম্পদ তাঁরি কাজে লাগাও, যাঁর সৃষ্ট ফুল, তাই দিয়ে তাঁরি পূজা কারো। ঘি-দুধ দিয়ে কতকগুলি কুকুর পুষছ বাবা! ভাগ্যবান তুমি, দুর্বলের সাহায্য কারো, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করো, রাজ্য-ঐশ্বর্য আরো বেড়ে যাবে। এরূপভাবে দিন দিন আর ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়ো না!

ব্রজেশ্বর। আরে ঠাকুর, রেখে দাও ঐ পর্যন্ত! ওসব উপদেশ তুমি গরীব লোকের উপরে খাটাতে পারো, বড় মানুষের ওসব শুনলে চলে না ; এ রাজনীতির সাথে তোমার ধর্মনীতি টিকবে না বাবা! মনে করো না, আমি ধর্ম-কর্ম কিছুই করি না। প্রতি বৎসর আমি হাজার হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন করাই ; নারায়ণ-সেবায় আমার বছরে হাজার টাকার উপরে বরাদ্দ ; সাধারণ কাজ-কর্ম স্কুল, সভা-সমিতি, থিয়েটার, বায়স্কোপ, খেম্‌টা প্রভৃতিতে বছরে আমি দশ হাজার টাকার উপরে খরচ করছি ; বাড়ীতে একটা নিত্যনৈমিত্তিক কাজ-কর্মে লুচি-মণ্ডার বন্যা বয়ে যায়। তুমি তো দেখছো আমি সবই অপকর্ম করছি! সন্ন্যাসী মানুষ, বিষয় কর্মের কি জান?

প্রেমানন্দ। ধ্বংসের পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে পড়েছ, সহজে ফিরবে না বাবা! শুনলাম তুমি নাকি সাত লাখ টাকার দেনাদার হয়ে পড়েছ ?

ব্রজেশ্বর। আ—মলো—! বলি অত খবরে তোমার কি প্রয়োজন? বড় মানুষের ওসব হয়েই থাকে। জানো, আমার জমিদারীতে দু'লাখের উপর আয় হয় ?

প্রেমানন্দ। তা জানি বই-কি। তোমার আর পথের ফকির হতে বেশী দেরী নেই। আচ্ছা, আমি চললুম। যাবার বেলায় যা বলে যাচ্ছি, শুনে রাখো। আজ থেকে তোমাব সাথে আমাব আড়ি, আমি তোমায সকল কার্যে বাধা দেবো, তোমাব খুল্লতাত পত্নী আনন্দময়ীকে আমি কিছুতেই কাশী যেতে দেবো না, সেই অনাথা সতীর সর্বনাশ করা তোমায শক্তিতে কুলাবে না। আজ থেকে তুমি সাবধান থেকো, আমি তোমার সকল কার্যে বাধা দেবো; দেখে নিও তুমি কেমন জমিদাব, আমি কেমন ভিখারী!

(প্রস্থান)

হরগোবিন্দ। আরে—ব্যাটা যেন ব্যাস মুনি!

ব্রজেশ্বর। গ্রাম থেকে ঝেঁটিয়ে তাড়াতে হবে। কি—এত বড় স্পর্ধা! আমার সঙ্কল্পে বাধা দেবে? দেখো দাদা, তুমি আব বিলম্ব করো না। যাতে কালই সরে পড়েন, তার ব্যবস্থা করে দাও। আবে, কাকিমার যাবার বেলায় কিন্তু দু'ফোটা চোখের জল ফেলতে হবে।

হরগোবিন্দ। সেজন্য চিন্তা নেই। দু'ফোটা কেন, কেঁদে মাটি ভিজিযে দেবো। চলো, এখন একবার বাগানবাড়ীর দিকে যাওয়া যাক্।

(উভযের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—আনন্দময়ীর বাড়ী।

(আনন্দময়ী, প্রেমানন্দ, কৃষকবালকগণ)

আনন্দময়ী। সংসারে সকল সুখ জলাঞ্জলি দিয়েছি। যেদিন বিধবা হয়েছি, সেদিন হতেই আমি সংসার থেকে বিদায় নিয়েছি, সেদিন থেকেই আমার আকাশের চাঁদ ডুবে গেছে, তারাগুলি নিভে

গেছে, সংসার মরুভূমি হয়ে পড়েছে। হায়—আমার মতন ভাগ্য কার ছিল! রাজার ঐশ্বর্য ছিল, দেবতার মতন স্বামী পেয়েছিলাম, কিন্তু কপালে সইলো না। তাঁর প্রেম, তাঁর ভালবাসা মনে পড়লে বুক ফেটে যায়। এতদিন এত চেষ্টা করলাম, কই, তাঁকে তো ভুলতে পারলাম না? বুঝি এ জীবনে সে স্মৃতি মুছবে না। দেখি পুণ্যতীর্থ কাশীতে বিশ্বনাথের পাদপদ্মে গিয়ে জ্বালা জুড়ায় কি না!

(প্রেমানন্দের প্রবেশ)

প্রেমানন্দ। তা তো জুড়োবে না মা—বিশ্বনাথের পাদপদ্মে গিয়ে জ্বালা জুড়োবে না—

(গীত)

প্রেমানন্দ—

আবার যখন গান ধরেছি
গাবো গো সেই গান;
বুকটা যাহে ফুলে ওঠে,
শিরায় যাহে অগ্নি ছোটে,
তন্দ্রা যাহে যায় গো ছুটে,
মাতায় যাহে প্রাণ।
অগ্নিগিরির গর্ভ মাঝে,
সাগর গর্জনে,
সিংহনাদে ঝড়ের বুকে,
মেঘের তর্জনে;
এদের ভেতর ওতপ্রোত,
রয়েছে যে সুরের স্রোত,
আজকে সে যে হবে বাহির
করবে প্রলয় অভিযান।
ধূধূপ সম উর্ধ্বে উঠে,
আকাশ লুটে নেবে,
চন্দ্র সূর্য অবাক হয়ে,
থাকবে চেয়ে সবে;
পাখা মেলি পাখীর মতন,
বিদারিয়া উর্দ্ধ গগন,

বিশ্বরাজের চরণতলে
লভিবে নির্বাণ।
গান গেয়েছি অনেক বটে,
তারে কি কয় গান,
আকাশ পৃথ্বী হলো না যায়,
টল্‌টলায়মান ;
ভূমিকম্প জলোচ্ছ্বাস,
উঠলো না যায় ঘূর্ণি বাতাস
লক্ষ প্রাণের সমুদ্রে যায়
ডাকলো না কো বান।

আনন্দময়ী। কে আপনি ?

প্রেমানন্দ। আমি সন্তান।

আনন্দময়ী। কি চান ?

প্রেমানন্দ। সন্তানে আর চায় কি মা, মায়ের স্নেহ চাই !

আনন্দময়ী। দাঁড়ান, ভিক্ষা এনে দিচ্ছি।

প্রেমানন্দ। কি দেবে মা, এক মুষ্টি চাল ?

আনন্দময়ী। না, দু'টি টাকা দিচ্ছি, নিয়ে যান।

প্রেমানন্দ। আমি টাকা ভিক্ষার জন্য আসি নি, আমায় চিনে দেখো, আমি সেই প্রেমানন্দ ঠাকুর !

আনন্দময়ী। আপনি সেই ব্রহ্মচারী ঠাকুর ? এসেছেন ? ভালই হয়েছে। আমি তো সব ত্যাগ করে যাচ্ছি ; আপনি সু-ব্রাহ্মণ, সাধু, উদাসীন, আপনাকে কিছু দান করে যাবো।

প্রেমানন্দ। তুমি নাকি কাশীবাসী হবে ?

আনন্দময়ী। সেরূপই ইচ্ছা, বাবা বিশ্বেশ্বর দয়া করলে হয় !

প্রেমানন্দ। কাশী যাওয়া এত তাড়াতাড়ি কেন মা ?

আনন্দময়ী। আর কোন্ সুখের আশায় গৃহে থাকবো ? হিন্দু-রমণী বিধবা হলে তার সংসার-বাসের প্রয়োজন কি ?

প্রেমানন্দ। তোমার এতবড় ঐশ্বর্য, এতবড় জমিদারী !

আনন্দময়ী। তাই তো আরো দুঃখ। হিন্দু-রমণী বিধবা হলে তাঁর ঐশ্বর্য-সম্পদ ভোগে কি অধিকার আছে ? কেবল প্রাণে জ্বালা বাড়ে মাত্র।

প্রেমানন্দ। তাই বুঝি জ্বালা জুড়াতে তীর্থে যাচ্ছ ?

আনন্দময়ী। তাই মনে করেছি। কিছুদিন কাশীতে থেকে পরে বৃন্দাবনে গিয়ে রাধা-শ্যামের পাদপদ্ম সার করবো, তাতেই যদি প্রাণে শান্তি পাই!

প্রেমানন্দ। কেন, এ দেশের আগুন বুঝি সে দেশে জ্বলে না? তোমার বুক-ভরা আগুনের কুণ্ড, তীর্থে সে আগুন নিভবে না।

আনন্দময়ী। তা তো জানি, মৃত্যু ব্যতীত এ আগুন নেভার নয়। তবে যদি কিছু পুণ্য সঞ্চয় করে পরকালে শান্তি পাই!

প্রেমানন্দ। তা তো হবে না মা—কামনার অগ্নিশিখা হৃদয়ে জ্বলছে; সে আগুন আপনি না নিভলে তীর্থে সে আগুন নেভাতে পারবে না। শোন বলি মা, তুমি স্ব-ইচ্ছায় তীর্থবাসী হতে যাচ্ছ না, তোমার ভাসুর-পুত্র ব্রজেশ্বর আর তোমার কুলগুরুর প্ররোচনায় আজ তুমি তীর্থবাসী হতে চলেছ। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তোমার যদি কোন সন্তান থাকতো, তা হলে কি তুমি এমন সময় তীর্থবাসী হতে?

আনন্দময়ী। জানেনই তো সংসারে আমার কোন বন্ধনই নেই!

প্রেমানন্দ। কে বলেছে তোমার কেউ নেই? তোমার এতবড় জমিদারীতে বিশ হাজার প্রজা, এরা তোমার নয়? বড় ভুল বুঝেছ মা, তুমি তীর্থে পুণ্য সঞ্চয় করতে গিয়ে যে কি মহাপাপের অনুসন্ধানে যাচ্ছ, তা তুমি এখনো বুঝতে পার নি। তোমার সন্তানসম প্রজাদিগকে কাকে দিয়ে যাচ্ছ? ব্রজেশ্বরকে তো? সন্তানসম প্রজাদিগকে রাক্ষসের মুখে বলি দিয়ে তীর্থে পুণ্য সঞ্চয় করতে যাচ্ছ? তোমার পরলোকগত পুণ্যাত্মা স্বামীর গচ্ছিত সম্পদ শুঁড়ীকে দিয়ে যাচ্ছ, সতীর সতীত্ব নাশের জন্য একটা লম্পটকে বলীয়ান করে দিয়ে যাচ্ছ? এ সঙ্কল্প ত্যাগ করতে হবে মা।

আনন্দময়ী। আমি কাছে থেকেও তো প্রজা-পীড়ন নিবারণ করতে পারছি না। আমি স্ত্রীলোক, সর্ব-বিষয়ে অবলা, ব্রজেশ্বরের দুষ্কর্মের প্রতিরোধ তো আমি করতে পারছি না! যে সংসারে এত পাপ সে সংসারে অন্ন-জল গ্রহণ করতেও আর আমি ইচ্ছা করি না। আমার গৃহত্যাগের ইহাও একটি কারণ।

প্রেমানন্দ। কে বলেছে স্ত্রীলোক অবলা, কার কাছে শুনেছ স্ত্রীলোক শক্তিহীনা? স্ত্রীলোক মহাশক্তির অংশ, সে শক্তি নিয়ে তোমাকে এখানে রাণী হয়ে বসতে হবে, দুর্বল প্রজাদের পালন

করতে হবে, শ্বশুরকুলের গৌরব রক্ষা করতে হবে, ব্রজেশ্বর উচ্ছন্নে যাচ্ছে, তাকে উদ্ধারের পথে আনতে হবে।

আনন্দময়ী। আমি অবলা, আমার সে শক্তি কই ?

প্রেমানন্দ। শক্তি আছে মা, নিদ্রিতা আছেন কিনা, তাই টের পাচ্ছ না। আমি মাকে জাগাবার পন্থা বলে দিতে পারি।

আনন্দময়ী। কৃপা করে বলে দিন !

(গীত)

প্রেমানন্দ— মাকে ডাক্ দেখি, তোরা সবে বদন ভরে,
দেখি কান খেয়ে বেটী ক'দিন থাকতে পারে।
ত্রিশ কোটী কণ্ঠে যদি, ডাক আজ নিরবধি,
ঠিক দাঁড়াবে ক্ষেপা মাগী, অসি লয়ে করে।
ক্ষেপী যদি উঠে দাঁড়ায়, দেখে পাপ ভয়েই পালায়,
মুকুন্দ বগল বাজায়, ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম্ হরে হরে।

(কৃষক-বালকদের শ্যামসুন্দর মূর্তি নিয়ে প্রবেশ)

প্রেমানন্দ। এই শ্যামসুন্দর ত্রিভঙ্গঠাম মূর্তিটির পানে চেয়ে দেখো তো! তার পরে বল দেখি, তোমার প্রাণের বেদনাটি কি ? নীরব রইলে যে, বলতে পারছ না ? আচ্ছা, আমি বলি—তুমি বিধবা হয়েছ, এইটিই তোমার প্রাণের বড় দুঃখ, নয় কি ?

আনন্দময়ী। আপনি অন্তর্যামী।

প্রেমানন্দ। তোমার ঐশ্বর্য আছে, সম্পদ আছে, রূপ আছে, যৌবন আছে, নেই কেবল স্বামী। এই তো তোমার প্রাণের বড় দুঃখ। এই দুঃখেই তো তোমার সকল সুখ মলিন হয়ে গেছে। কিন্তু এই যে প্রস্তরময় মূর্তিখানা দেখছ, এর পানে দেখো, ইনি স্বামীর প্রেমের পারাবার, রূপের আধার, এই রূপেই গোকুল কামিনীরা মজেছিলেন, এই রূপ দেখেই রাই-রঙ্গিণী কলঙ্ক-সাগরে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। একটা তুচ্ছ মেদমাংসময় নশ্বর দেহের উপরে প্রেম করেছিলে, সে দেহ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কিন্তু এ রূপ, এ প্রেম অনন্ত অক্ষয়। শোন বলি মা, স্বামীকে যথার্থ প্রেম করতে শেখ নি। যদি শিখতে, তবে তাঁর নশ্বর দেহের অন্তর্ধানে এত শোকাকুল হয়ে পড়বে কেন ? সে মাংসপিণ্ডটার উপরে

কামনা জন্মেছিল মাত্র। যে নারী স্বামীর প্রেম দিয়ে ঐ জগৎ-স্বামীকে প্রেম করতে না শিখবে, সে প্রেমময়ী নয়, কামময়ী। রূপ চাও, প্রেম চাও, কৌতুক চাও, আনন্দ চাও, ঐ সচ্চিদানন্দকে বরণ করো মা, পূর্ণানন্দ পাবে। দেখছো না কত মধুর, কত মিষ্টি!

(গীত)

কৃষক-বালকগণ। কিবা সজল দলন অঙ্গ,
সুত্রিভঙ্গ বাঁকা তরুমূলে,
হেরিলে হরে জ্ঞান মন,
প্রাণ পড়ে ঐ পদতলে।
নবীন নটরাজ কে বিরাজ ব্রজমণ্ডলে,
সাজ হেরি লাজ দ্বিজরাজ নভোমণ্ডলে,
এমন মনোহর মাধুরী না হেরি মহিমণ্ডলে,
যেন প্রখর প্রভাকর কিরণ মকর কর-কুণ্ডলে।
উচ্চ শিখি-পুচ্ছ সহ,
উচ্চ চূড়া বামে হেলে,
তুচ্ছ শিখি-তুচ্ছ দেখে,
মূর্চ্ছা পায় নারীকুলে,
ভুবন করেছে আলো,
বনমালা শোভে ভালো,
বাস পড়ে রাস করে,
ভাষ করে হেলে-দুলে।
মধু অমৃত হাসি,
সুধা রাশি রাশি ঝড়িতে পারে,
বংশী বাদ্য শুনে মনোদাসী,
দাসের দাসী করিতে পারে;
নীলকণ্ঠ ভনে ক্ষণে ক্ষণে,
অচেনারে চিনিতে পারে,
চিনিতে পারে জিনিতে পারে,
কিনিতে পারে বিনা মূলে।

আনন্দময়ী। এ সব ছেলেরা কারা ঠাকুর ?

প্রেমানন্দ। ব্রজেশ্বর কর্তৃক লাঞ্ছিত পীড়িত প্রজা এরা। এদের বাস্তুভিটা, খামার-জমি যা কিছু ছিল, ব্রজেশ্বর তা কেড়ে নিয়ে এদের পথের ফকির করেছে। এমন আরো অনেক দেখতে পাবে।

আনন্দময়ী। এখন আমায় কি করতে বলেন ?

প্রেমানন্দ। রাণী হয়ে বসে রাণীর কর্তব্য পালন করতে বলি। ঠাকুর শ্যামসুন্দরের মণ্ডপপ্রাঙ্গণে একটি সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যারা অন্নহীন তাদের অন্নের সংস্থান করতে হবে, যারা আশ্রয়হীন তাদের আশ্রয় দিতে হবে। সকলের উপরে মনে রাখতে হবে— যা কিছু করছি, তা সকলই ঠাকুর শ্যামসুন্দরের কাজ করছি। দেখবে মা, ভগবানের প্রীত্যর্থে কাজ করলে সে কার্যে কত আনন্দ, কত সুখ!

আনন্দময়ী। এ সকল কার্যে ব্রজেশ্বর বড়ই বিরোধী হবে।

প্রেমানন্দ। তা তো হবেই মা, ব্রজেশ্বরের সাথে বিরোধ করতেই হবে। হয়তো তার সাথে লাঠি ধরে নামতে হবে। কিন্তু মনে রেখো আমরা যাঁর কাজ করছি, তিনি ব্রজবালাগণের নবনীও ভিক্ষা করে খেয়েছেন, আবার রণভূমে পাঞ্চজন্য নাদে দিক্‌দিগন্ত কম্পিত করে ভীষণ-দর্শন সুদর্শন সঞ্চালনও করেছেন। সবই বুঝতে হবে মা, এখন ভক্তি-বিশুদ্ধ অন্তরে আপন পুরীতে শ্যামসুন্দর দেবের প্রতিষ্ঠা করে নাও, সঙ্কল্প করো, এ স্থান মধুময় বৃন্দাবনে পরিণত করতে হবে, জগৎকে মধুময় করে তুলতে হবে। হয় মা-যশোদা হয়ে গোপালকে কোলে তুলে নাও, না হয় প্রেমময়ী রাই-রঙ্গিণী হয়ে ঠাকুরের সেবা করো। মনে রেখো, যদি ঘরের শ্যামসুন্দর উপেক্ষা করে চলে যাও, তবে বৃন্দাবনের শ্যামসুন্দর অনেক পর হয়ে পড়বে।

আনন্দময়ী। আপনার আদেশই শিরোধার্য। (প্রণাম করা)

প্রেমানন্দ। আশীর্বাদ করছি, ঠাকুর তোমার মঙ্গল ইচ্ছা জয়যুক্ত করুন! আজ থেকে তুমি ব্রহ্মচারিণী। (প্রস্থান)

(শ্যামসুন্দর বুকে করে আনন্দময়ীর প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—রাজীব দত্তের বাড়ী।

(রাজীব, জগবন্ধু, নিতাই দাস, গোয়ালা)

রাজীব। হাঁরে জগা! রাস্তায় ছ'দিনের গোময় জমে রয়েছে, ঘুঁটে দেওয়াটা কি বন্ধ ক'রে বসা হলো না কি রে?

জগা। তা কি করবেন, মা যে রাস্তায় বেরোতে পারেন না, তাঁর পরবার কাপড়খানা যে একেবারে ছিঁড়ে গেছে।

রাজীব। কাল যে বাজার-খরচের পয়সা দেওয়া হলো, কাপড় আনিস নি?

জগা। মাত্র ছ'আনা বাজার খরচ দেওয়া হয়েছে, বাজার-খরচ দিয়ে যা রইল তাতে কাপড় হলো না, কাপড়ের বাজার বড় চড়া।

রাজীব। ছ'আনাই বাজার-খরচ গেল? এ কি রাজার খরচ পেয়েছিস্? আচ্ছা, কি কি সদায় করলি বল দেখিনি!

জগা। ছ'পয়সার তেল, আর এক পয়সার নুন।

রাজীব। ছ'পয়সার তেল? এ যে কালিয়া-পোলাওয়ের বাজার! ও—তেল বুঝি আবার মাথায় মাথা হয়েছিল? কতখানি তেল মাথায় দিয়েছিস্ রে হারামজাদা?

জগা। আমি বাড়ীতে তেল মাখি নি, মাসীমার বাড়ী গিয়েছিলাম, সেখান থেকে তেল মেখে এসেছি।

রাজীব। রোজ তো আর মাসীমার বাড়ীর তেলে হবে না? বেতর অভ্যাস করে ফেলেছিস্। ডাক—ডাক, নাপিত ডাক, সব চুল কামিয়ে ফেল, লোকে জিজ্ঞেস করলে বলবি আমরা মাথাছোলা গোসাইর শিষ্য হয়েছি। যাক, এ তো গেল তিন পয়সার হিসাব, আর কি কি সদায় করলি?

জগা। ছ'পয়সার মাছ।

রাজীব। ছ'পয়সার মাছ? আরে, এক হাটে ছ'পয়সার মাছ?

জগা। মাছ খুব সস্তা হয়েছিল, ছ'পয়সায় একটা ইলিশ মাছ এনেছি।

রাজীব। আরে ব্যাটা, ইলিশ মাছ খেতে খেতে যদি ঐ ইলিশ মাছেরই নেশা হয়ে যায়, তবে উপায়? যাক, আর কি কি খরচ করলি?

জগা। এক পয়সার পান, আর এক পয়সার চুণ।

রাজীব। পান—আবার চুণ? এ কিনতে তোকে কে বলেছে রে? ও—গিন্নি বুঝি? আচ্ছা রসো, নোড়া দিয়ে দাঁত ভাঙবো, তবে ছাড়বো—পান আবার চুণ? সেই তো এক বছর হলো এক পয়সার চুণ কিনে দেওয়া হয়েছে?—পান আবার চুণ!

(গোয়ালার প্রবেশ)

গোয়ালা। দত্তমশায়, আমার পাওনাটা চুকিয়ে দিন।

রাজীব। (পীড়িতের ভান করে) বাবা রামধন! আহা—হা, যাই আর কি! যেমন ভেদ, তেমনি বমি, বাবা। এবার বুঝি আর বাঁচব না!

গোয়ালা। মশায়, এ সব বিট্‌কেলেপানা রেখে দিন। দেড় বছর হলো বাবার শ্রাদ্ধের সময় একখানা দু'গণ্ডা পয়সার দই এনেছিলেন, একশ' দিন তাগিদ করেও তা পেলাম না। আজ পয়সা দিতেই হবে, তা নইলে অপমানী হতে হবে।

রাজীব। বাবা রামধন! আর দুটো দিন সবুর কর বাবা, হাতে একটিও পয়সা নেই। আসছে হাটের দিন পয়সা পাবিই পাবি।

গোয়ালা। সে হবে না মশায়। যে লাখ টাকায় ফিরে না, তার দু'গণ্ডা জোটে না? মশায, পয়সা দিয়ে দাও, তা নইলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি!

রাজীব। বাবা রামধন! তোর ঠাকুরদাদা আমার জ্যেঠামশায় হতেন, তুই আপন জন, অভাবে পড়েছি বাবা, আর দুটো দিন সবুর কর, বাবার শ্রাদ্ধে দই এনেছিলাম, না—গু এনেছিলাম!

গোয়ালা। বুঝলাম সহজ কথায় হবে না। কাল যখন রাস্তায় বেরোবে তখন কান মলে পয়সা আদায় করে নেবো; বেটা পাজী, ছোটলোক!

(প্রস্থান)

জগা। ওর পয়সা বাকী রাখা কেন? কালকের বাজার খরচ ফেরত দু'আনা ছিল, তা দিলেই হতো!

রাজীব। দিয়ে দিলেই হতো? যেন ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির! আরে বেটা, দু' আনার পয়সা সোজা হলো? মাসে দু'পয়সা ক'রে টাকায় সুদ, দু'আনায় প্রায় এক পয়সা হবে, বারো মাসে তিন আনা। কোন রকমে গোটা দুই বছর ঘুরিয়ে রাখতে পারলে ওরই সুদের পয়সায় ওর পয়সা শোধ হয়ে যাবে। দুটো কড়া কথায় চড়া হলে চলবে কেন?

(নিতাই দাসের প্রবেশ)

নিতাই। প্রণাম বাবু!

রাজীব। নিতাই যে! কেন এসেছিস?

নিতাই। বড় দায়ে ঠেকেছি বাবু। আজ তিন দিন খাই নি।

রাজীব। কেন? জন খাটলেই তো রোজ একটা সিকি মেলে। এতে আর অভাব হবে কেন রে?

নিতাই। এক সিকিতে তো আর তিনজনের দিন চলে না? তাতে না না খেয়ে রোগা হয়ে প'ড়েছি, খাটতে যে আর পারি না। ছ'টি টাকা আমায় ধার দিতে হবে বাবু। আমি পেটে ছুটি অন্ন দিয়ে বল পেলেই জন খেটে সুদ-সমেত শোধ করে দেবো।

রাজীব। না, না, সে হবে না, টাকা আমি ধার দিতে পারবো না, অন্যত্র চেষ্টা করো।

নিতাই। অন্যত্র আর কোথায় যাবো? ছেলেটা আজ তিন দিন না খেতে পেয়ে মড়ার মত হয়ে পড়েছে, আর উপায় নেই। দোহাই বাবা, এই ছু গাছা বালা এনেছি, এই রেখে আমায় ছ'টি টাকা ধার দাও, আমার জান বাঁচাও, মাসে তোমায় টাকায় চার পয়সা করে সুদ দেবো। কাঙ্গালের প্রাণ বাঁচাও, তোমার একগুণে হাজার গুণ হবে।

রাজীব। বালা এনেছিস্? দেখি?

নিতাই। এই নিন্। (বালা প্রদান)

রাজীব। এতে ভরি তিনেক রুপো হবে। এর দাম এক টাকা না হয় আঠার আনা, এতে ছ'টাকা চাচ্ছিস্—আমায় বোকা পেয়েছিস্ না কি?

নিতাই। আজ্ঞে, ওতে সাড়ে চার ভরি রূপা আছে, এর দাম চার টাকা, আমি ছ'টাকা চাচ্ছি।

রাজীব। হ্যাঁ, ভাল কথা। তুই যে সেবারে টাকা নিয়েছিলি, তার চার আনা বাকি ছিল না?

নিতাই। আজ্ঞে না, আমি ত সুদে-আসলে সবই দিয়ে গিয়েছি!

রাজীব। আরে না, সুদের সুদটা বাকী ছিল।

নিতাই। সে তো আপনি রেয়াৎ করেছিলেন।

রাজীব। রেয়াৎ করেছিলাম অমনি? আমার বুঝি মনে নেই? সেই যে একখানা খেজুরের গুড় দেবার কথা ছিল, আর একটি বড় কাঁঠাল!

নিতাই। আজ্ঞে, খেজুর গাছ এবার আমি কাটতে পারি নি, আর, এ সবে-মাত্র চৈত্র মাস, কাঁঠালও এখন গাছে নেই।

রাজীব। ভারী বজ্জাত ব্যাটা তুই! চলে যা, এই বালা রেখে দিলাম, সেই বাকী চার আনা আর তার সুদ চার আনা, এই আট আনা দিয়ে তবে বালা নিতে পারবি।

নিতাই। বলেন কি দত্তমশায়? আমার যে আর কিছু নেই! কচি ছেলে আমার তিনদিন না খেয়ে মরতে চলেছে। দোহাই বাবা, তোমার পায়ে পড়ি! আমার আর কিছু নেই, পাতায় ভাত খাই, নারকেলের মালায় জল খাই, ছেলের হাতে দু'গাছা বালা ছিল, তাই কেড়ে নিয়ে এসেছি; আজ দুটি ভাত না পেলে ছেলেটা আমার মারা যাবে! বাবা, দয়া করো, দু'টি না হয় একটি টাকা আমায় দাও!

রাজীব। হ্যাঁ, আমি কল্পতরু হয়ে বসেছি কি না? চলে যা ব্যাটা! নিতে জানবে, দিতে জানবে না! ছোটলোকের বজ্জাতি!

নিতাই। বাবা, তুমি আমার ধর্মের বাবা, আমায় বাঁচাও! আমায় অন্ততঃ আট গণ্ডা পয়সা দাও, আজকের দিনটা আমার চালিয়ে দাও, পায়ে পড়ি তোমার!

রাজীব। বাবা বলো, আর বাবার বাবা ঠাকুরদাদা বলো, একটি পয়সাও আর বেরোবে না বাপু।

নিতাই। আমার কচি ছেলেটা যে তবে মারা যাবে বাবু! (ক্রন্দন)

রাজীব। তার আমি কি করবো রে? তোর গুষ্ঠি মরলে তাতে আমার কি?

নিতাই। বাবা, গরীবের মুখের দিকে তাকাও! টাকা না দাও, আমার বালা দু'গাছি দাও, আমি আরেক মহাজনের দুয়ারে যাই।

রাজীব। এই দেখো, বোকা ভেবে ধোঁকা দিয়ে আবার পয়সা বের করবার চেষ্টা হচ্ছে? সেবার বড় বিশ্বাস করে চার আনা বাকী রেখেছিলাম, এবার আরো বিশ্বাস করে ছোটলোককে ছেড়ে দেওয়া—নগদ আট আনা পয়সা আনবি তবে এ বালা পাবি।

নিতাই। তবে একগাছা তুমি রাখো আর একগাছা আমায় দাও, আমার আর উপায় নেই।

রাজীব। সে হবে না। যা ব্যাটা পাজী, মরা-কান্না আরম্ভ করে দিলে! আমি তোর কান্না দেখে ভুলে যাবো তাই মনে করিস নাকি?

আরে ব্যাটা, যে মাগ্-ছেলেকে খাওয়াতে পারে না, তার আবার বিয়ে করা কেন রে পাজী ব্যাটা ?

নিতাই। হা ধর্ম! এই কি বিচার ? দত্তমশায়! প্রাণটা কি তোমার পাষাণের চেয়েও শক্ত ? লাখ টাকা তোমার ঘরে, না হয় একটি টাকা আমায় ভিক্ষা দাও ; আমি আটদিন তোমার বাড়ীতে জন খেটে দেবো, আমার মাগ্-ছেলের প্রাণ বাঁচাও, পায়ে পড়ি তোমার !

রাজীব। যা ব্যাটা! জ্বালাতন করলে ! (প্রস্থান)

নিতাই। হা অদৃষ্ট, হা ধর্ম, এই কি বিচার ? আর যে আমার কিছুই নেই ! হায় মা অন্নপূর্ণা, অন্নের রাণী, তুই নাকি মা সারা দুনিয়ার অন্ন যোগাস্ ? দুনিয়ার সকল জীবই নাকি তোর সন্তান ? কেবল আমার জন্যই দু'টি পেটের ভাত জুটলো না ? এখন উপায় কি ? কোথায় যাবো ? কে দয়া করবে ? সংসারে দয়া নেই, যার ঘরে অন্ন আছে, সে টাকা দিয়ে মদ খায়, বাঈ নাচায়, বাছা বাছা লোক নিমন্ত্রণ করে মণ্ডা-মিঠাই ছড়িয়ে দেয়, ছেলের বিয়েতে বাজী পোড়ায় ; কিন্তু যার ভাত নেই, সে ভাত পায় না। অবিচারের সংসার, দুনিয়ার মালিক যে, তাঁরও অবিচার। তা না হলে রাজীব দত্তের লাখ টাকা, আর আমি খেতে পাই না কেন ? রাজীব দত্ত যথার্থ ই বলেছে, যে খেতে দিতে পারে না, তার আবার মাগ্-ছেলে কেন ? না, আর মাগ্-ছেলে রাখবো না, খুন করবো, স্ত্রী-হত্যা করবো, পুত্র-হত্যা করবো, বাঁচিয়ে রেখে ভাতের জ্বালায় দগ্ধে দগ্ধে মারছি, তার চেয়ে এক ঘায়ে বলি দিয়ে সব জ্বালা জুড়িয়ে দেবো। এই ঠিক করেছি, এই প্রতিজ্ঞা। ধারাল রাম-দা আছে, ঘরে গিয়েই সব শেষ করবো। এ সংসারে গরীবের থাকতে নেই, যারা বড়মানুষ তারাই থাক্, তারাই আমোদ করুক, ফূর্তি করুক, বেশ্যা নাচাক,—জয় মা কালী, আজ তোকে স্ত্রী-পুত্র বলি দেবো। (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—ব্রহ্মচারীর আশ্রম।

(প্রেমানন্দ, শিবদাস, নিতাই দাস, চৌকিদার)

শিবদাস। গুরুদেব! সর্বনাশ হয়েছে!

প্রেমানন্দ। কি সংবাদ, শিবু?

শিবদাস। ভয়ঙ্কর সংবাদ, নিতাই দাস তিনদিন অনাহারে থেকে স্ত্রী-পুত্র খুন করেছে!

প্রেমানন্দ। সে কি!—তোমরা তার উপরে দৃষ্টি রাখ নি?

শিবদাস। আমরা পূর্বে জানতে পারি নি, দেশময় দুর্ভিক্ষ, ঘরে ঘরে লোক অন্ন-কষ্ট পাচ্ছে। আমরা ক'জনই বা লোক, আমাদের শক্তিই বা কি? বিশেষতঃ নিতাই দাসের যে এতদূর অন্ন-কষ্ট তা আমরা জানতে পারি নি। সে কোনদিনই কষ্টের কথা আমাদের জানায় নি। ছেলের হাতের বালা নিয়ে রাজীব দত্তের কাছে টাকা ধার করতে গিয়েছিল, রাজীব টাকা দেয় নি, উপরন্তু আগেকার দেনা ছিল বলে বালা দু'গাছিও কেড়ে রেখেছে।

প্রেমানন্দ। শিবদাস। আমি নিতাই দাসের বাড়ীর দিকেই চললুম, পার তো আমার সাহায্যে একবার এসো।

শিবদাস। গুরুদেব! ঐ যে নিতাইকে নিয়ে চৌকিদার এদিকেই আসছে।

(নিতাইকে নিয়ে চৌকিদারের প্রবেশ)

নিতাই। বেশ করেছি! ছেলে খুন করেছি, স্ত্রী খুন করেছি, তাদের পেটের আগুন জন্মের মত নিভিয়ে দিয়েছি।

প্রেমানন্দ। হতভাগার বুক দিয়ে রক্ত পড়ছে, বোধ হয় আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল।

নিতাই। ছেলের রক্ত খেয়েছি, স্ত্রীর রক্ত খেয়েছি, তারপর নিজের রক্ত খাচ্ছিলাম। খাবো না?—পেটে যে বড় ক্ষুধা! তিনদিন পর্যন্ত কিছুই খাই না, হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খেটে এক গোলা ধান পেয়েছিলাম, তা কতক মনিব, আর কতক মহাজনে বেচে নিলে। পরের দুয়ারে জন খাটতে লাগলাম, দেশেও দুর্মূল্য বাড়তে লাগল, জন খেটে দিন চালাতে পারলাম না,—ধার করলাম; ঘটি, বাটি,

বিছানা পর্যন্ত বিক্রয় করলাম, তারপর বড়মানুষের কাছে ভিক্ষার জন্য হাত পাতলাম। কিন্তু বড়মানুষ গরীবকে ভিক্ষা দেয় না; আপনার মত বড়মানুষ ডেকে ফলার দেয়, পোলাও খাওয়ায়, কিন্তু গরীবের মুখের দিকেও চায় না। যাক, বেশ করেছি, যোগ্য কাজ করেছি, যাদের প্রাণের চেয়েও ভালবেসে সংসার পাতিয়েছিলাম, এতকাল বুকের রক্ত দিয়ে পুষেছিলাম, তাদের রক্ত পান করেছি,—তারপর—তারপর এই দেখ, আমি ছিন্নমস্তা সেজেছি,—হাঃ- হাঃ-হাঃ!

প্রেমানন্দ। কি ভয়ঙ্কর!

নিতাই। ভয়ঙ্কর! কি ভয়ঙ্কর দেখছো? আমি ভয়ঙ্কর, না রাজীব দত্ত ভয়ঙ্কর? মা-বাপের চোখের সম্মুখে ছেলে অনাহারে মরে যায়, সেই ছেলের হাতের বালা নিয়ে মহাজনের দুয়ারে যায়, মহাজন টাকা ধার দেয না, বালা কেড়ে নেয়,—এর চেয়ে ভয়ঙ্কর কি করেছি? যাও—ঘরে ঘরে গিয়ে দেখো; সবাই আমার মত আপনার রক্ত আপনি [illegible] করছে। সংসার এখন ছিন্নমস্তার অধিকারে। -

প্রেমানন্দ। মা আনন্দময়ী! এ কি দেখাচ্ছ?

নিতাই। চৌকিদার! আমায় ধরেছিস কেন? আমি তো মানুষ খুন করি নি। খুন করেছে রাজীব দত্ত সুদখোর, খুন করেছে আমাদের মনিব ব্রজেশ্বর রায়। আমায় ছেড়ে দে! না।— ছাড়বি কেন? নিযে চল। খুনে খুন যাবে, আমার ফাঁসী হবে, তা হলেই আমার এ জ্বালা জুড়াবে। ও-হো—যারা আমার প্রাণের চেয়েও বড়,—স্ত্রী অর্ধাঙ্গিনী, পুত্র বংশের দু[illegible], ও-হো, আমি আপন হাতে তাদের মাথা কেটেছি! চলো, শীঘ্র আমায় হাকিমের কাছে নিযে চলো! আমার ফাঁসী হবে, তা হলেই সকল জ্বালার নির্বাণ হবে সন্ন্যাসী ঠাকুর। এসো, সাক্ষী দেবে! আমি খুন করেছি, যথার্থই আমি খুন করেছি!

(চৌকিদারসহ প্রস্থান)

(গীত)

প্রেমানন্দ। এ সব দেখে শুনে ধাঁ ধাঁ লাগে
বুঝে ওঠা দায়।

এর কোন্‌টা যে ঠিক,
কোন্‌টা বেঠিক
ঠিক করতে না পারি তায় ॥
কেউ সত্য পথে চলে,
ভাসে শুধু নয়ন-জলে,
কত পাপী ভূমণ্ডলে,
হেসে নেচে চলে যায় ॥
কেউ সারাদিন খেটে খেটে,
দিনান্তে ভাই পায় না খেতে,
কারো খাবার দিনে রাতে,
জোটে কত কেবা খায় ॥

(দৌড়ে সুধীরের প্রবেশ)

সুধীর। গুরুদেব, সর্বনাশ হয়েছে !

প্রেমানন্দ। আবার কি হলো ?

সুধীর। ব্রজেশ্বরের অত্যাচার আর তো সহ্য করতে পাবি না ! জানেনই তো মতি দত্তের বিধবা ভগ্নী তারামণি আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল, অনাথার জগতে আর কেউ নেই, ভাইটা নচ্ছার, বোনটাকে দু'টো ভাত দিলে না। বাবা তাকে আপন মেয়ের মতন ঘরে স্থান দিয়েছিলেন। ব্রজেশ্বর ঘাটের পথ থেকে তাঁকে জোর করে নিয়ে গেছে। কি ভয়ানক ব্যাপার মশাই, স্ত্রীলোকের মান-ইজ্জৎ বজায় রেখে চলা যাবে না ? বাবা আপনার কাছে আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন, আমি কিন্তু আর সহ্য করতে পারছি না—পিতার নিষেধ, নতুবা এতক্ষণ আমি ব্রজেশ্বর রায়ের মাথাটা গুঁড়ো করে ফেলতুম। বিধবা তারা, ভদ্রলোকের মেয়ে, সাধ্বী সতী, আমাদের আশ্রয়ে ছিল, আমরা তাকে রক্ষা করতে পারলাম না ? যদি আশ্রিতা অবলার ধর্ম রক্ষা করতে না-ই পারলাম, তবে এ প্রাণ রেখে আর ফল কি ? আপনি আমায় আদেশ করুন, আমি ব্রজেশ্বরকে মেরে ফাঁসীর কাঠে ঝুলবো।

প্রেমানন্দ। তাই তো, এ যে অসুরেরই অবতার বটে ! মা অসুরমর্দিনীর

অবতীর্ণ হবার সময় হয়েছে। সুধীর, স্থির হও, আমি যাচ্ছি, মা মহাশক্তির কৃপায় সতী-ধর্ম রক্ষা হবে। শিবদাস! দাও, আমার ত্রিশূল দাও—জয় মা কালী—জয় মা কালী! (প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—ব্রজেশ্বর রায়ের বাগানবাড়ী।

(ব্রজেশ্বর, তারামণি, প্রেমানন্দ, ছদ্মবেশী মা)

তারামণি। বাবু—বাবু, আমি অনাথা, অবলা, হিন্দুর বিধবা, আমার প্রতি এ অত্যাচার কেন? ছেড়ে দিন আমায়!

ব্রজেশ্বর। তোমায় আমি কত ভালবাসি, তা জান সুন্দরী? তোমায় রাজরাণী করবো।

তারা। আমি হিন্দুর বিধবা, সতী-ধর্ম রক্ষা করতে পারি। আমায় ত্যাগ করুন!

ব্রজেশ্বর। তোমার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করবো, তোমার গোলাম হয়ে থাকবো- আমার কাছে এস—প্রেমময়ী!

তারা। সাবধান রায়মশাই! জেন, আমি সতী নারী,—জ্বলন্ত আগুন, পুড়ে ছাই হবে, ধন-জন-জমিদারী পুড়ে ছাই হয়ে উড়ে যাবে। তুমি জমিদার, আমি তোমার প্রজা, প্রজা সন্তানস্বরূপ, আমার প্রতি তোমার এ কি অত্যাচার?

ব্রজেশ্বর। তাই তো! আমি জমিদার, তুমি আমার প্রজা, তোমার উপর আমার ষোল আনা অধিকার। তোমার ভাই খেতে দেয় না, তুমি দীনবন্ধু রায়ের বাড়ী দাসীপনা করে দু'টি অন্ন পাচ্ছ, তা হতে দেবো না, আমার ঘরে আমার হয়ে রাজ-সুখে থাকবে। এই যে দেখছো এমন সুন্দর বাগানবাড়ী, এই বাড়ীর তুমিই একমাত্র অধীশ্বরী, এ রাজ্যের রাণী। লজ্জা করো না লজ্জাবতী, এসো, আমার কাছে এসো!

তারা। সাবধান কুকুর! দুষ্প্রবৃত্তি দমন করো! জেন আমি সতী নারী, ভদ্রঘরের মেয়ে আমি। তোমার ধন-দৌলত, বাগানবাড়ী দেখে ভুলবো না। মিছিমিছি তুমি মহাপাপ করছ, আমার অকলঙ্ক কুলে কালি দিয়েছ, এই পাপে তোমার সর্বনাশ হবে! ছাড়, আমি যাই!

ব্রজেশ্বর। যাবে কোথা চাঁদ, আর কি যাবার যো আছে? ও সব সতীপনা এখন রেখে দাও। (হস্তধারণ)

তারা। ছাড়্ দুরাত্মা! সর্বনাশ হবে, মাথায় বাজ পড়বে, অনাথা কুলের কুলবধূ, আমার উপর অত্যাচার, ধর্মে সইবে না।

ব্রজেশ্বর। রেখে দাও তোমার ধর্ম! ধোঁকা দিয়ে চলে যাবে, এমন বোকা আমায় ভেবো না।

তারা। দোহাই ধর্মের, অবলার সর্বনাশ করো না! কোথায় তুমি মা-কালী, আমি দস্যুর হাতে পতিত, আমায় রক্ষা করো!

(প্রেমানন্দের প্রবেশ)

প্রেমানন্দ। মাভৈঃ—মাভৈঃ! সাবধান—নর-পিশাচ! কে মা তুই, নিজেই এসেছিস!

(গীত)

কে—ও রণরঙ্গিণী, প্রেম তরঙ্গিণী,
নাচিছে উলঙ্গিনী, আসব আবেশে হায়;
কুন্তল দল দল, চুম্বে চরণতল,
মধুব্রত চঞ্চল, ঝঙ্কারে পায় পায়॥
তুঙ্গ পয়োধরা, রঙ্গে লাস্য পরা,
সঙ্গে কামধুরা, কোটী যোগিনী ধায়;
হুঙ্কারে ঘন ঘন কম্পিত ত্রিভুবন,
শঙ্কিত দেবগণ শঙ্কর লোটে পায়॥
লাস্য সমুল্লাসে, চন্দ্র সূর্য খসে,
কক্ষ ভ্রষ্টাকাশে, গ্রহ তারা নিভে যায়;
গভীর অন্ধকারে, বিশ্ব ব্যাপ্ত করে,
সপ্ত সাগর নীরে, মুগ্ধ ধরণী ডুবায়॥
বধ বধ হন হন, প্রহরণ ঝন ঝন,
প্রবল প্রভঞ্জন, বুঝি প্রলয় ঘটায়;
কোটী বিজলী হাসি, বিস্মিত ভীম আসি,
নিশুম্ভে রণে নাশি, শোণিত তৃষা মিটায়॥
ভীষণাদপি ভীষণা, প্রেম-ফুল্লাননা,
হেরি নিরভয়মানা, ইন্দুপদে বিকায়;

কালী করুণা বসে, শমনে জয়ী অনায়াসে,
কাটিয়া অষ্টপাশে, মহা শিবে সে মিলায় ॥

ব্রজেশ্বর। দারোয়ান—দারোয়ান!

প্রেমানন্দ। দারোয়ানের সাধ্য কি মূর্খ, ধর্মের গতিরোধ করে! এসো মা, আমার সঙ্গে এসো। এ দেহে একবিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্ত কার সাধ্য সতীর অঙ্গ স্পর্শ করে, বেকুব!

(তারাকে নিয়ে প্রস্থান)

ব্রজেশ্বর। কি আশ্চর্য! বামুনটার কত বড় গোস্তাকী! ভেল্কি দিয়ে নিয়ে চলে গেল? এই বামুনটাই আমার পরম শত্রু। কাকিমাটা কাশী যাবে স্থির করেছিল, এরই কথায় এখন ফিরে বসেছে। আরো বলছে, আমার বিষয় আমায় ভাগ করে দাও। উইলের মামলা রুজু করেছে, এই ব্যাটাই তার সাক্ষী-সাবুদ সব যোগাড় করে দিযেছে। একে পথ থেকে সরাতেই হবে। টুকরো টুকরো করে কেটে নদীতে ভাসাতে হবে। থাকো প্রেমানন্দ! শীঘ্রই বুঝতে পারবে, ব্রজেশ্বরের সাথে লড়াই করার কি ভীষণ পরিণাম! (প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—মতি দত্তের বাড়ী

(মতি দত্ত, রাইমণি, হরগোবিন্দ, তারামণি, প্রেমানন্দ)

রাইমণি। মতি, কি ভয়ানক খবর দেখ্ দেখি?

মতি। কি আর ভয়ানক! যেতে দাও ও সব, যার যার কপালের কথা ভেবে নাও!

রাইমণি। বলিস্ কি? বোনটার এমনভাবে অপমান করলে, তার কি কিছুই করা হবে না? এ অপমানে কি তারা আর প্রাণে বাঁচবে? বিষ খেয়ে মরবে।

মতি। তা মরে মরুক! সেখানে থাকলে সুখে থাকতো, তা হলো না, গরীব দীনবন্ধুর বাড়ীতে যাওয়া হলো! সেই অপমানে অপমানী হয়েই তো ব্রজেশ্বরবাবু এমন করেছেন। এতে ব্রজেশ্বরবাবুর কোন মন্দ অভিপ্রায় ছিল না। কেবল দীনবন্ধুর উপর আক্রোশে মান

বাঁচাতে এমন করেছেন। যাক, মা যাও তো তুমি, আমার জন্যে এক পেয়ালা চা করে নিয়ে এসো। যাও, শীঘ্র যাও।

(রাইমণির প্রস্থান)

(বাহির হইতে হরগোবিন্দ) মতি বাড়ী আছ, মতি?

মতি। কে ডাকছেন, বড়বাবু! এদিকে আসুন, এদিকে আসুন!

(হরগোবিন্দের প্রবেশ)

হরগোবিন্দ। মতি, ভাল আছ তো, বউমাটি ভাল আছেন তো? বেড়াতে বেড়াতে আজ তোমার বাড়ীর দিকে এসে পড়লুম।

মতি। আনন্দের কথা, আমার সৌভাগ্য! মা ঠাকুরাণী ভাল আছেন তো? খোকাবাবু ভাল আছেন তো?

হরগোবিন্দ। সবই তো ভাল মতি, তবে একটা মুস্কিলে পড়েছি।

মতি। কি সে হুজুর, অনুমতি করুন!

হরগোবিন্দ। বাসার বামুনটা আজ দু'দিন চলে গেছে, খাওয়া-দাওয়ার বড়ই অসুবিধা হচ্ছে।

মতি। দু'দিন বামুন নেই? তবে রান্না করে কে?

হরগোবিন্দ। করবে আর কে, ওঁরা নিজেরাই করেন। অনভ্যাস, কষ্টের একশেষ।

মতি। আহা হা, মা-ঠাকরুণ নিজেই রান্না করেন! আমায় বলেন নি কেন? আমাদের বাড়ীর মেয়েরাই না হয় রান্না করে দিয়ে আসতো! আমার মা-ঠাকরুণ হাত পুড়িয়ে রান্না করছেন, আমাকে এতদিন বলেন নি কেন?

হরগোবিন্দ। দেখ মতি! বামুন রাখতে আর আমার ইচ্ছা নেই, একটা রাঁধুনী পেলে ভাল হয়। ব্যাটাছেলে প্রায়ই চোর-বদমাস হয়, ভদ্রঘরে ও সব রাখতে নেই। দেখ দেখি একটা রাঁধুনী পাওয়া যায় কিনা!

মতি। পাওয়া যাবে না কেন? নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে; কাল সকালেই আমি লোক দেবো।

হরগোবিন্দ। আচ্ছা, তবে এখন আমি আসি, তোমার জন্য তো ব্রজেশ্বরবাবুকে বলা হয়েছে, বোধ হয় হয়ে যাবে।

মতি। সে হুজুরের দয়া, হুজুর গরীবের মা-বাপ!

হরগোবিন্দ। আচ্ছা, তবে এখন আসি! (হরগোবিন্দের প্রস্থান)

মতি। ও মা, মাগো—একবার এদিকে এসো তো!

(রাইমণির প্রবেশ)

রাইমণি। কেন ডাকছিস্ বাবা ?

মতি। মা—বড় একটা সুবিধে পাওয়া গেছে, এতে তোমারও সুবিধে, আমারও সুবিধে।

রাইমণি। ব্যাপার কি? বড়বাবু বুঝি বলে গেলেন, তোর চাকুরীর উন্নতি হবে ?

মতি। হবে কি, হয়েছে। এখন তোমায় একটি কাজ করতে হবে। শোন বলছি। তোমারও এতে সুবিধা আছে। বাসায় থেকে বউয়ের সাথে তোমার মিশ খায় না, বউ তোমায় একটু কাজ করতে বললেই তোমার মুখ ভার হয়ে ওঠে। সে থাক, তোমার আর বাসায় থেকে কাজ নেই। এই যে আমাদের বড়বাবু এসেছিলেন, এঁর বাড়ীতে একটি রাঁধুনীর প্রয়োজন হয়েছে। খুব ছোট সংসার—কর্তা, গিন্নি আর একটি খোকা। বড়মানুষ, অনেকগুলি ঝি-চাকর আছে, তুমি কেবল দু'টি রাঁধবে, আর সারাদিন তোমার মালা জপ, সন্ধ্যা-আহ্নিক চলবে। কর্তা তোমায় খেতে-পারতে তো দেবেনই, আরো কালে কালে কিছু মাইনেও বোধ হয় দেবেন। সেই সঙ্গে আমার সুবিধাটা কি জানো? তুমি রাঁধ খুব ভাল, তা তো আমার জানাই আছে। তোমার রান্না খেয়ে বড়বাবু খুশী হবেন, তার আর সন্দেহ নেই। আর আমি এমন ভাল পাচিকার যোগাড় করে দিয়েছি, আমার চাকুরীর প্রমোশনটা খুবই তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। কালই কাজে বহাল হতে হবে, এতে অমত করো না কিন্তু!

রাইমণি। বলিস্ কি মতি ? আমি এখন পরের বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করতে যাবো ?

মতি। এই দেখো, আবার মানের বস্তা এলিয়ে নিয়ে বসলো! এ আবার দাসীবৃত্তি কি ? ভদ্রলোকের ঘরে দু'টি রান্না করবে!

রাইমণি। ছি—বাবা! অমন কথা বলিস না। আমি ভদ্রলোকের মেয়ে, তুই আমার যোগ্য ছেলে, আমি কি পরের ঘরে চাকুরী করতে যেতে পারি ?

মতি। ঐ তো মা—তোমাদের দোষ! ভদ্রলোকের মেয়ে! কত বড় মেয়ে তুমি? উচিত কথা বললে মা রুষ্ট হবে। নিজের মানের

মাত্রাটা একবার ভেবে দেখলেই পারো ! তোমার বাবা তো ক্ষেতে পড়ে খামার-টামার করেই খেতো ; আর তোমার স্বামী, যিনি আমার বাবা ছিলেন, বাবা হলে কি হয়—উচিত কথা বলতে হয়, তিনি তো পাটারীগিরি করেই দিন চালিয়ে গেছেন। এখন ভেবেই দেখ, তুমি চাষার মেয়ে, পাটারীর বউ, তোমার আবার মান কতটুকু ? তবে যা মান, সে আমার মা বলে। লোকে বলে, মতিবাবুর মা। তবে সেখানে তা তুমি ব'লো না। লোকে যদি জিজ্ঞেস করে, তবে ব'লো যে, মতিবাবুর দূরসম্পর্কীয়া একজন আত্মীয়া। ব্যস্, চুকে যাবে।

রাইমণি। তোর এমন বুদ্ধি হয়েছে মতি ? সে বড়বাবু নাকি জাতিতে ছোট, প্যাঁজ-মুরগী খায়, আমি কি এখন ছোটর দাসী হয়ে মুরগী রাঁধতে যাবো ?

মতি। এই দেখো, আবার কুলীনপনা আসলো ! Damn ! জাতি-ভেদ ওসব রেখে দাও। তুমি যাবে কিনা ?

রাইমণি। না বাবা ! আমি ও পারবো না।

মতি। আমার চাকুরীটার উন্নতির খাতিরেও পারবে না ?

রাইমণি। না, বাবা—আমার দ্বারা এ কাজ হবে না।

মতি। তুমি নিতান্তই কু-মাতা, আমার উপরে তোমার ভালবাসা মোটেই নেই। যে মা ছেলের চাকুরীর জন্য এইটুকুন করতে না পাবে, সে আবার—মা ! সে—তো রাক্ষসী !

রাইমণি। হা—নারায়ণ—!

মতি। এই আবার কাঁদতে বসলে ? দেখো, কাঁদলে চলবে না। আমি বাবুকে কথা দিয়ে ফেলেছি। কথা রাখতে না পারলে আমার মহাবিপদ, তাই বুঝে কাজ করো।

রাইমণি। আর একজন লোক দেখে শুনে দে।

মতি। কেন, তুমি পারবে না ? দেখো, মাসে পাঁচ টাকা মাইনে পাবে, ছ'মাসের মাইনে হলে গয়া কাশী অনেক তীর্থ করে আসতে পারবে !

রাইমণি। না বাছা, অমন গয়া'কাশী আমার মাথার উপরে থাক। আমি ম্লেচ্ছের দাসীপনা করতে পারবো না।

মতি। পারবে না, তবে খাবার আসবে কোথা থেকে ?

রাইমণি। তা তুই দু'টি ভাত দিতে না পারলে আমি ভিক্ষা মেগে খাবো।

মতি। তবে বের হও আমার বাড়ী থেকে, এ ভূতের বোঝা আমি বইতে পারবো না।

রাইমণি। মতি, এ তোর কি হয়েছে, তুই কি পাগল হয়েছিস্? সেই তিন বছরের তোকে কোলে নিয়ে বিধবা হয়েছি। মা ছাড়া জানতিস্ না। বিশ বছর বয়স পর্যন্ত আমার কোল ছাড়া তোর ঘুম হতো না, আর আজ তোর কি হলো, ঠাকুর, এ কি করলে! আমার সোনার ছেলে কেন এমন বিগড়ে গেল? নারায়ণ, তুমি শুধরে দাও, আমার বাছার মঙ্গল করো!

মতি। যাও, দিন থাকতে সরে পড়ো, এ বাড়ীতে তোমার ভাত-জল উঠে গেছে।

রাইমণি। মতি! আমি যে তোর মা!

মতি। অমন ঢের মা দেখা গেছে, যে মা ছেলের ভাল বোঝে না, সে আবার মা!

(প্রেমানন্দের তারাকে নিয়ে প্রবেশ)

(গীত)

প্রেমানন্দ। ঘোর কলিকাল যা দেখি সব উল্টো তোর,
নৈলে মা করবেন দাসীপনা,
গিন্নি উঠছেন মাথার 'পর॥
হয়েছে ছুনিয়ার কি দোষ,
সবে খোঁজে পরের দোষ,
দেখে আমার পাচ্ছে হাসি,
বাবুদের কি জ্ঞানের জোর॥
যে জন সদা খাচ্ছে মদ,
বেশ্যা যার পরম সম্পদ,
সে নয় দোষী,—তার উচ্চ পদ,
যে না খায় সে মদখোর॥
সদা অসতের আদর,
সতের যে হচ্ছে অনাদর,
(বাবুরা) নভেল পড়ে প্রেমে ভোর॥

দেখে-শুনে ভবের ভাব,
মুকুন্দের পুরিল অভাব,
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখিয়ে,
ভাঙ্গলো আমায় ঘুমের ঘোর॥

মতি। কে হে—তুমি? গান করতে করতে ভদ্রলোকের বাড়ীর ভেতরে ঢুকে পড়লে?

প্রেমানন্দ আরে ভাই,—আমি বোনকে নিয়ে ভাইয়ের বাড়ী উপস্থিত হয়েছি। (তারাকে সামনে নিয়ে) বলি মতিবাবু, এটি তোমার কে হয়?

মতি। (তারাকে দেখে) তারা যে? তুই আবার কোথা হতে এলি?

প্রেমানন্দ। তারা কোথায ছিল, তা জানো?

মতি। মা তো বলেছিলেন, দীনবন্ধু রায়ের বাড়ীতে আছে!

প্রেমানন্দ। ভাই থাকতে বোন পরের বাড়ী থাকবে কেন পাজী?

মতি। ও, তুমি বুঝি মুরুব্বিযানা করতে এসেছ? বামুন জাত কিনা, হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি!

প্রেমানন্দ। বামুন জাতের উপরে অত আক্রমণ কেন?

মতি। ভারি পাজি জাত। মন্ত্র পড়েই টাকা উড়িযে নিতে চায়। ছেলে-মেয়ে বিয়ে দাও, ঠাকুরকে দশ টাকা না দিলে চলবে না! মা-বাপ যদি মরে যায়, অমনি লম্বা চওড়া ফর্দ—চাল, কলা, গামছা, গাই, ষাঁড়, তারপর মাসে মাসে সপিণ্ডকরণ তর্পণ—এই বামুন জাতে ভেল্‌কী দিয়ে দেশটাকে গোল্লায় দিলে।

প্রেমানন্দ। আরে, সে জন্য আর ভাবনা কি!

মতি। ভাবনা নেই, এখনো মা'টা ঘাড়ের উপরে পড়ে আছে!

প্রেমানন্দ। আহা—হা, মা বেঁচে থাকতেই তার যে আদর, মরলে পরে তুই একটা দান-সাগর করবি আর কি? হায় ব্রাহ্মণ! দেখো, দেশের লোক তোমার একটা কি ঘৃণিত ছবি এঁকে নিয়েছে! তোমার জগৎ-পূজ্য দেব-প্রকৃতির উপরে কেমন হেয় কলঙ্কময় অখ্যাতি আরোপ করছে। ব্রাহ্মণ, তুমি ভূ-দেবতা। সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর যিনি, সেই সম্রাটের রত্ন-মুকুট একদিনতোমাদের পায়ে লুটায়ে ছিল। তোমাদের মুখ হতেই বেদ-বেদান্ত, দর্শন-উপনিষদ, এই সকল মহাসত্য নিঃসৃত হয়েছিল। আজ তোমাদের

সেই মুখে ধনবানের তোষামোদ গাথাই গীত হচ্ছে। শাস্ত্রের সরল অর্থ ছেড়ে দিয়ে কূটতর্কে আত্মগরিমা প্রকাশের টীকা রচিত হচ্ছে। ব্রাহ্মণ, তুমি তো ধনে বড় ছিলে না, জ্ঞানে বড় ছিলে। আজ তুমি জ্ঞান ছেড়ে ধনের সেবায় বড় হীন হয়ে পড়েছ। তাই বলি ব্রাহ্মণ, যুবক যদি কেউ থাকো, সমাজের জন্য যদি কারো প্রাণ কাঁদে, তবে ব্রাহ্মণের দ্বারে দ্বারে যাও,—যেয়ে গাও—

(গীত)

আমরা কেন ভোগে ভুলিব,
আমরা যে ভাই ত্যাগীর ছেলে,
এখন ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে,
অনুমানি তা গেছি ভুলে ॥
মনে নাই রে মোদের পূর্বপুরুষগণের স্মৃতি,
কেহ দণ্ডী ব্রহ্মচারী, কেহ সন্ন্যাসী, কেহ যতি,
যোগাসনে বসে কাটাতো কাল কুতূহলে ॥
মনে করলে হতো তারা,
এ ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি,
তা না হযে নিবিড় বনে,
নীরবে রইতো দিবারাতি ;
কত রাজরাজেশ্বর আসি,
তাঁদের চরণ-তলে বসি,
কৃপাবিন্দু লাভের তরে,
পা ধোয়াতো আঁখি জলে ॥
এখন দেখছি কাল-স্রোতে,
বইছে তার বিপরীত ধারা,
ত্যাগীর ছেলে ভোগীর পায়ে,
ঢালছে কত অশ্রুধারা ;
পাপ উদর, আর স্বার্থের লাগি,
আত্ম-গৌরব হারালে ?
এখনো সময় আছে,
বসে যা রে গভীর ধ্যানে,

ডেকে ডেকে কেঁদে কেঁদে,
বাধ্য করে সে ভগবানে ;
পুনঃ যদি তা পারিস হতে,
তবেই দেখবি এ ভারতে,
বইবে আবার উল্টো স্রোত,
ভাসবি সুখের হিল্লোলে

যাও না পুনঃ গুরু-গৃহে,
ধর না ব্রহ্মচারীব বেশ,
কব উচ্চ বেদধ্বনি,
শ্যাম-গানে জাগাও না দেশ ;
হও না পুনঃ সর্বত্যাগী,
রও না জগৎ-মঙ্গলে ॥

পুনঃ যদি সাধনাতে
একটি ব্রাহ্মণ হতে পাব,
তবে কটাক্ষেতে কোটী কোটী,
ত্যাগী ছেলে সৃজিতে পার ,
তবেই যাবে এ দুর্গতি
নৈলে বে ভাই অধোগতি,
এতেই ডুবে যাবে বে ভাই,
মোহ-সিন্ধুর অতল জলে ॥

দেখো মতিবাবু ! তোমার তো বুঝি আর মা-বোনকে খেতে দেওয়া পোষায না ! আমি বড় মা-কাঙ্গাল, এ মাকে আমায় দাও, আমি নিযে যাচ্ছি। আর, তোমাব বোনকে তো আমি ব্রজেশ্বরের হাত থেকে উদ্ধাব কবে নিয়ে এসেছি, ও তো আমাব কাছেই থাকবে ; আমি তোমার সব গোল মিটিয়ে দিচ্ছি।

রাইমণি তাই হউক, বাবা, আমি তোমার সাথেই যাবো। তাবা, তুইও চল, এই সাধুর সঙ্গে চল।

তারা। যাবো মা, যাবার পূর্বে দাদাকে দু' একটা কথা বলে যাবো। দাদা, তুমি আমার ভাই, আমি তোমার বোন, তোমারই রক্ষণীয়া। দুরাত্মা ব্রজেশ্বর আমার অঙ্গ স্পর্শ করেছে, আমার অকলঙ্ককুলে কালি দিযেছে, এ অপমানে আমার বুকে তুষানল জ্বলছে, এর

প্রতিকার ক'রো। আমি তোমার কাছে অন্নবস্ত্র চাই না, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মেগে খাবো, কিন্তু যতদিন দুরাত্মা ব্রজেশ্বরের এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে না পারছি, ততদিন আমার প্রাণের আগুন নিভবে না। তুমি ভাই, বোনের এই অপমানের প্রতিশোধ নিও।

মতি। সে দেখা যাবে,—ব্রজেশ্বর রায় বড়মানুষ, তার উপর প্রতিহিংসা লওয়া কি যে-সে কথা! ওসব আর মনে ক'রো না, ভুলে যাও।

তারা। কি বললে? ভুলে যাব? না, এ প্রতিহিংসা ভুলবার নয়। বুঝি নরাধম ব্রজেশ্বরের বুক চিরে রক্ত পান করতে পারলে এ প্রতিহিংসা ভুলতে পারবো। তুমি নচ্ছার, ইতর, মা-বোনের অপমান তুমি ভুলতে পার, নচেৎ আমার দশা এমন হবে কেন? তবে যাই দাদা, চিরদিনের জন্য বিদায় নিচ্ছি। কিন্তু মনে রেখো, তারা সতী মায়ের সতী কন্যা, তারা এ অপমানের প্রতিশোধ নেবে, দুরাত্মা ব্রজেশ্বরের বুক চিরে রক্ত পান করবে।

মতি। যা—যা, চলে যা এখান থেকে।

প্রেমানন্দ। চলো মা, চলো। ব্যাটা মা-বোনকে খেতে দিতে পারেন না, আবার একটা সোনার চশমা নিয়েছেন!

(রাইমণি ও তারাকে নিয়ে প্রেমানন্দের প্রস্থান)

মতি। যাক্, বাঁচা গেল! (প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য

স্থান - আনন্দময়ীর ঠাকুরবাড়ী।

(আনন্দময়ী, তারা, ব্রজেশ্বর, প্রেমানন্দ ও কৃষক-বালকগণ)

তারা। (স্বগতঃ) আ—মরি—মরি! কি সুন্দর প্রেমের ছবি! রাণী আনন্দময়ীর জীবনই সার্থক। ঠাকুর যথার্থ ই ওঁর সনে কথা বলেন, ওঁর সঙ্গে লীলা করেন। এখানে এলেই যেন প্রাণ শীতল হয়। আজ ক'দিন মাত্র এখানে এসেছি, সব জ্বালা যেন জুড়িয়ে গেছে। ভাইয়ের অনাদর, অনাথা বিধবা বলে প্রাণের ভিতর যে যাতনা আমি মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারি নি, এইখানে এসে গুরুদেবের কৃপায় সবই যেন ভুলে গেছি। কিন্তু একটা জ্বালা এখনও প্রাণ

থেকে সরাতে পারছি না। দুরাত্মা ব্রজেশ্বর আমার অঙ্গ স্পর্শ করেছে, আমার অকলঙ্ক জীবনে কলঙ্ক মেখেছে, এর প্রতিহিংসা আমার নিতেই হবে। গুরুদেব বলেন, ক্ষমা করো, আনন্দময়ীও বলেন, ক্ষমা করো,—ভুলে যাও। কিন্তু আমি তো ভুলতে পারছি না! বুঝি ব্রজেশ্বরের রক্ত পান করতে না পারলে এ জ্বালার অবসান হবে না। ঠাকুর! বুঝে দেখো, আমার মর্মে কি যাতনা!

আনন্দময়ী। এসেছ তারা? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছ? ঠাকুরের পূজার ফুল এনেছ? এস না, পূজা করি!

তারা। এই নাও মা ফুল, তুমি পূজা করো।

আনন্দময়ী। আমি একলা কেন পূজা করব, এস না দু'জনেই পূজা করি!

তারা। না মা, আমি এখনও ঠাকুরের পায়ে ফুল দেবার যোগ্য হই নি। গুরুদেব বলেছেন, নিষ্পাপ পবিত্র অন্তরে ঠাকুরের পূজা করতে হয়। আমার মনে এখনও অনেক পাপ, অনেক ময়লা।

আনন্দময়ী। আচ্ছা তারা, তুমি ঠাকুরকে কিভাবে ভাবো?

তারা। গোপাল ভাবে ভাবি। গুরুদেব বলেছেন, তাঁকে যে যেভাবে ভাবে, তিনি তাকে সেইভাবেই দর্শন দেন। তাঁর কাছে যে যা চায়, সে-ই তা পায়। আমি আর কিছুই চাই না, ননীচোরা গোপাল নেচে নেচে ননী খাবে,—আরও চাইবে! মা, এমন দিন কি আমার হবে?

আনন্দময়ী। কেন হবে না মা? তুমি মা যশোদা, তোমার গোপাল তোমার কোলে বসে মা বলে ডাকবে। আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ঠিক হলো। তুমি আমার মা—শাশুড়ী মা। মা, তোমার গোপালকে যে আমি মালা পরিয়েছি!

তারা। গুরুদেব কি তোমায় তাই বলে দিয়েছেন?

আনন্দময়ী। হ্যাঁ মা, আমি পতি-পাগলিনী বলে, গুরুদেব আমায় শ্যাম-স্বামী দিয়েছেন।

তারা। গুরুদেব আমার অন্তর্যামী, আমি ছেলে ভালোবাসি, তাই তিনি গোপালকে আমার ছেলে করে দিয়েছেন।

(ব্রজেশ্বরের প্রবেশ)

ব্রজেশ্বর। বিট্‌লে প্রেমানন্দ বামুনটা কি একটা বিদঘুটে কাণ্ডই না করে তুলেছে! গ্রামের যত মায়ে-তাড়ানো; বাপে-খেদানো লোক

নিয়ে একটা নেড়া-নেড়ির আখড়া করে তুলেছে। বলি কাকীমা, এসব কি কাণ্ড?

আনন্দময়ী। এসব লীলাময়ের লীলা; আমি আনন্দ রাজ্যে রাজত্ব পাতিয়েছি।

ব্রজেশ্বর। কোথায় তুমি তীর্থবাসী হবে, পরকালের পথ দেখবে; তা না বিষয়-কর্মে মন দিলে?

আনন্দময়ী। আমার বড় ভাগ্যি বাবা, আমি ঘরে বসেই বৃন্দাবনবিহারীর দর্শন পেয়েছি! ঠাকুর গুরুবেশে এসে আমায় চরিতার্থ করেছেন। ঐ দেখ বৃন্দাবনবিহারী বনমালী, করে বাঁশী, অধরে মধুর হাসি, বাঁকা শিখি-পাখা শিরে, মদনমোহন আমার কেমন সুন্দর!

ব্রজেশ্বর। রেখে দাও ওসব। আমি ও ধর্মকথা শুনতে আসি নি। আমি জানতে এসেছি, তুমি আমার উইলের মোকদ্দমায় জবাব দিয়েছ?

আনন্দময়ী। তোমার মিথ্যা উইল, গুরুদেবের আদেশে আমি তা রদ করার চেষ্টাই করছি।

ব্রজেশ্বর। তোমার গুরুদেব কে, ঐ প্রেমানন্দ?

আনন্দময়ী। হ্যাঁ, তিনিই আমার গুরু।

ব্রজেশ্বর। তুমি কুলগুরুর অপমান করেছ, তুমি গুরুত্যাগিনী মহাপাপিষ্ঠা!

আনন্দময়ী। যার প্রতি বিশ্বগুরু নারায়ণ কৃপা করেন, তার গুরু তিনিই মিলিয়ে দেন, আমার যিনি গুরু, তিনিই স্বয়ং নারায়ণ।

ব্রজেশ্বর। আমি তোমার ঐ ভাণ্ডামী দেখতে আসি নি, আমি জানতে এসেছি তুমি আমার উইল মঞ্জুর করে দেবে—কি—না?

আনন্দময়ী। না।

ব্রজেশ্বর। এতবড় জমিদারীতে তোমার কি প্রয়োজন?

আনন্দময়ী। আমার বড় প্রয়োজন বাবা, আমি বিশ্বপতিকে বরণ করেছি, বিশ্ব জুড়ে সংসার পাতিয়েছি, আমার জমিদারী, টাকাকড়ির খুব প্রয়োজন, আমি তোমায় অনুরোধ করছি, আমার সম্পদ আমায় ফিরিয়ে দাও।

ব্রজেশ্বর। তুমি স্ত্রীলোক, ভেবেছ আমার সঙ্গে বিসম্বাদে জয়ী হবে?

আনন্দময়ী। সত্য স্বরূপ নারায়ণের কার্য, আমায় পরাজিত করে কে?

ব্রজেশ্বর। একটা বিট্‌লে প্রেমানন্দ তোমার সহায় মাত্র, তার সাথে দীনবন্ধু রায়, আর তার ছেলে সুধীর। একটা রাস্তার লোক কুড়িয়ে

ভাবছ, তুমি আমার সাথে আঁটবে? দীনবন্ধুকে তো আমি উচ্ছন্ন করেছিই, আর কিছুদিন পরে দেখবে, দীনবন্ধু ভিক্ষা মেগে খাচ্ছে, আর প্রেমানন্দের শব শেয়াল-কুকুর ছিঁড়ে খাবে। সেদিন অতি নিকটে।

আনন্দময়ী। সে যা হয় হবে, ব্রজেশ্বর। তুমি এখান থেকে চলে যাও।

ব্রজেশ্বর। কাকীমা! এরূপ কার্যে তোমার কি দুর্নাম হচ্ছে, কি কলঙ্ক হচ্ছে, তা তুমি জানো?

আনন্দময়ী। সুনাম-দুর্নামকে আমার ভয় নেই বাবা।

ব্রজেশ্বর। ছি ছি ছি! এমনভাবে গোল্লায় গেছ? এতবড় গোস্তাকি তোমার? তুমি ভেবেছ, তোমার শাসনকর্তা কেউ নেই? শেষ-কালে তোমার কপাল পুড়লো একটা বুড়ো বামুন নিয়ে—তুমি আমার রায়-বংশে কলঙ্ক দিয়েছ, তোমায় কেটে টুকরো টুকরো করে নদীর জলে ভাসিয়ে দেবো।

আনন্দময়ী। ব্রজেশ্বর! এখান থেকে চলে যাও বাবা!

ব্রজেশ্বর। চলে যাবো? আমি চলো যাবো? কাকীমা বলে এতদিন কিছুই বলা হয় নি, কিন্তু আমি তো আর সহ্য করতে পারছি না। প্রেমানন্দ সন্ন্যাসী সেজে এ দেশটাকে মজাতে বসেছে। ঐ তো আর একটি কোন্ ভদ্রলোকের মেয়েকে ঘর থেকে বের করে এনে সেবাদাসী করেছে।

তারা। এ ভদ্রলোকের মেয়েকে তুমি চেন না ব্রজেশ্বর? দাঁড়াও, আজ চিনিয়ে দিচ্ছি! (বস্ত্রাভ্যন্তর থেকে ছুরি বের করে) এই দেখো, এখন আর আমি অনাথা অবলা নই।—প্রতিহিংসা! দারুণ প্রতিহিংসা! গভীর প্রতিহিংসা! নরাধম, তোর মুণ্ড গলায় ঝুলিয়ে আজ আমি মুণ্ডমালিনী হবো। (ছুরি বসাতে উদ্যত)

ব্রজেশ্বর। (ভীতভাবে) ওরে বাবা, এরা সব কেমন মেয়ে-মানুষ গা, সব যেন ডাকিনী!

তারা। ডাকিনী! তোর রক্ত-পিয়াসী ডাকিনী! ভীম যেমন দুঃশাসনের রক্ত পান করে রাক্ষস হয়েছিল, আমি আজ তোর রক্ত পান করে রাক্ষসী হবো।

(প্রেমানন্দের প্রবেশ)

প্রেমানন্দ। কি করছ তারা?

তারা। গুরুদেব! আমি পারলাম না, প্রতিহিংসা দমন করতে পারলাম না।

প্রেমানন্দ। না পারলে যে তুমি গোপাল পাবে না দিদি?

তারা। কি করবো গুরুদেব! এই দুরাত্মা এসে আমার সম্মুখে রাণী-মাকে কটূক্তি করছে, আপনাকে গাল দিচ্ছে, আমি যে আর সইতে পারলাম না গুরুদেব!

ব্রজেশ্বর। এ কে?—প্রেমানন্দ? তুমি আবার এখানে?

প্রেমানন্দ। আসবো না? তোমাকে দিয়ে আমার কত কাজ! তুমি জমিদার, দেশে কত টাকার প্রয়োজন, কত কল-কারখানা করতে হবে, আরো কত কি—

(গীত)

(হায় রে) বান এসেছে মরা গাঙে,
খুলতে হবে নাও।
তোমরা এখনো ঘুমাও॥
কত যুগ গেছে কেটে, দেখেছ কত স্বপন,
বদর বলে ধর বৈঠা, জীবন-মরণ পণ,
দমকা হাওয়ার কাল গিয়েছে,
ফাগুন বইছে পাল খাটাও॥
অবহেলে থাকলে বসে, কাঁদতে হবে সারা জীবন,
যুগ-যুগান্তের তপস্যাতে, মিলেছে এমন লগন,
পরের মাঝি হাল ধরেছে,
মিছে পরের মুখ তাকাও॥

ব্রজেশ্বর। আচ্ছা, থাকো প্রেমানন্দ, কিছুদিনের ভিতরেই বুঝতে পারবে, আমি কেমন ব্রজেশ্বর রায়! (প্রস্থান)

প্রেমানন্দ। ব্রজেশ্বর কি বললে, রাণী-মা?

আনন্দময়ী। গুরুদেব, ব্রজেশ্বর উইলের মোকদ্দমা করেছে, আমি তার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছি, ব্রজেশ্বর আমায় ভয় দেখাতে এসেছিল। গুরুদেব, ব্রজেশ্বর অতি ভয়ঙ্কর লোক, একটা কিছু অত্যাচার করতে পারে!

প্রেমানন্দ। ব্রজেশ্বরের ইচ্ছা সে আমায় খুন করবে!

আনন্দময়ী। ও দুরাত্মার অসাধ্য কাজ কিছুই নেই।

প্রেমানন্দ। তবে তুমি এখন কি করতে চাও?

আনন্দময়ী। গুরুদেব! আমাদের জমিদারীতে কি প্রয়োজন? জমিদারী ব্রজেশ্বর নিয়ে যাক। আমার হাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে, তাই দিয়ে ঠাকুর-সেবা ও সেবাশ্রমের কাজ চলবে।

প্রেমানন্দ। কেন? বিসম্বাদ দেখে ভয় পেলে নাকি?

আনন্দময়ী। বিসম্বাদে ভয় করি না। কিন্তু ব্রজেশ্বর সহজে ছাড়বে না, এ নিয়ে লড়াই-দাঙ্গা, খুন-জখম হবে। রক্তারক্তি, নরহত্যা এসব তো ভাল লাগে না!

প্রেমানন্দ। রক্তারক্তি, নরহত্যায় আমাদের ভয় কি? ও তো হবেই। ব্রজেশ্বর যদি সাধু-চরিত্র জমিদার হতো, তবে তার সম্পত্তি তাকে ফিরিয়ে দেওয়া অন্যায় হতো না। এখন আমাদের কি করতে হবে জানো? তোমার অধেক জমিদারী তো ভাগ করে নিতেই হবে, অধিকন্তু ব্রজেশ্বরের জমিদারীও আমাদের হস্তগত করতে হবে। ওকে নিরন্ন ফকির করে তুলতে না পারলে ও মহাপাপীর পরিত্রাণ হবে না। জেনে রেখো, যে মহাপাপী, তার উদ্ধারসাধন করাই হচ্ছে নারায়ণের অতি প্রিয় কার্য। তুমি কোন চিন্তা ক'রো না, যদি ঠাকুরের কৃপা থাকে, তবে এই ব্রজেশ্বর দু'দিন পরে এসে তোমার চরণ ধরে বলবে—মা, আমায় ক্ষমা করো! যাক্, বড় বাজে কথা বলছি, তোরা কে আছিস্ রে—, ঠাকুরের আরতির সময় হয়েছে, একটা আরতির গান কর তো!

(কৃষক-বালকদের গান)

একি আরতি তব বিশ্বপতি
তোমারি বিশ্ব-মন্দিরে।
ওঠে অযুত কণ্ঠে উদার গীতি,
তোমার পানে গম্ভীরে॥
বাজে শঙ্খ ঘোর শননে,
চন্দ্র-তারকা কাঁপে গগনে,
জলদ মন্দ্রে প্রচারে পবনে,
ভুবনে ভুবনে অধীরে॥
নিষাদ রিখাত গান্ধার তান,
মূর্ত্ত রাগিণী লভিল প্রাণ,
দিক-দিগন্ত কম্পমান,

শিহরে ধরণী রে—
জয় জয় জয় মহিমময়,
চির সুন্দর মঙ্গলালয়,
মূরতি ধরিয়া উঠুক আরতি,
মন-প্রাণ শরীরে ॥

প্রেমানন্দ। যাও মা, যাও তারা, ঠাকুরের ভোগের যোগাড় করো গে।

(সকলের প্রস্থান)

নবম দৃশ্য

স্থান—মাঠের ভিতরে ধানের ক্ষেত।

(কৃষক বালকগণ, রাজীব দত্ত, দীনবন্ধু, ভোলা, প্রেমানন্দ, ও কালাচাঁদ)

(গীত)

কৃষক-বালকগণ। [illegible] চষে নে চষে ভুঁই !
এই লাঙ্গলে শাঁখা-শাড়ী,
এই লাঙ্গলে গোলাবাড়ী,
শিকের উপর উঠবে হাঁড়ি,
যদি লাঙ্গল থুই ॥
জানি না কো বাবুয়ানা,
চিনি না কো সোনা-দানা,
নাই কো মোদের খাট-বিছানা
মাটির উপর শুই ॥
চাই না কো ভাই মোণ্ডা-মিঠাই,
চিড়া-মুড়ির অভাব কি ভাই,
ঘরে আছে লক্ষ্মী গাই,
যোগায় দুধ-দই ॥
গোলা ভরে তুলবো ধান,
অতিথি সাধুর রাখবো মান,
দয়াল ঠাকুর ভগবান,
ভক্তি বলে জয়ী ॥

(রাজীব দত্তের প্রবেশ)

রাজীব। ব্যাটাদের যে ভারি স্ফূর্তি দেখতে পাচ্ছি! এবার জমি চাষের টাকা পেলি কোথায় রে? একটি ছেলেও এবার আমার ঘরে এল না, একটি টাকাও এবার দাদন হলো না। হ্যাঁ রে ভোলা, ভাল আছিস তো বাবা?

ভোলা। আজ্ঞে ভাল আছি, নমস্কার।

রাজীব। চাষবাস চলছে কেমন রে?

ভোলা। খুব ভাল চলছে, ভগবানের কৃপায় এমন ভাল আর কোন বছরই চলে নি। এবার স্বয়ং মা-লক্ষ্মী আমাদের জান বাঁচাবার জন্য দুনিয়ায় এসে জন্ম নিয়েছেন।

রাজীব। মোষ কিনেছিস্?

ভোলা। হ্যাঁ—এবার জন প্রতি জোড়া বলদ কিনেছি। চাষের কাজ তো সারা।

রাজীব। টাকা পেলি কোথায় রে?

ভোলা। রাণী আনন্দময়ী এবার সবাইকে টাকা ধার দিয়েছেন।

রাজীব। বটে! সুদ কত করে?

ভোলা। সুদ নেই, বিনা-সুদে।

রাজীব। এ্যাঁ—বিনা-সুদে, তাও কি কখনো হয় রে? চাষা কিনা, বুঝতে পারিস নি, দলিলে দেড়া সুদ লিখে নিয়েছে।

ভোলা। দলিল আবার কি? এ টাকার কোন দলিল-পত্র নেই, রাণী-মা তো আর তোমার মত সুদখোর নন্। তিনি বললেন, টাকা আমার নয়, এ শ্যামসুন্দরের টাকা, তোমরা ঐ ঠাকুরের টাকা ঠাকুর সাক্ষী করে নিয়ে যাও—আমরাও তাই এনেছি। স্বয়ং লক্ষ্মীনারায়ণ মানুষের বেশে গরীবের প্রাণ বাঁচাতে এসেছেন, রাণী-মা স্বয়ং লক্ষ্মী, আর সেই ব্রহ্মচারী ঠাকুর নারায়ণ। কত লোক ঠাকুরবাড়িতে যাচ্ছে, কত অন্ধ, আতুর, রোগা, শোকা সেখানে পড়ে আছে; যে যে ব্যারাম নিয়ে যাচ্ছে, সে-ই ভাল হচ্ছে।

রাজীব। হ্যাঁ বুঝেছি, ব্যাটারা, বড়ই নিমকহারাম! আজ একটু সুবিধা পেয়েছে, আর পুরানো মহাজনের কথা ভুলে গেছে। আচ্ছা থাক্, আবার যেতে হবে।

(দীনবন্ধুর প্রবেশ)

দীনবন্ধু। আ—হা—হা—কি আনন্দ! মা আনন্দময়ী অকাতরে সন্তানগণকে আনন্দ বিলাচ্ছেন। শ্যামাবরণী শ্যামাভরণী মা আমার অন্নপূর্ণা-রূপে কি শোভাই না বিকশিত করেছেন! গত বছর অজন্মায় অনেক কষ্টের পর দীন প্রজারা আবার ক্ষেত্রময় হরিৎ শোভা দেখে নেচে উঠেছে। যে মা করাল ভয়ঙ্করীরূপে দীন-দুঃখীর দুয়ারে দারুণ দুর্ভিক্ষ মূর্তিতে ভীষণ তাণ্ডব-নৃত্য করেছিলেন, আজ আবার সেই মা শান্ত করুণাময়ী ক্ষেমঙ্করী কমলারূপে দীনের কুটীরে হাসির লহরী তুলছেন। লীলাময়ী মায়ের সন্তানের সঙ্গে কি রহস্যময়ীর লীলা! মা কখনো রক্তনেত্রে সন্তানদের ভয়ে বিত্রস্ত করছেন, কখনো বা আদরে তাদের আনন্দে বিভোর করে দিচ্ছেন।

রাজীব। ভাল আছেন তো দীনবন্ধুবাবু?

দীনবন্ধু। হ্যাঁ, ভালই আছি। এবার মা আনন্দময়ীর রাজ্যে নিরানন্দ নেই।

রাজীব। তাই তো, আপনি মহাশয় ব্যক্তি, দেখুন আমার কোন দোষ নেই। ব্রজেশ্বরবাবু জমিদার—তাঁর অনুরোধ না শুনে পারি না তাই সে হ্যাণ্ডনোটখানা আমার স্বীকার করতে হয়েছে। আমি তো মহাশয়কে পূর্বেই বলেছিলাম যে আপনি জমিদারের সাথে একটা আপোস করে ফেলুন। কিন্তু তা আপনি শুনলেন না, বড় মানুষের সাথে আঁটাআঁটি সাজে?

দীনবন্ধু। সে থাক্ দত্তমশায়! পুরানো কথায় আর কাজ নেই।

রাজীব। আপনি পরম সাধু, আপনার খামার-জমিগুলি ব্রজবাবু কেড়ে নিলে, এ বড় অন্যায় কথা তো! দেখুন মশায়, এতে আমার এক পয়সাও লাভ হয় নি। কেবল জমিদার বাস্তু-পুরুষ, তাই তাঁর অনুরোধে আমায় মোকদ্দমায় জবানবন্দী দিতে হলো। ফলভোগী হলেন জমিদারবাবু, আমি কেবল বদনাম কিনে নিলাম।

দীনবন্ধু। তা আপনি জানেন। সে কথা তুলবার বিশেষ আবশ্যক নেই।

রাজীব। আমার উপর আপনার ক্রোধ না থাকে, এই প্রার্থনা!

দীনবন্ধু। কিছুই নয়, আপনি ক্রোধের পাত্র নন।

রাজীব। তা তো বটেই, ক্ষতি আপনার যা করেছে, তা ব্রজেশ্বরবাবু আর তাঁর দেওয়ান হরগোবিন্দ; আমি কেবল নিমিত্ত মাত্র।

দীনবন্ধু। আপনি অন্যত্র কাজ থাকলে যেতে পারেন। আমি [illegible] বিয়ে একটু আনন্দ করতে এসেছি।

রাজীব। তা বেশ, আনন্দ করুন—আনন্দ করতে বাধা কি? আরে ভোলা, তুই তো এবার তোর বোনের বিয়ে দিতে চেয়েছিলি?

ভোলা। গতবছর এতবড় মন্বন্তর গেল, বিয়ের টাকা পাবো কোথায়?

রাজীব। টাকার অভাব ছিল কি রে? গৌরদাসের এমন সুন্দর ছেলেটা ছেড়ে দিলি? এমন ছেলে কি আর মিলবে? তোর জন্য দু'শো টাকা তুলে রেখেছিলাম, খুব কম সুদেই তোকে দিতাম। তোর সাথে একটা ধর্ম সম্বন্ধও তো আছে!

ভোলা। না গো, না, তোমার কাছে আর টাকা ধার করছি না, তুমি সবে পড়ো।

রাজীব। ব্যাটারা বড চালাক হয়েছে। আচ্ছা দেখা যাবে, দেখা যাবে!

(প্রস্থান)

ভোলা। কর্তা, আপনার খামার-জমিগুলি কি সমস্তই ব্রজেশ্বরবাবু কেড়ে নিয়েছেন? এই রাজীব দত্তই নাকি জাল খৎ করেছিল?

দীনবন্ধু। সেকথা কেন বাবা? যা হবার হয়েছে।

ভোলা। খামার-জমি নেই, তবে আপনার চলবে কিসে? বারো মাসে তেরো পর্ব, অতিথি-সেবা, ঠাকুর-সেবা কি করে চলবে? ভগবানেরই বা কেমন ইচ্ছা, আদালতের বিচারই বা কেমন?

দীনবন্ধু। অবিচার কিছুই নয় ভোলানাথ, এ সব পরীক্ষা। শুধু সম্পদ নিয়ে জীবন কাটানো কারো ভাগ্যে ঘটে না। সম্পদের সুখ ভোগ করবে, বিপদের ব্যথা গায়ে লাগবে না, অদৃষ্ট এরূপভাবে নিরূপিত করেন নি। থাক, আনন্দ করো, আনন্দময়ী তারার গুণগান করো। আয় ভাই সব, বন্ধু সব, আমরা সকলে একপ্রাণে সেই আনন্দময়ীর নাম কীর্তন করি!

(প্রেমানন্দের প্রবেশ)

প্রেমানন্দ। ডাক দীনবন্ধু, খুব ডাক, ডাকার সময় এসেছে। আজ তুমিও ডাকো, তোমার সাথে আমিও ডাকি।

(গীত)

জাগতে হবে, উঠতে হবে,
জাগতে হবে কাজে,

জগৎ জুড়ে কেউ বসে নাই,

মোদের কি ঘুম সাজে ?

যেতে হবে সাগরের পার,

(এখন) ছাড়তে হবে জেতের বিচার,

শুনতে হবে জগৎ বীণা,

কোন্ সুরেতে বাজে।

পরের খেয়ে, পরের লয়ে,

চলবে না দিন গেছে বয়ে,

পা থাকিতে নিছি লাঠি,

হাসে লোক-সমাজে।

যাদের মা উপবাসী,

তাদের মুখে রঙ্গ হাসি,

দেখে মুকুন্দ মরে যায় আজ,

ঘৃণা অভিমান লাজে। (প্রস্থান)

(কালাচাঁদের প্রবেশ)

কালাচাঁদ। কর্তা, আপনি এ্খনো মাঠে দাঁড়িয়ে? দেওয়ান হরগোবিন্দ মালক্রোকের পরোয়ানা নিয়ে এসে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

দীনবন্ধু। জিনিসপত্র সব বের করে নিয়েছে কি ?

কালাচাঁদ। না, বের করতে এসেছিল, আপনি বাড়ি নেই, বড়বাবু বাড়ি ছিলেন, তিনি অনেক নিষেধ করলেন। কিন্তু ব্যাটারা তা শুনল না। যে ঘরে বউ-মা ছিলেন, সে ঘরে ঢুকতে গেল, আমি দোহাই দিলাম, স্ত্রীলোকের ইজ্জৎ, ভদ্রলোকের মান, কত করে নিষেধ করলাম, পাজী ব্যাটারা তাও শুনল না। যে ঘরে মা-লক্ষ্মী ছিল, সে ঘরে ঢুকে পড়ল। আর আমি সইতে পারলাম না, আমার বুকের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল, অমনি একটা বরকন্দাজের পিঠে এক ঘা বসিয়ে দিলাম! ইচ্ছা ছিল পাজী হরগোবিন্দের পা দু'খানা গুঁড়া করে ফেলি। কিন্তু কি করবো, পাজী ব্যাটা দৌড়ে পালাল। কি ভয়ানক ব্যাপার হলো বলুন দেখি, ধর্ম বলে যে জগতে কিছু আছে, তাও ওদের বিশ্বাস নেই!

দীনবন্ধু। ভাল করো নি কালাচাঁদ। জমিদারের দারোয়ানকে লাঠি মেরেছ, তার সঙ্গে আদালতের চাপরাশীও ছিল!

কালাচাঁদ। থাক মশায়! রক্ত-মাংসের শরীর, কত আর সইব? তুমি শিবঠাকুর, সইলে সইতে পারো, আমি অত সইতে পারবো না। এত অত্যাচার, এত অবিচার, ধর্ম যে কি করে সয়ে আছেন, তাই আমি বুঝতে পারছি না।

দীনবন্ধু। অত উতলা হচ্ছ কেন কালাচাঁদ? যাঁর হাতে জগতের বিচার, তাঁর কখনো ভুল হয় না।

কালাচাঁদ। তুমি বলো কি? তোমার জমাজমি-তালুক সবই কেড়ে নিয়েছে, এমন কি তোমার বাড়িখানা নিয়ে তোমায় রাস্তায় দাঁড করিয়েছে, আরো কি বাকী আছে বলো তো?

দীনবন্ধু। বাকী আছে, হয় আমার, না হয় সুধীরের জেলে যাওয়া।

কালাচাঁদ। না—না—শোন কর্তা। এতদিন তোমার লবণ খেয়েছি, এবার লবণের ধার শোধ দিয়ে যাবো। ব্রজেশ্বরকে খুন করবো, হরগোবিন্দ ঘোষের মাথা লাঠি মেরে ভাঙবো। এই দেখো লাঠি, এবার আমি কারো কথা শুনবো না, কেউ আমায় ফেরাতে পারবে না।

দীনবন্ধু। স্থির হও কালাচাঁদ! চলো ঘরে গিয়ে দেখি, না হয় বাড়ি-ঘর বিক্রী করে অন্যত্র চলে যাবো।

(সকলের প্রস্থান)

দশম দৃশ্য

স্থান—দীনবন্ধু রায়ের বাড়ি।

(দীনবন্ধু, প্রেমানন্দ, কালাচাঁদ, সুধীর, সুধীরের মৃতা স্ত্রী, মতি দত্ত, দারোগা, কনেস্টবল ও শিবদাস)

প্রেমানন্দ। কেমন হলো দীনবন্ধুবাবু, মা কি করুণাময়ী, না, পাষাণী, কোনটা বলতে চান?

দীনবন্ধু। মা করুণাময়ীই বটেন, তবে মায়া বশে মাঝে মাঝে সন্দেহ এসে পড়ে।

(কালাচাঁদের প্রবেশ)

কালাচাঁদ। কর্তা—কর্তা! বউমা যে একেবারে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন, এখন কথাবার্তা কিছুই বলছেন না!

দীনবন্ধু। সুধীর কোথায় ?

কালাচাঁদ। বড়বাবু সেখানে বসে ঔষধ খাওয়াচ্ছেন, আমায় কবিরাজ বাড়িতে যেতে বললেন।

দীনবন্ধু। যাও, শীগ গির কবিরাজ মহাশয়কে ডেকে নিয়ে এসো। মা আনন্দময়ী, একি করলে মা ?

(কালাচাঁদের প্রস্থান)

প্রেমানন্দ। কি ভাবছ দীনবন্ধুবাবু ?

দীনবন্ধু। পুত্রবধূর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিষয় ভাবছি।

প্রেমানন্দ। সাথে সাথে তোমার পুত্রটিও জেলে যাচ্ছে, তার ভাবনাও ভেবে রাখো।

শিবদাস। বলেন কি গুরুদেব ?

প্রেমানন্দ। কিছু নয় শিবদাস, মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হতে দাও।

(মৃতা পত্নীকে নিয়ে সুধীরের প্রবেশ)

দীনবন্ধু। এ কি ? সব শেষ ! রাখো সুধীর, এই ব্রহ্মচারীর পদতলে রাখ, আর তুলসী গঙ্গাজলের আবশ্যক করে না। শিবদাস, দাও, আমার বউমার কানে শিব নাম দাও !

শিবদাস। (কর্ণমূলে) শিব, শিব, শিব।

প্রেমানন্দ। সুধীর ! প্রাণে বড লেগেছে বুঝি ?

সুধীর। গুরুদেব ! এ যাতনা অসহ্য ! শিক্ষা, সাধনা সব ভেসে গেল, শোকানলে পুড়ে ছাই হলো। দেখুন, আমার বৃদ্ধ পিতা আজ ধন-সম্পদহীন পথের কাঙাল ; এই বৃদ্ধ বয়সে সেবা করতে একমাত্র পুত্রবধূ ছিল, এখন কে আমার বাবার সেবা করবে ? ক তাঁর মরণকালে মুখে এক গণ্ডূষ জল দেবে ? গুরুদেব। মা যদি করুণাময়ীই হবেন, তবে তাঁর ভক্তের এ দুর্গতি হয় কেন ? আজ আমি বলতে বাধ্য হলাম, মা নির্দয়া পাষাণী !

দীনবন্ধু। গুরুদেব ! পরিত্রাণ করো ! বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি, শোকের আগুন যে জ্বলে ওঠে ! ঐ দেখুন, আমার বউমার চাঁদমুখ, মৃত্যুও একে বিরূপ করতে পারে নি।

(মতি দত্ত, দারোগা ও কনেস্টবলের প্রবেশ)

মতি। এই যে সুধীর !

দারোগা। তুমি গুরুতর মোকদ্দমার আসামী সুধীর, আমি তোমায় গ্রেপ্তার করলুম, এই দেখো ওয়ারেণ্ট। কনেস্টবল, আসামী গ্রেপ্তার করো।

(পুলিশ সুধীরকে হ্যাণ্ডকাপ পরালো)

শিবদাস। মতি! তুমি না দীনবন্ধুবাবুর অন্নে প্রতিপালিত? তোমার চাকুরী না দীনবন্ধুবাবুর সুপারিশে? আজ বুঝি তার প্রতিদান দিতে এসেছ!

মতি। মুখ সামলে কথা বলো, জানো আমরা জমিদারের লোক?

শিবদাস। জানি বই-কি! তুমি পশু অপেক্ষাও অধম। কিন্তু আজ পশুকে জয়ী হতে দেবো না, সুধীরকে ধরে নিয়ে যেতে দেবো না। প্রিয়তমা পত্নীর শব পড়ে রয়েছে, তার সৎকার করা পর্যন্ত সময় দেবে না? রাক্ষসেও এমন পারে না, বো'ধ হয় বনের বাঘেও এমন সময় শিকার করতে সাহসী হয় না।

(কালাচাঁদের প্রবেশ)

কালাচাঁদ। একি! বউমা আমার নেই? সোনার প্রতিমা ধূলায় গড়াচ্ছে, আমি কেমন করে সহ্য করি! আমি যে বাড়ির চাকর, কিন্তু মা, আমায় আপন শ্বশুরেব মতন ভক্তি করতেন। বউমা, এই কালাচাঁদকে ভাত-জল কে দেবে মা? একি! সুধীরের হাত বাঁধা কেন? ও—পুলিশে ধরেছে বুঝি! এমন সময়েও কি পুলিশে ধরে? কর্তা, দেখছ কি? এ সবই সেই ব্রজেশ্বরের কর্ম, আর সহ্য করবো না, আগুন জ্বালাবো, চাই না কর্তা তোমার হুকুম। এই পুলিশের সামনেই বলছি, আমি ব্রজেশ্বরকে খুন করবো।

প্রেমানন্দ। স্থির হও কালাচাঁদ, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাই পূর্ণ হতে দাও। যাও কালাচাঁদ, সন্তান যেমন মায়ের সৎকার করে, তুমি আর শিবদাস দু'জনে এই মহাসতীব সৎকারের আয়োজন করো গে, আমরা আসছি।

(কালাচাঁদ ও শিবদাসের প্রস্থান।
দারোগার সুধীরকে নিয়ে প্রস্থান)

প্রেমানন্দ। দীনবন্ধু! চিন্তা কি? এসো, আমার সঙ্গে এসো।

(গীত)

অতীত যাইবে অতীতে মিলায়ে
সম্মুখে মহা ভবিষ্যৎ।

আলোক পুলকে জ্ঞানে পুণ্যে,
দীপ্ত যেন সে ত্রিদিববৎ ॥
শাসন যাঁহার অস্ত্রে নহে,
প্রেমই কেবল মাত্র,
আসিছেন হেন নব নরপতি,
যাঁহার শাসন আত্মদানে,
দেখাইবে মহা মুক্তিপথ ॥
চিন্তা হবে বর্ণময়ী, কল্পনা লভি প্রাণ,
সমান সূত্রে হইবে মিলিত,
কর্ম ভক্তি জ্ঞান ,
কামনা হবে মূর্তিমতী,
আশা হবে ফলবতী,
জীবন সাধনা হবে সুমহতী,
পূরিবে পূরিবে সে মনোরথ ,
রবে না এদিন, আসিবে সুদিন,
কর কর তাঁরে দণ্ডবৎ ॥

(উভয়ের প্রস্থান)

একাদশ দৃশ্য

স্থান - প্রেমানন্দের আশ্রমবাড়ি ।

(প্রেমানন্দ, শিবদাস, আনন্দময়ী ও দীনবন্ধু)

শিবদাস । গুরুদেব ! আনন্দময়ী এদিকে আসছেন ।

প্রেমানন্দ । আসবেনই তো, ইনি যে বিশ্বজননীর প্রতিকৃতি ।

(আনন্দময়ীর প্রবেশ)

আনন্দময়ী । গুরুদেব ! বড় মর্মাহত হয়ে এসেছি ।

প্রেমানন্দ । কোন সন্তানের অমঙ্গল সংবাদ বুঝি মায়ের কাছে পৌছেছে !

আনন্দময়ী । ব্রজেশ্বর নাকি দীনবন্ধুর উপরে অমানুষিক অত্যাচার করেছে ।

প্রেমানন্দ । হ্যাঁ মা, তা করেছে ।

আনন্দময়ী । তা এতক্ষণ আপনি আমায় জানান নি কেন ?

প্রেমানন্দ । কোন প্রয়োজন মনে করি নি ! তাই বলি নি ।

আনন্দময়ী। প্রয়োজন মনে করেন নি? পরম সাধু দীনবন্ধু, এমন নিগ্রহ, আমি কি এর কিছুই করতে পারতাম না?

প্রেমানন্দ। কি করতে পারতে, মা?

আনন্দময়ী। আমি টাকা দিয়ে তাঁর সমস্ত দেনা পরিশোধ করে দিতাম, উকীল-ব্যারিস্টার দিয়ে তাঁর ছেলে সুধীরকে খালাস করে আনতাম!

প্রেমানন্দ। সুধীর নিজে কখনো তার দুরবস্থার কথা তোমায় জানিয়েছে?

আনন্দময়ী। না, সে বোধ হয় লজ্জায় আমায় জানায় নি, আপনার জানানো উচিত ছিল। কি অন্যায় কাজ হয়েছে, পরম সাধু দীনবন্ধু, তাঁর এমন নিগ্রহ! আমি যে এদের কোনই উপকার করতে পারলাম না, আমার সেবাব্রত পালন কি করে হবে?

প্রেমানন্দ। সকলের উপকার করো বলে দীনবন্ধুরও করবে মনে করেছ, মা! দীনবন্ধু আমার অনেক উপরে। সংসারের সুখ-দুঃখ সে সমান করে নিয়েছে।

(দীনবন্ধুর প্রবেশ)

ঐ দেখো মা, বৃদ্ধ এইদিকেই আসছে, মুখের দিকে চেয়ে দেখো, আমার মনে হয়, কোন স্বর্গীয় আনন্দে ওঁর প্রাণ সর্বদা নৃত্য করছে।

দীনবন্ধু। রাণী-মা যে এখানে?

আনন্দময়ী। আমি আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।

দীনবন্ধু। সন্তানকে ডাকলেই তো কাছে আসতো!

আনন্দময়ী। আপনার উপরে ব্রজেশ্বর নাকি অমানুষিক অত্যাচার করেছে? মিথ্যা মোকদ্দমায় জাল দলিল তৈরী করে টাকার বলে আপনাকে হারিয়ে দিয়েছে?

দীনবন্ধু। হারা-জেতার কথা বলা যায় না' মা। তিনি হেরেছেন, কি আমি হেরেছি, তা আজ পর্যন্ত কিছুই স্থির করতে পারি নি।

আনন্দময়ী। মৃতা পত্নীর সৎকার করবার সময় না দিয়ে সেদিন আপনার পুত্র সুধীরকে জেলে দিয়েছে?

দীনবন্ধু। হাজতে দিয়েছে; মোকদ্দমার শেষ বিচার এখনো হয় নি।

আনন্দময়ী। এখন আপনার দিন চলে কিরূপে? কে-ই বা দু'টি রান্না করে দেয়? বহুকাল পূর্বে আপনার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে, পুত্রটি কারাগারে,

পুত্রবধূটি মারা গেল, এ বৃদ্ধ বয়সে আপনার সেবা-শুশ্রূষাই বা কে করে?

দীনবন্ধু। একজন আছে, সে আমার বড় বন্ধু, তার নাম কালাচাঁদ। বিশ্ব-জননী এখনো তাকে আমার কাছ-ছাড়া করেন নি।

প্রেমানন্দ। দেখলে মা, দীনবন্ধু কত বড় ভাগ্যবান! তুমি-আমি এঁর কি উপকার করতে পারি? আমার মনে হয়, ওঁর পদধূলি পেলে আমরা ধন্য হবো।

দীনবন্ধু। আপনারা যদি উপকার করতে চান, তবে সে লোকের সন্ধান আমি বলে দিতে পারি।

প্রেমানন্দ। বলুন! নর-সেবা আমরা আমাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা মনে করি।

দীনবন্ধু। সম্প্রতি রাজীব দত্ত কঠিন পীড়াগ্রস্ত, তার উপরে আবার টাকার শোকে পাগল হয়েছে।

প্রেমানন্দ। রাজীব দত্তের টাকার শোক হলো কেন? এতবড় সুদখোর যে, তার আবার টাকার শোক কেন?

দীনবন্ধু। লোকটা অর্থ খুব ভালবাসে, সামান্য অবস্থা হতে টাকার সুদ নিয়ে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেছে। তার লাখ টাকা ব্রজেশ্বর রায়কে ধার দেয়, সুদে-আসলে তা দেড় লাখ হয়েছে। রায়মশায়ের জমিদারী নাকি অন্য এক মহাজনের কাছে বাঁধা পড়েছে; উকীল বলেছে, রাজীবের টাকা আদায়ের আর পথ নেই। তার উপরে আবার ছেলেটা মাতাল হয়েছে, সে বাক্স ভেঙে হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছে। এদিকে রাজীব অতি বৃদ্ধ, তার উপরে আবার এই মনস্তাপ, লোকটা যেন তুষানলে জ্বলছে। তার মুখের দিকে চাইলে বুক ফেটে যায়,ভাল পথ্য খেতে পায় না, কারণ টাকার প্রয়োজন, ভাল একজন ডাক্তার ডেকে দেখায় না, টাকার প্রয়োজন। এদিকে রোগের যাতনা, রোগ বাতব্যাধি। যদি উপকার করতে হয়, তবে ঐ রাজীবের উপকার করুন, হতভাগার জ্বালার শান্তি করুন।

প্রেমানন্দ। চলো মা, আমরা রাজীব দত্তের বাড়িতে যাই। রাজীবের সেবা করতে হবে। রাজীব আর ব্রজেশ্বর এই দু'জনকে যদি আমরা পথে আনতে পারি, তবেই আমাদের সেবাব্রত সিদ্ধ হবে। দীনবন্ধু, তুমিও আমাদের সঙ্গে এসো। (সকলের প্রস্থান)

দ্বাদশ দৃশ্য

স্থান—রাজীব দত্তের বাড়ি।

(রাজীব, জ্ঞানদা, জগন্নাথ, প্রেমানন্দ ও দীনবন্ধু)

রাজীব। উঃ—ফেটে গেল রে, ফেটে গেল! একটু রায়মশাইর বাড়ি যাবো! ব্যাটা আমার সর্বনাশ করলে, লাখ টাকা, সুদে-আসলে দেড় লাখ হয়েছে, একেবারে ভরা ডুবালে রে—ভরা ডুবালে!

জ্ঞানদা। বলি একটা ডাক্তার ডাক, এমন করে রোগের যাতনা আর কতদিন সইবে?

রাজীব। ডাক্তার ডাক, টাকা কোথায়? ডাক্তার এলেই বলে, দু'টাকা ভিজিট দাও! ঐ তো সেদিন এক ব্যাটা এসে দু'টাকা নিয়ে গেল, কিন্তু রোগের কি হলো?

জ্ঞানদা। একটু রেড়ীর তেল মালিস্ করতে বলেছিল, তা আর তোমার জুটলো না!

রাজীব। হায় রে, রেড়ীর তেলে কাজ নেই, রেড়ীর পাতা বেটে ব্যাণ্ডেজ করে দাও, পাতা আর ফলে একই গুণ। আরে, জগা ব্যাটা গেল কোথায়? দু'টা-একটা টাকা নয়, হাজার টাকা! আরে, তার মরার খবরটা কি কেউ আমায় এনে দেবে?

জ্ঞানদা। একটি মাত্র ছেলে, সে মরবে, আর তুমি যক্ষের ধন নিয়ে বসে থাকবে? অমন কথা বলবে তো মুখে ঝেঁটা বিঁধিয়ে দেবো।

রাজীব। হ্যাঁরে, তুই কবে তোর পুতের মাথা খাবি রে?

জ্ঞানদা। তুমি আমার পুতের মাথা খাবে, আর আমি তোমার শ্রাদ্ধ করবো, পারবো না!

(প্রস্থান)

রাজীব। হায় রে, চলে গেলে নাকি? আমি যে আর চলতে পারছি না, আমায় ধরে নে—ধরে নে।

(জগার প্রবেশ)

(গীত)

তনয়ে তার তারিণী,

ও মা শ্যামা—

ত্রিবিধ তাপেতে তারা
হয়েছি মা দিশেহারা,
বার বার অনিবার
কাঁদাও না মা আমার,
অধম সন্তানে দুঃখ
দিও না কো জননী।

জগন্নাথ। এ-কে—বা-বা, পথে প—ড়ে কেন? মা-তা-ল হ-য়ে-ছ বুঝি? খা-বে এ-ক-টু?

রাজীব। তফাৎ যা, পাজী! (মদের বোতল দেখানো)

জগন্নাথ। তফাৎ যাবো? তোমার মুণ্ডপাত না করে তফাৎ যাবো? ব্যাটা রক্তচোষা, এক পয়সার চিংড়ি মাছ কিনে খেতে দাও নি, এখন তার সুদ তুলে নেবো।

রাজীব। জগা, দেখিস নে আমার ব্যামো, ডাক্তার দেখবার পয়সা পর্যন্ত নেই! টাকাগুলি নিয়ে কি করলি? দু'টা-একটা টাকা নয়, হাজার টাকা! না হয় দু'টা একটা টাকা রেখে বাকী টাকা আমায় ফিরিয়ে দে!

জগন্নাথ। তাই দেবো বই-কি! বা-বা, ব্রজেশ্বর রায়ের ছেলে থিয়েটার করবে, আমি তার Stage Manager হয়েছি, পাঁচশো টাকা চাঁদা দিতে হবে; ভাল মানুষ হও তো পাঁচশো টাকা গুণে দাও।

রাজীব। ও, আবার থিয়েটার করা হবে? তফাৎ যা পাজী!

জগন্নাথ। তফাৎ যাবো, তোমার মুণ্ডপাত না করেই তফাৎ যাবো? বা-বা, এতকাল টাকাই করেছ, কিন্তু কি করে টাকা ব্যয় করতে হয়, তা তো শেখ নি! আমার হাতে চাবির তোড়াটি দিয়ে যদি দু'টো দিন বেঁচে যেতে পারো, তবে দেখে নিও লোকে টাকা দিয়ে কি করে? দাও বা-বা, দাও! (চাবি কেড়ে নেওয়া)

রাজীব। ওরে জগা, তুই আমার তেজ্যপুত্র।

জগন্নাথ। তুমি আমার তেজ্যবাপ! (প্রস্থান)

রাজীব। ও গিন্নি, ও পুত্র-শোকী, কবে তোর পুতের মাথা খাবি রে—(ক্রন্দন)

(জ্ঞানদার প্রবেশ)

জ্ঞানদা। তুমি আমার পুতের মাথা খাবে, আর আমি তোমার সেবা করবো? এই আমরা চললুম, তুমি এখানে ঘরে পচে থাকো, তার পরে টেনে ফেলে দেবো। (প্রস্থান)

(দীনবন্ধু ও প্রেমানন্দের প্রবেশ)

দীনবন্ধু। ঐ দেখুন ঠাকুর, বেচারার দুর্দশা! মা শান্তিদায়িনী, ওকে শান্তি দাও!

প্রেমানন্দ। সুদখোরের এই অবস্থাই হয়। ওহে দত্তমশায়, তোমার এ দুর্দশা কেন?

রাজীব। ও কে ব্রহ্মচারী! দীনবন্ধুবাবু? দেখো, আমার দশা দেখো, মাথায় লাথি মারো।—ওঃ! কত পাপ করেছি, তারই এই পরিণাম!

প্রেমানন্দ। এখন মাকে ডাকো, প্রাণের সব জ্বালা জুড়িয়ে যাবে।

রাজীব। ডাকতে পারি না, লজ্জা করে! ওই যে মা শ্মশানকালী, খাঁড়া-হাতে নাচতে নাচতে আমায় ধেয়ে আসছে! ঐ যে হাজার হাজার ডাকিনী আমায় তেড়ে আসছে, কে আমায় রক্ষা করবে?

প্রেমানন্দ। আমি তোমায় রক্ষা করবো। (হস্তধারণ)

রাজীব। আ-হা-হা! কি শীতল তোমার হাত, আমার অর্ধেক জ্বালা জুড়িয়ে গেছে! ব্রহ্মচারী, তুমি দেবতা, আমায় বাঁচাও!

প্রেমানন্দ। বাঁচাবো। স্ত্রী-পুত্র সব ভুলে যাও, সংসার ভুলে যাও, সব ভুলে মায়ের চরণে শরণ লও, প্রাণের সব জ্বালা জুড়িয়ে যাবে। চিন্তা কি?

(গীত)

শ্যামা নামের ডঙ্কা বাজা রে।
বাজা রে বাজা রে বাজা,
এ দেহে ভাই তুই রাজা,
দু'জন কুজন প্রজা,
রেখে কারাগারে॥
শঙ্কা কি রে ডঙ্কা দিতে,
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ যাতে,
যে নামেতে বিশ্বনাথে,
বিষ পান করে;
নামের জোরে মৃত্যুঞ্জয়,
মৃত্যুকে করেছেন জয়,
অভয় পদে কি আর ভয়,
ভয় করে ভাই কারো॥

প্রেমানন্দ। দীনবন্ধু! তুমি একে নিয়ে আমার আশ্রমে এসো।

(সকলের প্রস্থান)

ত্রয়োদশ দৃশ্য

স্থান—ব্রজেশ্বরের বৈঠকখানা।

(ব্রজেশ্বর, হরগোবিন্দ, ধীরেশ্বর ও প্রেমানন্দ)

ব্রজেশ্বর। হরগোবিন্দ দাদা, এ হলো কি? একটা মেয়ের সঙ্গে মোকদ্দমায় হেরে গেলাম? High Court পর্যন্ত ঠিক এক রকমই বললে!

হরগোবিন্দ। শুধু মেয়ে বলছ কেন, মেয়ের পেছনে মিন্‌সেটা কি জবর, তা দেখছ না? ঐ যে প্রেমানন্দ ঠাকুর, ও নিশ্চয়ই কোন জাদু জানে, দেখলে না সাক্ষীগুলি কেমন বশীভূত করে ফেললে!

ব্রজেশ্বর। ওকে খুন করো। আমার প্রতিজ্ঞা আগে প্রেমানন্দের মুণ্ড চাই। তার পর না হয় Privi Council-এ appeal ক'রো।

হরগোবিন্দ। সে তো হচ্ছে পরের কথা। এদিকে কাল লাটের দিন, লাটের টাকার তো কোন যোগাড় দেখছি না!

ব্রজেশ্বর। সে কি। লাটের টাকা নেই? তবে তোমার নিজের থেকেই এবার দশ হাজার টাকা দাও, এবারকার লাট রক্ষা করে দাও!

হরগোবিন্দ। আমার কাছে কোন টাকা নেই, তুমি অন্যত্র চেষ্টা করো।

ব্রজেশ্বর। হরগোবিন্দ দাদা, তোমার বিস্তর টাকা আছে। সেদিন তুমি দশ হাজার টাকা মুনাফার জমিদারী কিনেছ, আজ আমার সম্পত্তি যায়, তুমি রক্ষা দাও!

হরগোবিন্দ। আমার কাছে কোন টাকা নেই, তুমি অন্যত্র চেষ্টা করো।

ব্রজেশ্বর। কি বললে হরগোবিন্দ! আমার টাকা নিয়েই আজ তুমি বড় মানুষ। ভেবে দেখো, আজ বিশ বছরের ভিতর আমি তোমার কাছে হিসেব-নিকেশটি পর্যন্ত চাই নি; আজ আমার সম্পত্তি যায়, তুমি রক্ষা করবে না? তুমি এমনই নিমকহারাম?

হরগোবিন্দ। কি বলছ হে তুমি? তোমার সম্পত্তি যায়, তা আমি কি করবো? অত কথা কেন? এই তোমার চাকুরী ইস্তাফা দিয়ে চললাম।

ব্রজেশ্বর। তা যাবে বৈকি! এখন তো যাবারই সময় হয়েছে।

(ধীরেশ্বরের প্রবেশ)

ধীরেশ্বর। বাবা, আজ দু'দিন দৈনিক খরচের টাকা পাচ্ছি না। খাজাঞ্চি-খানায় গেলেও বলে টাকা নেই, ব্যাপার কি ?

ব্রজেশ্বর। ব্যাপার আর কি ? এই তো সবে শুরু হলো, জমিদারী এখন লাটবন্দী।

ধীরেশ্বর। সে আমি জানি না, আমায় টাকা দিতেই হবে। কলকাতায় দু'মাসের বাড়িভাড়া বাকী পড়েছে, আমার মোটরখানাও মেরামত করতে হবে। টাকার বড় দরকার।

ব্রজেশ্বর। আর মোটরে চড়তে হবে না বাবা, এখন গাছে চড়বাব সময হয়েছে।

ধীরেশ্বর। কি বললে, টাকা পাব না ? আচ্ছা, ঘরে গিযে দেখি, যেখানে যত সোনা-রূপা পাবো, সবই নিয়ে যাবো। যৌতুক দেবে আর কি ! দেখে নিও টাকা পাই কি না ?

(প্রস্থান)

ব্রজেশ্বর। বা—এই তো আমার বড়মানুষি, খুব বড়মানুষি করেছি কিন্তু ! যাও হরগোবিন্দ, তুমিও যাও, ছেলে হয়ত এতক্ষণ বাক্স ভেঙে অলঙ্কারাদি নিয়ে পালিয়েছে। তারপর যা কিছু থাকে, তা নিয়ে তুমিও পালাও। আমিও পালাবো, আমি কিছুই নিয়ে যাবো না, রিক্তহস্তেই পালাবো ; ওহো-হো, এই তো পরিণাম !

(গমনোদ্যত)

(প্রেমানন্দের প্রবেশ)

প্রেমানন্দ। কোথায় যাচ্ছ ব্রজেশ্বর ? অনেকদিন বলেছি বাবা—

(গীত)

এসেছ নেংটা যাইবে নেংটা,
মাঝখানে কেন গণ্ডগোল ?
কেউ বলে বাবা, কেউ বলে দাদা,
কেউ বলে ভাই, আবোল-তাবোল
জননী জঠরে দশ মাস ছিলি,
ভূমিষ্ঠ হইয়ে মা-ডাক শিখিলি,

করি স্তন পান জীবন বাঁচালি,
এখন ভুলে গেলি সে মা বোল ॥
মণি-মুক্তা আদি ধন অগণিত,
বোকা তুমি তাই যতন করো এত,
মিছে ধন আশায় হয়ে বিচলিত,
টাকা টাকা টাকা করিছ রোল ॥
ভাই-বন্ধু আদি পরিজন যত,
শেষের সাথী এরা কেউ নয় রে তো,
কালী কালী কালী বল্ অবিরত,
যদি অন্তে পেতে চাস্ মায়েরি কোল ॥

ব্রজেশ্বর। কে?—ঠাকুর! তুমি আবার এসেছ? আমি তোমায় কেটে টুকবো টুকরো করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবো।

প্রেমানন্দ। সে ভয় দেখাচ্ছ কেন বাবা?

(গীত)

এই মাটিই খাঁটি ভবে।
মাটিব দেহের পরিপাটি,
মাটিতেই লয় হবে ॥
দু'দিনের জন্যে আসা,
দু'দিনেরই ভালবাসা,
দু'দিনেই ভাঙে বাসা,
স্থায়ী হয় কে কবে;
কাল-সাগরে উঠেছে তুফান,
আর কতদিন রবে,
(এখনো) ভুলে যা রে দলাদলি,
গলাগলি হযে সবে ॥
সকলি এক মায়ের ছেলে,
আছি এক মায়ের কোলে,
ভাবো একটু, গোলকধাঁধার,
ধাঁধা ঘুচে যাবে;

ধনী দীন রাজা-প্রজা,
এই মাটির কোলেই শোবে ;
নেংটা আসা, নেংটা যাওয়া,
ভবের খেলা সাঙ্গ হবে।

ব্রজেশ্বর। না, কিছুতেই ক্ষমা করা হবে না। কে আছিস্, এই বিটকেল বামুনটার মাথাটা কেটে রাখ্ তো !

প্রেমানন্দ। আর কেন ? এখন একটু সুপথে ফেরবার চেষ্টা করো !

ব্রজেশ্বর। কি বললে, সুপথে ফিরবো ? এত পথ হেঁটে এসে আবার ফিরে যাবো ? না—না—এত পথ ফিরে যেতে আমার জীবনে কুলোবে কেন ? যে পথে চলেছি, তার শেষ না দেখে ফিরবো না। কে ফেরাবে আমায় ? হরগোবিন্দ আমায় ছেড়েছে, আমার ছেলে আমায় ছেড়েছে, আমি কিছুতেই ফিরবো না।

হরগোবিন্দ। মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে।

প্রেমানন্দ। কে ? দেওয়ানমহাশয় ? এখন আর বাগানবাড়ি যান না বাবু ? মদের বোতল এখন আর আসে না বুঝি ? লোকটার সর্বনাশ করে এখন সাধু সাজতে বসেছিস্ ব্যাটা ? আমাদের দেশের সকল রাজা-জমিদারের পেছনে এমন দু'চারটা কুত্তা লেগেই আছে। কে আছিস্ রে, ব্যাটাকে বেঁধে রাখ্—লাটের টাকা আদায় কর্।

(শিবদাস এসে হরগোবিন্দকে নিয়ে প্রস্থান করে)

ব্রজেশ্বর। হ্যাঁ—আমার মাথাই খারাপ হয়েছে হরগোবিন্দ, তবে ঔষধ করো। অন্য ঔষধে কিছুই হবে না, খুব উত্তেজিত সুরা নিয়ে এসো। সুরার মোহে ডুবে আমি থাকি। সুরার স্রোতে আমার পূর্ব-জীবনের জ্বালাময়ী স্মৃতি ডুবিয়ে দাও। দাও, মদ দাও ! কি—টাকা নেই ? একদিনের জন্য তুমি দু'বোতল মদের টাকা দিতে পারবে না ? আমাদের তো অনেক খেয়েছ, আমি যে মদের গাং বইয়ে দিয়েছিলাম, তার মাঝে তোমরা কত হাবুডুবু খেয়েছ ! দাও, মদ দাও, প্রাণ যায়, কে আমায় বাঁচাবে ?

প্রেমানন্দ। আমি তোমার বন্ধু, আমি তোমায় বাঁচাবো।

ব্রজেশ্বর। কে তুমি ? তুমি বন্ধু ? না—তুমি শত্রু। আমি তোমার অনুগ্রহ

চাই না। আমি কি চাই তা জানো? আমি চাই মদ, তুমি আমায় মদ দিতে পারবে?

প্রেমানন্দ। মদে যদি তোমার কল্যাণ হয়, তবে আমি তোমায় মদই দেবো। এতদিন তুমি এক মদের নেশায় ডুবে ছিলে, আজ আমি তোমায় আর এক মদ দেবো। সে উগ্র নয়, উত্তেজক নয়, বড় শীতল। সে মদ কি তা জানো? সে মদ পতিত-পাবনী মায়ের নাম। এ মদ যদি একবার কণ্ঠস্থ করতে পারো ব্রজেশ্বর, তবে এ জীবনে তার নেশা ছুটবে না।

(গীত)

(ডাকো) দীনে দয়া কর দেখি গো,
দীন-দয়াময়ী শ্যামা মা।
সবাই বলে দীন-তারিণী,
দেখি সে নামের মহিমা॥
জাগো কুল-কুণ্ডলিনী,
অজ্ঞানে জ্ঞানদায়িনী;
মোহ-আঁধাব যাক্ মা কেটে,
জুড়াই আঁখি রূপ দেখে মা॥
হৃদি-পদ্ম উঠলে ফুটে,
মাযার বাঁধন যাবে টুটে,
আনন্দে আনন্দময়ীর,
প্রেম-সাগরে ডুব দেবো মা॥
নাম-রসে যাই মা মজে,
নামের ভেরী উঠুক বেজে,
মুকুন্দের সাধ মিটে যাক্,
নেচে-গেয়ে যাই চলে মা॥

ব্রজেশ্বর। কি বলছ প্রেমানন্দ? তুমি আমায় ধর্মের কথা শোনাচ্ছ? কাকে মা ডাকতে বলছ? কে মা?—মা কালী? উঃ, কি ভীষণা কালী, কালো রুদ্রাবেশা, আলুলায়িতকেশা, লোলরসনা, রক্তদশনা, লুণ্ঠিতবসনা, নৃমুণ্ডমালিনী, ভীমা ভয়ঙ্করী শ্যামা! উঃ! কি ভীষণা তীব্র মূর্তি, কি নির্দয় দেবতা! প্রেমানন্দ!

কি দেখালে? কি জাদুমন্ত্র দিলে? ঐ—ঐ—কালী করালী অট্টহাস্তে নাচতে নাচতে আমায় গ্রাস করতে আসছে!—সন্ন্যাসী, তান্ত্রিক! আমায় বাঁচাও, রক্ষা করো!

প্রেমানন্দ। আনন্দম্! এসো, আমার সঙ্গে এসো, মায়ের আনন্দময়ী মূর্তি দেখতে পাবে। (উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্দশ দৃশ্য

স্থান—দীনবন্ধু রায়ের বাড়ি।

(দীনবন্ধু, রাজীব দত্ত, প্রেমানন্দ, ব্রজেশ্বর, তারামণি মতি দত্ত, রাইমণি ও আনন্দময়ী)

রাজীব। দীনবন্ধুবাবু, এঁরা কি মানুষ?

দীনবন্ধু। তোমার কি বিশ্বাস?

রাজীব। এঁরা দেবতা। দারুণ বাতব্যাধি, পথে পড়ে ছিলাম, ব্রহ্মচারী আমার গায়ে হাত দিযে আমার অর্ধেক জ্বালা কমিয়ে দিলেন। তার পরে সেবা যা করেছেন, তা আপন মা'ও করতে পারেন না। এখানে এসে প্রাণে একটা নূতন ভাব জেগে উঠেছে। তোমায় বলেই ফেলি, টাকা করেছিলাম বিস্তর, কিন্তু সে টাকায় নিজেরও কিছু করি নি, পরেরও কিছু করি নি, বরং পরের অনিষ্টই করেছি। শিশু-ছেলে-কোলে অনাথা জননী রাস্তায় দাঁড়িয়ে, আমি তার কুঁড়েখানা পর্যন্ত ভেঙে ফেলে দিয়েছি; তারপর তোমার যা করেছি, তা তো তুমিই জানো!

দীনবন্ধু। এখন তো সম্পূর্ণ আরাম হয়েছে, বিষয়-কর্ম দেখো না কেন?

রাজীব। না, রায়মশায়, আর বিষয়-কর্ম দেখবো না, কার জন্মই বা বিষয়-ভাবনা করবো?

দীনবন্ধু। এখন কি টাকা-পয়সা কিছুই নেই?

রাজীব। থাকবে না কেন? এখনো লাখ টাকার উপরে আমার সঞ্চিত আছে। তবে সে টাকা কেউ পাবে না, জগা-মাতাল পেলে এতদিনে উড়িয়ে দিত। আরো অনেক খাতকের কাছে আমার বিস্তর টাকা পাওনা আছে।

দীনবন্ধু। সে টাকা আদায়ের চেষ্টা করো না কেন ?

রাজীব। না রায়মশায়, আর টাকা আদায় করবো না। তোমায় একটা কথা বলবো ! কথাটা রাখবে কি ?

দীনবন্ধু। বলো !

রাজীব। কত টাকা হলে তোমার সম্পত্তি উদ্ধার হয়, তুমি নাও, আমি দিচ্ছি। তোমার সর্বনাশ করেছি, তার পূরণ করে দিচ্ছি।

দীনবন্ধু। না ভাই, আমার কোন টাকা-পয়সার প্রয়োজন নেই।

রাজীব। বলো কি ? তোমার ঘর-বাড়ি সব গেছে, এখন তুমি পথে দাঁড়িয়ে, তোমার টাকার প্রয়োজন নেই ? তবে, তুমি এ পাপীর ধন নেবে না ? আমার পবিত্রাণ কিসে হবে রায়মশায় ?

দীনবন্ধু। তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে, তায় আবার অর্থের প্রতি অনাসক্তি জন্মেছে, তখন পরমার্থের প্রতি আসক্তি আসবেই আসবে। তাতে আবার সজ্জন-সঙ্গতি, সদ্‌গুরুও মিলেছে।

(ব্রজেশ্বর, প্রেমানন্দ ও তারামণির প্রবেশ)

তারা। এ কে। ব্রজেশ্বর ? এভাবে এখানে কেন ? সে দম্ভ অহঙ্কার, রূপ, যৌবন সব গিয়েছে তো ? নরাধম, দেখ্, পাপের শাস্তি আছে কি না ? সতীর অভিশাপ সফল হয় কি না ? এই দেখ্ ছুরি, এই ছুরি তোর বুকে বসাবো বলে এতদিন বুকে করে রেখেছিলাম, কিন্তু আর প্রয়োজন নেই। পাপের সহস্র ছুরি তোর বুকে বিঁধেছে, তা দেখছি আর হাসছি—হাঃ—হাঃ—হাঃ।

ব্রজেশ্বর। একি। আমায় কোথায় আনলে ? শত্রু-পুরী ! দীনবন্ধু, রাজীব দত্ত আর তারা। এই দীনবন্ধু আমার মাথায় লাঠি তুলেছিল, অপমানের প্রতিশোধ নেবে। আর তারা, ভীমা ভয়ঙ্করী রুদ্র-রূপিণী তারা, এরা আমায় অপমান করবে ? আমি জমিদার, বড় মানুষ, অপমানী হবো কেন ? জমিদারী, ধন-দৌলত সব যাক্, কিন্তু মান যেতে দেবো না—পালাই। (গমনোদ্যত)

তারা। কোথায় পালাবি নারকী ? তোর সেই একদিন, আর আজ একদিন। অনাথিনী অবলা পেয়ে আমার ইজ্জতের উপরে আক্রমণ করেছিলি। এখন দেখ্ দেখি, মূর্খ, যে নেশায় মজেছিলি সে নেশা কতক্ষণ ?

প্রেমানন্দ। চলে যাও তারা—চলে যাও। (তারার প্রস্থান)

ব্রজেশ্বর। তারা! সতী, আমায় বাঁচাও, বুকে ছুরি বসিও না! ওঃ—আমার কেউ নেই—মা— (পতন ও মূর্ছা)

(আনন্দময়ীর প্রবেশ ও ব্রজেশ্বরকে কোলে নিয়ে)

আনন্দময়ী। একি ব্রজেশ্বর? কেন এত কাতর হচ্ছ? আবার তোমার সব হবে!

ব্রজেশ্বর। এ কে! মা? নৈলে কার এমন শীতল স্পর্শ, কার কণ্ঠে এমন স্নেহময় মধুর বাণী? মা, তোর হতভাগ্য সন্তানের সকল অপরাধ ভুলে গেলি মা?

আনন্দময়ী। মা বই-কি বাবা, আমি তোমার মা—তুমি আমাব সন্তান। মা কি সন্তানের অপরাধ নিতে পারে, বাবা?

প্রেমানন্দ। ব্রজেশ্বর! তোমার লাটের টাকা কাল আমরা দিয়ে দিয়েছি। তোমার জমিদারী আবার তুমি বুঝে নাও। আমাদের জমিদারীর কোন প্রয়োজন নেই, চরিত্রটি সংশোধন করো, এই প্রার্থনা তোমার কাছে।

(মতি দত্তের প্রবেশ)

প্রেমানন্দ। কে তুমি?

মতি। আমি দুর্মতি মতি।

প্রেমানন্দ। কে? মতিবাবু? তোমার এ দুর্দশা কেন?

মতি। আমার মা কোথায় বলতে পারেন?

প্রেমানন্দ। তোমার মাকে প্রয়োজন কেন?

মতি। এখন আমার কেউ নেই, তাই আমার মাকে প্রযোজন!

প্রেমানন্দ। কেন? তোমার প্রিয়তমা পত্নী?

মতি। যে মাকে ফেলে পত্নীর সেবা করে, তার কি পত্নী হতে সুখ হয়?

প্রেমানন্দ। চাকুরীতে দিন দিন উন্নতি হচ্ছিল?

মতি। আমার মত নরাধমের লাট-সাহেবি পেলেও তাতে সুখ হতে পারে না। শোন, আমার সেই চাকুরী গিয়েছে, মান-ইজ্জত, সর্বস্ব দিয়ে যে উপরওয়ালার মন জুগিয়েছিলাম, একদিনের একটু অপরাধে সে আমায় ক্ষমা করলে না। ঘুষ-খাওয়া অপরাধে সে আমায় ফৌজদারীতে সোপর্দ করলে, তাতে আমার বিস্তর টাকার প্রয়োজন হলো। এতকাল যা করেছিলাম, তাতে নিজের কিছুই করি নি, কেবল স্ত্রীর কতকগুলি অলঙ্কার করেছিলাম। টাকার

প্রয়োজন হওয়ায় তার কতক অলঙ্কার মহাজন-বাড়িতে বাঁধা দিয়ে কিছু টাকা আনবার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু স্ত্রী তার বাক্সের চাবি বন্ধ করে বসলে! বললে, তুমিও যাবে, আমার সোনা-রূপাটুকুও যাবে। উকীল-মোক্তার বলেছে, এ মোকদ্দমায় তোমার কিছুতেই অব্যাহতি নেই। তখনই আমার চোখ ফুটলো। তখন বুঝলাম, মা আর পত্নীতে কত তফাৎ। আর মোকদ্দমা করতে প্রবৃত্তি হলো না। বিচার-কর্তার কাছে সব অপরাধ স্বীকার করলাম, ক্ষমাও চাইলাম না, তথাপি তিনি আমায় ক্ষমা করলেন। দণ্ড হতে মুক্ত হলাম বটে, কিন্তু এখন দাঁড়াই কোথায়? বলতে পারেন, আমার মা কোথায়? যদি মায়ের কোল পাই, তবে বুঝি এ জ্বালা জুড়াতে পারবো।

প্রেমানন্দ। আনন্দময়ীর রাজ্যে এখন আর নিরানন্দ নেই।—শিবদাস! ওর মা-বোনকে ডেকে দে তো।

(রাইমণি আর তারার প্রবেশ)

প্রেমানন্দ। ঐ যে মতি, তোমার মা-বোন এসেছেন।

মতি। মা—মা—আমায় ক্ষমা করো মা!

রাইমণি। এ কি, মতি—কখন এলি বাবা?

তারা। দাদা—দাদা—তোমার এ অবস্থা কেন?

(গীত)

প্রেমানন্দ। এমন দিন কি আসবে মোদের
আমরা আবার মানুষ হবো।
ভুলে যাবো দলাদলি,
প্রাণে প্রাণে মিলিয়ে দেবো॥
ছোট-বড় যাবো ভুলে,
প্রাণের কপাট দেবো খুলে;
"বাবু" এই দুটি আখর,
নামের পেছন থেকে উঠিয়ে দেবো॥
মেয়েলী ঢং দেবো ছেড়ে,
ফেশন দেবো ঝেঁটিয়ে দূরে;

গোঁফ রেখে চুল সমান কেটে,
বীরের মত কাজ করিব ॥
ঘুচে যাবে তম-রাশি,
মায়ের মুখে দেখবো হাসি ;
আমরা আবার সকল ভুলে,
মায়ের লাগি পাগল হবো ॥

প্রেমানন্দ ব্রজেশ্বর। যাও, তোমার জমিদারী আবার বুঝে নাও গে যাও। মতি, তুমিও তোমার মাকে নিয়ে ঘরে যাও। দীনবন্ধু, তুমিও যাও, মায়ের দুর্গোৎসবের যোগাড় করো গে, আমি আশীর্বাদ করছি, মা তোমার পূজা গ্রহণ করবেন। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চদশ দৃশ্য

স্থান— দীনবন্ধু রায়ের দুর্গা-মণ্ডপ।

(দীনবন্ধু, কালাচাঁদ, ছদ্মবেশী মা, ব্রজেশ্বর, সুবীর ও ভাস্কর)

দীনবন্ধু। এত সহ্য করেছি, কিন্তু আজ যে আর সহ্য হচ্ছে না। বুক ফেটে কান্না আসছে, ভিতরে আনন্দময়ী মূর্তি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু বাইরে আজ নিরানন্দ। আনন্দের দিন আজ, তাই আনন্দের পূর্ব-স্মৃতি জেগে উঠছে। এই মণ্ডপে দশভুজা মা আমার আনন্দময়ী মূর্তিতে আবির্ভূতা হতেন। সে কি আনন্দ, চতুর্দিক আনন্দ-রোলে ভেসে যেত! শত শত ভক্ত আনন্দে মগ্ন হয়ে মণ্ডপ-সম্মুখে এসে দাঁড়াত। নব নব বেশে সজ্জিত হয়ে পল্লীর নর-নারী কি আনন্দ-লীলায়ই বিভোর হয়ে পড়ত! মা, কি আনন্দময়ী তোমার সে মূর্তি! মৃগেন্দ্র-বাহিনী, অসুর-মর্দিনী, বামে লক্ষ্মী, দক্ষিণে বাণী, সিদ্ধিদাতা গণেশ, আনন্দময় বীর মূর্তি কার্তিক পুত্র-রূপে বিরাজিত। আহা হা, সে কি আনন্দ-যাত্রা, মা দশ হস্ত প্রসারিত করে ভক্তগণকে প্রসাদ বিতরণ করতেন! সেই শরৎকাল আবার উপস্থিত। ঐ তো দূরে সকলের বাড়িতে শাঁখ-ঘণ্টা বেজে উঠেছে! কিন্তু এ মণ্ডপে আর বাজবে না, সে আনন্দ আর ফিরে আসবে না।

(কালাচাঁদের প্রবেশ)

কালাচাঁদ। কর্তা, কর্তা, সারা দিনটা বয়ে গেল, এখনো কিছু খেলে না?

দীনবন্ধু। কি খাবো কালাচাঁদ, কিছুই তো নেই!

কালাচাঁদ। আধসের চাল আর দু'টো কাঁচা কলা ভিক্ষা করে পেয়েছি।

দীনবন্ধু। কালাচাঁদ! আবার ভিক্ষা করতে গিয়েছিলে? তুমি আমায় রেহাই দেবে না? সবাই তো আমায় রেহাই দিয়েছে, তবে আর কেন কালাচাঁদ? আমায় ছেড়ে চলে যাও!

কালাচাঁদ। কেন যাবো? আমি তো তোমার ভার-বোঝা নই!

দীনবন্ধু। তুমিই আমার ভার। স্নেহের ভার আর আমি বইতে পারি না। আমায় ভার-মুক্ত করো, আপন পথে চলে যাও, আমার পথ আর রোধ ক'রো না!

কালাচাঁদ। নিশ্চয়ই করবো, যে পথে যাও কালাচাঁদকে সাথী করতেই হবে। এই বুড়ো বয়স পর্যন্ত সাথে নিয়েছ, এখন আর তাড়িও না বাবা। চলো, কিছু খাই গে।

দীনবন্ধু। না কালাচাঁদ, ভিক্ষার অন্ন আর খাবো না। যার মা অন্নপূর্ণা, সে কেন ভিক্ষা করে খাবে?

কাল'চাঁদ। তুমি খাও না খাও, আমি তো খাবো। আমায় প্রসাদ দেবে না?

দীনবন্ধু। যাও কালাচাঁদ, রান্নার যোগাড় করে গে, আমি পরে আসছি। আমায় একটু নীরবে থাকতে দাও। (কালাচাঁদের প্রস্থান)

(ছদ্মবেশী মায়ের প্রবেশ)

মা। বসে বসে কি ভাবছ বাবা?

দীনবন্ধু। আমার ভাবনার অভাব কি মা?

মা। আজ অধিবাসের দিন, পূজার যোগাড় কই, প্রতিমা কই? এবার পূজা হবে না?

দীনবন্ধু। না, আর এ বাড়িতে প্রতিমা আসবে না?

মা। বলো কি? তবে পূজা দেখবো কোথায়, প্রসাদ পাবো কোথায়?

দীনবন্ধু। কি বলছো তুমি বালিকা? যার ক্ষুধার অন্ন ভিক্ষার চাল, সে কি কখনো দুর্গোৎসব করতে পারে?

মা। ভক্ত মায়ের পূজা করবে, তাতে আবার ধন-দৌলতের আবশ্যক কি?

দীনবন্ধু। কি বলছ বালিকা! কে তুমি?

মা। বাগান-ভরা ফুল, বুক-ভরা ভক্তি, পূজায় আর লাগে কি বাবা?

দীনবন্ধু। কে তুমি—কে তুমি?

মা। আমি যে-ই হই, তুমি পূজা করবে। (প্রস্থান)

দীনবন্ধু। কে এ বালিকা?—কই সে? কোথায় গেল? এত ফুলের গন্ধ কোথা হতে আসছে? সহসা প্রাণে এত আনন্দ এল কেন? আমার আনন্দময়ী মা কি এলেন?

(ভাস্করের প্রবেশ—দশভুজা মূর্তি নিয়ে)

ভাস্কর। রায়মশায়, এ আপনার কেমন রীতি! প্রতিমা গড়াবার বায়না দিয়ে আজ অধিবাসের দিন, প্রতিমা আনেন নি কেন?

দীনবন্ধু। কে তোমায় বায়না দিয়েছে?

ভাস্কর। কেন? আপনার মেয়ে?

দীনবন্ধু। আমার মেয়ে! একটা মেয়ের কথায় তুমি বায়না স্বীকার করলে?

ভাস্কর। স্বীকার করবো না? নগদ পাঁচ টাকা দিয়েছে, বায়না স্বীকার করবো না?

দীনবন্ধু! তাই তো, ভাস্কর! রাখো রাখো, মায়ের প্রতিমা মণ্ডপে তুলে রাখো, আমি মায়ের পূজা করবো।

(ভাস্করের প্রতিমা রেখে প্রস্থান)

দীনবন্ধু। মা—মা—কে কার পূজা করে! আপনার পূজা আপনি করতে এলি! সে বালিকা আর কেউ নয়, স্বয়ং তুমি! এত দয়া, তবে আর মাটির প্রতিমা কেন মা?

(সুধীরকে নিয়ে ব্রজেশ্বরের প্রবেশ)

ব্রজেশ্বর। দীনবন্ধুবাবু আপনি নরদেবতা, আপনি আমায় ক্ষমা করুন!

দীনবন্ধু। একি, রায়মশায়, আপনি এ অবস্থায় এখানে কেন?

ব্রজেশ্বর। হে মহাপুরুষ! আপনি একবার বলুন যে, আমায় ক্ষমা করলেন! তা হলেই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

সুধীর। বাবা, ব্রজেশ্বরবাবু নিজেই আমাকে কারা-মুক্ত করে এনেছেন। এখন দেখুন, তিনি অনুতাপানলে দগ্ধ হচ্ছেন।

দীনবন্ধু। ব্রজেশ্বরবাবু, আপনি নিশ্চিন্ত হউন, আমি আপনার যে-প্রজা সেই প্রজাই আছি, ঐ দেখুন, মা এসেছেন। আসুন আমরা মায়ের সম্মুখে আনন্দ করি! মা, কে কার পূজা করে? আপনার পূজা আপনি করতে এলি মা? এত দয়া! সে বালিকা আর কেউ নয়—তুমি! তবে আর মাটির প্রতিমা কেন মা? সেই

বালিকা-বেশেই আয় মা, আমি বাগান থেকে ফুল কুড়িয়ে এনেছি, বুক-ভরা ভক্তি দেবো, মাটি ছেড়ে খাঁটি হয়ে আয় মা !

(দৈববাণী)

নেপথ্যে—বিজয়ার দিনে সাধ পূর্ণ হবে।

(প্রেমানন্দের প্রবেশ)

প্রেমানন্দ। দীনবন্ধু, ধন্য তুমি ! আজ যে আদর্শ দেখালে, তা জগতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। দেখো সংসার, ভক্তের বিজয় দেখো। আদর্শ গৃহস্থ দেখো। দীনবন্ধু, মায়ের মাটির প্রতিমা বিসর্জন দিয়েছ, এখন খাঁটি প্রতিমা দেখে জীবন ধন্য করো, ইনিই আদি বিদ্যা।

(কালীমূর্তি দৃশ্যমান)

(গীত)

প্রেমানন্দ।

কিবা রক্ত সুরঞ্জিত মঞ্জির গুঞ্জিত,
নীল নলিনী-পদ-যুগম্।
পশ্যতু শিব সিত হৃদয় স্বমাশ্রিত,
মাধুত অনুপম রূপম্॥
উজ্জ্বল নীল কাদম্বিনী কুন্তল,
লুণ্ঠন বহু শোভ মস্তম্,
লম্বিত নর-শির কণ্ঠমাল মোহ,
করধৃত খর-করবালম্;
কিবা চঞ্চলাপাঙ্গ তরঙ্গ বিরঙ্গিতা,
নঙ্গ দহন হৃদি লীনং,
নব জলদোদ্যুতি কোটিল শস্তনু,
মিন্দু কমল-দল ভাস্তং॥

(যবনিকা-পতন)

কর্মক্ষেত্র

—:*:—

মুকুন্দদাস প্রণীত

মুকুন্দ-৩৯

নায়ক

বাউল	...	জনৈক কর্মী গৃহস্থ
নন্দলাল রায়	...	স্বর্ণপুরের জমিদার !
হরিমোহন দত্ত	...	নন্দলালের ম্যানেজার
রমজান	...	ঐ প্রজা।
করিম	...	ঐ প্রজা।
প্রমোদ বসু	...	ঐ বন্ধু।
সুরেন সেন	..	ঐ বন্ধু।
মাণিক	...	ঐ জমাদাব।
কিশোরীলাল রায়	...	নন্দলালেব খুড়ো।
সুরেশ	..	ঐ পুত্র।
যোগেন	..	ঐ পুত্র।
দীনেশ	..	সুবেশেব বন্ধু।
হরিদাস মুখুয্যে	.	নবেনেব পিতা।
গণেশ মুখুয্যে	...	নিরুপমাব পিতা।

পুরোহিত, মাড়োযারী, প্যাদা, ভট্টাচার্য, নমঃশূদ্র-বালকগণ,
কৃষক-বালকগণ, চাকব, মুদী ইত্যাদি।

নায়িকা

সুরমা	...	নন্দলালের স্ত্রী।
হেমলতা	..	কিশোবীলালেব স্ত্রী।
কাত্যায়নী	...	ঐ পুত্রবধূ।
গার্গী	...	বাউলের কন্যা।
জ্ঞানদা	...	গার্গীর ছাত্রী।
মন্দাকিনী	...	ঐ ছাত্রী।
হেমাঙ্গিনী	...	ঐ ছাত্রী।
নিরুপমা	...	ঐ ছাত্রী।

কর্ম্মক্ষেত্র

—:*:—

প্রস্তাবনা

স্থান—ধান্যক্ষেত্র।

(কৃষক-বালকগণ)

(গীত)

মা মা বলে ডাক দেখি ভাই
ডাক দেখি ভাই সবে রে।
মা মা বলে কাঁদলে ছেলে,
মা কি পারে রইতে রে॥
জাগিবে জননী কুলকুণ্ডলিনী
জাগিবে শক্তি জাগিবে রে।
খুলে যাবে প্রাণ, দিতে পারবি প্রাণ,
স্বদেশ-কল্যাণ তরে রে
মায়ের শ্রীচরণতরী ভরসা করি,
ভাসাও দেহ-তরী রে।
তবে, মা হবে কাণ্ডারী, সুখে যাবি তরি,
ভয় কি অকূল-পাথারে রে॥
দেখ ভারতবাসী, ঐ এলোকেশীর
মাণিকহারে হাত কেঁপেছে রে।
এ মুকুন্দে কয়, আর করে ভয়,
জয় জয় ডঙ্কা বাজা রে॥

(প্রস্থান

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—নন্দলালের বৈঠকখানা।

(নন্দলাল, কিশোরীলাল, ম্যানেজার, বাউল ঠাকুর ও জমাদার)

নন্দলাল। আজ প্রায় একমাস হলো আমার স্বাস্থ্যটা কেমন ভেঙে গেছে। গায়ে মোটেই বল পাই না, দু'পা হাঁটলেই বুকটা যেন কাঁপতে থাকে, যা খাই তার কিছুই হজম হয় না, পেটে অসুখ তো লেগেই আছে। কবিরাজ মহাশয় আর আমাদের চ্যারিটেবেল ডিস্পেনসারীর ডাক্তারবাবু কত কি ঔষধ দিলেন, কিছুতেই ফল হচ্ছে না; বরং অসুখ দিন দিন বেড়েই চলেছে। স্বাস্থ্যটার জন্য কি যে করবো, কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছি না।

ম্যানেজার। শুধু বসে বসে ভাবলেই কিছু হবে না, এর জন্য ভাল ঔষধের ব্যবস্থা করা দরকার। স্বাস্থ্যই যদি ভাল না থাকে, তবে কিসের সংসার, আর কিসের পুত্র-পরিজন? আপনি ভাল ডাক্তার ডেকে দেখান।

নন্দলাল। আমাদের ডাক্তারবাবু বলেন পুরী কিংবা বৈদ্যনাথে গিয়ে কিছুদিন থাকলে স্বাস্থ্য ভাল হতে পারে, কিন্তু আমার মন কিছুতেই এগুচ্ছে না। যখনই ভাবি বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে, জন্মভূমি ত্যাগ করে বিদেশে গিযে থাকতে হবে, তখনই প্রাণটা যেন চমকে ওঠে। মনে হয ভিতর থেকে কে যেন বলছে— বিদেশে যেও না, অকল্যাণ হবে।

ম্যানেজার। ওসব কিছু নয়! কোনদিন বিদেশে যান নি কিনা, তাই মনের এ অবস্থা হচ্ছে, কিছুদিন পরে মনের এ অবস্থা থাকবে না। তবে যাবার পূর্বে একটা কাজ করুন, কলকাতা থেকে একজন বড় ডাক্তার এনে দেখান; তিনি এসে যে ব্যবস্থা করবেন, সে ব্যবস্থা মত কাজ করাই আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি।

নন্দলাল। আমারও ইচ্ছা তাই, একজন ডাক্তার ডাকলে হয়। কত টাকা লাগবে মনে করো?

ম্যানেজার। বড় কাউকে আনতে হলে দৈনিক হাজার টাকার কমে হবে না। তার পরে তাঁর যাতায়াত খরচও প্রথমশ্রেণীরই দিতে হবে, খাবার তো কথাই নেই।

নন্দলাল। যথেষ্ট খরচ! একদিনের জন্য আসবেন, তাতে এত টাকা? তিনি আসামাত্রই আমার ব্যারাম ভাল হয়ে যাবে নাকি?

ম্যানেজার। তা না হতে পারে, তবে কলকাতা থেকে আনতে হলে তাঁরা এমনি করেই নিয়ে থাকেন।

কিশোরীলাল। দেখো নন্দ! তোমার অসুখ এখনো এমন কিছু হয় নি, যাতে কলকাতা থেকে একজন ডাক্তার না ডাকলেই নয়; বৈদ্যনাথে যাবারও তেমন প্রয়োজন হয়েছে বলে আমার মনে হয় না; কিছুদিন আমাদের কবিরাজ মহাশয়ের ঔষধ খেয়েই দেখো না কি হয়! যদি এ কবিরাজ কিছু করতে না পারেন, তবে আমি বৈদ্যনগরের গৌরহরি সেন মহাশয়কে এনে দিচ্ছি। তিনি খুব বড় কবিরাজ এবং সুচিকিৎসক; আমার বিশ্বাস, তিনি তোমায় ভাল করে দিতে পারবেন।

ম্যানেজার। তিনি যদি খুব বড় কবিরাজই হবেন, তবে কি তাঁর নামটা একবারও খবরের কাগজে দেখতে পেতাম না!

নন্দলাল। হ্যাঁ, তাও তো বটে, গৌরহরিবাবু একজন প্রসিদ্ধ কবিরাজ, কাগজে কিন্তু এ কখনো দেখিনি।

(বাউলের প্রবেশ)

বাউল। দেখবে কি বাবা! তিনি কি তোমাদের কাগজের ধার ধারেন? যে প্রকৃতই বড়, সে কি আর নাম বেচে খেতে চায়? না, কাগজে নাম ছাপিয়ে সমাজের চোখে ধূলা দেবার চেষ্টা করে? গৌরহরি সেনের নাম কাগজে নেই বটে, কিন্তু এ দেশের প্রত্যেক নর-নারীর প্রাণের পাতায় পাতায় তাঁর নাম ছাপানো রয়েছে। গাঁয়ে নেমে জিজ্ঞেস করো, তবেই বুঝতে পারবে তিনি কত বড়! তারপরে কাগজের এডিটারের কথা বলছ?

(গীত)

এডিটার খোঁজ রাখে ক'জনার
আমরা ত্রিশ কোটী মায়ের ছেলে,

নাম ছাপে সে দু'চারজনার।
নামটি যার টাইটেল-যুক্ত,
লেখনীটি সেথায় মুক্ত,
তা বই লেখার উপযুক্ত,
আছে কি রে তাহার॥
রামা আজ দিল্লী যাবেন,
শ্যামা যাবেন কাছার।
স্টারে নাচবেন কুসুমকুমারী,
আ' মরি খবরের বাহার॥
এ দেশের এডিটার যত,
বুঝলে তাদের দাযিত্ব কত,
লেখায় তারা ঢালতো আগুন,
আসন নিত নেতার;
দেশের সেবক উঠতো মেতে,
জয় দিয়ে বিধাতার।
তারা ফেলতো ছিঁড়ে বাঁধন-ছাঁদন,
মুক্ত তারা হতো আবার॥

বাউল। দেখো নন্দ! এ দেশের জলবায়ুতে তুমি জন্মেছ, বেড়েছ, তোমার পক্ষে এ দেশের উদ্ভিজ্জ ঔষধই উপকারী। আমার মতে তুমি কবিরাজী চিকিৎসাই করো, তোমার ভাল হবে।

ম্যানেজার। বাউল ঠাকুর যে! কি মনে করে? বহুদিন তো আপনায় দেখি নি, তীর্থে গিয়েছিলেন নাকি?

বাউল। না বাবা, তীর্থে যেতে আর মন এগোয় না, দেশ ছেড়ে বিদেশে যাওয়া আর পৈতৃক ভিটা উচ্ছন্ন করা—এ একই কথা। বাপ-দাদার ভিটায় না খেয়ে মরলেও স্বর্গবাস।

ম্যানেজার তীর্থযাত্রা না আপনি খুবই ভালবাসতেন?

বাউল। হ্যাঁ, বাসতাম বটে, কিন্তু সে ভালবাসা এখন আর নেই। দেশের অবস্থা আর তোমাদের বাবুদের হালচাল দেখে সে মোহ আমার কেটে গেছে। এখন কি ভাবি তা জানো?

ম্যানেজার কি করে জানবো? একটু খুলেই বলুন না!

বাউল। কি করে দেশে দু'টি অন্নের সংস্থান হবে, আমাদের সকলের

সংসার আবার ধনে-ধান্তে পূর্ণ হবে, সে ভাবনাই আমায় পাগল করে তুলছে। তীর্থ দর্শন বা দশটা তুর্গোৎসবের চেয়ে একটি ক্ষুধার্ত ভাইয়ের মুখে একমুষ্টি অন্ন তুলে দিতে পারলে যে বেশী পুণ্যের সঞ্চয় হয়, এইটেই এখন দেশকে বোঝাতে হবে! এ যেদিন দেশ বুঝবে, সেদিনই ভারতে প্রকৃত কার্যের ক্ষেত্র তৈরী হবে, এর পূর্বে ক্ষেত্র তৈরীর আশা করা আমি আকাশ-কুসুম বলেই মনে করি!

ম্যানেজার। তা হলে তো দেখছি আপনি এখন খুব উঁচুদরের ভাবুক হয়ে পড়েছেন!

বাউল। শুধু ভাবুক নয়, তোমাদের মতন কপটাচারী বিশ্বাসঘাতক দেশের শত্রুদের ধ্বংস করাও জীবনের একটা ব্রত করে নিয়েছি।

ম্যানেজার। তোমার স্পর্ধা দেখছি অনেক বেড়ে গেছে, মুখ সামলে কথা বলো! জানো আমি স্টেটের ম্যানেজার, তুমি আমারই একজন নগণ্য প্রজা!

বাউল। জানি, আমি নন্দলালেরই একজন প্রজা, তোমার নয়! তার পরে স্পর্ধার কথা বলছ? সে তো তোমরাই বাড়িয়ে দিয়েছ। প্রত্যেক কার্যেরই একটা সীমা আছে, তোমরা যখন সে সীমা অতিক্রম করতে পেরেছ, মনুষ্যত্বকে পদদলিত করে ভারতের পুরাতন আদর্শগুলিকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে, পাশ্চাত্যের মুখোশ পরে সমাজের নেতৃত্ব স্থান অধিকার করতে ইচ্ছুক, এতটা স্পর্ধা যখন তোমাদের হতে পেরেছে, তখন আমরা চাষাব দলই বা নীরব থাকবো কেন? সীমা অতিক্রম করবো না কেন? যাক্, তোমার সাথে আর বেশী বকতে চাইনে, তবে এইটে তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি, ম্যানেজার! তুমি যে ফাঁদ পাতবার চেষ্টা করছ, সে ফাঁদে তুমি তোমার নিজের ধ্বংসের পথই তৈরী করে তুলছ মাত্র, যখন আমি টের পেয়েছি, তখন জমিদার ধ্বংস হবে না, তুমি নিজেই উচ্ছন্নে যাবে। (প্রস্থান)

ম্যানেজার। (স্বগত) এই লোকটা আমার অভিসন্ধি সব টের পেয়েছে নাকি!—একে দেখলেই বুকটা কেঁপে ওঠে! (প্রকাশ্যে)

বাবু, আপনার সামনে আমায় এমন করে অপমান করে গেল, আর আপনি একেবারে নীরব রইলেন, আশ্চর্য !—এই করেই আপনারা এসব ছোটলোকের স্পর্ধা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

কিশোরীলাল। লোকটা নেহাৎ ছোট নন, তবে কিনা ওঁকে চেনা একটু শক্ত, বৃথা কথা ইনি কখনো বলেন না।

নন্দলাল। যাক্, তা হলে কি ব্যবস্থা করতে চাও ?

ম্যানেজার। আজ্ঞে, আমার মতে তা হলে ডাক্তারকে আসতেই লিখে দেওয়া হউক, তিনি এসে যে ব্যবস্থা করবেন, সে ব্যবস্থা মতনই কাজ করা যাবে।

কিশোরীলাল। নন্দলাল ! আমার কথাটা বুঝি তোমার মোটেই ভাল লাগল না ! গৌরহরিবাবুকে দিযে চিকিৎসা করে দেখো না, কি হয়ে ? তারপরে না হয কলকাতা যেও !

ম্যানেজার। শরীর যখন খুবই খারাপ বলছেন, তখন যার-তার হাতে চিকিৎসা করানো আমি ভাল বলে মনে করি না। ওসব হাতুড়ে কবিরাজী চিকিৎসা আমার বেশ জানা আছে, কোন ভদ্রলোক ওদেব উপর বিশ্বাস করে অপেক্ষা করতে পারে না।

কিশোবীলাল। কবিরাজী চিকিৎসা হলেই যে সেইটে হাতুড়ে বা অকাজের, এমন কথা বলাটাও তেমন সঙ্গত বলে মনে হয় না। চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি পুরাকালের ঋষি প্রবর্তিত। এ দুর্ভাগা দেশে আজও তাব শেষ স্মৃতিটুকু দেখাতে গৌরহরি সেনের মতন ঋষিতুল্য ব্যক্তি এ চিকিৎসাক্ষেত্রে রয়েছেন। বাংলাদেশে তাঁর নাম কে না জানে ? শুধু বাংলা কেন, আজও বাংলাব বাইরে কত স্বাধীন নৃপতির বাড়ি থেকে তাঁর ডাক আসছে ! তাঁরা তো আর টাকার সুবিধা বা আধুনিক চিকিৎসকের অভাবে তাঁকে ডাকছেন না !

ম্যানেজার। ও রাজরাজড়ার কথা ছেড়ে দিন, এ দেশে এমন সব বড় বড় লোক এখনো আছেন, যাঁদের কুসংস্কার দূর হতে এখনো অনেক পুরুষ লাগবে।

(বাউলের প্রবেশ)

বাউল। তা ভালো, সুসংস্কার অর্জন করে দেশটা কেমন তর-তর করে

উন্নতির পথে এগিয়ে চলছে, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। তোমরা সভ্যতার ধুয়া ধরে যেদিকের সংস্কারের জন্য এগিয়ে চলেছ, আমি তো দেখতে পাচ্ছি সেদিকের অন্ধকারটা আরো গভীরতর হয়ে দেশের বুকে অলক্ষ্যে একটা ভীতির কম্পন স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছে।

ম্যানেজার। এইবার কাকাবাবুর জুরী মিলেছে। কি আশ্চর্য, এখনো দেশকে সভ্যতার আসনে তুলতে যে কত দেরী, তাই ঠিক পাচ্ছি না।

বাউল। তোমার ভাববার দৌড় ততদূর পৌঁছবার বড় বেশী আশা নেই। সভ্যতা-ভব্যতা ওসব বেশী কথা তুলো না বাবা, যেদিন সভ্যতার ধুয়া ধরে পাশ্চাত্যের মক্স আরম্ভ করেছ, সেদিন থেকে দেশের শান্ত নিরাবিল আনন্দ, স্বাস্থ্য, সম্পদ সব তোমাদের সভ্যতার ছেঁদো পথে চশমা-পরা চোখকে ফাঁকি দিয়ে কোথায় চলে যাচ্ছে তার ঠিকানা নেই।

ম্যানেজার। আপনার ঐ ফিলসফিক্যাল লেকচারে আমার অবাক হবার কিছুই নেই। আপনি কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন যে, পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এসে আমরা কিছুই উপকৃত হই নি? চিকিৎসার কথাই বলি—এই ধরুন, আজ মানুষের প্রাণ বাঁচাবার জন্য কতরকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদিব না আবিষ্কার হয়েছে, ইলেক্‌ট্রিক্ ট্রিট্‌মেণ্ট কি আশ্চর্য ফলই না দেখাচ্ছে! কোন্ চিকিৎসা আমাদের দেশে ছিল, যার সাথে এর তুলনা করতে পারি?

বাউল। তা, তুলনার জন্য হেকিমি বা কবিরাজীর ভিতরে একটা ইলেক্‌ট্রিক মেশিন ধরে দেখাতে পারবে না বটে, কিন্তু ফলের ঘরে লাভা-লাভের খতিয়ানে এইটে বেশ দেখাতে পারবো যে, তোমাদের বিদেশী ডাক্তারী চিকিৎসা আর তার সহযাত্রী সভ্যতার উপকরণ-গুলি বের হবার পর থেকে এই ভারতবর্ষে মরার মাত্রাটা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আজ ঘরে ঘরে প্লেগ, ম্যালেরিয়া, কলেরা, কালাজ্বর, কত কি ব্যাধি—সব ব্যাধির নামও জানি না। স্বাধীন দেশের চকমকে সভ্যতা অনুকরণ করতে গিয়ে তোমাদের জাতের উপরে যেটা বেশী লোকসানের, যেটা মহোৎসাহে অন্ধ অনুকরণ করে মজ্জায় ঢুকিয়েছ; আর যেটুকু লাভের, যেটুকু গুণের তা বিষবৎ পরিহার করে যাচ্ছ।

ম্যানেজার। তা হলে আপনার মতে দেশটা শুধু সেই সেকেলের মত আচার-ব্যবহার আঁকড়ে ধরে ইংরাজী না পড়ে নগ্নপদে আদুড় গায়ে একটা টিকি ঝুলিয়ে চলতে থাকলেই ভাল হয়ে যাবে, কেমন?

বাউল। তা কেন, আজ জগতের সাথে চলতে হবে শুধু সেটুকুর জন্য, যেটুকুই আমাদের প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে আমাদের জাতেরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে, তা হাবার মতন কখনো হাটে হারিয়ে ফেলবো না। আমরা অশ্রদ্ধায় যেন আমাদের খাঁটি জিনিসগুলি না হারাই। তুমি যে কবিরাজী চিকিৎসা উড়িয়ে দিতে চাচ্ছ, মনে রেখো শাস্ত্রটি বেদেরই একটি অঙ্গ, ঋষিকৃত। আমাদের আসক্তির অভাবে আজ অনেক কবিরাজ নিরন্ন, এই বাংলার সংস্কৃত টোলগুলি আজ সব বন্ধ হয়ে গেছে। এত অশ্রদ্ধার ভিতরে থেকেও সে মরে নি, তার বেঁচে থাকার দৃঢ়তা দেখে আজ গুণগ্রাহী বৃটিশ জাতিরও দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হযেছে, এ দেখেও যদি তোমাদের উর্বর মস্তিষ্কে একটু জ্ঞান হয়!

ম্যানেজার। যাক্, ওসব তত্ত্ব আলোচনার সময় এখন নেই, যদি কখনো তেমন উন্নতি লাভ করে, তখন দেখা যাবে।

বাউল। তা তো বটেই, বিদেশী ভট্টাচার্যের সার্টিফিকেট না দেখলে যে আমাদের দেশের জিনিসগুলি আমাদের কাছে মূল্যবান হবে না, তা তো আমি অনেক দিন থেকেই জানি। সাবাস দেশের শিক্ষাভিমানীর দল! হায় রে দেশ!

(গীত)

ঝড়ের মুখে পাখীর বাসা,
যেমন টলমল;
যেমন নলিনদলে জল,
ক্ষণিকের এ রঙ্গীন জীবন,
তেমনি চপল, হা'রে তেমনি চপল।
আজ আছে কাল রবে কিনা,
কে বলিবে বল॥
তারি লাগি ও ভোলা মন,
কেন রে এত আয়োজন,
কড়া বুলি কড়া আঁখি,
মন ভরা গরল;

[illegible] [illegible]ায় আলোর খেলায়
শিশির উজ্জল।
সেই আলো তার বুকের মাঝে,
শুকিয়ে তোলে জল॥
সুখের দিনে এই যে নেশা,
এই আলো আর জলে মেশা,
দিন না যেতে ফুরিযে যে যায
দিনেরি সম্বল;
সুখ যে হবে দুঃখের সাথী,
নিভবে প্রদীপ রাতারাতি,
ঐ তারার পানে লক্ষ্য বেখে
আপন পথে চল॥

(প্রস্থান)

ম্যানেজার। এ সব অসভ্যদেব গুলি করে মাবা উচিত। যত সব ছোট-লোকের স্পর্ধা বেড়ে গেছে!

কিশোরীলাল। নন্দ, বাউল ঠাকুর কি বলে গেলেন শুনলে তো? আমার মতে কবিবাজী চিকিৎসাই কবো।

ম্যানেজার। তা বাবু, আপনি কবিরাজী চিকিৎসাই করুন, আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু ফল ভাল হবে না।

কিশোরীলাল। তুমি চুপ করো, এ আমারই ভ্রাতুষ্পুত্র, আমার চেয়ে তুমি ওকে বেশী জানো না, বা আমার চেযে তুমি ওর বেশী আত্মীযও নও। একে আমি নেংটাকাল থেকে প্রতিপালন করে আসছি, দাদাব মৃত্যুব পরে আমিই ওকে মানুষ করেছি, এর সম্বন্ধে যা কিছু করাব তা আমিই করবো, তুমি এব ভিতবে কথা কইতে আসো কেন?

ম্যানেজার। তা আমার কি দোষ? ইনি আমায জিজ্ঞেস করেন, তাই উত্তর দিতে হয়।—তারপরে আপনিও আমায চোখ রাঙিয়ে কথা বলবেন না, আমি আপনার কর্মচারী নই, এইটিও স্মরণ রাখবেন!

নন্দলাল। আমি একে আমার স্টেটে ম্যানেজার নিযুক্তি করেছি, আমার ভাল-মন্দ যা কিছু এখন এ-ই দেখবে; আপনি একে যা-তা

বলবেন না। তারপর এ ভদ্রবংশের সন্তান, এটিও আপনি স্মরণ রাখবেন।

কিশোরীলাল। এ তোমায় একজন কর্মচারী বই নয়। একেও ভয় করে এখন আমায় কথা কইতে হবে? অবাক্ করলি নন্দ! বাল্যাবধি প্রতিপালনে যথেষ্ট পুরস্কার দিলি! (প্রস্থান)

ম্যানেজার। দেখলেন তো, যা বলেছি তাই কি না? ওঁর ইচ্ছাই আপনাকে মেরে ফেলেন।

নন্দলাল। কাকার এ ইচ্ছা হবে কেন! তাতে তাঁর লাভ?

ম্যানেজার। এতবড় সম্পত্তিটা সবই আত্মসাৎ করবেন।

নন্দলাল। কাকার তো এ সম্পত্তিতে কোন অংশ নেই, বাবা তাঁকে খুব ভালবাসতেন এবং বিশ্বাস করতেন। তাই যতদিন না আমি সাবালক হই, ততদিন তাঁর উপরে স্টেটের যাবতীয় ভার অর্পণ করে গিয়েছিলেন। তার পরে এখন আমিই সব বুঝে নিয়েছি। ধরলাম তিনি আমায় মেরে ফেললেন, কিন্তু যত-দিন আমার স্ত্রী বর্তমান থাকবে, ততদিন কি করে তিনি সম্পত্তির মালিক হবেন? তুমি যা-ই কেন বলো না, কাকার প্রাণ এত ছোট হতে পারে, এ আমি ভাবতেই পারি না। সকলে বলে কাকা দেবতা, তুমি তাঁকে এত ছোট মনে করো?

ম্যানেজার। আমি তো আর ইচ্ছা করে মনে করছি না; ওঁর কাজই আমায় মনে করাচ্ছে। আপনি দেখতে চান? আচ্ছা, আমি এখনি তার একটা প্রমাণ দিয়ে দিচ্ছি!—জমাদার··· ··· জমাদার—

(জমাদারের প্রবেশ)

জমাদার। হুজুর!

ম্যানেজার। বড়কর্তা সেদিন তোমায় কি বলেছিলেন?

জমাদার। সেদিন তিনি আমায় বলেছিলেন, পুরোনো লোহার সিন্দুকের চাবি তুমি আমার বিনা অনুমতিতে নন্দকে দেবে না।

নন্দলাল। আচ্ছা, তুমি এখন যাও।

(জমাদারের প্রস্থান)

নন্দলাল। কাকার একথা বলার উদ্দেশ্য কি মনে করো?

ম্যানেজার। উদ্দেশ্য, তাতে যে টাকা আছে, তা সব আত্মসাৎ করবেন, আমরা যদি দেখে ফেলি—এই ভয়! তারপরে ইনি অনেক সম্পত্তি ওঁর নিজের নামে খরিদ করেছেন, তাতে আপনার নাম থাকা উচিত ছিল। আপনাকে মেরে ফেলবার চেষ্টাও উনি করছেন, এমন কথাও আমার কানে এসেছে, আর একদিন আপনাকে এ কথা বলেছি, বোধ হয় আপনার স্মরণ নেই।

নন্দলাল। হাঁ, তুমি বলেছিলে বটে, কিন্তু কাকা, যিনি আমায় শৈশবকাঃ থেকে প্রতিপালন করে এসেছেন, যিনি তাঁর ছেলের থেকেও আমায় বেশী স্নেহ কবেন, তাঁর প্রাণ এত ছোট, তিনি এত নিষ্ঠুর হতে পেরেছেন, এ ভাবলেও আমাব হৃৎকম্প হয়। জানি না বিধাতার কি ইচ্ছা। যাক্, এ সব কথা এখন থাক, তুমি অন্য কাজে যাও।

ম্যানেজার। তবে ডাক্তার আসতে লিখে দেবো কি ?

নন্দলাল। যা হয় কাছাবীতে বসে বলবো, তুমি এখন যাও।

ম্যানেজার। আচ্ছা, আমি এখন যাই!

নন্দলাল। কি ষড়যন্ত্র। কাকা আমায় মেবে ফেলবাব চেষ্টা করছেন, এও কি কখনো হতে পাবে ? তিনি যে আমায় তাঁব ছেলেব থেকেও বেশী স্নেহ কবেন। ম্যানেজাব কি যে বলে, ওব মাথাই খারাপ হয়ে গেছে। আচ্ছা, তাবই বা একথা বলায় স্বার্থ কি ? সেও তো আমাব একজন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বলেই আমি জানি। কি ব্যাপাব যে হচ্ছে, তা কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। যাই দেখি একবার বাউল দাদার কাছে, তিনি যা বলবেন তা-ই করবো, প্রাণ গেলেও তিনি কখনো সত্য গোপন করবেন না।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—নন্দলালের ভিতর-বাড়ি।

(নন্দলাল, সুরমা, বাউল ও চাকর)

সুরমা। আজ নাকি কাকাবাবুকে কি বলেছ ? তিনি খুব দুঃখিত

হয়েছেন। আমায় বললেন, বউমা! আমার জীবনে এমন অপমান কেউ কখনো করতে পারে নি।

নন্দলাল। হ্যাঁ, কাকা তা বলতে পারেন। কিন্তু শুনতে পাচ্ছি, কাকা নাকি আমায় মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র করছেন, এ যদি সত্য হয়, তবে কি করে আমি কাকার সম্মান রক্ষা করবো?

সুরমা। এ কথা তোমায় কে বলেছে? যে বলেছে, সে-ই তোমার শত্রু; তুমি তাকে এই মুহূর্তেই দেশ থেকে তাড়িয়ে দাও। কাকা মানুষরূপী দেবতা, তাঁর মতন নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রেমিক ভারতে দুর্লভ। সাবধান! তুমি পরের কথায় এমন দেবতার অভি-সম্পাত মাথা পেতে নিও না, অকল্যাণ হবে!

(বাউলের প্রবেশ)

বাউল। ঠিক বলেছিস বউমা, তিনি দেবতাই বটেন। প্রত্যেক নরনারী তাঁর চরিত্রে মুগ্ধ। সহস্র-সহস্র নরনারী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে কৃতকার্য হয়েছেন। তাঁর দেব-চরিত্রে যে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করার চেষ্টা হচ্ছে, যদি তা কোনরকমে বাড়ির বাইরে পৌঁছায় তবে এই জমিদারীতে আগুন জ্বলে উঠবে; তা এমনভাবে জ্বলবে যে, সে আগুনে তোমাদের সকলকে পুড়ে ছাই হতে হবে নন্দ! আমিও তোমায় সাবধান করছি, কাকা তোমার পিতৃস্থানীয়, তিনি তোমায় নেংটাকাল থেকে প্রতিপালন করে এসেছেন, তুমি তাঁকে বিশ্বাস করো।

নন্দলাল। আমি কি তাঁকে কখনো অবিশ্বাস করেছি?

বাউল। করো নি তা সত্য। কিন্তু এখন তোমায় অবিশ্বাস করাচ্ছে; তুমি যাকে ম্যানেজার রেখেছ, তাকে উঠিয়ে দাও। যতদিন স্টেটে ঐ ম্যানেজার না ছিল, ততদিনই স্টেট ভাল চলেছে, ওকে রাখাবধি নানারকম গোলমালের সূচনা দেখা যাচ্ছে।

নন্দলাল। আপনি কি বলতে চান, ম্যানেজার রাখায়ই এসব গোল হচ্ছে?

সুরমা। আমার তো মনে তাই হয়। যেদিন থেকে তুমি সব কাজে ম্যানেজারের উপর নির্ভর করেছ, সেদিন থেকেই কাকাবাবুর মুখ গম্ভীর হয়েছে, তোমার প্রজা-মহলেও নানারকম গোলমালের আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে।

বাউল। নিজের কাজ নিজে না করলে যে ভাল হয় না, এ সহজ কথাটাও কি তোমায় বুঝিয়ে দিতে হবে, নন্দ? লেখাপড়া তো কম শেখো নি, ম্যানেজার তোমার চেয়ে বেশী বিদ্বানও নয়, তার কাজটা নিজেই করো না? বসে থাকতে যে থাকতে একেবারে অকর্মণ্য হতে চলেছ, আর কিছুদিন পরে এ দেশের রাজা-জমিদারের মুখের ভাত মুখে উঠিয়ে দিতে হবে, তা না হলে বোধ হয় ওদের অদৃষ্টে খাওয়াই জুটবে না। নিজের কাজ নিজে করো, ম্যানেজারকে যে টাকাগুলি মাইনে দেওয়া হচ্ছে তাও তহবিলে জমা হবে, নিজে বিচার করলে প্রজারাও আনন্দিত হবে।

(চাকরের প্রবেশ)

চাকর। বাবু! ম্যানেজারবাবু আপনাকে বাইরে ডাকছেন।

নন্দলাল। কেন, বলতে পারিস?

চাকর। আজ্ঞে না; তবে শুনে এলাম, নায়েববাবুর সাথে ডাক্তার সম্বন্ধে কি কথা হচ্ছে।

সুরমা। তবে কি এর মধ্যে কলকাতা থেকে ডাক্তার এসে পড়লো?

বাউল। ডাক্তার আসবে না বউমা! বাংলা যে এখন কলকাতা-রাক্ষসীর বড় আদরের সামগ্রী, তার পেট ভরাতেই হবে। দেখছ না দেশের রাজা-জমিদারগুলো কেমন দৌড়ে চলেছে তার পেট ভরাতে! কালের বিচিত্র গতি বউমা, প্রকৃতি ঠাকুরুন পর্যন্ত এখন তাঁর ভুবন-ভোলানো রূপটি হারিয়ে ফেলেছেন, এখন শীতে পাখা চলে, গ্রীষ্মে ঘোলের সরবত ছেড়ে গরম চা, মায়ের ছেলে এখন আয়ার হাতে মানুষ, শিশু এখন দেশী গো-মাতাকে ছেড়ে বিদেশী ফুড-বিমাতা-ভক্ত হয়ে পড়েছে। অথচ কর্তাদের নাকি কান্না এখনো থামছে না। ঐ কলকাতা না গেলে কি আর Health ভাল হয়? বড় ডাক্তার না হলে কি এখন আর কবিরাজে পোষায়? কলকাতা যেতেই হবে বউমা, ঐ কলকাতা যেতেই হবে।

নন্দলাল। ডাক্তার এলেই কি আমায় কলকাতা যেতে হবে?

বাউল। নিশ্চয়! সে এসে তোমায় যা বলবে, সে কথা আমি তোমায় বলে দিতে পারি, সে বলায় কোন কাজ হবে না, নন্দ।

সুরমা। চিকিৎসা করাতে হয় এখানে বসেই করাবে, ডাক্তার যদি কলকাতা নিতে চায়, তবে তুমি যেও না।

নন্দলাল। আচ্ছা, আমি এখন যাই, কলকাতা যেতে আমারও তেমন ইচ্ছা নেই, এইটে তুমি জেনে রাখতে পারো। (প্রস্থান)

সুরমা। বাউল দাদা! আপনি কিন্তু সর্বদাই ওর কাছে থাকবেন, আমার যেন কেমন ভয় হচ্ছে। ম্যানেজার রাখাবধিই সংসারে কেমন একটা অশান্তির সৃষ্টি হযেছে, কারোই তেমন হাসিভরা মুখ এখন আর দেখতে পাই না।

বাউল। তুমি কোনো চিন্তা করো না, আমার প্রাণ থাকতে তোমাদের কোন অকল্যাণ হতে পারবে না। যাও তুমি, সংসারের কাজ করো গে, বৃথা চিন্তা করে মনকে দুর্বল করো না। ভগবান আছেন, তিনি মঙ্গলময, তিনি তোমাদের মঙ্গলই করবেন।

(প্রস্থান)

সুরমা। ঠাকুর! আমার দেবতার মঙ্গল কবো! (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—কিশোরীলালেব বাড়ি।

(কিশোরীলাল, সুরেশ, বাউল, হেমলতা, যোগেন ও গার্গী)

সুরেশ। বাবা, আমার পাশের খবব এসেছে, নবীন টেলিগ্রাম করেছে। এই দেখুন টেলিগ্রাম।

কিশোরীলাল। বি. এল্. তো পাস হলে, এখন কি কবতে চাও?

সুরেশ। আমার ইচ্ছা হুগলী গিযে প্রাকৃটিস আরম্ভ কবি, যদি সেখানে সুবিধা না হয় তবে অন্যত্র যাবো।

কিশোরীলাল। আমি বলি কি জানো? শহরে গিযে ওকালতী আরম্ভ না করে নিজেদের যা জায়গা-জমি আছে সেগুলি রক্ষা করতে চেষ্টা করো। যোগেনও এবার বি. এ. দিয়েছে, পাসও হবে। সে না হয় বিদেশে গিয়ে টাকা উপার্জনের চেষ্টা করুক। বিষযটা দেখার জন্য আমি তোমায় বাড়িতেই থাকতে বলি।

সুরেশ। গাঁয়ে থাকলে এতদিন বসে যা শিখেছি তা সবই ভুলে যাবো, জীবনটাও অকর্মণ্য হয়ে যাবে। তার পরে এতদিন শহরে থেকে মনের এমন একটা অবস্থা হয়েছে যে, এক মুহূর্ত আর গাঁয়ে থাকতে ইচ্ছা হয় না।

কিশোরীলাল। এখানে তোমার এমন কি অসুবিধা হচ্ছে, সেইটেই বুঝে উঠতে পারছি না। আমার তো মনে হয় শহর থেকে গাঁয়েই আমরা অনেক সুখে আছি। এখানে যেমন খাবার মেলে, শহরের বাবুরা তা বোধ হয় চোখেও দেখেন না। তার পরে শহরে খরচও আমাদের গাঁয়ের থেকে অনেক বেশী।

সুরেশ। খরচ কিছু বেশী হয় বটে, কিন্তু শহরের স্বাস্থ্য গ্রাম থেকে অনেক ভালো, খাবারও যথেষ্ট মেলে।

(বাউলের প্রবেশ)

বাউল। খরচ কমানোই হচ্ছে এখন সব চেয়ে বড় কথা। নিজের খরচ কমিয়ে যাতে পরের কিছু সাহায্য করা যায়, সেইটেই এখন আমাদের দেখতে হবে। তারপরে শহরে তোমরা ভাল জিনিস কি খাও তা বলতে পারো? সরষের তেলের বদলে খাও কলে-পেষা ভেরণ তেল। ঘৃতের বদলে চর্বি। দুধে এক সেরে তিন পো জল। আর আমরা চাষা, ক্ষেতে সরষে জন্মাই। কলু দিয়ে ঘানিতে ভেঙে খাই খাঁটি তেল, গো-লক্ষ্মী আমাদের ঘরে আছে, প্রচুর দুধ হয়। মেয়েরা দুধ মন্থন করে ঘৃত তৈরী করেন, তা দেবভোগ্য; দুধটা যে খাঁটি খাই, তা বোধ হয় না বললেও চলবে। তবে বলবে যে, তোমাদের হাণ্টলি-পামার বিস্কিট্-ফিস্‌কিট্ আমরা খাই না। ও গ্রামের বাজারে পাবারও যো নেই বাবা! কিন্তু তার চেয়ে আমাদের ঘরের মেয়েদের হাতেব তৈরী মুড়ি, মুড়ির মোয়া, নারকেলের সন্দেশ, চিড়ের মোয়া, নিম্‌কি, রসপুলী, পুলী—কত আমরা খাই! তোমাদের ঐ বিস্কিটের চেয়ে এর আস্বাদ বেশী বই কম বলে তো আমাদের মনে হয় না!

সুরেশ। শহরের মেয়েরাও ওসব তৈরী করতে জানেন।

বাউল। জানলে হবে কি বাবা, তাদের সময় কই? তারা যে সকলেই এখন সাহিত্যিক হয়ে উঠলো; পড়া নিয়েই তারা ব্যস্ত, গিন্নিপনা কি এখন আর তাদের পোষায় রে বাবা?

সুরেশ। বিস্কিটের চেয়ে মুড়ির মোয়াতে আস্বাদ বেশী, এ আপনি কি বলেন?

বাউল। বেশী কি আর একটু বেশী বাবা? অনেক বেশী। ঐ মুড়ির

খোয়ার সাথে একটু নারকেল কোরা হয়, তবে তো আর কথা নেই, একেবারে স্বর্গসুখ। তবে কিনা এর আস্বাদ বাবুদের ভাগ্যে জুটে ওঠা বড় কষ্ট। কারণ, সকল বাবুরই এখন দেখতে পাচ্ছি, সাহেবদের মতন বাঁধানো দাঁত হয়ে পড়েছে। এ খেতে হলে আসল দাঁত চাই, মেকি দাঁতে এর মজা পাওয়া যায় না বাবা!

সুরেশ। মতি-মার্কা সরষের তেল এখন বেশ ভাল বেরিয়েছে।

বাউল। তাতেও ভেজাল যথেষ্টই আছে। তবে কিনা তা তোমাদেব বুঝবার সাধ্যি নেই। কারণ, তোমরা তো আর খাঁটি জিনিস খাও না, আমরা খাঁটি জিনিস খাই, তাই আমাদের কাছে ভেজাল দিয়ে সারবার যো নেই। মিলগুলি এদেশে আমাদের সর্বনাশ করতেই এসেছে, মিলের কর্তারা বসেছেন ব্যবসা করতে। দেশের টাকা লুট করা আর আমাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করা —এ দুটিই হচ্ছে তাদের লক্ষ্য। খাবার জিনিসে যেদিন থেকে ভেজাল আরম্ভ হয়েছে, সেদিন থেকেই ভারতবর্ষে নূতন নূতন ব্যাধির আমদানি হয়েছে। খাবারের ভিতরে বেশী প্রয়োজনীয়ই হচ্ছে ঘৃত আর তেল। তবে গরীবের এখন আর ঘৃত খাওযা পুষিয়ে উঠছে না, অল্পই হউক আর বেশীই হউক তেল একটু সকলেরই চাই। অন্ততঃ এই তেলটা ইচ্ছা করলে সকলেই কলু দিয়ে ঘানিতে ভেঙে খেতে পারেন। এতে অর্থের দিক দিয়ে চাইলেও বাবুদের অনেক লাভ, আট আনা দশ আনা সেরের জায়গায় পাঁচ আনা ছ' আনায় পেতে পারেন।

সুরেশ। দেশে যত তেলের প্রয়োজন, তা কলুতে ভেঙে দিতে পারে, এত কলু কোথায়?

বাউল। কলু এ দেশে কম নেই, ও জাতিটা এ দেশের একটা শক্তি। কাজ পাবে না বলে তারা ঘানি ছেড়ে অন্য পথ ধরতে বাধ্য হয়েছে। কাজই যদি দিতে পারো তবে দেখবে শহর-বন্দর ভরে যাবে। কাজ অভাবে জাতিটা মরতে বসেছে। বাবুরা এই জাতিটাকে একটু বাঁচিয়ে তুলুন না, এতে তেলের কলের মূলধনের জন্য বাড়ি বাড়ি দৌড়াবার প্রয়োজন হবে না; সকলের মিলিত ইচ্ছা হলেই হবে। দেশের অকাল-মৃত্যুর সংখ্যাটাও

বোধ হয় কমে যাবে। আরে, নিজের যা জায়গা-জমি আছে, সেগুলি যাতে নিজের হাতে রক্ষা করতে পারিস তাই কর; কাজের সময় এসেছে, কাজে লেগে যা।—

(গীত)

বাউল। পণ করে সব লাগ রে কাজে,
খাটবো মোরা দিন কি রাত।
বাংলা যখন পরের হাতে
তখন কিসের মান আর
কিসেব জাত॥
মাড়োয়ারী দিল্লীওয়ালা
উড়ে পাশি ভাটীয়ারা
তারা মোটর হাঁকে,
চৌতালায় থাকে,
আমা'দের নাই
পেটে ভাত॥
যেদিকে যাই বাংলা দেশের,
সকল দিকই করছে গ্রাস ;
তোরাই শুধু কেরানীর দল,
একটা ব'ড়েব চালেই
হলি মাৎ॥
এমন করে পরের হাতে,
বিকিয়ে দিলি সোনার দেশ,
ধিক্ বাঙ্গালী নীরব রইলি
থাকতে চৌদ্দ কোটী হাত॥

বাউল। কিশোরীবাবু, অনেক বকলুম, এখন যাই। ছেলে শহরের নেশায় ভরপুর, এ নেশা ছোটানো বড় সহজ নয়। তবু চেষ্টা করে দেখো যদি বাছার নেশা ছোটে! (প্রস্থান)

কিশোরীলাল। যাদের চাকুরী না করলেই নয়, তারা না হয় চাকুরী করুক, শহরে যাক। তোমার তো চাকুরী না করলেও চলে, তুমি কেন দেশে থেকে তোমার নিজের যা আছে সেইটে রক্ষা করো না?

সুরেশ। আমি শহরে না গিয়ে পারবো না, শহরে আমায় যেতেই হবে। যোগেন না হয় বাড়ি থেকে বিষয় দেখুক।

কিশোরীলাল। তুমি হলে তার বড় ভাই, আমার এখন বৃদ্ধাবস্থা, যোগেনকে এখন তোমারই চালিয়ে নিতে হবে। আমি এখন আর তেমন করে খাটতে পারি না, সে শক্তিও আমার নেই। আমি আমার খামারের আয় থেকেই তোমাদের দু'জনকে শহরে রেখে বি. এ পর্যন্ত পড়িয়েছি, এই খামারই হচ্ছে তোমাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন। এর প্রতি যদি তোমরা লক্ষ্য না করো, তবে তোমাদের ভবিষ্যৎ ভাল হবে বলে আমার মনে হয় না। তারপর তুমি যাচ্ছ ওকালতি করতে। শুনতে পাচ্ছি উকীলদের এখন আর পূর্বের মত পসার নেই।

সুরেশ। ও সব বাজে লোকের কথা। যাঁরা শক্তিশালী উকীল, তাঁদের পয়সার অভাব কি ?

কিশোরীলাল। তুমি নূতন উকীল, শুনলাম পুরোনো উকীলদেরও অনেককে এখন বাড়ি থেকে টাকা এনে খেতে হয়। যাঁর বাড়িতে কিছু নেই, তিনি কর্জের উপরেই আছেন। তাই আমি তোমার নিজের যা আছে সেইটেই রক্ষা করতে বলছি, আর এতেই তোমার কল্যাণ হবে। বৃদ্ধের কথা উপেক্ষা করে শহরে গেলে তোমার মঙ্গল হবেই, সে আশা আমার নেই। আমার যা বলবার তা বললাম। এখন তুমি যা ভাল মনে করো, তাই করতে পারো।

সুরেশ। শহরে আমি যাবোই, গাঁয়ে পচে মরতে আমি পারবো না। এ ক'দিন মাত্র গাঁয়ে এসেছি, আমার স্বাস্থ্যটা কেমন ভেঙে গেছে।

কিশোরীলাল। আমরা সারা জীবন এই গাঁয়েই কাটালাম, কই, তোমাদের শহরে বাবুদের চেয়ে আমাদের স্বাস্থ্য তো মোটেই খারাপ মনে করি না! তবে বলবে যে, ওটা আমাদের সয়ে গেছে। তা তোমারও কিছুদিন পরে সয়ে যাবে ; গাঁয়েই থেকে যাও।

সুরেশ। কি করে থাকবো, এখানে দশজন শিক্ষিত লোকের দেখা পাবার যো আছে কি ? অসুখ হলে ভাল ডাক্তার মেলে না, খাবারেরও যথেষ্ট অভাব।

কিশোরীলাল। খাবার সবই মেলে, সবই আমরা খাই। তবে ঐ চা আর সিগারেট, যা তোমার খুব বেশী প্রিয়, তার কিছু অভাব আছে বটে।

সুরেশ। চা তো আমার না হলেই নয়, ঐটে আমার চাই-ই।

কিশোরীলাল। শহরে গিয়ে ঐ একটি ব্যাধি নিয়ে এসেছ বাবা। তোমরা বলো চা-তে শরীর ভাল হয়, কিন্তু আমি তো দেখতে পাচ্ছি যারা ও না খায় তারা তোমাদের চেয়ে সবল এবং সুস্থ শরীরে আছে। চা তো বিষ, ওতে নেশাও যথেষ্ট। আফিং থেকে চায়ের নেশা কোন অংশেই কম নয। যারা আফিং খায় তাদেব যেমন আফিং না হলে চলে না, চা যারা খায় তাদেরও চা না হলে চলে না। ওসব খেয়ে খেয়েই মাথাটা খারাপ কবে এসেছ, তাই ভাল কথা এখন আর মাথায ধবছে না। তা শহবে যেতে চাও যাও, কিন্তু মনে রেখো তোমার ভবিষ্যৎ জীবন বড়ই দুঃখের হবে!

সুবেশ। আমি এখন একেবারে ছেলেমানুষ নই, বি. এল্. পাস করেছি, নিজেব কিসে ভাল হবে তা বুঝবার শক্তিটা অন্ততঃ হয়েছে।

কিশোবীলাল। তা বেশ, নিজের পথ নিজেই বেছে লও, আমার বাধা দেবার কোনই প্রয়োজন নেই। লেখাপড়া শেখার পরিণাম যে এই হয, তা যদি পূর্বে বুঝতে পারতাম, তা হলে তোমাদের শহরে পাঠিযে এ বিদ্যা না শিখিযে আমাদের মতন চাষা মূর্খ কবে রাখবারই ব্যবস্থা করে দিতাম। আজ তোর সাথে কথা বলে এই জ্ঞানটা বেশ হলো যে, আজকাল স্কুল-কলেজে ছেলেদের পিতামাতার অবাধ্য হতে হবে, এই শিক্ষাটাই বোধ হয খুব ভাল কবে দেওযা হয;—ভগবান করুন, এই স্কুল কলেজ ভেঙে নূতন কবে গড়ে উঠুক, তা না হলে বোধ হয এ দেশে মানুষ জন্মাবে না।

সুবেশ। এইটে কি আপনি বুদ্ধিমানের মতন কথা বললেন? এই স্কুল-কলেজ দেশের কত উপকার করছে! আজ আমবা সভ্য-সমাজে মিশবার যোগ্য হয়েছি!

কিশোবীলাল। তোদের সভ্য-সমাজে মিশবার বালাই লযে মরি। যাদের পেটে ভাত নেই, পরবার কাপড় নেই, পরের মুখের দিকে চেয়ে দিন কাটানোই যাদের শিক্ষা, সে সভ্যদের চেয়ে অসভ্য

চাষারা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। তারা তাদের নিজের কাজ নিজেরাই করে নেয়, আপন পায়ে দাঁড়িয়ে দুঃখ-দরিদ্রতার সঙ্গে চিরজীবন সংগ্রাম করেও নির্মল আনন্দ উপভোগ করে, স্বাধীন চিন্তা করবারও তারা একটু অবসর পায়।

সুরেশ। আমি আপনার সাথে আর তর্ক করতে চাই না, আমার শহরে যাওয়াই ঠিক। আমি গাঁয়ে থেকে চাষার দলে মিশে চাষা সাজতে পারবো না।

কিশোরীলাল। এই চাষার দল আছে বলেই তোদের শহরে বাবুরা বেঁচে আছেন। এই চাষারাই শহর বাঁচিয়ে রাখে, দেশ বাঁচিয়ে রাখে। এদের পদধূলি যতদিন না বাবুরা মাথায় তুলে নিচ্ছেন, ততদিন সহস্র আন্দোলনেও এ দেশেব হাহাকার দূর হবে না। এ চাষার শক্তি যে কত, তা কিছুদিন পরে এই সমগ্র জগৎ টের পাবে। (প্রস্থান)

(হেমলতার প্রবেশ)

হেমলতা। কি রে সুরেশ! তুই নাকি শহবে যাচ্ছিস? কর্তা তোকে যেতে নিষেধ কবেছেন, তাঁব অবাধ্য হওযাটা কি ভাল?

সুরেশ। শহরে না গেলে ওকালতী কববো কি গাঁযে বসে? যখন ওকালতী পাস করছি, তখন শহবে আমায যেতেই হবে।

হেমলতা। কর্তা তোদের শহবে যাবার জন্য লেখাপড়া শেখান নি, লেখপডা শিখিয়েছেন জ্ঞানেব জন্য। এখন গাঁযে বসে যারা অশিক্ষিত, তাদের শিক্ষা দেওয়াই হলো তোদের কাজ। কর্তা তোদেব এই কার্যেব জন্যই উচ্চশিক্ষা দিযে দেশে এনেছেন। পাড়ার লোক তোদের কাছে কত আশা কবে, তাদের ফেলে কোথায় যাবি? যারা অর্থব্যয করে শহবে ছেলে পড়াতে অক্ষম, তাদের ছেলেপিলেগুলি যাতে মানুষ হয় তাই কব, তা হলে কর্তা খুব খুশী হবেন, কারণ, তিনি এই লোকসেবাই চান।

সুরেশ। আমি বাবাকে বলে দিয়েছি, আমার শহরে যেতেই হবে।

হেমলতা। কর্তার অমতে শহরে গেলে তোর ভাল হবে বলে আমার মনে হয় না। আমি যতদূর জানি, তাতে তিনি চাকুরী করাটাকে খুবই অপছন্দ করেন। তিনি নিজেও একজন উচ্চশিক্ষিত, ইচ্ছা করলে অনেক বড় কাজই তিনি করতে পারতেন। কিন্তু

তা না করে পাড়ায় ছেলেপিলেগুলি যাতে মানুষ হয় তাই করছেন, আমাদের স্কুলটিতে পণ্ডিত না রেখে তিনি নিজেই ছেলেদের পড়ান। আমি আজ ত্রিশ বছর এ সংসারে এসেছি, এ গাঁয়ের যা দেখেছি, তার চেয়ে স্বর্ণপুর আজ সহস্রগুণে উন্নত হয়েছে। যেমন লেখাপড়ায়, তেমনি শিল্পে, তেমনি লোকসেবায়। স্বর্ণপুরের মরা-প্রাণে ত্রিশ বছরে যেন একটা নূতন জাগরণ এসেছে। তিনি এখন বৃদ্ধ, তাঁর যাবতীয় কাজ এখন তোর নিজের হাতে নেওয়াই কর্তব্য। তা হলে তিনি খুব আনন্দিত হবেন, বৃদ্ধ বয়সে একটু বিশ্রাম করারও অবসর পাবেন।

সুরেশ। তিনি বিশ্রাম করলেই তো পারেন, তাঁকে তো কাজের জন্য ডাকে না, তিনি নিজেই গায়ে পড়ে লোকেদের নিয়ে এমন-ভাবে মাতামাতি করছেন!

হেমলতা। আরে, ওই তো তাঁর মহত্ত্ব! তিনি ঘরে বসেই তাঁর সংসার বেশ চালিয়ে যেতে পারেন, কারো কাছে তাঁর এক পয়সার জন্যও যাবার প্রয়োজন করে না। কিন্তু পরের দুঃখে যাঁর প্রাণ অত কাঁদে, তিনি কি আর নিজেকে নিয়ে বসে থাকতে পারেন? তাই সকলের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে কার সংসার কিভাবে চলছে, ছেলেরা কি রকম লেখাপড়া করছে, কার ব্যারামের ঔষধের প্রয়োজন, কার ঘরে কাপড় নেই, এই সব দেখছেন, আর যার যা প্রয়োজন, তাকে তাই দিয়ে তার সেবা করছেন। এর জন্যই আজ এই স্বর্ণপুরে তিনি দেবতার মতন পূজা পাচ্ছেন। তাই বলছি, এ দেবতার কথা অগ্রাহ্য করলে অকল্যাণ হবে।

সুরেশ। ওকালতী না করলে পয়সা আসবে কোত্থেকে?

হেমলতা। আমাদের খামার খুবই বড়, এতে যা আয় হয় তা তোর মতন দশজন উকীলেও উপার্জন করতে পারে না। কর্তার শরীরের রক্ত এই জমির পেছনে জল করেছেন। শিক্ষিত লোক যে এত পরিশ্রম করতে পারে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। নিজের জমা-জমি যা আছে, তা কর্তার কাছ থেকে বুঝে নিয়ে সে খামার যাতে আরো বড় করতে পারিস্ তার চেষ্টা

কর। এতে তোর ওকালতীর চেয়ে অনেক বেশী আয় হবে।

সুরেশ। তা এখন আমি চললুম, ভেবে-চিন্তে যা হয় তোমায় আমি পরে বলবো। (প্রস্থান)

হেমলতা। একেই কি বলে উচ্চশিক্ষা? পিতামাতার অবাধ্য হওয়াই যে শিক্ষার ফল, মানুষ যে কেন সে শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ছেলেদেব দলে দলে স্কুলে পাঠাচ্ছেন, তাই বুঝে উঠতে পারছি না। যাই দেখি কর্তার কাছে, তিনি কি ব্যবস্থা করেছেন! ছেলেব যা অবস্থা দেখতে পাচ্ছি তাতে আবার বউমাই বা কি বলেন, তাই বা কে জানে?

(যোগেনেব প্রবেশ)

যোগেন। মা, দাদা নাকি শহরে যাচ্ছেন?

হেমলতা। হ্যাঁ বাবা, সে কারো মানাই শুনলে না। কর্তা তাকে বিষয় দেখতে বলেছিলেন, তা নাকি তাব ভাল লাগে না, সে শহবেই যাবে। তা যাক্, তুমি না হয় এখন বিষয় দেখো, কর্তাকে একটু বিশ্রাম দাও।

যোগেন। দাদা যদি বিষয় না দেখেন, তবে আমিই বিষয় দেখবো। দাদা শহরে যেতে চাচ্ছেন, বাবা তাঁকে বাধা দিচ্ছেন কেন? তিনি যদি ওকালতী কবাই ভালো মনে করেন, তবে তাই করুন না, তাতে ক্ষতি কি?

(গার্গীর প্রবেশ)

গার্গী। ক্ষতি আছে রে, যথেষ্ট ক্ষতি আছে। শহরে গেলেই যে দাদা আর দাদা থাকে না, পর হয়ে যায় বে, সে পর হয়ে যায়! বাংলা উচ্ছন্নে গেল। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই—এ শহরেই করে বে, শহরেই করে!

যোগেন। শহরেই কি বাংলার সর্বনাশ করছে মা?

গার্গী। হ্যাঁ বাবা, তাই! সোনার সংসার ছারখার এই শহরেই করে রে, এই শহরেই করে! বাপ-দাদার নাম লোপ পাচ্ছে, পিতৃপুরুষের বাস্তু ভিটাখানি পর্যন্ত উচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে, ভবিষ্যদ্বংশধরগণ হা-অন্ন হা-অন্ন করে চীৎকার করে মারা যাচ্ছে! বাংলা ফকির হবার একমাত্র কারণ গ্রাম ছেড়ে শহরে যাওয়া।

হেমলতা। মা এসেছ! এদের একটু ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে যাও, আমরা এদের বোঝাতে পারলাম না।

গার্গী। সে দোষ তো মা তোমাদেরই, কোলের ছেলে কোল-ছাড়া করে দাও কেন? যদি বুকে করে রাখতে, তবে কি আজ আর ছেলে অবাধ্য হতে পারতো? শুধু লেখাপড়া শেখালেই ছেলে মানুষ হয় না, তার সাথে আরো অনেক চাই, তা শেখাবার ভার পিতা-মাতার উপরে। তা তো করো নি, তাই আজ ছেলের অবাধ্যতার যাতনা ভোগ করতে হচ্ছে।

হেমলতা। সে ভুল মা বেশ বুঝতে পেরেছি। বর্তমান শিক্ষার পরিণাম যে এই, তা পূর্বে বুঝতে পারলে কি আজ এমন হয়?

গার্গী। বহুদিন থেকেই তো বাবা তোমাদের সকলের দ্বারে দ্বারে একথা চীৎকার করে বলে বেড়াচ্ছেন, কই, কেউ তো সে কথা শুনেও শুনছেন না! অনেকে হয়তো বাতুল বলেই তাঁকে উপহাস করছেন।

হেমলতা। হাঁ, তিনি কর্তার সাথে অনেক সময় এই বর্তমান শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

গার্গী। আপনার কর্তা তো বাবারই একজন প্রিয় শিষ্য, তাই তিনি ছেলেকে শহরে যেতে নিষেধ করছেন। তিনি আমাদের আশ্রমে প্রায়ই যান। দেশের বর্তমান অবস্থার কিসে পরিবর্তন হবে, বাবার সাথে এ সম্বন্ধে অনেক কথা হয়।

যোগেন। আমার বাবা কি আপনার বাবার শিষ্য?

গার্গী। হ্যাঁ। অবাক হলে নাকি? শুধু তোমার বাবাই নন, এ দেশের কর্মী প্রায় সকলেই তাঁর শিষ্য। আজ এই স্বর্ণপুরে যা কিছু দেখতে পাচ্ছ, এ সকল তাঁরই উপদেশে হচ্ছে। একবার দেখা করো, মনের অনেক গলদ কেটে যাবে।

যোগেন। অনেকদিন থেকেই ভাবছি একবার দেখা করবো, কিন্তু সময়ই করে উঠতে পারছি না।

গার্গী। তোমাদের সকলের মুখেই ঐ এক কথা। সময় তো যথেষ্টই খরচ হয়ে যাচ্ছে, কেবল কাজের বেলায়ই তোমাদের সময় হয়ে ওঠে না। সময় করে একবার যেও, স্কুল-কলেজে যা শিখেছ তার চেয়ে অনেক বেশী শেখবার আছে সেখানে। ঐ

যে দেখছ পাগলের মতন যা-তা বলে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান, উনি হচ্ছেন একটি রত্নের খনি। ওঁকে চেনা বড় সহজ নয়, তাই বাবা অনেক সময় গেয়ে থাকেন—

(গীত)

গার্গী। এ ভবে পাগল চেনা বিষম দায়।
পাগলের তত্ত্ব ভবে ক'জন পায়?
ছিল পাগল গৌরাঙ্গ,
নিতাই তাঁর সাঙ্গ-পাঙ্গ,
বলে গেলেন সাধনার কি
মধুর প্রসঙ্গ;
আজ নেড়া-নেড়ি সে প্রসঙ্গ,
উল্টো করে উল্টো ধায়॥
আর একটা শ্মশান শয্যায়,
বক্ষে রেখে মাগীর পায়,
জ্ঞানদাতা জ্ঞান দিচ্ছেন
জীবমাত্রে সবায়;
বোঝে কি দীন ভারতবাসী,
শক্তি মহাশক্তির পায়॥

(প্রস্থান)

যোগেন। মা, ইনি কে? এমন তেজস্বিনী মেয়ে তো আমি আর কখনো দেখি নি! ইনি কি দেবী?

হেমলতা। হ্যাঁ বাবা, ইনি দেবীই বটেন। যে মহাপুরুষের নাম ইনি করে গেলেন, ইনি তাঁরই মেয়ে, নাম গার্গী। বাউল ঠাকুর আদর্শ গৃহিণী তৈরী করার জন্য একটি মেয়ে-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই গার্গীর উপরেই তিনি মেয়েদের শিক্ষার ভার ন্যস্ত করেছেন।

যোগেন। এ আশ্রমে আমায় একদিন যেতেই হবে।

হেমলতা। আমায়ও সাথে নিয়ে যাস্। আমি মাঝে মাঝে সেখানে যাই। কর্তা তো প্রায় সব সময় সেখানেই থাকেন। বাউল ঠাকুরের অক্লান্ত পরিশ্রমে সত্য সত্যই এই স্বর্ণপুর আজ স্বর্ণপুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইনি যখন যেতে বলে গেলেন, তখন একবার যাস্।

(প্রস্থান)

যোগেন। পাগলী কি বলে গেল? শহরই বাংলার সর্বনাশ করছে, চিন্তার বিষয় বটে! যাই দেখি একবার দাদার কাছে, তিনি কি বলেন!

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—নন্দলালের বৈঠকখানা।

(নন্দলাল, ম্যানেজার, বাউল ও যোগেন)

ম্যানেজার। ডাক্তারবাবু যা বলে গেলেন, তা শুনলেন তো? কিছুদিন কলকাতা গিয়ে থাকাই আমি সঙ্গত মনে করি।

নন্দলাল। আমার মন যে কিছুতেই এগুচ্ছে না!

ম্যানেজার। প্রাণটা বাঁচাতে হবে তো! না গেলে চলবে কেন?

নন্দলাল। তিনি ঔষধ দিয়ে যান না কেন, এখানে বসেই বেশ খাওয়া যাবে!

ম্যানেজার। তাতে তাঁর কোন আপত্তি নেই। তিনি বলেন—আমার কিছুদিন রোজই একবার করে দেখতে হবে, তাই কলকাতা যাওয়া প্রয়োজন। আমাকে এখানে রাখতে হলে দৈনিক পাঁচশ, টাকা করে দিতে হবে, আর কলকাতা গেলে ষোল টাকাতেই চলতে পারে। এখন আপনি যা ভাল মনে করেন, তা করতে পারেন।

নন্দলাল। তাও তো বটে! কিন্তু দেশের সকলেরই ইচ্ছা যাতে আমি কলকাতা না যাই।

ম্যানেজার। কলকাতা না গেলে এখানে বসে আপনার সুচিকিৎসা কিছুতেই হবে না।

(বাউলের প্রবেশ)

বাউল। কেন হবে না? না হবার কারণ কি বলতে পারো? নন্দ, এই কারণ কি বলতে পারো? নন্দ এই স্বর্ণপুরের জমিদার, তার এখানে অভাব কিসের? এখানে বসেই তার সব হতে পারে। কবিরাজেই যথেষ্ট হতো, ডাক্তার এনেছ—তা বেশ করেছ। কতগুলি টাকার পাখা হয়েছিল, তারা উড়ে কলকাতা চললো। এই রাজ্যটা সমেত উড়িয়ে আর কলকাতা নিয়ে লাভ কি বাবা?

নন্দ, তোমার এই শনিঠাকুরটিকে তোমার কাঁধ থেকে নামাও, তা না হলে ইনি তোমার ভিটে-বাড়ি পর্যন্ত উচ্ছন্ন করবেন, দেখতে পাচ্ছি !

নন্দলাল। আপনারা দেখছি সকলেই এর উপর খড়্গহস্ত ! আমার কি একটা হিতাহিত জ্ঞান নেই ? উপযুক্ত কর্মচারী বলেই তো একে আমি আমার স্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত করেছি।

বাউল। হ্যাঁ, খুব উপযুক্ত কর্মচারীই রেখেছ ! ইনি যখন যার স্কন্ধে চেপেছেন, তার ভিটেয় ঘুঘু না চরিয়ে ছাড়েন নি। কিছুদিন পরেই টের পাবে।

নন্দলাল। আমাদের গায়ে পড়ে এসে উপদেশ দেওয়াটা আমি মোটেই পছন্দ করি না ; আমার ভালো আমি নিজেই ঠিক করে নিতে পারবো। ম্যানেজার, তুমি আজই কলকাতা যাবার আয়োজন করে ফেলো। এ সব পাগলের দল আমার কানটা ঝালাপালা করে দিলে !

ম্যানেজার। যে আজ্ঞে ! (প্রস্থান)

বাউল। আচ্ছা ভাই চললাম, আর কখনো তোমায় কোন কথা কইতে আসবো না।

(গীত)

মা এ কি মজার খেলা তাস,
পেতেছে এ ভবের খেলায়।
বেঁটে মা আপন হাতে,
রং সব রেখেছ হাতে,
বদ্ রং বাজারে দিলে,
দেখে পেল হাস ॥
হবে বলে সাত তুরুক,
দু'খানা রং-এ বেঁধেছ মুখ,
ছ' রং-এ করেছ তুরুক,
হয়, সাধে কি হতাশ ॥
কে বোঝে মা তোমার বাজী,
কারে কি ভাবে করো রাজী,
পাঁচ-দশে পঞ্চাশের বাজী,

ফেরাই দিচ্ছে পাশ ॥
কেন কর এত ছলনা,
মুকুন্দে দিচ্ছ যাতনা,
যাবে মা যাবে জানা,
পেলে হাতের পাঁচ ॥

(প্রস্থান)

(যোগেনের প্রবেশ)

যোগেন। দাদা, আপনি নাকি শহরে যাচ্ছেন?

নন্দলাল। হ্যাঁ ভাই, স্বাস্থ্যটা বড়ই খারাপ হয়ে পড়েছে।

যোগেন। তার জন্যে কলকাতায় যাবার প্রয়োজন কি? এখানে থেকে চিকিৎসা করলেই তো হতো!

নন্দলাল। ডাক্তার কলকাতা যেতে বলেছেন। তারপরে এখানে লোক থাকে কি করে? নানারকম অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। পয়সা থাকতে কে ভাই এ সব সহ্য করে? আমার ইচ্ছা আর এখানে থাকবো না, বছরের প্রায় সব ক'টা দিনই কলকাতায় কাটিয়ে দেবো। প্রয়োজন মত মাঝে মাঝে বাড়ি আসবো।

যোগেন। এখানে আপনার এমন কি অসুবিধা হচ্ছে সেইটাই বুঝে উঠতে পারছি না। যদি কিছু অসুবিধা হয়ও, তা টাকা খরচ করলে অল্প দিনেই সে অসুবিধা দূর করে নিতে পারেন।

নন্দলাল। তোমাদের যেমন আক্কেল! সংসারের চাপ এখনো ঘাড়ে পড়ে নি কিনা, তাই কিছুই টের পাচ্ছ না। বাবা মরে গেলেই সব বুঝতে পারবে। দেশের কিছু খবর রাখো কি? বিশ বছর পূর্বে এখানে কি ছিল, আর এখন কি হয়েছে! পূর্বে যে কাজ চার আনায় হতো, এখন সে কাজ এক টাকায়ও হতে চায় না। আর সে কাজ করবারও ছাই লোক আছে? সব ব্যাটার কৌলীন্য যেন একসঙ্গে জেগে উঠেছে। টাকা নিয়ে সাধাসাধি করলেও লোক পাবার যো নেই। ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার সব ব্যাটারই যেন ল্যাজ ফুলে গেছে; খেতে পায় না, কিন্তু অপমান-বোধটুকু বেশ আছে।

যোগেন। বর্তমান সময়ে জগতের যে অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে এখন কাউকে চোখ রাঙিয়ে কাজ করাবার যো নেই, সেদিন চলে

গেছে। এই বিংশ-শতাব্দীর জাগরণে সকলেরই চোখ খুলে গেছে। এখন কোন জাতিই তার জাতের বৈশিষ্ট্য নষ্ট করতে প্রস্তুত নয়। এইটে উঠবার যুগ কিনা, তাই সকল জাতির ভিতরেই একটা স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। তারপরে যাদের আমরা এতদিন পদদলিত করে চলেছি, তারাই হচ্ছে আমাদের জাতির মেরুদণ্ড। ওদের উঠতে দিলে আজ আমাদের হাবার মতন পরের মুখের দিকে চেয়ে 'দুটি অন্ন দাও, অন্ন দাও' বলে চীৎকার করতে হতো না। বলি শহরে যে যাবেন, সেখানে টাকা আসবে কোত্থেকে?

নন্দলাল। কেন, জমিদারী থেকে?

যোগেন। জমিদারী থেকে টাকাটা জুটবে কি করে তাই ভাবছি!

নন্দলাল। ম্যানেজার আর নায়েব রইলেন, তাঁরাই টাকা আদায় করে পাঠাবেন; এ সহজ কথাটাও বোঝ না! লেখাপড়া শিখেছিলে কেন বলতে পারো?

যোগেন। তারাও যে শহরে যেতে চাইবে! তবে চাকুরীর লোভে যদি না যায়। কিন্তু কোনরকমে কিছু টাকার সংস্থান করতে পারলে তারাই কি আর এই গাঁয়ে পড়ে মরতে চাইবে! তবে গরীব প্রজাগুলো, ওদের শহরে যাবার ইচ্ছা হলেও তা যেতে পারবে না, এখানেই থাকবে, জ্বর-জ্বালায় ভুগবে, জমিও চষবে, আবার খাজনার টাকাও দেবে।

নন্দলাল। তোমরা সব আজকালকার ছেলে কিনা, ভাবের ঘোরেই ঘুরে বেড়াও। নিজের প্রানটা আগে বাঁচাও, তার পরে পরের ভাবনা ভেবো।

যোগেন। তা আপনি শহরে গিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাতে পারেন; কিন্তু আমি আমার এই সহস্র ভাইকে ফেলে একা প্রাণ বাঁচাতে ইচ্ছা করি না; আমি এই পাড়াগাঁয়েই থাকবো, দেখি এই পাড়াগাঁকেই আবার শহরে পরিণত করতে পারি কি না, গাঁয়ের শ্রী ফিরাতে পারি কি না! এখানে অসুবিধা যথেষ্ট আছে তা আমি স্বীকার করি, কিন্তু আপনি তো আর সেই জন্যে শহরে যাচ্ছেন না! আপনার ভিতরে রয়েছে বিলাসিতার আকাঙ্ক্ষা, তা কি আর এই পাড়াগাঁয়ে তৃপ্ত হতে পারে? তাই আপনার শহর চাই। কিন্তু

মনে রাখবেন, এই পাড়াগাঁয়েই আবার শহুরে বাবুদের শেষ বিশ্রাম নিতে হবে। (প্রস্থান)

নন্দলাল। কি বেয়াদব! আজকালকার ছেলেগুলো গুরুজনদের সাথে কেমন করে কথা কইতে হয়, তা পর্যন্ত শেখে নি! যাক্, আমাকে যখন আজই কলকাতা রওনা হতে হবে, তখন আর সময় নষ্ট করা ঠিক নয়; যাবার জন্য প্রস্তুত হই গে। সকলেরই অমতে চলেছি, কে জানে, ভাল করছি কি মন্দ করছি! (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—গার্গীর বিদ্যালয়।

(গার্গী, ছাত্রীগণ, বাউল, কিশোরীলাল ও যোগেন)

(গীত)

ছাত্রীগণ। কি আনন্দধ্বনি উঠলো বঙ্গভূমে,
বঙ্গভূমে, বঙ্গভূমে, বঙ্গভূমে,
ভারতভূমে॥
আনন্দে আনন্দধামে,
হচ্ছে বেচা-কিনি,
দেশী ধুতি দেশী চিনি,
এইমাত্র শুনি,
বিদেশী আব কি কিনি॥
জেগেছে ভারতবাসী,
আর কি মানা শোনে,
লেগেছে আপন কাজে,
যার যা নিচ্ছে মনে,
মায়ের নামের গুণে॥

মায়ের কৃপায় পেলেম ফিরে
চরকা হেন ধনে,

তাই দিদি রেখেছি আমি

অতি সযতনে,

আমার চরকা ধনে ॥

চরকা আমার পিতামাতা,

চরকা বন্ধু সখা,

চরকায় ভাত কাপড় পরি,

জোড়ায় জোড়ায় শাঁখা,

চরকা প্রাণের সখা ॥

হাতের কঙ্কণ নাকের বেসর,

পরি ঢাকাই শাড়ী,

সুতো কেটে পরেছি এবার,

হাতীর দাঁতের চুড়ী,

চরকা আর কি ছাড়ি ॥

মুকুন্দদাসে বলে,

ভাল সুযোগ পেলে,

দিদিরা সব ধর চরকা

মাতরম্ বলে,

হবে সুখ কপালে ॥

(গার্গীর প্রবেশ)

গার্গী ! তোমরা সকলেই এসেছ ?

ছাত্রীগণ। হ্যাঁ দিদি, আমরা সকলেই এসেছি ।

গার্গী। আচ্ছা বেশ, এস এখন আমরা কাজ আরম্ভ হবাব পূর্বে একবার ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে নিই !

(মিলিত গীত)

প্রণমি তোমার, প্রণমি তোমারে,

প্রণমি তোমারে ।

সম্মুখে পশ্চাতে নমি,

নমি তোমায় বারে বারে ।

ধূলার মাঝে তোমায় নমি

দিগন্তের দূর পারে,

শৈল-শিরে তোমায় নমি,
নমি নীল পারাবারে,
প্রণমি তোমারে।
ফুলের রূপে তোমায় নমি,
নমি শ্যাম তৃণভারে,
মেঘের ছায়ায় পায়ে নমি,
নমি স্নিগ্ধ বারিধারে,
প্রণমি তোমারে॥
অনিলে অনলে নমি,
নমি রবি-চন্দ্রমারে,
অশনিতে তোমায় নমি,
নমি ফুল্ল তারা-হারে,
প্রণমি তোমারে।
সুদূর অনাগতে নমি,
নমি পুণ্য অতীতেরে ;
আজিকার এই সুখে দুঃখে
নমি তোমায় বারে বারে,
প্রণমি তোমারে॥
জন্ম-মৃত্যু মাঝে নমি,
নমি বুকের রক্তধারে,
মিলনেতে তোমায় নমি,
বিরহের ব্যথা ভারে,
আশা দিয়ে তোমায় নমি,
স্মৃতির দগ্ধ ধূপাধারে,
ধৈর্য বীর্য মাঝে নমি,
নমি গো পুরুষকারে,
প্রণমি তোমারে॥

মন্দাকিনী। দিদি, আমরা সংসার-সমুদ্রে নিমগ্ন রয়েছি, আমাদের আশ্রয় কি ?

গার্গী। আজ বুঝি আবার পাগলামী উঠলো ? একদিনই তো বলেছি যে, জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হবে না, কর্তব্য করে যাও।

ভিতরে যে দেবতা আছেন, তিনিই সব জানিয়ে দেবেন। বাবা বলেছেন—ভারতবাসীকে ধর্মোপদেশ দেবার প্রয়োজন করে না, কারণ, ভারতবাসী ধর্ম নিয়েই জন্মায়, ঐটে নাকি ভারতবাসীর পৈতৃক সম্পত্তি। কর্মহীন ভারতে এখন কর্মের গীতই গাইতে হবে, তার কথাই বলো। তবে এইটে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, কর্ম যেন আমাদের ধর্মকে বাদ দিযে না হয়, বিশ্বনাথের পাদপদ্মরূপ দীর্ঘ নৌকাই যেন আমাদেব কর্মসাগব পাব হবাব একমাত্র আশ্রয় হয।

মন্দাকিনী। সংসারে আবদ্ধ কে দিদি?

গার্গী। যে বিষযানুরাগী সে-ই প্রকৃত আবদ্ধ জীব।

মন্দাকিনী। মুক্তি কি?

গার্গী। বিষয়ে বিরাগই মুক্তি। তবে কিনা আজকাল আমাদের দেশে অনেক বিরাগী পুরুষ দেখতে পাওযা যায, যাঁদের বিষয় বলতে কিছুই নেই। এ সকল বিবাগী কিন্তু মুক্ত নন, তাঁদের ভিতবে বাসনা যথেষ্টই আছে, সে বাসনা পূর্ণ করবার যোগ্য ক্ষমতা নেই বলেই তাঁরা বিবাগী সেজেছেন। ভোগেব মাঝে থেকে যিনি ত্যাগ করতে পেরেছেন, তিনিই প্রকৃত বিবাগী।

মন্দাকিনী। স্বর্গ কি দিদি?

গার্গী। এক কথায় বোঝাতে চেষ্টা করবো, না, অনেক কথা কইতে হবে?

মন্দাকিনী। না, এক কথাযই বলুন।

গার্গী। বাসনা-ক্ষয়।

মন্দাকিনী। কিসে সংসাব-বন্ধন ঘোচে?

গার্গী। শ্রুতিসম্মত আত্মজ্ঞান দ্বারা।

মন্দাকিনী। সংসারে সুখে থাকে কে?

গার্গী। সমাধিনিষ্ঠ ব্যক্তি যে।

মন্দাকিনী। সাধু কে?

গার্গী। সমস্ত বিষয়ে যিনি বীতরাগ হয়েছেন, যিনি মোহশূন্য এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ, তিনিই প্রকৃত সাধু।

মন্দাকিনী। কিসে স্বর্গলাভ হয়?

গার্গী। জীবের প্রতি অহিংসায়।

মন্দাকিনী। সংসারে কাকে প্রিয় করতে হবে?

গার্গী। ভগবত-চরণে ভক্তিই যেন তোমাদের সবচেয়ে বেশী প্রিয় হয়।

মন্দাকিনী। প্রকৃত জীবন কিরূপ?

গার্গী। যাহা দোষ-বিবর্জিত, তাহাই প্রকৃত জীবন।

হেমা। কে জগৎ জয় করতে সক্ষম?

গার্গী। যে মহাপুরুষ আপন মনকে জয় করতে পেরেছেন, একমাত্র তিনিই জগৎ জয় করতে সক্ষম।

হেমা। বীর অপেক্ষা প্রকৃত বীর কে?

গার্গী। যিনি সংযমী, তিনিই প্রকৃত বীর।

হেমা। এ জগতে ধন্য কে দিদি?

গার্গী। যিনি পরোপকারী, তিনিই ধন্য।

হেমা। সংসারে পূজনীয় কে?

গার্গী। যাঁর শিবতত্ত্বে নিষ্ঠা আছে।

নিরু। বর্তমান সময়ে আমাদের কর্তব্য কি, তা আপনি আমাদের দয়া করে বলে দিন!

গার্গী। জগৎ জুড়ে আজ যে দুঃখ-দেবতার প্রচণ্ড লীলাখেলা চলছে, তার ভীষণ আবর্তে আমাদের ভারতবর্ষ যে পড়ে নেই, এমন নয়। ফ্রান্সের এন্ ও ওযাজ নদীর তীরে উভয় সভ্য জাতির সংঘর্ষে নর-রক্তের নদী বয়ে গেছে দেখে জগৎ শিউরে উঠেছিল। কিন্তু এ কথা কি কেউ ভেবে দেখে যে, এক ভারতবর্ষে কোন মানুষের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে নয়, যমের সাথে যুদ্ধ করতে প্রতি বৎসর আশী লক্ষ লোকের পরমায়ু ফুরিয়ে যাচ্ছে! কথাটা বলতে আমাদের প্রাণ তো শিউরে ওঠেই, পরন্তু আমাদের রাজ-প্রতিনিধি লর্ড রোনাল্ড্‌সে বাহাদুরকে এ কথা বলবার সময় খুব সম্ভব চমৎকৃত হতে হয়েছিল। তাই তিনি এ দেশের আবহাওয়ার উৎকর্ষ সাধনের জন্য দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিধিনির্বন্ধ, আমাদের দেশের পুরুষগণ বলেছেন, এর প্রতিকার বর্তমানে অসম্ভব। এই অসম্ভবকেই আমাদের সম্ভবে পরিণত করতে হবে। ইহাই আমাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত।

নিরু। কী করে তা আপনি সম্ভব করবেন?

গার্গী। ভয় পেও না দিদি! আমরা মায়ের জাতি, এ জাতিটাকে এখন

আমাদের জাগিয়ে তুলতে হবে। স্তন্যপানের সঙ্গে সন্তানকে আমরা কর্মমন্ত্রে দীক্ষিত না করা পর্যন্ত এ দেশে কর্মীদের সৃষ্টি হবে না। তাই ঘরে ঘরে গিয়ে মা সকলকে বলে দাও, দেশ এখন কর্মবীর চায়। বীর-প্রসবিনী জননীগণ—জাগো! দুঃখ-দেবতার হাত থেকে ভারতকে রক্ষা করতে হবে তোমাদেরই; জগৎকে বিস্মিত করে দাও তোমাদের মাতৃশক্তির জাগরণে।

(বাউলের প্রবেশ)

বাউল। গার্গী!

গার্গী। বাবা!

বাউল। কাকে জাগানো হচ্ছিল মা?

গার্গী! ভারতের মাতৃশক্তিকে জাগাবার কথা হচ্ছিল।

বাউল। হ্যাঁ, মা, জাগিয়ে তোল। মা না জাগলে তো ছেলে জাগবে না—গার্গী, মায়েদের জাগিয়ে তোল।

(গীত)

মায়ের জাতি জাগিয়ে তোল।
সকল কাজের ঐ তো গোড়া,
আজ ভেঙ্গে দে রে তাদের গোল॥
না জাগিলে সবার প্রাণ,
পোহাবে কি রজনী;
নাম ধর দয়াময়ী,
দয়া কি মা আছে তোর?
দয়া থাকলে মরে কি আজ,
ত্রিশকোটী ছেলে তোর।
মরি তাতে ক্ষতি নাই,
বাসনা মা দেখে যাই,
ভারতের ভাগ্যাকাশে,
উঠিছে দিনমণি॥
নিবেদিলাম তব পায়,
ঠেল না পায় তারিণী,
ছেলের কথা চিরকাল,
রাখে জানি জননী;

মুকুন্দের কথা রাখো,
করুণা-নয়নে দেখো,
অকূলে পড়েছি মোরা,
তার দীন-তারিণী ॥

বাউল। এখন বুঝতে পেরেছিস মা ?

গার্গী। হ্যাঁ বাবা, এখন বেশ বুঝতে পেরেছি।

বাউল। আচ্ছা, আমি এখন যাই, কিশোরীবাবু আর তাঁর ছেলে যোগেনের আজ তোমার বিদ্যালয় দেখতে আসবার কথা। যদি তাঁরা এসে থাকেন, তবে তাঁদের দু'জনকে নিয়ে আমি আবার আসবো। ও, কিশোরীবাবু এসে পড়েছেন!

(কিশোরীলাল আর যোগেনের প্রবেশ)

বাউল। আসতে আজ্ঞা হয়! হেমা; তোমার মোজার কল কেমন চলছে ?

হেমা। খুব ভাল চলছে, আমি এখন মাসে কুড়ি টাকা পাই।

বাউল। নিরু, তোমার তাঁত কেমন চলছে মা ?

নিরু। খুব ভালই চলছে।

বাউল। এতে যা পারিশ্রমিক পাও, তাতে তোমার দিন চলে যায় তো ?

নিরু। হ্যাঁ, কিছু কিছু সঞ্চয়ও হচ্ছে।

বাউল। মা, যাঁরা সুতো কাটছেন, তাঁরা এখন কত করে পান ?

গার্গী। তাঁদেরও মাসে এখন বারো টাকার মত দিচ্ছি। যাঁরা রুমাল জামা তৈরী করেন, তাঁরা প্রায় ত্রিশ টাকার উপরে পান।

বাউল। অন্যান্য কাজ যাঁরা করেন, তাঁদের অবস্থা কি ?

গার্গী। আমাদের এখানে যিনি যে কাজ করছেন, তাঁর সংসারই বেশ চলে যাচ্ছে, কারো কোন অভাব আছে বলে শুনছি না।

বাউল। বেশ বেশ, খুব আনন্দের কথাই বটে!

গার্গী। যাঁরা জিনিসগুলি বাজারে নিয়ে বিক্রী করেন, তাঁদের বাহাদুরীই সব চেয়ে বেশী। হরেন দাদা আর রমেশ দাদা খুবই পরিশ্রম করছেন। তাঁরা শুধু বাজারে নয়, বাড়ি বাড়ি গিয়ে জিনিস বিক্রী করেন। আমাদের হাতের তৈরী জিনিস বলে ভদ্রলোকেরা খুবই আগ্রহ করে নেন।

বাউল। তাঁদের ছু'জনকে এখন কত টাকা করে কমিশন দিচ্ছ?

গার্গী। প্রায় ছু'শ' টাকার মতন তাঁরা ছু'জনে পান।

বাউল। হ্যাঁ, তা না হলে তাদের পোষাবেই বা কেন? বি. এ. পাস করা ছেলে, যদি একশ' টাকাও মাসে আয় করতে না পারে, তবে এ কার্যে আসবেই কেন?

কিশোরীলাল। এ যাতে দেশময় প্রচার হয়, সেজন্য আমি আমার সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ দান করতে ইচ্ছা করছি, আপনি তা গ্রহণ করলে আমি বড়ই আনন্দিত হবো!

বাউল। এ তো আর আমায় দেওয়া হচ্ছে না! দেশকে দান করা হচ্ছে! দেশ তা সানন্দে গ্রহণ করবে। তোমার মত স্বদেশভক্ত সন্তান যেদেশে জন্মেছে কিশোরী, সে দেশ ধন্য হয়ে গেছে। আশীর্বাদ করছি, ভগবান তোমার মঙ্গল-ইচ্ছা জয়যুক্ত করুন!

কিশোরীলাল। এতে ছেলেদেরও উপার্জনের একটা পথ করে দেওয়া হয়েছে, আপনি ছেলেদের ডেকে একথা বলে দিন।

বাউল। ডাকতে কি আর কম করছি কিশোরী? ডাকবো কি? ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে গেলাম।

(গীত)

ডাকবো কি শুনবে কে রে,
আছে কি কারো কান?
পাবো কি এমন ছেলে,
দেশের লাগি কাঁদে প্রাণ॥
দেশ বিদেশে ঘুরে ঘুরে
কত ভাবের গাইনু গান।
সে গান শুনলে না কেউ,
বুঝলে না কেউ,
কোন্ সুরেতে ধরছি তান॥
আমরাই নাকি বিশ্ব মাঝে,
বিশ্বপতির শ্রেষ্ঠ দান,
আজ, উপোস করে দিন কাটাচ্ছি,
থাকতে মোদের ক্ষেতে ধান॥
ভাব-সাগরে বইছে হাওয়া,

কাল-সাগরে ডাকছে বান,
এখনো হাল ছেড়ে দে,
ঢেউ কাটিয়ে,
পার হয়ে যাক্ তরীখান ॥
(মাগের নামে জয় দিয়ে রে)

বাউল। তার পর ক্ষেত্র বড় না হলে ছেলেদের ডেকেই বা কি হবে? শুধু ডেকে ডেকে স্কুল-কলেজ থেকে বের করে তাদের রাস্তায় দাঁড় করালেই তো হবে না, কাজ দিতে হবে তো! তুমি যখন এ কার্যে ব্রতী হলে, এখন আমি ডাকতে পারবো।

কিশোরীলাল। আমার মনে হয়, যাতে এ কাজ দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তার জন্য এখন আমাদের উঠে-পড়ে কাজে লাগা দরকার।

বাউল। সে তো লাগতেই হবে, তুমি এ কার্যে ব্রতী হলে এমন অনেক বিদ্যালয় তুমি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। আমার ইচ্ছা, তুমি এ কার্যের অগ্রদূত হও, কিশোরী!

কিশোরীলাল। কী করে কাজ আরম্ভ করতে হবে বলে দিন!

বাউল। পাঁচটি গ্রাম নিয়ে একটি সভা করে হিন্দু-মুসলমান দু'ভাইকে ডেকে এর উপকারিতা সকলকে বুঝিয়ে কাজ আরম্ভ করতে হবে শুধু কাপড়, গেঞ্জি, মোজা, জামা তৈরী করলেই হবে না, আমাদের সংসারে যে সকল জিনিসের প্রয়োজন, তা সবই আমাদের ঘরে তৈরী করার ব্যবস্থা করতে হবে, যেন কোন কিছুর জন্য আমাদের বাজারে যেতে না হয়। শুধু বললেই হবে না, বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজ আরম্ভ করিয়ে দিতে হবে, সকলকে কাজ করতে বাধ্য করতে হবে। এরই নাম Home Industry বা গৃহ-শিল্প।

কিশোরীলাল। এ সকল কাজ করবার উপযুক্ত লোক চাই।

বাউল। এ বাংলাদেশে এখন আর লোকের অভাব কি? অনেক এম. এ. বি. এ. পাস করা ছেলে চাকুরী-চাকুরী করে হয়রান হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের ডেকে নাও, এতে তাদের একটা উপার্জনের পথ করে দেওয়া হবে। তারা গিয়ে লোকের দ্বারা কাজ করাবে, আর জিনিসগুলি সংগ্রহ করে বাজারে এনে বিক্রী করবে। শুধু এ দেশে নয়, বিদেশেও ঐ জিনিস বিক্রীর জন্য পাঠাবার ব্যবস্থা

করতে হবে, কারণ, বিদেশ থেকে টাকা আনতে না পারলে শুধু দেশের টাকায় দেশ অর্থশালী হবে না। ছেলেদের লাভের একটা বড় অংশ দিতে হবে, শুধু মাইনের টাকায় বা কমিশনে ছেলেদের পোষাবে না।

কিশোরীলাল। ছেলেদের দাঁড়াবার একটা স্থান করা প্রয়োজন।

বাউল। তা তো করতেই হবে, তা না হলে ছেলেরা কাজ করবে কি করে?

কিশোরীলাল। কিভাবে সে স্থান তৈরী করতে চান?

বাউল। ঐ পাঁচটি গ্রাম নিয়ে এক একটি "কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক" তৈরী করে ছেলেদের দাঁড়াবার জায়গা করতে হবে। ব্যাঙ্ক না হলে ছেলেরা কাজ করবে কি করে? শুধু বক্তৃতায় তোমাদের প্রোপাগাণ্ডা হবে না, ব্যাঙ্ক চাই। মনে রাখবে, আমাদের দেশের শস্যগুলি যাতে বিদেশে রপ্তানী না হয়, দেশেই রাখা যায়, তার ব্যবস্থা করে পরে অন্য কাজ। দেশকে যদি নিজের পায়ে দাঁড় করাতে চাও, তবে ঐ রকম ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করে তার সাথে বাণিজ্য যোগ করে দাও, আর চাই তার সাথে গৃহ-শিল্প। এ দু'টি পথ তুমি দেশকে ধরিয়ে দাও, এর পরে কি করতে হবে তা আমি তোমায় একটু ভেবে-চিন্তে পরে বলবো।

কিশোরীলাল। আমি আজ থেকেই এ কাজে লাগবো। আশা করি এ কাজ দেশময় ছড়িয়ে দিতে বেশী সময় লাগবে না। কারণ, যে পথে পয়সা উপার্জন করা যায়, দেশের লোক এখন সে পথেরই খোঁজ করছে, এ পথ ভদ্র-অভদ্র সকলেই ধরবে বলে আমার বিশ্বাস।

বাউল। আনন্দের সহিত ধরবে। কাজে নেমে দেখো কত আনন্দ পাবে। শুধু 'কাজ করো কাজ করো' বলে বক্তৃতা দিলেই মানুষ কাজ করবে না; তাদের পেটের যোগাড় করে কাজের কথা বলো, দেখবে তোমরা কাজের লোক কত পাও! খালি পেটে কি আর কাজ হয় কিশোরী? পেটে ভাত নেই, পরবার কাপড় নেই, তাতে 'কাজ করো কাজ করো' বলে চীৎকার করলে সে চীৎকার তারা শুনবে কেন? ও বক্তৃতা এখন তোমরা কিছুদিন রেখে দাও। ভারতবর্ষে বক্তৃতার শ্রাদ্ধ-সপিণ্ডকরণ হয়ে গেছে। অর্থোপার্জনের

পথ তৈরী করো, ছেলেরা অর্থশালী হোক। পেটের দায় থেকে তাদের মুক্ত করো, দেখবে তোমাদের কোন ইচ্ছা অপূর্ণ থাকবে না। তাই তো বলি কিশোরী—

(গীত)

সকল কাজের মিলবে সময়
কিছু ভাতের যোগাড় কর্ রে
তোরা পেটের যোগাড় কর্।
মানের গোড়ায় ছাই ঢেলে আজ,
কষে লাঙ্গল ধর্॥
ডেকে নে তাঁতী জোলা,
ছাড়িয়ে নেংটি তিলক ঝোলা;
খুলে দে আজ তাঁতের মেলা,
প্রতি ঘর ঘর॥
কামার কুমার চামার মুচি,
তারাই কাজের তারাই শুচি,
ধর্ জড়িয়ে গলা তাদের,
ভুলে আপন পর॥
এত সব যাদের ঘরে,
তারাও মরে উপোস করে,
তোদের কথা ভাবলে আসে,
কম্প দিয়ে জ্বর॥

কিশোরীলাল। তা হলে এখন আমি আসি! কাজ আরম্ভ করে আমি আপনাকে খবর দেবো।

বাউল। যাও, আশীর্বাদ করছি, মা তোমার মঙ্গল করুন! ছেলে তো শহরে গেছে। তা যাক্, বউটি বাড়িতে আনতে পারো কিনা, তার চেষ্টা করো। কোন ফল হবে বলে মনে হয় না, তবু চেষ্টা করে দেখা ভাল।

(প্রণাম করে কিশোরীলালের প্রস্থান)

বাউল। কি হে যোগেন! তুমি যে গেলে না?

যোগেন। আমি একটা কাজ আরম্ভ করেছি, তা আপনাকে জানাতে এসেছি।

বাউল। হ্যাঁ, আমি শুনেছি, তুমি নাকি কৃষিক্ষেত্র তৈরী করছ?

যোগেন। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার নিজের যা জমি আছে, তাতে আমার উদ্দেশ্য সফল হবে না, আরো কিছু জমি চাই।

বাউল। শুনেছি তোমার আরো কয়েকজন বন্ধু এ কাজে যোগ দিয়েছেন, তাঁরাও সব বি. এ. এম. এ. পাস করা ছেলে ?

যোগেন। আজ্ঞে হ্যাঁ, তাঁদের ইচ্ছা খুব বড় রকমের একটা কৃষিক্ষেত্র তৈরী করেন ; তাতে যা আয় হবে, তা দিয়ে বিদেশে গিয়ে কিছু কাজ শিখে আসা।

বাউল। সাধু ইচ্ছা ! তাঁরাও কি তোমার মতন এই দেশের সেবাই জীবনের ব্রত করে নিতে পেরেছেন ?

যোগেন। তাঁদের প্রাণ আমার চেয়েও উন্নত।

বাউল। খুব বড় করে একটা কৃষিক্ষেত্র তৈরী করি, এ আমারও ইচ্ছা, কিন্তু জায়গা পাই কোথায় ?

যোগেন। আমরা একটা জায়গার খোঁজ পেয়েছি, মীরপুরের জমিদার পাঁচ হাজার বিঘা জমি বিক্রয় করবেন।

বাউল। আনন্দের কথা ! তবে সেই জমিগুলিই খরিদ করে ফেলো !

যোগেন। টাকা কোথায় পাবো তাই ভাবছি !

বাউল। টাকার অভাব হবে না। তবে তোমার বন্ধুদের বলো, আমি যে লক্ষ্য নিয়ে চলেছি, তাঁদেরও সেই লক্ষ্য নিয়েই কাজ করতে হবে।

যোগেন। তারা সকলেই আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

বাউল। ওসব বড় কথা থাক্, গুরু-শিষ্য ও সব বাজে কথা, কাজ করলেই হলো। দেশকে বড় ভালবাসি, দেশের সেবা করলেই আমার আনন্দ ! যাক্, জমি খরিদ করতে কত টাকা লাগবে, সেইটে তুমি আমায় জানাও !

যোগেন। আনন্দম্ ! (প্রস্থান)

বাউল। নিরু। তোমরাও যাও। মায়ের ভোগ দিয়ে প্রসাদ পাও গে। আজকের বিদ্যালয়ের কাজ আমি এখানেই শেষ করলাম।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—নন্দলালের কলকাতার বাড়ি।

(নন্দলাল, ম্যানেজার, প্রমোদ, সুরেন ও সুরমা)

নন্দলাল। আমি কখনও কলকাতা আসি নি, এখন আপনারাই আমার ভাল-মন্দ যা কিছু সব দেখবেন।

সুরেন। আপনি যখন আমাদের পাড়ায় এসে বাসা নিয়েছেন, তখন আমরা আপনার খবর নিতে বাধ্য।

ম্যানেজার। আমাকে আজই স্বর্ণপুরে যেতে হবে, একমাত্র নায়েবের উপরে নির্ভর করে থাকা যায় না। হয়তো আমায় গিয়েই আপনার কাকাবাবুর সাথে মোকদ্দমায় লাগতে হবে। তাঁর হাত থেকে স্টেট বের করে না আনা পর্যন্ত আপনার কল্যাণ নেই।

নন্দলাল। যা ভাল মনে করো তাই করবে। দেখো, কাকা যেন অসন্তুষ্ট না হন বা অন্যায় কিছু করা না হয়।

ম্যানেজার। মোকদ্দমাই যদি বাধে, তবে ন্যায়-অন্যায় বিচার করে কাজ করা যাবে না; সত্য-মিথ্যা দুই নিয়েই মোকদ্দমা চালাতে হবে, একমাত্র সত্য নিয়ে মোকদ্দমা চলে না।

নন্দলাল। তাঁর সাথে গোল হবার কোন কারণই তো আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমি আসার সময় আমার যা কিছু সবই তিনি আমায় বুঝিয়ে দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন, তোমার যা সবই তোমায় বুঝিয়ে দিলাম; একমাত্র লোহার সিন্দুকের চাবিটা আমার কাছে রইল, তা তুমি ফিরে এলে দেবো। এখন তোমার স্টেট নিয়ে কোন গোল বাধলে সেজন্য দায়ী আমি নই, দায়ী তোমার কর্মচারিগণ।

ম্যানেজার। ওকথা তিনি মুখেই বলেছেন, কার্যে কতদূর করবেন তা না গিয়ে বলতে পারি না। প্রজারা সব তাঁরই বাধ্য; আমার মনে হয়, মহলগুলি সব এক জোট হয়ে যাবে।

নন্দলাল। তাই যদি হয় তবে তোমার কর্তব্য তুমি করবে। আমার খরচের

টাকা যেন সময় মত আসে। ডাক্তার বলে গেলেন, দু'মাস তো থাকতে হবেই, বেশীও হতে পারে।

ম্যানেজার। ওকথা না বললেও পারতেন; আমার তো একটা কর্তব্য বোধ আছে? আমার কর্তব্যের কোনরকম ত্রুটি পাবেন বলে আমি আশা করি না। তা হলে আমি আজ Evening Train-এই যাবার উদ্যোগ করি গে!

নন্দলাল। হ্যাঁ, আজই যাও, বিলম্ব করা ঠিক নয়।

ম্যানেজার। (নমস্কার করে) সুরেনবাবু! (দূরে সরে) আপনাকে যা বলেছি তা স্মরণ আছে তো? আপনারা একে মাতিয়ে তুলুন, যত টাকা লাগে আমি আছি।

সুরেন। তা আপনাকে আর বেশী বলতে হবে না। এ কলকাতায় যিনি আসেন তিনি কি আর আস্ত মানুষ দেশে ফিরে যেতে পারেন! আপনি মনের আনন্দে কাজ করুন; আমরা একে একেবারে সাবাড় না করে দেশে ফিরতে দিচ্ছি না। আমাদের টাকা যেন সময় মতন পাঠানো হয়, তা না হলে কিন্তু সব কাজ পণ্ড হয়ে যাবে!

ম্যানেজার। তা হবে, তা হবে। Good night!

সুরেন। Thank you, good night! (ম্যানেজারের প্রস্থান)

নন্দলাল। কি ব্যাপার, কি কথা হলো এতক্ষণ?

সুরেন। আজ্ঞে বেশী কিছু নয়; আপনার উপরে সর্বদা লক্ষ্য রাখবার কথাই বলে গেলেন। দেখুন, এই ম্যানেজারটি কিন্তু আপনার বেশ হিতাকাঙ্ক্ষী লোক!

(প্রমোদের প্রবেশ)

নন্দলাল। প্রমোদবাবু! আপনি না ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়েছিলেন? ঔষধ এনেছেন কি?

প্রমোদ। আজ্ঞে হ্যাঁ! এ-ই নিন। এর এ—ক আউন্স করে রোজ সন্ধ্যায় খেতে হবে।

নন্দলাল। পথ্যের কথা কিছু বলে দিয়েছেন কি?

প্রমোদ। হ্যাঁ, ভোরে চায়ের সাথে বিস্কুট কিংবা এক—টুকরো রুটি, মধ্যাহ্নে সুক্ত আ—র মাছের ঝোল দিয়ে ভাত।

নন্দলাল। আর রাত্রে?

প্রমোদ। গরম গরম লুচি আ—র মাংস। এ—রূপভাবে কিছুদিন খেলেই

নাকি ব্যারাম ভা-ল হয়ে যাবে। আ-জ্ঞে ; আ—মায় কিছু পুরস্কার দেবেন না ? এ—ই লাঠিখানা আ-মায় দিয়ে দিন না ?

নন্দলাল। এ আমার একজন বন্ধু আজই আমায় Present করেছেন।

প্রমোদ। তা—তা—তা আ—পনি বড়লোক মানুষ, আ—রো কত পাবেন। (লাঠিখানা হাতে নিয়ে) বাঃ, কি সুন্দর ! সুরেন ! দেখ তো কেমন হলো ?

সুরেন। বেশ হয়েছে।

প্রমোদ। হ্যাঁ-রে, মানিয়েছে কেমন তা-ই বলো না ?

সুরেন। বেড়ে মানিয়েছে—বেড়ে মানিয়েছে !

নন্দলাল। (ভ্রূ-কুঞ্চিত করে) তা হলে এখন আপনারা যান, সন্ধ্যায় আবার আসবেন।

সুরেন। আজ্ঞে হ্যাঁ, সন্ধ্যাও হয়ে গেছে। তা হলে আসি !

প্রমোদ। আ—জ্ঞে, এ—কটা কথা বলতে চাই, আ—পনি যখন বেশী লোকজন নিয়ে আসেন নি, তখন আ—মাদেরই সর্বদা আ—পনার কাছে থাকতে হবে। তা—ই বলছিলাম আমাদের খাবার ব্যবস্থাটা এখানে হলেই ভাল হয় না কি ?

নন্দলাল। তাই যদি মনে করেন, তবে আজ বিকেল থেকে আপনারা এখানেই খাবেন।

প্রমোদ। হা-হা-হা ! দেলখানা দরিয়ার মত না হলে কি বড় মানুষ হওয়া যায় ? আ—জ্ঞে, ত—বে এ—খন আসি ? (লাঠি নিয়ে প্রস্থান)

(সুরমার প্রবেশ)

সুরমা। ম্যানেজার তো চলে গেল। তোমায় যাদের হাতে রেখে গেল, তারা ভাল লোক বলে আমার মনে হয় না। এ ক'দিন আমি এদের হাবভাব লক্ষ্য করে আসছি, আমার মোটেই ভাল লাগছে না। আরো শুনছি এরা নাকি ম্যানেজারের আত্মীয় লোক। কথাটা সত্য কি ?

নন্দলাল। ম্যানেজার বলে গেল এরা দু'জন তার খুব বিশ্বাসী বন্ধু।

সুরমা। ম্যানেজার যা-ই বলুক না, এই কলকাতা আসাটা ভাল হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। এর ভিতরে ম্যানেজারের কিছু ষড়যন্ত্র আছে বলেই আমার মনে হচ্ছে। তুমি ঔষধ নিয়ে বাড়ি চলো।

নন্দলাল। তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? যদি ভাল মনে না করি, চলে যাবো !

সুরমা। যাবে বটে, সব শেষ না করে যাবে না। কাকাকে অবিশ্বাস করে সব কাজে ম্যানেজারের উপর নির্ভর করে বুদ্ধিমানের কাজ করো নি। এদের হাবভাব দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে। আমার মতে বাউল দাদাকে আসতে লিখে দাও,যতদিনআমরা কলকাতায় থাকবো, তিনি আমাদের কাছে থাকবেন।

নন্দলাল। তিনি কি আসবেন? আসার সময় তাঁকেও অনেক অন্যায় কথা বলেছি!

সুরমা। তিনি দেবতা; সেকথা হয়তো তাঁর মনেও নেই। আমাদের কিসে মঙ্গল হবে, তিনি সর্বদা সেই চিন্তাই করেন। তিনি আমাদের প্রজা বটেন, কিন্তু মনে হয় যেন একই সংসারের লোক। আমি যদি আসতে লিখি, তবে তিনি ছুটে আসবেন।

নন্দলাল। তাকে আনা-ই যদি ভাল মনে করো, তবে লিখে দাও। কিন্তু আসবেন কিনা সে সম্বন্ধে আমার ঘোর সন্দেহ আছে; অত্যন্ত স্বাধীনচেতা।

সুরমা। খাঁটি মানুষ স্বাধীনচেতা না হয়ে পারেন না। লিখলে ক্ষতি কি? আমি আজই তাঁকে পত্র লিখবো। চলো, এখন ভেতরে চলো, ঝি খাবার তৈরী করেছে। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—কিশোরীলালের বাড়ি।

(কিশোরীলাল, যোগেন ও বাউল)

কিশোরীলাল। যোগেন! নন্দ তো কলকাতা গেছে, তোমার দাদাও হুগলী গেছে, তুমি কি বাড়ি থাকাই স্থির করলে?

যোগেন। হ্যাঁ, আমি আপনার কাজগুলি সব নিজের হাতে নিতে চাই। আপনি আমায় আদেশ করবেন, আমি সেই আদেশ মত কাজ করবো।

কিশোরীলাল। উত্তম, তাই করিস্—এ খামার থেকেই আমি সব পেয়েছি রে; এ জমি চাষে যে কত আনন্দ তা কিছুদিন পরেই বুঝতে পারবি। চাকুরে বাবুদের ভবিষ্যৎ বড়ই দুঃখময়। যাদের খামার-জমি নেই, ক্ষেতের ধান বাড়িতে ওঠে না, তারা আর কিছুদিন পরে হা-অন্ন,

হা-অন্ন করে মারা যাবে। বর্তমানে ধান যার, মান তার। তাই খামার-জমিগুলি রক্ষা করার জন্য তোদের এত করে বলি!

যোগেন। হ্যাঁ, আমি তা বেশ বুঝতে পেরেছি। মাইনের টাকায় এখন আর চালের টাকাই হয় না, অন্য জিনিসের তো কথাই নেই। আচ্ছা বাবা! চালের দাম কি বরাবর এমনই থাকবে?

কিশোরীলাল। ইউরোপ যখন চাল খাওয়া শিখেছে, তখন চালের বাজার সস্তা হবার আশা করাই ভুল।

যোগেন। তা হলে প্রত্যেক গৃহস্থেরই কিছু খামার-জমি থাকা প্রয়োজন!

(বাউলের প্রবেশ)

বাউল হ্যাঁ যোগেন, ঐ কথাটা দেশকে খুব ভাল করে বুঝিয়ে দে, খুব ভাল করে বুঝিয়ে দে।

কিশোরীলাল। অসময়ে কি মনে করে?

বাউল। সুরমা কলকাতা থেকে আমায় তার করেছে। নন্দের পিছনে কতগুলো মন্দ লোক লেগেছে। হ্যাণ্ডনোট কাটা হচ্ছে, মদ আরম্ভ হয়ে গেছে, রাত্রে তিনি বাড়ি থাকেন না, যে সব লোক তাকে পেয়ে বসেছে, তাদের হাত থেকে উদ্ধার করতে না পারলে নন্দের নিস্তার নেই।

কিশোরীলাল। হ্যাঁ, কলকাতা শহরে কতগুলি রাজা-জমিদারের ছেলে আছে, যারা স্কুল-কলেজে যায় নামে মাত্র; রাত-দিন তারা গানের আড্ডায় আর থিয়েটারের মজলিসেই থাকে। ধনী নামে খ্যাত বলেই তাদের সর্বদা ধনের অনটন। হ্যাণ্ডনোট কাটতে, চেক জাল করতে তাদের মোটেই আটকায় না। তবে যে জেল পর্যন্ত পৌঁছায় না, সেটা নিতান্তই নামের জোরে। কাজেই দুঃসাহসের অন্ত নেই। নন্দের টাকার প্রাচুর্য দেখে তারা ঘাড়ে চেপে বসেছে। আপনি এখন কি করতে চান?

বাউল। আমি কলকাতা যাবো স্থির করেছি। তবে যেতে আমার দু'চার দিন বিলম্ব হবে। তুমি আমার গার্গীর বিদ্যালয়ের দিকে লক্ষ্য রেখো।

কিশোরীলাল। সেজন্য আপনার ভাবতে হবে না, আমি ম্যানেজারের উপরেও লক্ষ্য রাখবো, যাতে এদিকে সে কিছু করতে না পারে।

বাউল। ম্যানেজারের উপরে তো লক্ষ্য রাখবেই, গার্গীর বিদ্যালয়ের দিকে যেন বিশেষ দৃষ্টি থাকে, আমি একথা বলতেই এসেছিলাম।

(প্রস্থান)

কিশোরীলাল। যোগেন, তুমিও তোমার কাজে যাও। আমিও নন্দীগ্রামে চললাম ; সে জায়গায় নাকি ম্যানেজার গোল বাঁধাবার চেষ্টা করছে।

যোগেন। বাউল ঠাকুর যদি যদি কলকাতায় যান, তবে তাঁর বিদ্যালয় আমিই দেখতে পারবো ; তাঁর যাবতীয় কাজ আমিই করতে পারবো।

কিশোরীলাল। না, তোমার সেখানে গিয়ে কাজ নেই। মেয়েদের বিদ্যালয়। তুমি যুবক, তোমার সব সময় সেখানে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। মেয়েদের থেকে একটু দূরে থাকাই ভাল। যদি কখনও তেমন প্রয়োজন মনে করি তখনই আমি তোমায় বলবো।

যোগেন। সে বিদ্যালয়ের সকলেই তো আমায় দাদা দাদা বলে ডাকে, আমিও তাদের বোনের মতন স্নেহ করি। আমার সেখানে যেতে আপত্তি কি ?

কিশোরীলাল। আপত্তি অনেক আছে রে বাবা, অনেক আছে। পুরুষ ও মেয়ে এক জায়গায় থাকাই যুক্তির বাইরে। ভক্তি-শ্রদ্ধার ভিতর দিয়েই অনেক সময় পাপ স্পর্শ করে। তার পরে মেয়ে-পুরুষে মিলে কাজ করার সময় এখনো ভারতে হয় নি। অবশ্য যেভাবে এখন জাগরণ দেখতে পাচ্ছি, তাতে মনে হয়, অল্প দিনের ভিতরেই ভারতে সে ক্ষেত্র তৈরী হবে। মানুষ এখন পবিত্রতার দিকেই অগ্রসর হচ্ছে, ব্যক্তিগত জীবনকে পবিত্রতাময় করে তুলবার জন্য প্রায় সকলেই চেষ্টা করছে। যতদিন আমরা তৈরী হতে না পারবো, ততদিন দূরে দূরে থাকাই ভালো।

যোগেন। আপনার আদেশ প্রতিপালন করাই আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত ; বিশেষ জরুরী কাজ না হলে আমি কখনো সেখানে যাবো না।

কিশোরীলাল। এ লক্ষ্য যদি ঠিক থাকে, তবে আর তোমার কোন চিন্তা নেই। এখন তুমি যাও, আমিও নন্দীগ্রামের দিকে যাচ্ছি।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—বড়-খাতার মেলা।

(রমজান, করিম ও বাউল)

করিম। রমজান ভাই, কেমন আছ? খাজনার টাকা দিয়েছ কি?

রমজান। না, দিতে গিয়েছিলাম, নায়েব বললে টাকা দিয়ে যাও, দাখিলা কিছুদিন পরে পাবে; আমরা আজকাল কাজে বড় ব্যস্ত আছি।

করিম। নায়েব আমাযও ঐ কথাই বলেছে। শুনলাম সকলের কাছেই টাকা চায়, কিন্তু দাখিলা দিতে চায় না। ব্যাপারটা কি হে?

রমজান। আমার মনে হয়, নায়েব আর ম্যানেজার তু'জনে একটা মতলব করেছে। জমিদার দেশে নেই, সে এদের উপরে ভার দিয়েই নিশ্চিন্ত। কিন্তু এদের হাবভাব আমার মোটেই ভাল লাগে না!

করিম। এখন কি করবে মনে করেছ?

রমজান। আমার ইচ্ছা, জমিদার বাড়ি এলেই খাজনা দেবো, এর পূর্বে আর খাজনা দেবো না। মনিবের দিকেই এখন আমাদের চাইতে হবে।

করিম। আমারও ইচ্ছা তাই, কর্তা বাড়ি এলেই টাকা দেবো। তবে ওরা মনে করবে যে, প্রজারা সব জোট হয়ে গেছে। তা করে করুকগে, মনিবের সাথে তো আমাদের গোল নেই, খোদার কাছে সাফ থাকলেই হলো।

(বাউলের প্রবেশ)

বাউল। কি হে রমজান!

রমজান ও করিম। আদাব আদাব!

বাউল। হ্যাঁ রে, বাজারে কি জিনিস কেনা হলো? ও—এক বাক্স সিগারেট দেখছি যে!

রমজান। বহুদিন বাজারে আসি নি, আজ এসেই মনে হলো এক বাক্স সিগারেট কিনে খাই! দোকানিকে জিজ্ঞেস করলাম কোন্ সিগারেট ভালো, সে এইটেই দিলে।

বাউল। দাম কত নিয়েছে?

রমজান। পাঁচ সিকে।

বাউল। এত দাম দিয়ে 'প্লি ক্যাসেল' সিগারেট কিনেছ, আবার দাতব্যও হচ্ছে, ব্যপার কি ?

রমজান। যারা সাথে এসেছে, তাদের না দিয়ে কি করে খাই, সকলে তো আর কিনে খেতে পারে না ? তার পরে এতে অবাক হবারই বা কি আছে ? পাঁচ হাজার মণ ধান পাই নিজের খামারে, হাজার মণ পাই পাট, সরিষা-মরিচও বছরে হাজার-বারো শ' টাকার বিক্রী করি। পাঁচ সিকে দিয়ে এক বাক্স সিগারেট কিনেছি, তাতে এত ব্যস্ত হবার কি আছে ? ব্যস্ত হবেন শহরের বাবুরা, যাঁদের বাজারে না গেলে উনুনে হাঁড়িই চড়ে না।

বাউল। হ্যাঁ, সে কথা তুমি বলতে পারো। তোমার মতন গৃহস্থ এ দেশে খুব কমই আছে। তবে ওটা অভ্যাসের মধ্যে গিয়ে না দাঁড়ায়, সেজন্যই সাবধান করা। তারপরে ওটা বিদেশী জিনিস, ঐটে আমাদের ত্যাগ করতে হবে তো !

রমজান। অভ্যাসের মধ্যে আর যাবে কি করে ? বাজারেই আসি না, বছরে দু'চার দিন। তবে বিদেশী জিনিস গ্রহণ করা অন্যায় হয়েছে। আচ্ছা, আমি ফেলে দিই !

বাউল। তোমার বিবেক যা বলে, তাই করো।

রমজান আপনি বোধ হয় আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন ! আচ্ছা, ফেলে দিচ্ছি। (ফেলে দেওয়া) আপনি আমায় ক্ষমা করুন, আজ থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করছি—জীবনে কখনো বিদেশী জিনিস গ্রহণ করবো না।

বাউল। আনন্দম্ ! বাজারে আসার কি প্রয়োজনই হয় না নাকি ?

রমজান। বড় বেশী নয়। ক্ষেতে ধান হয়, গাইয়ে দুধ দেয়, সরিষা দিয়ে ঘানিতে তেল তৈরী করে নিই। তরি-তরকারী যা হয়, তা নিজেরা তো খাই-ই, আর পাড়া-প্রতিবেশীদেরও বিলিয়ে দিই। পুকুরে মাছও প্রচুর আছে। একমাত্র কিনতে হয় নুন্, তাও একদিন এনে রাখি, মাস ভরে খাই। বাজারে বাবুদের প্রয়োজন।

করিম। আমরা চাষা হলে হবে কি ? বাবুদের চেয়ে আছি অনেক ভালো, খাইও অনেক ভালো।

বাউল। তাতে আর সন্দেহ কি ! কিনে খাওয়া আর ক্ষেতের জিনিস খাওয়া,

এ অনেক তফাৎ। দেখো করিম! তোমার পোশাকটা একটু ভাল করা প্রয়োজন।

রমজান। ঐ কথাটা ওকে বলবেন না আমি বলে বলে হয়রান হয়ে গেছি। ওরও বছরে খামারে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা আয়, কিন্তু নেংটি ও কিছুতেই ছাড়বে না।

বাউল। ভাই করিম, কাপড় একটু পরিষ্কার করা দরকার, তা না হলে ভদ্র-সমাজ তোমাদের সাথে মিশবে কেন বলো তো?

করিম। বাউল দাদা, তুমিও তাই বলো? ঐ জায়গায়ই তো বাবুদের সাথে মিশতে পারি না। বাবুরা প্রেম করেছেন কেতাবের সাথে, তাই তাদের সাফ কাপড়ের প্রয়োজন! তা না হলে যে বাবুদের বাবু-গিরিই থাকে না! আমরা প্রেম করেছি গাছের সাথে, নেংটি না পরলে তার সাথে প্রেম করা যায় না, তার কাছে যেতে হলেই ধুলো-কাদা মাখতে হয়, তাই আমরা নেংটি পরেই থাকি।

বাউল। সভ্য সমাজ! কোথায় লাগে তোমাদের ইউনিভারসিটির শিক্ষা? আজ এই চাষা যে বিদ্যা অর্জন করেছে, তা কি কোন বইতে পাওয়া যায়? তাই এখন পুঁথির বিদ্যা ছেড়ে চাষার কাছ থেকে এই চাষী-বিদ্যাটা আয়ত্ত করে নাও, তা না হলে তোমাদের জাতীয়-জীবনের ভিত্তি তৈরী করার চেষ্টা আকাশকুসুম। আচ্ছা করিম, সেই গানটি মনে আছে তো?

করিম। হ্যাঁ আছে, আমি ঐ গানটি প্রায় সময়ই গেয়ে থাকি।

বাউল। আচ্ছা এসো, আজ দু'জনে একবার গাই।

(মিলিত কণ্ঠে গান)

(গীত)

রাম রহিম না জুদা করো ভাই
মনটা খাঁটি রাখো জী।
দেশের কথা ভাবো ভাই রে,
দেশ আমাদের মাতাজী॥
হিন্দু মুসলমান এক মায়ের ছেলে
তফাৎ কেন করো জী,
দু'ভায়েতে দু'ঘর বেঁধে
করি একই দেশে বসতি॥

টাকায় ছিল একমণ চাউল,

ভাই, এখন বিকায় পশারী,

এর পরেতে হতে হবে ঐ

গাছের তলায় বসতি ॥

বাউল। রমজান! খাজনা দেবাব কি করেছ?

রমজান। ঠিক করেছি জমিদার বাড়ি না আসা পর্যন্ত খাজনা দেবো না।

বাউল। হ্যাঁ, তাই ক'রো; আমি শীঘ্রই কলকাতা যাচ্ছি, বোধ হয অল্প দিনের মধ্যেই নন্দকে নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবো। ম্যানেজার স্টেটটাকে উচ্ছন্নে দেবার আয়োজন করছে; শুনলাম অনেক প্রজার নামে মোকদ্দমা করেছে! সত্য কি?

রমজান। হ্যাঁ, তা করেছে। তাতে লাভ এই হযেছে, জমিদারীতে এখন ঘোব অশান্তি। ওরা যেভাবে সকলকে খেপিয়ে তুলেছে, তাতে মনে হয় ম্যানেজারকে অল্প দিনেব ভিতরেই এ দেশ ছেড়ে যেতে হবে। আপনি জমিদারকে এ সব কথা জানাবেন, এবং যাতে সত্বর তাঁকে নিয়ে আসতে পারেন, তাই করবেন।

করিম। অনেকের সম্পত্তিই নিলামে উঠেছে, শীঘ্রই লুটপাট আরম্ভ হবে বলে আমার মনে হয়।

বাউল। আমি এসব খোঁজ পেযেই তোমাদের কাছে এসেছি। তোমবা মনিবের হিতাকাঙ্ক্ষী প্রজা, যাতে মনিবের অকল্যাণ না হয়, তোমরা তাই করবে। ম্যানেজারের ইচ্ছা সে এ সম্পত্তিটা হাত করে নেয়।

করিম। তাই নাকি? আচ্ছা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ওকে আর অগ্রসব হতে দিচ্ছি না। মনিবের জন্য জান্ কবুল করে রাখলাম।

বাউল। সাবাস্—সাবাস্! এই তো চাই!

(গীত)

ধন্য এ দেশের চাষা,

এদের চরণ-ধূলা পড়লে মাথায,

প্রাণ হয়ে যায় খাসা ॥

কপটতার ধার ধারে না,

সত্য ছাড়া মিথ্যে কয় না,

প্রাণের কথা গুছিয়ে বলার,

নাই কো এদের ভাষা।
প্রাণ ভরা আনন্দ এদের,
বুকটা স্নেহের বাসা,
চিনলে এ সব সোনার মানুষ,
মিটতো দেশের সব পিয়াসা॥
নাই জুতো নাই তেমন কাপড়,
ছেঁড়া নেংটি ছেঁড়া চাদর,
তাতেই তুষ্টি এমনি মিষ্টি,
যেন প্রেম সাগরে ভাসা;
এ সব দেবতা ছুঁলেই
জাত যায় মোদের,
মোরা এমনি বুদ্ধিনাশা।
যাদের রক্তে জগৎ তুষ্ট,
(তাদের) দেখলে কুঞ্চিত করি নাসা॥
এরা কর্মনিষ্ঠ বীরই বটে,
ছোট বলে খুবই চটে,
কারো দুঃখ দেখলে শিউরে ওঠে,
এদের এমনি ভালবাসা;
অন্ধ মনিব চিনলে না যে,
এই দেশের চাষা।
যারা প্রাণ দিয়েও মনিব বাঁচায়,
এই স্বর্গই যাদের আশা॥

বাউল। আচ্ছা, আমি এখন যাই। রমজান, আমার কলকাতা যাবার পূর্বে তুমি আমার সাথে একবার দেখা ক'রো, ভুলো না কিন্তু! (প্রস্থান)

করিম। এই বাউল দাদাই আমাদের মনের মত। লোকটি এদেশে চারটি স্কুল করেছেন, রাত্রে গিয়ে ইনি আমাদের ছেলেদের পড়ান।

রমজান। তার ভিতরে বড় কর্তার ছেলে যোগেনবাবুও আছেন, তিনিও পড়াতে যান। কারো ব্যারাম হলে তিনি যত্ন করে চিকিৎসা করেন।

করিম। এঁরা দেবতা, এঁদের দেখলেই আনন্দ হয়। চল, এখন যাই। বাউল দাদা যা বলে গেলেন, সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে।

রমজান। আরে, বেশী নজর আর কি রাখবো, ম্যানেজার যদি তেমন বাড়াবাড়ি করে, তবে তার মাথা কেটে রেখে দেবো। আমরা থাকতে মনিবের অকল্যাণ হতেই পারবে না।

(উভয়ের প্রস্থান)

স্থান—কিশোরীলালের বাড়ি।

(কিশোরীলাল, হেমলতা, যোগেন ও বাউল)

কিশোরীলাল। গিন্নি, ছেলে তো শহরে গেছে, বউটিকে, রেখে যেতে বললাম, তা'ও সে রেখে গেল না। বুড়ো হয়েছি, আর কতদিনই বা বাঁচবো! আমার যা কিছু আছে, তা এখনই উইল করে রাখতে চাই। তুমি কি বলো?

হেমলতা। তা তুমি যা ভাল মনে করো তাই করবে, আমি আর এ সম্বন্ধে কি বলবো? আমিও বউমাকে রাখবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সুরেশ তাকে কিছুতেই রেখে গেল না। বউমারও যাবার ইচ্ছা ছিল না।

কিশোরীলাল। আমি মনস্থ করেছি সম্পত্তি চার ভাগ করবো। একভাগ তুমি, দু'ভাগ তোমার দু'ছেলে, আর একভাগ বাউল ঠাকুরের আশ্রমের জন্য।

হেমলতা। এ বেশ হয়েছে। বাউল ঠাকুরের আশ্রমে যে কাজ হচ্ছে, তা যেদিন দেশময় ছড়িয়ে যাবে, সেদিনই দেশ নিজের পায়ে দাঁড়াবার যোগ্য হবে। আমাদের বিদ্যালয়টিতেও যথেষ্ট কাজ হচ্ছে এই ক'বছরে স্বর্ণপুরের কৃষক ছেলেরা প্রায় সকলেই কিছু কিছু লেখাপড়া শিখেছে।

কিশোরীলাল। তা হলে আমি এ-ই করি কেমন?

হেমলতা। হ্যাঁ, বেশ ব্যবস্থা হয়েছে।

কিশোরীলাল। আমার কর্তব্য আমি শেষ করে যাই, পরে ওদের অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। তোমার সুরেশ যে আর বাড়ী এসে বিষয়-

কর্ম দেখবে, সে আশা নেই ; কিছুদিন পরেই শুনবে যে, তার জায়গা-জমি সব পরের হাতে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়েছে।

হেমলতা। তোমার কর্তব্য তুমি করে যাও, ওদের অদৃষ্টে থাকলে ওরা ভোগ করবে। নিজের পায়ে নিজেই যদি কুঠার মারে, তার আমরা কি করবো!

কিশোরীলাল। নন্দ কলকাতা গেছে, স্টেটের অবস্থাও দিন দিন কেমন হয়ে আসছে। ম্যানেজারের উপরে কারো বিশ্বাস নেই। অনেক মহাল বিদ্রোহী হয়েছে। নন্দ যদি এখনো বাড়ি না আসে, তবে তার ভবিষ্যৎও বড়ই দুঃখজনক দেখতে পাচ্ছি। এখনো বাড়ি ফিরলে কিছু পাবে, আর কিছুদিন পরে এলে সে কিছুই পাবে না। লাটের টাকা এখন আমিই চালাচ্ছি। বাউল ঠাকুরের কাছে বৌমা তার করেছে, বাউল ঠাকুর শীঘ্রই কলকাতা যাবেন।

হেমলতা। তিনি গেলে ভালই হবে, হয়তো বাড়িতে নিয়ে আসতে পারবেন।

কিশোরীলাল। বাড়ি আসবে মনে হয় না, তবে যদি প্রায়শ্চিত্ত হয়ে থাকে তা হলে আসতেও পারে।

(যোগেনের প্রবেশ)

যোগেন। বাউল ঠাকুর বলে দিলেন, আপনাকে তাঁর সাথে একবার দেখা করতে, আশ্রম সম্বন্ধে কি বলবেন।

কিশোরীলাল। তিনি এখনো কলকাতা যান নি?

যোগেন। এদিকের কাজগুলি না সেরে কি করে যাবেন?

কিশোরীলাল। আচ্ছা, আমি এখনি যাচ্ছি। (প্রস্থান)

যোগেন। মা, বাবা এতক্ষণ কি বললেন?

হেমলতা। বিষয় চার ভাগে ভাগ করে উইল করতে চান, তাই বললেন।

যোগেন। চার ভাগ করবেন কেন?

হেমলতা। তুমি, সুরেশ, আর আমি তিন ভাগ ; আর বাউল ঠাকুরের আশ্রমের জন্য এক ভাগ।

যোগেন। ভাগ ঠিক হয় নি। আশ্রমের জন্যই অর্ধেক দেওয়া উচিত ছিল। আমাদের খামার খুব বড়। এর অর্ধেকেও আমাদের তিনটি সংসার বেশ ভালভাবেই চলতে পারে।

হেমলতা। তাই যদি হয়, তবে তুমি একথা কর্তাকে ব'লো, এতে তিনি আনন্দিতই হবেন।

যোগেন। হ্যাঁ, আমি বাবাকে একথা নিশ্চয়ই বলবো। এ আশ্রমের প্রসার দিন দিন যাতে আরো বৃদ্ধি হয়, তারি চেষ্টা করতে হবে। এতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।

হেমলতা। তোমার এ সাধু প্রস্তাবে কর্তা যথেষ্ট আনন্দ পাবেন। তুমি যা বলবে, বোধ হয় তিনি তাই করবেন।

যোগেন। আমি দাদার এক বন্ধুর পত্র পেয়েছি। তিনি লিখেছেন, দাদা কোনরকমে খেয়ে আছেন আয় তেমন কিছুই হচ্ছে না।

হেমলতা। তাঁর যে এ অবস্থা হবে, তা আমি সেদিনই বুঝেছি, যেদিন সে ঐ দেবতার কথা উপেক্ষা করেছে। যে সন্তান পিতা-মাতার অবাধ্য, পিতা-মাতার আশীর্বাদ যে সন্তানের মাথায় বর্ষিত হয় না, সে সন্তান জগতে মানুষ নামের যোগ্য হতে পারে না। বাংলার এই দুর্দিনের মূল আমার মনে হয়, পিতা-মাতার দীর্ঘশ্বাস। ছেলে বিয়ে করে বউ ঘরে এলে, মা হন তখন দাসী। এ বাংলার হাহাকার দূর হবে সেদিন, যেদিন বাঙালী তার জনক-জননীকে চিনবে।

যোগেন। যা বলেছ মা, তাই। পিতামাতার উপরে এখন আর কারো লক্ষ্য নেই, নেতা নিয়েই সকলে ব্যস্ত। যারা আপন ঘরকে ভালবাসতে শেখে নি, তারা কি কখনো দেশকে ভালবাসতে পারে মা?

হেমলতা। এসব কোথায় শিখেছিস্ রে? আজ তোর কথা শুনে খুবই আনন্দ পাচ্ছি।

যোগেন। এ-ই তো বাউল ঠাকুরের উপদেশ, বাবাও এই কথা বলেছেন—"আপন ঘর ঠিক করে নাও, ধনে-ধান্যে ঘর পরিপূর্ণ হউক, তার পরে জগতের সেবায় লেগে যাও। ত্যাগী হতে চাও তো আগে ভোগের যোগাড় করো। ভোগী হও, তার পরে ত্যাগী সেজো। যার নেই বলতে কিছুই নেই, ভিক্ষাই যার জীবনের লক্ষ্য, সে আবার ত্যাগ করবে কি?"

হেমলতা। কথাগুলি যেন তোমার জীবনে মূর্তিমান হয়ে ওঠে, এই আশীর্বাদ করছি।

যোগেন। তুমি আশীর্বাদ করো, তবেই সাধনা পূর্ণ হবে। তোমার চরণ ধূলাই যেন আমার জীবনের প্রধান সম্বল হয়!

হেমলতা। আশীর্বাদ করছি, মা তোমার সাধনা সিদ্ধ করুন! (প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—বাউল ঠাকুরের আনন্দময়ীর বাড়ী।

(বাউল, গার্গী, পুরোহিত ও নমঃশূদ্র-বালকগণ)

(গীত)

গার্গী। বিশ্ব-প্রসবিনী, ত্রিলোক-পালিনী,
প্রলয়-কারিণী, ত্রিগুণময়ী শ্যামা।
অসুর-নাশিনী, নৃমুণ্ড-মালিনী,
শ্মশান-চারিণী, ভীষণা ভীমা শ্যামা॥
শত কোটী যোগিনী
নাচিছে সঙ্গে,
থিয়া থিয়া ধেই ধেই,
কত না রঙ্গে
রুধির শত ধারা,
বহিছে অঙ্গে,
শত মধুপানে,
মাতঙ্গিনী শ্যামা॥
হা-হা-হা-হা-হি-হি-হি-হি-
অট্ট অট্ট হাসে,
শিষ্ট-পালিনী আজ
দুষ্ট বিনাশে,
কম্পিত অরিকুল
শঙ্কিত ত্রাসে,
আনন্দে শবোপরি,
নৃত্য করিছে শ্যামা॥
অগণিত দেবগণ,
গাহিছে জয়-গীতি,
রবি শশী তারকা,
করিছে আরতি ;
জাগিল না ভারত,

গেল না ভীতি,

উঠালে না তারে তুমি

দীন-তারিণী শ্যামা ॥

(বাউল ও পুরোহিতের প্রবেশ)

বাউল। আজ আমাদের মায়ের নিশিপূজা হবে, তাই আপনাকে আহ্বান করা হয়েছে।

(নমঃশূদ্র-বালকগণের প্রবেশ)

সকলে। আমরা কি মায়ের ঘরে গিয়ে মাকে দেখতে পারবো ?

বাউল। নিশ্চয়ই পারবে, মা তো আমার একার নন্ তিনি যে সকলের। আমরা সকলেই যে মায়ের সন্তান।

পুরোহিত। এরা মায়ের ঘরে যাবে কি করে ? এরা যে সব নমঃশূদ্রের ছেলে !

বাউল। হলোই বা, তাতে দোষ কি ? মা তো আর একটা পুতুলই নন্, মা যে চিন্ময়ী ; প্রত্যেক কীটানুকীটে মা বিরাজ করছেন। সন্তান মায়ের ঘরে যাবে, তাতে বাধা দেবার কি অধিকার আপনার আছে ? এই জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, ভারতে দুই মহাপাপ—মেয়েদের পায়ে দলানো আর জাতি জাতি করে গরীবগুলিকে পিষে ফেলা।

পুরোহিত। শাস্ত্রে আছে, নমঃশূদ্র অস্পৃশ্য জাতি।

বাউল। শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে সব কথা বলা ঠিক নয়। আমরা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগকে অস্পৃশ্য করে বেদান্ত ধর্মের সাম্যবাদের ঘোর অবমাননা করেছি, সমাজকে দুর্বল করেছি। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত একদিন আমাদেরই করতে হবে। আমার মনে হয়, সে প্রায়শ্চিত্তের সময়ও আমাদের এসেছে।

পুরোহিত। ব্রাহ্মণগণ কি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের জন্য কিছুই করেন নি ?

বাউল। কিছুই করেন নি, এ কথা বলতে পারি না। তবে পদদলিত হিন্দুদিগের জন্য মুসলমানেরাই মুক্তি আনয়ন করেছিলেন ; তাই এত লোক ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। শঙ্করাচার্য ধীবর প্রভৃতি পতিত জাতিকে এক মুহূর্তে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করেছিলেন। আচার্য শঙ্কর ঋষি ; আমাদেরও এখন সেই ঋষিজনোচিত কার্য করতে হবে, নিম্নশ্রেণীকে আভিজাত্য মর্যাদা দান করতে হবে।

পুরোহিত। এও কি কখনো সম্ভব ?

বাউল। অসম্ভবের তো কোন কারণই দেখতে পাচ্ছি না! সত্যযুগে জাতি বলতে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি ছিল, পরে তাদের গুণের হ্রাস ঘটায় অন্যান্য জাতির সৃষ্টি হয়। মনে রাখতে হবে—এখন আবার সেই সত্যযুগ ফিরে এসেছে। ব্রাহ্মণ যুগ-যুগান্তের জ্ঞান-ভাণ্ডার স্বীয় গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখায় আজ আমরা এক হাজার বৎসর বিদেশীর পদানত। ব্রাহ্মণ যে বিষ সমাজ-শরীরে প্রবিষ্ট করিয়ে সমাজকে প্রাণহীন করে ফেলেছেন, সেই ব্রাহ্মণকেই সে বিষ শোষণ করে নিতে হবে; সর্ব বর্ণে জ্ঞান বিতরণ করতে হবে, তবেই তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত। যেদিন এই হবে, সেদিনই ভারতীয় চিন্তা, ভারতের আধ্যাত্মিকতা জগৎ জয় করতে সক্ষম হবে, এর পূর্বে নয়।

পুরোহিত। তবে কি তুমি জাতিভেদ উঠিয়ে দিতে চাও ?

বাউল। জাতিভেদ উঠে যাবে কি থাকবে, সে সম্বন্ধে আমার বলবার কিছুই নেই। আমার উদ্দেশ্য এই যে, ভারতান্তর্গত বা ভারত-বহির্ভূত মনুষ্য জাতি যে মহৎ চিন্তারাশি সৃজন করেছে, তা অতি হীন, অতি দরিদ্রের কাছে পর্যন্ত তা প্রচার করতে হবে। তারপরে তারা ভাবুক বসে জাতিভেদ থাকা উচিত, কি উঠে যাওয়া উচিত! মেয়েদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত কি অনুচিত, এ নিয়েও মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন নেই। চিন্তা ও কার্যের স্বাধীনতাই জীবন; যেখানে তা নেই, সে জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী। এখন ভেবে দেখুন আমাদের দুর্বলতা কোথায় ?

পুরোহিত। তোমার কথা শুনে মনে হয় তুমি ভারতকে নূতন করে গড়তে চাও। পুরাতন মতগুলিকে পদদলিত করে নূতন মতের প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক !

বাউল। আমি নূতন মত প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যস্ত নই, আমি অতি পুরাতনকেই আবার নূতন করে আনতে চাই। আমার মনে হয়, তা হলেই ভারতবাসী তার গন্তব্য পথ স্থির করে নিতে পারবে আমরা যে অতিরিক্ত বিজ্ঞতার ভান করেই যত অনর্থের সূত্রপাত করেছি, তা কারো অস্বীকার করার উপায় নেই। ইউরোপীয় জাতিসমূহ, ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বিগণ কার্যতঃ আমাদের

অপেক্ষা আত্মপ্রত্যয়শীল, মুসলমানগণ আমাদের অপেক্ষা সাম্যপরায়ণ। খৃষ্টের নির্বৈরিতার আদর্শ শঙ্করাচার্যের "নলিনীদলগত জলমতিতরলম্" শ্লোক উচ্চারণ করে চলেছি আমরা; আর, আমাদেরই শ্রীকৃষ্ণের "যুদ্ধস্ব বিগতজ্বর" শ্লোক মেনে নিয়েছে ইউরোপ।

পুরোহিত। তবে কি বলতে চাও, বর্তমান ভারত যে পথে চলেছে, সে পথটা কিছুই নয়? এ সকল পূজা-পদ্ধতির কোনই সার্থকতা নেই?

বাউল। সার্থকতা নেই, একথা আমি বলছি না, অধিকারীভেদে এ পূজার যথেষ্টই সার্থকতা আছে। আপনারাই বলে থাকেন, ব্রহ্ম-সদ্ভাব উত্তম, ধ্যান-ভাব মধ্যমা আর এই বাহ্যপূজা অধমের চেয়েও অধম। এই বিশাল জাতিটা যে সেই অধম পূজা নিয়েই রয়ে গেল, তাই তো ভারত শক্তিহীন।

(গীত)

ঠাকুর—
শক্তি-পূজা কথার কথা না—।
যদি কথার কথা হতো,
চিরদিন ভারত,
শক্তি পূজে শক্তিহীন হতো না ॥
কেবল ডাকের গহনায়,
আর ঢাকের বাজনায়
শক্তি পূজা হয় না,
একমন বিল্বদল,
ভক্তি-গঙ্গাজল,
হৃদয়-শতদল দিলে হয়
মায়ের সাধনা ॥
দিলে আতপান্ন কি মিষ্টান্ন,
মা যে তাতে ভোলেন না;
এক জ্ঞান দীপ জ্বেলে,
একান্ত ধূপ দিলে,
ব্রহ্মময়ী পূর্ণ করেন কামনা ॥

বনের মহিষ-অজা মায়ের বাছা,
মা সেই বলি লন না ;
যদি বলি দিতে আশ,
যার যার স্বার্থ করো নাশ,
বলিদান করো বিলাস-বাসনা ॥
কাঙ্গাল কয় কাতরে জাত বিচারে,
শক্তি-পূজা হয় না ;
সকল বর্ণ এক হয়ে, ডাকো
মা মা বলে,
নৈলে মায়ের দয়া কভু হবে না ॥

বাউল। বুঝতে পেরেছেন ? আমি চাই বৈদিক যুগ। বৈদিক যুগে দেবদেবীর আড়ম্বর ছিল না, পৌরোহিত্যের উপদ্রব ছিল না। আচারসর্বস্ব ব্রাহ্মণ্যধর্মের মূর্তিপূজা বৌদ্ধধর্মের ফল। আমাদের যা ভাল ছিল, তার উপরে ভর করে বিদেশের যা ভাল আছে, তা আয়ত্ত করে, আমাদের বহু বৎসর সঞ্চিত কুসংস্কার ও আবর্জনা-রাশি ঠেলে ফেলে দিয়ে, আমাদের বীরের ন্যায় অগ্রসর হতে হবে।

পুরোহিত। তা হলে বর্তমানে আমাদের কর্তব্য কি ?

বাউল। বর্তমান যুগে সর্বপ্রধান কর্তব্যই হচ্ছে শক্তি-সঞ্চয়—আধ্যাত্মিক, দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক। সর্বপ্রথম দৈহিক শক্তির দিকেই লক্ষ্য করতে হবে বেশী, তা হলেই আমরা বেদান্ত-ধর্মের গীত-ধর্মের প্রকৃত মর্ম বুঝতে সক্ষম হবো। মনে রাখতে হবে—এইটে কর্মের যুগ, এখন কইতে হবে কর্মের কথা, গাইতে হবে কর্মের গীত।

(গীত)

করমেরি যুগ এসেছে ;
সবাই কাজে লেগে গেছে,
মোরাই শুধু রবো কি শয়ান ?
চিরদিনই রবো নীচে,
চলবো সবার পিছে পিছে,
সহিব শত অপমান ॥
জেগেছে জগৎ সবে,

বসে নাই কেউ নীরবে,
একই সুরে ধরিয়াছে গান।
নিজেরে ভেব না হীন,
ধনী মানী দুঃখী দীন,
রাজা-প্রজা সকলি সমান॥
সে সুরে সুর মিলাইয়ে,
করম-পতাকা নিয়ে,
দলে দলে হও আগুয়ান।
দ্বেষ-হিংসা পায়ে দলে,
আয় ছুটে আয় চলে,
ত্রিশ কোটী হিন্দু-মুসলমান॥
মরণ-সাগর পার,
হতে হবে সবাকার,
দিন গেল বেলা অবসান।
তরী বুঝি ছেড়ে যায়,
উঠে পড় খেয়া নায়,
ভয় নাই মাঝি ভগবান॥

পুরোহিত। তোমার কথা শুনে আজ আমার প্রাণটাও কেমন হয়ে আসছে! তুমি বর্তমানে ধর্ম সংস্কার কিভাবে করতে চাও তা আমায় বলো, উপযুক্ত মনে হলে আমিও তোমার প্রচারকার্যে সাহায্য করবো।

বাউল। আপনাকে যদি প্রচারক পাই তা হলে আমার আর ভাবনা থাকে না। অল্পদিনের ভিতরেই আমার কর্ম আমি ভারতময় ছড়িয়ে দিতে পারি। ধর্ম জিনিসটা কি, এই নিয়েই হচ্ছে দেশে মস্তবড় গোলমাল। যদিও দেখতে পাচ্ছি, নূতন বাংলা ধর্মটাকে প্রাচীন যুগের জটিল পথ থেকে বেশ সহজ এবং সরল পথে নিয়ে এসেছে, তথাপি ধর্ম বললেই মানুষের মনে এমন একটা চমকানির ভাব আসে, একটা কৃচ্ছ্রসাধনার কল্পনা আসে, একটা উগ্র তপস্যার ছায়া আসে যে, ইহা যে সহজ এবং অনায়াসলভ্য তা কেহই স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। কাজেই ধর্ম তার মোহনবাঁশিটি হাতে করে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়ালেও তার পাগল-করা গানটি শুনতে কেউই প্রস্তুত নয়। ইহা বিমুখ মানুষ যখন ধর্মের জন্য

মাথা খুঁড়তে বসে, তখন ধর্ম তার মূর্খতা দেখে দেশ ছেড়ে পালায়। ধর্মই তো সংসার ধারণ করে রেখেছে। মানুষের দুর্গতির দিন সমাগত হলে তার ধর্মবুদ্ধি পর্যন্ত বিকৃত হয়ে যায়; কাজেই সে তখন ধর্মের দিকে পিছন ফিরে উল্টোদিকেই এগিয়ে যায়। ইহাই ভারতের কৃচ্ছ্রসাধ্য ধর্ম এবং ইহাই হচ্ছে বর্তমান ভারতের ধর্মসংস্কার।

পুবোহিত। এখনো আ'মি ভাল করে বুঝতে পারলাম না।

বাউল। প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ঐ যে বিশাল তাল তরুটি শাখা-পল্লবে ভরে উঠে নিজেকে আকাশের দিকে ছড়িয়ে চলেছে, এরি জন্য ওর কিছু সাধনা আছে কি?

পুরোহিত। সাধনা না থাকলে ও অত বড হলো কি করে?

বাউল। না, বৃক্ষের কোন সাধনাই নেই, প্রকৃতির অযাচিত দানই ওর সকল ঐশ্বর্য, সমস্ত শক্তি, সমস্ত সাধনা।

পুরোহিত। তবে কি তুমি বলতে চাও, জগতের সকলই সেই প্রকৃতিরই দান?

বাউল। নিশ্চয় আমরা প্রকৃতির দান ভিন্ন আর কিছুই নই; মানুষের সকল গুণ আমাদের ভিতরে বিকশিত হয়ে উঠলেই আমাদের সিদ্ধি। আমাদের অসাধারণ ধীশক্তি, অনন্ত গভীর প্রেম, অফুরন্ত পরমায়ু, অপরিমিত শক্তি—এই সকলেব সম্যক খেলা জীবনের স্তরে স্তরে পরিপূর্ণভাবে ফুটে ওঠা চাই।

পুরোহিত। তা হলে বর্তমান যুগে আমাদের প্রচার্য বিষয় কি, তা তুমি আমায় বলে দাও, আমিও তোমার মত কর্মসাগরে ঝাঁপ দিয়ে আমার অকর্মণ্য জীবনকে কর্মময় করে ধন্য হয়ে যাই!

বাউল। আনন্দম্! এখন চাই বুদ্ধির অসাধারণ তীক্ষ্ণতা, হৃদয়ে অপার্থিব প্রেম, দুর্জয় সাহস, প্রাণের মধ্যে অপ্রতিহত হুতাশন, শত ঝঞ্ঝাবাতে, প্রলয় দুর্যোগে যে অনল নির্বাপিত হবে না। আর চাই বাহু-যুগলে মত্ত কেশরীর মতন অমানুষিক বল, মজ্জায় মজ্জায় অমোঘ বীর্য, শোণিত-প্রবাহে বিদ্যুৎ শক্তি। ধর্মের ইহাই মূর্ত দেবতা, ব্রাহ্মণ।

পুরোহিত। বাউল, তুমি কি মানুষ? তোমার ভিতর এত শক্তি, তা তো পূর্বে জানতে পারি নি! পাগল বলে তোমায় কত কি বলেছি! তুমি আমায় ক্ষমা করো! তুমি আজ আমার প্রাণের কপাট

খুলে দিয়েছ, তোমায় কোটী নমস্কার; তুমিই আমার গুরু! আমায় মানুষ করে দাও, আমার কর্তব্য স্থির করে দাও!

(চরণে পতিত)

বাউল। এই তো সব মাটি করলেন! ঠাকুর, ঐ গুরুগিরিটাই করতে পারলাম না। পারলে এতদিনে লক্ষ লক্ষ শিষ্য হয়ে যেতো। যাতে ঐটে দেশে না থাকে, তার জন্যও বিশেষ চেষ্টা করছি। কারণ, ওতে একটা ঘণ্টা-নাড়ার দলই সৃষ্টি হচ্ছে। যুবকগুলি ধর্ম ধর্ম করে কর্মহীন হয়ে পড়ছে, ভিক্ষুকের দল দিন দিন পুষ্ট হচ্ছে।

পুরোহিত। বর্তমান যুগে এদেশে অনেক মহাপুরুষ এসে গেছেন। তুমি কি বলতে চাও, তাঁরা যে পথের কথা বলে গেছেন, সে পথটা কিছুই নয়?

বাউল। পথটা কিছুই নয়—একথা বলতে পারি না, অত স্পর্ধাও রাখি না। তবে বর্তমানে শিষ্যমণ্ডলীরা যে পথে চলেছেন, সে পথটা সময়োপযোগী কিনা, সে সম্বন্ধে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। যে ভগবানের নাম নিয়ে ভিক্ষুক সাজতে হয়, আমি সে ভগবানকে চাই না।

পুরোহিত। তোমার কথায় মনে হয় তুমি গুরুবাদের ঘোর বিরোধী।

বাউল। ঠাকুর, ভুল বুঝবেন না। আমি গুরুবাদের বিরোধী বা অবতার বিশ্বাস করি না, তা নয়; আমারও গুরু আছে। আমি বর্তমানে শিষ্যমণ্ডলী এবং তাদের ভাবের অবস্থা দেখে দুঃখিত। রাস্তার এক কোণ দিয়ে মড়ার মতন হেঁটে যাবেন, নাকিস্বরে কথা কইবেন, এ হয়েছে আজকাল মস্ত বড় একটা ভক্তের লক্ষণ। আর যে ছেলেটা বুক ফুলিয়ে রাস্তা কাঁপিয়ে চলে যাচ্ছে, সে হয়েছে অহঙ্কারী। ভারতের কোন্ ঋষি ধর্ম সাধনা করিতে গিয়ে ভিক্ষা-পাত্র হাতে করে পরের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছিল, ব্রাহ্মণ? ব্রহ্ম সাধন-নিরত কোন্ মহাপুরুষ অনাহারে জীর্ণ শরীর বহন করে পৃথিবীর উপেক্ষাকে ধর্ম সাধনার অঙ্গ বলে মেনে নিয়েছিল? অর্জুন কি ধার্মিক ছিলেন না? আজন্ম ব্রহ্মচারী মহামতি ভীষ্ম, তিনি কি অধার্মিক? ক্ষাত্রবীর্য, রাজর্ষি জনক এঁরা কি তোমাদের আদর্শ পুরুষ নন? ধর্ম সাধনায় পথে পরিধেয় বস্ত্রখানাও অনাবশ্যক জ্ঞান জড় জগৎটা কিছু নয়, ওটা মায়াময়—এ যেদিন ভারতের উর্বর মস্তিষ্কে প্রবেশ করেছে, সেদিন থেকে ভারত রসাতলে যেতে বসেছে।

পুরোহিত। একথা যুক্তিযুক্তই বটে। আমায় এখন কি করতে হবে বলে দাও! আমি তোমার কাছে ধর্মোপদেশ চাই, তুমি আমার গুরু।

বাউল। আবার! আমি একবারই বলেছি গুরু হতে পারবো না। মানুষ আমার মূর্তিটাকে পূজা করবে, মশারী খাটিয়ে তাঁকে খাটে শোয়াবে, বাতাস করবে, আর লোকের কাছে বলে বেড়াবে— আহা, ইনি কি মানুষ? ইনি ভগবান। পুরুষ ও প্রকৃতির যোগে ওঁর জন্ম হয় নি। কি বাতুলতা! আমি এসব বাতুলতাকে প্রশ্রয় দিতে মোটেই প্রস্তুত নই।

পুরোহিত। তোমার ভাব কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। কখনো মনে হয় তুমি আস্তিক, আবার কখনো মনে হয় তুমি নাস্তিক।

বাউল। আমি আস্তিক নই। নাস্তিকও নই। তোমরা যা চাও, আমিও ঠিক তাই চাই। তবে কিনা তোমাদের ধর্মটা কিছু শুকনো, আর আমার ধর্মটা রসে ভরা।

পুরোহিত। সে কি রকম?

বাউল। আমি সে ধর্মকে চাই, যে আমায় রক্ষা করতে পারবে, পৃথিবীর প্রবল সংঘর্ষে যে আমার ললাটে বিজয়-তিলক পরিয়ে দিতে পারবে। আমি সে ধর্মকে চাই না, যে আমায় সকল ভোগ হতে দূরে সরিয়ে নিয়ে পৃথিবীর মহামেলার বাইরে ঐ অন্ধকার কোণটায় আমায় হাত পা বেঁধে ফেলে রেখে দেবে। ব্রহ্ম এই ব্যাপ্তির রাজ্য সংহরণ করে যেদিন মহা প্রকৃতির কোলে তলিয়ে যাবেন, সেদিন যাবতীয় সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আমিও তলিয়ে যাবো। আজ আমার ব্রহ্ম জাগ্রত; তাই আমি আমার সকল ইন্দ্রিয়কেই জাগিয়ে রেখে দিতে চাই, ইহাই আমার ধর্ম এবং ইহাই মানুষের ধর্ম হউক। মানুষের নীতি, মানুষের উপদেশ, মানুষের কল্পনা ধূলি-বিলুণ্ঠিত হউক। প্রকৃতির দান মাথা পেতে নেবার জন্য, হে বাংলার সাধক-মণ্ডলী! বাঙালী বালক বাহিনীকে প্রস্তুত করে তোল। প্রকৃতির কোলে দোর্দণ্ডপ্রতাপ স্বভাব জননীর মহামন্ত্রে তারা মানুষ হয়ে উঠুক। জননীর পীযূষধারা পানের সাথে সাথে বালকদের কানে কানে বলে দাও, তারা স্বাধীন, তারা মুক্ত তারা মায়ের সন্তান।

পুরোহিত। কথাগুলি খুবই মূল্যবান; একথা সকলের দ্বারে দ্বারে প্রচার করা উচিত।

হ্যাঁ, কিন্তু এ প্রচারের জন্য উপযুক্ত গুরু চাই। এ মন্ত্রে দীক্ষিত করতে পারে এমন কর্মী গুরুরই এখন দেশে প্রয়োজন। তাই তো আমি মায়ের কাছে প্রার্থনা করি।—

(গীত)

পাঠিয়ে দে মা আনন্দময়ী,
দেখা মা তোর কে সন্তানে।
যে জন ভোগের মাঝে
ত্যাগের ছবি,
দেখাতে পারে জীবনে॥
ঘুমিয়েছিনু এমন ঘুম মা,
সাড়া পায়নি কেউ ডেকে,
এলো একটা প্রভাতী হাওয়া,
কোন্ অজানা দেশের থেকে ;
জেগেছি, উঠে বসেছি,
আঁখি খুলেছি মা ;
পেলে এখন পথের সন্ধান,
যে পথেতে মুক্তি মিলে,
যাত্রা করি জয় মা বলে,
মা তোর কোটী কোটী ছেলে ;
কিন্তু বক্তা হলেই হন এখন
দেশের নেতা,
বলে বেড়ান ত্যাগের কথা,
মাথা নাই তার মাথা ব্যথা,
তাদের অনেকেরই কথায়
কাজে মা এক দেখি নে॥
চাই মা এখন এমন গুরু,
জীবন যাহার কর্মময়,
আপন জন্মভূমির লাগি,
তিল তিল করে হচ্ছে ক্ষয় ;
ত্যাগই যাহার মূলমন্ত্র,
জীবনে আর মরণে,

শুনলে মা তোর অভয় বাণী,
সবার প্রাণই যাবে গলে,
আমাদের মড়া হাড়েই খেলবে ভেল্কী,
সূর্যের মতন উঠবো জ্বলে,
জ্বালি'য় দিলে জ্ঞানের বাতি
খুঁজবো করে পাতি পাতি,
এ জগতের হীরা-মতি,
এনে দেবো মা তোর চরণে ॥

বাউল। আপনার যদি এ ব্রত ভাল লেগে থাকে, তা হলে সেবকদের সাথে মিশে গিয়ে কাজ আরম্ভ করুন।

পুরোহিত। তুমি যে কৃপা করে আমায় তোমাদের সঙ্গী করলে, এজন্য তোমায় আমি সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

বাউল। গার্গী, আমাদের পূজা হয়ে গেল। সকলকে প্রসাদ বিতরণ করে দাও গে। সকলে যেন এক জায়গায় বসে প্রসাদ পায়। প্রসাদে জাতি বিচার ক'রো না, যেমন শ্রীক্ষেত্রে জাতি বিচার নেই। জগবন্ধু শ্রীক্ষেত্রেই আছেন, আমাদের বাড়িতে নেই, এ কথা মনে ক'রো না, তা হলে মাকে সঙ্কীর্ণ করা হবে, ছোট করা হবে। সকলে এক জায়গায় বসে প্রসাদ না পেলে পূজা ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর আজই আমি কলিকাতা রওনা হবো, আমায় যা কিছু সব গুছিয়ে রেখো। (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—হুগলী, সুরেশের বাসা।
(সুরেশ, কাত্যায়নী ও দীনেশ)

সুরেশ। পূজার ছুটি এসে পড়লো, এবার বাড়ি যেতে ইচ্ছা করেছি, তোমার কি মত ?

কাত্যায়নী। আমার তো বাড়ি যেতে ইচ্ছা খুবই, কিন্তু তুমি টাকার যোগাড় করতে পারলে হয়। কোনরকমে দিন চলে যাচ্ছে বই তো নয় ? খোরাকী খরচ দিয়ে এক পয়সাও বাঁচাবার উপায় নেই, কি নিয়ে যে বাড়ি যাবো তাই ভাবছি।

সুরেশ। আমার এক বন্ধু আমায় একশ' টাকা ধার দিতে প্রস্তুত আছেন, তা নিয়েই যাবো মনে করছি। কি করবো, চেষ্টা তো আর কম করছি না। মোকদ্দমাই নেই, দেশের অনেক স্থানেই সালিশী বিচার আরম্ভ হয়ে গেছে। সালিশী বিচার পেতে Court-এ কেউ আসতে চায় না, বোধ হয় কিছুদিন পরে সকল উকীলকেই বাড়ি যেতে হবে।

কাত্যায়নী। বাবা তোমায় বাড়ি বসেই এ কথা বলেছিলেন, তখন তুমি তাঁর অবাধ্য না হলে আজ আমাদের পেটের ভাবনায় অস্থির হতে হতো না।

সুরেশ। বাবার কথা তখন না শুনে কাজ ভাল করি নি। আমার খামার থাকতে আমি তার যত্ন নিই নি। যাদের খামার নেই, তারা আজ জমি করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। জমিব কথা ছাড়া লাইব্রেরীতে এখন অন্য কথা বড় একটা হয় না।

কাত্যায়নী। নিজের পায়ে নিজেই কুঠার মেরেছ, দোষ দেবে কার? এখনো যদি বুঝে চলো, তবুও বাঁচবার পথ হয়। কিন্তু তা কি তুমি কববে?

সুরেশ। তুমি কি করতে বলো?

কাত্যায়নী। পূজায় বাড়ি যেতে চাও চলো, গিয়ে বাবার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করো, বাবা দেবতা, মা আমাদের দেবী, তাঁরা আমাদের ক্ষমা করবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে।

সুরেশ। বাবার কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি আমায় ক্ষমা করবেন, এ বিশ্বাস আমারও আছে; কিন্তু ছেলেবেলা থেকে এমনভাবে তৈরী হয়ে এসেছি যে, গাঁয়ে এখন আর মন টেঁকে না।

কাত্যায়নী। পেটে যখন টান পড়েছে, তখন গাঁয়ে থাকাটা এখন মন্দ লাগবে না।

সুরেশ। মনে হয় তুমি আমায় ব্যঙ্গ করছ!

কাত্যায়নী। না, ব্যঙ্গ করবো কেন? যা সত্য, তাই বলছি। অভিমানেই তোমার পতন। তোমার নিজের শক্তি যে কত, তা যদি তুমি বুঝতে পারতে, তবে পিতামাতার অবাধ্য হয়ে আজ এ সর্বনাশ করতে না।

সুরেশ। সে অভিমানের জন্য আজ আমিও অনুতপ্ত। কিন্তু শহরের কি মোহিনী শক্তি আছে জানি না, আমায় শহর ছাড়তে হবে এ কথা মনে হলেই আমি যেন কেমন হয়ে পড়ি।

কাত্যায়নী। শহরের দোষ যে কিছু নেই তা নয়; তবে ছেলেবেলা থেকে বিলাসী হয়ে পড়েছ, গাঁয়ে গেলে সেইটে কমাতে হবে। একথা যখন মনে হয়, তখনই কেমন হয়ে পড়ো। তা না হলে, তেমন হবার তো কোন কারণই আমি দেখতে পাচ্ছি না।

সুরেশ। তুমি দেখছি আমায় রীতিমত আক্রমণ করছ! এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

কাত্যায়নী। আক্রমণ মোটেই করি নি। যদি তাই আমার উদ্দেশ্য হতো, তবে তুমি এতদিনে পাগল হয়ে যেতে। তোমার ভাগ্যি যে, আমার মত গৃহিণী পেয়েছিলে। আর আমিও ভাগ্যবতী যে, এমন দেব-দেবীর মত শ্বশুর-শাশুড়ী পেয়েছিলাম। তাঁদের চরণতলে বসে আমি আমায় তৈরী করে নিতে পেরেছি। তোমার অবস্থা যে এই হবে, তা আমি সেদিনই জানতে পেরেছি, যেদিন তুমি দেবতায় উপেক্ষা করেছ। বাড়ি যাবে মনে করেছ, তাই চলো, বাবার কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করো, তিনিই তোমার বাঁচবার পথ করে দেবেন।

দীনেশ। (বাহির থেকে) সুরেশবাবু, বাড়ি আছেন কি?

সুরেশ। আমার এক Friend এসেছেন, তুমি এখন ভিতরে যাও।

কাত্যায়নী। তোমার শহুরে বন্ধুদের দেখলেই আমার ভয় হয়। দেখো, যেন বাড়ি যাবার কথাটা আবার উল্‌টে না যায়। (প্রস্থান)

(দীনেশবাবুর প্রবেশ)

সুরেশ। আসুন, আসুন। কি মনে করে?

দীনেশ। শুনলাম পূজায় বাড়ি যাচ্ছেন? কতদিনে ফিরবেন, ছুটির পরে, না ভিতরে?

সুরেশ। বোধ হয় ছুটির ভিতরেই আসবো।

দীনেশ। হরিনারায়ণপুরের জমিদার তাঁর Estate-এ একজন ভাল উকীল চাচ্ছেন। আমি আপনার কথা বলেছি, চষ্টা করলে বোধ হয় এ কাজটা আপনার হয়ে যায়। বছরে হাজার টাকার ভুল নেই, বেশীও পেতে পারেন।

সুরেশ। এখানে আমার সহায়-সম্বল কিছুই নেই, যদি আপনি যোগাড় করে দিতে পারেন, তবে আমাদের বাঁচবার পথ হয়।

দীনেশ। যদি কিছু টাকার যোগাড় করতে পারেন, তবে আমি ঠিক করে দিতে পারি।

সুরেশ। ঐটিই তো আমার সাধ্যাতীত। কত টাকা হলে হতে পারে মনে করেন?

দীনেশ। ম্যানেজার আর সদর নায়েবকে পাঁচশ' টাকা ঘুষ দিতে হবে, কারণ তাঁরাই কর্মচারী নিযুক্ত করেন।

সুরেশ। আপনার সাথে কি তাঁদের এ সম্বন্ধে কোন কথা হয়েছে?

দীনেশ। হ্যাঁ, তাঁদের সাথে কথা বলে যতটা বুঝতে পেরেছি, তাতে পাঁচশ' টাকায়ই কাজ হতে পারে। স্থানীয় উকীলদের মধ্যে অনেকেই চেষ্টা করছেন। আপনি যদি টাকাব যোগাড করতে পারেন, তবে আমায় বলে দিন, আমি তাঁদের সাথে কথা পাকা করে ফেলি।

সুরেশ আমার কাছে বর্তমানে কিছুই নেই। তবে শুনেছি বাবা তাঁর সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ আমায় উইল করে দিয়েছেন, তাতে আমি কিছু জমি-জমা পেয়েছি। বাডি গিয়ে সেগুলি পত্তন করে বা বাঁধা দিয়ে যদি টাকার যোগাড করতে পারি, এ ছাডা অন্য উপায় নেই।

দীনেশ এ তো উত্তম কথা, জমি দিয়ে কি হবে? নিজে তো আর চাষ করতে পারবেন না, প্রজার হাতে দিতেই হবে। কিছু টাকা নিয়ে যদি পত্তন করেন, তবে খাজনা তো পাবেনই, এ চাকুরীটাও হয়ে যাবে।

সুরেশ। কথাটা মন্দ নয়, তবে বাডি না গিয়ে আপনাকে জবাব দিতে পারছি না। যদি আপনি আমায় word দিতে পারেন যে, এ কাজ হবেই, তবে আমি চেষ্টা করে দেখবো টাকাটা যোগাড করতে পারি কি না।

দীনেশ। হ্যাঁ, আমি আপনাকে word দিচ্ছি, আপনি টাকার যোগাড করুন।

সুরেশ। দেখবেন শেষে যেন সব পণ্ড হয়ে না যায়!

দীনেশ আপনি আমায় অবিশ্বাস করছেন? আমি যেদিন আপনার বর্তমান অবস্থার কথা শুনেছি, সেদিন থেকেই ভাবছি আপনার একটা কিছু করে দিতে পারি কি না। ভগ ানের কৃপায় এ কাজটা হাতে এসে পডেছে। এ কাজ যদি আপনার হয়ে যায়, তবে আব সংসারের ভাবনা আপনার ভাবতে হবে না।

সুরেশ। যদি যোগাড় করে দিতেই পারেন, তবে চিরদিন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।

দীনেশ। আপনি টাকার যোগাড় করুন, ম্যানেজার আমার Class friend, তাকে আমি যা বলবো সে তাই করবে।

সুরেশ। আচ্ছা, আমি যে কোনরকমে টাকার যোগাড় করবোই।

দীনেশ। তবে এখন আমি আসি, Good night। (প্রস্থান)

সুরেশ। গিন্নি গিন্নি, এদিকে এসো।

(কাত্যায়নীর প্রবেশ)

কাত্যায়নী। এত বড় গলায় ডাকছ যে, বন্ধু কিছু দিয়ে গেল নাকি?

সুরেশ। কিছু দিয়ে যায় নি বটে, তবে দেবার মধ্যে। একটা চাকুরী স্থির হয়ে গেল, হরিনারায়ণপুরের Estate-এর উকীল।

কাত্যায়নী। তবে বুঝি আর বাড়ি যাওয়া হবে না?

সুরেশ। বাড়ি যেতেই হবে, কারণ, এ চাকুরী নিতে হলে ম্যানেজারকে পাঁচ শ' টাকা দিতে হবে। কিন্তু বছরে হাজার টাকা পাওয়া যাবে।

কাত্যায়নী। এ টাকা পাবে কোথায়? কর্জ করবে? তা কেউ দেবে না। আমার যা ছিল তাও প্রায় শেষ করেছ।

সুরেশ। বাড়িতে যা বিষয়-সম্পত্তি আছে, তা বিক্রয় করে বা বাঁধা দিয়ে টাকা যোগাড় করবো মনে করেছি। এক বছরের মধ্যেই এ দেনা পরিশোধ করতে পারবো, এ বিশ্বাস আমার আছে।

কাত্যায়নী। দেনা করে টাকা এনে চাকুরী নেয়ার চেয়ে না নেয়াই আমি ভাল মনে করি। একেবারে ধনে-প্রাণে মারা যাবার ব্যবস্থা করছ? এর জন্য এত বড় গলায় ডাক দিয়েছিলে, লজ্জাও করে না?

সুরেশ। তুমি দেখছি আমায় একটা মানুষের মধ্যেই গণ্য করো না!

কাত্যায়নী। কি করে করবো? যে পুরুষ নিজের স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ করতে অক্ষম, সে কি একটা পুরুষের মধ্যে? আমি যদি পুরুষ হতাম, তবে দেখতে সংসারে কত কাজ করে ফেলতাম!

সুরেশ। থাক্, এ বীরত্ব তো চিরদিনই দেখে আসছি। এখন কি করা কর্তব্য তাই বলো! তোমার বাবার কাছে লিখে দেখো না, তিনি টাকাটা দেন কি না।

কাত্যায়নী। আমি আর বাবার কাছে টাকার জন্য লিখতে পারবো না। দেখো, শহুরে বন্ধুদের কথা শুনে আর কাজ নেই, পূর্বে যা বলেছি তাই করো, তাতেই তোমার মঙ্গল হবে।

সুরেশ। বলো কি? এমন একটা Chance সামনে এসে পড়েছে, এ কি ছাড়া যায়? চেষ্টা করে দেখতেই হবে।

কাত্যায়নী। আমি জানি যে, তুমি আমার কথা শুনবে না, তবু বলি, চাকুরী দিয়ে আর কাজ নেই, বাড়ি চলো।

সুরেশ। আচ্ছা, বাড়ি তো চলো, তারপর যা ভালো মনে করো তাই করা যাবে।

কাত্যায়নী। চলো, আমি সর্বদার জন্যই প্রস্তুত আছি। কিন্তু তোমার ভাঙা কপাল আর জোড়া লাগবে, সে আশা আমার নেই। যদি লাগতো, তবে দেবতার কথা উপেক্ষা করে শহরে আসতে না।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—কলকাতা, নন্দলালেব বাড়ি।

(নন্দলাল, সুরমা, বন্ধুদ্বয়, মাড়োয়ারী, প্যাদা, বাউল ও চাকর)

নন্দলাল। ম্যানেজার পত্র দিয়েছে, লাটের টাকা হ্যাণ্ডনোট কেটে নেওয়া হয়েছে। প্রজারা খাজনা দেয় না, তাদের নামে নালিশ রুজু করতেও নাকি বিশ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। সে টাকাও কর্জ করেই আনতে হয়েছে; তহবিলে টাকা নেই, আমিও এক বছর এখানে এসেছি, বাডিখানা এখন হোটেল বললেও অত্যুক্তি হয় না।

সুরমা। এ সকল খরচ তো নিজেই বাড়িয়েছ। কোথায় দু'মাস থেকেই যাবে, তাতে আজ এক বছর হয়ে গেল। আমি তোমায় পূর্বেই বলেছি, যে সকল বন্ধু তোমার জুটেছে, এরা সকলেই চরিত্রহীন, এদের হাত এড়াতে না পারলে তোমার সবই যাবে।

নন্দলাল। যোগাড তো সেই রকমই হযে উঠেছে। আমিও প্রায় দশ হাজার টাকা দেনা হয়ে পড়েছি, মাড়োয়ারী রোজই টাকার জন্য তাগিদ দিচ্ছে।

(চাকরের মদ নিযে প্রবেশ ; মদ রেখে প্রস্থান)

সুরমা। (হাত ধরে) গ্লাস রাখো বলছি!

নন্দলাল। সুরমা, যখন ডুবেছি, তখন আমায় ভাল করে ডুবতে দাও।

সুরমা। না, তুমি এ বিষ খেতে পারবে না। ভালো চিকিৎসক পেয়েছিলে! ভালো ঔষধ খাওয়া শিখিযেছে, ঔষধে এখন ভিটে-বাড়ি পর্যন্ত উচ্ছন্নে যাবার যোগাড় হয়ে উঠেছে!

নন্দলাল। বাধা দিও না, খেতে দাও। অন্ততঃ আজ খেতে দাও, আর খাবো না।

সুরমা। দেখি কেমন করে খাও? আমি তোমার স্ত্রী, সুখ-দুঃখের সাথী, তোমার শুভাশুভের ফল-ভোগী। আজ দেখবো কে বড়, সুরা, না সহধর্মিণী!

নন্দলাল। এই দেখো—একি? হাত অবশ হয়ে আসছে, বুকের পশুবল যেন মূর্ছিত হয়ে পড়ছে! কেন আজ এত কঠিন হলে সুরমা? ছেড়ে দাও, আমি প্রাণ ভরে পান করি!

সুরমা। আমার সব যেতে বসেছে, রাজরাণী আজ পথের ভিখারিণী হতে চলেছে, এখনো বলছ বাধা দেব না? আমি যে তোমার স্ত্রী, তোমার উপরে আমার দাবী যে কত, তা কি তুমি বোঝ না?

নন্দলাল। সব বুঝি সুরমা, সবই বুঝি। কিন্তু কি করবো! লোকে মদ খায়, আমায় যে মদে খেয়ে বসেছে! জানি তুমি সেই স্ত্রী যে শুধু দেহের সেবিকা নয়, আত্মার শুশ্রূষাকারিণী; বিলাসের ইন্ধনক নয়, উচ্চাশার সহায়; তুমি আমার সেই স্ত্রী, যে প্রমোদে রঙ্গিণী, কর্তব্যে পাষাণী! সুরমা, আমি কি মানুষ?

সুরমা। তোমার মত মানুষ ক'জন আছে?

নন্দলাল। আমি জানি, ঠাট্টা করছ না, কিন্তু আমার পক্ষে আজ এটা পরিহাস। মদে কি মনুষ্যত্ব থাকে? আমার আছে কি সুরমা! ঘরে খাবার নেই, বাইরে সুখ নেই, দেহে স্বাস্থ্য নেই, মনে শান্তি নেই, আমি কি উপলক্ষ্য করে ভালো হবো? কাকা আমার দেবতা, তাঁর কথা উপেক্ষা করে কলকাতায় এসে যা হয়েছি, তা তো দেখতেই পাচ্ছ। বাউল দাদাকেও কটু বলতে ছাড়ি নি; বাড়ি যেতে বলো, কোন্ মুখে গিয়ে তাঁদের কাছে দাঁড়াবো? সুরমা, এখন আমার মৃত্যুই মঙ্গল।

সুরমা। তুমি মদ ছেড়ে দাও, বন্ধুদের সঙ্গ ছেড়ে দাও, আবার তোমার সব হবে।

নন্দলাল। বহুদিন তো এমন সত্য কারো কাছে শুনি নি! কিন্তু এ যে জীবন-ভরা ভুল!

সুরমা। কি হয়েছে? দু-চারটা পতনে কি একটা জীবন ব্যর্থ হতে পারে?

নন্দলাল। সত্য করে বলো, আমার মত লোকেরও নিস্তার আছে?

সুরমা। **সব অপরাধেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে।**

নন্দলাল। **সুরমা! আমি যদি কোনদিন মানুষ হই, সে তোমারি জন্যে, তোমারি পুণ্যে।**

(নেপথ্যে বন্ধুদ্বয়ের কণ্ঠস্বর)

বন্ধুদ্বয়। নন্দবাবু বাড়ি আছেন?

সুরমা। বাইরে কে ডাকছে! বোধ হয় তোমার বন্ধুরা সব এসেছে, ওদের তাড়িয়ে দিতে বলো।

নন্দলাল। সব ভদ্রলোকের ছেলে, তাড়িয়ে দেবো কি করে? আচ্ছা, আজ বলে দেবো—তারা যেন আর কখনো এ বাড়িতে না আসে। তুমি এখন ভিতরে যাও! (সুরমার প্রস্থান)

নন্দলাল। আপনারা এদিকে আসুন।

(বন্ধুদ্বয়ের প্রবেশ)

সুরেন। তোমায় এখন আর সব সময় পাওয়া যায় না, গিন্নির প্রেমে মজে গেলে নাকি?

নন্দলাল। তা যা-ই কেন হই না, তোমরা আর আমার বাড়ি এসো না, তোমরাই আমার সর্বনাশ করেছ।

সুরেন। যখন আসতে নিষেধ করলে, তখন আর আসব না। আজ যখন এসে পড়েছি, তখন একটু ফুর্তি হোক না! ওরে ঢাল্ না, মদ ঢাল্, নন্দকে দে।

নন্দলাল। তোমরা খাও, আমি দেখবো; আমি আর খাবো না প্রতিজ্ঞা করেছি।

সুরেন। আরে ও প্রতিজ্ঞা মদখোর দিনে পাঁচটা করে। ও প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গে মাতালের কোন দোষ হয় না। দেশ দেখা আর মদ চাখা তিন-ইয়ারে তেরস্পর্শ না হলে কি আর মশ্‌গুল হয় রে?

প্রমোদ। আ-রে! মাগের পাল্লায় পড়ে এ—কেবারে বিধবা সাজলে নাকি?

নন্দলাল। যা-ই বলো, আমাকে তোমাদের দল থেকে বাদ দিতে হচ্ছে!

প্রমোদ। তুমি না খাও না খাবে, দু'টা ভ—দ্রলোক এসেছে, তাদের পে—যালা ভ—রে দিয়ে খুশী করো!

(চাকরের প্রবেশ)

চাকর। বাবু! মালক্রোকের পরোয়ানা নিয়ে মাড়োয়ারী আর প্যাদা এসেছে।

নন্দলাল। হা ভগবান্!

(প্যাদা ও মাড়োয়ারীর প্রবেশ)

প্যাদা। আমি আপনার যাবতীয় মাল ক্রোক দিলাম। যদি টাকা দিতে পারেন, তবে মাল ফেরৎ রাখতে পারেন।

নন্দলাল। আমি আর কি করে রাখবো? আপনারা সব নিয়ে যান।

প্যাদা। মাল বের করো দারোয়ান।

(বাউলের প্রবেশ)

বাউল। বের করতে হবে না, অপেক্ষা করুন। আপনাদের কত টাকা পাওনা?

প্যাদা। দশ হাজার টাকা পাঁচ আনা।

বাউল। অপেক্ষা করুন, আমি টাকা দিচ্ছি। (ব্যাগ খুলে) এই নিন, দশ হাজার টাকার একখানা চেক। বেঙ্গল ব্যাঙ্কে, ভাঙিয়ে নেবেন।

প্যাদা। (টাকা গ্রহণ করে) এই নিন রসিদ, ডিক্রী আমরাই মকস্মলি করে দেবো। (প্রস্থান)

বাউল। দারোয়ান! এদের ঘাড় ধরে বের করে দে তো!

প্রমোদ। আমাদের বের করে দিতে হবে না, আমরা নিজেরাই যাচ্ছি। (বন্ধুদ্বয়ের প্রস্থান)

নন্দলাল। এসেছ বাউল দাদা! সময় মতনই এসেছ; আর কিছু সময় পরে এলে বোধ হয় দেখা পেতে না। তোমরা দেবতাই বটে, (পায়ে পড়ে) আমার সকল ত্রুটি মার্জনা করো!

বাউল। কেন তোমায় কলকাতা আসতে নিষেধ করেছিলাম, এখন বুঝতে পেরেছ? এ জায়গার পরিণামই এই। যে কোন রাজা, জমিদার এখানে এসেছেন, তাঁরা অনেকেই ধ্বংস হয়ে গেছেন; যাঁরা আছেন, তাঁরাও ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছেন। এক দিন স্বর্গীয় ঋষি রাজনারায়ণবাবু তাঁর প্রিয় ভক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়কে বলেছিলেন—"অশ্বিনি! তোকে দেখে মনে হয়, তুই জগতে একটা কিছু কাজ করবি। একটা কথা তোকে বলে দিচ্ছি, বৃদ্ধের এ কথাটা রক্ষা করিস্, মঙ্গল হবে। গঙ্গা যার পশ্চিমে, কাশীপুর যার উত্তরে, মারাঠা ডিচ যার পূর্বে, টালিগঞ্জ যার দক্ষিণে, এই যে স্থানটুকু, অর্থাৎ কলকাতা—এর ভিতরে যেন তোর কর্মক্ষেত্র না হয়, এখানে মানুষ মানুষ থাকে না।" ঋষিবাক্য কি কখনও মিথ্যা হয়? কলকাতা এখন ঠিক তাই হয়েছে।

(সুরমার প্রবেশ)

সুরমা। এসেছ বাউল দাদা ! রক্ষা করো আমাদের, আমরা পথে দাঁড়িয়েছি। আর একটু পরে এলে বোধ হয় শ্মশানে দেখতে পেতে।

বাউল। মা তোমাদের রক্ষা করেছেন। আজই বাড়ি যাবার যোগাড় করো। সম্পত্তি এখন লাটের টাকার দায়ে নিলামে উঠেছে। যাকে ম্যানেজার করে রেখে এসেছিলে, তাঁর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়ি না গেলে সব যাবে।

সুরমা। আচ্ছা, আমি রান্না তৈরী করি গে, খেয়েই আমরা গাড়িতে উঠবো।

(প্রস্থান)

বাউল। কেন তোমায় কলকাতা আসতে নিষেধ করেছিলাম, এখন বুঝতে পেরেছ তো ?

নন্দলাল। সেকথা বলে আর আমায লজ্জা দেবেন না। বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন, গিয়ে আমি দাঁড়াবো কোথায় ? খাবো কি ?

বাউল। সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি কলকাতা আসাবধি আমরাও একেবারে নীরব ছিলাম না, কাজেই ছিলাম ; বাড়ি গিয়েই সব দেখতে পাবে। এখন ভেতরে চলো, আজ সন্ধ্যার গাড়িতেই রওনা হতে হবে। আমি এইমাত্র শেয়ালদায় গাড়ি থেকে নেমে এখানে এসেছি।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—কিশোরীলালের বাড়ি।

(কিশোরীলাল, যোগেন ও চাকর)

কিশোরীলাল। যোগেন ! তোমার দাদার পত্র পেলাম, সে বউমাকে নিয়ে বাড়ি আসছে ; তাদের যত্নের যেন কোনরকম ত্রুটি না হয়। বউটি আমার লক্ষ্মী, তার বাড়ি ছেড়ে যাবার ইচ্ছা ছিল না, হতভাগা তাকে জোর করে নিয়ে গেছে।

যোগেন। দাদা বাড়ি আসছেন, এ তো আনন্দের বিষয় ; যত্নের ত্রুটি হবে কেন ? শহরে গেছেন বলেই কি দাদা পর হয়ে গেছেন ? তিনি

পর মনে করতে পারেন, কিন্তু আমার যিনি দাদা, তিনি চিরদিন দাদাই থাকবেন।

কিশোরীলাল। হ্যাঁ, এই তো চাই, ভাই-ভাই কখনো যেন বিরোধ না হয়। বাংলার অনেক সোনার সংসার এই ভ্রাতৃ-বিরোধে ধ্বংস হয়ে গেছে।

(চাকরের প্রবেশ)

চাকর। বাবু, আমি কলকাতা থেকে এই পত্রখানা নিয়ে এসেছি!

(পত্র প্রদান ও প্রস্থান)

কিশোরীলাল। (পত্র পাঠ করে)

কিশোরী!

আমি নন্দ আর সুরমাকে নিয়ে কাল বেলা একটায় স্বর্ণপুরে পৌছাব। তুমি এদের রীতিমত অভ্যার্থনার আয়োজন করো।

ইতি—

"বাউল"

—যোগেন, যাও, ব্যাগুপার্টি ঠিক করো, স্বর্ণপুরের প্রত্যেক বাড়ি যেন জানান হয়, রাত্রে দীপযাত্রা হবে। স্বর্ণপুরে আজ আনন্দের তুফান বইয়ে দাও।

যোগেন। যে আজ্ঞে! (উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—নন্দলালের বাড়ি।

(নন্দলাল, কিশোরীলাল, বাউল, প্রজাগণ, যোগেন ও বালকগণ)

(গীত)

বালকগণ— ভাই চল্ রে চল্ রে চল্
করমের নিশান উড়ায়ে চল্;
বাজা মা-নামের ভেরী,
ধরা হউক রে টল্মল্।
চল্ চল্ চল্॥

বসে কি ভাবিস্ তোরা,
ডাকছে মা দিস্ নে সাড়া,
তোরা কি জ্যান্ত-মরা হলি রে সকল ?
চল্ চল্ চল্॥
দেবতা ঐ মাথার 'পরে,
অভয় দিচ্ছেন অভয় করে ;
যায় যদি প্রাণ দেশের তরে,
পাবি মোক্ষ ফল।
চল চল্ চল্॥
মায়ের নামে ডঙ্কা দিয়ে,
দাঁড়া বে তোরা বুক ফুলিয়ে ;
দেখে মুকুন্দ জয় মা বলে,
বাজাক রে বগল।
চল্ চল্ চল্॥

(বাউল ও নন্দলালের প্রবেশ)

বাউল। যাও নন্দ, কাকার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করো !

নন্দলাল। কাকা—ক'কা ! আপনি আমার সকল ত্রুটি মার্জনা করুন। (চরণে পতিত)

কিশোরীলাল। ওঠো বাবা! আরে তুই কি আমার পব। দাদাব মৃত্যুর পরে তোকে আমিই মানুষ করেছি। তুই যে আমাব বুকেব ধন ; আবার তোকে এমনভাবে বুকে ফিরে পাবো তা আমি ভাবতে পাবি নি।—আজ তোমার এই উদ্ধাবের মূল বাউল ঠাকুর, তাঁর চরণে কৃতজ্ঞতা জানাও।

নন্দলাল। বাউল দাদা, ছোট ভাইয়েব ত্রুটি মার্জনা করুন ! বলুন, আমায় ক্ষমা করলেন ?

বাউল। ক্ষমা অনেকদিনই করেছি নন্দ। কেন তোমায আমবা কলকাতা যেতে নিষেধ করেছিলাম, তা বোধ হয় এখন বেশ বুঝতে পেরেছ !

নন্দলাল। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, কলকাতার মোহ আমার একেবারে কেটে গেছে। দেশের রাজা-জমিদারদের মোহ যাতে কাটে, সেজন্য আমি এখন প্রাণপণে চেষ্টা করবো। এখন আমার জীবনের কর্তব্য কি বলে দিন। জমিদারী বোধ হয় নিলাম হয়ে গেছে, এখন আমি দাঁড়াবো কোথায় ?

কিশোরীলাল। তোমার জমিদারী পূর্বে যা ছিল, এখনো তাই আছে। লাটের টাকা আমরাই দিয়েছি, ম্যানেজার স্টেট ধ্বংস করার চেষ্টা করছিল, কিন্তু সে কৃতকার্য হতে পারে নি। বর্তমানে তার কোন খোঁজই পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ কেউ বলেন—প্রজারা তাকে মেরে ফেলেছে; খাঁটি খবর এখনো পাই নি। প্রজারা তোমায় দেখতে এসেছে, তাদের আনন্দ ধরে না। তারা তোমাকে নজরানা দেবে, তা তুমি গ্রহণ করো না। জমিদারী আবার তুমি বুঝে নাও। আর, তোমার বাবা দশ লক্ষ টাকা মজুত রেখে গিয়েছিলেন, সে মাত্র আমিই জানতাম; এবং লোহার সিন্দুকের চাবি তিনি আমার কাছেই দিয়ে যান। একদিন তুমি সে চাবি চেয়েছিলে, কিন্তু তখন আমি দিই নি। আজ সে চাবি দিচ্ছি, তুমি টাকা বুঝে নিয়ে আমায় দায় থেকে মুক্ত করো! (চাবি প্রদান) মালখানায়ই সে সিন্দুক আছে।

বাউল। এখন তোমার শুধু জমিদারী নিয়ে বসে থাকলেই চলবে না, এই স্বর্ণপুরের সেবায় লাগতে হবে। এমনভাবে একে তৈরী করতে হবে, যেন ভারতের প্রতিটি পল্লী এই স্বর্ণপুরের আদর্শে তৈরী হয়। এই ব্রতই তোমার জীবনের সাধনা করে নাও, তবেই তোমার কর্তব্য শেষ হবে।

নন্দলাল। আপনার আদেশ প্রতিপালন করতে যদি আমায় সমস্ত সম্পত্তি এই স্বর্ণপুরের সেবায় দান করতে হয়, আমি তাতেও প্রস্তুত। বলুন, আমায় কি করতে হবে?

বাউল। যোগেন-কেদার প্রভৃতি দশটি বন্ধু একত্র হয়ে একটি কৃষিসঙ্ঘ তৈরী করেছে। দু'জন কৃষিক্ষেত্রে কাজ করছে, আর ক'জন ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান চলে গেছে। তাদের ইচ্ছা বিদেশ থেকে কিছু কাজ শিখে এসে দেশে কাজের পত্তন করে, বর্তমানে ওরা একটা স্থতোর মিল প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

নন্দলাল। এখন কি করে তা করবে? আর মিল চালাবেই বা কে?

বাউল। ওদের ইচ্ছা ইউরোপ থেকে একজন ইঞ্জিনিয়ার দশ বছরের জন্য কনট্রাক্ট করে এনে কাজ আরম্ভ করে দেয়। তার পরে ছেলেরা এসে যখন তাদের কাজ বুঝে নেবে, তখন তাকে বিদায় দেওয়া হবে। জাপান, কাবুল প্রভৃতি দেশেও তারা এমনিভাবে বিদেশ

থেকে লোক এনে কাজ আরম্ভ করেছে। কিন্তু ওদের টাকার অভাব। আমি বলি তুমি ওদের টাকাটা দিয়ে দাও, পরে তোমার টাকা ওরা পরিশোধ করবে। যোগানের ইচ্ছা ছেলেরা ফিরে আসার পূর্বেই মিলের কাজ আরম্ভ করে দেয়।

নন্দলাল। আমার তো মনে হয় এখন মিল বসালে খুব high tax বসিয়ে দেবে, কাজেই ওরা মিল চালাতে পারবে না।

বাউল। আমার মনে হয় সরকার বাহাদুর এখন আর এতটা বাড়াবাড়ি করবেন না। এ দেশের শিল্পোন্নতির জন্য বোধ হয় তারাও একটু সাহায্য করতে বাধ্য হবেন।

নন্দলাল। আপনার যদি সে বিশ্বাস হয়ে থাকে, তবে বাবা যে দশ লক্ষ টাকা মজুত রেখে গেছেন, তা আমি স্বর্ণপুরের সেবার জন্য আপনার হাতে দিচ্ছি, আপনি কাজ করুন। এই নিন্ সে সিন্দুকেব চাবি।

বাউল। (চাবি নিয়ে) আনন্দম্, আনন্দম্!

(গীত)

ভরসা মাযেব চরণ-তরণী।
আমরা এবার হবোই পার,
ভয় গেছে দূবে, অভয় পেযেছি,
মাভৈঃ বাণী শুনেছি মা'র।
বীর-প্রসবিনী জননী মোদেব,
বীরের জাতি আমরা বীব,
বিলাসে ব্যসনে ধরে ছিল জরা,
নত হয়ে ছিল উন্নত শির ;
জানি না কাহার চরণ পরশে,
উজলি উঠিল পূববাকাশ,
মোহ-মদিরার নেশা গেল ছুটে,
তামসী নিশার হইল নাশ ;
জাগিল স্মৃতিতে পূরব গরিমা,
কালিমা মোছাতে হবেই হবে,
দাঁড়া রে সকলে জয় মা বলিয়া,
তোদের বিজয় হবেই হবে॥

প্রজাগণ। আদাব—আদাব—

(নন্দলালকে ফুলের মালা প্রদান)

বাউল। এই রমজান আর করিম তোমার জমিদারীর ভিতরে খুব বড় জোতদার। রমজানের খামারে বার্ষিক আশী হাজার টাকার উপরে আয় হয়। করিমেরও প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা হয়। কলকাতা যাওয়ার সময় এই রমজানই আমায় দশ হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছিল। তা না হলে আমি তোমায় মাড়োয়ারীর হাত থেকে উদ্ধার করতে পারতাম না। রমজানের দশ হাজার টাকা তাকে এখনি ফেরৎ দিয়ে দাও।

রমজান। না—সে টাকা আমি নেবো না। আমি সে টাকা মনিবকে নজরানা দিলাম। দশ হাজার টাকা দিয়েও যে আমরা মনিবকে ফিরে পেয়েছি, সেই আমাদের সৌভাগ্য। খোদার দোয়ায় আমার বহু টাকা আছে। যাঁর খেয়ে আমরা বেঁচে আছি, আজ তাঁরি সেবার জন্য দশ হাজার টাকা দিয়েছি। সে টাকা যদি আমি ফিরিয়ে নিই বাউল দাদা, তবে খোদার কাছে জবাব দেবো কি ?

নন্দলাল। বাউল দাদা ! আমার স্বর্ণপুরে এমন সব দেবতা আছেন, এ যদি আমায় পূর্বে জানাতেন, তবে বোধ হয় আমার জীবনে এমন একটা কালো দাগ লাগতো না। এসো ভাই রমজান, আমি তোমায় আলিঙ্গন করে ধন্য হই ! (আলিঙ্গন)

(গীত)

বাউল—

বিশ্বপতির বিশ্ব-বীণায়
পঞ্চমে ধরেছে তান,
তা নইলে কি এমনি করে,
পাগল হতো সবার প্রাণ ॥
ধনী-মানী মেথর কুলী,
বৃদ্ধ-যুবা বালকগুলি,
তাই তো সবে আপন-হারা,
আজ হিন্দু পার্শী মুসলমান ॥
অজানা দেশের টানে,
কারো মানা কেউ না মানে,
কালের স্রোতে ভাসিয়ে তরী,
আজ সবাই তরী বায় উজান ॥

এই তো রে ভাই কালের গতি,
আজ পতন কাল উন্নতি,
উঠলে পরেই নামতে হবে
আমার প্রেমময়ের এই বিধান ॥

বাউল। রমজান আমাদের মিল প্রতিষ্ঠার জন্যও লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছে। দেশের উন্নতির জন্য এ মুক্তহস্ত। এমন আরো অনেক প্রজা তোমার আছেন, যাঁরা স্বর্ণপুরের সেবার জন্য অজস্র দান করতে প্রস্তুত।

নন্দলাল। কাকা, তা হলে আপনি আর বাউল দাদা যত শীঘ্র হয় কাজ আরম্ভ করে দিন, টাকার অভাব হবে না। আমার জমিদারীতে যা আয় হয়, সংসার চালাতে যা লাগবে, তা রেখে বাকী টাকা সবই আমি আমার স্বর্ণপুরের সেবায় দান করতে প্রস্তুত আছি।

কিশোরীলাল। তোমার এ সাধু প্রস্তাবে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। আশীর্বাদ করছি, মা তোমার সহায় হউন।

বাউল। এ সব কথা এখন থাক। যোগেন, তুমি তোমার দাদাকে নিয়ে ভিতরে যাও, গাঁয়ের মেয়েরা নন্দকে দেখবার জন্য ভিতরে অপেক্ষা করছেন। (নন্দকে নিয়ে যোগেনের প্রস্থান)

বাউল। কিশোরী, তুমি আমার সঙ্গে চলো। রমজান, করিম, তোমরাও আমাদের সঙ্গে এসো। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—হুগলী, সুরেশের বাড়ি।

(সুরেশ, কাত্যায়নী, মুহুরী ও প্যাদা)

কাত্যায়নী। আজ কাছারীতে কিছু পেয়েছ কি?

সুরেশ। না, মোকদ্দমাই নেই।

কাত্যায়নী। শুনছি, তুমি নাকি লাইব্রেরীতে বসে কেবল তাস-পাশা-দাবাই খেলো? এতদিন ওকালতী করছ, কিন্তু আমার বাবার কাছ থেকেই টাকা এনে সংসার চালাতে হচ্ছে। আমি কিন্তু আর কখনো টাকার জন্য বাবাকে জ্বালাতন করতে পারবো না বলে রাখছি!

সুরেশ। কি করবো কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছি না। আমার ওকালতীতে সুবিধা হবে বলে মনে হয় না। যাঁরা পুরানো উকীল, তাঁদেরই পসার দিন দিন কমে যাচ্ছে, নূতন উকীলদের আর ডাকে কে?

কাত্যায়নী। বাবা তোমায় বাড়ি বসেই এ কথা বলেছিলেন, কিন্তু তখন সে কথা তুমি কানেই তুললে না। মানুষ যতই সত্যের দিকে অগ্রসর হবে, ততই মামলা-মোকদ্দমা কমে যাবে, এ সহজ কথাটা তখন তিনি তোমায় বোঝাতে পারলেন না। যাক্, দোকানী আর ধারে জিনিস দিতে চাচ্ছে না; তারই বা দোষ কি, প্রায় একশ' টাকার মত বাকী পড়েছে। আজ যে কি খাবে, তারও কিছুই যোগাড় দেখছি না।

সুরেশ। তোমার বাবার কোন পত্র পেয়েছ?

কাত্যায়নী। হ্যাঁ, তিনি লিখেছেন, ভাল জামাই এনেছিলাম! বিবাহের সময় যা দেবার তা তো দিয়েছিই, এখন তার গুষ্ঠি পর্যন্ত পুষতে হচ্ছে! আমায় আর কখনো টাকার জন্য পত্র দিও না। তোমাদের জন্য কি এখন ভিটে-বাড়ি বিক্রী করতে বলো?

সুরেশ। কি, এতদূর? তুমি আর তাঁকে পত্র দিও না, দেখি সংসার চালাতে পারি কি না!

কাত্যায়নী। রাগো কেন? এতদিন তিনিই তোমার সংসার চালিয়েছেন, তা না হলে উপোস করে থাকতে হতো। নিজের যে সংসার চালাবার ক্ষমতা নেই, সেইটে স্বীকার করো না কেন?

সুরেশ। সংসার চালাতে অক্ষম, এ কথা স্বীকার করবো কেন? আমি কি লেখাপড়া শিখি নি?

কাত্যায়নী। যে লেখাপড়ায় মাগ্‌-ছেলের পেটের ভাত যোগাতে পারে না, সে লেখাপড়া না শিখলেও হয়। আমার মতে বাড়ি চলো, জমি-জমা যা আছে তাতেই সচ্ছলভাবে সংসার চলে যাবে; কিছু কিছু সঞ্চয়ও হতে পারে।

সুরেশ। সে জমি-জমা কি এখনো আছে? সে সব যে যোগেন দখল করে বসে আছে, বাবা সবই যোগেনকে দিয়েছেন।

কাত্যায়নী। আমার বিশ্বাস হয় না। শ্বশুরমহাশয় দেবতা, তিনি সকলকেই সমানভাবে দিয়েছেন, তুমি খোঁজ করো।

সুরেশ। আমি খোঁজ না নিয়ে কি বলছি? বাবা আমার উপরে খুব

রেগেছেন, তাঁর কথা উপেক্ষা করে শহরে আসাই এই রাগের কারণ। তিনি জমি-জমা সবই যোগেনকে দিয়েছেন।

কাত্যায়নী। এ কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না। তুমি ভাল করে খোঁজ নাও, তোমার যা প্রাপ্য, বাবা তোমায় তা নিশ্চয়ই দিয়েছেন।

সুরেশ। তুমি যা বলছ তাই বটে। বাবা আমায় সবই দিয়েছিলেন। কিন্তু সে জমিও আমি প্রজার হাতে পত্তন করে এসেছি ; তারা এখন আমায় খাজনা দেয় মাত্র, তাও সব আদায় হচ্ছে না।

কাত্যায়নী। এতদিন তো তুমি এ কথা আমায় বলো নি! তবে এখন আমাদের নাই বলতে কিছুই নেই! হায় ভগবান! একেবারে পথে দাঁড় করালে? (ক্রন্দন)

সুরেশ। এখন আর কাঁদলে কি হবে? বর্তমানে কর্তব্য কি তাই বলো! বাবাকে পত্র দেবো কি? তিনি কি আমায় ক্ষমা করবেন?

কাত্যায়নী। তাই করো, আজই বাবাকে পত্র দাও। আজই বাড়ি চলো, বাবার পায়ে ধরে কাঁদবো, তিনি স্নেহের সাগর, তাঁর স্নেহে আমরা বঞ্চিত হবো না।

সুরেশ। তা হলে বাবাকে পত্র দিয়ে দিই যে, আমরা বাড়ি আসছি। যাও, তুমি যাবার জন্য প্রস্তুত হও গে।

কাত্যায়নী। আচ্ছা, আমি গুছিয়ে নিই গে।

(প্রস্থান)

সুরেশ। কোন্ মুখে গিয়ে বাড়িতে উঠবো! বাবা কি আমায় ক্ষমা করবেন? তাঁর অবাধ্য হয়ে শহরে এসেছি। তিনি কত করে বুঝিয়েছিলেন, তখন তাঁর সাথে কত তর্ক করেছি, তাঁর প্রাণে ব্যথা দিয়েছি, সে বেদনার এখন আমার প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে। এখন উপোস করে দিন কাটাতে হয়। বাউল দাদা যা বলেছিলেন, তা বর্ণে বর্ণে সত্য। দেশ ছেড়ে বিদেশে এসেই আমরা সোনার সংসার ছারখার করে ফেলি, ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হয়ে পড়ি। শহরে এসেছিলাম, যদি গিন্নিকে সঙ্গে না আনতাম, তবে আজ খামার-জমিগুলি এমন করে পরের হাতে যেতো না। থাক্, এখন ভাববার সময় নেই, বাড়ি গিয়ে বাবার পায়ে পড়ে কৃত অপরাধের ক্ষমা-ভিক্ষা করবো। যদি তিনি ক্ষমা না করেন, তবে তাঁর চরণতলে বসেই এ অনুতপ্ত

জীবনের শেষে ব্যবস্থা করে চিরবিদায় গ্রহণ করবো। যাই, বাড়ি যাবার জন্য প্রস্তুত হই গে।

(মুদী ও প্যাদার প্রবেশ)

প্যাদা। মহাশয়, আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করলাম। আপনি এই মুদীর দোকানে একশ' টাকা দশ আনার দেনাদার, ইনি দস্তকের পরোয়ানা বের করেছেন।

মুদী। আমি আপনাকে কতদিন বলেছি যে মশায়, আমার পাওনা চুকিয়ে দিন। কিছু কিছু করে দিলেও এতদিনে শোধ হয়ে যেতো। কিন্তু আপনার কাছে টাকার কথা বললেই, আপনি যা-তা বলে বিদায় করে দিতেন। পাওনা টাকা চাইলেও এ দেশের বাবুদের মান খসে যায়, অপমান বোধ হয়! এখন কি সম্মানটা বেশী হলো?

সুরেশ। তাই তো! এখন উপায় কি? জেলে যেতেই হচ্ছে, শহরের এই পরিণাম!

(কাত্যায়নীর প্রবেশ)

কাত্যায়নী। আপনাদের কত টাকা পাওনা?

প্যাদা। একশ' টাকা দশ আনা।

কাত্যায়নী। একটু অপেক্ষা করুন, আমি টাকা দিচ্ছি। (হাতের অনন্ত খুলে স্বামীর হাতে দিয়ে) তুমি এ নিয়ে এক মহাজনের ঘরে বিক্রী করে এদের টাকা দিয়ে দাও।

সুরেশ। তুমি আমায় চিরদিনের জন্যে ঋণী করলে।

কাত্যায়নী। আমি আমার কর্তব্য করেছি। তোমার চেয়ে আমার গহনা বেশী নয়। (প্রস্থান)

সুরেশ। একেই বলে সহধর্মিণী, যে নিজের সর্বস্ব দিয়েও স্বামীকে বাঁচায়। এ রত্ন শুধু ভারতেই জন্মায়, জগতের কোন স্থানেই এ রত্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। এর জন্যই ভারতবাসী ভাগ্যবান। স্বামীর চরণ-সেবাই যাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত, স্বামীর মুখ প্রফুল্ল দেখলে যারা স্বর্গ-সুখ উপভোগ করে, সে রত্ন আমরা পদদলিত করে চলেছি। ভারতবাসী! মস্ত বড় ভুল করছ, এরা সত্য সত্যই তোমাদের গৃহলক্ষ্মী। এ গৃহলক্ষ্মী পদদলিত করে জাতির সর্বনাশ ক'রো না। এদের পূজা করতে শেখো, জাতীয় জীবনের ভিত্তি অল্পদিনেই গঠিত হয়ে যাবে। এমন গৃহলক্ষ্মী পেয়েও যদি জাতি তৈরী না

হয়, তবে সে ভারতবাসীর অদৃষ্টের দোষ। আজ আমিও ধন্য যে, এমন গৃহলক্ষ্মী আমার মতন হতভাগাও পেয়েছে। চলো ভাই, তোমাদের টাকা দিয়ে মুক্ত হই গে। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে, আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বাউলের বাড়ি।

(বাউল, কিশোরীলাল গার্গী)

বাউল। কেমন হলো, কিশোরীবাবু?

কিশোরীলাল। এতটা পরিবর্তন হবে, এ আমি আশা করি নি। পরশ-পাথরের স্পর্শে লোহা যেমন সোনা হয়, নন্দও আজ আপনার স্পর্শে সোনা হয়ে গেছে।

বাউল। এ দেশের রাজা-জমিদারদের প্রাণ খুবই উদার এবং মহৎ। কতকগুলি ভাল জিনিস নিয়েই এরা জন্মায়। পূর্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য না থাকলে কি আর এত বড় ঘরে জন্মায়? অসৎ লোকের পাল্লায় পড়েই এরা এদের বিবেক হারিয়ে ফেলে, তা না হলে প্রায় সব বিষয়েই এরা আমাদের চেয়ে উন্নত। নন্দের এই পরিবর্তনের মূল তার স্ত্রীর সুরমা, বউমাটিই এ সংসারের লক্ষ্মী; আমি অমন মেয়ে খুব কমই দেখেছি।

কিশোরীলাল। আমার বউমার তুলনা নেই, সত্য সত্যই সে এ সংসারের লক্ষ্মী। কলকাতা যাবার সময়ও নন্দকে অনেক বাধা দিয়েছিল।

বাউল। যাক্ সে কথা। তোমার ছেলে সুরেশ ওকালতী ত্যাগ করে বাড়ি আসছে, এলে তার যা কিছু আছে সবই তাকে বুঝিয়ে দিও।

কিশোরীলাল। তার সবই তো সে প্রজার হাতে দিয়ে গেছে।

বাউল। হ্যাঁ, সে সব আমি হাজার টাকায় রমজানের নামে বেনামা করে রেখে দিয়েছি। সুরেশের পরিবর্তন হবেই, আজ অথবা কাল।

কিশোরীলাল। আমার কর্তব্য আমি শেষ করেছি।

বাউল। তোমার কর্তব্য যে তুমি শেষ করেছ তা আমি জানি।

(গার্গীর প্রবেশ)

গার্গী। বাবা!

বাউল। কি—মা?

গার্গী। মেয়েরা বলে পাঠিয়েছে, বাবা যেন আজ একবার আমাদের বিদ্যালয়ে আসেন, তারা অনেক নূতন কাজ করেছে, তা আপনাকে দেখাবে।

বাউল। আনন্দের কথা! মেয়েদের বলে দিও, আজ বেলা দু'টার সময় আমি বিদ্যালয় দেখতে যা'বো। তোমার বিদ্যালয়ে এখন ছাত্রীর সংখ্যা কত?

গার্গী। এক শ'য়ের উপরে হবে।

বাউল। বেশ। মনে রেখো, শুধু লেখাপড়া শেখালেই হবে না, তাদের ধর্ম-জীবন, কর্ম-জীবন দু-ই এখান থেকে তৈরী করে দিতে হবে, যেন তারা সংসারে গিয়ে আদর্শ গৃহিণী হয়ে দাঁড়াতে পারে। শ্বশুর-শাশুড়ী যেন তাদের সেবায় আনন্দে ভরপুর হয়। বর্তমানে বাংলার অবস্থা বড়ই ভীষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, বউ ঘরে এলেই শ্বশুর-শাশুড়ীর বুক শুকিয়ে যায়। তোমার বিদ্যালয়ে যাতে গৃহলক্ষ্মী তৈরী হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবে।

গার্গী। অনেক মেয়েই বিয়ে করতে চায় না। বলে, আমরাও আপনার মত কুমারী থেকে দেশের সেবা করবো।

বাউল। সকলেই যদি বিয়ে না করে, তবে সংসার থাকবে কি করে? আর, আমাদেরই বা এ কর্মক্ষেত্র তৈরী করার কোন আবশ্যকতা ছিল কি? বিবাহিত জীবনই সুন্দর, যদি ত্যাগই জীবনের মূলমন্ত্র হয়। বেশী সন্ন্যাসী দিয়ে কাজ নেই, দু'একটি আদর্শ থাকলেই হবে। এ দেশে সন্ন্যাসী যথেষ্ট আছে, আর সন্ন্যাসী দিয়ে প্রয়োজন নেই এখন চাই আদর্শ গৃহস্থ। বিয়ে না হলে জীবনের একদিক অপূর্ণ থেকে যায়। বহু স্বামীজী হয়ে দেশটাকে উচ্ছন্নে দিতে বসেছেন। যুবকগণ ধর্ম ধর্ম করে কর্মহীন হয়ে পড়ছে। এ বিংশ-শতাব্দীর কর্মযুগে স্বামীজীরা কিছুদিনের জন্য অবসর নিলেই ভাল হয়। ধর্মোপদেশ এখন কিছুদিন তাঁরা শিকেয় তুলে রাখুন, ধর্ম ভারতবাসীর পৈতৃক সম্পত্তি। অভাব আমাদের অন্ন-বস্ত্রের, এ অভাব যদি দূর হয়ে যায়, তবে ধর্ম এ দেশে আপনা থেকেই ফুটে বের হয়ে পড়বে। এখন বুঝতে পেরেছিস মা?

গার্গী। হ্যাঁ বাবা বুঝতে পেরেছি। আর একটা কথা—মেয়েরা সব আপনার কাছে দীক্ষিত হতে চাচ্ছে।

কিশোরীলাল। আমিও এ কথা শুনেছি; আমিই আপনাকে বলতাম, গার্গীর মুখ থেকে বেরিয়ে ভালই হলো।

বাউল। যা পছন্দ করি না, তাই! দীক্ষা আবার কি? কর্মে দীক্ষা তো তাদের হয়েই গেছে। ধর্মে দীক্ষা দেবার শক্তি তো মা আমার নেই, সে দীক্ষা দেবেন তাদের স্বামী। পতিই পরম দেবতা, তাঁর উপরে তাদের আরাধ্য আর কেউ আছেন, এ কথাই কখনো বলবে না। মেয়েদের ধর্ম-জীবন তৈরী করার জন্য যেদিন গুরুর হাতে বা স্বামীজীর হাতে আমরা তাদের সঁপে দিয়েছি, সেদিন থেকেই ভারতে নারী-শক্তির পায়ে কুঠারাঘাত করা হয়েছে। অনন্ত শক্তিতে শক্তিশালিনীদের আমরা শক্তিহীনা করে ফেলেছি। পতিসেবাই তাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত, মেয়েদের কাছে এ কথাই বলবে। স্বামীর উপরে কোন দেবতা নেই, ভগবানও নন। পতি-পরায়ণা সতীরাই ভারতে বীর-প্রসবিনী বলে পরিচিতা। ইহাই ভারতের পুরাতন আদর্শ, এ পুরাতনকেই আবার নূতন করে ভারতে আনতে হবে। তা না হলে মেয়েদের ভিতরে মাতৃত্ব ফুটিয়ে তোলার আশা করাই বাতুলতা।

গার্গী। আর একটা কথা, আমার বিদ্যালয়ে বাল্যবিধবাই বেশী, কুমারীও চল্লিশের মতন হবে; এদের ভিতরে অনেকেই যোগ্যা, এদের বিয়ের যোগাড় করা প্রয়োজন। অভিভাবকগণ টাকা দিয়ে বিয়ে দেন, এমন অবস্থা অনেকেরই নেই, এর কি করা যাবে?

বাউল। তোমার বিদ্যালয়ে মেয়েদের বরের অভাব হবে না। তুমি তাদের তৈরী করো, বর আমিই জুটিয়ে দেবো।

(গার্গীর প্রস্থান)

কিশোরীলাল। ছেলে যোগাড় করবেন কোত্থেকে? টাকা না হলে যে আজকাল ছেলে পাওয়া যায় না!

বাউল। যে ছেলে বিয়ে করতে টাকা চায়, আমি তার বাড়ির পাশ দিয়েও যাবো না। যে কর্মক্ষেত্র আমরা তৈরী করেছি, তাতে প্রচুর শিক্ষিত যুবক আমরা পাবো। মেয়েদের বিদ্যালয়ে মেয়েরা তৈরী হচ্ছে, ছেলেদের বিদ্যালয়ে ছেলেরা তৈরী হচ্ছে, এ ছেলে-মেয়ের হাত যদি মিলিয়ে দিতে পারি, তবে সে মিলন বড় মধুর হবে। কারণ, ছেলেও ত্যাগের আদর্শে তৈরী, মেয়েও তাই। আমি চাই আদর্শ

গৃহস্থ প্রতিষ্ঠা করতে। আমার বিশ্বাস, এরাই ভোগের মাঝে থেকে কি করে ত্যাগী হওয়া যায়, ভারতকে তা দেখাতে পারবে।

কিশোরীলাল। তবে কি আপনার মেয়ে-বিদ্যালয়ের লক্ষ্য আদর্শ-গৃহিণী তৈরী করা?

বাউল। নিশ্চয়! আমি যেমন চাই আদর্শ গৃহিণী, তেমন চাই আদর্শ ছেলে। এদের মিলন হলে যেমন হবে সংসার শান্তিময়, তেমন হবে দেশের কর্মীদের বিশ্রামের স্থান। দেশের নেতাদের বলো, তাঁরা বক্তৃতা না দিয়ে মানুষ তৈরী করুন। মানুষ তৈরী হলে তাকে রাজনীতি, সমাজনীতি বক্তৃতা দিয়ে বোঝাবার প্রয়োজন হবে না, তখন তারা নিজেরাই সব বুঝে নেবে, দেশও তখন তাঁদের কথায় সাড়া দেবে। দু'চারজনে হৈ-চৈ করলে কি আর কাজ হবে? সকলের মিলিত আকাঙ্ক্ষা মূর্তিমান হয়ে না উঠলে তোমাদের কথা কেউ কানে তুলবে না। ভিক্ষান্নে কি কখনো পেট ভরে ভাই? তোমরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছ, এ যখন জগৎকে দেখাতে পারবে, তখন তোমাদের জগতে অপ্রাপ্য কিছুই থাকবে না।

কিশোরীলাল। তা হলে এ কর্মক্ষেত্র যাতে আরো বড করা যায়, তার জন্যে আমাদের উঠে-পড়ে লাগতে হবে। জগৎকে দেখাতে হবে— আমরাও মানুষ এখন, আমরাও কাজ করতে পারি।

বাউল। তোমার-আমার আর তেমন করে খাটবার সময় নেই। আমি ছেলেদের শিক্ষার ভার যোগেনের উপরে, আর মেয়েদের শিক্ষার ভার গার্গীর উপরে দেবার ইচ্ছা করেছি, তোমার কি মত?

কিশোরীলাল। আপনার আশীর্বাদে ওরা যে কাজ সুন্দরভাবে চালাতে পারবে, সে বিশ্বাস আমার আছে।

বাউল। আচ্ছা চলো, এখন একবার নন্দের বাড যাই, তার সাথে আরো অনেক পরামর্শ আছে। (উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—নন্দলালের বাড়ি।

(হেমলতা, সুরমা, বাউল, নন্দলাল ও ফোনওয়ালা)

হেমলতা। কলকাতায় তোমার কোন কষ্ট হয় নি তো?

সুরমা। শারীরিক কোনই কষ্ট হয় নি, ঝি-চাকরের কোনই অভাব ছিল না।

কিন্তু রাত্রে তিনি প্রায়ই বাড়ি থাকতেন না; কোথায় যেতেন বলেও যেতেন না, তাই ভয়ে ভয়ে আমার সারা রাত জেগে থাকতে হতো।

হেমলতা। রাত্রি জেগেই তোমার চেহারা ময়লা হয়ে গেছে। যাক্, মা কালী যে এত শিগ্‌গীর নন্দের পরিবর্তন করবেন, এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।

সুরমা। মায়ের কাছে দু'বেলা প্রার্থনা করাই আমার ব্রত ছিল। এখন মনে হয়, মা আমার প্রার্থনা শুনেছেন।

হেমলতা। প্রার্থনা কখনো ব্যর্থ হয় না মা, যদি প্রার্থনা করতেই পারে। তুমি সতী, পতিগতা প্রাণ তোমার, প্রার্থনা কি মা না শুনে পারেন? নন্দ দেশে এসেই স্বর্ণপুরের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে, প্রজারা নন্দের এই অপূর্ব পরিবর্তনে আনন্দে নেচে উঠেছে। সকলেই বলেছেন, আমরা প্রাণ দিয়েও বাবুর কাজে সাহায্য করবো।

সুরমা। জগতের সেবাই যদি জীবনের ব্রত হয়, তবে মানুষ আপনা থেকেই পায়ে এসে লুটিয়ে পড়ে।

(বাউলের প্রবেশ)

বাউল। ঠিক বলেছিস বউমা! জগতের সেবাই যার জীবনের ব্রত, তিনিই ধন্য। তোমার নন্দ সত্য-সত্যই দেশের সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করেছে। এমন একদিন আসবে, বেঁচে থাকলে দেখতে পারবি বউমা, এই স্বর্ণপুরের আদর্শে ভারতের প্রতিটি পল্লী তৈরী হবে।

(সুরমা ও হেমলতার ভূমিষ্ঠ প্রণাম)

বাউল। আশীর্বাদ করছি, ঠাকুর তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করুন! নন্দ কোথায়?

সুরমা। এই তো বাইরে গেলেন। কারা এসেছেন! বলে গেলেন, এখনি আসবেন। আমি আজ একবার মেয়েদের বিদ্যালয় দেখতে যাবো!

হেমলতা। তা বেশ, আমিই তোমায় নিয়ে যাবো।

সুরমা। সকলেই যখন কাজে লেগে গেলেন, তখন আমিই বা বসে থাকবো কেন? দেখি আমিও সেবার যোগ্যা হতে পারি কি না!

হেমলতা। ইচ্ছা করলে সে বিদ্যালয় নিয়ে তুমিও থাকতে পারো। তোমায় পেলে মেয়েরা সকলেই খুব আনন্দিতা হবে।

সুরমা। আমি কি সেখানে কোন কাজের যোগ্য হবো?

বাউল। কেন হবে না মা? তোমার মত ইংরেজী জানা একটি মেয়েও তাদের প্রয়োজন। কিন্তু গার্গী তা এখনো পায় নি, তোমায় পেলে গার্গীর আনন্দের সীমা থাকবে না।

হেমলতা। মেয়েদের ইংরেজী শেখাবার প্রয়োজন কি? এতে কি কাজ ভাল হবে?

বাউল। মন্দ হবার তো কারণ দেখতে পাচ্ছি না! ইংরেজী শিখলেই মেয়েরা বিলাসিনী হন না, বিলাসিনী হন পিতামাতার শিক্ষার ত্রুটিতে। যে সকল ছেলেরা বিদেশে গিয়েছে, তাদের জন্যই আমাদের এ মেয়ে তৈরী করা। তারা সব বি. এ., এম.এ. পাস করা ছেলে, তাদের মেয়েদেরও সামান্য একটু ইংরেজী জানা প্রয়োজন, তা না হলে ঐ ছেলেদের মনোমত হবে কেন? প্রতিভা কখনো ব্যর্থ হয় না মা, সমানে সমানে মিল না হলে সে মিলনে প্রেম হয় না।

সুরমা। আপনি তা হলে মেয়েদের সবদিকে সমানভাবে ফুটিয়ে তুলতে চান?

বাউল। হ্যাঁ—মা, গৃহিণীর কোনদিক অপূর্ণ না থাকে, আমি তেমনভাবেই মেয়েদের তৈরী করে দিতে চাই।

সুরমা। ও—কেউ গান গাচ্ছে, নয়?

বাউল। হ্যাঁ—বোধ হয় কোন ফেরিওয়ালা আসছে। আচ্ছা, আমি নন্দের কাছে যাচ্ছি, তোমরা দেখো কি এনেছে। (বাউলের প্রস্থান)

ফেরিওয়ালা। (বাহির থেকে) চাই—দেশী কাপড়, দেশী জামা, তোয়ালে, রুমাল!

সুরমা। এদিকে নিয়ে এসো।

(গীত)

ফেরিওয়ালা—

আয় না রে ভাই আপনি হাঁটি,
কেন পা থাকিতে নিবি লাঠি?
দেশী জিনিস থাকতে কেন,
বিদেশীতে মন মজাও ভাই;
মোটা ভাত, মোটা কাপড়ে,
চলে না কি মোটামুটি।
বিটের চিনি, কলের ময়দা,
কাজ কি রে আর খেয়ে তারে;

আখী গুড় আর জাঁতার আটা,
খাবো খানা পরিপাটি।
ছেড়ে দাও বিদেশী কাপড়,
বাঁচুক মোদের দেশী তাঁতি,
তামা কাঁসা থাকতে দেশে,
ছেড়ে দে মা রেশমী চুড়ী,
শাঁখার কি আর অভাব দেশে ;
মুকুন্দের কথা ধর ভাই-বোন সব হয়ে খাঁটি।

সুরমা। তোমার গানটি বড়ই মিষ্টি, আবার গাও বাবা!

(গীত)

ফেরিওয়ালা— "আয় না রে ভাই আপনি হাঁটি!"...

সুরমা। তোমার সব জিনিসই কি দেশের তৈরী?

ফেরিওয়ালা। হ্যাঁ মা, সবই এদেশের মেয়েদের হাতের তৈরী। আমি কুমারী গার্গী দেবীর বিদ্যালয় থেকে এসব জিনিস পাই।

সুরমা! দেখি কি এনেছ?

(ফেরিওয়ালা কাপড় দেখায়)

সুরমা। বাঃ, চমৎকার! এমন তো মিলেও তৈরী হয় না! তোমার এখানে কত টাকার জিনিস আছে? আমি সবই রাখবো।

ফেরিওয়ালা। আনন্দের কথা, এখানে পঞ্চাশ টাকার জিনিস আছে।

সুরমা। দাঁড়াও, আমি টাকা এনে দিচ্ছি।

হেমলতা। এত জিনিস দিয়ে তুমি কি করবে?

সুরমা। চেষ্টা করে দেখবো, আমিও এমনি তৈরী করতে পারি কি না; তাই কিছু নমুনা রেখে দিলাম।

হেমলতা। তুমি তো আর তৈরী করে বাজারে বিক্রী করতে যাবে না? যারা বিক্রী করে, তাদের শেখা প্রয়োজন।

সুরমা। আমি বিক্রী করলেই বা ক্ষতি কি? আমার নিজের অর্থাভাব নেই বটে, কিন্তু যারা একমুষ্টি অন্নের জন্য রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, এ কাজ করে তাদের তো কিছু সাহায্য করতে পারবো! নিজের রক্ত জল করে তো কখনো পরের সেবা করি নি, এই করেও যদি কিছু সেবা করে কৃতার্থ হতে পারি!

হেমলতা। তোমার সাধু ইচ্ছা মা পূর্ণ করুন। তুমি স্বচ্ছন্দে এসব জিনিস রাখতে পারো।

সুরমা। বাবা, তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি টাকা এনে দিচ্ছি। (প্রস্থান)

হেমলতা। তোমরা শুধু এ স্বর্ণপুরেই জিনিস বিক্রী করো, না অন্যত্রও গিয়ে থাকো?

ফেরিওয়ালা। তা কেন? আমরা সমস্ত বাংলা ঘুরে বেড়াই। আমি একা নই, এই বিদ্যালয়ে যা তৈরী হয়, তা আমরা ত্রিশজনে বিক্রী করি। যেভাবে কাজ চলেছে তাতে মনে হয়, আমরা অল্পদিনের মধ্যেই বিদেশে জিনিস পাঠাতে পারবো।

(সুরমার প্রবেশ)

সুরমা। এই নাও বাবা তোমার টাকা! যাবার সময় আর একটি গান শুনিয়ে যাও, তোমার গান বড় মিষ্টি!

(গীত)

ফেরিওয়ালা— ছেড়ে দাও রেশমী চুড়ী, বঙ্গনারী;
কভু হাতে আর প'রো না।
জাগো গো ও জননী ও ভগিনী,
মোহের ঘুমে আর থেকো না;
কাঁচের মায়াতে ভুলে, শঙ্খ ফেলে,
কলঙ্ক হাতে প'রো না॥
তোমরা যে গৃহলক্ষ্মী, ধর্ম সাক্ষী;
জগৎ ভরে আছে জানা;
চটকদার কাঁচের বালা, ফুকের মালা,
তোমাদের অঙ্গে শোভে না॥
নাই বা থাক্ মনের মতন, স্বর্ণভূষণ,
তাতেও যে দুঃখ দেখি না;
সিঁথিতে সিন্দুর ধরি, বঙ্গনারী,
জগতে সতী শোভনা॥
বলিতে লজ্জা করে, প্রাণ বিদরে,
কোটি টাকার কম হবে না;
পুঁতি কাঁচ ঝুটা মুক্তায়, এই বাংলায়,
নেয় বিদেশে কেউ জানে না॥

ঐ শোন বঙ্গমাতা, শুধান কথা,
জাগো আমার যত কন্যা;
তোরা সব করিলে পণ, মায়ের এ ধন,
বিদেশে উড়ে যাবে না ॥
আমি যে অভাগিনী, কাঙ্গালিনী,
দু'বেলা অন্ন জোটে না,
কি ছিলেম কি হইলেম, কোথায় এলেম,
মা যে তোরা ভাবিলি না ॥

ফেরিওয়ালা। (প্রণাম করে) মা, তবে এখন আসি! (প্রস্থান)

সুরমা। কি মিষ্টি গান, গানের সাথে প্রাণের তন্ত্রীগুলি যেন আপনা থেকে বেজে ওঠে। কাকিমা! এরা বুঝি সবই সে আশ্রমের ছেলে, বাউল দাদার তৈরী?

হেমলতা। হ্যাঁ—মা, তাই। বাউল ঠাকুর দেবতাই বটেন। অমন স্বদেশ-বৎসল কর্মবীর ভারতে ক'জন আছেন জানি না। চলো এখন, বিদ্যালয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হও গে। এই, নন্দ এসেছে।

(নন্দের প্রবেশ)

নন্দলাল। একি! এতসব কাপড় কোথায় পেলে সুরমা?

সুরমা। গার্গীর বিদ্যালয়ের তৈরী কাপড়, একটি ছেলে বিক্রী করতে এনেছিল, আমি রেখে দিয়েছি।

নন্দলাল। বাঃ, সুন্দর কাপড় তো! বেশ করেছ, আমাদের বাড়ি এসে যে সে ফিরে যায় নি, তাতেই আনন্দ পেলাম। এই সবই বাউল দাদার কর্ম। আমরা বড়ই ভাগ্যবান যে, এমন কর্মী-গুরু পেয়েছি।

হেমলতা। তিনি তোমার খোঁজে এসেছিলেন। এইমাত্র কোথায় চলে গেলেন।

নন্দলাল। হ্যাঁ, আসবার কথা ছিল, বোধ হয় আবার আসবেন। আমার সাথে তাঁর দেখা হওয়া প্রয়োজন। যে সব ছেলেরা বিদেশে গিয়েছে তাদের খরচের টাকা আজই পাঠাতে হবে।

সুরমা। কত টাকা পাঠাতে হবে? (হেমলতার প্রস্থান)

নন্দলাল। তারা সাতজন গেছে; দু'জন বিলেতে, তিনজন জাপানে, দু'জন অ্যামেরিকায়। দশ হাজার টাকা আজই পাঠাতে হবে, তাদের পত্র পেলে আবার টাকা পাঠাবো। তাদের সে জায়গায় কাজ শেষ করে আসতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগবে।

সুরমা। এত টাকা তুমি কোথায় পাবে?

নন্দলাল। সুরমা, স্বর্গাদপি গরীয়সী মা জন্মভূমির সেবা যদি প্রাণ দিয়ে করতেই পারি, তবে মায়ের কৃপায় টাকার অভাব হবে না। আমার যা কিছু ছিল তা মায়ের পায়ে উৎসর্গ করেছি। এতেও যদি না হয়, তবে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করে ভারতবাসীর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে আমার মায়ের সেবার যোগাড় করবো।

সুরমা। এ দাসীকেও সঙ্গে রেখে কৃতার্থ করতে ভুলো না কিন্তু।

নন্দলাল। সুরমা, তোমায় সঙ্গ ছাড়া করবো, এও কি কখনো হতে পারে? দুঃখময় জীবনের পরিবর্তনের মূলে যে তুমি আর বাউল দাদা! জীবনে যদি কিছু করি সে তোমায় নিয়েই করবো সুরমা, আমাদের বলতে আমরা কিছুই রাখবো না; যা কিছু আছে সে সবই দেশের সেবায় তিল তিল করে বিলিয়ে দিয়ে চলে যাবো। চলো, এখন দুটো খেতে দেবে চলো। (উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—কিশোরীলালের বাড়ি।

(হেমলতা, কাত্যায়নী, যোগেন ও কিশোরীলাল)

হেমলতা। হুগলীতে তোমার কোন অসুবিধা হয় নি তো?

কাত্যায়নী। যথেষ্ট হয়েছে, অনেক দিনই সময়ত খাওয়া জোটে নি।

হেমলতা। সে কি? সুরেশ নাকি বেশ পয়সা উপায় করতো? তবে কি সে আমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে?

কাত্যায়নী। যাঁরা পুরাতন উকীল, তাঁদেরই এখন তেমন আয় নেই, নূতনদের ডাকে কে? তার পরে মোকদ্দমাও দিন দিন কমে যাচ্ছে।

হেমলতা। কর্তা তো এ কথা পূর্বেই বলেছেন, তখন তাঁর উপদেশ মত কাজ করলে আজ এমন হতো না। তবে আমরা থাকতে যে বাড়ি ফিরেছে এই মঙ্গল!

কাত্যায়নী। তিনি কি আর ইচ্ছা করে বাড়ি এসেছেন? একরকম জোর করেই আনা হয়েছে।

হেমলতা। হ্যাঁ—আমি তা বুঝতে পেরেছি। সুরেশ বাড়ি এসেছে বটে, কিন্তু খুবই লজ্জিত। আমার কাছে আসতেও যেন ভয় পায়।

ক্যাত্যায়নী। কোন্ মুখে কাছে আসবেন? নেই বলতে তো এখন আর কিছুই নেই। যা কিছু বাবা দিয়েছিলেন, তাও সবই পরের হাতে।

(যোগেনের প্রবেশ)

যোগেন। কিছুই যায় নি বউদি। দাদার অভাব কিসের? বাবা আমায় যা দিয়েছিলেন, তা সবই আমি দাদাকে বুঝিয়ে দিয়েছি। দাদাই সংসারের কর্তা, আমি তাঁর আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র।

কাত্যায়নী। ঠাকুরপো, আপনি :দেবতা! মানুষের প্রাণ কি এত বড় হয়? যে আপনার মত ভাই পেয়েছে, সে ভাগ্যবান্ আমাদের ত্রুটি আপনি মার্জনা করুন!

যোগেন। বউদি, তুমি আমার মাতৃস্থানীয়া। তুমি অমন করে কথা বললে আমি আর কখনো তোমাব কাছে আসবো না। দাদা কি কখনো পর হয়? যেদিন থেকে তা হয়েছে, সেদিন থেকেই দেশ রসাতলে যেতে বসেছে। ভাইয়ের উপর যেদিন থেকে ভাই কর্তব্য হারিয়েছে, সেদিন থেকেই ভারতের পতন হয়েছে, বাপ-দাদার নাম কলঙ্কিত করে আমরা ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছি। এ গতি আবাব ফিরিয়ে দিতে হবে, তা না হলে এ জাতির কল্যাণ নেই, কল্যাণ হতে পারে না। তুমি দাদাকে ব'লো তাঁর জন্যে আমরা একটা কাজের পত্তন করেছি, তাঁকে সে কাজের ভার গ্রহণ করতে হবে। সংসারের ভাবনা তাঁকে ভাবতে হবে না, সে যা করবার আমিই করবো।

হেমলতা। ছেলে হলে যেন—যোগেন, তোর মত ছেলেই আমি জন্মে জন্মে পাই। তোর মা হয়ে আজ আমি আমায় গৌরবান্বিতা মনে করছি।

(কিশোরীলালের প্রবেশ)

কিশোরীলাল। গিন্নি, শুধু তুমিই গৌরবান্বিতা নও, আজ আমিও গৌরবান্বিত। তোমার যোগেনের প্রশংসা আজ সমগ্র ভারতময় ছড়িয়ে পড়েছে। আজ আমাদের বংশ ধন্য হয়ে গেছে, আমার সমস্ত জীবনের পরিশ্রম আজ আমি সার্থক মনে কবছি।

যোগেন। বাবা! এ প্রশংসার মূলে তো আপনিই। আপনার চরণতলে বসে আমি যে শিক্ষা পেয়েছি, এ তো সে শিক্ষারই ফল। আজ আপনার দান আপনি গ্রহণ করে আমায় কৃতার্থ করুন!

(চরণে পতিত)

কিশোরীলাল। (বুকে তুলে) আজ আমরা আনন্দে ভরপুর। এমন ছেলে

যাদের হয়, সে মা-বাবার আনন্দের আর সীমা থাকে না। সুরেশ বাড়ি এসেছে, সুরেশ আমার পণ্ডিত ছেলে। জীবনে অনেকেই অনেক ভুল করে, সেও একটা ভুল করেছে। একটা ভুলে কারো জীবন ব্যর্থ হয়ে যায় না। যে কাজ তার হাতে দেওয়া হলো, তাতে সে দেশের অনেক কাজ করতে পারবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। বাল্যকাল থেকে ছেলের ভিতরে যে শক্তির বিকাশ দেখা যায়, পিতা-মাতার কর্তব্য তার সে শক্তিকে ফুটিয়ে তোলা। এ দেশ তা করে না বলেই আমাদের ছেলেরা শক্তিহীন। ইউরোপ তা করে বলেই সে দেশের ছেলেরা শক্তিমান। এইটে যে শুধু আমাদের পিতা-মাতারই দোষ, তা নয়, বর্তমান শিক্ষারও যথেষ্ট ত্রুটি আছে।

হেমলতা। সুরেশকে কি কাজ দেওয়া হলো ?

কিশোরীলাল। "স্বর্ণপুর" নামে একটা কাগজ বের হচ্ছে, সে তার এডিটার হলো। এ দেশে যা কাজ হচ্ছে, ভারতময় ছড়িয়ে দেওয়াই হলো তার জীবনের ব্রত।

কাত্যায়নী। বেশ কাজই দেওয়া হয়েছে, বাসায় প্রায় সব সময় বই নিয়েই থাকতেন। অনেকদিন পড়া ফেলে কাছারীতে পর্যন্ত যেতেন না।

কিশোরীলাল। ও যে পড়তেই ভালবাসে তা জেনেই তো আমি ওকে শিক্ষা-বিভাগে রাখতে চেয়েছিলাম। যার যে শক্তি, তাকে সে শক্তি বিকাশানুযায়ী ক্ষেত্র তৈরী করে দেওয়াই কর্তব্য।

হেমলতা। সুরেশ আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে।

কিশোরীলাল আমার কাছেও ক্ষমা চেয়েছে, তা'র পাপের প্রায়শ্চিত্ত যথেষ্টই হয়েছে। যোগেন, যাও, তোমার দাদাকে নিয়ে একসঙ্গে বসে খাও গে, আমি দেখবো। বউমা! তুমিও যাও, আমার স্নানের যোগাড় করো গে। আর ভয় নেই, মা তোমাদের সকল ময়লা ধুয়ে-মুছে বাড়ি এনেছেন।

হেমলতা। শুনলাম সুরেশ নাকি তার সম্পত্তি হাজার টাকায় পত্তন করে গিয়েছিল ?

কিশোরীলাল। হ্যাঁ, টাকা নিয়ে রমজান সে সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়েছে। অন্য দেশ হলে ফিরে পাবার কোনই আশা ছিল না। স্বর্ণপুরের চাষীরাও আজ দেবতার আসনে উন্নীত হয়েছেন, তাই সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—নন্দলালের কাছারী।

(কিশোরীলাল, নন্দলাল, বাউল, প্রজাগণ, সুরেশ ও যোগেন)

বাউল। রমজান! আজ আবার তোমাদের কেন ডেকেছি, তা বোধ হয় বুঝতে পেরেছ?

রমজান। হ্যাঁ, আমি বুঝেছি। গাঁয়ে গাঁয়ে এখন আমাদের সালিশী-সভা করতে হবে, মোকদ্দমা যাতে আদালতে না যায়, সে ব্যবস্থা করতে হবে।

বাউল। হ্যাঁ, আমাদের সব কাজ হয়ে গেছে, শুধু ঐটেই হয় নি। আজ আমি ঐ কাজটিও শেষ করে রাখতে চাই।

রমজান। আমি এ কথা সর্বত্র প্রচার করেছি। প্রস্তাব শুনে সকলেই আনন্দ প্রকাশ করেছেন; এতে কারোই আপত্তি নেই।

বাউল। এ যে আনন্দেরই কথা। দেশের টাকা যাতে বিদেশে না যায়, বর্তমানে আমাদের তাই দেখতে হবে, পরে অন্য কাজ। এই মোকদ্দমায় কি দেশের কম টাকা বিদেশে চলে যাচ্ছে? তার পরে বিচারও তেমন কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না।

করিম। তা আর বলেন কেন? আমার জমি ফয়জদ্দি বেদখল করে খাচ্ছিল, দলিল-পত্র সবই আমার নামে কিন্তু মোকদ্দমায় আমিই হেরে গেলাম।

বাউল। তাই তো আমরা এ বিচারাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছি। দেশের বিচার দেশে বসে হলে সত্য গোপন থাকবে না, কাজেই বিচারও ভাল হবে। এই স্বর্ণপুর পরগণায় বর্তমানে আমরা দশটি সালিশী-সভা প্রতিষ্ঠা করতে চাই, আর একটি সদরে। ঐ সকল জায়গার বিচারে যাঁরা খুশী না হবেন, তাঁরা সদরে আসবেন। এখানে নন্দ নিজে বিচার করবে, কিশোরীবাবুর পরামর্শ নিয়ে।

সকলে মিলিতকণ্ঠে। কর্তার জয় হউক।

করিম। চমৎকার! বাবু নিজে বিচার করেন, এই তো আমরা চাই। মনিব নিজে বিচার না করলে কি আর প্রজা বাঁচে? আমলা-কর্মচারীরা তো কেবল ঘুঁষের বিচারক, যে টাকা দিতে পারে, তার কথাই কয়।

বাউল। তা হলে আমি এখনই তোমাদের সামনে নন্দকে সে বিচার-আসনে বসাচ্ছি। নন্দ, মায়ের নাম নিয়ে প্রস্তুত হও।

কিশোরীলাল। নন্দ! বাউল ঠাকুরের পদধূলি নিয়ে আসনে বসো। মা মঙ্গলময়ী তোমার মঙ্গলই করবেন।

নন্দলাল। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

(সকলকে অভিবাদন করে আসনে বসল)

বাউল। কালী মাঈকী জয়!

(মিলিতকণ্ঠে, 'কালী মাঈকী' জয়)

বাউল। রমজান! শিবপুরের বিচারাসনে আমি তোমায় প্রতিষ্ঠিত করলাম। তোমার সাথে করিম মোল্লা, রামু হাওলাদার, হীরামোহন তাঁতি, উপেন্দ্র বাঁড়ুয্যে—এ ক'জন থাকবেন। এঁদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করবে। নন্দরামপুরের ভার নিতাই পালের উপরে দেবার ইচ্ছা করেছি, তোমার কি মত?

রমজান। তিনি সাধুলোক, কাজ ভালই করবেন।

বাউল। আর যে যে জায়গায় বিচারাসন করা হবে, সে সকল জায়গা আমার ঠিক হয়ে গেছে, লোক এখনো মনোনীত করতে পারি নি; যখন করবো তখন আমি তোমায় খবর দেবো। আজ তোমরা যাও।

সকলে। আদাব—আদাব! বাবুর জয় হউক! (প্রস্থান)

বাউল। নন্দ! আমার কর্ম তো প্রায় শেষ হয়ে গেল। আর একটি প্রার্থনা তোমার কাছে করবো, আশা করি তুমি আমার সে প্রার্থনাটিও মঞ্জুর করবে!

নন্দলাল। আপনি আমার গুরু। আমি আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র, আদেশ করুন!

বাউল। আমার মেয়ে-বিদ্যালয়ে অনেক মেয়ে তৈরী হয়েছে। যে সকল ছেলেরা বিদেশে গিয়েছে, তাদের জন্যই আমার এই মেয়ে তৈরী করা। অনেক মেয়ে এমন আছে যাদের যাবতীয় খরচ ঐ বিদ্যালয় থেকেই এতদিন চালাতে হয়েছে, অবশ্য এখন তারা নিজেদেরটা নিজেরাই করে নিচ্ছে। বাবা টাকা দিয়ে বিয়ে দেন, এমন অবস্থা অনেকেরই নেই। এদের বিবাহের যাবতীয় খরচ তোমাকেই দিতে হবে। তবে ছেলের পণ আর মেয়ের গহনার বাবদ তোমায় কিছুই দিতে হবে না। আমাদের হাতে যে সব ছেলে তৈরী হয়েছে, তারা ওটুকু স্বার্থ ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছে।

নন্দলাল। এ আর বড় কথা কি? আমি আপনার আদেশ ব্রতের মতন পালন করবো।

বাউল। তুমি যে এ করবে, তা আমি জানি। মনে রেখো আদর্শ গৃহস্থ দেশে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই আমার এই বিরাট কর্মক্ষেত্রের আয়োজন। খাঁটি গৃহস্থ না হলে প্রকৃত কর্মবীর দেশে জন্মাবে না—আমার বিশ্বাস। এমন ছেলে-মেয়ের হাত মিলিয়ে দিতে পারলে সে গৃহস্থ দেশে প্রতিষ্ঠিত হবে, এ আমি খুব জোর করেই বলতে পারি। কারণ ছেলেরাও ত্যাগের আদর্শে তৈরী, মেয়েরাও তাই। জন্মভূমির সেবাই এদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই মহামন্ত্রেই আমি এ সব ছেলে-মেয়েদের দীক্ষিত করেছি। ভোগীর ঘরে কখনো ত্যাগীর জন্ম হয় না, সে আশা করাই ভুল। কর্মবীর যদি পেতে চাও, তবে দেশে ত্যাগী গৃহস্থের প্রতিষ্ঠা করো। আশ্রম বলতেই মানুষ জঙ্গলের একটা কিছু মনে করেন, কিন্তু তা নয়, গৃহই আমাদের আশ্রমে পরিণত করতে হবে। ভারতের প্রতি গৃহই এক-একখানা আশ্রম, এভাবে যেদিন দেশকে গড়ে তুলতে পারবে, সেদিনই তোমরা জগৎ জয় করতে সক্ষম হবে, এর পূর্বে নয়।

নন্দলাল। এ কথা ধ্রুব সত্য সন্দেহ নেই। আমি আর একটা ইচ্ছা করেছি। আমার জমিদারীতে যে আয়, তাতেই আমার যথেষ্ট। যে মিল প্রতিষ্ঠা করেছি, তা আমি দেশের সর্বসাধারণকে দান করে দিতে চাই, যেন এর লভ্যাংশে দেশের আপামর জনসাধারণ সকলেই পায়। তা হলে সকলেই অর্থশালী হবে, কাজও সকলে দ্বিগুণ উৎসাহে করবে।

বাউল। আনন্দম্—এসো নন্দ! আজ আমি তোমায় আলিঙ্গন করে ধন্য হই। আজ আমার ব্রত ষোলকলায় পূর্ণ হলো। দেশের ধনী, জমিদার, সকলে দেখে নিন, এমনি করে আপনাদেরও দেশের সেবায় লাগতে হবে। দেশকে যদি দুঃখ-দৈন্যের হাত থেকে বাঁচাতে চান, তবে এ-ই পথ। দরিদ্রকে জানতে দিন যে, আপনারা তাদের শোষণকারীই নন, পোষণও আপনারাই করেন। তা না হলে তাদের সাড়া পাবেন না। তারা সাড়া না দেওয়া পর্যন্ত হাজার হাজার কংগ্রেস কন্‌ফারেন্সেও আমাদের ঘুম ভাঙবে না। কিশোরী! নন্দকে

আলিঙ্গন করো, তোমাদের বংশ ধন্য হয়ে গেছে, দেশ ধন্য হয়ে গেছে! স্বর্গে দেবতারা দুন্দুভি ধ্বনি করছেন।

(গীত)

স্বরাজ সেদিন মিলিবে যেদিন
চাষার লাগিয়া কাঁদিবে প্রাণ,
তাঁদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়ে
সপ্তমে তোরা তুলিবি তান।
দেবতার আশিস্ বর্ষিবে সেদিন,
অজস্র ধারায় মাথার 'পর,
আসিবে নামিয়া নূতন শকতি,
নব বলে সবে হবি বলীয়ান,
শক্তিতে হবি শক্তিমান।
কোটী কোটী মিলিত কণ্ঠে
তখনি উঠিবে গান,
যে গানে আবার হইবে মিলিত
হিন্দু মুসলমান;
মা-মা বলিয়া উঠিবে ফুকারি
ভারতের নর-নারী,
হোমানল জ্বালি বসিবে যজ্ঞে,
পূর্ণাহুতি করিবে দান।
সাধনার সিদ্ধি স্বরাজ তোদের
তখনি হইবে মূর্তিমান॥

কিশোরীলাল। (নন্দকে বুকে নিয়ে) নন্দ! তোর ভিতরে যে এত শক্তি লুকানো ছিল, তা পূর্বে বুঝতে পারি নি; এখন আনন্দে মরতে পারবো। আশীর্বাদ করি, মা তোর মঙ্গল ইচ্ছা জয়যুক্ত করুন!

(সুরেশ ও যোগেনের প্রবেশ)

যোগেন। নরেন জাপান থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে আসছে, টেলিগ্রাম পেলাম; সে এক সপ্তাহের ভিতরেই কলকাতা পৌছাবে।

নন্দলাল। আনন্দের কথা! ভাল করে শেখা হচ্ছে তো?

যোগেন। সে আমায় যে পত্র দিয়েছে তাতে সে লিখেছে, আমি এখন সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারের সাথে Challenge করতে পারি।

কিশোরীলাল। সাধে কি আর সমগ্র জগৎ বাঙালীর মাথার প্রশংসা করে? এত বড় একটা শক্তি নীচে পড়ে আছে শুধ্ ক্ষেত্রের অভাবে।

বাউল। ক্ষেত্র না পেলে ছেলেরা শক্তি বিকাশ করবে কি জঙ্গলে বসে? এ দেশের ছেলেরা প্রচুর শক্তি নিয়েই জন্মায়, ক্ষেত্রাভাবে ছেলেরা মলিন হয়ে পড়ে। ক্ষেত্র পেলে বাঙালী যুবকের জগৎকে বিস্মিত করে দিতে বড় বেশী সময়ের প্রয়োজন করে না। যাক্, নন্দ, তুমি এ ছেলের বিয়ের আয়োজন করো, আমি দেখে আমার কর্ম শেষ করে বিদায় গ্রহণ করি।

নন্দলাল। যে আজ্ঞে, আমি আজই এ বিবাহের আয়োজনে ব্রতী হবো।

বাউল। সুরেশ! তোমার বিষয়-সম্পত্তি ফিরে পেয়েছ তো? তোমায় 'স্বর্ণপুর' কাগজের Editor করা হয়েছে। কাগজখানা এমনভাবে লিখবে, যেন তার প্রতি বর্ণে অগ্নি-বর্ষণ হয়। মানুষ যেন কাগজ পড়ে জীবন তৈরী করে পারে। "রামবাবু আজ Aka স্টীমারে ঢাকা যাত্রা করলেন, কলিকাতার মোহনবাগান আজ আমবাগানকে তিনটে গোল দিয়েছে, স্টার থিয়েটারে আজ কনকলতা আর্ট দেখাবেন"—ও দিয়ে আমাদের কাজ নেই। দেশ চায় এখন পথ, কাগজ দেশকে সে পথ দেখিয়ে দেবে। Editorদের দায়িত্ব যে কত, তাঁদের আসন যে কত উঁচু, তাঁরাই যে দেশের চালক, একথা বর্তমান সময়ের Editor মহাশয়েরা বোঝেন কি না, সে বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। কারণ, বর্তমান সময়ে কাগজ পড়াও যা, আর কবির দলের সরকারের ছড়া শোনাও তাই বলে মনে হয়। তুমি যেন তোমার দায়িত্ব ভুলে যেও না, দেশকে তোমার অনেক দিতে হবে। তোমার কাগজখানা যেন নিন্দা-কুৎসা বর্জিত হয়, ইহাই আমার আদেশ। আর স্মরণ রেখো, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

সুরেশ। (চরণে পতিত) আপনার এ মন্ত্র যেন আমার জীবনে মূর্তিমান হয়ে ওঠে, এই আশীর্বাদ করুন! আপনি আমার গুরু, আমার অনন্ত প্রণাম গ্রহণ করুন!

বাউল। জয় হউক! নন্দ! তা হলে তুমি ঐ ছেলের বিয়ের আয়োজন করো। কিশোরী! চলো, গার্গীকে এই শুভ-সংবাদটা দিয়ে আসি। (সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—গার্গীর বিদ্যালয়।

(গার্গী, ছাত্রীগণ ও বাউল)

বাউল। গার্গী! আনন্দ করো, মা তোমার সাধনা পূর্ণ করেছেন।

গার্গী। বাবার আজ এত আনন্দের কারণ কি জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

বাউল। বলতেই তো এসেছি মা! নন্দ তার মিলটি দেশের সর্বসাধারণকে দান করেছে। তোমার বিদ্যালয়ের মেয়েদের বিয়ের ভারও সে গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি নরেন জাপান থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে আসছে। তার জন্য একটি মেয়ে ঠিক করো, সে এলেই বিয়ে হবে।

গার্গী। ছেলের বাবা এখান থেকে মেয়ে নিতে রাজী হবেন তো?

বাউল। না হবার কারণ তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। বেথুন কলেজ আর ইডেন হাইস্কুলের মেয়েদেরই যখন সমাজ আনন্দের সহিত গ্রহণ করছেন, তার চেয়ে এই গৃহস্থ-ঘরে তৈরী মেয়ের জাত কোন অংশে খাটো হয়ে যায় নি।

গার্গী। ছেলের মত হবে তো?

বাউল। মেয়েও যেমন আমাদের হাতে তৈরী, ছেলেও তেমন আমাদেরই হাতে গড়া। তুমি মেয়ে ঠিক করো। তবে মনে রেখো, ছেলে ব্রাহ্মণ; তাকে ব্রাহ্মণের মেয়েই দিতে হবে।

গার্গী। শুনেছি, নরেনবাবু কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে, কুলীনদের নাকি মেলে মেলে মিল না হলে বিয়ে হতে পারে না!

বাউল। ঐ মেলের প্রাচীরটা আমি ভেঙে দিতে চাই। দেবীবর ঘটকের ঐ চারটি মেল ব্রাহ্মণ-সমাজে চারটি প্রাচীর, চারভাগে বিভক্ত হওয়ায় ব্রাহ্মণ-সমাজ আজ মরণের পথে এসে দাঁড়িয়েছে। মাতৃ-মন্ত্রে যে ছেলে দীক্ষিত, সে ওসব বাঁধন-ছাঁদনের ভয় করে না, তুমি মেয়ে ঠিক করো।

গার্গী। আমি নিরুপমাকে এ ছেলের সাথে বিয়ে দিতে চাই। সে এবারে আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হয়েছে, শিল্পবিদ্যায় সে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। নরেনবাবুর সাথে তার মিলন আনন্দদায়কই হবে।

দেখতেও বেশ সুন্দরী। এও কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে, তবে মেলে দু'জনার মিল নেই; নরেনবাবু ফুলিয়া, নিরুপমা বল্লভী। মেয়ের বাবা সরকারী চাকুরী করতেন, এখন পেন্সন পাচ্ছেন। বড় সংসার, কোন কোনদিন উপোস করেও থাকতে হয়। তাঁকে আমি একদিন মেল সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তখন তিনি আমায় বলেছিলেন, মা, মেল নিয়ে কি হবে? ব্রাহ্মণ-বংশীয় ছেলে হলেই হলো।

বাউল। ঠিকই তো বলেছেন। অনেকেই এ মেলের প্রাচীর ভেঙে দিতে ইচ্ছুক, কিন্তু সমাজের ভয়ে কেউ অগ্রসর হচ্ছেন না। আমরা এমনই দুর্বল হয়ে পড়েছি যে, সমাজকে উচ্ছন্নে দিতেও প্রস্তুত; সমাজকে প্রসারিত করতে ভীত। যাক্ এ সব কথা, মেয়ের কি কি প্রয়োজন, তা আমায় একটা ফর্দ করে দেবে; এ মাসের পনের তারিখে বিবাহের দিন ধার্য করা হয়েছে। মেয়ের বাবা-মাকে আনবার জন্যে আজই লোক পাঠানো হবে, নন্দের বাড়িতেই বিবাহকার্য সম্পন্ন করা হবে। সকল মেয়েদেরই বলে দিও, তারা যেন বিয়ের জন্য কেউ ব্যস্ত না হয়, তারা তাদের নিজেদের তৈরী করুক, যোগ্যতানুসারে উপযুক্ত বর এরা প্রত্যেকেই পাবে। (প্রস্থান)

(মিলিতকণ্ঠে হুলুধ্বনি দিতে দিতে ছাত্রীগণের প্রবেশ)

নিরু। আজ যে তোদের বড় ঘটা দেখছি! বলি, ব্যাপারখানা কি?

গার্গী। আজ যে আমাদের নিরুদিদির বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেল। তোর বরাত ভালো দিদি! বড় ভাল বর পেয়েছিস্।

হেমা। বড় ভাল বর পেয়েছিস্ বোন, একটু আনন্দ কর, একটু আনন্দ কর!

গার্গী। তোমরা এ বিদ্যালয়ে যারা আছ, তাদের কারো কপালই মন্দ নয়, সকলেই কর্মবীর স্বামী পাবে, এখন তোমরা প্রকৃত গৃহিণী হতে পারলে হয়।

আনন্দা। (নিরুপমার চিবুক ধরে) হ্যাঁরে, বলি একটু কথা বল না, চুপ করে রইলি কেন?

নিরু। যাও, তোমরা আর ঠাট্টা ক'রো না!

মন্দা। আরে, সত্যি, বলছি বাবা এসে বলে গেলেন। এখন একটু আনন্দ কর!

হেমা। আনন্দ আর করবে কি? দেখছ না হাসি মুখ ফুটে বেরুচ্ছে! আচ্ছা দিদি! তোমার বিয়ের কথা বাবা বলেন না কেন?

গার্গী। আমি চিরদিন ব্রহ্মচারিণী থেকে তোমাদের সেবা করবো, এই আমার ব্রত। তাই বাবা আমার বিয়ে দেবেন না, আমায় কুমারীই থাকতে হবে।

হেমা। তবে আমরাই বা বিয়ে করবো কেন? আমরাও কুমারী থেকে জগতের সেবা করবো!

গার্গী। বিবাহিত জীবনই সুন্দর। বিয়ে না হলে জীবনের একদিক অপূর্ণ থেকে যায়। গৃহিণীরই দেশে প্রয়োজন বেশী। কুমারী দু' একটি সমাজে আদর্শ থাকাও প্রয়োজন। বাবা বাল্যকাল থেকে আমায় ঐ আদর্শে ই তৈরী করে এনেছেন। যাক্, এ কথা পরে হবে, চল এখন আমরা নিরুদিদির বিয়ের যোগাড় করি গে।

(হুলুধ্বনি দিতে দিতে সকলের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—নন্দলালের বাড়ি।

(নন্দলাল, কিশোরীলাল, বাউল, সুরমা, কাত্যায়নী, হরিদাসবাবু, গণেশবাবু, গার্গী, নিরুপমা ছাত্রীগণ, পুরোহিত, নরেন, যোগেন ও সুরেশ)

বাউল। হরিদাসবাবুর এ মেয়ে গ্রহণ করতে আপত্তি নেই তো?

হরিদাস। গার্গী দেবীর বিদ্যালযে যে মেয়ে তৈরী হয়েছে, সে মেয়ে সম্বন্ধে আমার বলবার কিছুই নেই, আমি এ বিবাহে খুবই আনন্দিত হয়েছি।

বাউল। গণেশবাবু! আপনার মেয়ে সৎপাত্রে পড়েছে তো?

গণেশ। এর চেযে ভাল পাত্র আর কি হতে পারে? আপনি আমায় কন্যাদায় থেকে মুক্ত করলেন, আমায চিরদিনেব জন্য ঋণপাশে আবদ্ধ করলেন!

বাউল। পুরোহিত মহাশয়! আপনি ছেলে-মেয়ের হাত মিলিয়ে দিন।

নন্দলাল। নরেন, নিরু, তোমরা তোমাদের বাবার পদধূলি নিয়ে প্রস্তুত হও।

(উভয়ে সকলকে প্রণাম করল। গণেশবাবু কন্যা সম্প্রদান করলেন। ছাত্রীগণের হুলুধ্বনি)

বাউল। নরেন, নিরু, আজ থেকে তোমাদের কর্মজীবন আরম্ভ হলো। যে মন্ত্রে তোমরা দীক্ষা গ্রহণ করেছ, সে মন্ত্র যেন ভুলে যেও না। দেশের সেবাই যেন তোমাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত হয়। সংসারের ভিতরে থেকেও কেমন করে ত্যাগী-জীবন গড়ে তোলা যায়, সেইটেই তোমাদের বর্তমান ভারতকে দেখাতে হবে।

নরেন। আপনি আশীর্বাদ করুন, তা হলেই আমি আদর্শ গৃহস্থ হয়ে জগতের সেবা করতে সক্ষম হবো।

নন্দলাল। নরেন! তোমরা বিদেশে যাবার পরেই আমরা তোমাদের জন্য কর্মক্ষেত্র তৈরী করে রেখেছি। আজ থেকে তুমি স্বর্ণপুর মিলের Assistant Engineer-এর পদে নিযুক্ত হলে। বর্তমানে তিন শ' টাকা মাইনে পাবে, যে লোক আমরা বিদেশ থেকে দশ বছরের Contract করে এনেছি তাঁর মেয়াদ আর চার বছর বাকী আছে। এর ভিতরেই তুমি তোমার সকল কাজ আয়ত্ত করে নাও, যেন সে চলে গেলে আমাদের বসে থাকতে না হয়। তাঁর কাজ শেষ হলেই আমরা তোমায় সে কাজে নিযুক্ত করবো; তখন তুমি পাঁচ শ' টাকা মাইনে পাবে।

নরেন। আপনাদেব চরণাশীর্বাদে আমি এখনি সব দায়িত্ব নিতে পারি।

নন্দলাল। তোমাকে পাকা করে নেবার জন্যও তাঁকে আর কিছুদিন রাখতে হবে। তার পরে যে ক'বছরের Contract করে তাঁকে আমরা এনেছি, সে ক'বছর তাঁকে আমরা রাখতে বাধ্য। আর আমাদেব Engineerটি বড়ই ভাল লোক, তিনি ছেলেদের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট যত্ন নিয়ে থাকেন। একটা কাজ দশবার দেখাতে হলেও তাঁর মুখে বিরক্তির ভাব কখনো দেখি নি আমি।

বাউল। (নরেন-নিরুর হাত মিলিয়ে) আজ থেকে তোমাদের নূতন জীবন আরম্ভ হলো, দেখো যেন ব্রত ভঙ্গ না হয়। তোমাদের আদর্শে ভারতের প্রতি গৃহস্থ পরিবার গঠিত হয়ে উঠুক, ইষ্টদেবের কাছে ইহাই আমার প্রার্থনা। দু'জনে মিলে মহামন্ত্র উচ্চারণ করে আজ কর্তব্যের পথে অগ্রসর হও। ভয় নেই, মাভৈঃ! ভগবান তোমাদের মঙ্গল-ইচ্ছা জয়যুক্ত করবেন। প্রিয় পাঠক, গৃহস্থ তৈরী আমার জীবনের সাধনা। এই গৃহস্থ তৈরী করার জন্যই আমার এ "কর্মক্ষেত্রে"র আয়োজন।

নরেন ও নিরু। (মিলিত কণ্ঠে)

"জননী জন্মভূমিশ্চ
স্বর্গাদপি গরীয়সী"

(সকলের মিলিত কণ্ঠে)

"জননী জন্মভূমিশ্চ
স্বর্গাদপি গরীয়সী"

(গীত)

বাউল। তরুণ অরুণ কিরণে প্রকৃতি,
সেজেছে নূতন করিয়া;
প্রভাতী গাহিছে পঞ্চম রাগে,
জাগরণ-গীতি পাপিয়া
পুলকে বিশ্ব উঠিল শিহরি,
খুলে গেছে সব কুটীর-দ্বার,
জাগালো জননী সন্তানগণে,
জাগালো আপন করমে তাঁর;
বন্দি মায়ের চরণ দু'খানি,
আশিস্-সাগরে করিয়া স্নান,
বাহিরিলা সব মত্ত কেশরী,
ধরিয়া মায়ের বিজয় গান;
পেয়েছে এরা মায়ের অভয়,
গিয়েছে এদের মরণ-ভয়।
এরাই পরিবে বিজয়-তিলক,
এরাই বিশ্ব করিবে জয়।

(সকলে 'কালী মাঈকী'—জয়)

সমাপ্ত

॥ চারণ-কবির জীবনের স্মরণীয় ঘটনাবলী ॥

(১) স্বাধীনতার স্বপ্নে, সংকল্পে ও সাধনায় যাঁহারা বাংলার জনসাধারণকে উদ্‌বুদ্ধ এবং অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন—চারণ-কবি মুকুন্দদাস তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ১২৮৫ সালে ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত "বানরি" নামক গ্রামে তাঁহার জন্ম। কিন্তু উক্ত গ্রাম পরে পদ্মাগর্ভে বিলীন হওয়ায় মুকুন্দদাস শৈশবেই "পুণ্যে বিশাল বরিশাল"-এ আসিয়া স্থায়িভাবে বাস করেন। এখানেই তাঁহার গৌরবময় জীবনের ইতিহাস রচিত হওয়ায় অনেকেই মুকুন্দদাসের জন্মস্থান বরিশাল বলিয়া মনে করেন। মূলতঃ বরিশাল 'যজ্ঞেশ্বরের' যজ্ঞভূমি এবং মুকুন্দদাসের গৌরবভূমি। আর জন্মস্থান—স্মৃতিকথার স্মৃতিভূমি, স্মরণভূমি।

(২) মুকুন্দদাসের বাল্যকালের নাম ছিল—"যজ্ঞেশ্বর"। এই যজ্ঞেশ্বর "মুকুন্দদাস" নামে পরিচিত হন—বরিশালের শ্রেষ্ঠ জননায়ক মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। বলা যায়, মুকুন্দদাস মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের আবিষ্কার ও সৃষ্টি। ১৩০২ বঙ্গাব্দে বরিশালের ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের শারদোৎসবে স্বর্গীয় পণ্ডিত মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় রচিত—"চল্ রে চল্ রে ও ভাই, জীবন আহবে চল্" এই সংগীতটি সমবেত ছাত্রকণ্ঠে গীত হইয়াছিল। ঐ ছাত্রদের পুরোভাগে পতাকাহস্তে সংগীতের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র যজ্ঞেশ্বর। সেই স্মরণীয় দিনের স্মরণীয় সংগীত-ব্যঞ্জনার মধ্যে ভাবী-মুকুন্দের আভাস স্ফুট হইয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

(৩) ১৩০৭ বঙ্গাব্দ। পূজার ছুটি। উৎসবমুখর বরিশাল যেন ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া ছুটির আরাম ভোগ করিতেছে। এই সময়ে একদিন মুকুন্দের জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটিল। বেলা দ্বিপ্রহরে ক্রেতাশূন্য দোকানে যজ্ঞেশ্বর সমবয়স্ক কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা ও পাঠ এবং মাঝে মাঝে গান করিতেছিলেন। হঠাৎ "রামানন্দ অবধূত" নামে এক সন্ন্যাসী দোকানে আসিয়া উপস্থিত। দেখামাত্রই যজ্ঞেশ্বর "রাগ-অনুরাগ-ভাব-মহাভাবে" আপ্লুত হইয়া

তাঁহাকেই সপ্তাহব্যাপী উৎসবের অবসানে গুরুত্বে বরণ করিলেন। দীক্ষান্তে গুরু রামানন্দ যজ্ঞেশ্বরের নূতন নামকরণ করিলেন—"মুকুন্দদাস"। গুরু-শিষ্যের এই সংবাদ—"রামানন্দ-মুকুন্দ সংবাদ" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

(৪) ১৩০৮ বঙ্গাব্দ—মুকুন্দ-জীবনের এক স্মরণীয় বৎসর। কারণ, ঐ বৎসরের বসন্ত ঋতুতে স্বীয় বিপণিতে বসিয়া যজ্ঞেশ্বর "কৃষ্ণনাম বড়ই মধুর! যে লয় সে বড়ই চতুর"—এই সঙ্গীত রচনা করেন। নবানুরাগের স্পর্শে রঞ্জিত যজ্ঞেশ্বরের জীবনে ইহাই প্রথম রচিত সংগীত এবং উত্তরকালে "মুকুন্দ" নাম প্রচারের সর্বপ্রথম গোপনাভিব্যক্তি। গানের ভণিতায় "গোঁসাঞি রামানন্দের বাণী, শোন্ মুকুন্দ তোরে বলি" ইত্যাদি পদ দ্বারা রামানন্দ-মুকুন্দ সংবাদ অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ ব্যতীত অপরের নিকট অজ্ঞাত রহিল।

(৫) ১৩০৯-১৩১০ বঙ্গাব্দের মধ্যে মুকুন্দের প্রায় শতাধিক গান রচিত ও সঙ্গে সঙ্গে গীত হইয়াছিল। প্রত্যেকটি গানে প্রাচীন রীতি অনুসারে "মুকুন্দ" নামের ভণিতা যুক্ত ছিল। ১৩১০ বঙ্গাব্দে "বরিশাল আদর্শ প্রেসে" ঐ শতাধিক গান মুদ্রিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। পুস্তকের নাম—"সাধন-সংগীত"। মূল্য—আট আনা। গুরু রামানন্দের নামে পুস্তকখানি উৎসর্গ করা হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণের পর নানা কারণে আর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। তবে "সাধন-সংগীত" মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবার পর যজ্ঞেশ্বরের "মুকুন্দ" নাম কিছু কিছু প্রচারিত হইযাছিল।

(৬) ১৩১২ বঙ্গাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সারা দেশ যখন মরণ-পণ সংগ্রামে সঙ্কল্পবদ্ধ ও একতাবদ্ধ, চারণকবি মুকুন্দদাস তখন সেই আন্দোলনকে হাটে-মাঠে-ঘাটে, গ্রামে-শহরে-প্রান্তরে ছড়াইয়া দিবার ব্রত গ্রহণ করিলেন। আর সেই ব্রত পালনের জন্য বৈষ্ণব-মুকুন্দের হৃদয়তন্ত্রী মাতৃমন্ত্রে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। ফলে তিনি দেশকে জড় না ভাবিয়া বাংলার আরাধ্যা চৈতন্যময়ী কালী-দুর্গা মূর্তিতে অঙ্কিত করিয়া "মাতৃপূজা" রচনা করিলেন এবং সুর-সংযোগে তিনি যেভাবে অভিনয় করিলেন তাহাতে সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা বাংলার হৃদয়-মন এক অভিনবরূপে মাতিয়া উঠিল। 'প্রাণহীন এদেশেতে গানহীন যেথা চারিধার'—সেখানে প্রাণের ও গানের সঞ্চার করিবার জন্য মুকুন্দ গাহিলেন—

"জাগো গো জাগো গো জননী।
তুই না জাগিলে শ্যামা, কেউ তো জাগিবে না মা;
তুই না নাচিলে কারো নাচিবে না ধমনী।"

(৭) ১৩১৩ বঙ্গাব্দের প্রথমভাগে সভা-সমিতির বন্যা-প্লাবন হইতে দূরে রহিয়া মুকুন্দদাস সঙ্গোপনে সংগীতাদি ও তাঁহার প্রথম যাত্রাভিনয় "মাতৃপূজা" রচনা শেষ করিলেন। অভিনয় মধ্যে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সংগীত ও অশ্বিনী-কুমারের আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিলেন। আর স্বদেশী মন্ত্রে ও স্বদেশী গানে বাংলাদেশকে মাতাইয়া তুলিলেন। বাংলার চারণ-কবিদের মত মুকুন্দদাস এইভাবে হইয়া উঠিলেন —স্বদেশীযুগের স্বদেশী কবি—চারণ-সম্রাট।

(৮) ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ২ রা বৈশাখ বরিশালের রাজা বাহাদুরের হাবেলীতে অগণিত লোকসহ স্বয়ং অশ্বিনীকুমার মুকুন্দের "মাতৃপূজা" অভিনয় শ্রবণ করিয়া সভাস্থলে দাঁড়াইয়া মুকুন্দকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন এবং বলিলেন—"বীর হও। অন্যায়ও যদি করতে হয়, বীরের মত করো।" বলা বাহুল্য, রাজা বাহাদুরের হাবেলীতে প্রতি বৎসর উকীলদের মুহুরী-মুন্সীরা মহাসমারোহে বাসন্তীপূজা করিতেন। যাত্রাগান হইত তিন পালা। অশ্বিনীকুমারের নির্বাসনের পরে এই পূজা বন্ধ ছিল। আবার দ্বিগুণ উৎসাহ-উদ্দীপনায় সে পূজার আয়োজন হইয়াছিল মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের মুক্তির পরে।

(৯) ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ১লা অগ্রহায়ণ উত্তর সাহাবাজপুরের দাদপুর স্টেশনের নিকটবর্তী নদীতে মুকুন্দের গমনশীল নৌকার গতি পুলিশ সাহেবের লঞ্চ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইল এবং ১০৯ ধারায় দলসহ গ্রেপ্তার হইয়া মুকুন্দ বরিশালে আনীত হইলেন। পাঁচ হাজার টাকার জামিনে বাহির হইয়া পুনরায় ৭ই পৌষ তারিখে বরিশালের রাস্তায় ভ্রমণকালে রাজদ্রোহের অপরাধে তিনি গ্রেপ্তার হইলেন। কিছুকালের মধ্যে মুকুন্দের ভাই রমেশচন্দ্রও "মাতৃপূজা" গানের প্রকাশক বলিয়া গ্রেপ্তার হইলেন। দুইটি ধারায় মুকুন্দদাসের তিন বৎসর জেল ও তিনশত টাকা জরিমানা হইল। এই ঘটনার কয়েকদিন পূর্বে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার নির্বাসিত হইয়াছিলেন। মুকুন্দদাসের প্রথম মোকদ্দমায় বরিশালের কোন উকীল পাওয়া যায় নাই। অবশেষে ভোলার বিখ্যাত উকীল শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাশগুপ্ত ও শরৎচন্দ্র সেন (স্বামী পূর্ণানন্দ গিরি মহাশয়) মুকুন্দদাসের মামলা পরিচালনার জন্য বরিশালে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

(১০) ১৩১৭ বঙ্গাব্দে নির্দিষ্ট দিনে দিল্লীর কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া মুকুন্দদাস অপরিচিত নগরীর রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। কোথায় যাইবেন এবং কোথায় কি খাইবেন তাহা কিছুই ঠিক নাই। তবে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের বাড়িতে আতিথ্য-গ্রহণ ও কালীবাড়িতে প্রণাম করা—এই দুইটি মনে মনে স্থির করিয়া প্রথমে কালীবাড়ি পৌঁছাইয়া প্রণামান্তে মন্দিরের অদূরে

বরিশালের ভৈরবী-মাতার দর্শন লাভ করিলেন। কথোপকথনে মুকুন্দদাস জানিলেন তাঁহার পত্নী-বিয়োগ হইয়াছে। "জয় মা" বলিয়া মুকুন্দদাস যমুনায় স্নান করিলেন এবং মালব্যজীর বাড়িতে কোনরকমে আহার সারিয়া পরবর্তী গাড়িতে কলিকাতা অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। কলিকাতায় একদিন মাত্র অপেক্ষা করিয়া বরিশালে পৌছাইলেন। ঐ বৎসরেই শারদীয়া পূজার পূর্বে বিগত লাঞ্ছনা ঝাড়িয়া ফেলিয়া পুনরায় মুকুন্দদাস দল লইয়া বাহির হইলেন এবং নূতন উদ্যমে সর্বত্র "সমাজ" নামে পালা গান গাহিতে লাগিলেন।

(১১) ১৩২৩ বঙ্গাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের কন্যার বিবাহ। দেশবন্ধু অশ্বিনীকুমারের নিকট বরিশালের মুকুন্দকে ঐ বিবাহোৎসবে গান গাহিবার জন্য চাহিয়া পাঠাইলেন। মুকুন্দ তখন বর্ষাকালীন বিশ্রামের জন্য দলকে ছুটি দিয়া বরিশালে আছেন। অশ্বিনীকুমারের আদেশে মুকুন্দ বিভিন্ন দলের লোকজন আনিয়া একত্র করিলেন; হাজার টাকা বায়না স্থির হইল, মুকুন্দ দলসহ কলিকাতায় পৌছাইলেন। সুসজ্জিত আসরে বাংলার বিশিষ্ট শিরোমণিবৃন্দের উপস্থিতিতে মুকুন্দদাস সুনামের সঙ্গে অভিনয় করিলেন। বায়নাকৃত বিবাহোৎসবের গান সমাপন হইলে শ্রোতৃবৃন্দ জনসাধারণকে "মাতৃপূজা" গান শুনাইবার জন্য ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট্ হলে গানের ব্যবস্থা করিলেন। হলে তিলধারণের স্থান রহিল না। দেশবন্ধুর গৃহে যাঁহারা গান শুনিয়াছিলেন তাঁহারাও উপস্থিত হইলেন। এ দিনের গান-অভিনয় আরও উৎকৃষ্ট হইল। দেশবন্ধু প্রদত্ত একটি মূল্যবান স্বর্ণপদক ঐ আসরে মুকুন্দদাসকে পরাইয়া দেওয়া হইল। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উপহার দিলেন তাঁহাকে একখানি লাঠি, তাহাতে খোদাই করিয়া লেখা :—

"যে রাখে আমারে তার হয় না বিপদ।
মুকুন্দের সখা আমি মূর্খের ঔষধ॥"

(১২) মুকুন্দদাসের প্রতি অশ্বিনীকুমারের স্নেহ-মিশ্রিত ভর্ৎসনা :—

বরিশাল বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সপ্তাহকাল পূর্বে ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ২রা চৈত্র অশ্বিনীকুমার বরিশালে পৌছাইলেন। স্বীয় বিদ্যালয়কে সরকারী সংশ্রব হইতে মুক্ত করিয়া জাতীয় ভাবে শিক্ষা দিবার মনোভাব ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবদের নিকট অজানা রহিল না। শরৎকুমার ঘোষ এবং চারণ-কবি মুকুন্দদাস দলবলসহ তাঁহাকে আগে-ভাগে অভিনন্দন জানাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। অশ্বিনীকুমার ইহা জানিতে পারিয়া ভ্রূকুটি করিয়া স্নেহশাসন-মিশ্রিত স্বরে

মুকুন্দদাসকে বলিলেন—"আজ এই মস্ত বড় সভায় অশ্বিনী দত্তের জন্য একটা করতালির যোগাড় করতে এসেছিস্? খুব জয়-জয়কার আর বাহবা লওয়ার সুযোগ পেয়েছিস? গালাগালি বা হাততালি কোনটাতেই অশ্বিনী দত্তের যা করবার তার একটুও এদিক-ওদিক হবে না। আমার মতামত শুনেছিস্, এসব গোলমাল যাক্, প্রয়োজন হয় আবার বলবো—আজ আর কোন কথাই শুনবো না"—ইত্যাদি।

(১৩) ১৩২৮ বঙ্গাব্দ। মহাত্মা গান্ধীর পরিচালনায় স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ আসমুদ্র-হিমাচলব্যাপী বিস্তৃত প্রান্তর প্লাবিত করিল। মুকুন্দও চরকা আর বিদেশী পণ্য বর্জনের মন্ত্র গাহিলেন দ্বিগুণ উৎসাহে—

"চরকা আমার মাতাপিতা
চরকা বন্ধু সখা,
চরকায় ভাত কাপড় পরি,
জোড়ায় জোড়ায় শাঁখা।"

আসরে 'চিকের' দিক চাহিয়া গাহিলেন—

"ছেড়ে দাও রেশমী চুড়ী বঙ্গনারী
কভু হাতে আর প'রো না,
জাগো গো জননী, ও ভগিনী
মোহের ঘুমে আর থেকো না।"

গানের শেষে দেখা গেল 'চিকের' আড়ালে রাশীকৃত রেশমী চুড়ী মা-বোনেরা ভাঙিয়া বা ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন। আর পরের দিন দেখা গেল—চরকা-দোকানে চরকা বিক্রীর ধুম এবং বিদেশী পণ্যের বহ্ন্যুৎসব।

(১৪) ১৩৪০ বঙ্গাব্দ। মুকুন্দদাসের পূজার বায়না জিলান্তরে ও কালী পূজার বায়না স্বজিলান্তর্গত "নলচিড়া"য় স্থির হইয়াছে। কিন্তু মুকুন্দদাস একাধিকবার জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় এবং বর্ষাকালীন বিশ্রাম তেমন উপভোগের না হওয়ায় শারীরিক দৌর্বল্য উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। চিকিৎসক ও বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হইতে ঔষধ ও সতর্কতার রক্ষা-কবচ লইয়া যথাসময়ে জিলান্তরে পূজার গান শেষ করিয়া অন্যত্র দুই-এক পালা গাহিতেই জ্বরাক্রান্ত হইয়া বরিশালে প্রত্যাবর্তন করিলেন। বরিশালে সুস্থ হইয়া "নলচিড়া"য় কালী পূজার বায়নাকৃত গান শেষ করিলেন। কিন্তু আসরে একবার মাত্র দেখা দিয়া কোনরকমে পালা শেষ করিয়া আবার বরিশালে ফিরিলেন—অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিরেখার মত।

(১৫) ১৩১০-১৩৪১ যাত্রারম্ভের একত্রিংশবর্ষ। মুকুন্দদাস যাত্রাভিনয়ের আহ্বানে ১৩৪১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে কলিকাতায় আসিয়া ১৯ নং গোপাল নিয়োগী লেনে একটি বাড়ি ভাড়া করিয়া দলসহ অবস্থান করেন এবং বিভিন্ন স্থানে গীতাভিনয় আরম্ভ করেন। এমতাবস্থায় হরিশ পার্কের আসরে একদিন অসুস্থতা বোধ করায় মুকুন্দদাস বিশ্রামকল্পে কয়েকদিন অভিনয় বন্ধ রাখিলেন। ৩রা জ্যৈষ্ঠ বেলেঘাটায় এক বন্ধুর বাড়ি হইতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া রাত্রি ১২টায় বাসায় ফিরিলেন। সেবক কালীচরণ নট্ট যথানিয়মে শয্যাদি ঠিক করিয়া পা টিপিয়া দিয়া মশারি ফেলিয়া দিয়া শুইতে গেলেন। পরের দিন সকালে, অর্থাৎ ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বেলা বেশী হওয়া সত্ত্বেও মুকুন্দদাসের শয্যাত্যাগের লক্ষণ না দেখিয়া কালীচরণ অতি সন্তর্পণে মশারি তুলিয়া আতঙ্কিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ছুটিয়া আসিয়া সকলে দেখিল, সেই বীরবপু চাঞ্চল্যের কোন চিহ্ন শয্যায় বা দেহে না রাখিয়া নিশ্চিন্তে নিদ্রা নিমগ্ন—সে নিদ্রা চির-নিদ্রা!

প্রমাণপঞ্জী

১। অমিয় বসু—বাংলায় ভ্রমণ (১ম খণ্ড)।
২। হীরালাল দাশগুপ্ত—জননায়ক অশ্বিনীকুমার।
৩। বৃন্দাবনচন্দ্র পূতহুণ্ড—চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস।
৪। নিখিলনাথ রায়—প্রতাপাদিত্য।
৫। ঐ —যশোহর-খুলনার ইতিহাস।
৬। সুরেশচন্দ্র গুপ্ত—অশ্বিনীকুমার।
৭। শরৎকুমার রায়—ঐ
৮। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন—ঐ
৯। যতীন্দ্রকুমার ঘোষ—অশ্বিনীকুমার রচনা-সম্ভার।
১০। আনন্দচন্দ্র রায়—ফরিদপুরের ইতিহাস।
১১। ঐ —বারভূঞা।
১২। রাজেন্দ্রলাল আচার্য—বাঙ্গালীর বল।
১৩। রবিসাধন চট্টোপাধ্যায়—আমরা বাঙ্গালী।
১৪। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালীর ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড)।
১৫। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়—বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)।
১৬। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১ম ও ৫ম খণ্ড)।
১৭। ঐ —বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়।
১৮। ঐ —বৃহৎ বঙ্গ।
১৯। তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত—প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস।
২০। ঐ —প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা।
২১। গোপাল হালদার—বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা (১ম খণ্ড)।
২২। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—মধ্যযুগে বাঙ্গালা।
২৩। দুর্গাচন্দ্র সান্যাল—বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস।
২৪। অক্ষয়কুমার মৈত্র—ফিরিঙ্গি বণিক।
২৫। ডঃ সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, ৩য় সং)।
২৬। ঐ —মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী।
২৭। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—প্রাচীন বাংলার গৌরব।
২৮। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—কংগ্রেস।

২৯। যতীন্দ্রমোহন রায়—ঢাকার ইতিহাস।
৩০। ভূদেব চৌধুরী—বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম পর্যায়)।
৩১। মণীন্দ্রমোহন বসু—বাংলা সাহিত্য (১ম খণ্ড)।
৩২। শঙ্করীপ্রসাদ বসু—মধ্যযুগের কবি ও কাব্য।
৩৩। ক্ষিতিমোহন সেন—বাংলার সাধনা।
৩৪। ঐ —বাংলার বাউল।
৩৫। ডঃ ক্ষুদিরাম দাস—বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি (ছন্দ ও অলঙ্কার)।
৩৬। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা।
৩৭। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা।
৩৮। নরহরি কবিরাজ—স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙ্গালী।
৩৯। প্রথমনাথ তর্কভূষণ—বাংলাব বৈষ্ণব ধর্ম।
৪০। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস।
৪১। ঐ —বাংলা নাট্যসাহিত্যেব ইতিহাস।
৪২। ঐ —বাংলার লোকসাহিত্য (১ম-৫ম খণ্ড)।
৪৩। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম ও ২য় খণ্ড)।
৪৪। ঐ —প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গালীর সাহিত্য।
৪৫। কালিদাস রায়—প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য।
৪৬। ঐ —বঙ্গসাহিত্য পরিচয়।
৪৭। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান।
৪৮। কৃষ্ণদাস কবিরাজ—চৈতন্যচরিতামৃত। পণ্ডিত সীতাপতি ভট্টাচার্য বি. এ. সম্পাদিত (৩য় সং)।
৪৯। বৃন্দাবন দাস—শ্রীচৈতন্যভাগবত। মৃণালকান্তি ঘোষ (ভক্তিভূষণ দ্বারা পরিশিষ্ট-সংকলিত, ষষ্ঠ সং শ্রীগৌরাঙ্গ-৪৬৪)।
৫০। লোচনদাস—চৈতন্যমঙ্গল। মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত (২য় সং)।
৫১। খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত—পদামৃতমাধুরী।
৫২। ঐ —বৈষ্ণব রস-সাহিত্য।
৫৩। ঐ —কীর্তন (১৩৫২, আষাঢ়)।
৫৪। ডঃ উমা রায়—গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব।
৫৫। অমূল্যধন রায়ভট্ট—বৈষ্ণব-চরিত অভিধান।

৫৬। হরিদাস দাস— গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জীবন।

৫৭। ঐ —গৌড়ীয় বৈষ্ণব-তীর্থ।

৫৮। ঐ —বৈষ্ণব অভিধান (১ম-৪র্থ খণ্ড)

৫৯। নগেন্দ্রনাথ বসু—বিশ্বকোষ অভিধান।

৬০। রামগোপাল দাস—শাখা বর্ণন।

৬১। যদুনাথ দাস—শাখা নির্ণয়ামৃতম।

৬২। ডঃ অজিতকুমার ঘোষ—বাংলা নাটকের ইতিহাস।

৬৩। কালীপদ দাস— চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী।

৬৪। পশুপতি চট্টোপাধ্যায়—চারণ-কবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী।

৬৫। কৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত ও মদনগোপাল গুপ্ত—মুকুন্দদাসের গীতাবলী।

৬৬। সুরেশচন্দ্র দাস—দেশভক্ত ৺মুকুন্দচন্দ্র দাসের গান।

৬৭। বসুমতী সাহিত্য মন্দির— মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী।

৬৮। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—১৩০৪, ১৩০৮, ১৩১৮, ১৩১২, ১৩৩২।

৬৯। রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—১ম ও ২য় খণ্ড।

৭০। বেতার জগৎ—VOL. XXXIV No. 7 'চারণ-কবি মুকুন্দদাস"
- অধ্যাপক কমলাকান্ত ঘোষ, পৃঃ ২১৬-২১৭

৭১। বসুমতী সাময়িকী (রবিবার)—"অবিস্মরণীয় মুকুন্দদাস", তথাগত,

৭২। যুগান্তর—স্বাধীনতা-সংখ্যা
"সমাজ সচেতন মুকুন্দদাস"—সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

৭৩। দেশ—১৩৬৬ সাল, ৫ই আষাঢ়, সংখ্যা—৩৪।
শার্ঙ্গদেব—গানের আসর, পৃঃ ৬২৩-৬২৪।

৭৪। The Times of India.
"Charankabi Mukunda Das"—Salil Ghosh.

৭৫। Dr Radhakamal Mukherjee—The changing Face of Bengal.

৭৬। Ajit Kumar Mukherjee—Folk Art of Bengal.

৭৭। Sir Jadunath Sarkar—History of Bengal.
(VOL. II) Dacca University Publication, 1948.

—